তাফসীরে মাযহারী

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী

চতুর্থ খণ্ড

সপ্তম, অষ্টম ও নবম পারা

(সুরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ্ অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনূবাদক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ্

পুনর্লিখন ও সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং শাওয়াল. ১৪১৯ হিজরী
হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহ. এর পবিত্র জন্মদিবস উপলক্ষে— (জন্ম তারিখ ১৪ই শাওয়াল, ৯৭১ হিজরী)।

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০১০

বিনিময় ঃ পাঁচশত টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI (Volume-IV): Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana Mohammad Wahidullah and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange : Taka Five Hundred only. US$ 20

ISBN 984-70240-0004-0

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক বিশাল শোকমিছিলের মতো আমরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছি মৃত্যু-উত্তর জীবনের দিকে। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই চলেছে আমাদের পৃথিবীর পদযাত্রা। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা হারিয়ে চলেছি সহযাত্রীকে, স্বজনকে। শোকমিছিল হয়ে চলেছে দীর্ঘ, দীর্ঘতর। সন্দেহ নেই, মহাপ্রলয় পর্যন্ত প্রলম্বিত হতেই থাকবে আমাদের শোক ও শংকার এই নিরুপায় অভিযাত্রা।

কিন্তু গন্তব্য তো আমাদের এক নয়। শুরুতে আমরা পেয়েছিলাম একটি জগত— যখন আমরা ছিলাম কেবল আত্মা। এরপর দেয়া হলো আর একটি জগত— যখন আমরা হলাম সকলে সকলের আত্মীয়। পিতা-মাতা, বধু, বন্ধু, বোন, ভাই, সন্তান-সন্ততি, স্বজন। তারপর থেকে বুক পেতে নিচ্ছি নিয়তির তীর। শোকের শরাধার থেকে ছুটে আসা সেই অব্যর্থ শর কাকে কখন বিদ্ধ করবে আমরা জানি না। স্বজন-বিয়োগের বেদনাভরা পৃথিবীতে আমরা তবে আর কতোদিন?

অবুঝ মানুষ। এসো, এই মুহূর্তে ভাবতে শুরু করি— আমরা কে কোথায় যাবো? অনন্ত আলোকে? না অনিঃশেষ অমানিশায়? এসো, সচকিত হই। দূরে দৃষ্টিপাত করি। এ পৃথিবী আমাদের শুরু নয়। শেষও নয়। পরবর্তী পৃথিবীর চিরন্তন আহ্বানকে উপেক্ষা করে তবে আমরা কেনো আশ্রয় করবো এই সাময়িকতাকে, তাৎক্ষণিকতাকে? কেনো প্রশ্রয় দেবো বিস্মরণকে, প্রবৃত্তি-মুখীনতাকে, ঔদাসীন্যকে? আমাদেরকে কি পথপ্রদর্শন করা হয়নি? দেয়া হয়নি কি আকাশাগত জ্ঞান? বলা হয়নি কি, ওই সকল প্রেরিত পথপ্রদর্শনকারীরাই আমাদের নির্ভুল দিশারী?

অনন্ত পথের পথিক আমরা। তাই প্রেম ও জ্ঞানই আমাদের প্রকৃত বৈভব, যে বৈভব কখনো বিচ্যুত হয় না। এ দু'টো সম্পদ ছাড়া বাকী সকল কিছুই প্রয়োজন মাত্র। উদ্দেশ্য নয়।

তিনিই আমাদেরকে দিয়েছেন এই অপ্রার্থিত অস্তিত্ব। দিয়েছেন নিসর্গের নেতৃত্ব। তবে আমরা আরাধ্য করবো কেনো— দাতাকে ছেড়ে দানকে। দান আমাদের প্রয়োজন। আর দাতা আমাদের উদ্দেশ্য। তাই তো আমাদেরকে দৃষ্টিপাত করতে হবে দিক, চিহ্ন ও অনুভবের অতীত ওই দিকহীনতার দিকেই। উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁরই, সকল দিক যাঁর অধিগত। জ্ঞানাকাশের অসীমতা থেকে তিনিই দয়া করে দান করেছেন তাঁর আনুরূপ্যহীন বাণীবৈভবের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি। সেই সুগ্রথিত ও সুগ্রন্থিত বাণীসম্ভারকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি কিরূপে? কী করে মান্য করি অবিমৃশ্যতাকে, অজ্ঞতাকে। আমরা যে বিশ্বাসী। আমরা যে প্রেমিক। সুতরাং অপ্রেম ও অবিশ্বাস আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হবেই। অসিদ্ধ হবে কক্ষ-চ্যুতি, বিস্মৃতি ও অপরিমিতি। জ্ঞানের উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণকে করা হবে অত্যাবশ্যক। সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কথাটিকেই জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— প্রতিটি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীর জন্য জ্ঞানান্বেষণ অত্যাবশ্যক।

অতএব, শোকমিছিলের অভিযাত্রী সকল শোনো। অজ্ঞতা কখনো ক্ষমার্হ নয়। অপরিপূর্ণতা কখনো অভিনন্দনযোগ্য নয়। অপরিচ্ছন্নতা কখনো কাম্য নয়। নৈরাশ্যও কখনো নয় অভিপ্রেত।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছে সেই শুদ্ধ সাহসিকতার পথে, আত্ম-সমাহিতি ও আত্ম-অতিক্রমনের পথে। সচলতা, সংক্ষোভ ও সফলতার পথে। এসো আমরা গন্তব্য নির্ধারণ করি। জ্ঞানের এই মহান উৎসবে হই মগ্ন ও মুখর।

সংক্ষুব্ধ সময় এখন। প্রবৃত্তিপ্রপীড়িত সভ্যতায় অনাবশ্যক ব্যতিব্যস্ততাই এখন আমাদের প্রধান শত্রু। চিরপ্রতারণাপ্রবণ শয়তান প্রায় নিভিয়ে দিতে চলেছে আমাদের জ্ঞানান্বেষণের শিখাটিকে— সভ্যতার নামে, মানবতার নামে। আবার কখনো ধার্মিকতার নামেও। সেকারণে নির্ভুল জ্ঞানের আকর মহাগ্রন্থ আল

কোরআনের যথাভাষ্য অধ্যয়ন অনিবার্য্য। সেই অনিবার্যতার দাবি পূরণ করতে পারে কেবল পরিচ্ছন্নতম বিশ্বাস এবং যথার্থ জ্ঞানানুশীলনের প্রতিভূ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। সুতরাং এই নন্দিত জামাতের বিশ্বাস ও জ্ঞান ভাণ্ডারকেই মান্য করে অগ্রসর হতে হবে আমাদেরকে। তাঁদের ভাষ্যই যথাভাষ্য— নির্ভুল তাফসীর।

হজরতুল আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী রহঃ সেই বিরল ভাষ্যকার (তাফসীকার)— যিনি জ্ঞানপিপাসুদের সম্মুখে উন্মোচন করেছেন এক অবাক নিসর্গ। নির্মাণ করেছেন প্রজ্ঞা-সমুদ্রের এক বিস্ময়কর বেলাভূমি— যে বেলাভূমিতে দাঁড়ালে সহজেই সত্তায় ও আত্মায় এসে লাগে অসীমতার অমেয় বাতাস। সকল ইন্দ্রিয়ও হয় সমমাত্রিকরূপে সচকিত। মনীষা, অন্তর্দৃষ্টি, বর্ণনাসঞ্জাত বিদ্যা— সকল কিছুই যেনো এখানে এসে রচনা করেছে প্রত্যাদেশের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছায়া ও বিস্তার। তাই প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে রচিত হয়েও এই অমূল্য তাফসীর গ্রন্থটির আবেদন এখনো অনিঃশেষ। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়ই যেনো এর গতি ও স্থিতির নিয়ন্ত্রক। নুহ নবীর কিশতীর মতোই এ যেনো প্রত্যয়ী প্রেমিকজনের নিরাপদ আহ্বান ও আশ্রয়। মূর্খতার মহাপ্লাবনের অনিবার্য্য নিমজ্জন থেকে পরিত্রাণার্থী কি আমরা নই?

সর্বজনসমাদৃত এই তাফসীর গ্রন্থটির রচয়িতা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী রহঃ ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রা. এর অধস্তন বংশধর। হিন্দুস্তানের মুসলিম শাসনে অবক্ষয়ের নোনা ধরেছে যখন, তখন তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক পানিপথ শহরের স্বনামধন্য বিচারপতি। বিচারপতির গুরুদায়িত্ব পালন করেও সতত সঞ্চরণশীল ছিলেন জ্ঞানানুশীলনে, গ্রন্থ রচনায়, আধ্যাত্মিক সাধনায়। মগ্নতা ও মুখরতাকে এভাবেই মিলিয়েছিলেন তিনি। জ্ঞানীদের ভাবনা বেদনায় তাই তাঁর স্মৃতি ও কৃতি চির ভাস্বর।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহ. এর সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতা নেমে এসেছে এভাবে, হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি—খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী—খাজা সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী—শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদাউনি—শায়েখ মাযহারে শহীদ জানেঁ জানা—কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এই বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সূত্রপ্রবাহটির বর্তমান নাম খাস মোজাদ্দেদিয়া। পূর্ব নাম নকশ্বন্দিয়া। আর মূল নাম নেস্বতে সিদ্দীকী। কারণ এই প্রেমপ্রবাহটি উৎসারিত হয়েছে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম ও প্রধানতম প্রতিনিধি হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে। গ্রন্থকর্তা কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী এভাবে লাভ করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তরিকার পূর্ণতা। আর ওদিকে আশ্রয় করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মাজহাবকে। হানাফী ও মোজাদ্দেদিয়া নামের দুই জ্ঞান-সমুদ্রে সতত সন্তরণরত ছিলো তাঁর সত্তা ও আত্মা। তাফসীর শাস্ত্রের দিকপালগণের মধ্যে এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। আমাদের বৈদগ্ধে ও বৈচিত্রে বর্ণনাসঞ্জাত বিদ্যার সঙ্গে সত্তাসঞ্জাত বিদ্যার যে যথামাত্রা তিনি প্রদর্শন করেছেন— তার তুলনা মেলা ভার।

প্রায় তিনশ’ বছর পর এই প্রথম বঙ্গ-বৃন্তে দল মেলতে শুরু করেছে তাফসীরে মাযহারী। বাহ্যত এ আমাদের যুথবদ্ধ প্রয়াস। আর নেপথ্যে কেবলই আল্লাহ্তায়ালার সবিশেষ দয়া ও দান। বরং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, সুচনা-সমাপ্তি, সবকিছুই তাঁর কৃপা ও করুণা। আমরা তাই আনতমস্তকে হৃদয়ের হৃদয় থেকে ঘোষণা করি তাঁরই মহিমা, পবিত্রতা ও প্রশংসা। এ মহান উপপ্লবে আমরা উপলক্ষ মাত্র। যাকে বলে যোগ্যতা, তা আমাদের ক্ষেত্রে শূণ্যতা ছাড়া অন্যকিছু নয়। আমরা কেবল বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত দেখে চলেছি শূন্যতার অন্ধকারে তাঁরই অনুগ্রহের অবিনাশী আলোর সতত-সম্পাত।

হে আমাদের সত্তার অতুলনীয় ও অননুভব্য সৃজক এবং প্রভুপালক! আমরা প্রার্থী। আর তুমি প্রার্থনা পূরণকারী। আমরা তোমার কাছে অনিঃশেষ অনুগ্রহই কেবল চাই। পুণ্যহীন পথিক আমরা। চাই পরিমিত পদবিক্ষেপের শক্তি ও সাহস। আর চাই ক্ষমা। শুভসমাপ্তি। আমাদের জন্য। সকল মানুষের জন্য।

হে আমাদের বেদনাহত বক্ষের আর্তনাদ শ্রবনকারী আল্লাহ্! আমাদেরকে প্রশমিত করো। দাও তোমার প্রিয়তম রসুলের অক্ষয় ভালোবাসা। বিরামহীন দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি। তাঁর সহচর, পরিবার পরিজন, বংশধর এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারী আউলিয়া সমাজের প্রতি, আমাদের দয়াল পীর ও মোর্শেদ হাকিম আবদুল হাকিম আউলিয়ার প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

হে আমাদের একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অসমকক্ষ উপাস্য! প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা মোহাম্মদ অহিদুল্লাহ, এই মহতী প্রকাশনার সঙ্গে আর্থিক, দৈহিক, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ— সকল সহযোগী এবং উদ্যম, শ্রম, সময় ও সমর্থন নিয়ে জড়িত হয়ে পড়েছি যারা তাদের পিতামাতা ও প্রিয়জনকে দান করো পূর্ণ মাগফেরাত। আর নির্ধারণ করে দাও পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। তোমার এই সুবিশাল সৃষ্টির কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। আমাদের সকলকে রক্ষা করো তোমার অসন্তোষের আগুন থেকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

উপসংহারে দু’টো প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করতেই হয়। সেগুলো হচ্ছে— ১. মূল তাফসীর গ্রন্থটি রচিত হয়েছিলো আরবীতে। আমরা অক্ষরান্তর ঘটিয়েছি দিল্লীর নাদওয়াতুল মুসান্নিফিনের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। ২. আয়াতের বঙ্গানুবাদটি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ‘কুরআনুল করীম’ থেকে।

শেষ বক্তব্যটুকু এই— বিস্মৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং সর্বাত্মক সতর্কতা সত্ত্বেও অনভিপ্রেত কোনো বিচ্যুতি ঘটে যাওয়া অবাস্তব কিছু নয়। বিদগ্ধ পাঠক সমাজের প্রতি উপরোধ— সেরকম কিছু প্রত্যক্ষ করলে জানাবেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্ততার সঙ্গে সংশোধিত হবো।

ওয়াস্সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

সপ্তম পারা — সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৩ — ১২০

সপ্তম পারা — সুরা আনআ'ম ঃ আয়াত ১ — ১১০

অষ্টম পারা — সুরা আনআ'ম ঃ আয়াত ১১১ — ১৬৫

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১ — ৮৭

নবম পারা — সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮৮ — ২০৬

তাফসীরে মাযহারী

চতুর্থ খন্ড

সপ্তম, অষ্টম ও নবম পারা (সুরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত)

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৩ — ১২০
সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১ — ১৬৫
সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১ — ২০৬

সপ্তম পারা

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

❒ রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে-সত্য উপলব্ধি করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্য-বহদিগের তালিকাভুক্ত কর।

হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের রা. থেকে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর এক প্রবীণ সভাসদ ফাল্লাসের নেতৃত্বে একটি দল রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। রসুল পাক স. তাঁদেরকে সুরা ইয়াসিন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। আল্লাহ্পাকের পবিত্র বাণীর হৃদয়হারক আবৃত্তি শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন ফাল্লাস ও তাঁর সঙ্গীরা। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই।

হজরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. থেকে নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনা কিছুটা বিস্তৃত।

আমি বলি, কেবল নাজ্জাশী অথবা নাজ্জাশীর দল সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে— এ রকম বলা ঠিক নয়। কারণ, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা দলকে উপলক্ষ করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের উদ্দেশ্য থাকে ব্যাপক। তাই সাধারণভাবে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্র পাক-পবিত্র বাণী শুনে যারা ক্রন্দন করে তাদের সকলকেই এই আয়াতের উপলক্ষ মনে করা যেতে পারে।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া আন্নাহুম লা ইয়াসতাক্‌বিরূন (আর তারা অহংকারও করে না)। এ আয়াতেও ওই নিরহংকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে', তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে।'

অশ্রুবিগলিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে—ওই অশ্রুপাতকারীদের অন্তরে রয়েছে সত্যের প্রতি অনাবিল আকুতি, নম্রতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় ও ভালোবাসা।

ফয়েজ অর্থ কোনো পাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার পর তা উপচে পড়া। তাদের চোখের অশ্রু উপচে পড়েছিলো— এ কথা বুঝাতেই এখানে 'তাফিদ্বু' (অশ্রুবিগলিত) বলা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের সুললিত আবৃত্তি শুনে তাঁরা অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করেছিলেন।

'মিম্মা আ'রাফু মিনাল হাক্ব' — এ কথার অর্থ তারা যে সত্য উপলব্ধি করে। 'মিম্মা আ'রাফু'— এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে— 'মিন মা আ'রাফু'। — এখানে 'মিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সূচনা বা কারণ প্রকাশার্থে। অর্থাৎ সত্য জেনেছে বলে অথবা সত্য জানার কারণে তারা কেঁদেছিলো। 'মা' শব্দটি এখানে সংযোজক অব্যয়। এর পরে 'মিনাল হাক্ব'— এর 'মিন'— শব্দটি হচ্ছে বায়ানিয়াহ্‌ বা বর্ণনামূলক। অর্থাৎ তারা যে সত্যের বিবরণ বা পরিচিতি লাভ করেছিলো, তার কারণেই তাদের চক্ষু থেকে নির্গত হয়েছিলো অশ্রু। এ রকমও হতে পারে যে, 'মিনাল হাক্ব'— এর 'মিন' আংশিক অর্থ প্রকাশক (তাবইজিয়াহ্‌)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তারা সত্যকে অংশতঃ উপলব্ধি করেছিলো বলে কেঁদেছিলো। সুতরাং অনুমান করে নাও যে, সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি লাভ করলে তাদের অবস্থা হতো কিরূপ?

আতা খোরাসানীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তারা শ্রবণ করে' বলে বুঝানো হয়েছে নাজ্জাশী ও তাঁর দরবারিগণকে। সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামের প্রথম হিজরতকারী দলের নেতা 'কাফ, হা, ইয়া, আইন, সোয়াদ' (সুরা মারইয়াম) পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ওই পাঠ যতক্ষণ চলেছিলো ততক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করে যাচ্ছিলেন নাজ্জাশী ও তাঁর সভাসদবৃন্দ। তারপর তাঁরা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যবাহীদের তালিকাভুক্ত করো।' এ কথার অর্থ, হে আমাদের আল্লাহ্‌! তুমি তোমার রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি যে বাণী অবতীর্ণ করেছো, আমরা তার উপর ইমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকেও বিশ্বাসীদের তালিকাভুক্ত করো। এভাবে তাঁরা সর্বশেষ রসুল ও সর্বশেষ কিতাব সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের বাক্যের প্রথমে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন 'রব্বানা' (হে আমাদের প্রতিপালক)। এ কথাতেই প্রমাণিত হয় যে— তাঁদের বিশ্বাস ছিলো বিশুদ্ধ, মুনাফিকদের মতো মৌখিক নয়। যারা কপট, তারা কখনো আল্লাহ্‌পাককে এ রকম সরাসরি সম্বোধন করতে পারে না।

'আশ্‌শাহিদীন' অর্থ সাক্ষ্যবহনকারীগণ। 'সাক্ষ্য-বহগণের তালিকাভুক্ত করো'— — এ কথা বলে তাঁরা রসুল স. এর ওই সকল উম্মতের অন্তর্ভূত হতে চেয়েছেন, যাঁরা কিয়ামতের দিন অন্য সকল নবী-রসুলের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। বলবেন, এ কথা সত্য যে— সকল নবী তাঁদের উম্মতকে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতে মোহাম্মদীর কিয়ামত দিবসের সাক্ষ্য প্রদানের এই বিরল সম্মানের কথা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল শরীফের মাধ্যমে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, এখানে শাহিদীন অর্থ রসুল মোহাম্মদ স. এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান। এই ব্যাখ্যাটির মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইমানদার। মুনাফিকদের মতো কপটচারী নন। 'শাহাদাত' অর্থই হচ্ছে অন্তর থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি। এখানে আল্লাহ্‌পাকই তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্যে তাঁদের সাক্ষ্যদানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্‌পাক নিজেই মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন— যদিও তারা মৌখিক ইমান প্রকাশ করেছে। যেমন, ওয়াল্লহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিক্বীনা লাকাজিবুন (আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা মিথ্যাবাদী)। কিন্তু এখানে আল্লাহ্‌পাক নিজেই নাজ্জাশী, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ এবং তাঁদের মতো সত্যকে উপলব্ধিকারী ও কোরআন মজীদের আবৃত্তি শুনে অশ্রুপাতকারীদের বাক্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্য-বহদিগের তালিকাভুক্ত করো।'

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৪

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

❒ 'আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করুন তখন আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কী কারণ থাকিতে পারে?'

আল ক্বওমুস সলিহীন (সৎকর্মপরায়ণগণ) অর্থ ইমানদার মুসলমান। অন্য আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ওয়া লাক্বদ্ কাতাব্‌না ফিজ্ জাবুরি মিম্ বা'দিজ্ জিক্‌রি আন্নাল আরদ্ব ইয়ারিছুহা ইবাদিয়াস্ সলিহুন' (আমি উপদেশ দানের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ দাসগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী)। এখানেও 'ইবাদিয়াস্ সলিহুন' (সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ) অর্থ ইমানদার বান্দাগণ।

এখানে নাত্‌মায়ু (আমরা প্রত্যাশা করি)— এর সম্পর্ক রয়েছে নু'মিনু (আমরা বিশ্বাস করি)— এর সঙ্গে। নু'মিনু— এর পূর্বে রয়েছে না বোধক শব্দ 'লা'।

সুতরাং অর্থ হবে এ রকম— কেনো আমরা ইমান আনবো না এবং তা প্রত্যাশা করবো না। এ রকমও হতে পারে যে 'লা' এর সংযোগ কেবলই 'নু'মিনু' শব্দটির সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এ রকম— কী কারণ থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর সত্যবাণীর উপর বিশ্বাসই করবো না, অথচ সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করবো। বিশ্বাসই যদি না থাকে তবে প্রত্যাশা তো থাকতেই পারে না। এ রকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে— এখানে নু'মিনু (আমরা বিশ্বাস করি) এর সর্বনাম দ্বারা নাত্মায়ু (আমরা প্রত্যাশা করি) এর অবস্থা বুঝানো হয়েছে। এভাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে—এ রকম অবস্থায় কী কারণে আমরা ইমান আনবো না, যখন সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা আমাদের অন্তরে বিদ্যমান। এ রকমও উদ্দেশ্য হতে পারে যে— আমরা আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের প্রত্যাশী। এই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে হলে ইমান আনতে হবে। সুতরাং আমাদের যখন ইমান আছে, তখন প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দলের বক্তব্যটি ইহুদীদের একটি প্রশ্নের প্রতিপ্রশ্ন। ইহুদীরা তাদেরকে লজ্জা দিয়ে বলেছিলো, তোমরা আবার ইমান আনলে কেনো? তাদের ওই প্রশ্নের বিপরীতে নাজ্জাশীর দল যে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নটিই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে দীক্ষিত নাজ্জাশীর প্রতিনিধিদল যখন আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেন, তখন তাঁরা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। যদি এ রকম ব্যাখ্যা মেনে নেয়া হয়, তবে আলোচ্য আয়াতটি আর পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের শুরুতে হরফে 'আতফ' (সংযোজক অব্যয়) হিসেবে রয়েছে 'ওয়া' (এবং)। সুতরাং বিষয়টির আরো কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নতুবা এখানে সংযোজক অব্যয়টি অর্থগত দিক দিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, হয়তো এখানে কিছু কথা অনুক্ত রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৫, ৮৬

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

❐ এবং তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। ইহা সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার।

❒ যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী।

পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত বিশুদ্ধ বিশ্বাস সম্বলিত বক্তব্যটি যাদের, তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন— এবং তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আল্লাহ্পাকের কালাম শুনে তাঁরা অশ্রুপাত করেছিলেন। ওই অঝোর অশ্রুপাত ছিলো বিশুদ্ধ বিশ্বাসের প্রকাশ। তাঁদের ওই হৃদয়োৎসারিত রোদন এবং বিশ্বাসের অকুণ্ঠ ঘোষণার কারণে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে। কথার মাধ্যমে মানুষ তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। যেমন বলা হয় যে, এটাই অমুক ব্যক্তির অভিমত। অর্থাৎ তিনি এই অভিমতে বিশ্বাসী। সুতরাং, কোরআন শ্রবণ করে অশ্রুপাতকারীরা বিশ্বাস প্রকাশার্থে যে অভিমতটি প্রকাশ করেছেন, তার জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে সেই জান্নাত দান করবেন যার পাদদেশে রয়েছে নদী। আর সেই জান্নাতই হবে তাঁদের চিরকালীন আবাস।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া জালিকা জাজাউল মুহ্সিনীন (এটা সংকর্মপরায়ণদের পুরস্কার)। এ কথার অর্থ— যে সকল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে (হুজুরী কলবে) ভয় ও আশা বুকে নিয়ে আল্লাহ্পাকের ইবাদত করবে, তাদের জন্যই রয়েছে আল্লাহ্পাকের চিরস্থায়ী পুরস্কার— জান্নাত। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইহ্সান (ইবাদতের পূর্ণ সৌন্দর্য) এই—তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে এভাবে যেনো তোমরা তাঁকে দেখছো, এ রকম না হলে (বিশ্বাস রাখো যে) তিনি তো তোমাদেরকে দেখছেন।

পবিত্র কোরআনের একটি সাধারণ বাকরীতি এই যে, তিরস্কারের পরে পুরস্কার অথবা পুরস্কারের পরে তিরস্কারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানেও তেমনি প্রদত্ত পুরস্কারের আলোচনা শেষে পরের আয়াতে (আয়াত ৮৬) বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের কথা। বলা হয়েছে, 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারাই অগ্নিবাসী'।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! গোশত ভক্ষণ করলে আমার প্রচণ্ড কামপ্রবণতা জেগে ওঠে। তাই আমি আমার নিজের উপরে গোশত হারাম করে নিয়েছি। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে-সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।

❒ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

উৎকৃষ্ট ও বৈধ বস্তুসমূহকে এখানে বলা হয়েছে তৈয়্যেবাত। আয়াতের ধারাক্রমানুসারে এখানে একটি বিশেষ সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে। প্রথমে নাসারাদের প্রশংসা করা হয়েছে। তাদের বৈরাগ্যকেও প্রশংসনীয় বলা হয়েছে। প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে দূর করার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তারপরে দেয়া হয়েছে হালাল হারামের যথাসংরক্ষণের নির্দেশনা। বলা হয়েছে, ওই সকল বস্তুকে তোমরা অবৈধ কোরো না। এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ালা তা'তাদু— ইন্নাল্লহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন'—এ কথার অর্থ, 'এবং সীমালংঘন কোরো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না।' — কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমরা হালালের সীমানা অতিক্রম করে হারামের সীমানায় প্রবেশ কোরো না। হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিও না। জটিলতা পরিহার করো— সহজ-সরল পথে অগ্রসর হও। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— বৈধ ও পবিত্র বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয়কে প্রশ্রয় দিও না।

ইবনে জারীর সূত্রে আউফী বলেছেন, হজরত ওসমান ইবনে মাজউন এবং কতিপয় সাহাবী একবার ঠিক করলেন, তাঁরা স্ত্রী সম্ভোগ করবেন না, গোশত ভক্ষণ করবেন না এবং নির্বীর্য হবেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন হয় এবং ইবাদত বন্দেগী হয় অধিকতর একনিষ্ঠ। তাঁদের এমতো সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে জারীর এ রকম আরেকটি বিশ্বস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইকরামা, আবু কেলাবা, মুজাহিদ, আবু মালেক নাখয়ী এবং সুদ্দীর সূত্রে। সুদ্দীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, ওই সাহাবীগণের সংখ্যা ছিলো দশজন। হজরত ওসমান বিন মাজউন এবং হজরত আলী বিন আবু তালেবও ছিলেন ওই দলে। ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো সাত জন।

ওই সাত জনের মধ্যে ছিলেন হজরত ইবনে মাজউন, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হজরত হোযায়ফার মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হজরত সালেম। মুজাহিদের বর্ণনায় কেবল হজরত ইবনে মাজউন এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের কথা এসেছে।

ইবনে আসাকেরের ইতিহাস গ্রন্থে সুদ্দী সূত্রে কালাবী ও আবু সালেহের মাধ্যমে এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবীগণের একটি দলকে লক্ষ্য করে। ওই দলে ছিলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ওসমান ইবনে মাজউন, হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হজরত হোযায়ফার আযাদ করা গোলাম হজরত সালেম। তাঁরা সকলে এইমর্মে একমত হয়েছিলেন যে, তাঁরা স্ত্রী সংগম করবেন না, পুরুষাংগ কর্তন করবেন, গোশত ভক্ষণ করবেন না, মসলাযুক্ত আহার্য গ্রহণ করবেন না, পরিধান করবেন কম্বলের পোশাক এবং অভ্যস্ত হবেন অল্পাহারে। জীবনযাপন করবেন জনবিচ্ছিন্ন ও সংসারত্যাগী সাধুদের মতো। তীর্থযাত্রীদের মতো।

প্রথিতযশা তাফসীরকারগণের বিবরণ থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একদিন রসুলপাক স. তাঁর বক্তৃতায় কিয়ামত সম্পর্কে বললেন। কিয়ামতের ভয়াবহ বর্ণনা শুনে শ্রোতৃবৃন্দ ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ক্রন্দন করতে শুরু করলেন সকলে। বক্তৃতা শেষ হলে হজরত ওসমান বিন মাজউনের গৃহে সমবেত হলেন দশ জন সাহাবী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন— হজরত ওসমান বিন মাজউন জাহামী, হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত আলী ইবনে আবী তালেব, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর, হজরত আবু জর গিফারী, হজরত আবু হোযায়ফার মুক্ত দাস হজরত সালেম। সেখানে হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত মা'কাল বিন মাকরানের মধ্যে এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে— তাঁরা দুনিয়া পরিত্যাগ করবেন, চটের পোশাক পরিধান করবেন, গোপনাংগ কেটে ফেলবেন, প্রতিদিন রোজা রাখবেন, রাতে শয্যা গ্রহণ করবেন না— সারারাত নামাজ পড়বেন, গোশত ও চর্বি খাবেন না, স্ত্রীগমন করবেন না, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না। জীবনযাপন করবেন তীর্থযাত্রীদের মতো। অথবা যাযাবরের মতো। এই সংবাদ জানতে পেরে রসুল স. উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান ইবনে মাজউনের বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে তাঁকে পেলেন না। দেখলেন, তাঁর স্ত্রী খাওলা উম্মে হাকিম বিনতে আবী উমাইয়া সুসজ্জিতা ও সুবাসিতা। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্বামী সম্পর্কে যা কিছু শুনলাম তা কি সত্য? খাওলা স্বামীর গোপন শপথের কথা জানাতে চাচ্ছিলেন না। আবার অসত্যভাষণও ছিলো তাঁর অপছন্দনীয়। তাই তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওসমান যদি এ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলে থাকেন

তবে ঠিকই বলেছেন। এ কথা শুনে রসুল স. ফিরে এলেন স্বগৃহে। হজরত ইবনে মাজউন বাড়ীতে এসেই শুনতে পেলেন রসুল স. এর শুভাগমনের কথা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. বললেন, আমি শুনতে পেলাম, তোমরা এই এই কথাগুলো বলেছো। হজরত ইবনে মাজউন বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি যথার্থই শুনেছেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। রসুলুল্লাহ্ বললেন, আমার উপর এ রকম কোনো কঠোর নির্দেশ নেই। পুনরায় বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের জীবনের হক রয়েছে। সুতরাং কখনও রোজা রাখো। কখনো ভঙ্গ করো। রাতে উপাসনা করো, আবার নিদ্রাভিভূতও হও। আমি (রাতের শেষাংশে) উঠি (এবং নামাজ পড়ি) এবং (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাই। কখনও রোজা রাখি আবার কখনও ভঙ্গ করি। আমি গোশত ভক্ষণ করি। মসলা মিশানো আহার্য গ্রহণ করি এবং স্ত্রীগমনও করি। আমার এই আদর্শকে যে অবজ্ঞা করবে, সে আমার অনুসারী নয়। এরপর জনতাকে একত্রিত করে তিনি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা উপস্থাপন করলেন। বললেন, আমি জানি না কী কারণে একদল লোক স্ত্রী সম্ভোগ, উৎকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ, সুগন্ধি ব্যবহার, নিদ্রা এবং পার্থিব প্রয়োজনকে হারাম ঘোষণা করেছে। আমি তোমাদেরকে সন্যাসব্রত অবলম্বন করতে বলিনি। এ রকমও বলিনি যে, আমার ধর্মাদর্শে গোশত আহার এবং স্ত্রী-ব্যবহার নিষিদ্ধ। খানকাবন্দী হওয়ার কোনো নির্দেশও আমি তোমাদেরকে দেইনি। আমার উম্মতের রোজা যাযাবর জীবনের মতো এবং জেহাদ বৈরাগ্যের মতো। আল্লাহ্র উপাসনা করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কোরো না। হজ করো। ওমরা করো। নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। জাকাত প্রদান করো। রমজান মাসের রোজা রাখো এবং চলা ফেরা করো সাধারণ মানুষের মতো। এ রকম করলে তোমাদের আমল যথাযথ হবে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা কাঠিন্যকে প্রশ্রয় দেয়ার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিলো। তাই আল্লাহ্পাক তাদের দায়িত্বকে কঠোর করে দিয়েছিলেন। খৃষ্টানদের গির্জা এবং ইহুদীদের উপাসনালয়ে যারা বসবাস করে, তারা সুচিহ্নিত। তাদের কাছে রয়েছে মানদা (চিহ্ন সমূহ)। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াতটি।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সা'দ ইবনে মাসউদ বলেছেন, একবার হজরত ওসমান ইবনে মাজউন রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমাকে খাসী হওয়ার অনুমতি দিন। তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি খাসী করে এবং যে করায় সে আমার দলভুক্ত নয়। কামপ্রবৃত্তি দমনার্থে আমার উম্মতের জন্য রোজার বিধান দেয়া হয়েছে। হজরত ওসমান বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তবে আমাকে অসংসারী হওয়ার অনুমতি দিন। তিনি স. বললেন,

আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করাই আমার উম্মতের সংসারাসক্তিহীনতা। কতিপয় সাহাবী তখন বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! অনুমতি দান করুন— আমরা বৈরাগ্যকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করি। তিনি স. বললেন, মসজিদে বসে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাই আমার উম্মতের জন্য বৈরাগ্য।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, একবার তিনজন সাহাবী উম্মত জননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকার নিকটে উপস্থিত হয়ে রসুল করীম স. এর ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জননীর নিকট থেকে যথা বিবরণ শুনে তাঁদের মনে হলো রসুল স. এর ইবাদতের পরিমাণ তো নিতান্তই অল্প। তাই তাঁরা বললেন, আমরা তো কিছুতেই রসুল স. এর মতো নই। তিনি নিষ্পাপ। পূর্বাপর সকল বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। সুতরাং আমাদেরকে আরো অধিক ইবাদত করতে হবে। একজন সাহাবী বললেন, আমি তো সমস্ত রাত নামাজ পড়েই কাটাবো। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি কোনো দিন রোজা ভঙ্গ করবো না। তৃতীয়জন বললেন, আমি জীবনে কখনো বিবাহ শাদী করবো না। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হয়ে রসুল স. বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। এখন আমার কথা শোনো— আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি। কিন্তু আমি কোনো দিন রোজা রাখি। কোনো দিন রাখি না। রাতে নামাজ পড়ি। আবার নিদ্রাও যাই। আর আমি বিবাহিতও (এগুলোই আমার আদর্শ)। যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে অবমাননা করবে সে আমার দলের নয়।

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোর হয়ো না। যদি হও, তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। যারা কাঠিন্য পছন্দ করে, আল্লাহ্পাক তাদের উপর কাঠিন্যই চাপিয়ে দেন। খৃষ্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়ে বসবাসকারীদের রয়েছে এক প্রকার বিশেষ চিহ্ন (মানদা)। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— বৈরাগ্য প্রথাটি তাদের নিজস্ব আবিষ্কার, আমি তাদের জন্য বৈরাগ্যকে অত্যাবশ্যক করিনি।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার রসুল স. একটি কাজ করলেন এবং সকলকে সেই কাজ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কেউ কেউ সেই কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম মনে করলেন। এ কথা রসুল স. এর গোচরীভূত হলে তিনি স. জনতাকে একত্র করে একটি ভাষণ দিলেন। প্রথমে বর্ণনা করলেন আল্লাহ্পাকের স্তব-স্তুতি। তারপর বললেন, তারা কেনো ওই কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় যা আমি নিজে করি। আল্লাহ্র কসম, আমি তাদের অপেক্ষা আল্লাহ্পাককে অধিক চিনি। তাঁকে তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি।

হজরত জায়েদ বিন আসলাম থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক মেহ্মান উপস্থিত হলেন হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার গৃহে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে মেহমানের যথাআপ্যায়ণের নির্দেশ দিলেন। রসুল স. এর দরবারে গিয়েছিলেন তিনি। ঘরে ফিরতে তাঁর অনেক রাত হয়ে গেলো। দেখলেন, মেহ্মানকে তখনও আহার করানো হয়নি। তিনি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, তুমি এখনও আমার মেহ্মানকে পানাহার করাওনি, আমার জন্য এই আহার্য হারাম। স্ত্রী বললেন, তবে আমার জন্যও হারাম। মেহ্মান বললেন, তাহলে আমার জন্যেও হারাম। উপায়ান্তর না দেখে হজরত আব্দুল্লাহ্ তাঁর বক্তব্য পরিহার করলেন এবং খাবারের উপর হাত দিয়ে বললেন, এসো বিস্মিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করেছেন, সে সকলকে তোমরা অবৈধ কোরো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে ভালোবাসেন না' (আয়াত ৮৭)।

পরের আয়াতে সরাসরি এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহ্কে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।'

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেছেন, ওই জীবিকা বৈধ (হালাল) যা শরিয়তের বিধানানুযায়ী উপার্জন করা হয় এবং ওই জীবিকা উৎকৃষ্ট (তৈয়্যেব) যা শরীরকে পুষ্ট করে। যা পুষ্টিকর নয়, তা আহার করা মাকরূহ। তবে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এ কথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সকল খাদ্য বৈধ নয়। তেমনি সকল খাদ্য উৎকৃষ্টও নয়।

মোতাজিলারা বলে, হারাম রিজিককে রিজিক বলা যাবে না। কিন্তু তাদের বক্তব্যটি ভুল। কারণ, হারাম যদি না থাকে তবে 'হালাল' শব্দটিও হয়ে পড়বে অনর্থক। আয়াতে হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ এসেছে। —এ কথার অর্থ হারাম খাদ্যও রয়েছে। আর সেই হারাম পরিত্যাজ্য। আর গ্রাহ্য কেবল হালাল।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'এবং ভয় করো আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।' 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। এই আল্লাহ্র ভয়ই খাঁটি ইমানের বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় না থাকলে আল্লাহ্পাকের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার যথাপ্রতিপালন সম্ভব নয় ।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে জননী আয়েশা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. শিরনী ও মধু খেতে ভালোবাসতেন। বোখারী।

আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর প্রিয় আহার্য ছিলো রুটির সরিদ এবং কলিজার সরিদ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পানাহারের পর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের শোকর করে, সে ধৈর্যশীল রোজাদারের মতো। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী।

বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সকল বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ কোরো না' —তখন ওই সকল সাহাবী (যাঁরা স্ত্রীবর্জন, গৃহবর্জন, উৎকৃষ্ট খাদ্যবর্জন ইত্যাদির শপথ করেছিলেন) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তবে আমরা যে সকল শপথ করেছি সেগুলোর কী হবে? তাঁদের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৮৯

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ
الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ
اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ
ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

❐ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে-সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন। অতঃপর ইহার প্রায়শ্চিত্ত দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও, অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি, এবং যাহার সামর্থ নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

শপথের প্রকৃতি এবং শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্‌পাক মানুষকে দায়ী করবেন না, দায়ী করবেন সুদৃঢ় শপথের জন্য, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং যদি ওই শপথ করা হয় আল্লাহ্‌র নামে। এ ধরনের শপথ পূর্ণ করতেই হবে। তাই

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে, ইয়া আইয়্যুহাল্ লাজিনা আমানু আওফু বিল উক্কুদ (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো)।

জ্ঞাতব্যঃ আবু শায়েখ এবং আব্দ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যদি কসমের দ্বারা হালালকে হারাম বানানো হয় তবে তা হবে নিরর্থক কসম (কসমে লাগবী)। এ রকম কসম ভঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে (কাফফারা দিতে হবে)। কিন্তু পরকালে এর জন্য কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই সকল কসমের জন্য, যে সকল কসম করা হয় সুদৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে।

ইতোপূর্বে সুরা বাকারার তাফসীরে শপথ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানেও এ সম্পর্কে কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

মাসআলাঃ চার মাজহাবের ইমাম এবং জমহুর বলেছেন, শপথের বাক্য উচ্চারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। উচ্চারণ মুখে মুখে হোক অথবা মনে মনে। শপথ হতে হবে আল্লাহ্র নামের সঙ্গে অথবা এমন শব্দাবলীর সঙ্গে যা আল্লাহ্পাকের সত্তাবাচক নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন— যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম, তাঁর কসম যিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, শপথ তাঁর যিনি অন্তরের বিবর্তনকারী, আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ ইত্যাদি।

কোনো কোনো হানাফী আলেম বলেছেন, কেবল আল্লাহ্পাকের গুণবাচক নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যা আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত সেই নামের কসম করলে কসম হয়ে যাবে। কিন্তু যে গুণ আল্লাহ্ এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত, সেই গুণবাচক নাম নিয়ে শপথবাণী উচ্চারণ করলে শপথটি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে নিয়ত (সংকল্প), অবস্থা, কারণ এবং নিদর্শনের উপর । অর্থাৎ যেগুলোর উপর শপথ নির্ভরশীল সেগুলোর স্পষ্ট প্রমাণ না পেলে শপথ হবে না। যেমন, হালিম (ধৈর্য্যশীল), আলীম (জ্ঞানী), কাদের (ক্ষমতাশীল), ওয়াকিল (নির্ভরস্থল)। এ সকল বিশেষণ মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এ সকল গুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত শপথ, শপথ হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর পরিচিতির জন্য যে সকল গুণের কসম করেছেন, সে সকল গুণের কসম খেলে কসম হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ্র ইজ্জত, জালাল, আজমত ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ আল্লাহ্পাকের যে সকল গুণের কসম করা হয় না, সে সকল গুণের কসম করলে তা কসম বলে বিবেচিত হবে না। যেমন, আল্লাহ্র এলেম, ইরাদা ইত্যাদি।

ইরাকের শায়েখগণ বলেছেন, জাতি সিফাতের (সত্তাগত গুণাবলীর) কসম খেলে কসম হয়ে যাবে। কিন্তু সিফাতের ফেল বা ক্রিয়ার কসম খেলে কসম হবে না। শায়েখবৃন্দের অভিমত হচ্ছে— যে সকল গুণের বিপরীত কিছু আল্লাহ্পাকের

জন্য অসম্ভব সে সকল গুণই সত্তাগত গুণ (জাতি সিফাত)। যেমন, কুদরত, জালাল, আজমত এ সকলের বিপরীত হচ্ছে অক্ষমতা, অপমান, অবহেলা। এ সকল দোষ থেকে আল্লাহ্পাক সম্পূর্ণ পবিত্র। আর যে সকল গুণের বিপরীত গুণ আল্লাহ্পাকের মধ্যে রয়েছে সে সকল গুণের কসম করা যাবে না। যেমন, রহমত-গজব, সন্তোষ-অসন্তোষ, জীবিকা প্রশস্তকারী-অপ্রশস্তকারী ইত্যাদি।

মাসআলাঃ তিন ইমাম বলেছেন, কোরআন পাকের কসম খেলে শুদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, হবে না—কারণ, এ রকম কসম খাওয়ার প্রচলন নেই (সম্ভবত ইমাম আবু হানিফার যুগে কোরআন পাকের কসম খাওয়া ছিলো অপ্রচল)। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এখন ব্যাপকভাবে কোরআনের কসম খাওয়া হয়। তাই বলতে হয়, কোরআনের কসম খাওয়া শুদ্ধ। মাসহাফ বা সহিফার (আকাশী পুস্তিকার) কসমও কোরআন পাকের কসমের মতো। কেননা মাসহাফ দ্বারা কোরআনকে বুঝানো হয়ে থাকে— যা কাগজ নয়। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, কসমের মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের উক্তি উল্লেখ পূর্বক সকল ইমাম এইমর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কোরআনের কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। এর বিপরীত অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

পবিত্র কোরআনের নামে মিথ্যা কসম খেলে কী পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সে সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে কাফফারা দিতে হবে একটি। ইমাম আহমদ থেকে দু'টি অভিমতের বর্ণনা এসেছে। একটি হচ্ছে— কাফফারা দিতে হবে একটিই। অন্যটি হচ্ছে—কোরআনের প্রতিটি আয়াতের জন্য এক একটি কাফফারা দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্র হকের কসম খায় তবে তার কসম শুদ্ধ হবে না। ইমামত্রয় বলেছেন, হবে।

যদি কেউ লাউমরুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আয়ুর শপথ) এবং লাআয়মুল্লাহ্ (আল্লাহ্র জীবনের শপথ) বলে, তবে ইমাম আজমের (ইমাম আবু হানিফার) মতে কসম শুদ্ধ হবে— কসমের নিয়ত করা হোক অথবা নাই করা হোক। ইমাম আহমদের একটি অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো অনুসারী বলেছেন, নিয়ত না করা হলে বর্ণিত শব্দগুলো দ্বারা কসম শুদ্ধ হবে না। ইমাম আহমদের অপর অভিমতটি এ রকম।

মাসআলা ঃ যদি কা'বা শরীফ অথবা নবীর কসম খায়, তবে তা শুদ্ধ হবে না। সেই কসম ভাঙলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে না— ইমামত্রয় এ রকম বলেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদ বলেছেন, কোরআন ও নবীর কসম খেলে শুদ্ধ হবে। আমাদের পক্ষে রয়েছে রসুল স. এর ওই হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে— কসম যদি খেতেই হয়, তবে আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ো, নতুবা বিরত থেকো। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম খায়, সে অবশ্যই শিরিক করে। হজরত ইবনে মাসউদের একটি মাওকুফ বর্ণনায় রয়েছে— আমার নিকট আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য বস্তুর কসম খাওয়া থেকে উত্তম। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, এই অভিমতটি গ্রহণীয় হবে তখন, যখন কেউ রসুলপাক স. এর নামে প্রতিজ্ঞা করবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকারী যদি এ রকম বলে— যদি আমি এই কাজ করি তবে যেনো রসুল স. এবং কাবা আমার প্রতি বিরূপ হয়। অথবা যদি বলে— আমি যেনো কাফের, ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হই। এ রকম প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা হিসেবেই গণ্য। কেননা প্রতিজ্ঞাকারী এখানে নিজেই কাফের হওয়ার শর্ত সংযোজন করেছে। এ রকম অবস্থায় তাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞার শব্দ বা শর্ত উল্লেখ না করলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা শুদ্ধ হবে। যেমন— কেউ কোনো হালাল বস্তু তার নিজের উপর হারাম করে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করলো। ইমাম শাফেয়ী অবশ্য বলেছেন, হালাল বস্তুকে হারাম করার প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে— রসুল স. তাঁর এক ক্রীতদাসী হজরত মারিয়াকে এবং মধুপান করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাই কোরআনপাকে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু লিমা তুহার্‌রিমু মা আহাল্লাল্লহু লাকা ক্বদ ফারাদ্বল্লহু লাকুম তাহিল্লাতা আইমানিকুম'।

বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে এ রকম বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুরা তাহ্‌রীমের তাফসীরে আসবে ইন্‌শা আল্লাহু তা'য়ালা।'

মাসআলাঃ 'যদি আমি এরূপ করে থাকি তবে আমি ইহুদী হবো অথবা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবো'— এ রকম প্রতিজ্ঞা ইয়ামিনে গুমুস (অতীতের জানিত ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা)। যদি প্রতিজ্ঞাকারী অতীতে কথিত কাজটি করেও থাকে, তবুও ইমাম আজমের মতে সে কাফের হবে না। কেননা তার প্রতিজ্ঞা অতীত সম্পৃক্ত। যদি প্রতিজ্ঞাটি ভবিষ্যৎকাল সম্পৃক্ত হয় তবে সে কাফের হবে। যেমন, সে বললো— 'আমি যদি (ভবিষ্যতে) এ রকম কাজ করি তবে কাফের হয়ে যাবো।' কিন্তু কোনো কোনো ফকিহ্ বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে অতীতকাল সম্পৃক্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারাও সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, কুফরী হওয়ার ব্যাপারটি সে নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, প্রকৃত কথা এই যে, এ রকম প্রতিজ্ঞাকারী যদি তার বক্তব্যকে কেবলই প্রতিজ্ঞা বলে মনে করে, তবে সে কাফের হবে না। কিন্তু যদি সে বুঝে শুনে প্রতিজ্ঞাবাক্যটি উল্লেখ করে, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, জেনে শুনে সে কুফরীকে পছন্দ করেছে। সুতরাং সে অবশ্যই কাফের হবে।

হজরত বুরায়দা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ বলে— আমি ইসলাম থেকে পৃথক হয়ে থাকবো— তার কথা মিথ্যা হলে তো মিথ্যাই। কিন্তু যদি সে মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করে (যদি তার বক্তব্যকে সে সত্য বলে বিশ্বাস করে) তবে সে আর কখনও ইসলামে ফিরে আসবে না। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্পাকের নাম বা গুণের উল্লেখ করে অতীতকালবোধক বাক্য দ্বারা শপথ করলে শপথ হয়ে যাবে। যেমন– –'ক্বসামতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র কসম করেছি) অথবা 'হালাফতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নামে হলফ করেছি), কিংবা 'শাহিদ্তু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিয়েছি) বা 'আজামতু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নামে দৃঢ় সংকল্প করেছি)। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করলেও প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে— এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কারণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক শব্দের মধ্যে বর্তমানই প্রত্যক্ষ এবং ভবিষ্যৎ অপ্রত্যক্ষ। আর ভবিষ্যৎকাল বুঝাতে কিছু কারণেরও আবশ্যক হয়। যেমন, শিন অথবা সাওফা ইত্যাদি। এ ধরনের শপথের দৃষ্টান্ত হচ্ছে—'উক্বসিমু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি অথবা করবো), 'আহ্লিফু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করছি অথবা করবো), আশহাদু বিল্লাহ্ (আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি অথবা দিবো), 'ওয়া আজিমু বিল্লাহ্' (আমি আল্লাহ্র নামে দৃঢ় সংকল্প করছি অথবা করবো)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, নিয়ত ব্যতীত শপথ হবে না। কেননা, মোজারের সিগায় (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালবোধক শব্দরূপে) ভবিষ্যৎ কালই সম্ভাব্য। এ রকম শব্দের মাধ্যমে ভবিষ্যতের প্রতিজ্ঞাই বুঝা যায়। অর্থাৎ এ রকম অবস্থায় 'উক্বসিমু' অর্থ হবে আমি শপথ করবো, 'আশহাদু' অর্থ হবে, আমি সাক্ষ্য দেবো ইত্যাদি।

মাসআলাঃ যদি কেউ তার শপথে আল্লাহ্পাকের নাম বা গুণের উল্লেখ না করে কেবল বলে— আমি শপথ করছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তবে তার শপথ গ্রহণীয় হবে, সে নিয়ত করুক কিংবা নাই করুক। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। এভাবে শপথ উচ্চারণ করার পর কেউ যদি বলে 'আমার তো শপথের নিয়ত ছিলো না'— তবে তার বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ্পাকের দরবারে সে অভিযুক্ত না হলেও আদালতে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে। আদালত তার 'আমি শপথ করছি'— এ রকম বাক্যকে শপথ বলে ধরে নেবে। অবশ্য যদি সে ধর্মপরায়ণ ও সত্যবাদী হয় এবং তার ধর্মভীতির সম্পর্ক হয় কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে (যিনি অন্তর্যামী)।

ইমাম জোফারের একটি অভিমত এবং ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমত অনুযায়ী কেউ যদি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে কেবল বলে

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি' তবে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করার উদ্দেশ্য তার না থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা হবে না। কেননা তার ওই বাক্যটি শরিয়তবহির্ভূত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্তও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,'আমি প্রতিজ্ঞা করছি'—এ রকম কথা বললেই প্রতিজ্ঞা হয় না। প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য থাকলেও হয় না। না থাকলেও হয় না।

আমরা বলি, আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করাই শরিয়তের বিধান। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে প্রতিজ্ঞা করা নিষিদ্ধ। তাই নিয়ত যদি শরিয়তসম্মত হয় তবে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থও করতে হবে শরিয়তসম্মতভাবে। হাদিস শরীফেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নবৃত্তান্ত রসুলপাক স. সকাশে বর্ণনা করলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিলে আমি তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে চাই। তিনি স. অনুমতি দিলেন। হজরত আবু বকর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি সঠিক ব্যাখ্যা করতে পেরেছি? তিনি স. বললেন, ব্যাখ্যার কিছু অংশ সঠিক এবং কিছু অংশ ভুল। হজরত আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি কসম খাচ্ছি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার ভুল ব্যাখ্যাটি ধরিয়ে দিন। রসুল স. বললেন, এভাবে কসম খেয়ো না। ইমাম আহমদের বর্ণনায় বর্ণিত হাদিসটির বিবরণ এসেছে এ রকম। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে— হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি অবশ্যই আমাকে ভুল ব্যাখ্যাগুলো জানিয়ে বাধিত করবেন। তখন রসুল স. বললেন, কসম খেয়ো না। আল্লাহ্‌পাকই সমধিক জ্ঞাত।

আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, 'ফা কাফ্‌ফারাতুহু'। শব্দটির অর্থ কাফফারা, ক্ষতিপূরণ, প্রতিকার অথবা প্রায়শ্চিত্ত। দৃঢ়তার সঙ্গে জ্ঞাতসারে কৃত শপথকে বলে ইয়ামিনে গমুস। এ রকম শপথভঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করলে বা কাফফারা দিলে শপথ ভঙ্গের পাপ মুছে যায়।

এর পরের আয়াতে দেয়া হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম ও নির্দেশনা। বলা হয়েছে, 'ইত্‌আ'মু আ'শারাতি মাসা কিনা'— এ কথার অর্থ, প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্যদান করবে। দরিদ্র বা মিসকিনকে খাদ্যদান অর্থ খাদ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব বা মালিকানা প্রদান অথবা দানকৃত খাদ্যবস্তু ভক্ষণের অনুমতি প্রদান। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রদত্ত খাদ্যবস্তুর মালিকানা প্রদান না করে, অর্থাৎ খাদ্যবস্তু বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে যদি দশজন দরিদ্রকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পেট পুরে খাইয়ে দেয়া হয়, তবু তা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ কম খেলো বা বেশী খেলো— তা ধরা যাবে না। কেবল দেখতে হবে, তারা সকলে পেট পুরে খেলো কিনা। হাসান বিন জিয়াদ সূত্রে ইমাম কারখী এ রকম বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,

মিসকিনদেরকে আহার্য বস্তুর মালিক করে দিতে হবে, যেনো তারা ইচ্ছে করলে তা নিয়ে যেতে পারে অথবা কিছু অংশ খেয়ে বাকী অংশ নিয়ে যেতে পারে। জাকাত, সদকা ও ফিতরা গ্রহিতাদেরকে প্রদত্ত সম্পদের মালিকানা দিতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রেও মিসকিনদেরকে আহার্য বস্তুর পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া প্রয়োজন। এতে করে মিসকিনেরা ওই আহার্য বস্তু দ্বারা যথেষ্ট সুফল লাভ করার সুযোগ পাবে (কিছু খেতে পারবে, কিছু নিয়ে যেতে পারবে)। শুধু খাওয়ার অনুমতি দিলে যথেচ্ছ সুফল লাভ করার আর সুযোগ থাকে না।

আমরা বলি, কোরআন মজীদে বলা হয়েছে 'আতুজ্‌জাকাহ্।' এখানে আতা অর্থ প্রদান করা। সদ্‌কা ও ফিতিরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে 'আদা' শব্দটি। এর অর্থ আদায় করা। কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়েছে 'ইত্‌আ'ম'। এর অর্থ খাদ্য প্রদান নয়— খাদ্যের উপর আহারের কর্তৃত্ব প্রদান। অর্থাৎ আহার করানোই ইত্‌আম শব্দের প্রকৃত অর্থ।

একটি প্রশ্নঃ যদি ইত্‌আম শব্দটির অর্থ আহার করানো হয় তবে খাদ্য প্রদান (যে খাদ্য দরিদ্ররা নিয়ে যেতে পারবে) নাজায়েয হওয়াই সমীচীন। কিন্তু খাওয়ার অনুমতি প্রদান তো এক ধরনের মালিকানা প্রদান। যদি তাই হয় তবে অনুমতি প্রদান ও মালিকানা প্রদান সম্মিলিত হয়ে যায়। তাহলে পৃথকভাবে আহার করানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হবে কেনো?

উত্তরঃ আমরা বলি, মালিকানা প্রদানের মধ্যে আহারের অনুমতি ও দানের ক্ষমতা দু'টোই রয়েছে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, কোরআনের মাধ্যমে এখানে মালিকানার বৈধতা এসেছে। এই বৈধতাটুকু বুঝতে পারাই আসল কথা। এই বৈধতা বাস্তবতার প্রতিকূল নয়। যেমন— কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, পিতামাতা 'উহ্' বলে, এ রকম আচরণ সন্তানেরা করতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে অনেক কথা— যেমন সন্তানেরা তাদের পিতামাতাকে প্রহার করতে পারবে না, গালি দিতে পারবে না ইত্যাদি। তেমনি এখানে খাদ্যদানের মধ্যেও রয়েছে খাদ্যের মালিকানা প্রদান ও খাদ্যাহারের অনুমতি প্রদানের কথা। এখানে খাদ্যের প্রয়োজন মিটানোই আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং আহারের প্রয়োজনকে এখানে বড় করে দেখা সবদিক দিয়ে উত্তম।

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, 'দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্যদান'— সম্পর্কে হজরত আলী বিন আবী তালেব বলেছেন, দরিদ্রদেরকে সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা খাওয়াবে রুটি-গোশত, রুটি-জয়তুনের তেল, রুটি-ঘি, রুটি-খেজুর— যাই হোক না কেনো।

মাসআলাঃ দশজন দরিদ্রের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ধরা যাবে না। কারণ, এ ধরনের শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো পরিপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করতে সক্ষম নয়।

মাসআলাঃ প্রায়শ্চিত্তের খাদ্য হিসেবে গমের রুটি না দিয়ে অন্য রুটি দিলে তার সঙ্গে তরকারী থাকা একান্ত প্রয়োজন— যাতে দরিদ্ররা তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেতে পারে। গমের রুটি দেয়া হলে তরকারী দেয়ার শর্তটি আর থাকে না। কারণ, যিনি খাদ্যদান করছেন তিনি নিজেও সাধারণতঃ তরকারী ছাড়া গমের রুটি খেয়ে থাকেন।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে একজন মিসকিনকে দশ দিন ধরে খাদ্যদান করা জায়েয। কিন্তু একই দিনে একজনকে দশবার খাদ্য প্রদান জায়েয নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, একদিনে একজনকে দশবার খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু একদিনে একজনকে দশজনের খাদ্য দেয়া জায়েয। কেননা, একজন একদিনে দশজনের খাদ্যের মালিক হতে পারে। কিন্তু দশজনের খাদ্য কেউ একদিনে খেতে পারে না (একদিনে কারো দশবার খাবারের প্রয়োজনও হয় না)। তাই ইমাম আজম বলেছেন, একদিনে দশজনের খাদ্য একজনকে দিলে জায়েয হবে না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে— দশ মিসকিনের খাদ্য এক মিসকিনকে খাওয়ানো জায়েয। কিন্তু দেয়া জায়েয নয় (একসঙ্গে, দশবারে কিংবা দশদিনে দেয়া জায়েয নয়)। কেননা আয়াতে বলা বয়েছে, দশজনের কথা। সুতরাং একজন যদি দশ দিন ধরে প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণ করে তবে ওই মিসকিনকে দশ মিসকিন বলা যায় না (সে তো প্রকৃতপক্ষে একজনই)।

ইমাম আজম বলেছেন, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে— খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো। আর প্রতিদিনই নতুন করে আহারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং একজনকে প্রতিদিন আহার দিলে প্রতিদিন একজন একজন করে ধরতে হবে— এভাবে পূর্ণ হবে দশ মিসকিনের সংখ্যা। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়ায় একজনকে প্রতিদিন নতুন নতুন মিসকিন ধরতে হবে। আর যেহেতু একদিনে একজনের দশবার খাদ্যের প্রয়োজন হয় না, তাই একদিনে একজনকে দশজনের খাদ্য প্রদান করলে তাকে ধরতে হবে একজনই— দশজন নয়।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আয়াতে বলা হয়েছে দশজনের কথা। সুতরাং দশজনের সংখ্যা পূরণ করতে হবে। খাদ্য দিতে হবে দশজনকেই— একজনকে নয়।

মাসআলাঃ ইরাকী আলেমগণের অভিমত হচ্ছে— প্রতি মিসকিনকে দিতে হবে দুই মুদ (প্রায় দুই সের) আটা। অর্থাৎ আটার পরিমাণ হতে হবে অর্ধ সা। ইমাম বাগবী বলেছেন, হজরত ওমর এবং হজরত আলী থেকে এ রকমই বর্ণনা এসেছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গম দেয়া হলে দিতে হবে অর্ধ সা (চৌদ্দ ছটাক) এবং যব বা খেজুর দিলে দিতে হবে পূর্ণ এক সা। শা'বী, নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং হাকাম এ রকম বলেছেন। ইমাম মালেকের মতে মুদ্ হচ্ছে বাগদাদী দুই রতল। ইমাম আহমদ বলেছেন, গম অথবা গমের আটা হলে দিতে হবে এক মুদ্। যব অথবা খেজুর দিলে দিতে হবে দুই মুদ্ এবং গমের রুটি দিলে দিতে হবে দুই রতল।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, মুদ্ হচ্ছে রসুল স. এর যুগের মুদ্ যার পরিমাণ এক সমস্ত তিন ভাগের এক রতল। এবং খাদ্য বস্তু হতে হবে শহরবাসীদের প্রধান খাদ্যের মতো। রুটি ও আটা দেয়া ঠিক হবে না। প্রচলিত আহার্য দেয়াই সমীচীন। বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত ইবনে ওমর, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, কাসেম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, আতা এবং হাসানও এ রকম বলেছেন।

অন্য সকল কাফফারার মতো শপথভঙ্গের কাফফারা প্রসঙ্গেও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং ইমামগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম আজমের মতে কাফফারা দিতে হবে দিরহাম ও দিনারের (রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রার) মুদ্রামানে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে। অন্য আলেমগণ বলেছেন, এভাবে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়।

ইমাম কারখীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, খেজুর ও যব দেয়া উচিত এক সা এবং গম আধা সা। স্বসূত্রে কারখী আরো বর্ণনা করেছেন যে, হজরত আলী বলেছেন, শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ হবে আধা সা গম। মুজাহিদের উক্তিরূপে কারখী এ কথাও বলেছেন যে, কোরআনের উল্লেখিত কাফফারার পরিমাণ হচ্ছে মিসকিন প্রতি অর্ধ সা গম।

আত্‌তাহ্‌কীক গ্রন্থে ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন, হজরত সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেছেন, আমি আয়াতের নির্দেশের মধ্যে (তআমু মাসাকিনা) পেয়েছি– কাফফারা দিতে হবে এক মুদ্। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত কথা হিসেবে এসেছে— এই পরিমাণই যথেষ্ট হতো (এই পরিমাণ কাফফারা আদায় করাকে যথেষ্ট মনে করা হতো)।

কাফফারার মাসআলার বিবরণ প্রসঙ্গে হজরত আবু সালমার বর্ণনায় এসেছে– হজরত সুলায়মান বিন সাখর (সালমা বিন সাখর) একবার রমজান মাসে তাঁর স্ত্রীকে জেহার করলেন। অর্থাৎ বললেন, তুমি রমজান মাসে আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ তুল্য। কিন্তু রমজান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পর পরই তিনি স্ত্রীগমন করলেন। পরদিন রসুল স. এর দরবারে গিয়ে তিনি এই ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. বললেন, একটি ক্রীতদাসী কিনে মুক্ত করে দাও। হজরত

সালমা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বাঁদী আজাদ করা তো আমার পক্ষে কঠিন। তিনি স. বললেন, তবে একাধারে দু'মাস রোজা রাখো। হজরত সালমা বললেন, আমি এ রকম করতেও অক্ষম। রসুল স. বললেন, তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। তিনি বললেন, এ কাজটিও আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন রসুল স. হজরত ওরওয়া বিন আসরকে নির্দেশ দিলেন, সালমাকে এক ফুরক (খেজুর) দিয়ে দাও। তারপর সালমাকে বললেন, এই খেজুর দিয়ে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাও। তিরমিজি। (পনেরো/ষোলো সা আহার্য বস্তুর সংকুলান হয় এমন পাত্রকে বলে ফুরক)।

তিরমিজির মতো আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং দারেমীও হজরত সালমা বিন সাখরের হাদিস বর্ণনা করেছেন—যেগুলোতে বলা হয়েছে, হজরত সালমা বলেছিলেন, আমি রমণীর মধ্যে ওই বস্তু পাই যা অন্য কেউ পায় না।

ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য ফিকাহ্‌ শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, কাফফারা স্বরূপ প্রতি মিসকিনকে এক চতুর্থাংশ সা খাদ্যবস্তু দেয়াই যথেষ্ট। এর সমর্থনে তাঁরা হজরত সালমা সম্পর্কিত হাদিসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আর ইমাম আবু হানিফা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হজরত আউস বিন সামেত থেকে তিবরানী বর্ণিত হাদিসটিকে—যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছিলেন, ষাটজন মিসকিনকে তিরিশ সা খাদ্যবস্তু দিয়ে দাও। হজরত আউস বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার কাছে তো ওই পরিমাণ আহার্য বস্তু নেই। আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই আমি ওই পরিমাণ খাদ্য দিতে পারবো। রসুল স. তখন তাঁকে দিলেন পনেরো সা। অন্য এক সাহাবীও তাঁকে সাহায্য করলেন। এভাবে তিরিশ সা হয়ে গেলো। আমি বলি, সম্ভবতঃ ওই পনেরো সা ছিলো গম। আবু দাউদ ও ইবনে ইসহাক বর্ণিত হজরত মুয়াম্মার বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন হানযালা এবং হজরত ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন সালামের হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি তাকে এক ফুরক খুরমা দান করবো। হজরত আউস বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আমি এক ফুরক দান করবো। তিনি স. বললেন, উত্তম। বর্ণনাকারী বলেছেন, এক ফুরকের পরিমাণ ষাট সা এবং এক মাকতালের পরিমাণ তিরিশ সা। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, শেষোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা এক মাকতালের পরিমাণ যদি ষাট সা হতো তবে দ্বিতীয়বার সাহায্য প্রার্থনার আর প্রয়োজনই দেখা দিতো না।

হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমান সম্পর্কিত হাদিস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, এক ফুরক অর্থ পনেরো সা ওজনের একটি আটি, গাঁইট বা বোঝা। হজরত সালমা বিন সাখরের ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বললেন, ষাটজন দরিদ্রকে এক ওসাক খুরমা দিয়ে দাও। হজরত সালমা বললেন, যিনি আপনাকে রসুল রূপে প্রেরণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার

শপথ! আমি দুই রাত ধরে অভুক্ত। আমার ঘরে কোনো খাবার নেই। রসুল স. বললেন, তুমি বনি জুরাইকের জাকাত আদায়কারী কর্মচারীর কাছে যাও। সে তোমাকে কিছু দিবে। যা দিবে তা থেকে এক ওসাক খেজুর ষাটজন মিসকিনকে দিয়ে দাও। অবশিষ্ট যা থাকবে তা তোমার এবং তোমার পরিবারের। আবু দাউদ, আহমদ।

মাসআলাঃ শিশুদেরকে আহার করানো এবং খাদ্যদান দু'টোই জায়েয। শিশুদের পক্ষ থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ করবে তাদের অভিভাবকেরা। যে শিশু এখনো খেতে শিখেনি, তাকেও কাফফারার খাদ্য দেয়া যাবে। ইমাম আজম, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মতে এ রকম খাদ্যদান সিদ্ধ। ইমাম আহমদের মতে অসিদ্ধ।

মাসআলাঃ ইমাম আজমের মতে জিম্মিকে (আশ্রিত বিধর্মীকে) খাদ্য দান সিদ্ধ। কেননা কোরআনে কেবল বলা হয়েছে দরিদ্রকে খাদ্য দানের কথা। দরিদ্রকে যে ইমানদার হতেই হবে— এ রকম বলা হয়নি। তাছাড়া অন্য আয়াতে এসেছে 'লা ইয়ানহাকুমুল্লহু আনিল্লাজিনা লাম ইউক্বাতিলুকুম ফিদ্‌দিন' (যে বিধর্মী তোমাদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয় না তার সঙ্গে পার্থিব বিষয়ে উত্তম আচরণ করা থেকে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিরত রাখেন না)। জমহুরের মতে বিধর্মীকে কাফফারার খাদ্যদান অসিদ্ধ। কারণ, তাদেরকে জাকাত দেয়া বৈধ নয়। বিধর্মীরা জাকাতের ব্যয়ের খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সিদ্ধান্তটি ঐকমত্যসম্মত। তাই জাকাত প্রদানের খাতের মধ্যে কাফফারা প্রদানকেও সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ রকম কিয়াস অসমীচীন নয়।

আয়াতে বলা হয়েছে, মধ্যম ধরনের খাদ্য দানের কথা। বলা হয়েছে 'মধ্যম ধরনের খাদ্যদান, যা তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের খেতে দাও।' এ সম্পর্কে বাগবী বলেছেন, পরিবার পরিজনেরা যে রকম উত্তম উত্তম আহার্য ভক্ষণ করে, সে রকম উত্তম আহার্য দিতে হবে মিসকিনদেরকে।

আমি বলি, যে খাদ্য উন্নত ধরনের নয় আবার নিম্নমানেরও নয়— সেই আহার্য বস্তুই মধ্যম ধরনের আহার্য বস্তু। ধনী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের পরিবার পরিজনদের জন্য যেমন উত্তম সুস্বাদু আহার প্রস্তুত করা হয় তেমনি উন্নত মানের আহার্য দিতে হবে মিসকিনকে। এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ইমাম আবু হানিফার 'খাদ্যদান অর্থ আহারের অনুমতিদান' এই উক্তিটিকে প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ দরিদ্রদেরকে খাদ্যের মালিকানা প্রদান অথবা আহারে অনুমতি প্রদান দু'টোই সিদ্ধ।

'মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান' সম্পর্কে আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মধ্যম ধরনের খাদ্য কেমন তা নির্ধারিত হয় আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে— অভাব ও

সচ্ছলতার নিরিখে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অধিক জাঁকজমকপূর্ণও নয়— আবার নিকৃষ্ট মানেরও নয়।

'অথবা তাদেরকে বস্ত্র দাও'—বস্ত্রও দিতে হবে মধ্যম মানের। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের অভিমত এই— এতটুকু কাপড় দিতে হবে, যা পরিধান করে নামাজপাঠ করলে নামাজ শুদ্ধ হয়। ইমাম মোহাম্মদও এ রকম বলেছেন, পুরুষকে দিতে হবে পাজামা, লুঙ্গি অথবা কোর্তা। আর মেয়েদেরকে দিতে হবে দু'টি কাপড়— লম্বা কোরতা ও উড়না।

ইমাম আজম এবং ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হচ্ছে— কমপক্ষে এমন কাপড় দিতে হবে যা দিয়ে শরীরের বেশীর ভাগ অংশ আবৃত করা যায়। তাই কেবল পাজামা দেয়াই যথেষ্ট নয়, যদিও পাজামা পরে নামাজ পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে। আর শুধু পাজামা পরিহিত ব্যক্তিকে বিবস্ত্র বলার প্রচলন রয়েছে। তাই দিতে হবে পূর্ণ পোশাক। আবার মহিলাদেরকে একটি লম্বা কোরতা দিলেই যথেষ্ট হবে। ওড়না দিতে হবে না, যদিও ওড়না ছাড়া মহিলাদের নামাজ শুদ্ধ হয় না। কেননা লম্বা কোরতা পরিহিতা মহিলাকে সাধারণত বিবস্ত্রা বলা হয় না।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত হোযায়ফা বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'আও কিসওয়াতুহুম'(বস্ত্রদান) কথাটির অর্থ কি? তিনি স. বললেন, আবা (লম্বা ঢিলাঢালা জামা)। জননী আয়েশা থেকে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মিসকিনকে দিতে হবে লম্বা ঢিলাঢালা জামা।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, এখানে কিসওয়াতুহুম এর উদ্দেশ্য, কমপক্ষে এতটুকু কাপড় যা পোশাক পদবাচ্য। সুতরাং পাগড়ি বা পাজামা অথবা সাধারণ কোনো জামা— যে কোনো একটি দিলেই বস্ত্রদান শুদ্ধ হবে। টুপি প্রদান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের দু'রকম অভিমত এসেছে। পাঁচজন দরিদ্রকে খাদ্যদান এবং পাঁচজনকে বস্ত্রদান— এভাবেও কাফফারা পরিশোধ করা যাবে। বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। আর ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক বলেছেন, এভাবে কাফফারা দেয়া যাবে না।

এরপর বলা হয়েছে 'কিংবা একজন দাস মুক্তি'। —এখানে 'রক্বাবাতিন' শব্দটির অর্থ গ্রীবাদেশ। অথবা গ্রীবার অধিকারী বা অধিকারিণী। সুতরাং এখানে দাসমুক্তি অর্থ হবে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী মুক্ত করা।

ইমাম আজমের অভিমত হচ্ছে শপথ ও 'জেহার' এর ক্ষতিপূরণরূপে কাফের ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীও মুক্ত করে দেয়া সিদ্ধ। কেননা কোরআনে রয়েছে 'রক্বাবাতিন' শব্দটি—যা মুসলমান ও কাফের ক্রীতদাস এবং ক্রীতদাসী উভয়কেই বুঝায়।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে— মুক্তি দিতে হবে বিশ্বাসী ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে, বিধর্মীকে নয়। কোরআন মজীদের অন্য আয়াতে হত্যার ক্ষতিপূরণরূপে বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আয়াতের আলোকে এখানেও বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার কথা বলা হলো (যদিও এখানে বিশ্বাসী বা বিধর্মীর কথা স্পষ্টরূপে বলা হয়নি)। আমরা বলি, কোরআন মজীদের নির্দেশনাগুলো যে রকম রয়েছে, সে রকম করেই ব্যাখ্যা করা উচিত। একটি নির্দেশকে অন্য নির্দেশের সঙ্গে তুলনীয় ভাবা অনাবশ্যক।

মাসআলাঃ এখানে তিন প্রকার কাফফারার কথা বলা হয়েছে। একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ করা হয়েছে 'আও' (অথবা, কিংবা) শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং এ কথাটি পরিষ্কার যে, বর্ণিত তিনটি নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়াজিব হবে। যিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন, তিনিই নির্ধারণ করবেন, তিনি কোন্ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হজরত হোযায়ফা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা কি যে কোনো একটি নিয়ম নির্ধারণ করে নিতে পারবো?। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। এ বিষয়ে তোমাদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে। তোমরা ইচ্ছে করলে দরিদ্রকে আহার করাতে পারবে, অথবা বস্ত্র দান করতে পারবে কিংবা দাস-দাসী মুক্ত করে দিতে পারবে। অসমর্থ হলে একাধারে রোজা রাখবে তিন দিন।

'এবং যার সামর্থ্য নাই, তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন'— এ কথার অর্থ সকল শপথভঙ্গকারী বর্ণিত তিনটি প্রায়শ্চিত্তের একটিও যদি পালন করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে কাফফারারূপে তিনদিন রোজা রাখতে হবে। অসমর্থ ওই ব্যক্তি যার পারিবারিক ব্যয়বহন ও ঋণ পরিশোধের পর এ রকম কোনো সম্পদ অবশিষ্ট থাকে না— যার মাধ্যমে খাদ্যদান, বস্ত্রদান অথবা দাস-দাসী মুক্তি সম্ভব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি কাফফারার তিনটি নিয়মের যে কোনো একটি নিয়ম পালন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়, তবে তাকে অসমর্থ বলা যাবে না। হজরত হাসান এবং হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের এ রকম বলেছেন।

আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, যার নিকট পঞ্চাশ দিরহাম রয়েছে— সে সমর্থ। তার উপর কাফফারা অবধারিত। পঞ্চাশ দিরহামের কম থাকলে তাকে অসমর্থ গণ্য করা যাবে। তার শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে— একটানা তিনদিন রোজা পালন। আবু শায়েখ কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, বিশ দিরহামের অধিকারী ব্যক্তিকে সমর্থ বলা যাবে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দরিদ্রকে খাদ্যদান তার জন্য ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসের জন্য রোজা পালনই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেননা তার নিজের বলে কিছু থাকে না। সুতরাং খাদ্যদান, বস্ত্র প্রদান অথবা দাসমুক্তি তার দ্বারা সম্ভবই নয়। আবার তার মনিব তার পক্ষে ক্ষতিপূরণ দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মাকাতিব এবং মুসতাসআ প্রকৃতির ক্রীতদাস, ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য (মাকাতিব বলে ওই ক্রীতদাসকে যার সঙ্গে তার প্রভু এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে, — তুমি আমাকে এত টাকা দিলে মুক্তি পাবে। আর মুসতাসআ ওই ক্রীতদাস—যাকে সম্মিলিতভাবে ক্রয় করেছে দু'জন ব্যক্তি। একজন মালিক যদি তাকে মুক্ত করে দেয়, তবে সে অপর মালিককে অর্থ প্রদান করে মুক্ত হয়ে যেতে পারে)।

মাসআলাঃ কাফফারার রোজা পালনকারী ক্রীতদাস তিন দিবস পূর্ণ হওয়ার এক ঘন্টা আগেও যদি মুক্তি পায় এবং প্রায়শ্চিত্ত করার মতো সম্পদও যদি তার হস্তগত হয়, তবে তাকে অন্নদান, বস্ত্রদান অথবা দাসমুক্তির মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মাসআলাঃ আমাদের নিকট কাফফারা আদায় করার ইচ্ছা করার সময়েই সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত (শপথভঙ্গের সময় সম্পদশালী থাকুক বা না থাকুক)। তাই সম্পদ না থাকার কারণে কেউ রোজা পালনকালে সম্পদের মালিক হয়ে গেলে তাকে বর্ণিত তিনটি নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে (অন্নদান, বস্ত্রদান, দাসমুক্তি) কাফফারা আদায় করতে হবে। ওজু না থাকলে যেমন তায়াম্মুম করতে হয়, আবার তায়াম্মুম অবস্থায় পানি পেলে যেমন ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়— এ ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি । সম্পদ না থাকায় তিন দিনের রোজা পালন এবং রোজা পালনকালে সম্পদের অধিকারী হলে কাফফারা প্রদান (অন্নদান অথবা বস্ত্রদান কিংবা দাসমুক্তি)। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শপথভঙ্গের সময় সম্পদের মালিক হওয়া প্রয়োজন।

মাসআলাঃ ইমাম মালেক বলেছেন, ধারাবাহিকভাবে তিনদিন রোজা রাখার প্রয়োজন নেই। ক্রমচ্ছিন্ন রোজা রাখলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কারণ, এই আয়াতে ধারাবাহিকতার কথা উল্লেখিত হয়নি। কেবল বলা হয়েছে 'ছালাছাতা আইআম' (তিনদিন রোজা পালন)। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, একাধারে তিন দিন রোজা রাখা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমত হচ্ছে, ধারাবাহিক রোজা রাখা মোস্তাহাব— ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ধারাবাহিক রোজা পালন ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ীর অপর অভিমতটি হচ্ছে এই—যেহেতু হত্যা ও জেহারের কাফফারারূপে কোরআন মজীদের অন্যত্র ধারাবাহিক রোজা পালনের কথা এসেছে, তাই এখানে শপথভঙ্গের কাফফারার রোজাও ধারাবাহিক হওয়া উচিত।

ইমাম শাফেয়ীর অধিকতর গ্রহণযোগ্য বক্তব্যটির প্রমাণ এই যে— শপথভঙ্গের কাফফারার দু'টি পদ্ধতিকে সামনে রাখতে হবে। একটি হচ্ছে হত্যা ও জেহারের পদ্ধতি। এ সকল ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে ধারাবাহিক রোজার কথা এসেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে সওমে তামাত্তু (ধারাবাহিকতাহীন রোজা)। এই পদ্ধতিটি হজের মধ্যে দমে জবরের (জোরপূর্বক ক্ষতিপূরণের) মতো। আমরা তাই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের বক্তব্যকে যথাস্থানে রাখার পক্ষপাতি। তাই আমরা ক্রমসহ এবং ক্রমবিচ্ছিন্ন— দু'টোর একটিকেও ওয়াজিব বলিনি।

ইমাম আজম তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ দিয়েছেন, হজরত ইবনে মাসউদের ক্বেরাতের মাধ্যমে। তাঁর ক্বেরাতে উচ্চারিত হয়েছে— 'ছালাছাতু আইয়াম।' এর পরে উল্লেখিত হয়েছে 'মুতাতাবিয়াত্' শব্দটি। তাঁর ক্বেরাত সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ রকম সুবিদিত অবস্থা সুনির্দিষ্ট করা সিদ্ধ। এমতোক্ষেত্রে নির্দেশনার গুরুত্বটিই মুখ্য, কারণ এখানে মুখ্য নয়।

মাসআলাঃ বিধর্মীর শপথ কখনো শপথ নয়। সুতরাং তার উপর শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত অত্যাবশ্যক নয়। বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমামত্রয় বলেছেন, বিধর্মীর প্রতিজ্ঞাও প্রতিজ্ঞা পদবাচ্য। সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করলে তাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আমাদের দলিল হচ্ছে— বিধর্মীরা প্রতিজ্ঞা করার যোগ্যতারহিত। কারণ, প্রতিজ্ঞা সম্পাদিত হয় আল্লাহ্পাকের নামের সম্মানের কারণে। কিন্তু বিধর্মীদের কাছে আল্লাহ্র নামের কোনো গুরুত্বই নেই (আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করছি— এ রকম কথা তারা বলে না)। তবে এ রকম বলা যেতে পারে যে, বিধর্মী কোনো বিধান বা আইন অস্বীকার করলে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে বলতে হবে। এটাই আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত বা ঐকমত্য।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত এক ধরনের ইবাদত। কিন্তু বিধর্মীরা ইবাদতেরও যোগ্যতারহিত। আমি বলি, এই দলিলের মাধ্যমে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কোনো বিধর্মী শপথ করার পর যদি মুসলমান হয় এবং তারপর যদি শপথভঙ্গ করে; তবে তার উপরে কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, সে শপথভঙ্গ করেছে মুসলমান হওয়ার পর এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের যোগ্যতাও সে অর্জন করেছে। আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত'— এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায়, শুধু শপথ করলেই কাফফারা ওয়াজিব হয় না— কাফফারা ওয়াজিব হয় শপথভঙ্গ করলে। এটাই আলেমগণের অভিমত।

ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ী এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কাফফারা আদায় করা জায়েয। ইমাম মালেকের একটি অভিমতও এ রকম। কেননা, এখানে কাফফারার সম্পর্ক করা হয়েছে শপথের সঙ্গে, শপথ ভঙ্গের সঙ্গে নয়। তাই শপথ ভঙ্গের পূর্বেই কৃত শপথের কাফফারা পরিশোধ করা সিদ্ধ। কেননা এখানে শপথই কাফফারার কারণ। যেমন, নেসাব পরিমাণ সম্পদ জমা হয়ে যাওয়া জাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে এক বৎসর। কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি কেউ জাকাত দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই— যদি কেউ কাউকে আহত করে, তবে আঘাতকারী ব্যক্তি আহত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার রক্তপণ পরিশোধ করতে পারবে। এ রকম পরিশোধ সিদ্ধ। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, শপথ ভঙ্গের আগেই কৃত শপথের সম্পদগত ক্ষতিপূরণ অথবা রোজা পালন দু'টোই জায়েয। ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফেয়ীর পূর্বতন অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী সময়ের অভিমত হচ্ছে, শপথভঙ্গের আগে কৃত শপথের সম্পদগত ক্ষতিপূরণ প্রদান সিদ্ধ, কিন্তু রোজাপালন সিদ্ধ নয়। কেননা রোজা শারীরিক ইবাদত। আর শারীরিক ইবাদত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করা যায় না। যেমন, নামাজ ও রোজা নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ও মাস ছাড়া প্রতিপালিত হতে পারে না। আর নামাজ, রোজা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত— সম্পদগত ইবাদত নয়।

ইমাম আজম বলেছেন, শপথভঙ্গের পূর্বে সম্পদগত, শারীরিক— কোনো রকম কাফফারা আদায় করা সিদ্ধ নয়। তাঁর মতে কেবল শপথ কাফফারার কারণ নয়, কাফফারার কারণ হচ্ছে শপথভঙ্গ। সুতরাং, শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করা জায়েয নয়। কাফফারার বিধান দেয়া হয়েছে পাপ অপসারণ ও ক্ষমার জন্য। পাপ হয় কসম ভঙ্গ করলে। সুতরাং কসম ভঙ্গের পূর্বে নয়, আর্থিক অথবা শারীরিক কাফফারা ওয়াজিব হবে শপথভঙ্গের পর। তাই শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়।

এবার আসা যাক কাফফারা সংক্রান্ত নিয়ম কানুনের আলোচনায়। কসম খাওয়া হয় ভঙ্গ করার জন্য নয়, কাফফারা প্রদানের জন্যও নয়— বরং পুণ্য অর্জনের জন্য। কসম করাকে শরিয়ত ওয়াজিব করে দেয়নি। কোনো বস্তু লাভের জন্য কসম খাওয়া হলে, কাংক্ষিত বস্তু যদি হস্তগত না হয় তবে তাকে কসম ভঙ্গ কিভাবে বলা যেতে পারে? এমতো অবস্থাকে তো কসম ভঙ্গ করা হয়েছে বলা যায় না। ভঙ্গ করার জন্য কসম করা নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও যদি কসম ভঙ্গ হয়েই যায়, তবে তার জন্য কাফফারা ওয়াজিব। এ রকমও বলা যায় না যে, কেবল কারণ নয়— শর্তের সঙ্গেও রয়েছে কাফফারার সম্বন্ধ। যেমন, রোজার ফিত্‌রা সদকা ওয়াজিব হওয়ার একটি শর্ত। যদি শপথকে কাফফারার কারণ মেনে নেয়া হয়,

তবুও শপথভঙ্গের শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সুতরাং শপথভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দিলে তা আদায় হবে না। কোনো কিছু ওয়াজিব না হওয়া পর্যন্ত তা প্রতিপালনের চিন্তাই তো করা যায় না। জাকাত এবং ফিতরাও ওয়াজিব হওয়ার পূর্বে আদায় করা যায় না। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার শর্তটি অবশ্য প্রতিপালনীয়। অতএব, কোরআনের নির্দেশই এখানে রূপান্তরহীনভাবে বহাল রাখা সমীচীন। কিয়াস বা অনুমানগত ব্যাখ্যাকে এক্ষেত্রে প্রশ্রয় না দেয়াই উচিত।

জাকাত সম্পর্কে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই জাকাত দেয়া যাবে কিনা? তিনি স. বললেন, যাবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। সদকা ফিতর সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. সদকা ফিতরকে ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন। ওই হাদিসে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেকে ঈদের দুই একদিন আগেই ফিতরা দিয়ে দিতেন। রসুল স. তখন থেকেই এর অনুমতি দিয়েছিলেন। ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করা সাধারণতঃ জ্ঞানবহির্ভূত কাজ। তাই সাহাবীগণ এ ব্যাপারে রসুল স. এর নিকট থেকে বিধান জেনে নিয়েছিলেন। নিজেদের জ্ঞানে তাঁরা কিছু করেননি। ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আমার নিকট এটাই সঠিক যে, কসমই কাফফারার কারণ। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে কসম ভঙ্গ করা। উসুলে ফিকাহের মধ্যে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইমামে আজমের মতে 'যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করো, তবে তালাক'—এ রকম বললে বুঝতে হবে ঘর তালাকের কারণ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঘরে প্রবেশ করা। সুতরাং এখানে তালাকের প্রতিবন্ধক হচ্ছে ঘরে প্রবেশ করা, কেবল ঘর নয় (তেমনি শপথ কাফফারার কারণ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে শপথভঙ্গ)। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বর্ণিত বাক্যটি তালাকের কারণ হবে তখনই, যখন নির্দেশিত রমণীটি ঘরে প্রবেশ করবে। ঘরে প্রবেশ করলেই দূর হবে তালাকের প্রতিবন্ধকতা। তাকে এ রকম কথা বলা হয়েছিলো ঘরে প্রবেশ থেকে বিরত রাখার জন্য। এখানেও তেমনি আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়াটাই কসম পূর্ণ হওয়ার কারণ। কিন্তু কসম পূর্ণ না করে ভঙ্গ করা হলে তখনই ওই কসম কাফফারার কারণ হয়ে যায়। সুতরাং কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করা, কারণ পাওয়ার পূর্বে কাফফারা আদায়ের মতো। জাকাত কিন্তু এ রকম নয়। জাকাতের মূল কারণ হচ্ছে সম্পদ। আর ফিতরার কারণ হচ্ছে ব্যক্তি ও ব্যক্তির প্রকৃতি।

কসম ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ— এই অভিমতের পক্ষে নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করা হলো—

হজরত আউফ বিন মালেকের পিতা বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার এক চাচাতো ভাইয়ের নিকট আমি কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে যাই। কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয় না। আত্মীয়সুলভ আচরণও করে না। অথচ তার প্রয়োজনের সময় সে আমার কাছে চাইতে আসে। তাই আমি কসম করেছি, সে যদি আর কখনো চাইতে আসে তবে আমি তাকে কিছুই দিবো না। স্বজনসুলভ আচরণও করবো না। এখন হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে সৎপরামর্শ দিন যা আমার জন্য কল্যাণকর। যদি বলেন, তবে আমি কাফফারা দিতে পারি। নাসাঈ, ইবনে মাজা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতৃব্যপুত্র আমার নিকট প্রার্থী হয়। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি— তাকে আমি কিছুই দিবো না, তার সঙ্গে আপনজনসুলভ ব্যবহারও করবো না। রসুল স. বললেন, তুমি কৃত প্রতিজ্ঞার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও।

হজরত আবু মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি কোনো কথার উপর কসম খাওয়ার পর তদপেক্ষা উত্তম কিছু পাই, তবে ইনশা আল্লাহ্ কৃত কসমের কাফফারা দিয়ে ওই পুণ্য কর্মের দিকে ধাবিত হবো। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পর তদপেক্ষা কোনো উত্তম কর্মের সন্ধান পাও, তবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করে উত্তম কর্মটির দিকে ধাবিত হয়ো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি উত্তম কর্মটি করবে এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ কোনো কিছুর জন্য অঙ্গীকার করে; তারপর তার চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখতে পায়, তবে অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিকতর সুন্দর কর্মটির দিকে অগ্রসর হবে। মুসলিম।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নামে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পূর্বে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত বিষয় এরূপ নয়। কারণ, বর্ণিত হাদিসগুলোতে কাফফারা উল্লেখের পূর্বে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি রয়েছে। আর 'এবং' শব্দটি ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে না। অর্থাৎ শপথ করো এবং কাফফারা দাও কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে, শপথের পর পর কাফফারা দাও। অতএব, শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা দেয়া সিদ্ধ— বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় না।

একটি প্রশ্নঃ কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি। এই শব্দটি ধারাবাহিকতাকে প্রকাশ করে। যেমন হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা থেকে আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, অতঃপর নিজের কসমের কাফফারা দিয়ে দেবে, তারপর অধিকতর উত্তম কাজটির দিকে অগ্রসর হবে। মুসতাদরাক গ্রন্থে জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. শপথ করলে তা

ভঙ্গ করতেন না। যখন আল্লাহ্তায়ালা শপথের প্রায়শ্চিত্তের বিধান অবতীর্ণ করলেন তখন তিনি স. বললেন, এরপর থেকে আমি যদি শপথ করি (এরপর যদি উত্তম কোনো কাজ দেখি), তবে প্রথমে শপথের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো, তারপর ওই কর্মটি করবো— যা উত্তম।

উত্তরঃ আবু দাউদের বর্ণনাটি বিরল প্রকৃতির। বোখারী এবং মুসলিমও হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরার বর্ণনা এনেছেন, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসতাদ্রাক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, জননী আয়েশার বর্ণনাটিও দুর্লভ প্রকৃতির। বোখারীর বর্ণনায় 'ছুম্মা' শব্দটি নেই। রয়েছে 'ওয়াও' (এবং) শব্দটি। যে সকল হাদিসে 'ছুম্মা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে সেগুলো বোখারী, মুসলিম, সুনান ও মসনদ গ্রন্থাবলীর বর্ণনা থেকে ভিন্ন। এ সকল নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হাদিসগুলোর বিপরীত বর্ণনাগুলো বিরল ও অকার্যকর। তাই সেগুলো গ্রহণীয় নয়।

'ওয়াহ্ফাজু আইমানাকুম'— কথাটির অর্থ তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কোরো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ কথার অর্থ তোমরা কথায় কথায় কসম খেয়ো না। কথাটির সঠিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্পাক বাক্যটির মাধ্যমে শপথভঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন এবং শপথ পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সমর্থনে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আ'মানু আউফু বিল উকুদ' (হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যথাযথভাবে অঙ্গীকার পূর্ণ করো)।

শপথের নির্দেশনাঃ পুণ্যকর্মে শপথ করলে তা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু শপথ ভঙ্গের পরে না আগে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে— সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আজম এবং ইমাম আহমদের অভিমত হচ্ছে— শপথভঙ্গ করা যখন এই আয়াতের নির্দেশের বিরুদ্ধে, তাই (ইচ্ছাকৃতভাবে) শপথভঙ্গ করে কাফফারা দেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, শপথবিরুদ্ধ কাজ না করাই উত্তম। কিন্তু কেউ যদি শপথ ভেঙ্গেই ফেলে, তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। এ সম্পর্কে ইমাম মালেকের দু'টি অভিমত এসেছে। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। অপরটি ইমাম শাফেয়ীর। কেউ বৈধ বিষয়ের উপর শপথ করলে (যা না করা— করা থেকে উত্তম) — এ রকম শপথের হুকুমও উপরের হুকুমের ন্যায়।

কেউ যদি কোনো পাপকর্ম করবে বলে কসম খায়, তবে সেই কসম ভঙ্গ করে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। কেননা কসম ভঙ্গের পাপ কাফফারার মাধ্যমে বিদূরিত হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম কসমকারী যদি পাপকর্ম করেই ফেলে (যে কর্মের জন্য সে কসম করেছে) — তবে তার পাপ মুক্তির আর কোনো উপায় নেই।

যদি কেউ মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে, তবে কৃত প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে ক্ষতিপূরণ দান করা উত্তম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'লা তাজআলুল্লহা উরদ্বাতাললি আইমানিকুম' (তোমরা তোমাদের শপথ সমূহকে সৎকর্মের প্রতিবন্ধক কোরো না)।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি কাউকে কিছু দেবো না— এ রকম প্রতিজ্ঞা করতাম এবং (কাফফারাস্বরূপ) দশ জন দরিদ্রকে এক সা করে খেজুর অথবা অর্ধ সা করে গম দিয়ে দিতাম।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক শপথ করে কখনো ভঙ্গ করতেন না। পরে যখন শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিধান গ্রহণ করি। এখন আমি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর তদপেক্ষা উত্তম কিছু পেলে সেটাই গ্রহণ করি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা, আব্দুর রাজ্জাক, বোখারী এবং ইবনে মারদুবিয়া।

মানতঃ যদি কেউ এ রকম শর্ত আরোপ করে মানত করে যে, অমুক বিষয় বাস্তবায়িত হলে আমি মানত পূর্ণ করবো, তবে ওই মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। যেমন— কেউ যদি বলে, যদি আমার অসুখ ভালো হয়ে যায় তবে আমি একটি রোজা রাখবো। এক্ষেত্রে অসুখ ভালো হলে তার উপর একটি রোজা ওয়াজিব হবে। বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই— এ রকম বিষয় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই যদি কেউ মানত করে, তবুও তা পূর্ণ হলে মানত আদায় করা ওয়াজিব হবে। যেমন— কেউ বলে, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমার উপর হজ অত্যাবশ্যক। এমতাবস্থায়ও তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে।

বিশুদ্ধতার সঙ্গে বর্ণিত ইমাম আজমের আরেকটি অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় মানত পূরণ না করে কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। এ রকম অবস্থায় মানত অথবা কাফফারা— যে কোনো একটি পূরণ করা যাবে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে— ইমাম আহমদ বলেন, এমতক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হবে কেবল কাফফারা। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত শেষোক্ত অভিমত দু'টির মতো। ইমাম মালেক বলেছেন, সম্পদ বিতরণের মানত করলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করা ওয়াজিব হবে। সম্পদ দানের নিয়ত না করলে পূরণ করতে হবে কেবল মানত। কেননা হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু লুবাবা রসুল স. কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার তওবার মধ্যে এ কথাটিও ছিলো যে, আমার সম্প্রদায়ের বস্‌তি থেকে যে সকল পাপ প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেগুলোকে পরিত্যাগ করবো এবং আমার সমস্ত সম্পদ থেকে দূরে থাকবো এবং সকল সম্পদ বিতরণ করে দেবো। রসুল স. বললেন, তোমার সম্পূর্ণ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দরিদ্রদেরকে বণ্টন করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

মানতের স্থলে কাফফারা প্রদান সিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হজরত উকবা বিন আমেরের হাদিসটিও সুস্পষ্ট যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেন, মানতের কাফফারা এবং কসমের কাফফারা একই রকম। মুসলিম।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বর্ণনা করেছেন, ক্রোধান্বিত অবস্থার মানত মানত নয়। এ রকম মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। আহমদ, নাসাঈ।

মাসআলাঃ পূরণ করা অসম্ভব— এ রকম মানত করলে কসমের কাফফারার মতো কাফফারা দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে। যেমন কেউ বললো, আমার এই উদ্দেশ্য পূরণ হলে আমি পায়ে হেঁটে হজ করবো অথবা সব সময় রোজা রাখবো ইত্যাদি। মানত পূরণ করতে গেলে যদি পাপ কর্মে লিপ্ত হতে হয় তবুও কাফফারা দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে। যেমন— আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কথাবার্তা বা সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত বা রমজান মাসে রোজা না রাখার মানত ইত্যাদি।

মানত করার অর্থ— কোনো বিষয় পালন করা নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নেয়া এবং এর বিপরীত কিছু করা নিজের উপর হারাম করে নেয়া। কোনো কিছুকে নিজের উপর হারাম করে নিলেই কসম হয়ে যায়। আরবী ভাষায় মানত বুঝাতে আল্লাহ্ শব্দের উপর 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়। যেমন— লিল্লাহি আ'লাইয়া সওমুন (আল্লাহ্র কসম আমার উপর রোজা রাখা অত্যাবশ্যক)। এখানে লিল্লাহ্ শব্দটির প্রথমে সংযোজিত 'লাম' অক্ষরটি কসমের অর্থ প্রকাশক। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে— 'লা আমরুকা।' এখানেও 'লা' কসমের অর্থ প্রকাশক। জননী আয়েশার হাদিসে রয়েছে পাপকর্ম সম্পর্কিত মানত, মানতই নয়। এর কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। নাসাঈ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যার মানত সুনির্দিষ্ট নয়, তার কাফফারা কসমের কাফফারার মতো। গোনাহ্ হয়— এ রকম কাজের মানত যদি কেউ করে, তবে তার কাফফারাও কসমের কাফফারার মতো। শক্তি সামর্থ্যের বাইরে এ রকম মানতকারীর কাফফারাও কসমের কাফফারা তুল্য। সাধ্যের অনুকূল করলেও পূরণ করা জরুরী। আবু দাউদ, ইবনে মাজা। কোনো কোনো আলেম এ সম্পর্কে প্রদত্ত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তিটিকে সমর্থন করেছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, হজরত উকবা বিন আমেরের বোন একবার মানত করে বসলেন— নগ্ন পদে এবং নগ্ন মস্তকে তিনি পদব্রজে হজ যাত্রা করবেন। হজরত উকবা রসুল স. এর নিকটে এর সমাধান জানতে চাইলে তিনি স. বললেন, তাকে মস্তক আবৃত করে এবং কোনো বাহনে আরোহন করে হজে রওয়ানা হতে বলো এবং তিন দিন রোজা রাখতে বলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুনান রচয়িতা চতুষ্টয় এবং দারেমী।

মাসআলাঃ কসম করার সময় যদি কেউ 'ইন্শাআল্লাহ্' বলে তবে তার কসম হবে না। এ রকম অবস্থায় কসমের বিপরীত কিছু করলে, সে কসম ভঙ্গ করেছে বলা যাবে না (কেননা তার কসমই হয়নি)। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'ইনশাআল্লাহ্' উচ্চারণ করে কসম করলে কসম হবে না। সুনান প্রণেতা চতুষ্টয়, দারেমী। তিরমিজি বলেছেন, একদল আলেমের নিকট এ বর্ণনাটি, হজরত ইবনে ওমরের নিজস্ব বক্তব্য।

শেষে বলা হয়েছে, 'এভাবে আল্লাহ্, তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেনো তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো'। এ কথার মাধ্যমে এই আয়াতে বর্ণিত শপথ সম্পর্কীয় অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সমূহের বিশদ বিবরণ দানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেনো তোমরা প্রদত্ত নির্দেশ সমূহ যথাপ্রতিপালনের মাধ্যমে আল্লাহপাকের সন্তোষ এবং নৈকট্যলাভ করে তাঁর একনিষ্ঠ কৃতজ্ঞভাজন হতে সক্ষম হও।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯০, ৯১,৯২,৯৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ○ وَأَطِيعُوا۟
ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوا۟ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا
ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ○ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّ
أَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ○

❐ হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

❐ শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহের স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?

❐ তোমরা আল্লাহের আনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে জানিয়া রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য।

❒ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই, যদি তাহারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্যনির্ণায়ক তীর ইত্যাদি সম্পর্কে সুরা বাকারার তাফসীরে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এখানেও দেয়া হয়েছে স্পষ্ট নির্দেশনা।

জ্ঞাতব্য ঃ তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, একবার হজরত ওমর বিন খাত্তাব দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! মদ সম্পর্কে আমাদের প্রতি একটি শান্তিদায়ক বিধান অবতীর্ণ করুন। তখন সুরা বাকারার মাধ্যমে রসুল স. এর প্রতি অবতীর্ণ হলো, 'ইয়াসআলুনাকা আ'নিল খমরি ওয়াল মাইসিরি কুল ফিহিমা ইছমুন কাবিরূ 'ওয়া মানাফিউ' লিন্নাস' (লোকে আপনাকে মদ, জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকার)। হজরত ওমর পুনরায় দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ্! শরাব সম্পর্কে আমাদের উপর কিছু প্রশান্তিপ্রদায়ক নির্দেশ অবতীর্ণ করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার এই আয়াত— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু লা তাক্বরাবুস্ সলাতা ওয়া আংতুম সুকারা' (হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা মদমত্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না)। রসুল স. হজরত ওমরকে ডেকে এই আয়াত শোনালেন। হজরত ওমর পুনরায় প্রার্থনা জানালেন হে আল্লাহ্! মদ সম্বন্ধে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট কিছু অবতীর্ণ করুন। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা মায়িদার এই আলোচ্য আয়াতটি (আয়াত ৯১)। হজরত ওমর তখন বললেন, আমি বিরত থাকবো, আমি বিরত থাকবো (মদ এবং জুয়া থেকে)।

হজরত আব্দুর রহমান ইবনে হারেস বর্ণনা করেছেন, আমি হজরত ওসমান ইবনে আফফানকে বলতে শুনেছি, তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাকো। কেননা মদ্যপান সকল পাপের উৎস। শোনো অতীত কালের একটি ঘটনা—এক ইবাদতপ্রিয় লোকের প্রতি আকৃষ্ট হলো এক চরিত্রহীনা রমণী। একদিন রমণীটি তার ক্রীতদাসীকে আবেদ লোকটির নিকট প্রেরণ করলো। ক্রীতদাসী আবেদকে বললো, আমি আপনাকে সাক্ষ্যদান করার জন্য ডাকতে এসেছি। সরলমনা লোকটি বললো, তবে চলো। এই বলে সে ক্রীতদাসীটির সঙ্গে চলতে চলতে একটি গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হলো। ক্রীতদাসীর সঙ্গে সে গৃহের দুই তিনটি দরজা অতিক্রম করলো। প্রতিটি দরজা অতিক্রমের পর ক্রীতদাসীটি দরজার কপাট অর্গলবদ্ধ করে দিচ্ছিলো। এভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করার পর সে উপস্থিত হলো এক গৌরবর্ণের রমণীর সামনে। রমণীর পাশে ছিলো একটি শিশু এবং একটি মদপূর্ণ পাত্র। রমণীটি বললো, আমি আসলে আপনাকে সাক্ষ্য দানের

জন্য ডাকিনি। এখন আপনাকে করতে হবে তিনটি কাজের যে কোনো একটি— আমার সঙ্গে রতিকর্ম করুন অথবা মদ্যপান করুন কিংবা এই শিশুটিকে হত্যা করুন। লোকটি বললো, বুঝেছি এখন তো আমার নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য কোনো পথ খোলা নেই। তবে আমাকে কেবল মদ্যপান করতে দাও (তারপর নিষ্কৃতি দাও)। রমণীটি পাত্র এগিয়ে দিলো। লোকটি অন্য দু'টো ভয়াবহ পাপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য মদ গলাধঃকরণ করলো। রমণীটি বললো একটু অপেক্ষা করো। লোকটি একটু পরেই মদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং মত্ত অবস্থায় মিলিত হলো রমণীটির সঙ্গে এবং তারপর শিশুটিকেও হত্যা করে ফেললো। সুতরাং তোমরা সর্বদা শরাব থেকে দূরে থেকো। আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং শরাব কখনও একত্র হতে পারে না। একটি থাকলে অন্যটি থাকবে না। নাসাঈ।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর যুগে মদ্যপায়ীদেরকে হাত, জুতা এবং লাঠি দ্বারা প্রহার করা হতো, রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের পর তাই ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর শরাব পানকারীর শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন চল্লিশটি বেত্রাঘাত। মদ্যপদের জন্য এই শাস্তিটি তখন থেকে চলে এসেছে।

হজরত আবু বকরের পরকাল যাত্রার পর পরবর্তী খলিফা হজরত ওমরও মদ্যপদেরকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন। একদিন এক সাহাবীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হলো। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম হিজরতকারীদের একজন। হজরত ওমর তাঁকেও বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। তখন ওই মুহাজির সাহাবী বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অগ্রণী! আপনি আমাকে কিভাবে বেত্রাঘাত করতে পারেন। আপনার আমার ফয়সালা আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে হওয়াই সমীচীন। হজরত ওমর বললেন, বেত্রাঘাত করা যাবে না, এ কথা কোরআনের কোন্ আয়াতে রয়েছে। মুহাজির সাহাবী তখন পাঠ করলেন, 'লাইসা আলাল্লাজিনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্ সলিহতি জুনাহু ফিমা তয়ীমু ইজা মাত্তাক্ব ওয়া আমানু (পুণ্যবান ব্যক্তি ইমানদার। তাকওয়া ও ইমান আনার পর সে যা কিছু ভক্ষণ করুক না কেনো, কোনো গোনাহ্ হবে না।) — আমি এই আয়াতে বিশ্বাসী। আমি রসুল স. এর সঙ্গে বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। হজরত ওমর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা এঁর কথার জবাব দিচ্ছোনা কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস বলে উঠলেন, মদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে সকল ইমানদারেরা পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন, তাদের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কিন্তু পরবর্তীদেরকে মেনে চলতে হবে এই আয়াতের নির্দেশ 'হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন করো' ৯০,৯১,৯২, এবং ৯৩ আয়াত পর্যন্ত।

এই আয়াতগুলোতে মদ্যপানকে স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, তবে এখন জনতার অভিপ্রায় কী? হজরত আলী বলে উঠলেন, এঁকে আশি বেত্রাঘাত করতে হবে। কারণ ইনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্পাকের আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (অপব্যাখ্যা করে), তাদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। হজরত ওমর তখন তাঁকে আশিটি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া ও হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

'আনসাব' অর্থ মূর্তিপূজা। 'আজলাম' অর্থ ভাগ্য নির্ণায়ক তীর। 'রিজ্সুন' অর্থ ঘৃণ্য বা অপবিত্র, রুচিশীল লোকেরা যা ঘৃণা করে। 'মিন আমালিশ্শাইত্বান' অর্থ শয়তানের কাজ। 'ফাজ্ তানিবুহু' অর্থ সুতরাং তোমরা এসব বর্জন করো। লায়াল্লাকুম তুফলিহুন অর্থ যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। বর্ণিত বাক্যাংশগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক সুন্দর ও স্পষ্টরূপে মদ ও জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। বাক্যটির শুরুতে ব্যবহার করেছেন 'ইন্নামা' শব্দটি, যার অর্থ 'নিশ্চয়'। অর্থাৎ মূর্তিপূজা, জুয়া, মদ ও জুয়া খেলার তীর সুনিশ্চিতরূপে হারাম। মদ এবং জুয়াকে এখানে ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। সুতরাং, বর্ণিত হারাম বস্তুগুলো থেকে বিশ্বাসীদেরকে বিরত থাকতেই হবে। তবেই আসবে সফলতা। তাই আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

পরের আয়াতে (আয়াত ৯১) বলা হয়েছে, শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়'—এ কথার মধ্যে রয়েছে ওই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত, যে ঘটনায় জনৈক আনসারী সাহাবী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হজরত সাঈদ বিন ওয়াক্কাস নামক অপর এক সাহাবীর মস্তক উটের পাঁজরের হাড়ের আঘাতে জখম করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

হজরত কাতাদা বলেছেন, কেউ কেউ তাদের সম্পদ ও পরিবার পরিজনকে বাজি ধরতো। তারপর বাজিতে হেরে গেলে বিজয়ী ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হতো এবং তাকে শত্রু মনে করতো। এই আয়াতে আলোচিত হয়েছে মদ ও জুয়ার ক্ষতিকর দিকটির কথা— যাতে করে বিশ্বাসীরা এ দু'টো অপকর্ম সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হতে পারে।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, মদ্যপানকারী মূর্তিপূজারীর ন্যায়। বায্যার কর্তৃক হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাজার বর্ণনায় শরাবে অভ্যস্তদের কথা বলা হয়েছে। হারেসের বর্ণনায় রয়েছে, শরাব পানকারী লাত ও উজ্জা পূজকের মতো।

'ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন জিকরিল্লাহি ওয়া আনিস্ সালাত' (এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়)। এর অর্থ শরাব ও জুয়ার নেশায় আচ্ছন্ন করে শয়তান মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়ে দেয় এবং নামাজ বিনষ্ট করে। হজরত আব্দুর রহমান বিন্ আউফের মেহমানের ঘটনা এরূপই ঘটেছিলো। আমন্ত্রিত অতিথি এবং আমন্ত্রক, সকলে মদ্যপান করেছিলেন— এ অবস্থায় নামাজের সময় হলে, একজন ইমাম হলেন এবং সকলে তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ইমাম পড়তে শুরু করলেন— 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূনা আ'বুদু মা তা'বুদুন'—এর অর্থ দাঁড়ায় আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদত করো আমিও তার ইবাদত করি। (আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করুন)। এভাবে আয়াতের অর্থ হয়ে গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘটনাটি সুরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের নামাজে বাধা সৃষ্টি করতে চায়— এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজই ধর্মের প্রধান নিদর্শন ও ভিত্তি। তাই নামাজ থেকে বিরত রাখার অর্থ ইমান থেকে বিরত রাখা। আর বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য নামাজই। কোরআন মজীদের এক স্থানে নামাজকে ইমান শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে—'ওয়ামা কানাল্লাহু লিইয়ুদ্বিয়া ইমানাকুম' {আল্লাহ্ এ রকম নন যে তোমাদের ইমানকে (মদ হারাম হওয়ার পূর্বের নামাজকে) বিনষ্ট করবেন}।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, নামাজ ইমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদার সূত্রে ইমাম আহমদ হাদিসটি সংকলন করেছেন। হাদিসটিতে রয়েছে—যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করলো সে কাফের। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ স. বললেন সুচারুরূপে নামাজ সম্পাদনকারীর নামাজ কিয়ামতের দিন নূর, সাক্ষী এবং পরিত্রাণের উপলক্ষ হবে। আর যে ব্যক্তি যথানিয়মে নামাজ সম্পন্ন করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো নূর ও পরিত্রাণের কোনো উপলক্ষ থাকবে না। ওই ভয়াবহ দিবসে সে হবে কারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই বিন খালফের সঙ্গী।

'ফাহাল আনতুম মুনতাহুন' অর্থ— তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? অর্থাৎ মদ, জুয়া এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কি আল্লাহ্‌পাক ও তার রসুলের একনিষ্ঠ আনুগত্যকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য করে নিবে না? এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে—'ওয়া আতিউল্লহা ওয়া আতিউর রসুলা (তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো ও আল্লাহ্‌র রসুলের আনুগত্য করো।) — এ কথার অর্থ তোমরা শরাব ও জুয়া সহ সকল প্রকার নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিধানের অনুসারী হও।

'ওয়াহ্জার' অর্থ— এবং সতর্ক হও। তারপর বলা হয়েছে—'ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম ফা'লামু আন্নামা আলা রসুলিনাল বালাগুল মুবীন'— এ কথার অর্থ— যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো স্পষ্ট প্রচারই আমার রসুলের কর্তব্য। অর্থাৎ সত্যের সুষ্ঠু প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমি আমার রসুলকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি। এখন তাঁকে মান্য করা বা অমান্য করা তোমাদের ব্যাপার। তবে এ কথাটি মনে রেখো যে, আমার রসুলকে অমান্য করলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে তোমাদের।

হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি গোনাহ্র বস্তু হারাম। সুতরাং যে নেশাচ্ছন্ন হবে, সে হবে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত; এবং কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে 'তৈয়্যেনাতুল খাবাল'। তোমরা কি জানো, তৈয়্যেনাতুল্ খাবাল কী? বস্তুটি হচ্ছে দোজখীদের শরীর নির্গত স্বেদ। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্যপান করবে এবং তওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ্পাক তাকে আখেরাতের শরাব (বেহেশতী পানীয়) থেকে বঞ্চিত করবেন। বাগবী। হজরত ইবনে ওমর আরো বর্ণনা করেছেন, আমি সংকেত দিচ্ছি রসুলপাক স. বলেছেন, শরাবের উপর রয়েছে আল্লাহপাকের অভিশাপ। অভিশাপ রয়েছে শরাবীর উপর, যে শরাব পান করায় তার উপর, ক্রেতা-বিক্রেতার উপর, পরিচর্যাকারী, প্রস্তুতকারী বাহকের উপর, যার জন্য বহন করা হয় তার উপর এবং মূল্য ভক্ষণকারীর উপর। ইবনে মাজা, এবং আবু দাউদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'মূল্য ভক্ষণকারীর উপর' কথাটি নেই। হজরত আনাস বিন মালেক থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। আরো বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি ও ইবনে মাজার মাধ্যমে এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেমের মাধ্যমে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে— রসুল স. বলেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করবেন। পুনরায় মদ্যপান করলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ গ্রাহ্য হবে না। এরপর তওবা করলে তওবা কবুল হবে। তৃতীয় বার এরূপ করলেও তার তওবা কবুল হবে। তবে চতুর্থবার করলে তওবা কবুল হবে না। কিয়ামতের দিন তাকে পান করানো হবে নহরে খাবালের দুর্গন্ধযুক্ত পানি। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা এবং দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন, ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, জুয়া খেলে এবং সর্বদা মদ্যপান করে।

হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে মহাবিশ্বের রহমত ও হেদায়েতরূপে। আমার **প্রভুপালক** আমাকে বিগ্রহের উপাসনা, ক্রুশ এবং মূর্খতার যুগের সকল অপসংস্কারকে উচ্ছেদ করার হুকুম দিয়েছেন। আমার প্রাণপ্রিয় **প্রভুপালক** শপথ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি এক চুমুক শরাব পান করবে, আমি তাকে আরো অধিক পান করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে শরাব পরিত্যাগ করবে, আমি তাকে পান করাবো কাওসারের পানি। আহমদ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ— সর্বদা মদ্যপানকারী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং অশ্লীল কর্মের সহায়ক। আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বেহেশত হারাম তিন ব্যক্তির জন্য— সর্বদা শরাব পানকারী, রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদুর উপর আস্থা স্থাপনকারী। আহমদ।

সুরা বাকারার তাফসীরে ইমাম আহমদ সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলপাক স. যখন মদীনায় আগমন করেছিলেন, তখন মদীনাবাসীগণ ছিলো মদ্যপানে অভ্যস্থ। ওই হাদিসের শেষাংশে রয়েছে— এর পর তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হলো— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইন্নামাল খমরু ওয়াল মাইসিরু... ফাহাল আন্‌তুম মুন্‌তাহুন' পর্যন্ত (আয়াত ৯০-৯১)। এই নির্দেশ শুনে সাহাবীগণ উচ্চারণ করলেন, হে আমাদের প্রভু! আমরা এ সকল নিষিদ্ধ বস্তু থেকে অবশ্যই নিবৃত্ত হবো। কিন্তু এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে সকল মদ্যপায়ী এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত হারাম ভক্ষণকারী বিশ্বাসী পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের উপায় কী হবে? তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— লাইসা আলাল্লাজিনা আমানু থেকে ওয়াল্লহু ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন্ পর্যন্ত। (আয়াত ৯৩)।

নাসাঈ ও বায়হাকীর বর্ননায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— আনসারগণের দু'টি গোত্রের অনাসৃষ্টির প্রেক্ষিতে মদ হারাম করা হয়েছে। একদিন তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন। নেশা কেটে যাওয়ার পর চেহারা, মস্তক ও শ্মশ্রুর বিধ্বস্ত অবস্থা লক্ষ্য করে তাঁরা বলতে শুরু করলেন, আমারই ভাই আমার এ অবস্থা করেছে। মদমত্ত না হলে সে একাজ কিছুতেই করতো না। তাদের ওই বিধ্বস্ত অবস্থাকে উপলক্ষ করে— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইন্নামাল্ খমরু ওয়াল মাইসিরু— আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন তাঁরা বললেন শরাব তাহলে অপবিত্র। কিন্তু আমাদের ওই সকল সঙ্গীদের অবস্থা কী হবে, যারা ইতোপূর্বে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তখন

অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের সর্বশেষটি (৯৩)। আল্লাহ্পাক সুস্পষ্টরূপে জানালেন, 'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তার জন্য তাদের কোনো পাপ নেই।' আরো জানালেন, 'ইজা মাত্তাক্বাও (যদি তারা সাবধান হয়), ওয়া আমানু (ও বিশ্বাস করে) ওয়া আমিলুস্ সলিহাত (এবং সৎ কর্ম করে)।' এরপর জানালেন, ছুম্মাত্তাক্বাও (অতঃপর মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পর উভয়টি থেকে সাবধান হয়), ওয়া আমানু (এবং মদ জুয়া উভয়টি হারাম হওয়াকে মেনে নেয়), ছুম্মাত্তাক্বাও (তারপর— সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা থেকে পুনরায় বিরত থাকে), ওয়া আহ্সানু (এবং সৎকর্ম করে)। এখানে ওয়া আহ্সানু অর্থ নন্দিত কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ ওই সুচারু ও সুন্দর উপাসনা যা সম্পাদন কালে তাদের প্রভুপ্রতিপালকের দর্শন অথবা বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। সর্বশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইয়ুহিব্বুল মুহ্সিনীন'। এ কথার অর্থ— এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণগণকে ভালোবাসেন'

জ্ঞাতব্যঃ বোখারী ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত জিব্রাইল রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুলাল্লাহ্! ইহ্সান (উপাসনার সৌন্দর্য) কী? তিনি স. বললেন, আপনতম প্রভুর উপাসনা এমনভাবে সম্পন্ন করা যেনো আল্লাহ্পাক দৃশ্যমান হন। এ রকম সম্ভব না হলে অন্ততঃপক্ষে এতোটুকু বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তো সর্বদ্রষ্টা। গ্রন্থকার এ হাদিসটির উপর আয়াতটির তাফসীর শেষ করেছেন।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে হুদায়বিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতটি।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা যাহা শিকার করা যায় সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন— যাহাতে আল্লাহ্ অবগত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। সুতরাং ইহার পর কেহ সীমালংঘন করিলে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

এখানে বলা হয়েছে, হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা হয় সে বিষয়ে আল্লাহ্ পরীক্ষা করবেন। এই পরীক্ষা জীবন বা সম্পদ উৎসর্গ করার মতো বৃহৎ কোনো পরীক্ষা নয়। শাইয়িম মিনাস্ সইদি (যা অথবা যা কিছু শিকার) বলে সে কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। শাই শব্দটির সঙ্গে তানভিন (দুই যের) ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরীক্ষা করার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হাত ও বর্শা দ্বারা যা শিকার করা যায়, সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। এ পরীক্ষা নিশ্চয় জীবন কিংবা সম্পদ উৎসর্গ করার মতো চরম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এ রকম বলা হয়েছে এজন্য যে, সাহাবীগণ যখন ওমরার ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন, তখন অনেক বন্যজন্তু তাঁদের শিবিরে ঢুকে পড়েছিলো। সেগুলোকে হাত দিয়ে ধরা যেতো অথবা সহজেই বর্শাবিদ্ধ করা যেতো। কিন্তু তাঁরা তো ছিলেন তখন ইহ্রাম অবস্থায়।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপনকারী ওমরাযাত্রী সাহাবীগণ সম্পর্কে। তাঁদের ওই শিবিরে অনেক বন্য শিকার এবং পাখি আসা যাওয়া শুরু করেছিলো। ইতোপূর্বে আর কখনও এ রকম দেখা যায়নি। সাহাবীগণ ছিলেন ইহ্রামের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আর ইহ্রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ করে তাঁদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ্পাক।

'লিইয়া'লামাল্লহু মাঁইইয়াখাফুহু বিল গইবি' অর্থ— যাতে আল্লাহ্ অবহিত হন, কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এখানে লিইয়া'লামা (অবহিত হন) এর সম্পর্ক রয়েছে ইয়াব্লুআ (পরীক্ষা করবেন) কথাটির সঙ্গে। কেননা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আল্লাহ্কে না দেখে ভয় করে এবং যারা করে না, তাদেরকে পৃথক করে দেয়া। এমতাবস্থায় 'অবহিত হন' কথাটির অর্থ হবে—প্রকাশ করেন বা বাস্তবায়িত করেন। অর্থাৎ ভীত হওয়া না হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়িত হওয়ার পর তিনি তা ওইরূপ জানবেন, যেরূপ জানতেন পূর্বেও। আল্লাহ্পাক আদি-অন্তের জ্ঞানসম্পন্ন। তাই সকল ঘটিতব্য বিষয় তিনি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও জানেন। পরেও জানেন। পূর্বে জানেন এজমালী হিসেবে এবং পরে জানেন তাফসিলী হিসেবে। অর্থাৎ প্রথমে সমষ্টিগত হিসেবে এবং পরে বাস্তবে বিস্তৃতরূপে। এভাবেই তাঁর চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জ্ঞান পূর্বাপর সকল জানিত বিষয়কে পরিবৃত করে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান চিরবিদ্যমান ও চিরস্থায়ী। কিন্তু কোনো ঘটনাকে প্রকাশ পেতে গেলে তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন হয়। বাস্তবায়নপূর্ব অবস্থার সঙ্গে সওয়াব বা আযাবের কোনো সম্পর্ক নেই। সওয়াব বা আযাব প্রবর্তিত হয় স্থূল বা বাস্তব জগতে, ঘটনার প্রকাশ হওয়ার পর। এখানে সেই প্রকাশিত ঘটনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে পরীক্ষা ও অবহিতির বিষয়টি। অর্থাৎ এজমালী হিসেবে আল্লাহ্পাক যা আগে থেকেই জানেন, তাই এখানে জেনে নিবেন বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে।

'কে তাঁকে না দেখেও ভয় পায়' (মাঁইইয়াখাফুহু বিল গইব)। দু'টো অর্থ হতে পারে এ কথাটির। একটি হচ্ছে— কে না দেখে আল্লাহ্কে ভয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগেই কে আল্লাহ্কে ভয় করে। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উপরে অত্যন্ত দয়ালু। তিনি চান, তাঁর প্রতি আস্থাস্থাপনকারীরা তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুক। তাই তিনি পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে দিচ্ছেন ইহ্রাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার আজ্ঞা। শেষে এ কথা আরো সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন— ফামানি' তাদা বা'দা জালিকা ফালাহু আজাবুন আ'লীম। এ কথার অর্থ, সুতরাং এরপর কেউ সীমালংঘন করলে তারজন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ শিকার থেকে যে বিরত থাকতে পারবে না সে ওই সকল বিষয় থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারবে— যেগুলোর প্রতি প্রবৃত্তি অধিকতর আকৃষ্ট।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, উপরে আলোচিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবুল ইয়াসার নামক এক ব্যক্তি ইহ্রামের পোশাক পরিহিত থাকা সত্ত্বেও একটি বন্য গর্দভকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেললো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৫

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

❑ হে বিশ্বাসীগণ! ইহ্রামে থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু বধ করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করিলে যাহা বধ করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক—কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা উহার বিনিময় হইবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা,

যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন; কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ্ তাহার শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

এখানে ইহরাম অবস্থায় ওই সকল বন্য জন্তুকে বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে— যেগুলো বন্য এবং হত্যাযোগ্য নয়। সেগুলোর গোশত খাওয়া যাক অথবা না যাক। কামুস অভিধানের বিবরণ এ রকম। ইমাম আবু হানিফা সঈদ বা শিকারের পরিচয় দিয়েছেন এভাবেই। কিন্তু তিনি ওই সকল প্রাণীকে এ নিষেধাজ্ঞা থেকে পৃথক করেছেন যেগুলো বিষাক্ত, হিংস্র এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর। যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক এবং আক্রমণপ্রবণ পাখি। কুকুর অথবা পাগলা কুকুরকে হত্যা করা যাবে। কারণ, কুকুর স্বভাবগত দিক থেকে বন্য জন্তুদের দলভুক্ত। কুকুর প্রতিপালন করা এবং তাকে পোষ মানানো কিছুটা হলেও বিপজ্জনক। শিক্ষিত কুকুর অবশ্য শিকারী, শিকার নয়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কুকুর স্বভাবগতভাবে বন্য নয়। তাই কুকুরকে শিকার বলা যায় না। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, মুহ্‌রিম (ইহ্‌রামধারী) কোন ধরনের পশু হত্যা করতে পারে? তিনি স. বললেন, বৃশ্চিক, মুষিক, কাক, চিল এবং কুকুর হত্যা করলে কোনো গোনাহ্ হবে না। বোখারী ও মুসলিমে জননী আয়েশার বর্ণনায় পাঁচটি পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জাওজী বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'কালব্' শব্দটির অর্থ হিংস্র পশু-পাখি। সাধারণভাবে হিংস্র প্রাণীকে কালোব বলা হয়ে থাকে। রসুলপাক স. উৎবা বিন আবী লাহাব সম্পর্কে অপপ্রার্থনা করেছিলেন এভাবে— আয় আল্লাহ্! আপনার কুকুরের মধ্য থেকে যে কোনো কুকুরকে (যে কোনো হিংস্র প্রাণীকে) তার উপর চড়াও করে দিন। বলা বাহুল্য, তাঁর এ প্রার্থনা কবুল হয়েছিলো এবং উৎবাকে বাঘে ছিঁড়ে খেয়েছিলো। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'মিনাল জাওয়ারিহি মুকাল্লিবিন্' (হিংস্র জন্তুদের মধ্য হতে আক্রমণকারী)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শব্দগত দিক থেকে 'কালব্' থেকে হিংস্র পশু মেনে নেয়া হলেও শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ কুকুর। হাদিস শরীফে যে পাঁচটি হিংস্র জন্তুর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে প্রচলিত অর্থে ধরাই উত্তম। সুতরাং এ কথাটি মেনে নিতে হয় যে, কাল্‌ব অর্থ কুকুর— সকল হিংস্র জন্তু নয়।

জননী আয়েশার মাধ্যমে আবু আওয়াসাহ ছয়টি হিংস্র পশুর কথা উল্লেখ করেছেন। এ রকম বর্ণনা রয়েছে বোখারী শরীফেও। হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মুহ্‌রিম ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, আক্রমণপ্রবণ কুকুর, চিল এবং হিংস্র পশু-পাখি হত্যা করতে পারে। কিন্তু

কাক হত্যা করতে পারে না। কাক তাড়ানোর জন্য কেবল ইট, পাথর নিক্ষেপ করতে পারে। তিরমিজিও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় হিংস্র পশু-পাখি কথাটি নেই। হাসান বলেছেন, এখানে ওই কাকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে— যেগুলো প্রান্তরবাসী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে মুনজির যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে রয়েছে সাতটি পশুর কথা। তার মধ্যে পাঁচটি প্রসিদ্ধ এবং তার সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে আরো দু'টি— বাঘ ও চিতা। আবার ইবনে খুজাইমা বলেছেন, হাদিসে উল্লেখিত 'কালবী আক্কোর' অর্থ বাঘ ও চিতা। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, মুহ্‌রিম সাপ ও বাঘ হত্যা করতে পারবে। বর্ণনাটি সংকলন করেছেন ইবনে আবী শায়বা, সাঈদ বিন মনসুর এবং আবু দাউদ। জননী আয়েশা থেকে মুসলিমের বর্ণনায় চারটি পশুর উল্লেখ রয়েছে। প্রসিদ্ধ পাঁচটি পশুর মধ্যে সেখানে বিচ্ছুর কথা নেই।

একটি প্রশ্নঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরআনের কোনো বিধানকে কোনো হাদিসে আহাদ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা সিদ্ধ নয়। (কেননা কোরআনের হুকুম সাধারণ, উন্মুক্ত ও ব্যাপকার্থক। তাই ইমাম আবু হানিফা একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা ওই ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করে নেয়াকে সিদ্ধ বলে স্বীকার করেননি)। অথচ এখানে সঈদ (শিকার) শব্দটি একক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে নেয়া হলো কেনো?

উত্তরঃ বর্ণিত হাদিসটিকে সকল আলেম বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। একক বর্ণিত হলেও হাদিসটির মর্যাদা প্রসিদ্ধ হাদিসের মতো। সুতরাং এ রকম ব্যাপক বিদিত হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের উদ্দেশ্যকে সুনির্ধারিত করা সিদ্ধ। এ রকমও হতে পারে যে, সাহাবীগণের ঐকমত্যানুসারে মুহ্‌রিম কোনো কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে পারে। কোরআন মজীদে উল্লেখিত সঈদ বা শিকার বধ করার বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এর মধ্যে বিশেষভাবে যেগুলো এর ব্যতিক্রম, সেগুলোই কেবল হাদিস শরীফের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল, মুহ্‌রিম সেগুলোকে হত্যা করতে পারবে না। আর যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলো হত্যা করতে পারবে। সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু গোশত খাওয়া হারাম, কিন্তু বধ করা হারাম নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কোনো পশুর হুকুম এ রকম যে, সেগুলোকে হত্যা করা যায়, কিন্তু সেগুলোর গোশত ভক্ষণ করা যায় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কিছু শিকারী হিংস্র পাখি এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ। যে পাখিরা শিকারী নয় আবার হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও পড়ে না, এ রকম কিছু কিছু পাখির গোশত খাওয়াও হারাম। যেমন— চিল, কাক ইত্যাদি। বিষয়টি

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমরা এ কথা বুঝতে পারলাম যে, যেগুলোর গোশত হারাম সেগুলোকে হত্যা করা বৈধ। এ কারণটিকেই কিয়াসী নিয়মে হাদিসের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আমি বলি, গোশত হারাম হলেই যে পশুকে হত্যা করা বৈধ— এ রকম মনে করা ভুল। হারাম হওয়া না হওয়ার উপরে মুহ্‌রিমের শিকার করা জায়েয অথবা নাজায়েয হতে পারে না। এ রকম কিয়াস জায়েয নয়।

আমার নিকট 'বাদায়ে' গ্রন্থের রচয়িতার অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন— যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয় ওই সকল প্রাণীর মধ্যে যেগুলো হিংস্র এবং আক্রমণপ্রবণ, মুহ্‌রিম কেবল সেগুলোকেই হত্যা করতে পারবে। যেমন, কাক, চিল— এ সকল প্রাণীর গোশত হারাম। কিন্তু এগুলো হিংস্র নয় বলে মুহ্‌রিম এগুলোকে হত্যা করতে পারবে না। হত্যা করতে পারবে কেবল হিংস্র পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিকে। অতএব, প্রাণীবধ বৈধ হওয়ার কারণ হিংস্রতা— গোশত হালাল হওয়া না হওয়া এখানে প্রধান কারণ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু ইউসুফও এ রকম অভিমত পোষণ করেছেন। ফতওয়ায়ে কাযীখানেও এ রকম বলা হয়েছে।

হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী কয়েক রকমের—

১. শরীরের মধ্যে বিষ প্রবেশ করায়— এ রকম প্রাণী। যেমন, বিচ্ছু এবং বিচ্ছুর মতো অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী।

২. এমন প্রাণী যেগুলো দংশন করে এবং জখম করে। যেমন, ইঁদুর, বেজি ইত্যাদি।

৩. থাবা বিস্তার করে ছোঁ মারে। যেমন, বাজপাখি, শকুন, এক ধরনের হিংস্র চিল ও কাক ইত্যাদি।

৪. এমন প্রাণী— যা উন্মত্ত ও বন্য, যা দংশনপ্রবণ এবং মানুষ দেখলেই যা আক্রমণোদ্যত হয়। যেমন, উন্মত্ত কুকুর। পোষা কুকুরের মধ্যেও এক ধরনের উন্মত্ততা বিদ্যমান। এই শ্রেণীর মধ্যে সকল হিংস্র জন্তু অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে গৃহপালিত পশু বলা যায় না। এগুলো গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদির মতো গৃহপালিত নয়। কিন্তু বন্য গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম শিকারযোগ্য প্রাণীর প্রতি ইঙ্গিতও করতে পারবে না। মুহ্‌রিমের ইঙ্গিত পেয়ে কোনো গায়ের মুহ্‌রিম (যে ইহরাম পরিহিত নয়) যদি কোনো প্রাণী শিকার করে, তবে মুহ্‌রিমও ওই হত্যাকর্মের অঙ্গীভূত হয়ে

পড়বেন। মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকা শিকার নিরাপদ। মুহ্‌রিম ওই শিকারকে দেখলেও কথায়, কাজে বা ইশারায় সেই শিকারকে দেখিয়ে দিতে পারবে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, সকল সাহাবী ইহ্‌রাম পরিহিত ছিলেন। কেবল হজরত আবু কাতাদা ছিলেন ইহরামমুক্ত অবস্থায়। ওই সময় হজরত আবু কাতাদা হঠাৎ একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে সেটিকে বধ করলেন। তারপর সেটিকে জবাই করে রান্নার পর সকলে মিলে গাধাটির গোশত ভক্ষণ করলেন। এই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে, সকলে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তোমরা কেউ কি আবু কাতাদাকে (কথায় বা ইঙ্গিতে) শিকার দেখিয়ে দিয়েছিলে। সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. বললেন, তবে তোমরাও গোশত খেতে পারবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে রসুল স. মুহ্‌রিমের জন্য ওই শিকারের গোশত খাওয়াকে জায়েয করে দিয়েছেন, যার প্রতি তারা শিকারীকে কোনো ইশারা ইঙ্গিত দেননি।

মাসআলাঃ পাখির ডিমের হুকুমও শিকারের মতো। দাউদ জাহেরী বলেছেন, ডিম ভেঙে ফেললে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু একটু পরেই একটি হাদিস এবং সে সম্পর্কে সাহাবীগণের অভিমতের আলোচনায় আমরা প্রমাণ পাবো যে, ডিম ভাঙলেও মুহ্‌রিমকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম কর্তৃক শিকারকৃত ও জবেহকৃত প্রাণী মৃতজীব তুল্য। ওই শিকারের গোশত খাওয়া মুহ্‌রিম, গায়ের মুহ্‌রিম উভয়ের জন্য হারাম। সওরী, জমহুর। আবু ছাওর এবং কতিপয় আলেম অবশ্য ওই প্রাণীর গোশত খাওয়াকে জায়েয বলেছেন। তাঁদের মতে ব্যাপারটি এ রকম— যেমন কোনো চোর কোনো পশু চুরি করে এনে জবাই করলো। ইমাম শাফেয়ীর উক্তিও এ রকম। আমরা বলি, মুহ্‌রিমের জন্য জবাই করা গোনাহ্‌। সুতরাং, তার জবাই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে জবাই করার মতো। সুতরাং তার জবাই গাইরুল্লাহ্‌র নামে জবাইতুল্য। চুরি করা পশু জবাই করার ব্যাপারটি এ রকম নয়। চোর যদি চুরির পশু জবাই করে, তবে তার জবাইয়ের মধ্যে কোনো ক্রটি নেই। কিন্তু ওই জবাইকৃত পশুর মধ্যে অন্যের অধিকার রয়েছে। তাই জবাইয়ের মধ্যে কোনো দোষ না থাকলেও অন্যের অধিকার বিনষ্টের কারণে তাকে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে। আর ক্ষতিপূরণ দিলেই কেবল অন্যের হক পূরণ করা সম্ভব।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম ব্যক্তির কথায়, আচরণে অথবা কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ইশারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো গায়ের মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি কোনো শিকার করে, তবে ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিম খেতে পারবে না। কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিম খেতে পারবে। জমহুরের অভিমতও এ রকম— ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিমের জন্য হারাম, কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিমের জন্য হালাল। এ সম্পর্কে একটু আগেই হজরত আবু কাতাদার হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়া মান কৃতালাহু মিনকুম মুতাআম্মিদান'— এ কথার অর্থ, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করলে'। এ বর্ণনাভঙ্গিটির দিকে লক্ষ্য করে হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের, দাউদ, আবু ছাওর, আবু মুনজির এবং শাফেয়ী বলেছেন, ভুলবশতঃ বা বাধ্য হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে মুহ্‌রিম অবস্থায় যদি কেউ শিকার করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ (কাফফারা) ওয়াজিব হবে না (যে কাফফারার কথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। কারণ, মুহ্‌রিম এখানে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' হত্যা করেনি। ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন।

মুজাহিদ এবং হাসানও 'ইচ্ছাকৃতভাবে'— কথাটির উপরে জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ক্ষতিপূরণ ওই সময় ওয়াজিব হবে, যখন মুহ্‌রিম ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণী বধ করবে। সুতরাং তার প্রাণী বধ ইচ্ছাকৃত না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ক্ষতিপূরণ দেয়, তবুও তার পাপস্খলন হবে না। এ রকম ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌পাকের উপর নির্ভরশীল (আল্লাহ্‌পাক তাকে এর জন্য শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন)।

জমহুর ওলামা এবং চার ইমামের বক্তব্য হচ্ছে— আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ সর্বাবস্থায় ওয়াজিব প্রাণীবধ ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত। জেনে শুনে হত্যা করুক অথবা ভুলবশতঃ। ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় শিকারযোগ্য প্রাণী বধ করা হারাম— এ জ্ঞান তার থাকুক অথবা না থাকুক।

ইমাম জুহুরী বলেছেন, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর উপর ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক— এ কথা এই আয়াত দ্বারাই স্বীকৃত। আর ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরেও ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক। এ কথাটি প্রমাণিত হয়েছে হাদিস শরীফের মাধ্যমে। এর বিপরীত প্রমাণ হানাফীদের নিকট গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ আয়াতে যেহেতু ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষতিপূরণের বিবরণ রয়েছে, সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাণী হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না— হানাফীগণ এ রকম মতকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন না। এ রকম ধারণার চেয়ে হাদিস শরীফের বিবরণ অধিকতর শক্তিশালী। আর ঐকমত্যের মাধ্যমেও এ কথা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত— সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক।

হজরত জাবের থেকে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স. এর নিকট বিজ্জু (উদ্‌) হত্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি স. বললেন, এই প্রাণীটিও শিকারযোগ্য প্রাণী। কোনো মুহ্‌রিম যদি প্রাণীটিকে হত্যা করে, তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার উপর ওয়াজিব হবে ভেড়া কিংবা দুম্বা কোরবানী করা। বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন তিরমিজি। দমে বদলকে (প্রাণী বধের বদলা বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করাকে) যাঁরা সাধারণ হুকুম বলেছেন, তাঁদের নিকটেও এ রকম হত্যাকাণ্ড পুনঃপুন ঘটানো নিষিদ্ধ। কারণ, পরবর্তী আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে 'কেউ উহা পুনরায় করিলে, আল্লাহ্‌ তার শাস্তি দিবেন'।

মাসআলাঃ মুহ্‌রিম যদি হাত দিয়ে অথবা অন্য কোনো অঙ্গের ইশারায় কোনো শিকারীকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর শিকারী যদি ওই প্রাণীটিকে হত্যা করে, তবে ওই মুহ্‌রিমের উপর ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হবে। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, ওই মুহ্‌রিমের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, কিন্তু সে গোনাহ্‌গার হবে। যেমন, কেউ যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে মুখের কথায় বা ইশারায় কোনো বেগানা রমণীকে দেখিয়ে দেয়, আর রোজাদার ব্যক্তি যদি ওই মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয় তবে ওই ইশারাকারী ব্যক্তির উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সে যদি রোজাদার হয়, তবে তার রোজাও ভঙ্গ হবে না। কিন্তু পাপ পথ প্রদর্শনের জন্য সে গোনাহ্‌গার অবশ্যই হবে। সুতরাং শিকার দেখিয়ে দেয়া অথবা তার প্রতি ইশারা করা অর্থ হত্যা করা নয়। আর যে হত্যাকারী নয়, তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না।

আমরা বলি, মুখে শিকার করার কথা বলা হত্যা করার মতোই। রসুল স.ও ইশারাকে হত্যার সমান্তরাল বলে উল্লেখ করেছেন। হজরত আবু কাতাদা বর্ণিত হাদিসে এ রকম বলা হয়েছে। আরেকটি কথা হচ্ছে এই, যে মুহ্‌রিম হত্যার কথা বললো, তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হলেও বলে দেয়ার পাপ তার উপর থেকেই যাবে। কেননা ঐকমত্যানুসারে এ রকম বলা নিষিদ্ধ। আর সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, ক্ষতিপূরণ দিলে হত্যার পাপ দূরীভূত হয়। হত্যার কথা বলা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ (যদিও বাহ্যিক অবস্থা এর বিপরীত)।

একটি প্রশ্নঃ মুখে বা ইশারায় হত্যা করতে বলা যদি হত্যা সমতুল্য হয়, তবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হওয়া সত্ত্বেও তার উপর ক্ষতিপূরণ কি ওয়াজিব হয় না?

উত্তরঃ বলা এবং ইশারা করা হত্যার কারণ বা উৎস। যেমন, তীর নিক্ষেপ করাও হত্যার কারণ। কিন্তু কেবল তীর নিক্ষেপ করলেই ক্ষতিপূরণ অত্যাবশ্যক হয় না— অত্যাবশ্যক হয় তখনই যখন তীর বিদ্ধ হয়ে কোনো প্রাণী মারা যায়। এভাবে তীরবিদ্ধ হয়ে মারা না যাওয়া পর্যন্ত তীর নিক্ষেপকে আবার হত্যার কারণও বলা যায় না। সুতরাং মুখে বা হাতের ইশারাকে তখনই হত্যার সমান্তরাল বলা যেতে পারবে, যখন হতাকাণ্ডটি সংঘটিত হবে।

'যাহা বধ করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— এ কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওয়াজিব হবে ওই রকমই একটি পশু, যে রকম পশুকে মুহ্‌রিম হত্যা করেছে।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, যে পশুকে হতা করা হয়েছে সেই পশুটির তুল্য একটি পশুকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করা উচিত। অর্থাৎ আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে দু'টি পশুর সমতুল্য হওয়াই উচিত। কিন্তু

ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, বধকৃত পশু এবং ক্ষতিপূরণের (কোরবানীর) পশুকে অবিকল এক রকম হতে হবে— এ রকম কথা আয়াতে বলা হয়নি। বলা হয়েছে রূপক সাদৃশ্যের (মিছলে মা'নুবীর) কথা। অর্থাৎ কোরবানীর পশুটিকে হতে হবে শিকার করা পশুটির মূল্যমানের সমান।

মেসাল (অনুরূপ) শব্দটি দু'রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়— সমআকৃতির অথবা সমমূল্যের। এখানে 'সমমূল্যের' অর্থটি গ্রহণীয়। এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে— যে শিকারটি বধ করা হয়— তা আকৃতিগত দিক থেকে উট, গাভী, মহিষ, ছাগল, ভেড়া কোনোটির সঙ্গেই তুল্য নয়। শিকার হিসেবে বধ করা হয়েছে হয়তো চড়ুই, ফড়িং ইত্যাদি। আর সেগুলো নিশ্চয় আকৃতিগত দিক থেকে উট, গাভী ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয় নয়। সুতরাং এখানে মেসাল শব্দটির প্রকৃত অর্থ এবং পরোক্ষ অর্থের সংমিশ্রণও সম্ভব নয়। হানাফিগণের মতে এ রকম সংমিশ্রণ অসিদ্ধ। অতএব, 'সমমূল্যের' অর্থটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যদি তোমার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে সেরকম এবং যতটুকু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে ততটুকু বদলা তুমি নিতে পারবে।' এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে— কোনো বস্তু নষ্ট করা হলে আকৃতিগত দিক থেকে অবিকল অনুরূপ বস্তু যদি পাওয়া না যায়, তবে মূল্যের দিক থেকে অনুরূপ বস্তুর সন্ধান করতে হবে। একই জাতের পশুর মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল্যগত আনুরূপ্যই গ্রহণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আরো বলা যেতে পারে— যেমন, উট এবং উটপাখি। এ দু'টোর মধ্যে মিল ততটুকু যে— দু'টোরই গলা এবং পা লম্বা। তবুও এ দু'টোর মধ্যে আকৃতিগত আনুরূপ্য রয়েছে, এ কথা বলা যায় না। যেমন, কবুতর শিকার করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ছাগল কোরবানী দিতে হবে। এ দু'টোর মধ্যেও আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য নেই। অতএব, এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, বধকৃত পশু এবং কোরবানীর পশুর আকৃতিগত আনুরূপ্য থাক অথবা নাই থাক— মূল্যগত আনুরূপ্য থাকলেই চলবে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, এখানে 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু' অর্থ ছাগল, ভেড়া, গাভী, মহিষ এবং উট। এগুলোও সৃষ্টিগত দিক থেকে (প্রাণী হিসেবে) শিকারকৃত পশুর তুল্য। রসুল স. বলেছেন, উদ শিকার করলে কোরবানী দিতে হবে একটি ছাগল। হজরত আবদুল্লাহ্ থেকে হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে। এই হাদিসটি আবার ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। হাকেম তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উদ একটি শিকারযোগ্য প্রাণী। মুহ্‌রিম ব্যক্তি এই উদ শিকার করলে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি ভেড়া অথবা দুম্বা। হাকেম আরো বলেছেন, বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম শাফেয়ী

বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে- হজরত ওমর সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি একটি উদ শিকার করলে একটি ভেড়া এবং একটি হরিণ শিকার করলে একটি ছাগল কোরবানী করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, ইহরামের বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বন্য ইঁদুর বধ করলে কোরবানী করতে হবে পুরুষ কিংবা স্ত্রী ছাগল অথবা ছাগলের পুরুষ বাচ্চা। বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হেরেম শরীফের কবুতর হত্যা করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি বকরি। দু'টো ডিম ভাঙলে কাফফারা দিতে হবে এক দিরহাম। উটপাখি শিকার করলে একটি উট, নীল গাভীকে হত্যা করলে একটি পালিত গাভী অথবা মহিষ এবং বন্য গাধা বধ করলে একটি গাভী কোরবানী দিতে হবে।

মালেকী ও শাফেয়ীগণের একটি দলিল হচ্ছে— আল্লাহ্পাক এখানে বলেছেন 'মিনান্ নাআম'। এখানে নাআমের উদ্দেশ্য হচ্ছে উট, গাভী অথবা বকরী। এগুলো কেবল উদাহরণ মাত্র। এ সকল পশুর মূল্যের কথা এখানে বলা হয়নি। (অতএব, মেসাল বা অনুরূপ অর্থ এখানে মূল্যের অনুরূপ হতে পারে না)।

মালেকী ও শাফেয়ীগণের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হানাফীগণ বলেছেন, রসুল স. এবং সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে 'অনুরূপ' শব্দটির অর্থ হবে মূল্যের অনুরূপ। এখানে 'ক্বতালা মিনান্ নাআম' (উহা বধ করিলে) এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে বধিত পশু যদি চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হয়, তবে অনুরূপ জন্তুর মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করা ওয়াজিব। হজরত আবু উবাদা বলেছেন, 'নাআম' বলতে যেমন গৃহপালিত পশু বুঝায়, তেমনি বন্য জন্তুও বুঝায়। কামুস অভিধান রচয়িতাও এ রকম বলেছেন।

হানাফীগণের বর্ণিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এমতো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, বধিত শিকার পশু বা পাখি যাই হোক না কেনো, সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং, কেবল চতুষ্পদ জন্তুকে বধ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে— এ রকম বললে তা হবে আয়াতের মূল বক্তব্যের বিপরীত। আমি বলি, এখানে 'মিনান্ নাআম' (অনুরূপ জন্তু) — এ রকম উদাহরণের অর্থ ওই সকল চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলো গৃহপালিত এবং যেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা যায়। বধিত জন্তুর সঙ্গে ক্ষতিপূরণের জন্তুর অন্যান্য সামঞ্জস্য থাকা জরুরী কিছু নয়। অতএব মুহ্রিম ব্যক্তি কোনো প্রাণী বধ করলে তাকে বধিত জন্তুর সমমূল্যের অথবা ততোধিক মূল্যের পশু ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী করতে হবে।

বন্য গাধা, নীল গরু এবং ওই সকল শিকার যেগুলোর মূল্য ছাগলের চেয়ে বেশী, সেগুলোর কোনো একটিকে হত্যা করলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করতে হবে একটি গৃহপালিত গাভী। ছাগলের চেয়ে বেশী কিন্তু গরুর চেয়ে কম— এ

রকম মূল্যের প্রাণী বধ করলে খুব বড় অথবা খুব ছোট নয়— এ রকম গরু কোরবানী করতে হবে। কিন্তু ওই গরুর মূল্য কিছুতেই শিকারের মূল্য থেকে কম হওয়া যাবে না। যদি শিকারের মূল্য গরুর চেয়ে বেশী হয়, তবে উট কোরবানী করা উচিত, যদিও শিকারের মূল্য গাভীর চেয়ে বেশী হয় এবং উটের সমান না হয়। উটের চেয়েও বেশী মূল্যের শিকারের ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে একটি উট এবং একটি ছাগল অথবা একটি গরু এবং একটি ছাগল কিংবা একটি গরু ও একটি উট, অথবা দু'টি উট বা দু'টি গরু, অথবা দু'টি ছাগল। মোটকথা সবসময় শিকারের মূল্য বিবেচনা করে কোরবানী করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কোরবানীর পশুর মূল্য শিকারের মূল্যের চেয়ে কম হওয়া চলবে না।

শিকারের মূল্য ছাগলের মূল্যের সমান হলেও কোরবানীযোগ্য অর্থাৎ নাক, কান, চোখ, হাত, পা ও লেজ— সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ, এ রকম শিকারের ক্ষেত্রে কোরবানী করতে হবে এমন ছাগল যা কোরবানীর উপযুক্ত।

শিকারের মূল্য ছাগলের মূল্যের চেয়ে কম হলে (যেমন উদ, বন্য ইঁদুর, হরিণ, গিরগিটি, গুইসাপ, শিয়াল ইত্যাদি) কোরবানী দিতে হবে শিকারের মূল্যানুসারে যে কোনো বয়সের ছাগল। এক্ষেত্রেও কোরবানীর ছাগলের মূল্য শিকারের মূল্য অপেক্ষা কম হতে পারবে না।

কবুতর অথবা কবুতরের চেয়ে কম মানের শিকারের বিনিময়ে কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। আর ছাগলটিকে হতে হবে কোরবানীর উপযুক্ত (বয়স ও সুস্থতার দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত)। উক্তিটি আমাদের নিকট ফতোয়া হিসেবে গ্রহণীয়। জমহুর আলেমগণের মাসআলাও এ রকম। তাঁরা বলেছেন, কাফফারার কোরবানীর পশু এমন শর্তযুক্ত নয় যে, তা কোরবানীযোগ্য হতেই হবে। কিন্তু ইমাম আজমের নিকট দমে বদলের (কাফফারা বা ক্ষতিপূরণের) কোরবানী এমন হওয়া উচিত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীর যোগ্য। তাই উদ, গিরগিটি— এ রকম প্রাণী বধ করা হলে কোরবানীর উপযুক্ত কোনো পশু কোরবানী করতে হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, শিকার ছোটবড় নিখুঁত ত্রুটিপূণ— যাই হোক না কেনো, তার বিনিময়ে দিতে হবে শরিয়তসম্মত কোরবানী। অর্থাৎ বয়স ও সুস্থতার দিক থেকে কোরবানীটিকে হতে হবে শরিয়তসম্মত। ইমাম আজম ও ইমাম মালেকের বক্তব্যের প্রমাণ হচ্ছে— 'হাদী' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, এর অর্থ হাদীয়ে কামেল। অর্থাৎ শরিয়ত যে কোরবানীকে কোরবানীর উপযুক্ত মনে করেছে সেরকম পূর্ণ ও নিখুঁত কোরবানী। তাই হাদীয়ে তামাত্তু (তামাত্তু হাজীদের কোরবানী) কে হতে হয় শরিয়তসিদ্ধ কোরবানী— যা দেয়া হয় হজের সকল ত্রুটির কাফফারা স্বরূপ।

আমাদের জমহুরের দলিল এই যে, সাহাবায়ে কেরাম ছাগলের ছোট বাচ্চাকে কোরবানী করা ওয়াজিব বলেছেন (অথচ ছাগলের ছোট বাচ্চা কোরবানী করা শরিয়তসিদ্ধ নয়)। আবার আয়াতে উল্লেখিত হাদী এ রকম সাধারণ অর্থবোধক নয়, যাকে পূর্ণ কোরবানী বলে নির্ধারণ করা যায়— যেমন হাদীয়ে তামাত্তু ও অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বরং এখানে হাদী (কোরবানী) শব্দটির উদ্দেশ্য ওই হাদী যা চতুষ্পদ জন্তুর মেসাল (অনুরূপ) হতে পারে। তাই আকৃতিগত দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোরবানীও জায়েয হবে— ইমাম শাফেয়ী যে রকম বলেছেন। অথবা মূল্যের দিক দিয়ে সমমানের কোরবানীও সিদ্ধ হবে— যে রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। সেক্ষেত্রে পশুকে কোরবানীযোগ্য হতেই হবে এমন বলার কারণ নেই।

আলোচ্য আয়াতটির যে ব্যাখ্যা আমি করেছি, তা কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের উক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, খরগোশের পরিবর্তে কোরবানী করতে হবে ভেড়া। কেননা, ভেড়া ও খরগোশ সমমূল্যমানবিশিষ্ট। উট ও গরুর জন্য নিম্নতম ক্ষতিপূরণ হচ্ছে ছাগল কোরবানী করা এবং ছাগল বা ছাগলের বাচ্চার মূল্য কবুতরের মূল্যের কাছাকাছি। গরু ও উটের মূল্য কবুতরের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু কবুতরের তুলনায় ছাগলের মূল্য উটের মূল্যের মতো অত্যধিক নয়। তাই কবুতরের পরিবর্তে ছাগল কোরবানীর কথা বলা হয়েছে।

এবার আসা যাক শিকার ও তার ক্ষতিপূরণের কোরবানীর পশুর শারীরিক সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে। শারীরিক দিক দিয়ে বধিত পশুর মতো কোরবানী হওয়া আবশ্যক— এ রকম কথার কোনো দলিল নেই। আতা খোরাসানী সূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত জায়েদ বিন সাবেত, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, উট পাখি বধ করলে মুহ্‌রিমকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোরবানী করতে হবে একটি উট। ইমাম মালেকের বর্ণনায় রয়েছে, আবু উবায়দা বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, আমার পিতার লিখিত অভিমত এ রকমই। ইমাম মালেক আরো বলেছেন, আমি এ কথা সবসময়েই শুনে এসেছি যে, উট পাখি নিধনের কাফফারা হচ্ছে উট। এখানে এ কথাটিও স্পষ্ট যে, শারীরিক সাদৃশ্যের কারণেই এ রকম ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে— মূল্যগত সাদৃশ্যের কারণে নয়। উট পাখির যেমন দীর্ঘ গলদেশ এবং দীর্ঘ পা রয়েছে, তেমনি রয়েছে উটের। কিন্তু এমতো উক্তি অশক্ত। আর এ রকম ধারণা অকাট্যও নয়, তাই একে গ্রহণ করা যায় না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম অভিমত হাদিস শাস্ত্রজ্ঞদের নিকট প্রমাণিত নয়। কিয়াসও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় না যে, উট পাখি ও উট সমতুল। এ রকমও হতে পারে যে, কোনো কোনো সময় হয়তো উট পাখির মূল্য উটের মূল্যের সমতুল হতো।

সাহাবীগণ হয়তো ওই সময়েই উট পাখির পরিবর্তে উট কোরবানীর কথা বলেছেন। আর পরবর্তী যুগের মানুষ এ রকম ঘটনাকে মনে করে নিয়েছে— শারীরিক সাদৃশ্যের কারণে উট পাখি শিকার করলে উট কোরবানী দিতে হবে। পরবর্তীতে তাবেয়ীদের যুগে এই ধারণাটি হয়ে গিয়েছিলো সুপ্রসিদ্ধ। তাই ইমাম মালেক বলেছেন, আমি সবসময় শুনে এসেছি উট পাখির পরিবর্তে কোরবানী করতে হবে উট।

একটি প্রশ্নঃ বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, এক লোক হজরত ইবনে আব্বাসের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ইহ্রামের পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় একটি খরগোশ হত্যা করেছি। এখন আমাকে কী করতে হবে? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, খরগোশের যেমন চারটি পা তেমনি ছাগলের পা চারটি। খরগোশ জাবর কাটে, ছাগলের বাচ্চাও জাবর কাটে। সুতরাং বধিত খরগোশের বিনিময় হিসেবে ছাগলের বাচ্চা কোরবানী করো। বর্ণনাটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইবনে আব্বাস এখানে আকৃতিগত আনুরূপ্যকেই বিবেচ্য বলে মেনেছেন।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আতা বলেছেন, এক লোক একটি কবুতর ও দু'টি কবুতরের বাচ্চাকে ঘরে আটকে রেখে আরাফা ও মিনায় গমন করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তিনটি কবুতরই মরে গিয়েছে। লোকটি তখন হজরত ইবনে ওমরের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি জানালেন। হজরত ইবনে ওমর বললেন, তোমাকে অতি অবশ্যই তিনটি ছাগল কোরবানী করতে হবে। সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তিও সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করলেন (কেননা এ আয়াতেই বলা হয়েছে— বধিত শিকার এবং তার ক্ষতিপূরণরূপী কোরবানীর পশুর আনুরূপ্য সম্পর্কে ফয়সালা করবেন দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক)। ইমাম সওরী, ইবনে আবী শায়বা, শাফেয়ী এবং বায়হাকী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, কবুতরের বিনিময়ে ছাগল— এ রকম সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে মূল্যের প্রসঙ্গটি বিবেচিত হয়নি। নতুবা একটি কবুতর এবং দু'টি কবুতরের বাচ্চার জন্য একটি ছাগল কোরবানী করাই যথেষ্ট ছিলো। বরং এর চেয়ে বেশী কবুতরের জন্য একটি ছাগলই ছিলো যথেষ্ট।

আমি বলি, কতিপয় প্রসিদ্ধ সাহাবীর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, বধিত পশু ও কোরবানীর পশু তুলিত হবে আকৃতিগত দিক থেকে, মূল্যের দিক থেকে নয়। কিন্তু কোরআনের আয়াত নিশ্চয় সকল ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রগণ্য। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা জাযাউম মিছলু মা ক্বতালা মিনান্ নায়াম' (যা বধ করলো, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু)। আর এ কথাটিও ঠিক নয় যে, শারীরিক দিক দিয়ে উট পাখি উটের অনুরূপ বা কবুতরের অনুরূপ

ছাগল। শরীর, আকার কোনো দিক দিয়েই বর্ণিত পশুগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। দূরবর্তী সাদৃশ্য যা কিছু রয়েছে, সেগুলোও সাদৃশ্য হওয়ার অযোগ্য। আর ওগুলোর মধ্যে শব্দগত সাদৃশ্যও নেই। প্রাণী হিসেবে সাদৃশ্যের কথা যদি বলা হয়, তবে এ রকম সাদৃশ্য তো সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যেই বিদ্যমান।

তারপর বলা হয়েছে, 'ইয়াহ্কুমুবিহি জাওয়া আদ্লিম্ মিন্কুম' (যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক)। — এ কথার অর্থ, মুহ্রিম অবস্থায় বধিত প্রাণীর ক্ষতিপূরণের কোরবানীর পশু কী রকম হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অধিকাংশ হানাফিগণের অভিমত এই যে, এক্ষেত্রে আনুরূপ্য যাচাইয়ের জন্য একজনের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। বিভিন্ন হাদিসে সাহাবীগণের একক সিদ্ধান্তদানের কথাও এসেছে। অবশ্য দু'জনের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অতি উত্তম। এ রকম সিদ্ধান্ত অধিকতর নিরাপত্তাপ্রদায়ক।

ইমাম শাফেয়ী এবং জমহুরের সিদ্ধান্ত এই যে— এক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্ত অত্যাবশ্যক। এর উপরেই ফতোয়া হওয়া উচিত। আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সাহাবীগণের কার্যকলাপেও এ রকম প্রমাণ রয়েছে অনেক।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত মায়মুন বিন মেহরান বর্ণনা করেছেন, একবার এক গ্রাম্য লোক হজরত আবু বকর সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি ইহ্রাম অবস্থায় প্রাণী বধ করেছি। এখন ক্ষতিপূরণ দিবো কিভাবে? হজরত আবু বকর তখন হজরত উবাই বিন কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বলেন? গ্রাম্য লোকটি বললো, আপনি আল্লাহ্র রসুলের স্থলাভিষিক্ত। তাই আমি আপনার কাছে বিধান জানতে এসেছি। অথচ আপনি অন্যকে জিজ্ঞেস করছেন। হজরত আবু বকর বললেন, তুমি কি জানো না, আল্লাহ্ পাক আজ্ঞা করেছেন, 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'? এই আজ্ঞা পালনের নিমিত্তেই আমি আমার সাথীর সঙ্গে মতবিনিময় করছি। আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমি তোমাকে নির্দেশ দান করবো।

হজরত আবু বকর মাজানী বর্ণনা করেছেন, এক মুহ্রিম একটি হরিণকে তাড়া করলো এবং অন্য মুহ্রিম সেটিকে হত্যা করলো। তারপর তারা দু'জনে উপস্থিত হলো হজরত ওমর সকাশে। হজরত ওমর তখন হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফের অভিমত জানতে চাইলেন। হজরত আব্দুর রহমান বললেন, আমার বিবেচনায় ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোরবানী করতে হবে একটি ছাগল। হজরত ওমর বললেন, আমার বিবেচনাও তাই। তারপর আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, তোমাদেরকে ছাগল কোরবানী করতে হবে। প্রত্যাবর্তনকালে আগন্তুকদ্বয়ের একজন অপরজনকে বললো, আমিরুল মু'মিনীন (হজরত ওমর) বিষয়টি জানতেন না। তাই তিনি তাঁর সঙ্গীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। হজরত ওমর এ কথা শুনে

ফেললেন। বললেন, দাঁড়াও। তোমাকে বেত্রাঘাত করা হবে। ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রাণী বধ করেছো, আবার শরিয়তের বিধান সম্পর্কেও তুমি বেখবর। অথচ আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করেছেন 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'। এখানে দেখা যাচ্ছে, হজরত ওমর এক্ষেত্রে এককভাবে সিদ্ধান্ত দান করেননি। সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যৌথভাবে।

মোহাম্মদ বিন সিরিনের মাধ্যমে ইমাম মালেক উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় হরিণ শিকারের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে হজরত ওমরের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। হজরত ওমর তখন হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে বললেন, আসুন, আমরা দু'জনে মিলে বিষয়টির সমাধান দেই। এ কথা বলে তাঁরা দু'জনে তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত জানালেন—কোরবানী দিতে হবে ছাগল। প্রশ্নকারী লোকটি বললো, আমাদের আমিরুল মু'মিনীন, এমন এক ব্যক্তি, যিনি হরিণ শিকারের ফয়সালা নিজে নিজে করতে পারেন না— অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। হজরত ওমর এ কথা শুনে বললেন, তুমি কি সুরা মায়িদা পাঠ করো? লোকটি জবাব দিলো, না। হজরত ওমর বললেন, 'সুরা মায়িদা পাঠ করি'— এ কথা বললে আমি এখনই তোমাকে প্রহার করতাম। তুমি কি জানো না আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন, 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক'।

মাসআলাঃ যারা ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যাকৃত পশুর সঙ্গে ক্ষতিপূরণের পশুর শারীরিক সাদৃশ্য হওয়ার পক্ষে, তাঁদের ব্যাখ্যায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। ইমাম মালেক বলেছেন, প্রত্যেক যুগে দু'জন ন্যায়বান মুসলমান ক্ষতিপূরণের স্বরূপ সম্পর্কে নিত্যনতুন সিদ্ধান্ত দান করবেন (যদিও তাদের ফয়সালা সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। কেননা, যুগ বদলের সাথে সাথে ক্ষতিপূরণের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়)।

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, সলফে সালেহীন যদি কোনো বিষয়ে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন তবে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। কোনো যুগেই তার বিপরীত বিধান দেয়া যাবে না। আর কোনো বিষয়ে যদি তাঁদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকে, তবে পরবর্তী জামানার দু'জন পুণ্যবান মুসলমান নতুন করে ফয়সালা করতে পারবেন। মাসআলাটি যদি ইজতেহাদ (গবেষণামূলক) হয়, তবে এমতোক্ষেত্রে মতপৃথকতার সুযোগ রয়েছে।

ইমাম সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে মাসআলায় ইমামগণের মতদ্বৈধতা রয়েছে, সে বিষয়ে প্রত্যেক যুগে দু'জন পুণ্যবান মুসলমানের ফয়সালাই প্রযোজ্য হবে— যদিও তা সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিকূল বধিত পশু এবং ক্ষতিপূরণের পশুর মধ্যে

শারীরিক আনুরূপ্যই যদি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়, তবে নতুন নতুন ফয়সালার সুযোগ আর কিভাবে থাকে? (পশুর শারীরিক সাদৃশ্য তো সকল যুগে একই রকম।

এবার আসা যাক 'সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্তকে মান্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব'—মন্তব্যটি সম্পর্কে। এই মন্তব্যটিকে মান্য করলে কোরআনের বিধানই তো রহিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা। এ দু'জন নিশ্চয়ই যুগে যুগে বদল হতে থাকবেন। কোনো যুগের দু'জন ন্যায়বানকে তো আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। সুতরাং, কোনো এক যুগের সিদ্ধান্ত যদি অবশ্যপালনীয় হতো, তবে রসুল স. নিজেই তো সকল অথবা অধিকাংশ বধিত শিকার সম্পর্কে কোরআনের মাধ্যমে ফয়সালা করে দিয়ে যেতেন— দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্ত তাহলে প্রয়োজনই পড়তো না। অতএব, এ কথাটি স্পষ্ট যে, এমতোক্ষেত্রে সলফে সালেহীনের সিদ্ধান্ত পরবর্তীদের জন্য দলিল নয়। বরং প্রতি যুগে দু'জন ন্যায়বান পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ফয়সালা করার অধিকার রাখেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, বধকৃত পশু এবং ক্ষতিপূরণের পশুর আনুরূপ্য বিবেচনা করতে হবে মূল্যমানের ভিত্তিতে— আকারের ভিত্তিতে নয়। এই মূল্যমান নির্ধারণের জন্যই প্রতি যুগে প্রতি ঘটনায় দু'জন ন্যায়বানের সিদ্ধান্তদানের প্রয়োজন পড়ে। সর্ববাদীসম্মতরূপে এ কথাটিও সত্য যে, স্থান ও কালের তারতম্য ঘটলে মূল্যমানের তারতম্যও ঘটতে বাধ্য। তাই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ফয়সালার জন্য দু'জন পুণ্যবানের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য।

'হাদ্ইয়াম্ বালিগাল কা'বাতি'— অর্থ কাবাতে প্রেরিতব্য কোরবানীরূপে । ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'হাদ্ইয়ান' (প্রেরিতব্য কোরবানী) — কথাটি প্রমাণ করে যে, কাবায় প্রেরিত হয় কোরবানীর পশু, পশুর মূল্য নয়। সুতরাং, বধকৃত শিকারের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের পশুর আকৃতিগত সাদৃশ্যই বিচার্য। কিন্তু বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, বধিত শিকার আর ক্ষতিপূরণের পশুর আনুরূপ্য নির্ণিত হওয়া উচিত মূল্যমানের ভিত্তিতে। এ সম্পর্কে ইমাম আজমের বক্তব্য হচ্ছে, যথামূল্য দিয়েই কাবায় প্রেরিত কোরবানী ক্রয় করতে হয়। সুতরাং মূল্যমানই বিচার্য।

একটি প্রশ্ন ঃ ইমাম আজমের বিশ্লেষণে, 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— কথাটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। যদি হতো, তবে আকৃতিগত সাদৃশ্যই প্রাধান্যলাভ করতো। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর বিশ্লেষণে তিনি কথাটিকে উল্লেখ করেননি কেনো?

উত্তরঃ কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এখানে দেখতে হবে, ইমাম আজম 'অনুরূপ' শব্দটির নিরিখ নির্ণয় করেছেন কিভাবে। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'অনুরূপ জন্তু' অর্থ বধিত শিকারের মূল্যমানের অনুরূপ জন্তু। যদি বলা হয়, 'অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু'— কথাটিকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন, তবে তো বলতে

হয় ইমাম শাফেয়ীও এড়িয়ে গিয়েছেন 'যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়বান লোক' কথাটিকে। ওই দু'জন ন্যায়বান লোক প্রেরিত কোরবানী সম্পর্কে মীমাংসা করবেন প্রথমে। আর তাদের মীমাংসার মাপকাঠিটি হবে মূল্যমানের আনুরূপ্য। তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে 'প্রেরিতব্য কোরবানী'। সুতরাং, ওই পশুর আকৃতিগত সাদৃশ্য ক্রয়ের পূর্বে বিচার্য হয় কিভাবে? অতএব আমাদেরকে এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, দুই ইমামের মতপার্থক্য ঘটেছে 'অনুরূপ' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে। (আকৃতিগত আনুরূপ্যের কথা বলেছেন ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবু হানিফা বলেছেন মূলগত আনুরূপ্যের কথা)।

মাসআলাঃ কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে কিনে পাঠাতে হবে, না মক্কার কোনো বাজার থেকে ক্রয় করলে চলবে, সে সম্পর্কে ইমামগণের মতভিন্নতা রয়েছে। 'প্রেরিতব্য' শব্দটির প্রকাশ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ইমাম মালেক বলেছেন, মক্কার বাইরে থেকে পশু ক্রয় করে মক্কায় প্রেরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু জমহুর বলেছেন, মক্কার বাইরে থেকে প্রেরিতব্য পশু ক্রয় করে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক নয়। 'কাবায় প্রেরিতব্য' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানী করতে হবে হেরেম শরীফে— হেরেম শরীফের বাইরে নয়। কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে ক্রয় করতেই হবে— এ রকম কথা এখানে বলা হয়নি। এই অভিমতের উপরেই আলেমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদায় হজের ঘটনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. মক্কায় প্রবেশ করে উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বললেন, যারা কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তারা হজ পূর্ণ না করে ইহ্রামমুক্ত হয়ো না। আর যারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আনোনি তারা তাওয়াফ ও সায়ী করে চুল কেটে ইহ্রামমুক্ত হও। হজের সময় এলে পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ কোরো। তারপর কোরবানী করে ইহ্রামমুক্ত হয়ে যেও। কোরবানীর পশু না পেলে রোজা রেখো। এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো সাহাবী বাইরে থেকে কোরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি তাঁরা কোরবানীর পশু ক্রয় করেছিলেন মক্কা থেকে। আর যারা কোরবানীর পশু পাননি তারা রোজা রেখেছিলেন। এই হাদিসে রসুল স. মক্কা থেকে ক্রয় করা পশুকেও বলেছেন হাদয়ি (কোরবানী অথবা প্রেরিতব্য কোরবানী)। কোরআন মজীদেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— 'ফামাস তাইসারা মিনাল হাদয়ি।' এই নির্দেশনাটি তামাত্তু হজ সম্পর্কিত। তামাত্তু হজ সম্পাদনকারীরা কোরবানীর পশু ক্রয় করেন মক্কা থেকেই। কিন্তু বর্ণিত আয়াতে তাদের পশুকেও কোরবানী বা প্রেরিতব্য কোরবানী (হাদয়ি) বলা হয়েছে। অতএব 'কোরবানীর পশু মক্কার বাইরে থেকে নিয়ে আসা ওয়াজিব'— ইমাম মালেকের এই অভিমতটি অযৌক্তিক। বরং বাইরে থেকে আনা কোরবানীর পশু একটি অহেতুক বিড়ম্বনার কারণ। বিড়ম্বনার কারণ এ জন্য যে, হজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করার সাথে সাথে সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে হয় মক্কায়, মিনায়, আরাফায় এবং মোজদালিফায়।

মাসআলাঃ জমহুর বলেছেন, কোরবানীর গোশত মক্কার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা ওয়াজিব। কেননা, কোরবানী করতে হয় হেরেম শরীফ এলাকায়। তাই হেরেমবাসী মিস্‌কিনদেরকে কোরবানীর গোশত দান করা অত্যাবশ্যক। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কোরবানীর গোশত হেরেমের ভিতরে বাইরে সকল স্থানের দরিদ্রদেরকে দেয়া যাবে। কারণ আয়াতে হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করার কথা বলা হয়েছে, বণ্টন করার কথা বলা হয়নি। সুতরাং হেরেম এলাকার বাইরে জবাই করা যাবে না। কিন্তু বণ্টন করা যাবে। গোশত বণ্টনের বিষয়টি এমনই এক ইবাদত— যা বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিবেচনা করে দেখতে হবে, কিভাবে গোশত বণ্টন করলে দরিদ্র জনসাধারণ অধিকতর উপকৃত হয়।

'আওকাফ্‌ফরাতুন ত্বয়ামু মাসাকিন'— এ কথার অর্থ, 'অথবা তার বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্নদান করা'। এ সম্পর্কে ইমাম শা'বী ও নাখয়ী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিয়মটি পালন করতে হবে এভাবে— কোরবানী করতে হবে। কোরবানীর পশু না পেলে দরিদ্রদেরকে অন্নদান করতে হবে। অন্নদান সম্ভব না হলে রাখতে হবে রোজা। কিন্তু আমরা বলি, বর্ণিত তিনটি নিয়ম সংযোজিত হয়েছে দু'টি 'আও' (অথবা, কিংবা) শব্দের মাধ্যমে। সুতরাং ক্ষতিপূরণদানের নিয়মটি হবে এ রকম— প্রাণী বধকারী মুহ্‌রিম ইচ্ছে করলে কোরবানী করতে পারবে অথবা দরিদ্রকে অন্নদান করতে পারবে কিংবা রাখতে পারবে রোজা। এভাবে যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার রয়েছে তার।

জ্ঞাতব্যঃ ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় শিকার করার অপরাধটিকে লঘু করার নিমিত্তে আল্লাহ্‌পাক অপরাধীকে তিন নিয়মের যে কোনো এক নিয়মে ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন স্বাধীনতা দিয়েছেন শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ আদায়ের বেলায়। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় প্রাণী বধকারীকে এ রকম স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। আয়াতে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণের পশু নির্ধারণকারী দু'জন ন্যায়বান লোকের উপরেই ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্তটি নির্ভরশীল। ওই পুণ্যবানদ্বয় যৌথভাবে ক্ষতিপূরণের তিনটি নিয়মের যে কোনো একটিকে সাব্যস্ত করে দিবেন। — আলোচ্য আয়াতে অবশ্য এ অভিমতটির প্রমাণ নেই। আয়াতে কেবল বলা হয়েছে, ওই দু'জন ন্যায়বান কেবল বধকৃত শিকারের অনুরূপ কোরবানীর পশুর মূল্যমান নির্ধারণ করে দিবেন। মূল্যমান সম্পর্কিত তাঁদের ওই সিদ্ধান্ত জেনে নেয়ার পর অপরাধী তিনটি নিয়মের যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। ওই নির্ধারিত অর্থে সে তখন পশু ক্রয় করে কাবায় প্রেরণ করতে পারবে অথবা খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে

পারবে কিংবা উল্লেখ পরিমাণ রোজা রাখতে পারবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের অধিকার ওই ন্যায়বানদ্বয়ের নেই। এই অধিকার তো কেবল আল্লাহ্র। প্রকৃত বিচারক তিনি। তিনি অপরাধীকে তিনটি নিয়মের একটিকে নির্ধারণ করার অধিকার দিয়ে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব করেছেন। এটা তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ।

মাসআলাঃ ঐকমত্যগত সিদ্ধান্ত এই যে, ক্ষতিপূরণের অন্নদান হতে হবে বধিত শিকারের মূল্যমানের ভিত্তিতে। যদি কোরবানীর জন্য 'অনুরূপ' পশু না পাওয়া যায়, তবে বধিত শিকারের মূল্য ধার্য করে সেই অর্থে খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদেরকে আহার করাতে হবে। কিন্তু 'অনুরূপ' পশু পাওয়া গেলে পশু কোরবানীই করতে হবে। ওই সময় মূল্য ধার্য করার অবকাশ থাকবে না। কারণ, ওই পরিস্থিতিতে শিকারের মূল্য ধর্তব্য হবে না— শিকারের অনুরূপ পশুই ধর্তব্য হবে। অন্নদান তো পশু কোরবানীর বিকল্প। — এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন জমহুর আলেমগণ। তাঁদের এই অভিমতের প্রেক্ষিতে কবুতর বধের জন্য যদি ক্ষতিপূরণরূপে অন্নদান করতে হয়— তবে অন্নদান করতে হবে ছাগলের মূল্যের। কবুতরের মূল্যের নয়। কারণ, কবুতর বধের কাফ্ফারা হচ্ছে ছাগল কোরবানী করা। তাই ছাগল কোরবানী সম্ভব না হলে ছাগলের মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য ক্রয় করে দরিদ্রদেরকে দান করতে হবে। এভাবেই 'অনুরূপ' কথাটি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইমাম আজম বলেছেন, এ রকম অবস্থায় অন্নদান করতে হবে বধিত প্রাণীর মূল্যের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে 'অনুরূপ' কথাটি বিচার্য হবে না। 'অনুরূপ' কথাটি আসবে কোরবানীর বেলায়। আর অন্নদানের ক্ষতিপূরণ হবে বধিত প্রাণীর মূল্যের ভিত্তিতে— সরাসরি। কারণ, ক্ষতিপূরণ ওই বস্তুরই দিতে হয়— যা বিনষ্ট করা হয়েছে। অন্নদানের বেলায় তাই এই নিয়মটিই পালনীয়। মূল্যের আনুরূপ্যের ভিত্তিতে কোরবানী নির্বাচন করা হলে কোরবানীর মূল্য অতিরিক্ত হয়েও যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও কোরবানীর পশু পুরোপুরি কোরবানী করতে হয়। কারণ, কোনো পশু আংশিকভাবে কোরবানী করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্নদানের ব্যাপারটি ভিন্ন। অন্নদানের মূল্য ধরতে হবে বধিত পশুর মূল্যের সমান। বধিত পশুর অনুরূপ কোরবানীর পশুর মূল্যের সমান নয়। অতএব অন্নদানের ক্ষেত্রে কবুতরের মূল্যই ধর্তব্য। ছাগলের নয়।

বধকৃত পশুর অবিকল অনুরূপ পশু কোরবানী ওয়াজিব— এই অভিমতটি ভুল। লক্ষ্যণীয় যে, কবুতর বধের পরিবর্তে উট কোরবানী দিলেও তা সিদ্ধ হবে। যদি অবিকল অনুরূপ পশু কোরবানী করা ওয়াজিব হতো, তবে ছাগলের পরিবর্তে ছাগল ছাড়া অন্য কোনো কিছু কোরবানী করা যেতো না। অবিকল

অনুরূপ কথাটিকে ওয়াজিব মনে করলে শা'বী এবং নাখয়ী কথিত ক্ষতিপূরণের নিয়মটিকে মেনে নিতে হয়। যেমন তাঁরা বলেছেন, প্রথমতঃ উদ্যোগ নিতে হবে কোরবানীর। বধিত পশুর অবিকল অনুরূপ পশু না পাওয়া গেলে অন্নদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে পালন করতে হবে রোজা। কিন্তু আমাদের মাজহাবের অভিমতানুযায়ী এ নিয়মটি ওয়াজিব নয়। আমরা বলি, এক্ষেত্রে অপরাধী স্বাধীনভাবে কোরবানী, অন্নদান, রোজা— এই তিনটির যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পারবে। সুতরাং, এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নিয়ম একটি না পারলে আর একটি, আর একটি না পারলে অন্য আর একটি— এ রকম নয়। বরং নিয়ম হচ্ছে তিনটির যে কোনো একটি। কারণ, এক প্রকারের শাস্তি অন্য প্রকারের শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

একটি প্রশ্নঃ এক প্রকারের শাস্তি যদি অন্য প্রকারের শাস্তির মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তবে এই আয়াতে দরিদ্রদের সংখ্যা অনুপাতে রোজা রাখা ওয়াজিব করা হয়েছে কেনো?

উত্তরঃ এখানে আল্লাহ্পাকের এরশাদ সুস্পষ্ট। আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে— 'আও আদলু জালিকা সিয়ামা' (কিংবা সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা)। এ সম্পর্কে ইমাম ফাররা বলেছেন, অবিকল সমপ্রকৃতি বুঝাতে গেলে 'ইদলু' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (প্রথম অক্ষর আইন এর নিচে দিতে হয় যের)। আর অবিকল সমপ্রকৃতির নয়, এ রকম আনুরূপ্য বোঝাতে গেলে ব্যবহৃত হয় 'আদলু' (প্রথম অক্ষর আইন এর উপরে দিতে হয় যবর। আলোচ্য আয়াতে এই বানানটিই ব্যবহৃত হয়েছে)।

মাসআলাঃ অন্নদানের পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পরিমাণ হতে হবে এক মুদ (আনুমানিক এক সের)। তিনি আরো বলেছেন— রোজা, জেহার এবং শপথভঙ্গের ক্ষতিপূরণ এ রকমই।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রতি মিস্কিনকে দিতে হবে অর্ধ সা (আনুমানিক দুই সের) গম এবং খোরমা। যব দিতে হবে এক সা (আনুমানিক চার সের)। ইমাম আবু হানিফার নিকট সদ্কায়ে ফিতিরের পরিমাণও এ রকম। তাঁর মতে সকল প্রকার কাফ্ফারার জন্য এই পরিমাণ খাদ্যদান করা ওয়াজিব। উত্তম নিয়ম হচ্ছে— শহর এলাকায় যে খাদ্য অধিক প্রচলিত, প্রতি মিস্কিনকে সেই খাদ্যের আধা সা দিতে হবে। কেননা, ঐকমত্যাগত অভিমতানুসারে সকল অপরাধের অন্নদান সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এ রকম। তাই হজের ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় বিশেষ ওজর বশতঃ কেউ যদি তার মস্তকমুণ্ডন করে তবে তাকেও এই পরিমাণ খাদ্যদান করতে হবে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে যে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে— তাতে বলা হয়েছে, রসুল স. হজরত কা'বকে ইহ্রাম

অবস্থায় মস্তক মুণ্ডনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক ফুরক খাদ্য ছয়জন দরিদ্রের মধ্যে ভাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং, শিকারের অন্নদান সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণকে ফিতরার সঙ্গে তুলনীয় না করে বর্ণিত হাদিসের মস্তকমুণ্ডনের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে তুলনা করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ফিতরা কোনো প্রায়শ্চিত্ত নয়। কিন্তু মস্তকমুণ্ডনের ক্ষতিপূরণ অপরাধের কারণে সাব্যস্ত করা হয়। তাই এদিক থেকে অক্ষম অবস্থায় মস্তকমুণ্ডন এবং মুহ্‌রিম অবস্থায় প্রাণী বধের মধ্যে মিল রয়েছে— যদিও অপরাধ দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু দু'টো অপরাধই অপরাধ।

জমহুরের মতে কোরবানীর গোশত যেমন কেবল হেরেম শরীফ এলাকার দরিদ্র জনতার প্রাপ্য, তেমনি অন্নদানের অন্নও তাদেরই প্রাপ্য। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ রকম কোনো শর্ত করা ঠিক নয়। কোরবানীর গোশত এবং অন্নদানের গোশত হেরেমের অন্তর্গত বহির্গত সকল এলাকার দরিদ্র জনতার প্রাপ্য।

মাসআলাঃ বধিত শিকারের মূল্য যদি একজন দরিদ্রের খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তবে পরিমাণ পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই। যা হয় তাই দিয়ে দিতে হবে। অথবা যদি এ রকম হয়— শিকারের মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্য বণ্টনের পর কিছু খাদ্য উদ্বৃত্ত হলো— যা একজনের খাদ্যের পরিমাণ নয়। এমতোক্ষেত্রেও নিজের পক্ষ থেকে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি ওই উদ্বৃত্ত খাদ্যদানের পরিবর্তে কেউ রোজা রাখতে চায়, তবে তাকে একটি রোজাই রাখতে হবে। কারণ, রোজার কোনো অংশ হয় না। এ বিষয়ে সকলে একমত। আর যদি সে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কোরবানীই করে তবে সে যে কোনো বয়সের পশু কোরবানী করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে তাকে কোরবানী করতে হবে এমন ছাগল যা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীযোগ্য। অর্থাৎ কোরবানীর ছাগলটিকে হতে হবে নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, নির্ধারিত বয়সের ইত্যাদি। যে কোনো বয়সের ছাগল কোরবানী দিলে তা যথেষ্ট হবে না।

এরপর বলা হয়েছে 'লিইয়াজুক্বা ওয়াবালা আমরিহি'— কথাটির অর্থ, যাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। এখানে 'ওয়াবালা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কৃতকর্মের বোঝা, কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি। শাব্দিক অর্থ— ভারী খাদ্য (ওয়াবিলুন)। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে 'আখজানাহু আখজাউঁ ওয়াবিলা'। এখানে ওয়াবিলা শব্দটির অর্থ কঠিন, ভারী।

'আফাল্লহু আম্মা সালাফা ওয়ামান আদা ফা ইয়ানতাক্বিমুল্লহু মিনহু'— এ কথার অর্থ 'যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন।' অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার

করে থাকলে সেই অপরাধ আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্পাক তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। বরং অপরাধের যথাশাস্তি দান করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাসের নিয়ম ছিলো— কোনো মুহ্রিম শিকার করার পর তাঁর নিকট এ ব্যাপারে বিধান জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন এ রকম ঘটনা কি এই প্রথম, না আগেও করেছো? লোকটি যদি বলতো, এটিই তার প্রথম অপরাধ, তখন তিনি তাকে কোরবানী, অন্নদান অথবা রোজা— যে কোনো একটি নিয়মে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে বলতেন। আর লোকটি যদি বলতো আগেও আমার দ্বারা এ রকম অপরাধ হয়েছে, তখন তিনি পড়ে শোনাতেন 'যা গত হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করেছেন; কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ্ তার শাস্তি দিবেন।' এভাবে আয়াত আবৃত্তির পর তিনি লোকটির পিঠে ও বুকে সজোরে আঘাত করতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্ এর প্রতিশোধ নিবেন। বাগবী।

আমি বলি, এই আয়াতের তাফসীর এ রকম হওয়াই সমীচীন— যা কিছু অতীতে ঘটে গিয়েছে, আল্লাহ্পাক তা মার্জনা করেছেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণরূপে কোরবানী, অন্নদান অথবা রোজা রেখেছে, আল্লাহ্পাক তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এরপরেও যে একই অপরাধে অপরাধী, আল্লাহ্পাক তাকে শাস্তি দান করবেন। সে যদি যথাক্ষতিপূরণ আদায় না করে, তবে আল্লাহ্পাক তাকে যথাশাস্তি দান করবেন।

সবশেষে বলা হয়েছে, ওয়াল্লহু আযিযুন জুনতিক্বম— এ কথার অর্থ 'এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী' অর্থাৎ অবাধ্যতার উপর যে অটল থাকে— মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্তায়ালা তাকে শাস্তি দান করবেনই।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৬

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

❐ তোমাদের প্রতি সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ বৈধ করা হইয়াছে তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। ভয় কর আল্লাহ্কে যাহার নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

এখানে 'ত্বোয়ামুহু' এর 'হু' সর্বনামটির সম্পর্ক 'সঈদু' এর সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ হবে, শিকারকৃত বস্তু থেকে প্রস্তুত আহার্য। সর্বনামটির সম্পর্ক 'আলবাহার' এর (সমুদ্রের) সঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে, সমুদ্র থেকে অর্জিত আহার্য। এই আয়াতে ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায় জলযানে ভ্রমণকারী হজযাত্রীদের জন্য সমুদ্রের শিকার ভক্ষণ বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন 'সঈদুল বাহর' অর্থ ওই সকল ভক্ষণযোগ্য প্রাণী যেগুলো সমুদ্রে বাস করে। আর 'ত্বোয়াম' অর্থ ওই সকল ভক্ষণযোগ্য প্রাণী যেগুলোকে সমুদ্র তার তটভূমিতে নিক্ষেপ করে।

হজরত হারেস বিন নওফেলের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওসমান ও হজরত আলী ছিলেন ইহ্‌রাম পরিহিত অবস্থায়। তাঁদের সম্মুখে কিছু শিকারের গোশত উপস্থিত করা হলো। হজরত ওসমান ওই গোশত খেলেন। কিন্তু হজরত আলী খেলেন না। হজরত ওসমান বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমরা এ শিকারকে স্বহস্তে হত্যা করিনি। কাউকে হত্যা করতেও বলিনি। ইশারা ইঙ্গিতও করিনি। হজরত আলী বললেন, আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়া হুররিমা আ'লাইকুম সঈদুল বাহরি মা দুমতুম হারামা' (এবং তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ)। হজরত হাসান বর্ণনা করেছেন, যা মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা হয়নি— যা কোনো গায়ের মুহ্‌রিম অন্য কোনো গায়ের মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করেছে, তার গোশত খাওয়াকে হালাল মনে করতেন হজরত ওমর, কিন্তু হজরত আলী মনে করতেন মাক্‌রূহ। ইবনে আবী শায়বা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'সঈদুল বাহর' অর্থ ওই সকল প্রাণী যেগুলো স্থলভাগে বেঁচে থাকে না। আর ত্বোয়ামুল বাহর অর্থ সামুদ্রিক খাদ্য।

ইমাম মালেক এই আয়াতের ভিত্তিতেই বলেছেন, সকল সামুদ্রিক প্রাণী ভক্ষণ সিদ্ধ। এ সম্পর্কিত মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা বাকারার তাফসীরে।

হজরত ওমর বলেছেন, 'সঈদুল বাহর' বলা হয় ওই সকল প্রাণীকে যেগুলো সমুদ্র থেকে শিকার করা হয়। আর ত্বোয়ামুল বাহর বলা হয় সমুদ্র কর্তৃক তীরভূমিতে নিক্ষেপিত প্রাণীকে। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, যে সকল মৃত প্রাণী সমুদ্রতরঙ্গ কর্তৃক বেলাভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়— সে সকল প্রাণীকে বলে ত্বোয়ামুল বাহর। হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের, হজরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, হজরত ইকরামা, হজরত কাতাদা, ইমাম নাখয়ী এবং ইমাম মুজাহিদ উল্লেখ করেছেন, সঈদুল বাহর অর্থ সদ্য ধৃত তাজা সামুদ্রিক মৎস্য। আর ত্বোয়ামুল বাহর হচ্ছে ওই সকল সামুদ্রিক মৎস্য, যেগুলোতে লবণ মাখানো হয়েছে।

'মাতায়াল্লাকুম ওয়ালিস্ সাইয়ারাহ্'— অর্থ তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, সামুদ্রিক মৎস্যকুল স্থানীয় অধিবাসী এবং পর্যটক উভয়ের জন্য হালাল। স্থানীয় অধিবাসীরা সদ্য ধৃত তাজা মৎস্য ভক্ষণ করে। আর পর্যটকেরা সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ভ্রমণ পথের আহার্য হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

'ওয়া হুররিমা আ'লাইকুম সঈদুল বার্রি মা দুমতুম হুরুমা'— এ কথার অর্থ তোমরা যতক্ষণ ইহ্রামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই বাক্যটির মাধ্যমে স্থলভাগের শিকারের গোশত মুহ্রিমের জন্য সাধারণভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গায়ের মুহ্রিম কর্তৃক বধকৃত শিকার এবং মুহ্রিম যে শিকার বধ করতে গায়ের মুহ্রিমকে বলেনি, ইশারা ইঙ্গিত করেনি বা কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা করেনি এবং যা কোনো মুহ্রিমের ভক্ষণের জন্য শিকার করেনি— এ ধরনের সকল শিকারের গোশত মুহ্রিমের জন্য হারাম। হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম বলেছেন। তাউস এবং সুফিয়ান সওরীও এ রকম অভিমত পোষণ করেন। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। হজরত সাআব বিন জুসামাহ্ ইয়াশি তাঁর সম্মুখে বন্য গর্দভের গোশত হাদিয়া পেশ করলেন, রসুল স. সে গোশত ফেরত দিলেন। হজরত সাআবের মুখমণ্ডলে দেখা দিল প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জার ছাপ। সেদিকে লক্ষ্য করে তিনি স. বললেন, এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি যে ইহ্রাম বেঁধেছি। বোখারী, মুসলিম। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত এ কথাটি— আমি এ শিকারের গোশত খাবো না। হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে হজরত সাঈদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটি রয়েছে— আমি ইহ্রাম না বাঁধলে এ গোশত ভক্ষণ করতাম। এ সম্পর্কে বোখারী বলেছেন, ওই বন্য গর্দভটি জীবিত ছিলো। আর জীবিত পশু ভক্ষণ করা মুহ্রিমের জন্য অসিদ্ধ। বর্ণনাকারীগণও এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের উক্তি সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের মন্তব্যগুলো ঠিক নয়। কেননা মুসনাদ গ্রন্থে মুসা, মোহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা এবং জুহুরী থেকে স্বসূত্রে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট তখন বন্য গর্দভের গোশতই পাঠানো হয়েছিলো (জীবিত গাধা পাঠানো হয়নি)। জুহুরী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হাদিয়াস্বরূপ দেয়া হয়েছিলো বন্য গর্দভের রান। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, দেয়া হয়েছিল বন্য গর্দভের নিতম্ব যা থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছিলো। মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় নিতম্বের স্থলে রানের কথা এসেছে। তাঁর তৃতীয় বর্ণনাটি হজরত সাঈদ থেকে দু'রকমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে এসেছে—বন্য গর্দভ। অন্যটিতে এসেছে— বন্য গর্দভের পাঁজর। এ সম্পর্কে বর্ণনাবৈষম্য যতই থাক না কেনো, আসল কথা হচ্ছে রসুল স. ওই হাদিয়া গ্রহণ করেননি।

আমর বিন উমাইয়া সূত্রে ওহাব এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন ছিলেন জুহফায়, ওই সময় তাঁর নিকট বন্য গর্দভের নিতম্ব উপস্থিত করা হয়েছিলো। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ওই গোশত ভক্ষণ করেছিলেন। বর্ণনাটি উত্তমসূত্রসম্বলিত।

যতদূর জানা যায় উপরে বর্ণিত ঘটনা দু'টো এক নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনাটি ছিলো আবওয়া অথবা ওয়াদ্দানের এবং ওহাব বর্ণিত ঘটনাটি ছিলো জুহ্ফার। জুহ্ফা থেকে আবওয়ার দূরত্ব তেরো মাইল এবং ওয়াদ্দানের দূরত্ব আট মাইল। এ সম্পর্কে হজরত আলী থেকেও একটি বর্ণনা এসেছে। হজরত আলী বলেছিলেন, তোমরা কি জানো রসুল স. এর সম্মুখে কোনো একটি শিকারের অঙ্গ বা অংশ হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ না করে বলেছিলেন, আমি ইহ্রাম অবস্থায় আছি। হজরত আলী এ কথা বলেছিলেন 'আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এবং তিনি কসমও দিয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, হাঁ (আমি জানি)। আবু দাউদ , তাহাবি এবং মুসলিমও এ রকম হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু করনে আওয়ালের (প্রথম উত্তম যুগের) পরের মুসলমানেরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, গায়ের মুহ্রিম নিজের জন্য যা শিকার করে, সেই শিকারের গোশত ভক্ষণ মুহ্রিমের জন্য হালাল। বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. স্বয়ং এ রকম শিকারের গোশত ভক্ষণ করেছেন এবং সাহাবীদেরকেও ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। হজরত আবু কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, (এই শিকারের) উদ্বৃত্ত গোশত তোমরা খেয়ে ফেলো। অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. নিজেও ওই গোশত খেয়েছেন। হজরত সাআব বিন জুসামাহ্র অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, রসুল স. নিজেও ওই গোশতের কিছু অংশ খেয়েছিলেন।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুয়াজ বিন আবদুর রহমান বিন ওসমান তাইমীর পিতা (আবদুর রহমান) বর্ণনা করেছেন, আমি ইহ্রাম অবস্থায় হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্র সঙ্গে ছিলাম। তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করা হলো একটি শিকার করা পাখির গোশত। আমরা কেউ কেউ ওই গোশত খেলাম। আবার কেউ কেউ বিরত রইলাম। হজরত তালহা জাগ্রত হয়ে ভক্ষণকারীদেরকেই সমর্থন করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স. এর সফর সঙ্গী হয়ে শিকারের গোশত খেয়েছি।

আমর বিন সালমা জমিরি বাহজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. মক্কা গমনের উদ্দেশ্যে ইহ্রামের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। যখন হজরত রওয়াহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন জবাই করা একটি বন্য গর্দভ পড়ে আছে। তিনি স. বললেন এটিকে এভাবেই থাকতে দাও। সম্ভবতঃ এর শিকারী এখনই এসে পড়বে। একটু পরেই সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত বাহজি। তিনি গর্দভটি

শিকার করেছিলেন। হজরত বাহজি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এটাকে বণ্টন করে দিতে পারেন। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বণ্টনের নির্দেশ দিলেন। হজরত আবু বকর কাফেলার লোকদের মধ্যে বন্য গর্দভটির গোশত বণ্টন করে দিলেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক এবং সুনান রচয়িতাগণ। ইবনে খুজাইমা বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। এ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সঈদ শব্দের অর্থ শিকার করা।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, গায়ের মুহ্রিম কর্তৃক শিকার করা পশুর গোশত খাওয়া সকলের জন্যই জায়েয। এমনকি যে মুহ্রিমের জন্য শিকার করা হয়েছে, তার জন্যও খাওয়া জায়েয। ইমাম মালেক বলেছেন, মুহ্রিমের জন্য যদি গায়ের মুহ্রিম শিকার করে তবে ওই শিকারের গোশত খাওয়া কারো জন্য হালাল নয়, এমনকি গায়ের মুহ্রিমও ওই গোশত খেতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, ইহ্রাম বাঁধার আগে অথবা পরে যে কোনো অবস্থায় মুহ্রিমের জন্য গায়ের মুহ্রিমের শিকারের গোশত মুহ্রিমের জন্যও ভক্ষণ করা জায়েয নয়। অবশ্য গায়ের মুহ্রিম ওই শিকারের গোশত খেতে পারবে। আর ওই মুহ্রিমও খেতে পারবে যার উদ্দেশ্যে শিকার করা হয়নি। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ওসমানের কথায়ও এর প্রমাণ রয়েছে।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের বলেছেন, তখন গ্রীষ্মকাল। আমি মাকামুল আরজে ইহ্রাম অবস্থায় হজরত ওসমানকে দেখলাম। তাঁর মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা আবৃত ছিলো। কিছুক্ষণ পর তাঁর সামনে শিকারের গোশত হাজির করা হলো। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, খাও। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি খাবেন না? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমার জন্য শিকার করা হয়েছে (তাই আমার জন্য এই গোশত হালাল নয়)।

এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. গায়ের মুহ্রিমের শিকার করা গোশত খেয়েছেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, খাননি। বরং ফেরত দিয়েছেন। ইমামত্রয় এই বিপরীতমুখী বর্ণনাগুলো সামঞ্জস্যসাধন করেছেন এভাবে— রসুল স. ওই গোশত খেয়েছিলেন— যা গায়ের মুহ্রিম নিজের জন্য শিকার করেছিলেন। আর ওই গোশত খাননি— যা রসুল স. অথবা অন্য কোনো মুহ্রিমের জন্য শিকার করা হয়েছিলো।

আমি বলি, কোনো হাদিসেই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। আমার ধারণায় বিপরীতমুখী বর্ণনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করার উত্তম পথ হচ্ছে এ কথা বলা— গায়ের মুহ্রিম যদি তার নিজের জন্য শিকার করে, তবে

ওই শিকারের গোশত খাওয়া মুহ্‌রিম, গায়ের মুহ্‌রিম উভয়ের জন্য জায়েয। কিন্তু না খাওয়াই উত্তম। তাই রসুল স. জায়েয হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন খেয়ে এবং উত্তম বা মোস্তাহাবের প্রমাণ দিয়েছেন না খেয়ে।

একটি প্রশ্নঃ পরস্পরবিরোধী হাদিস পরিদৃষ্ট হলে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হয়। আর কিয়াসের নিয়ম হচ্ছে, অসিদ্ধ হওয়ার বিধানকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু এখানে এই নিয়মটি মানা হলো না কেনো?

উত্তর ঃ আমরা বলি, কথাটি সত্য। কিন্তু আমি এক্ষেত্রে এই নিয়মটি অনুসরণ করিনি এ জন্য যে, বিষয়টি যেনো ঐকমত্যবিরোধী না হয়। কেননা, কোনো কোনো শিকার ভক্ষণ করা আলেমগণের ঐকমত্যানুযায়ী হালাল। আবার মুহ্‌রিমের জন্য শিকার করা পশুর গোশত তিন ইমামের নিকট হারাম।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, স্থলভাগের শিকারের গোশত তোমাদের জন্য হালাল— যখন তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকো, নিজেরা শিকার না করো এবং তোমাদের জন্য শিকার করা না হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে খুজাইমা এবং আহমদ।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, এককবর্ণিত (খবরে আহাদ) পরস্পর বিরোধী হাদিসের মধ্যেই কেবল প্রাধান্য প্রদানের অবকাশ রয়েছে। এ সকল বর্ণনায় দেখা যায়, মুহ্‌রিম তার নিজের জন্য শিকার করলে অথবা তার জন্য কোনো গায়ের মুহ্‌রিম শিকার করলে— ওই শিকারের গোশত মুহ্‌রিমের জন্য হারাম। কিন্তু গায়ের মুহ্‌রিম তার নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো মুহ্‌রিমের জন্য কিংবা অন্য কোনো গায়ের মুহ্‌রিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া যাবে কিনা— এ সকল প্রশ্নের উত্তর কোনো হাদিসের বিবরণে নেই। সুতরাং এ সকল কথা হাদিসের বাইরে থেকে জেনে নিতে হয়।

আমরা বলি, উপরে বর্ণিত আমর বিন সাওবী আমরের বর্ণনাটি দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইমাম আহমদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত জাবেরের সূত্রপ্রবাহসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী সাধারণ আনসার। তিরমিজির বর্ণনায় এবং অন্যান্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, হাদিসের সূত্রটি এ রকম, আমর-মতলব— হজরত জাবের। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, আমরের হাদিসের বর্ণনাকারীর মধ্যে রয়েছে এক অপরিচিত আনসারী। তিরমিজির বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, আমরের বর্ণনাকারী মতলব। আর এই মতলব যে হজরত জাবের থেকে হাদিস শুনেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। তদুপরি আমর বিন আবী আমর ছিলো মতলবের মুক্ত করা ক্রীতদাস (সে নির্ভরযোগ্যও ছিলো না)। ইয়াহ্‌ইয়া বিন মুঈন

বলেছেন, হাদিসটি দলিল হওয়ার অযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া এবং আবু দাউদ দু'জনেরই স্পষ্ট উক্তি হচ্ছে হাদিসটি শক্তিশালী নয়। ইমাম আহমদ অবশ্য বলেছেন, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উল্লেখিত দলিলটি ধারণাপ্রসূত দলিল। এ রকম ধারণাপ্রসূত দলিল সিদ্ধ নয়।

হজরত আবু কাতাদা বর্ণিত হাদিসটিও এই বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপস্থিত করা হয়— যদি গায়ের মুহ্রিম মুহ্রিমের জন্য শিকার করে তবে তার গোশত খাওয়া জায়েয নয়। হজরত আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া প্রান্তরে আমি রসুল স. এর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমার সাথীরা ছিলেন ইহ্রাম অবস্থায়। কিন্তু আমি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলাম না। ওই সময় আমি একটি বন্য গর্দভ শিকার করে রসুল স. এর নিকটে এসে বললাম, আমি ইহ্রাম বাঁধিনি। আমি রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য শিকার করেছি। রসুল স. তখন গায়ের মুহ্রিম সাহাবীগণকে ওই গোশত খাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স. নিজে খেলেন না। কারণ শিকারটি করা হয়েছিলো তাঁর জন্য। হাদিসটি সংকলন করেছেন ইসহাক ইবনে খুজাইমা এবং দারা কুতনী। এই দলিল প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে— ইবনে খুজাইমা, আবু বকর নিশাপুরী এবং দারা কুতনী সম্মিলিতভাবে এ কথা বলেছেন যে, মোয়াম্মারের বর্ণনায় এই কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে— 'আমি আপনার জন্য এটি শিকার করেছি' এবং 'রসুল স. নিজে ওই গোশত খাননি।' এই কথাগুলো মোয়াম্মার ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ অতিরিক্ত কথা দু'টো তাঁর নিজস্ব ধারণা। ইমাম জাহাবী উল্লেখ করেছেন, মোয়াম্মার বিন রাশেদ হাদিস লিপিবদ্ধকালে কিছু কিছু নিজস্ব ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

আমি বলি, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সকল বর্ণনার ভিত্তিতে এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে— রসুল স. ওই শিকারের গোশত খেয়েছিলেন। ইমাম মালেকের বিরুদ্ধে মোয়াম্মারের বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, রসুল স. সাহাবীগণকে ওই গোশত ভক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সাহাবীগণও ওই গোশত খেয়েছিলেন। অতএব এ কথাটি প্রমাণিত হলো যে, মুহ্রিমের জন্য শিকার করা পশুর গোশত সকলের জন্য হালাল। অথচ ইমাম মালেক বলেছেন হারাম।

আয়াতের সর্বশেষ অংশে বলা হয়েছে, 'ওয়াত্তাকুল্লহাল্লাজি ইলাইহি তুহ্শারুন'— এ কথার অর্থ, ভয় করো আল্লাহ্কে যার নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

❒ আল্লাহ্ পবিত্র কাবা গৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্য পরিহিত পশুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন; ইহা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানিতে পার যাহা কিছু আসমান ও জমিনে আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

❒ জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বলেই কাবা শরীফকে কাবা বলা হয়। আরবীতে অবশ্য চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সকল গৃহকেই কাবা বলে। কিন্তু মুকাতিল বলেছেন, অন্য সকল গৃহ থেকে পৃথক প্রকৃতির বলেই কাবাগৃহের নাম কাবা।

কেউ কেউ বলেছেন, অন্য সকল গৃহ থেকে উচ্চ হওয়ার কারণেই আল্লাহ্র ঘরের নাম হয়েছে কাবা। কাবা'র শাব্দিক অর্থ উঁচু হয়ে ওঠা। পায়ের গ্রন্থিকে (টাখনুকে) কাআব বলা হয়। কারণ তা দু'দিকে উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে। বালিকা যখন যুবতী হতে শুরু করে তখন তার বক্ষদেশ উঁচু হয়ে ওঠে। তখন তাকে বলা হয় 'তাকাআবাত্'।

আলোচ্য আয়াতে কাবা শরীফকে বলা হয়েছে 'আল বায়তুল হারাম'— যার অর্থ মহাসম্মানিত। এ কথা বলে কাবা শরীফের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই আল্লাহ্ তায়ালা কাবাকে সম্মান দান করেছেন।

ক্বিয়ামাল্লিন্নাস্ অর্থ 'মানুষের দ্বীন দুনিয়ার শান্তি কেন্দ্র।' কাবা শরীফ যে শান্তি কেন্দ্র বা শান্তিধাম— সে কথা সর্বজনবিদিত। এখানে হজ করা হয়। পালন করা হয় হজের বিভিন্ন বিধান। দর্শিত হয় বিভিন্ন নিদর্শন। বিশ্বশান্তির এই একক কেন্দ্রে লুণ্ঠন, হত্যা ও সকল অপকর্ম নিষিদ্ধ। এখানে সকল মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ।

'ওয়াশ্‌শাহরাল হারাম' অর্থ পবিত্র মাস। পবিত্র মাসও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এখানে পবিত্র মাস বলে বুঝানো হয়েছে ওই চারটি মাস কে, যে সময় লুণ্ঠন, রক্তপাত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ। মাসগুলো হচ্ছে রজব, জিলক্বদ, জিলহজ্জ এবং মহররম। আরববাসীরা ওই চারমাস যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকে। তাই ওই চারমাসে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা।

'ওয়াল হাদ্‌ইয়া ওয়াল ক্বলাইদা' অর্থ কোরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু এবং গলায় মাল্য পরিহিত পশু। কোরবানীর পশু এবং গলায় মালা পরিহিত পশুকেও আল্লাহ্‌পাক জানিয়েছেন নিরাপত্তার প্রতীক বলে। 'ক্বলাইদা' বা গলায় মালা পরা পশু সম্পর্কে এই সুরার প্রথম দিকে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জালিকা লি তা'লামু আন্নাল্লহা ইয়া'লামু মাফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ্বি ওয়া আন্নাল্লহা বিকুল্লি শাইইন আ'লীম।' এ কথার অর্থ, এটা এ কারণে যে, তোমরা যেনো জানতে পারো— যা কিছু আসমানে ও জমিনে আছে, আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

জুজায বলেছেন, এখানে জালিকা (এটা) শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল অদৃশ্য বিষয় ও ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এই সুরায়। যেমন 'ইহুদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর', 'তোমার নিকটে আসে না, এমন এক ভিন্নদলের পক্ষে', 'যারা কান পেতে থাকে।' (অথবা তাদের কিতাব পরিবর্তনের কথাও জানানো হয়েছে, 'জালিকা' শব্দটির মাধ্যমে) আল্লাহ্‌পাক বিধান দাতা। আসমান জমিনের সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায়। তাই তিনি ভবিষ্যতের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার জন্যই মানুষকে অনুগ্রহ করে বিভিন্ন বিধিবিধান দিয়েছেন। এখানে তাই বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌পাক যে আসমান ও জমিনের সকল কিছু জানেন— এ কথাটি যেনো তোমরা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারো। যেনো জেনে নিতে পারো যে, তিনি সর্বজ্ঞ। বিশেষভাবে এ কথা জানানোর পর পরের আয়াতে আল্লাহ্‌পাক শাস্তি ও ক্ষমার কথা সাধারণভাবে ঘোষণা করেছেন।

বলেছেন, 'জেনে রাখো যে, আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে যেমন কঠোর, তেমনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয়াত ৯৮)। এ কথার মধ্যে রয়েছে যুগপৎ শাস্তির হুমকি এবং সওয়াবের অঙ্গীকার। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের বিধানের বিরোধিতা করবে এবং বিরোধিতায় অনড় থাকবে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর বিধানের আনুগত্য যে করবে, বিরত থাকবে নিষেধাজ্ঞা থেকে, তার জন্য রয়েছে পুণ্য।

হাসান থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেন, জীবন সায়াহ্নে হজরত আবু বকর বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীতে রয়েছে কখনো কোমলতার সঙ্গে

কঠোরতা। আবার কখনো কঠোরতার সঙ্গে কোমলতা। এ রকম বর্ণনারীতির মাধ্যমে প্রকৃত বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভয় ও আশার সঞ্চার করাই হচ্ছে আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায়। নৈরাশ্য নিষিদ্ধ। তাই ভয় প্রদর্শনের পরক্ষণেই রয়েছে আশার কথা। আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীর আশা-আকাঙ্খাকে কখনো বিনষ্ট করেন না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ৯৯

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

❐ প্রচার করাই কেবল রসূলের কর্তব্য। তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ আল্লাহ্ তাহা জানেন।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, সত্যধর্মের প্রচারই আল্লাহ্র রসুলের প্রধান দায়িত্ব। তিনি স. সে দায়িত্ব পালন করেছেন। সুতরাং, সত্যধর্ম গ্রহণের পথে আর কোনো প্রতিবন্ধক রইলো না। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নির্বিবাদ আনুগত্য। এ কথাটি বুঝাতে যেয়েই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'প্রচার করাই কেবল রসুলের কর্তব্য।'

এরপর বলা হয়েছে 'ওয়াল্লহু ইয়ালামু মা তুব্দুনা ওয়ামা কুনতুম তাকতুমুন' (তোমরা যা প্রকাশ করো ও গোপন করো আল্লাহ্ তা জানেন) — এ কথার অর্থ আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড এবং গোপন অভিপ্রায় (নিয়ত) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। অতএব তোমরা সত্যনিষ্ঠ হও। বিশুদ্ধচিত্ত হও।

তারগীব গ্রন্থে ইসপাহানীর বর্ণনায় এবং হজরত জাবের থেকে ওয়াহেদির বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. শরাব হারাম হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এ কথা শুনে জনৈক আরববাসী বললো, আমি তো শরাবেরই ব্যবসা করি। এ ব্যবসা করে আমি অনেক উপার্জন করেছি। আমি যদি এই ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি তবে কি আমি পরকালে কোনো উপকার লাভ করতে পারবো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্পাক কেবল পবিত্র উপার্জন গ্রহণ করেন। তখন রসুল স. এর বক্তব্যের সমর্থনে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াকুব ইস্কান্দারী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, ওমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট তাঁর অধীনস্থ এক প্রশাসক একটি পত্রে লিখলেন— সরকারী কর আদায়ের অবস্থা নাজুক। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ উত্তরে লিখলেন, আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান নয়— যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।' সুতরাং উত্তম কর্ম এবং আত্মশুদ্ধির পথে ধাবিত হও। অতীত পাপাচারের কথা স্মরণে এলে পাঠ করো 'ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।'

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۟

❐ বল, 'মন্দ ও ভাল এক নহে যদিও প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধ-শক্তি-সম্পন্নেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর— যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'

'মন্দ ও ভালো এক নয়'— এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌পাকের নিকট ভালো ও মন্দ এক বরাবর নয়। তিনি মন্দ মানুষ ও মন্দ আমলকে অপছন্দ করেন। আর পছন্দ করেন উত্তম মানুষ ও উত্তম আমলকে। উদ্ধৃত বাক্যটির মাধ্যমে উত্তম আমল এবং হালাল উপার্জনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সম্পদের প্রাচুর্য প্রবৃত্তির বিবেচনায় মনমুগ্ধকর হলেও, আল্লাহ্‌পাকের নিকট অগ্রহণীয়। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পাদিত যৎকিঞ্চিত আমল অবিশুদ্ধ উদ্দেশ্যসম্বলিত অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ্‌র পথে হালাল উপায়ে অর্জিত অল্প সম্পদ ব্যয় হারাম পথে অর্জিত অধিক ব্যয় অপেক্ষা শ্রেয়।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বৈধ পথে উপার্জিত একটি খোরমা দান করলেও আল্লাহ্‌পাক তা কবুল করেন। ওই দান তিনি গ্রহণ করেন দক্ষিণ হস্তে এবং তা আরও বৃদ্ধি করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দেন। যেমন তোমরা ছাগ শিশুকে সম্মুখে পরিচালিত করো। ওই দানকৃত খোরমাটিকে তিনি করে দেন পাহাড়ের মতো বিশাল। অল্প সংখ্যক বিশুদ্ধচিত্ত পুণ্যবান পৃথিবীপূর্ণ মন্দ মানুষ অপেক্ষা উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সহল বিন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি স. তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক সাহাবীকে বললেন, গমনকারী লোকটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! ওই লোকটি অভিজাত। সে কোথাও বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রস্তাব সহজেই কবুল করা হবে। কারো জন্য সুপারিশ করলে তা গৃহিত হবে। এ কথা শুনে রসুল স. কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। একটু পরে আরেকটি লোক সে পথ দিয়ে যেতে শুরু করলো। রসুল স. তাঁর পাশের সাহাবীকে পুনরায় বললেন, এই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! লোকটি দরিদ্র মুসলমান। তার বিবাহের প্রস্তাব কোথাও কবুল হবে না এবং কারো জন্য সুপারিশ

করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। তার কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনবেও না। রসুল স. বললেন এই লোকটি পৃথিবীপূর্ণ মানুষের চেয়ে উত্তম। বোখারী, মুসলিম।

'ফাত্তাকুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নিকট উত্তম হতে চেষ্টা করো। হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে সচেষ্ট হও। সে সম্পদের পরিমাণ অল্প হলেও ক্ষতি নেই।

বাগবী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্কে ভয় করো' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, হজ যাত্রীদের জীবন ও সম্পদের কোনো ক্ষতি কোরো না, যদিও তারা মুশরিক হয় (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুশরিকেরাও হজ প্রতিপালন করতো)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ সুরার প্রথম দিকে। উল্লেখ্য যে, বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে 'আল্লাহ্কে ভয় করো' নির্দেশটি এসেছে। বলা হয়েছে, 'সুতরাং হে বোধ-শক্তি-সম্পন্নেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো— যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো (আল্লাহ্র ভয়ে সাবধান হও বা তাকওয়া অবলম্বন করো), তবেই কেবল তোমরা সফলতার আশা করতে পারো। কোরআন মজীদের যে সকল স্থানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটি এসেছে সে সকল স্থানে সৃষ্ট আশা আকাঙ্খা আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না, সম্পৃক্ত হয় বান্দার সঙ্গে। সুতরাং এখানে এ কথাটির অর্থ হবে এ রকম— এমতো আশা নিয়ে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তোমরা সাফল্য আশা করতে পারো। আমি বলি, আয়াতটির এমতো অর্থ করাই উত্তম।

হজরত আলী থেকে আহমদ, তিরিমিজি, হাকেম এবং হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু উমামা বাহেলী এবং হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যখন 'ওয়া লিল্লাহি আ'লান্নাসি হিজ্জুল বাইত' আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! প্রতি বছর কি হজ ফরজ? রসুল স. নিশ্চুপ রইলেন। সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আমাদের প্রিয় রসুল! প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? রসুল স. বললেন, না। যদি আমি এখন হ্যাঁ বলতাম, তবে প্রতি বছরই হজ ফরজ হয়ে যেতো। অন্য বর্ণনায় এসেছে রসুল স. তখন বললেন, তোমরা কি মনে করেছো, আমি হ্যাঁ বলবো? যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে প্রতি বছর হজ ফরজ হয়ে যেতো। আর তোমাদের পক্ষে প্রতি বছর হজ করা সম্ভব হতো না। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে আমি নিশ্চুপ থাকি, সে বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত তাদের নবীকে অধিক প্রশ্ন করতো বলেই ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে— আমি যা নির্দেশ করি তা প্রতিপালন করা। আর যা নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকা। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে। কোরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে, আল্লাহ্ সে সব বিষয়ের প্রশ্ন ক্ষমা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

অনাবশ্যক প্রশ্নের কারণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ রসুলের উপস্থিতিতে উম্মতের দায়িত্ব হচ্ছে নির্দেশনার প্রতীক্ষা করা। তিনি যা করতে বলবেন, তা করা। যা নিষেধ করবেন, তা থেকে বিরত থাকা। রসুল তো নির্দেশনা দান করবেনই। এটা যখন তাঁর কর্তব্যকর্মের অন্তর্ভূত তখন তাঁকে প্রশ্ন করে বিব্রত করা হবে কেনো? আলোচ্য আয়াতে এই অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নপ্রবণতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।'

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত উক্কাশা বিন মুহ্সিন হজ সম্পর্কে রসুল স. কে প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, মুসলমানদেরকে প্রতি বছর হজ করতে হবে কিনা। ইবনে জারীর হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজ প্রতি বছর ফরজ কিনা তা তো রসুল স. আপনা থেকেই বলবেন। অথবা বলবেন না— আমলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। সুতরাং এ বিষয়ে প্রশ্ন নিরর্থক। ধর্মের পথ সোজা সরল। জটিলতার প্রশ্রয় ধর্মীয় বিধানে নেই। সুতরাং অযথার্থ প্রশ্নজাত জটিলতাকে পরিহার করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে এই কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে।

'যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে'— কথাটির অর্থ, তোমাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যদি উত্থাপিত বিষয়টি ফরজ করে দেয়া হয়, তবে তোমরা মনঃক্ষুণ্ন হবে। কারণ, কঠিন নির্দেশ তোমাদের পক্ষে পালন করা অসম্ভব (তাহলে কঠিন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছো কেনো? কেনো জানতে চাচ্ছো— প্রতি বছর হজ ফরজ কিনা)।

'কোরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো, তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে'— এ কথার মাধ্যমে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, হে বিশ্বাসীরা। তোমরা আর কখনো এ রকম অযথার্থ প্রশ্নের

অবতারণা কোরো না। তোমাদের জন্যই ক্রমাগত অবতরণ হয়ে চলেছে কোরআনের নির্ভুল বাণী নির্দেশনা। প্রশ্নপ্রবণতার অপরিচ্ছন্নতা এনে সেই স্বচ্ছ ও নিরবচ্ছিন্ন বাণীপ্রবাহকে আবিল করে তুলো না। যদি তোলো তবে তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে কঠিন বিধান যা তোমাদের জন্য হবে কষ্টকর। সুতরাং সাবধান! এমন প্রশ্ন তোমরা করেছো যার উত্তরে ছোট একটি শব্দ হ্যাঁ বললেই বিধানটি হয়ে যাবে তোমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এ রকম প্রশ্ন থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

মাসআলাঃ সংখ্যা নির্দেশ করা না হলে বুঝতে হবে নির্দেশটি একবারই পালনীয়। বারংবার নয়। এটাই হানাফিগণের অভিমত। রসুল স. বলেছেন, 'লাও কুলতু নাআম ওয়াআজাবাত' (যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তবে ওয়াজিব হয়ে যেতো)। অর্থাৎ প্রতি বছর হজ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যেতো। আর হুকুমটি হতো তখন সংখ্যা নির্দেশ সম্বলিত ও বিস্তারিত।

'ইন তুবদালাকুম তাসুকুম'— কথাটির উদ্দেশ্য, হজ ফরজ (জীবনে একবারই ফরজ)। সাহাবীগণের প্রশ্নের কারণেই রসুল স.কে উত্তর দিতে হয়েছিলো। তখন যদি তিনি স. কেবল 'হ্যাঁ' বলতেন তবে 'হজ ফরজ' আয়াতটি রহিত হয়ে যেতো। তদস্থলে আসতো নতুন কঠিন আয়াত। আগের সাধারণ নির্দেশনার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো বিশেষ নির্দেশনা। প্রশ্নের পূর্বেই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু তা যখন করা হয়নি, তখন নিশ্চুপ থাকাই ছিলো সমীচীন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নতুন বিধান অবতীর্ণ না হলে পুরাতন বিধান রহিত হয় না। কিন্তু নতুন বিষয়ের আলোচনা— বিধান অবতীর্ণ হওয়া না হওয়ার প্রতি নির্ভরশীল নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে— সংক্ষিপ্ত, বিপজ্জনক অথবা গোপন বিষয়ে প্রশ্ন করাতে কোনো দোষ নেই। এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা সম্পর্কে এই আয়াতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, রুগ্ন ব্যক্তির নিরাময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সুতরাং বুঝতে হবে ওই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা অনুচিত যেগুলো সম্পর্কে শরিয়তে স্পষ্ট করে হ্যাঁ বা না বলা হয়নি। এ সকল বিষয়ে অহেতুক প্রশ্ন করা হলে এর পরিণামে নতুন হুকুম অবতীর্ণ হয়ে যাবে। যেমন প্রতি বছর হজ ফরজ কিনা— এই প্রশ্নটি। হজরত মুসা তাঁর উম্মতকে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিনা প্রশ্নে এই নির্দেশটি প্রতিপালিত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বনী ইসরাইলেরা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। আর কেবল তাদের প্রশ্নের কারণেই সরল হুকুম অপসারণ করে তদস্থলে এসে যাচ্ছিলো কঠিন, কঠিনতর হুকুম।

'আফাল্লহু আনহা'— কথাটির অর্থ, আল্লাহ্ সে সব বিষয়ের প্রশ্ন ক্ষমা করেছেন। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— তোমরা হজ সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করেছো— আল্লাহ্পাক তা দয়া করে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর যেনো কখনো এমন ঘটনা না ঘটে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াল্লহু গফুরুন্ হালিম।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তাই তিনি বিশ্বাসীদের ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করেন (ক্ষমা করে দেন) এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও শাস্তি আরোপ করেন না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০২

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِيْنَ

❒ তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।

'ক্বদ সাআলাহা ক্বওমুম্ মিন ক্বব্‌লিকুম'—অর্থ, তোমাদের পূর্বেও তো এ সব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিলো। এই প্রসঙ্গটি একটু পরেও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তার আগে এটুকু জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজির বলেছেন, হজরত উবাই বিন কা'ব এই আয়াতটিকে পড়তেন এভাবে—'ক্বদ্ সাআলাহা ক্বওমুন বাইয়েনাত লাহুম ফাস্‌বাহু বিহা কাফিরীন।'

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. রোষান্বিত হয়ে ঘরের বাইরে এলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ছিলো রক্তাভ। তিনি স. মিম্বরে আরোহণ করলেন। এক লোক দণ্ডায়মান হয়ে প্রশ্ন করলো, আমার পিতা ও পিতামহ এখন কোথায়? তিনি স. বললেন, দোজখে। আর এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? তিনি স. তার পিতার নাম বলে দিলেন। হজরত ওমর রসুল স. এর রোষতপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করে প্রমাদ গুণলেন। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, মোহাম্মদ স. কে রসুল হিসেবে এবং কোরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পেয়ে প্রসন্ন। হে আমদের প্রিয় রসুল! আমাদের জীবন থেকে মূর্খতার অমানিশা অপসৃত হয়েছে। আমরা এখন ইসলামের অক্ষয় আলোয় আলোকিত। আমাদের অপরাধ মার্জনা করা হোক। আল্লাহ্পাক অবশ্যই জানেন, আমাদের পিতা মাতারা এখন কোথায় (আমরা তাদের মর্মবিদারক পরিণতি সম্পর্কে আর জানতে আগ্রহী নই)। হজরত ওমরের এহেন সমর্পণস্নাত বক্তব্য শুনে রসুল স. এর রোষ প্রশমিত

হলো। তখন অবতীর্ণ হলো—'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু লা তাস্আলু আন আশ্ইয়াআ' (আয়াত ১০১)।

'সাআলাহা' শব্দটির 'হা' (এ সব) সর্বনাম পূর্বের আয়াতের 'আশ্আইয়া' (বিষয় সম্পর্কে) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত (অর্থাৎ ওই সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিলো)। এখানে 'আন' শব্দটি উহ্য রয়েছে ধরতে হবে। অথবা 'হা' সর্বনামটি এখানে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 'সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না' (লা তাসআল) পূর্ববর্তী আয়াতের বাক্যাংশটি এর প্রমাণ। যদি তাই হয়, তবে এখানে 'আন' শব্দটি উহ্য আছে— এ রকম বলার প্রয়োজন পড়বে না।

ইমাম বায়যাবী বলেছেন, 'মিন কুবলিকুম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'সাআলাহা' এর সঙ্গে। তিনি একে 'কুওমুন' এর বিশেষণ বলেননি। কেননা, 'জরফ জামান' (কালাধিকরণ কারক) কখনো বিশেষণ, বিশেষ্য কিংবা বিধেয় হতে পারে না। কিন্তু এ রকম দলিল প্রমাণ আপত্তিকর। 'জরফ' এর সম্পর্ক এমন বিষয়ের সঙ্গে করা উচিত যন্মধ্যে ওই বিষয়টি অনির্দিষ্ট। যেমন, 'আল হিলালু ইয়াওমাল জুমুআতে' (জুমআ দিবসের চন্দ্র)। এখানে জুমআর দিবস নির্দিষ্ট নয়। তাই এই দৃষ্টান্তটিতে নির্দিষ্টতাকে প্রকাশ করার জন্য জুমআর দিবসের সম্পর্ক চন্দ্রের দিকে করা হয়েছে।

বনী ইসরাইলকে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দেয়া হলে তারা গাভীর বয়স, রঙ, আকার ইত্যাদি সম্পর্কে অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলো। সামুদ সম্প্রদায়ও প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলো হজরত সালেহ্ আ. এর অলৌকিক উষ্ট্রী সম্পর্কে। হজরত ঈসার সম্প্রদায় কুটিল প্রশ্ন তুলেছিলো তাঁর আকাশারোহণ প্রসঙ্গে। হজরত মুসার পরবর্তী নবী সম্পর্কে বনী ইসরাইলেরা বলেছিলো, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দেয়া হোক— যার নেতৃত্বে জালুতের বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ করতে পারি।

'ছুম্মা আসবাহু বিহা কাফিরীন'— অর্থ, অতঃপর তারা উহা প্রত্যাখ্যান করে (কাফের হয়ে যায়)। এ কথার মাধ্যমে বলা হয়েছে, ওই কুট প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ নির্দেশ প্রশ্নকারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তারা কাফের (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)।

হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা কতিপয় ফরজ নির্ধারণ করেছেন। তোমরা প্রশ্নের অবতারণা করে সেগুলোকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী হয়ো না। আর আল্লাহ্পাক কতিপয় বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলোর বিপরীত কিছু করে অন্তরায় সৃষ্টি কোরো না। যে সীমানা তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন সে চিহ্নরেখাকে লংঘন কোরো না। কিছু বিষয় তিনি রেখেছেন গোপন— সেই নিভৃতিকে প্রশ্নবিদ্ধ কোরো না।

হজরত কাতাদাসূত্রে বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, কিছু লোক অনাবশ্যক বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। রসুল স. রুষ্ট হলেন। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো তাঁর। মিম্বরে আরোহণ করে রোষতাপিত স্বরে তিনি স. বললেন, আজ তোমাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেবো আমি (বলো কে কি বলতে চাও)। আমি অস্থির হয়ে ডানে বামে তাকাতে শুরু করলাম। দেখলাম, উপস্থিত জনতা লজ্জাবনত হয়ে পরিধেয় বস্ত্রে মুখমণ্ডল আবৃত করে কাঁদছে। এক লোক তার বংশপরিচয় বদলে ফেলেছিলো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! বলুন আমার পিতা কে? রসুল স. বললেন, হুজাফা। হজরত ওমর দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা আল্লাহ্কে প্রভুরূপে, ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মোহাম্মদ স.কে রসুলরূপে পেয়ে প্রশান্তচিত্ত। সকল বিশৃঙ্খলা থেকে আমরা পরিত্রাণপ্রার্থী। রসুল স. বললেন, ভালো মন্দ উভয় দিক থেকে আমি আজকের মতো দিন পাইনি। আমার দৃষ্টিপথে বেহেশত ও দোজখ উন্মোচিত করা হয়েছিলো। সামনের দেয়ালে আমি দেখেছি বেহেশত দোজখের উদ্ভাস। হজরত কাতাদার বর্ণনায় এসেছে— তখন অবতীর্ণ হলো, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না' (আয়াত ১০১)।

জুহরীর মাধ্যমে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, হজরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন হুজায়ফার মা তার ছেলে আব্দুল্লাহ্কে বললো, তোমার মতো মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী কোনো সন্তানের কথা আমি শুনিনি। তোমার কি সন্দেহ হয়, মূর্খতার যুগের অনেক মহিলার মতো তোমার মাতাও অশ্লীল চরিত্রের অধিকারিণী? এভাবে তিনি সর্বসমক্ষে তার সন্তানকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি কোনো হাবশী গোলামের সঙ্গেও আমার পিতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দিতে চাও, তবুও আমি তা মেনে নেবো।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা মূর্খতার অন্ধকার থেকে সদ্যমুক্ত। আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমার্হ মনে করা হোক। এ কথা শুনে রসুল স. প্রশমিত হলেন।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কয়েকজন লোক বিদ্রূপবশতঃ রসুল স. কে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। একজন বললো, আমার পিতা কে? আরেকজন বললো, আমার হারানো উট এখন কোথায়? তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বর্ণিত দু'টি ঘটনাই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত হতে পারে। তবে এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনাপেক্ষা হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আমি বলি, যদি হজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির সঙ্গে তা অধিকতর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হবে। আর পিতামাতা সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা মেনে নিলে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা এরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হও— যার উত্তর পেলে তোমরাই লজ্জিত ও অপদস্থ হবে (সঠিক জন্মসূত্র জানিয়ে দিলে গোপন কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়ে তোমাদেরই মনোকষ্ট বাড়িয়ে দিবে)।

মুজাহিদ বলেছেন, লোকেরা রসুল স. এর নিকট বহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হাম্ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো। তাদের জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

❒ বহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম্ আল্লাহ্ স্থির করেন নাই; কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।

❒ যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রসূলের দিকে আইস, তাহারা বলে, 'আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট।' কী! যদিও তাহাদিগের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই জানিত না ও সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তথাপি?

বহিরা, সায়েরা, ওসিলা এবং হামকে আল্লাহ্ পাক স্থির করেন নি— এ কথার অর্থ এগুলোকে আল্লাহ্পাক শরিয়তসম্মত করেননি, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এবং এগুলো আল্লাহ্পাকের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্তও নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে উট পাঁচবার প্রসব করেছে সে উটের কর্ণ ছেদন করে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। বোঝাবহনের কাজে কিংবা আরোহণের কাজে তাকে ব্যবহার করা হতো না। পশম কাটা হতো না, কোনো

কূপের পানি পান করতে বাধা দেয়া হতো না, সকল চারণক্ষেত্রে ছিলো তার অবাধ বিচরণ। ষষ্ঠ প্রসবের শাবক যদি পুরুষ হতো তবে ওই উষ্ট্রী শাবককে জবাই করে মুশরিক নারী পুরুষেরা ভক্ষণ করতো। আর মাদী শাবক প্রসব করলে সেই শাবকটিরও কান চিরে ছেড়ে দেয়া হতো। এ রকম উষ্ট্রীকে বলা হতো বহিরা।

হজরত আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, মান্নত করে ছেড়ে দেয়া উটকে বলা হতো সায়েবা। রোগ মুক্তির জন্য এবং প্রবাসী নিকটজনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য মান্নতকারী তাদের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম উট ছেড়ে দিতো। সকল চারণভূমি এবং সকল পানি পান করার স্থান ছিলো এদের জন্য অবারিত। কেউ এগুলোর উপর আরোহণ করতো না। পুরুষ ও মাদী উভয় প্রকার উট সায়েবা হতে পারতো।

কোনো কোনো অভিধানবিশারদ উল্লেখ করেছেন, বারোটি প্রসবের পর ত্রয়োদশ প্রসবে মাদী বাচ্চা জন্ম নিলে কর্ণ ছেদন করে তাকে তার মায়ের সঙ্গে মুক্ত করে দেয়া হতো। মায়ের মতো তারও থাকতো অবাধ স্বাধীনতা। এ ধরনের মা উটকে সায়েবা এবং তার শাবককে বহিরা বলা হতো।

হজরত আলকামা বলেছেন, ক্রীতদাসকে যখন সকল বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তার উপর আর কর্তৃত্বের অধিকার প্রয়োগ করা হয় না, তেমনি ছিলো বহিরা ও সায়েবা প্রকৃতির পশুকুল। ওগুলোর অবস্থা ছিলো রক্তের বদলা ও উত্তরাধিকারের বিপরীত। রসুল স. বলেছেন, কর্তৃত্বের অধিকার ওই ব্যক্তির যে মুক্ত করেছে। সায়েবা অর্থ মুক্তকৃত যেমন, ঈশাতুর্‌রদ্বিয়াহ্— এখানে রদ্বিয়াহ্ ব্যবহৃত হয়েছে মার্‌দ্বিয়াহ্ অর্থে। অর্থাৎ পছন্দনীয় বা পছন্দকৃত।

সাত বার পুরুষ শাবক প্রসবকারী ছাগলকে জবাই করে মুশরিক নারী-পুরুষেরা ভক্ষণ করতো। কিন্তু সাতবার মাদী শাবক প্রসবকারী ছাগলকে তারা ছেড়ে দিতো। সপ্তম প্রসবের সময় পুরুষ ও মাদী দু'টো শাবক প্রসব করলে বাচ্চা দু'টোকেও তারা ছেড়ে দিতো। বলতো, এ দু'টো জোড়া বেঁধেছে। ওই জোড়া বাঁধা ছাগল শাবক দু'টোর মা ছাগলকে তারা বলতো 'ওসিলা'। তারা আরো বলতো, ওই মা ছাগলের দুধ পান করা মহিলাদের জন্য হারাম। আর ওই জোড়া বাঁধা ছাগল দু'টোর যে কোনো একটি মারা গেলে মুশরিক নারী পুরুষ সকলে সেটিকে ভক্ষণ করতে পারতো।

কোনো পুরুষ উটের প্রজনন দ্বারা দশটি উট শাবকের জন্ম হলে অংশীবাদিরা সেটিকে বলতো, এর পৃষ্ঠদেশ মুক্ত (বাহন ও বোঝা বহন থেকে)। এরপর থেকে ওই উটের পিঠে কেউ চড়তো না। তার পিঠে কোনো বোঝাও চাপাতো না। সকল পানি পানের স্থান এবং সকল চারণভূমি তার জন্য ছিলো বাধা বন্ধনহীন। এ ধরনের উটকে বলা হতো হাম। হামের মৃত্যু হলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুশরিক উটটির গোশত ভক্ষণ করতে পারতো।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, ওই সকল উষ্ট্রীকে বহিরা বলা হতো যেগুলোর দুধ থাকতো তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর জন্য সংরক্ষিত। ওগুলোকে কেউ দোহন করতো না। আর তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত পুরুষ উটকে বলা হতো সায়েবা। সেগুলোর পিঠে কেউ চড়তো না। ওসিলা ছিলো ওই উষ্ট্রী যেগুলো প্রথম প্রসবে পুরুষ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রসবে মাদী শাবক প্রসব করতো। এ ধরনের উষ্ট্রীকে অংশীবাদিরা তাদের দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতো। ওগুলোরই নাম ছিলো ওসিলা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত জোড়া শাবক প্রসবকারী এবং সেগুলো থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শাবকের জন্ম হলে ওই প্রথম মা উষ্ট্রীকে তারা প্রতীমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো। ওই উষ্ট্রীর দ্বারা কোনো বোঝা বহনের কাজ করানো হতো না। এগুলোর নাম ছিলো হাম্।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমর বিন আমের খাজায়ীকে দোজখের মধ্যে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি টানা হেঁচড়া করতে দেখেছি। সে-ই ছিলো সর্বপ্রথম সায়েবা পদ্ধতির প্রবর্তক।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের মাধ্যমে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. আকসাম বিন জাওন খাজায়ীকে বলেছিলেন, আকসাম! আমি আমর বিন লুহাই বিন কুমআ বিন খান্দাফকে দোজখে নিজের নাঁড়িভুঁড়ি ছিঁড়তে দেখেছি। তুমি দেখতে অবিকল আমরের মতো এবং আমর তোমার মতো। আমরই সর্বপ্রথম হজরত ইসমাঈলের ধর্মাদর্শকে বিকৃত করেছিলো। উটকে চিহ্নিত করে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম সেই আবিষ্কার করেছে। বহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হামের অপপ্রবর্তনা তারই। আমি দেখলাম, তার নাড়িভুঁড়ির দুর্গন্ধে অন্য দোজখীরাও কষ্ট পাচ্ছে। আকসাম বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার চেহারা আমরের মতো— এজন্যে কি আমার কোনো ক্ষতি হবে? রসুল স. বললেন, না। তুমি ইমানদার এবং সে কাফের।

'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।'— এ কথার অর্থ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। অর্থাৎ তারা বলে, আল্লাহ্পাকই আমাদেরকে বহিরা, সায়েবা ইত্যাদি করতে বলেছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। তারা জানে না কি কারণে হালাল এবং হারাম বিধান প্রবর্তিত হয়। তারা তো ছিলো মূর্খ সাধকের অনুসারী। সত্যের উপলব্ধি তাদের নেই। তাদের অধিকাংশ এ রকম হলেও কিছুসংখ্যক ছিলো বোধসম্পন্ন। তৎসত্ত্বেও তারা তাদের অপবিশ্বাসের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেনি। নেতৃত্বাকাংখা এবং পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ তাদেরকে সত্যানুসারী হতে দেয়নি— আয়াতে 'তাদের অধিকাংশ' কথাটির মাধ্যমে মূর্খ মুশরিক জনতার উপলব্ধিহীনতাকে প্রকাশ্যতঃ চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই সহজেই বুঝা যায়, তাদের নেতা পর্যায়ের লোকেরা উপলব্ধিহীন ছিলো না, যদিও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে নেতা জনতা সকলেই ছিলো সমান।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে, 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসুলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানতো না ও সৎপথ প্রাপ্তও ছিলো না, তথাপি?' এখানে দেয়া হয়েছে কাফেরদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। বলা হয়েছে, পথভ্রষ্ট পিতা— পিতামহদের অন্ধ অনুসরণ ছাড়া কাফেরদের নিকট আর কোনো দলিল নেই। আর এদিকে ঘোষিত হচ্ছে দয়ার্দ্র আহবান— কোরআনের দিকে ও আল্লাহ্র রসুলের দিকে এসো। কী বিস্ময়! এখনো কী তারা তাদের অজ্ঞ, অবিশ্বাসী পূর্বপুরুষদের অন্ধ আনুগত্যকেই আশ্রয় করে থাকবে?

এখানে 'আও' (অথবা) শব্দটি একই সঙ্গে বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। শব্দটি এভাবে প্রয়োগ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এরপরও কি বাপ দাদাদের মূর্খতা ও বিভ্রান্তির অনুসরণ করা বৈধ হবে? এ রকম প্রশ্নের মাধ্যমে এ কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সকল যুগে, সর্বাবস্থায় পথপ্রাপ্ত জ্ঞানীগণই অনুসরণীয়। পথভ্রষ্ট মূর্খরা নয়।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদিগের কর্তব্য; তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহের দিকেই তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

হজরত আফরাহের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, যারা নতুন মুসলমান হতেন তাঁরা তাঁদের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকটজনকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতেন। ইসলামের আহবান শুনে তারা জবাব দিতো, আমাদের জন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রদর্শিত পথই যথেষ্ট। নতুন মুসলমানেরা এ কথা শুনে মনোক্ষুণ্ন হতেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। আল্লাহ্তায়ালা ওই মনোক্ষুণ্ন মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে এখানে জানাচ্ছেন, হে বিশ্বাসীরা! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। এ কথার অর্থ— তোমরা নিজেদেরকেই সংশোধন করো। আত্মরক্ষা করো অবিশ্বাস থেকে। তারপর জানাচ্ছেন, যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও— তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে

তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, মুসলমানেরা তাঁদের নিকটজনের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আক্ষেপ করতেন। তাঁরা মনে প্রাণে চাইতেন তাঁদের স্বজনেরাও সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করুক। ওই সময় অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে—হজরত আবু আমের আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম 'মান দ্বাল্লা' (যে পথভ্রষ্ট হয়েছে) কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বলেছিলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী (পথভ্রষ্ট)। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকো।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'মান দ্বাল্লা' অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টান। অতএব, হে মুসলিম বৃন্দ! যদি তোমরা সত্য ধর্মে সুদৃঢ় হও, তবে ইহুদী, খৃষ্টানেরা তোমাদের কোনো অপকার করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা তাদের নিকট থেকে জিজিয়া (কর) আদায় করো এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও।

কোনো কোনো আলেমের বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা বলতেন, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে নির্বোধ ভেবেছো। এ রকম অপকথন শুনে তাঁরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হতেন। মনে মনে চাইতেন, অজ্ঞ অবিশ্বাসীদের যদি বোধোদয় হতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

'আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য'—এ কথার অর্থ এ নয় যে, সৎ কর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের নিষেধের দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে হবে। বন্ধ রাখতে হবে সত্য ধর্মের প্রচার। সৎ কর্মের আদেশ এবং অসৎকর্মের নিষেধের কথা 'ইহতাদা' (যদি তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হও) কথাটিতেই রয়েছে।

হজরত আবু বকর বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করো, কিন্তু এর অর্থ বুঝতে ভুল করো। আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, যদি মানুষ মন্দ কর্ম থেকে নিজে সংশোধিত না হয় (অথবা অন্যকে সংশোধনের চেষ্টা না করে) তবে এ রকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক সৎ অসৎ নির্বিশেষে সকলকেই শাস্তি দান করবেন। ইবনে মাজা, তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, যদি মানুষ অনাচার দেখেও অনাচারীকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ্পাকের শাস্তি সকলের উপর নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ যদি অত্যাচারীকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ্তায়ালা তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, যদি কোনো সমাজের সংখ্যালঘুরা

পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদেরকে নিবৃত্ত করতে উদ্যোগী না হয়, তবে সর্বসাধারণের উপর নেমে আসতে পারে আল্লাহ্‌র আযাব। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে, মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশনা দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে প্রয়াসী হও। যদি এমন না করো তবে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে খারাপ লোকদের অধীন করে দিবেন এবং খারাপ মানুষেরা তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তিতে নিক্ষেপ করবে। তখন তোমাদের পুণ্যবানদের প্রার্থনাও গৃহীত হবে না।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা সৎ কর্মের নির্দেশনা দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের কথা মান্য করে। যখন মানুষ তোমাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করবে, তখন তোমরা নিজেরা সংশোধিত হও। কোরআন মজীদের কিছু কিছু ঘটনা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু কিছু ঘটেছে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে। কিছু কিছু ঘটতে চলেছে নিকট ভবিষ্যতে, আবার কিছু কিছু ঘটবে দূর ভবিষ্যতে। যেমন —শেষ জামানায় এবং কিয়ামতের দিন। সুতরাং তোমরা পরস্পরের সঙ্গে শক্রতা সৃষ্টি কোরো না। একে অপরকে আক্রমণ কোরো না। তোমরা উত্তম কর্মের নির্দেশ দিতে থাকো। আর নিষেধ করতে থাকো অনুত্তম কর্মের। এর পরেও যদি মানুষ সীমালংঘন করে তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তোমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তোমরা কেবল আত্মসংশোধন কর্মে ব্রতী হয়ো। ওই সময়ের সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক। ওই পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই আয়াতে বলা হয়েছে— আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য। বায়হাকীর শো'বুল ইমানে আবুল আলিয়া সূত্রে এবং ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে— উল্লিখিত বর্ণনাটিকে সকলে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন।

তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু ছা'লাবা খাশানী বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রসুল স.এর নিকটে এই আয়াতের মর্মার্থ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকম নয় যে, তোমরা সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্বকে বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। বরং এই আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে— তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাকো এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করতে থাকো এবং নিজেও বিরত থাকো। কিন্তু যখন দেখবে মানুষ কুপ্রবৃত্তির ক্রীতদাস, স্বেচ্ছাচারিতার অনুগামী, দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী এবং যখন দেখবে মানুষ তাদের অসৎ চিন্তাকে সঠিক মনে করে, তোমাকেও তাদের চিন্তানুসারী হতে বাধ্য করে—তখন কেবল আত্মসংশোধন কর্মে ব্যাপৃত থেকো, সর্বসাধারণের সংশোধন চিন্তা পরিত্যাগ কোরো। প্রকৃত কথা এই যে, সামনে

রয়েছে চরম দুঃসময়। হাতের মুঠোয় আগুন রাখা যেমন কঠিন, তখন ধৈর্য রক্ষা করাও হবে তেমনি কঠিন। ওই সময়ের একজনের পুণ্যকর্ম হবে পঞ্চাশ জনের পুণ্য কর্মের সমান। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তখন তাহলে একজনের পুণ্য কর্ম হবে তখনকার পঞ্চাশ জনের পুণ্য কর্মের সমান? তিনি স. বললেন, না। তোমাদের পঞ্চাশজনের সমান।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, বেদাতী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইমাম আবু জাফর রাজী বলেছেন, হজরত সাফওয়ান বিন মাহ্‌রাজের সামনে এক বেদাতী যুবক অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করলো। হজরত সাফওয়ান বললেন, আমি তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নির্দেশনার কথা বলি শোনো, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়জনদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন 'হে বিশ্বাসীরা! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোমরা যদি শুভ পথে পরিচালিত হও তবে যে পথচ্যুত হয়েছে সে তোমাদের কোনো অপকার করতে পারবে না।

'আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' — এ কথার অর্থ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেয়া হবে। একের অপরাধে অন্যকে অভিযুক্ত করা হবে না। পথচ্যুত এবং পথপ্রাপ্ত উভয়ের জন্য রয়েছে এখানে শাস্তি ও শান্তির অঙ্গীকার।

বাগবীর বর্ণনায় এবং বোখারী, আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তামীমদারী এবং আদী বিন বদর ছিলো খৃষ্টান। তাদের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন হজরত আমর বিন আসের মুক্ত করা ক্রীতদাস বুদাইল। তিনি ছিলেন মুসলমান। সিরিয়ায় পৌছে বুদাইল পীড়িত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অতি সন্নিকটে। তিনি তখন তাঁর নিজের পণ্যসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁর মালমাত্তার সঙ্গে রেখে দিলেন। সাথীদ্বয়কে তালিকার কথা জানালেন না। শুধু অসিয়ত করলেন, তোমরা আমার মালমাত্তাগুলো আমার বাড়ীতে পৌছে দিও। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলেন তিনি। সাথীদ্বয় খোঁজাখুঁজি করে তাঁর মালপত্রের মধ্যে পেলো একটি তিনশত মিশকাল ওজনের রৌপ্যনির্মিত পাত্র। তারা কৌটাটি আত্মসাৎ করলো। ব্যবসা শেষ করে মদীনায় ফিরে এসে তারা বুদাইলের বাড়ীতে তাঁর জিনিসপত্রগুলো পৌছে দিলো। বুদাইলের স্ত্রী ওই জিনিসপত্রের মধ্যে পেলেন একটি তালিকা। তিনি তামীম ও আদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্বামী কি তার কোনো জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করেছে? তারা বললো, না। বুদাইলের স্ত্রী পুনরায় বললেন, তিনি কি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন? তাঁর চিকিৎসার জন্য তোমাদেরকে কি কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে? তারা বললো, না। বুদাইলের স্ত্রী বললেন, আমি

আমার স্বামীর পণ্যসামগ্রীর মধ্যে একটি লিখিত তালিকা পেয়েছি। তালিকার সকল সামগ্রী এখানে রয়েছে। কিন্তু তালিকায় লিপিবদ্ধ ওই রৌপ্যপাত্রটি আমি পাচ্ছি না, যা ছিলো স্বর্ণখচিত। ওজন ছিলো তিনশত মিশকাল। তারা বললো, এ কথা আমাদের জানা নেই। সে বলেছিলো তার জিনিসপত্রগুলো যেনো আমরা বাড়ীতে পৌঁছে দেই। আমরা তাই জিনিসপত্রগুলো পৌঁছে দিলাম। কিন্তু রূপার পাত্রটির কথা আমরা জানি না। এ ঘটনা সম্পর্কে রসুল স. এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হলে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৬

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগের কাহারও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদিগের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদিগের ছাড়া অন্য লোকদিগের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে। তোমাদিগের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহের সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

মৃত্যু পথযাত্রীদের অসিয়ত সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, অন্তিম যাত্রার সময় কেউ অসিয়ত করতে চাইলে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে। 'শাহাদাতু বাইনিকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) এখানে উদ্দেশ্য (মুবতাদা)। আর 'ইছনান' হচ্ছে বিধেয়। ইছনান (দু'জন) শব্দটির পূর্বে শাহাদাত (সাক্ষ্যপ্রমাণ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। অসিয়ত সম্পর্কীয় এই

নির্দেশনাটি শব্দগত দিক থেকে বিজ্ঞপ্তিসূচক (জুমলায়ে খবরিয়াহ্)। আর অর্থগত দিক থেকে নির্দেশসূচক। বক্তব্য বিষয় এই যে, অসিয়তের সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'ইছনান' শব্দটি শাহাদাত এর কর্তা (ফায়েল)। শাহাদাত এখানে উদ্দেশ্য এবং এর প্রথমে বিধেয়টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু পথ যাত্রী ব্যক্তি যে বিষয়ে অসিয়ত করতে চায়, তার উপর দু'জনকে সাক্ষী হতে হবে। শাহাদাত অর্থ সাক্ষী নির্বাচন। দু'জন লোককে ডেকে নিয়ে তাদের সম্মুখে মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছু বলতে পারে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এরকমই বুঝা যায়। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, 'ওয়াল ইয়াশহাদ আজাবাহুমা তইফাতুম মিনাল মু'মিনীন'(মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে)।

সাক্ষী হিসেবে দু'জন লোককে নির্বাচন করার বিষয়টি ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, অসিয়ত করার সময় একজন সাক্ষীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

'ইজা হাদ্বারা' (যখন উপস্থিত হয়) কথাটি শাহাদাত এর জরফে জামান (কালাধিকরণ কারক)। অর্থাৎ যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। এখানে বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর সময় অসিয়তকে গুরুত্বহীন মনে করে পরিত্যাগ করা যাবে না। মৃত্যুর সময়ই অসিয়তের প্রকৃষ্ট সময়।

'জাওয়া আদলিম্ মিনকুম' অর্থ— তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান। ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টিকে এখানে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এরপরে বলা হয়েছে, সফররত অবস্থায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে অমুসলমানদের মধ্যেও দু'জন সাক্ষী নির্বাচন করা যাবে। তখন ওই সাক্ষীদ্বয়কে অসী (যাকে অসিয়ত করা হয়েছে) বানিয়ে সম্পদ দিয়ে দেয়া যাবে। অসীদ্বয় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে প্রদত্ত সম্পদ পৌছিয়ে দেবে। এমতোক্ষেত্রে অসীদ্বয় বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে। সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে। অথবা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সন্দেহও করতে পারে। তাই এর পর বলা হয়েছে, 'তোমাদের সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে অপেক্ষমান রাখবে।' এখানে 'মিমবা'দিস্ সলাত' (নামাজের পর) অর্থ আসরের নামাজের পর। কেননা আসরের পর অধিক লোক সমাগম হয়। ওই সময় দায়িত্ব আদান প্রদানের নিমিত্তে দিবস ও রজনীর ফেরেশতাবৃন্দও একত্র হয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে নামাজের পর অর্থ—যে কোনো ওয়াক্তের নামাজের পর।

যাদের প্রতি সন্দেহ করা হয়েছে তারা নামাজের পর সমবেত জনতার উপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না, যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে আমরা হবো পাপীষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাধিকারীরা সন্দেহ করলেই কেবল অসীদ্বয় জনসমক্ষে এ রকম শপথ বাক্য উচ্চারণ করবে। উত্তরাধিকারীরা সন্দেহ না করলে এ রকম শপথের কোনো প্রয়োজনই নেই। এ রকম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন কাযী বা বিচারক।

'এর বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না'—একথার অর্থ, আমরা লোভে পড়ে মিথ্যা শপথ করবো না। আর 'যদি সে আত্মীয়ও হয়'—এ কথার অর্থ অসী মৃত ব্যক্তির নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সন্দেহ করে বসে, তবুও তাকে শপথ করাতে হবে। সন্দেহের ক্ষেত্রে পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে একই বিধান প্রযোজ্য।

'শাহাদাতাল্লহ' অর্থ ওই সাক্ষ্য যা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌পাক। সাক্ষ্য অর্থ সত্য সাক্ষ্য। নিজের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যকে সত্যরূপে প্রকাশ করতে হবে।

'শাহাদাতাল্লহ ইন্না ইজাল্ লামিনাল আছিমিন' অর্থ 'আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করবো না, করলে আমরা হবো পাপীষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।'

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আসরের নামাজ শেষে তামীম ও আদীকে ডেকে মিম্বারের কাছে নিয়ে এসে শপথ করালেন এভাবে—বলো, ওই আল্লাহ্‌র শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, আমরা বুদাইলের প্রদত্ত সামগ্রী আত্মসাৎ করিনি। এভাবে শপথ করানোর পর রসুল স. তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘ দিন পর আত্মসাৎকৃত একটি পাত্র তাদের কাছে পাওয়া গিয়েছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে, হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, কথিত পাত্রটি পাওয়া গিয়েছিলো মক্কায়। যাদের কাছে পাওয়া গিয়েছিলো তারা বলেছিলো, পাত্রটি আমরা ক্রয় করেছি তামীম ও আদীর কাছ থেকে। সংবাদটি বনী সাহমের নিকট পৌঁছানো হলো। সে তখন তামীম ও আদীর কাছে গেলো। তামীম ও আদী বললো, আমরা পাত্রটি ক্রয় করেছিলাম বুদাইলের নিকট থেকে। বনী সাহম বললো, তোমরা তো আগেই বলেছিলে যে, বুদাইল কোনো কিছু বিক্রয় করেনি। তখন তারা বললো, বুদাইল যে বিক্রয় করেনি তার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমরা তাই কথাটিকে গোপন করাই উত্তম মনে করেছিলাম। এ কথা শুনে বনী সাহম মহানবী স. এর দরবারে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

❒ যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদিগের স্থলবর্তী হইবে এবং আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদিগের হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই, করিলে আমরা জালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

এখানে বলা হয়েছে, পরে যদি জানা যায় অসীদ্বয় প্রকৃতপক্ষে আত্মসাৎকারী এবং আত্মসাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্তে তারা মিথ্যা কসম করেছে, তবে পাল্টা কসমের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাতে হবে দু'জনকে। অর্থাৎ যে সকল উত্তরাধিকারীর স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জনকে মিথ্যা শপথকারীদের স্থলবর্তী করতে হবে। পাল্টা সাক্ষ্য হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে 'তাদের চেয়ে আমাদের সাক্ষ্যই অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করিনি, করলে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দু'জন পাল্টা সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে এজন্য যে, তারা দাবিদার। আর শরিয়তও তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। সুতরাং তাদেরকেই শপথ করে বলতে হবে যে, অসীদ্বয়ের কৃত শপথ মিথ্যা। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেই ঘটনায় দাবিদার ছিলো দু'জন। তাই আয়াতে 'নিকটতম দু'জন' এ রকম বলা হয়েছে। দাবিদার যদি একজন হয়, তবে একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'য়ের অধিক দাবিদার থাকাও সম্ভব। তখন তাদের পক্ষ থেকে দু'জনকে নির্বাচন করতে হবে। তারাই শপথ করে বলবে যে, অসীদ্বয়ের কৃত শপথ মিথ্যা। শপথকারীদ্বয়কে হতে হবে আত্মীয়তার দিক থেকে নিকটতম। নিকটতম বুঝাতে এখানে 'আওলাইয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, হুমাল আওলাইয়ান (তাদের মধ্য থেকে নিকটতম দু'জন)।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশানুসারে বলতে হয়, হারিয়ে যাওয়া পাত্রটি ক্রয় করার মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দাবিদারদের দু'জন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে এভাবে—ওই অসীদ্বয়ের শপথের চেয়ে আমাদের শপথ অধিক

গ্রহণযোগ্য। আর শপথের ক্ষেত্রে আমরা সীমালংঘনকারীও নই। যদি আমরা সত্যবিচ্যুত হই, তবে আমরা অবশ্যই হয়ে যাবো মিথ্যাচারী। এখানে শাহাদাত অর্থ শপথ। অপর এক আয়াতে এসেছে 'ফা শাহাদাতু আহাদিহিম আর বাউ' শাহাদাতিম বিল্লাহি ইন্নাহু লামিনাস্ সদিক্বীন' (তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ রকম হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে বার বার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী)।

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর বুদাইল সাহামীর নিকটাত্মীয়ের মধ্যে দু'জন শপথ করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলো। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আমর বিন আস এবং তাঁর সঙ্গে একজন বা দু'জন দাঁড়িয়ে কসম খেলেন। বাগবী লিখেছেন, শপথকারীর নাম ছিলো মতলব বিন ওয়াদায়াহ্ সাহামী। তিনি কসম করেছিলেন আসরের নামাজের পর। পূর্বাহ্নে তার বিরুদ্ধবাদী দুই শপথকারী সম্ভবত এই মর্মে কসম খেয়েছিলো যে, কথিত পাত্রটি বিক্রয় করার কথা আমাদের জানা নেই। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি একটি হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু হাদিস বিশারদগণ সেটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তামীমে দারী উল্লেখ করেছেন, আদী বিন বাদা এবং আমি ছিলাম খৃষ্টান। বাণিজ্য ব্যপদেশে আমরা সিরিয়ায় গমনাগমন করতাম। একবার আমাদের সঙ্গে বনী সাহমের এক মুক্ত ক্রীতদাস কিছু পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গেলো। তার নাম ছিলো বুদাইল বিন আবী মারিয়াম। সেখানে গিয়ে সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থতা বেড়েই চললো তার। সে বুঝলো, অন্তিম যাত্রার সময় সমুপস্থিত। আমাদেরকে সে এই মর্মে অসিয়ত করলো, তোমরা আমার সম্পদগুলো আমার বাড়ীতে পৌছে দিও। এ কথা বলে সে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। আমরা দেখলাম, তার সম্পদের মধ্যে রয়েছে একটি রূপার পাত্র। পাত্রটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে আমরা দু'জন সমানভাগে ভাগ করে নিলাম। বাকী সম্পদগুলো পৌছে দিলাম তার বাড়ীতে। ওগুলোর মধ্যে ছিলো তার সম্পদের একটি লিখিত তালিকা। তালিকাটি দেখে তার স্ত্রী বললো, সব ঠিকই আছে। কিন্তু রূপার পাত্রটি তো নেই। আমরা বললাম, আমরা যা পেয়েছি সবই দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরে যখন আমি মুসলমান হলাম তখন পাপবোধ জাগ্রত হলো আমার। আমি বুদাইলের স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানালাম এবং পাত্র বিক্রয়ের পাঁচশত দিরহামও তাকে দিয়ে দিলাম। আরো বললাম, আর পাঁচশত দিরহাম রয়েছে আমার সঙ্গীর কাছে। লোকেরা তখন আমার সেই বাণিজ্যসঙ্গীকে নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলো। রসুল স. তার বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী পেলেন না। তাই তিনি আদীকে কসম করতে বললেন। আদী কসম করলো। তখন অবতীর্ণ হলো ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু শাহাদাতু বাইনাকুম.......বা'দা আইমানিহিম পর্যন্ত (১০৬ থেকে ১০৮ আয়াত পর্যন্ত)।

আদীর মিথ্যা কসমের বিরুদ্ধে তখন হজরত আমর বিন আস এবং আর একজন সত্য কসম উচ্চারণ করলেন। এই সত্য কসমের প্রেক্ষিতে আদীর নিকট থেকে আদায় করা হলো পাঁচশত দিরহাম।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৮

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

❒ এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ের। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর; আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

এই আয়াতে জানানো হয়েছে, এভাবে মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে সত্য শপথ করানোর বিধান হয়তো মিথ্যা কসমকারীদেরকে ভীত করবে। সুতরাং এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় মিথ্যাবাদীরা হয়তো অনন্যোপায় হয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে ফেলবে। এখানেও শাহাদাত অর্থ সত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যে অসিয়ত করে গিয়েছেন তা যথাযথরূপে বর্ণনা করা। 'আলা ওয়াজহিহা'—কথাটির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত হুবহু বর্ণনা করার কথাটি বলে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে ওয়াত্তাকুল্লহ্ (আল্লাহ্কে ভয় করো)। কথাটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য বাক্যের সঙ্গে। উহ্য বাক্যটি হচ্ছে—আল্লাহ্র নির্দেশের অনুসরণ করো। এভাবে পূর্ণ বাক্যটি হবে এ রকম, আল্লাহ্পাকের নির্দেশানুসারী হও এবং আল্লাহ্কে ভয় করো।

'ওয়াস্মায়ু' অর্থ— এবং শ্রবণ করো। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন তা আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রবণ করো।

শেষে বলা হয়েছে ওয়াল্লহু লা ইয়াহ্দিল ক্বওমাল ফাসিক্বীন (আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না)। একথার অর্থ 'আল্লাহ্কে ভয় করো এবং শোন'—এ নির্দেশটি যদি তোমরা না মানো, তবে তোমরা হয়ে যাবে আল্লাহ্র আনুগত্যচ্যুত। এভাবে যারা আল্লাহ্র আনুগত্যের সীমানা থেকে বের হয়ে যায়, আল্লাহ্পাক তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। পৃথিবীতে কোনো দলিল প্রমাণ যেমন তাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করতে পারবে না, তেমনি পরকালেও তারা হারিয়ে ফেলবে জান্নাতের পথ।

আয়াতের শানে নুজুলের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছি। এভাবে ব্যাখ্যা করলে আয়াতের কোনো বাক্যকে মানসুখ (রহিত) বলার প্রয়োজন হবে না। কেননা উত্তরাধিকারীদের দাবি যদি অসী প্রত্যাখ্যান করে বসে, তবে তার বিরুদ্ধে সত্য শপথের প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অসী যদি মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে কোনো সম্পদ ক্রয় করেছে বলে দাবি করে, আর উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীরা যদি তা স্বীকার না করে, তবে উত্তরাধিকারীদেরকেই প্রথমে শপথ করাতে হবে। এটাই আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত। কেননা সুরা মায়িদার কোনো আয়াত রহিত হয়নি।

হাসান, দাউদ জাহেরী, এবং ইকরামা এই আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেছেন এরকম—মৃত্যুর পূর্বে কেউ যদি অসিয়ত করে যেতে চায়, তবে সে দু'জন লোককে সাক্ষী নির্ধারণ করবে। যেনো তারা যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে, তার পক্ষে বিচারকের সামনে গিয়ে সাক্ষী দিতে পারে।

'আমরা তার বিনিময়ে কোনো মূল্য গ্রহণ করবো না, যদি সে আত্মীয়ও হয়'—পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৭) এই বাক্যটিই এর প্রমাণ। অর্থাৎ সাক্ষী বলবে, যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে যদিও আমার নিকটজন, তথাপি আমি কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত সম্পদের অসিয়তের সাক্ষ্য দিবো না। এ অবস্থায় 'তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক'— পূর্ববর্তী আয়াতের (১০৬) এই বাক্যটির অর্থ হবে—দু'জন সাক্ষী মৃত্যুপথযাত্রী অসিয়তকারীর বংশ থেকেও হতে পারবে, আবার অন্য গোত্র থেকেও হতে পারবে।

মাসআলাঃ মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। মাসআলাটি সর্বজনসমর্থিত। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকার—এমন কি হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু মুসা আশআরী, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, ইব্রাহিম নাখয়ী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ এবং উবাইদা এই আয়াতের 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) শব্দটির অর্থ করেছেন—মুসলমানদের মধ্য থেকে এবং 'মিন গইরিকুম'(অন্য লোকদের মধ্য থেকে) শব্দটির অর্থ করেছেন—বিধর্মীদের মধ্য থেকে। তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের বিষয়ে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আবার ইব্রাহিম নাখয়ী এবং অন্যান্য আলেমগণ 'মিন গইরিকুম' শব্দ সংবলিত আয়াতকে (১০৬) রহিত বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের জন্য কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিলো। পরে নির্দেশটি রহিত হয়েছে। এখন আর মুসলমান সম্পর্কে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য আলেমের অভিমত হচ্ছে আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যানুসারে মুসলমান সাক্ষী না পাওয়া গেলে কাফেরকে সাক্ষী বানানো সিদ্ধ।

কাযী শোরাইহ্ বলেছেন, ভ্রমণকালে মুসলমান সাক্ষী না পাওয়া গেলে কাফেরকে সাক্ষী বানানো যাবে। কিন্তু বিধানটি কেবল অসিয়তের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্য কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য কাফেরের সাক্ষ্য সিদ্ধ নয়।

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেছেন, দাকুকা নামক স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলো। সে তখন অসিয়ত করতে চাইলো। কিন্তু অসী হিসেবে কোনো মুসলমানকে পেলো না। অগত্যা সে দু'জন আহলে কিতাবকে সাক্ষী বানালো। তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে সাক্ষী দু'জন উপস্থিত হলো কুফায়। সেখানে তারা হজরত আবু মুসা আশআরীর দরবারে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির সম্পদ হস্তান্তর করলো। হজরত আবু মুসা আশআরী বললেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর মহাতিরোধানের পর এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি। এরপর তিনি অসী দু'জনকে শপথ করালেন এবং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী নির্দেশ কার্যকর করলেন।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতকে যদি মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াত বলে মেনে নেয়া হয়, আর যদি কোনো কারণবশতঃ অমুসলিমের শপথে মিথ্যাচার রয়েছে বলে সন্দেহ হয়, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকট থেকে এইমর্মে শপথ গ্রহণ করাতে হবে যে, এই অমুসলিম লোক দু'টি অসত্য সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১০৯

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۗ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

❒ স্মরণ কর, যে-দিন আল্লাহ্ রসূলদিগকে একত্র করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমরা কি সাড়া পাইয়াছিলে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের তো কোন জ্ঞান নাই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।'

'যে দিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন'— কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' কথাটির সঙ্গে। এভাবে এখানে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ নবীদেরকে একত্র করবেন, সেদিন তিনি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে জান্নাতের পথ দেখাবেন না। অথবা পূর্বের আয়াতের 'ওয়াত্তাকুল্লহ্' (আল্লাহ্‌কে ভয় করো) কথাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে 'যে দিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন' কথাটি। যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম — ওই কিয়ামত দিবসকে ভয় করো, যে দিবসে আল্লাহ্ একত্র করবেন রসুলগণকে। কিংবা এর সম্পর্ক রয়েছে

‘ওয়াস্‌মায়ু’ (এবং শ্রবণ করো) এর সঙ্গে। এভাবে অর্থ হবে—শ্রবণ করো কিয়ামতের দিবসের সংবাদ— যে দিবসে আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্র করবেন।

‘এবং জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?’ এ কথার অর্থ—আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলগণকে সেদিন মৃদু তিরস্কার করে এ রকম প্রশ্ন করবেন। ওই সকল রসুলগণের অবাধ্য উম্মতদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্পাক এ রকম বলবেন। এ রকম প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন—‘মৃত্তিকায় জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছে?’ এ রকম প্রশ্ন করা হবে মৃত্তিকা প্রোথিত কন্যা সন্তানকে অভিযুক্ত করার জন্য নয়। হত্যাকারীই এখানে অভিযোগের লক্ষ্য। তেমনি ‘তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে’ প্রশ্নটির মাধ্যমে রসুলগণের অবাধ্য উম্মতের প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহ্পাকের প্রবল ক্রোধ। ওই ক্রোধদীর্ণ ভয়াবহ দিবসে আল্লাহ্পাকের প্রিয় রসুলগণও হতবিহ্বল হয়ে পড়বেন। আল্লাহ্পাকের জালাল (রোষ) দর্শনে তাই তাঁরা তখন বলে উঠবেন, ‘আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই।’

হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, মুজাহিদ এবং সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দর্শনে আল্লাহ্র প্রিয় নবী রসুলগণও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ্পাকের রোষতপ্ত প্রশ্নের জবাবে তাই তাঁরা তখন বলবেন, আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই। তারপর যখন তাঁদের চৈতন্যোদয় হবে, তখন তাঁরা তাঁদের আপন আপন উম্মত সম্পর্কে যথাসাক্ষ্য প্রদান করবেন।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ‘আমাদেরতো কোনো জ্ঞান নেই’ কথাটির অর্থ—রসুলগণ তখন বলবেন, আমরা জানিনা, আমাদের পৃথিবী পরিত্যাগের পর আমাদের উম্মতের কী পরিণাম হয়েছিলো। তাদের অন্তরের লালিত ধারণা এবং প্রদত্ত ধর্মাদর্শের কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি তারা করেছে— সে সম্পর্কে আমরা সত্যিই কিছু জানি না।

শেষে বলা হয়েছে —‘ইন্নাকা আংতা আল্লামুল গুয়ুব’ (তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত)। এ কথার অর্থ— হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখিনা, সে সকল বিষয়ও আপনার জ্ঞানের অধীন। আমরাতো কেবল ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদেরকে জানতে দিয়েছেন।

ক্বারী আবু বকর এবং ক্বারী হামযা পবিত্র কোরআনের সকল স্থানের ‘গুয়ুব’ শব্দটি পড়েছেন, গিয়ুব (গইন অক্ষরের নিচে যের সহযোগে)। অন্য ক্বারীগণ ‘গইন’ অক্ষরে পেশ সহযোগে পড়েছেন ‘গুয়ুব’ (যেমন এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে)।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন (কিয়ামতের দিন) হাউজে কাওসারের সন্নিকটে কিছু লোক আসতে চেষ্টা করবে। আমিও তাদেরকে চিনতে পারবো। আমার পিছন দিক থেকে তাদেরকে রূখে দেয়া হবে।

তখন বলা হবে, আপনার জানা নেই, এ সকল লোক আপনার তিরোধানের পরে ধর্মাদর্শের মধ্যে কি কি নতুন প্রথা উদ্ভাবন করেছিলো। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও অন্যান্য ইমামগণ।

অন্য একটি আয়াত আলোচ্য আয়াতটির সমপ্রকৃতির। ওই আয়াতে হজরত ঈসার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততোদিন ছিলাম আমি তাদের প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর যখন আপনি আমাকে আপনার সন্নিধানে নিয়ে এলেন, তখন থেকে আপনিই তো তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ক।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই'—কথাটির অর্থ, তুমি যতোটুকু দিয়েছো ততোটুকুই আমাদের জ্ঞান। আর সে জ্ঞান তোমার মহাজ্ঞানের তুলনায় জ্ঞানহীনতারই নামান্তর। তাই প্রকৃত অর্থে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমার অপরিসীম জ্ঞানের তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে জ্ঞানই বলা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— এ বিষয়টি প্রকাশ করা যে, যে সকল বিষয়ে তুমি অধিক জ্ঞাত সে সকল বিষয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করার মধ্যে কী অপার রহস্য নিহিত রয়েছে—আমরা তা জানি না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১০

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ
أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ
ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ
ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ
بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ
جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

❒ আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত

কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী-ইস্‌রাইলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম। তুমি যখন তাহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা তো স্পষ্ট যাদু!'

এই আয়াতের 'আল্লাহ্ বলবেন' কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' কথাটির সঙ্গে। অবাধ্য উম্মতদেরকে তিরস্কারের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি প্রেরিত নবী রসুলদেরকে আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন 'তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে?' ওই অবাধ্যদের কেউ কেউ তাদের আপনাপন নবী রসুলদের মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করেছিলো। কেউ কেউ বলেছিলো, ওগুলো তো যাদু। আবার কেউ কেউ মোজেজা দর্শনে অতি অভিভূত হয়ে নবী রসুলগণকে উপাস্য ভেবে নিয়েছিলো। আল্লাহ্পাক তাই ওই অলৌকিক নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করবেন। আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে হজরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত অলৌকিক নিদর্শনসমূহের কথা।

আয়াতের বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবে—আল্লাহ্ বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করোঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম। অনুগ্রহ বুঝাতে এখানে 'নি' মাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এক বচন। কিন্তু এর অর্থ হবে বহু বচনের। অর্থাৎ এখানে অনুগ্রহ অর্থ হবে অনুগ্রহরাজি।

'তোমার জননী' অর্থ হজরত ঈসার মাতা হজরত মরিয়ম। আল্লাহ্পাক তাঁকে পবিত্র করেছেন এবং রমণীকুলের মধ্যে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দান করেছেন। হাসান বলেছেন, এখানে 'অনুগ্রহ স্মরণ করো' কথাটির অর্থ অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 'পবিত্র আত্মা' (রুহুল কুদুস্) অর্থ হজরত জিবরাইল।

'এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে।'— এ কথার অর্থ যখন তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখনও তুমি পূর্ণ ও পরিণত মানুষের মতো বিজ্ঞজনোচিত কথা বলেছো। কেউ কেউ বলেছেন, পরিণত বয়সে পৌঁছার আগেই আল্লাহ্পাক হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। আকাশারোহনের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো তেত্রিশ বছর। তাই পরিণত বয়স হবে তখনই যখন তিনি পুনরায় আকাশ থেকে নেমে আসবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসাকে আল্লাহ্পাক তিরিশ বছর বয়সে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিরিশ মাস যাবৎ তিনি এই মহান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারপর আল্লাহ্পাক তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

কোনো কোনো বিজ্ঞজন এমতো উক্তি করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে (মধ্যম বয়সে) হজরত ঈসার কথা যে হুবহু এক রকম তা প্রমাণিত হয় না। বরং বলা যেতে পারে, ওই দুই অবস্থায় কথার মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তাই ওই দুই বয়সের এক রকম কথার উল্লেখ করে এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তাঁর পরিণত বয়সের কথা হবে আকাশ থেকে নেমে আসার পর।

'তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম।' এ কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক দিয়েছিলেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা।

এরপর উল্লেখিত হয়েছে হজরত ঈসার প্রতি প্রদত্ত আরো কয়েকটি অলৌকিক নিদর্শনের কথা। যেমন 'তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করতে এবং ওতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার নির্দেশক্রমে তা জীবিত পাখি হয়ে যেতো; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার নির্দেশক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার নির্দেশক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করতে।'

'আমি তোমা হতে বনী ইসরাইলকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম।' এ কথার অর্থ তোমার অলৌকিক নিদর্শনসমূহ দর্শনে হিংসার অনলে দগ্ধীভূত যে সকল ইহুদী তোমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো, তাদের জিঘাংসা ও হিংসানল থেকে আমি তোমাকে নিরাপদ রেখেছিলাম। তাদেরকে নিরাশায় নিমজ্জিত করে আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়েছিলাম আকাশে।

সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা নবী রসুলগণের সুস্পষ্ট নিদর্শন (মোজেজা) অস্বীকার করে থাকে। কেউ কেউ অবজ্ঞা ভরে বলে, এটা তো স্পষ্ট যাদু। অভিশপ্ত ইহুদীরাও হজরত ঈসার অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে মূল্যহীন মনে করেছিলো। সে কথাই আয়াতের শেষে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে, তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী তারা বলেছিলো, এটা তো স্পষ্ট যাদু!'

'ইল্লা সিহ্রুম্ মুবিন' অর্থ—এটা তো স্পষ্ট যাদু। ক্বারী হামজা ও ক্বারী কাসায়ী সুরা হুদ এবং সুরা সফে উল্লেখিত 'ইল্লা সিহ্রুন' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইল্লা সাহিরুন'। আলোচ্য আয়াতে 'সিহ্রুন' বা 'সাহিরুন' এর সম্পর্ক হজরত ঈসার সঙ্গে। আর সুরা হুদের 'সিহ্রুন' বা যাদুর সম্পর্ক রয়েছে রসুল পাক স. এর সঙ্গে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১১

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ○

❒ আরও স্মরণ কর, আমি যখন 'হাওয়ারী' দিগকে এই প্রেরণা দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা বিশ্বাস করিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পণকারী।'

পূর্ববর্তী আয়াতের মতো এই আয়াতেও হজরত ঈসার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে—আমি যখন হাওয়ারীদেরকে এ অনুপ্রেরণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এখানে 'ওয়া ইজ আওহাইতু ইলাল্ হাওয়ারিইন' (হাওয়ারীদেরকে এই অনুপ্রেরণা দিয়েছিলাম) কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ইজ কাফাফ্তু' এর সঙ্গে অর্থাৎ 'তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলে' কথাটির সঙ্গে। এখানে 'আওহা' (ওহী) শব্দটির অর্থ অন্তরে স্থাপিত প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা। এ রকম বলেছেন আবদ বিন হুমাইদ, হজরত কাতাদা থেকে এবং আবু শায়েখ, সুদ্দী থেকে। অন্যান্য আলেম বলেছেন, এখানে ওহী অর্থ হজরত ঈসার প্রতি প্রেরিত মৌখিক নির্দেশ।

'আন আমিনু বি ওয়া বিরসুলি'—কথাটির অর্থ তোমরা আমার প্রতি ও আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাওয়ারীগণ (হজরত ঈসার সহচরবৃন্দ) বলেছিলেন, 'ওয়াশ্হাদ্ বি আন্নানা মুসলিমুন।' কথাটির অর্থ— আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১২

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

❒ স্মরণ কর, 'হাওয়ারী'গণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদিগের জন্য আস্‌মান হইতে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম?' সে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

'ইজ ক্বালাল হাওয়ারিইয়ুনা ইয়া ঈসাব্‌না মারইয়ামা হাল ইয়াস্‌তাতীয়ু রব্বুকা'— এ কথার অর্থ হাওয়ারীগণ বলেছিলো, হে মরিয়ম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি সক্ষম? অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কি আমাদের নিবেদন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম? 'ইস্‌তাতায়াত' অর্থ এখানে মেনে নেয়া অথবা নিবেদনানুসারে কার্য সম্পাদন করা। যেমন 'ইস্‌তিজাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয় আজাবা অর্থে। তাই 'ফাস্‌তাজাবা লাহুম' অর্থ আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। ইবনে আবী হাতেম আমের—শা'বী সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হজরত আলী 'হাল ইয়াস্‌তাতিয়ু রব্বুকা' পাঠ করার পর বলেছেন, এর অর্থ হবে 'হাল ইউতিয়ু রব্বুকা।' আছার গ্রন্থে এসেছে— 'মান আতায়াল্লহা আতায়াহু'— কথাটির অর্থ, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে আল্লাহ্ তার আবেদন মঞ্জুর করে নেন। ক্বারী কাসায়ীর ক্বেরাতে এসেছে 'হাল তাস্‌তাতিয়ু রব্বুকা।' সম্বোধনটি করা হয়েছে হজরত ঈসাকে। অর্থাৎ এখানে বক্তব্য হচ্ছে— হে ঈসা, আপনার প্রভুর কাছে এই আবেদন জানাবেন আপনার জন্য এ রকম আবেদন জানাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এবং আপনার প্রভু আপনার আবেদন গ্রহণ করবেন। হজরত আলী, হজরত আয়েশা, হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ এই উচ্চারণরীতিটিকেই গ্রহণ করেছেন। হাকেম এবং হজরত মুআজ ইবনে জাবালও এই ক্বেরাতের সমর্থক। এই উচ্চারণরীতি অনুসারে 'ইয়াস্‌তাতিয়ু' অর্থ হয় 'ইয়াতিয়ু।'

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হাওয়ারীগণ আল্লাহ্‌তায়ালার মহান মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই 'আল্লাহ্‌পাক কি সক্ষম' কথাটির মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ্‌র সক্ষমতা এবং হজরত ঈসার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেননি— এ রকম বলেছেন ইবনে আবী শায়বা, আবু শায়েখ প্রমুখ।

হজরত আয়েশার ক্বেরাতে এসেছে—'তাস্‌তাতিয়ু রব্বাকা।' তিনি ইয়াস্‌তাতিয়ু' রব্বুকা পড়েননি। অর্থাৎ তাঁর ক্বেরাত অনুসারে অর্থ হয়— হজরত ঈসা কি তাঁর প্রভুর নিকট (আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণের) আবেদন জানাতে সক্ষম? তিনি (হজরত আয়েশা) ইয়াস্‌তাতিউ' রব্বুকা উচ্চারণটিকে ভুল বলেছেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এ স্থানে 'ইস্‌তাতায়াত' (সক্ষমতা) এর উদ্দেশ্য হতে পারে—হিকমত ও অভিপ্রায় এর মাধ্যমে সামর্থহীনতার সন্দেহ করা হয়নি। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালার অপার ক্ষমতার উপর হাওয়ারীগণের কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু তারা এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ্‌পাকের হিকমত ও অভিপ্রায় তাদের এহেন আবেদনের অনুকূল কি না। অর্থাৎ আসমান থেকে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র ইচ্ছার অনুকূল কিনা। যেমন— কোনো ব্যক্তি তার সাথীকে বললো, আপনি কি এখন আমার সঙ্গে বাজারে যেতে পারেন? এ রকম কথার মধ্যে বাজারে যাওয়ার শক্তি তার আছে কিনা সে রকম সন্দেহ প্রকাশ পায় না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে হাওয়ারীগণের প্রকাশ্য বক্তব্য থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের বিশ্বাস ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ের। তাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে মারেফাতের লেশ মাত্র ছিলো না। তারা সবেমাত্র মূর্খতা ও অবিশ্বাসের যবনিকা অতিক্রম করেছিলো। তাই হজরত ঈসা তাদের এ রকম অশিষ্ট উক্তিতে বিব্রতবোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—'ইত্তাকুল্লহা ইনকুনতুম মু'মিনিন (আল্লাহ্‌কে ভয় করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও)।

'মায়িদা' অর্থ খাদ্যপরিপূর্ণ বা খাদ্যসজ্জিত পাত্র। শব্দটি এসেছে 'মাদা' ইয়ামিদু' থেকে। 'মাইদুন' অর্থ পরিবেশন করা। খাঞ্চার মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। তাই খাঞ্চাকে বলা হয় মায়িদা। যেমন বলা হয়— নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নদী নয়, প্রবাহিত হয় পানি। তবু প্রবাহিত হওয়ার সম্পর্ক করা হয় নদীর সঙ্গে।

কুফাবাসীগণ বলে থাকেন, মায়িদা অর্থ আন্দোলিত হওয়া বা নড়াচড়া করা। বসরাবাসীরা বলেন, ভক্ষণকারীরা আহারের সময় খাঞ্চা নাড়াচাড়া করেন। তাই এ অবস্থাকে বলা হয় 'মায়ি দাতুন।'

'কালাত্তাকুল্লহ' অর্থ— আল্লাহ্‌কে ভয় করো। হাওয়ারীদেরকে লক্ষ্য করে হজরত ঈসা এ রকম বলেছিলেন। তাঁর এ রকম বলার উদ্দেশ্য ছিলো, মোজেজা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখতে চাওয়া নিষিদ্ধ। অতীত উম্মতেরা এভাবে মোজেজা দেখতে চেয়ে তাদের নবীদেরকে বিব্রত করেছিলো। যার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারা। হজরত ঈসা তাই আল্লাহ্‌র ভয় প্রদর্শন করে হাওয়ারীদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

'ইন কুনতুম মু'মিনীন' অর্থ, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। বিশ্বাসীদের জন্য মোজেজা দেখতে চাওয়া অসিদ্ধ। হজরত ঈসার এ রকম বলার উদ্দেশ্য ছিলো এ কথাটি জানিয়ে দেয়া যে, হে হাওয়ারীগণ! আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতার (কুদরতের) প্রতি এবং আমার রেসালাতের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেই থাকো, তবে মোজেজা দেখতে চাও কেনো? সন্দেহের ক্ষেত্রেই তো কেবল প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তোমরা বলো তোমরা বিশ্বাসী। তবে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রমাণ হিসেবে মোজেজা দর্শনের দিকে ধাবিত হচ্ছো কেনো? হজরত ঈসার এমতো উক্তির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে—যদি তোমরা ইমানের দাবীতে সত্য হও (বিশ্বাসী হও) 'তবে খাদ্যপরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে সক্ষম?'—এ ধরনের অযথার্থ প্রশ্ন থেকে বিরত হও।

নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, তিরমিজি—আল উ'জমা গ্রন্থে আবুশ শায়েখ এবং আল ফায়লানীয়াত গ্রন্থে আবু বকর শাফেয়ী, হজরত সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন, হাওয়ারীদের আসমানী খাঞ্চার আবেদনে হজরত ঈসা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তখন তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই কৃতজ্ঞ থাকো।

আকাশ থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ করার কথা বোলো না। এ রকম অলৌকিক খাঞ্চা অবতীর্ণ হলে তা হবে একটি বিরল নিদর্শন। আর ওই পবিত্র নিদর্শনের প্রতি তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে না। সামুদ সম্প্রদায় তাদের নবীর নিকট এ রকম নিদর্শন দেখতে চেয়েছিলো। সে কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছিলো। ওই নিদর্শন দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। সে পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

হাওয়ারীরা হজরত ঈসার সতর্ক সংকেত সত্ত্বেও নিরস্ত হলো না। অনভিপ্রেত আবদারের উপরেই অনড় রইলো তারা। রসুলের কথার উপরে কথা বলা অন্যায়, বেআদবী। তবু—

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৩

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

❒ তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা চাই যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদিগের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। চিত্তপ্রশান্তি ঘটে। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হাওয়ারীদের কথায় প্রকাশ পেয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসা তখন খাঞ্চার আবেদনকারীদেরকে বলেছিলেন, তিরিশটি রোজা রাখো। তারপর তোমাদের আবেদন আল্লাহ্‌পাক গ্রহণ করবেন। হাওয়ারীরা তাই করলো। তারপর দোয়ার মাধ্যমে লাভ করলো আসমানী খাঞ্চা। তারপর বললো, হে রসুল ঈসা! এ ব্যাপারে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে, তিরিশটি রোজা রেখে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্‌পাক সে প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

আয়াতের শেষ দিকে বলা হয়েছে, 'ওয়া নাকুনা আলাইহা মিনাশ্ শাহেদীন'—এ কথার অর্থ, আমরা এর সাক্ষী থাকতে চাই। অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস তো আমাদের ছিলোই। আসমানী খাঞ্চা লাভের পর আল্লাহ্‌র এককত্ব, কুদরত এবং আপনার নবুয়তের প্রতি এবার আমাদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাসও অর্জিত হলো। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, যখন আমরা বনী ইসরাইল জনতার নিকট গমন করবো, তখন তাদের সম্মুখে আমাদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবো।

বলা বাহুল্য, হাওয়ারীগণের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো হজরত ঈসার নেতৃত্বে। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসা গোসল শেষে কম্বল পরিধান করে নামাজ পড়ে অবনত মস্তকে চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় রোদন করছিলেন এবং প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন—

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

❒ মরিয়ম-তনয় ঈসা বলিল,- 'হে আল্লাহ্, আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদিগের ও আমাদিগের সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। এবং আমাদিগকে জীবিকা দান কর; আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা।'

এখানে হজরত ঈসার প্রার্থনা শুরু হয়েছে 'আল্লাহুম্মা রব্বানা' বলে। 'আল্লাহুম্মা' অর্থ হে আল্লাহ্! এ কথার মাধ্যমে স্বীকার করা হয়েছে আল্লাহ্পাকের গুণরাজিকে। আর রব্বানা অর্থ—হে আমাদের প্রভুপালক! এই সম্বোধনটির মাধ্যমে প্রার্থনা গ্রহণের আবেদন বা আহবান জানানো হয়েছে আল্লাহ্পাকের প্রতি। 'আল্লাহুমা' এবং 'রব্বানা' সম্বোধনদ্বয়ের মধ্যে এ রকম পার্থক্য নিরুপণ করেছেন আল্লামা তাফ্তাজানী।

'আনযিল আ'লাইনা মাইদাতাম মিনাস্-সামায়ী'—কথাটির অর্থ, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করো। এরপর বলা হয়েছে, এটা হবে—আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট থেকে নিদর্শন। সুদ্দী বলেছেন, এ কথার অর্থ—এ ঘটনাটি হবে আমাদের যুগের এবং আগামী প্রজন্মের আনন্দের দিন। আনন্দোৎসব বুঝাতে এখানে 'ঈদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঈদকে খুশির দিন বলা হয় এ কারণে যে, ওই দিন মানুষ সকল বিষণ্নতা পরিহার করে আনন্দমগ্ন হয়।

এক বর্ণনায় এসেছে, কথিত দিবসটি ছিলো রবিবার। খ্রীষ্টানেরা তাই রবিবারকে সাপ্তাহিক উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঈদ অর্থ আঈদাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলিল বা প্রমাণ।

'আমাদের ও আমাদের সকলের জন্য'— এখানে 'আমাদের' অর্থ হজরত ঈসা'র সমসময়ের মানুষ এবং 'আমাদের সকলের' অর্থ ভবিষ্যতের খ্রীষ্টানগণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ—আকাশ থেকে নেমে আসা ওই অলৌকিক খাঞ্চাটি যেনো এখনকার এবং আগামী পৃথিবীর সকল খ্রীষ্টানকে পরিতৃপ্ত করে। এভাবে বিষয়টি যেনো হয় সকল খ্রীষ্টান জনতার জন্য আনন্দোৎসব স্বরূপ।

'ওয়া আয়াতাম মিনকা'—অর্থ, তোমার নিকট থেকে নিদর্শন। অর্থাৎ এমন এক প্রমাণ যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতা এবং হজরত ঈসার নবুয়ত।

সবশেষে বলা হয়েছে, 'এবং আমাদেরকে জীবিকা দান করো, আর তুমিইতো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে—

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৫

قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُمْ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ۠

❒ আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমিই তোমাদিগের নিকট উহা প্রেরণ করিব: কিন্তু ইহার পর তোমাদিগের মধ্যে কেহ সত্যপ্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা আ'লাইকুম'—অর্থ, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করবো। আধিক্য ও ধারাবাহিক ক্রিয়া বুঝাতে 'মুনাজ্জিলুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করবো এবং ধারাবাহিকভাবে কয়েকবার আমি খাঞ্চা অবতীর্ণ করবো।

এরপর বলা হয়েছে, 'কিন্তু এরপর আমি তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাকে এমন শাস্তি দিবো, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিবো না।' শাস্তিদান বুঝাতে এখানে 'আযাবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে শাস্তির একটি বিশেষ রূপ বা পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যে শাস্তি পরবর্তীতে আর কাউকে দেয়া হবে না। তাই হয়েছে। খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। এ রকম ভয়াবহ শাস্তি পরবর্তীতে আর কাউকে দেয়া হয়নি।

ইতোপূর্বে হজরত সালমান ফারসী বর্ণিত একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। ওই হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে—হজরত ঈসা দোয়া করলেন। একটু পরে আকাশ থেকে নেমে এলো একটি লাল রঙের খাঞ্চা। খাঞ্চাটি ছিলো পর্দাবৃত। ধীরে ধীরে খাঞ্চাটি এসে পড়লো মাটিতে। খাঞ্চা পতনের এই দৃশ্যটি দেখে হজরত ঈসা কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে কৃতজ্ঞচিত্তদের অন্তর্ভূত করো। আর এই নেয়ামতকে আমাদের জন্য রহমতে পরিণত করে দাও। একে শাস্তির উপকরণ বানিও না। বনী ইসরাইল জনতা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলৌকিক খাঞ্চাটির দিকে। খাঞ্চা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে অপার্থিব সুবাস, যে সুবাসের সঙ্গে তারা কস্মিনকালেও পরিচিত ছিলো না। হজরত ঈসা বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সর্বাধিক পুণ্যবান সে দণ্ডায়মান হও

এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাঞ্চার আবরণ উন্মোচন করো। হাওয়ারীদের নেতা শামাউন সেফার বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই বিশেষ কর্মের জন্য আপনিই অধিক উপযুক্ত। হজরত ঈসা দণ্ডায়মান হলেন। ওজু করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ পাঠ করলেন। অনেক রোদন করলেন। তারপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাঞ্চার আবরণ উন্মোচন করলেন এবং বললেন বিস্‌মিল্লাহি—খইরুর রজেক্বীন। সকলে সবিস্ময়ে দেখলো, খাঞ্চায় রয়েছে আঁশ ও কাঁটাবিহীন একটি ভাজা মাছ। মাছটি থেকে তেল চুঁয়ে পড়ছে। আর তার মস্তকের দিকে রয়েছে কিছু লবণ। লেজের দিকে কিছু সিরকা। চারপাশে রয়েছে বহু বর্ণের ব্যঞ্জন— সেগুলোতে কোনো সুবাস ছিলো না। মাছটির পাশে আরও রয়েছে পাঁচটি রুটি। একটি রুটির উপরে রয়েছে জয়তুন। দ্বিতীয়টির উপরে রয়েছে মধু। তৃতীয়টির উপরে ঘি, চতুর্থটির উপরে পনির এবং পঞ্চমটির উপরে রয়েছে এক টুকরো গোশত। শামাউন বললো, হে রুহুল্লহ্! এ খাদ্য কি ইহকালের না পরকালের? হজরত ঈসা বললেন, এ আহার্য পৃথিবীর আহার্যের মতো নয়। আবার পরকালের খাদ্যের সঙ্গেও এর মিল নেই। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের অপার ক্ষমতার এক বিরল নিদর্শন। তোমাদের প্রার্থনার ফল হিসেবে আগত এ আহার্য তোমরা ভক্ষণ করো। আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর তাঁর অপার ক্ষমতা বলে এই আহার্যের মধ্যে তিনি প্রাচুর্য দান করবেন। হাওয়ারীগণ বললেন, হে রুহুল্লাহ্! আপনিই প্রথম শুরু করুন। হজরত ঈসা বললেন, এই আহার্য ভক্ষণ থেকে আমি আল্লাহ্‌পাক সকাশে পরিত্রাণ প্রার্থনা করি। এই খাদ্য চেয়েছিলে তোমরা। তাই তোমরাই এই খাদ্য ভক্ষণ করো। এ কথা শুনে হাওয়ারীগণ ভীত হলেন (কেউই আহার্য স্পর্শ করলেন না)। হজরত ঈসা তখন দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ এবং কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আহার্য ভক্ষণ করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু অন্যদের জন্য বিপজ্জনক। নিমন্ত্রিত জনতা পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করলো আসমানী আহার্য। এক হাজার তিনশজন নিরন্ন নারী পুরুষ উদরপূর্তি করে ভক্ষণ করার পর দেখা গেলো— ভাজা মাছটি পূর্বের অবস্থাতেই রয়েছে। এরপর অলৌকিক খাঞ্চাটি উঠে গেলো আকাশে। এভাবে এক সময় জনতার দৃষ্টি থেকে সংগুপ্ত হয়ে গেলো অলৌকিক নিদর্শনটি।

অদৃশ্য থেকে ঘোষিত হলো— যে সকল অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ মানুষ অলৌকিক আহার্য ভক্ষণ করেছে তারা হয়ে গিয়েছে নিরোগ। যে নিরন্ন নারী পুরুষ এই অলৌকিক খাদ্য খেয়েছে তারা হয়ে গিয়েছে বিত্তবান। যারা খায়নি তারা হয়েছে লজ্জিত। চল্লিশ দিন পর্যন্ত চাশতের নামাজের সময় অবতীর্ণ হতে লাগলো অলৌকিক খাঞ্চা। খাঞ্চা অবতীর্ণ হলে ধনী দরিদ্র, ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সকলে সেখানে একত্র হতো। সকলেই আহার করতো খাঞ্চাটি থেকে। আহার শেষে সকলের চোখের সামনেই খাঞ্চাটি অদৃশ্য হয়ে যেতো আকাশে। এ রকমও বলা হয়েছে যে, সামুদ সম্প্রদায়ের উষ্ট্রীর মতো একদিন পর একদিন খাঞ্চাটি অবতীর্ণ হতো। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুল হজরত ঈসাকে প্রত্যাদেশ করলেন—আমি

আমার খাঞ্চার খাদ্য কেবল দরিদ্রদের জন্য নির্ধারণ করলাম। বিত্তশালীদের কোনো অংশ এতে নেই। হজরত ঈসা আল্লাহ্পাকের এই প্রত্যাদেশ জনসমক্ষে প্রচার করলেন। বিত্তশালীরা চিন্তিত হলো। তারা হয়ে গেলো সন্দেহবাদী। অন্য লোকের মধ্যেও তারা সন্দেহ সৃষ্টি করে চললো। বলে বেড়াতে লাগলো, ভালো করে দেখে নিও, খাঞ্চাটি কি সত্যিই আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে? (আকাশ থেকেই যদি অবতীর্ণ হয়, তবে আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যের কথা ওঠে কেনো)। আল্লাহ্পাক পুনঃপ্রত্যাদেশ করলেন—আমি খাঞ্চা অবতীর্ণ করার পর যারা কুফরী (বিশ্বাসঘাতকতা) করবে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিবো—যা পৃথিবীতে অন্য কাউকে কখনো দিবো না। (সুতরাং যারা ইতোমধ্যে কুফরী করেছে তারা হয়ে গিয়েছে শাস্তির উপযুক্ত)।

হজরত ঈসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও (শাস্তি দেয়ার একক অধিকারী তো তুমিই), কিন্তু তারা তো তোমার বান্দা, আর যদি তাদেরকে তুমি মার্জনা করো, তবে নিঃসন্দেহে তুমিই তো অতুলনীয় ক্ষমাপরায়ণ। (তুমি মার্জনা করতে পারো এবং ক্ষমাপ্রার্থনা পদ্ধতিও তোমার জানা)। বিশ্বাসঘাতক তিনশত তেত্রিশজন ইহুদীর আকৃতি পরিবর্তন করে দিলেন আল্লাহ্পাক। রাতে তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করেছিলো। সকালে দেখলো, তারা আর মানুষ নয়, শুকর। ওই শুকরগুলো অন্য শুকরের মতো পচা নালা নর্দমায় দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অন্বেষণ করতে শুরু করলো। এই ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাইল জনতা হজরত ঈসার দরবারে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে শুরু করলো। শুকরাকৃতির লোকগুলোও কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। হজরত ঈসা তাদের নাম ধরে ডাকলে তারা মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় সাড়া দিতো। কথা বলার শক্তি তাদের ছিলো না। মাত্র তিন দিন পরেই মারা গেলো তারা।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার থেকে খালাস বিন আমর উল্লেখ করেছেন—রসুল স. বলেছেন, আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাঞ্চাটিতে ছিলো গোশ্‌ত ও রুটি। বনী ইসরাইলকে বলা হয়েছিলো যতোদিন পর্যন্ত তোমরা এই আহার্য নিয়ে লুকিয়ে না রাখবে অথবা আত্মসাৎ না করবে, ততোদিন পর্যন্ত খাঞ্চাটি তোমাদের কাছে থাকবে। কিন্তু চঞ্চলমতি জনতা প্রথম দিনেই খাঞ্চা থেকে খাদ্য নিয়ে লুকিয়ে রাখতে শুরু করলো। কেউ করলো আত্মসাৎ। ফলে তারা কেউ হলো শুকর। কেউ হলো বানর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ঈসা বনী ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তিরিশ দিন রোজা রাখো। তারপর আল্লাহ্পাকের কাছে যা খুশী চাও। আল্লাহ্পাক তোমাদের যাঞ্চা পুরণ করবেন। নির্দেশ মোতাবেক তারা সকলেই রোজা রাখলো। তারপর বললো, আমরা কারো কাজ করে দিলে সে আমাদেরকে খাদ্য দেয়। আমরা আল্লাহ্র কাজ করেছি। সুতরাং আল্লাহ্র কাছে আমরা খাবার চাই। এ কথা বলে তারা আল্লাহ্পাকের কাছে আকাশী খাঞ্চার

আবেদন জানালো। তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হলো। ফেরেশ্‌তারা নিয়ে এলেন বিস্ময়কর একটি খাঞ্চা। খাঞ্চায় ছিলো সাতটি রুটি এবং সাতটি ভাজা মাছ। লোকেরা ওই খাঞ্চা থেকে ইচ্ছেমতো খেলো। তারপরও খাঞ্চার খাদ্য নিঃশেষ হলো না।

হজরত কা'ব আহ্‌বার বলেছেন, খাদ্যাধারটি অবতীর্ণ হয়েছিলো আকাশ ও মাটির মধ্যবর্তী স্থানে। সেখান থেকে ফেরেশ্‌তারা খাদ্যাধারটি নিয়ে এসেছিলো পৃথিবীতে। গোশত ছাড়া অন্য সকল খাদ্য বস্তু ছিলো তার মধ্যে।

হজরত কাতাদা বলেছেন, খাঞ্চায় ছিলো বেহেশ্‌তী ফল। আতিয়া আওফি বলেছেন, আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো একটি মাছ, ওই মাছটিতে ছিলো সকল প্রকার খাদ্য বস্তুর আস্বাদ। কালাবী বলেছেন, ওই পাত্রটিতে ছিলো চালের রুটি। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন, আকাশী খাঞ্চাটিতে ছিলো রুটি ও গোশত ছাড়া অন্য সকল খাদ্য বস্তু। হজরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যবের কয়েকটি ছোট রুটি এবং মৎস্য অবতীর্ণ করেছিলেন। কিছু লোক খেয়ে চলে যেতো। পরবর্তীরা এসে খেতে শুরু করতো। এভাবে ক্রমাগত অনেক লোক এসে খেয়ে যাওয়ার পরও খাদ্য ভাণ্ডার ছিলো অনিঃশেষ।

কালাবী এবং মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক অবতীর্ণ করেছিলেন রুটি, মাছ এবং কলিজা। এক হাজারেরও বেশী লোক সেই খাদ্য খেয়েছিলো। তারা স্বগৃহে ফিরে গিয়ে গৃহবাসীদেরকে এই অলৌকিক খাদ্য গ্রহণের কথা জানালো। কথা শুনে হেসে ফেললো তাদের নিকটজনেরা। বললো, তোমাদেরকে তো যাদু করা হয়েছে। এই অপার্থিব ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হলো দু'টো দল। যাদের প্রতি আল্লাহ্‌পাক সুপ্রসন্ন ছিলেন তারাই কেবল ছিলো বিশ্বাসে সুদৃঢ়। আর যারা কুফরী করলো, তারা পেলো শুকরের আকার। ওই রূপান্তরিত লোকগুলোর মধ্যে মহিলা ও শিশু কেউ ছিলো না। তারা সকলেই ছিলো পুরুষ। শুকরাকৃতি নিয়ে তারা বেঁচে ছিলো মাত্র তিনদিন। এর মধ্যে তারা পানাহার করতে পারেনি। হজরত কাতাদার উক্তিরূপে এসেছে, বনী ইসরাইল জনতা যেখানে যেখানে অবস্থান করতো সেখানেই মান্না ও সালওয়ার মতো অবতীর্ণ হতো আকাশী খাঞ্চা।

মুজাহিদ ও হাসান বলেছেন, শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি। খাঞ্চার অবমাননা করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে—এ রকম হুঁশিয়ারী শুনেই খাঞ্চাপ্রার্থীরা অবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলো। বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! খাঞ্চা আমরা চাইনা। তাদের এ কথার পর খাঞ্চা আর অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত 'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা' (নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করবো) কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, 'ইন্নি মুনাজ্জিলুহা' বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— এই সতর্কীকরণের পরেও যদি তোমরা খাঞ্চার আবেদন জানাতে থাকো, তবে আল্লাহ্‌পাক অবশ্যই খাঞ্চা অবতীর্ণ করবেন। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিলো। 'আমিই খাঞ্চা প্রেরণ করবো'—আল্লাহ্‌পাক নিজেই এ কথা

জানিয়েছেন। সুতরাং খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি—এ রকম বলা যায় না। এছাড়া খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার স্বপক্ষে রসুলুল্লাহ্ স. এর বহুসংখ্যক হাদিস বিদ্যমান। আর এ সম্পর্কে রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের অসংখ্য উক্তি। অতএব, বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৬

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

❒ আল্লাহ্ যখন বলিবেন, 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর?' সে বলিবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তাহা বলিতাম, তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

'ইজ্ ক্বলাল্লহ' অর্থ —আল্লাহ্ বলেছিলেন অথবা বলবেন। 'ক্বলা' অতীতকাল বোধক। ইজ্ শব্দটিও অতীতকাল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্পাকের প্রশ্নটি উচ্চারিত হয়েছিলো হজরত ঈসার আকাশারোহনের পর। কিন্তু তাফসীরবিদগণের অভিমত হচ্ছে— এখানে 'ইজ্ ক্বলাল্লহ' অর্থ আল্লাহ্পাক (কিয়ামতের দিন) বলবেন। অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক ও তিরস্কার করার জন্য এ রকম প্রকাশভঙ্গির ব্যবহার ঘটেছে। অন্য দু'টি আয়াতেও এমতো প্রকাশভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ১. 'ইয়াওমা ইয়াজ্মাউল্লহুর রুসুলা ফা ইয়াক্বুলু' (স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ রসুলদেরকে একত্রিত করবেন এবং জিজ্ঞেস্ করবেন)। আয়াত ১০৯। ২, 'হাজা ইয়াওমুঁই ইয়ানফাউস্ সদিক্বীনা সিদ্ক্বুহুম।' সুতরাং এখানে 'ক্বলা' অর্থ হবে কিয়ামতের দিন বলবেন। এখন অবশিষ্ট রইল 'ইজ' শব্দটির অতীতকালসূচক ব্যবহারের প্রসঙ্গটি। এ সম্পর্কে বলতে হয় যে, ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে এ রকম অতীতকাল বোধক শব্দ ব্যবহার সিদ্ধ। এ রকম শব্দ ব্যবহার ঘটলে বুঝে নিতে হবে যে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে (কিয়ামত) তা যেনো ঘটেই গিয়েছে। 'ওয়ালাও তারা ইজ্ ফাজাউ'—এই আয়াতেও এভাবে ইজ্ শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে।

'ইয়া ঈসাব্‌না মারইয়ামা আংতা কুলতা লিন্নাস' অর্থ— হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে। 'আংতা' অর্থ তুমি এবং কুলতা অর্থ তুমি বলেছিলে। 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করো' কথাটিকে হজরত ঈসার সঙ্গে সুদৃঢ় করার জন্যই এখানে আংতা শব্দটিকে বসানো হয়েছে কুলতা শব্দটির আগে। আমার ও আমার জননীর উপাসনা করো—এ রকম কথা হজরত ঈসার পক্ষে কস্মিনকালেও বলা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি অবশ্যই জানতেন, আল্লাহ্‌পাক জন্মদান ও আনুরূপ্য থেকে পবিত্র। তাই এ রকম শক্তিশালী প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তব্যটিকে হজরত ঈসার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। হজরত ঈসা এবং তাঁর ধর্মপরায়ণা জননী অবশ্যই সৃষ্টির বৃত্তভূত। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ব্যতীত। অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ্ নন—গায়ের আল্লাহ্।

'মিন দুনিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত। অনধিক বুঝাতে 'দুনা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির ব্যবহারের মাধ্যমে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে—অপরের উপাসনা করার সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপাসনা করার অর্থ আদৌও আল্লাহ্‌র উপাসনা না করা। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপাসক নয়, যে তার উপাসনায় আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে হজরত ঈসা ও হজরত মরিয়মকে উপাস্য বানায়। আরেকটি অর্থ এ রকম হতে পারে যে—তোমরা আমার ও আমার মায়ের এমন উপাসনা করো, যা আল্লাহ্‌র উপাসনার চেয়ে নিম্নমানের। এ রকম অর্থ করার কারণ এই যে—খ্রীষ্টানেরা হজরত ঈসা ও হজরত মরিয়মকে আল্লাহ্‌পাকের সমান্তরাল কোনো উপাস্য বলে মনে করতো না। তারা মনে করতো হজরত ঈসা ও তাঁর জননী একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্‌তায়ালার মাধ্যম। তাই তাঁদের উপাসনা করার অর্থ আল্লাহ্‌রই উপাসনা করা।

'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকেও আমার জননীকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করো?'—কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাকের এ রকম রোষতপ্ত প্রশ্ন শুনে হজরত ঈসা শিউরে উঠবেন। প্রকম্পিত হবে তাঁর শরীরের গ্রন্থিসমূহ। তাঁর দেহের প্রতিটি পশমের গোড়া থেকে বের হবে রক্ত কণা। এ রকম বলেছেন আবু রওক।

হজরত ঈসা তখন বলবেন, তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে তুমিতো তা জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।' 'সুবহানাকা' অর্থ তুমিই মহিমান্বিত, পবিত্র। অর্থাৎ— হে আমার মহা মহিমান্বিত পরম পবিত্র প্রভুপালক! আমি তোমার মহিমা ও পবিত্রতার স্বীকৃতি দান করছি। এ কথাও ঘোষণা করছি যে, তুমি সকল প্রকার শিরিক থেকে মুক্ত, পবিত্র। সুতরাং কোনো প্রকার শিরিক প্রকাশক বাক্য আমার পক্ষে বলা অসম্ভব।

'তা'লামু মাফি নাফসি ওয়ালা আ'লামু মাফি নাফসিকা' (আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছো, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই)। এখানে প্রথমে উল্লেখিত 'নাফসি' শব্দটির মাধ্যমে হজরত ঈসার সত্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর শেষে 'ফি নাফসিকা' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌পাকের জাত বা সত্তাকে। শব্দের সমান্তরাল ব্যবহারের নিয়মে এখানে এ রকম করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে, 'ইন্নাকা আংতা আল্লামুল গুয়ুব' (তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত)। গুয়ুব শব্দটিকে কেউ কেউ পড়েছেন গিয়ুব। 'গইন' অক্ষরটিকে 'যের' না 'পেশ' সহযোগে পড়তে হবে, সে সম্পর্কে কোরআন পাঠকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৭

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

❐ 'তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই; তাহা এইঃ 'তোমরা আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের ইবাদত কর;' এবং যতদিন আমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদিগের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদিগের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।'

আগের আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ঈসা যে উত্তর দিতে শুরু করেছিলেন, সেই উত্তরের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে এই আয়াতেও। এখানে হজরত ঈসার বক্তব্যে আল্লাহ্‌পাকই যে প্রকৃত নির্দেশদাতা সে কথাটি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। নির্দেশ দান প্রসঙ্গটিকে তিনি নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেন নি যে 'তুমি আমাকে যে আদেশ করেছো আমি তাদেরকে সেরূপই আদেশ করেছি।' বরং তিনি বলেছেন, 'তুমি আমাকে যা আদেশ করেছো তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি।' এই বক্তব্যটিতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত আদেশদাতা। আর অন্য সকল রসুলের মতো তিনি সে কথা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছেন (বলেছেন)।

'আনি'বুদুল্লহা রব্বি ওয়া রব্বাকুম' অর্থ— তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। এ কথার মাধ্যমে হজরত ঈসা বনী ইসরাইলদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমি স্রষ্টা ও প্রভুপালক নই। বরং

আল্লাহ্‌তায়ালাই আমার ও তোমাদের স্রষ্টা ও প্রভুপালক। সুতরাং তোমরা সেই প্রভুপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো।

হজরত ঈসা এখানে আরো বলেছেন, 'এবং যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততোদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক'— এখানে 'তুলে নিলে' কথাটি বুঝাতে 'তাওয়াফফিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির প্রকৃত অর্থ— কোনো কিছুকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ে নেয়া। এই নিয়ে নেয়ার শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে মৃত্যুও একটি শ্রেণী। আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌ই পরিপূর্ণরূপে জীবনকে হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং কারো জীবনকে হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময় (আল্লহু ইয়াতাওয়াফফাল আং ফুসা হিনা মাউতিহা ওয়াল্লাতি লাম তামুত ফি মানামিহা) এখানে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—কেবল মৃত্যুর সময় নয়, নিদ্রার সময়েও আল্লাহ্‌পাক মানুষের প্রাণ হরণ করে থাকেন (প্রাণ হরণ করা বা নিয়ে নেয়া বুঝাতে এখানেও তাওয়াফফা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে)।

'তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক'— হজরত ঈসার এ কথাটির অর্থ, হে আমার পরম প্রভুপালক! আমাকে তো তুমি তোমার সকাশে তুলে নিয়েছো। তারপর আমার সম্প্রদায়ের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধান করেছো তুমি। তাদের মধ্যে তুমি যাদেরকে মিথ্যাচারিতা থেকে বাঁচাতে চেয়েছো তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে, নবীগণের মাধ্যমে এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত দান করেছো।

আয়াতে উল্লেখিত হজরত ঈসার শেষ কথাটি এই—এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। কথাটির মাধ্যমে এই সত্য স্বীকৃতিটিই দেয়া হয়েছে যে—আল্লাহ্‌পাক সকল কিছুর দ্রষ্টা। অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৮

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

❐ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

এই আয়াতটিও হজরত ঈসার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। হজরত ঈসা এখানে বলছেন—'ইন তুয়াজ্‌জিব্‌হুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক' (তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারাতো তোমারই দাস)। অর্থাৎ— হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি তো সকলের সর্বময় অধীশ্বর। সুতরাং, তুমি তোমার মালিকানায় যথেচ্ছ অধিকার প্রয়োগ করতে পারো। এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনের কোনো অবকাশই নেই। যারা

অবাধ্য হয়েছে, তাদেরকে তো তুমিই সৃষ্টি করেছো। তারা তোমার প্রতি বিমুখ হয়েছে, তবুও তুমি তাদেরকে   পালন করেছো এবং পৃথিবীতে দান করেছো অজস্র নেয়ামত। অতএব তোমার অকৃতজ্ঞ দাসদেরকে যদি তুমি শাস্তি প্রদান করো তবে তা সম্পূর্ণতই ন্যায়সংগত হবে।

জ্ঞাতব্যঃ ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, আমি একবার রসুল স.কে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমি আপনার রাতের নামাজে আপনাকে এই আয়াতটি বারংবার পাঠ করতে শুনেছি। আপনি এতবার এই আয়াতটি পড়েছেন যে, এ রকম অন্য কেউ করলে আমরা তার উপর বিরক্ত হয়ে যেতাম। রসুল স. বললেন, (এই আয়াত আবৃত্তির মাধ্যমে) আমি আমার উম্মতের জন্য দোয়া করেছি। আমি বললাম, কী জবাব পেয়েছেন? তিনি স. বললেন, আমি যে জবাব পেয়েছি, তা জানলে অনেক মানুষ নামাজ পরিত্যাগ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, আমি এই সংবাদটি কি মানুষের মধ্যে প্রচার করবো না? তিনি স. বললেন, করো। হজরত ওমর এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! এই শুভসংবাদটি জানানো হলে মানুষ ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্পাকের রহমতের উপর ভরসা করে বসে থাকবে। রসুল স. তখন গমনোদ্যত আমাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন এবং এই আয়াতটিই পুনরায় আবৃত্তি করলেন। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস থেকে ইমাম নাসাঈও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

'আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'— হজরত ঈসার এ কথাটির অর্থ, হে আমার আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে তুমি পরম পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তার অধিকারী। ক্ষমা ও শাস্তি—দু'টোই তোমার ক্ষমতাধীন। ক্ষমা করতে তুমি অপারগ অথবা বাধ্য নও। তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে তা হবে তোমার প্রকৃত ন্যায় বিচার। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা হবে তোমার নিতান্ত মেহেরবানী।

একটি সন্দেহঃ এখানে শাস্তি ও ক্ষমা—উভয় ক্ষেত্রে শর্তসূচক 'ইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—এ রকম শব্দ ব্যবহারের কারণে ক্ষমা ও শাস্তি দু'টোই হয়েছে সমসম্ভাবনাময়। অথচ কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, অংশীবাদীরা কস্মিনকালেও ক্ষমার্হ নয়। তবে এখানে এ রকম সম্ভাবনার কথা বলা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জনঃ আল্লাহ্‌পাক মুশরিকদেরকেও ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ রকম ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, অংশীবাদীদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না। সুতরাং তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। আল্লাহ্‌পাকের ঘোষণার কারণেই তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাটি অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এতে করে তাঁর ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা খর্ব হয়নি। আর এখানে ক্ষমা করার কথা বলার পর এ রকম বলা হয়নি যে—তুমি রহমানুর রহীম। বলা হয়েছে 'তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (ইন্নাকা আংতাল আজিজুল হাকিম)। আজিজ ও হাকিম (পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) —আল্লাহ্‌পাকের এই দু'টি নাম উল্লেখের মধ্যে এই ইংগিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌পাকের পরাক্রম ও প্রজ্ঞার প্রতি সমর্পিত হওয়া উচিত।

হজরত ইবনে মাসউদ আলোচ্য আয়াতটি পড়তেন এভাবে—'ইন তাগফির্‌লাহুম ফা ইন্নাহুম ইবাদুকা ওয়া ইন তুয়াজ্জিব্‌হুম ফা ইন্নাকা আংতাল আজিজুল হাকিম।' তিনি বলেছেন, রসুল স. আজিজুল হাকিম—এর সঙ্গে তুয়াজ্জিব্ পড়েছেন—তাগ্‌ফির পড়েন নি। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতের শব্দ ব্যবহারে কিছু অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। (অর্থাৎ তাগ্‌ফির থেকে ইবাদুকা এবং তুয়াজ্জিব্ থেকে আজিজুল হাকিম পর্যন্ত অর্থগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান)। এই সামঞ্জস্যানুসারে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম—তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, তাই তুমি ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারো এবং তারাতো তোমার দাস, তাই তুমি তাদেরকে মার্জনাও করতে পারো। আমি বলি, প্রসিদ্ধ ক্বেরাতটিই অর্থগত দিক থেকে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. কোরআন মজীদে উল্লেখিত হজরত ইব্রাহিমের এই দোয়াটি পাঠ করলেন—রব্বি ইন্নাহুন্না আফআলনা কাছিরম্ মিনান্নাসি ফামান তাবিয়ানি ফা ইন্নাহু মিন্নি ওয়ামান আ'সানি ফাইন্নাকা গফুরুর রাহীম। তারপর তিনি স. আলোচ্য আয়াতটি বারবার আবৃত্তি করে প্রার্থনা জানালেন— হে আমার প্রভুপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। আমার উম্মতকে মার্জনা করো। প্রার্থনার সঙ্গে তাঁর পবিত্র দু'চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো অশ্রুর ধারা। আল্লাহ্‌পাক সকল কিছু সম্যক পরিজ্ঞাত। তৎসত্ত্বেও তিনি হজরত জিবরাইলকে নির্দেশ দিলেন, আমার প্রিয় রসুলের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করো—আপনার এমতো অশ্রু বর্ষণের কারণ কী? হজরত জিবরাইল নির্দেশ পালন করলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. ওই কথাই

জানালেন যা তিনি তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করছিলেন আল্লাহ্‌পাকের নিকট। হজরত জিবরাইল রসুল স. এর জবাব শুনে আল্লাহ্‌পাককে জানালেন। আল্লাহ্‌পাক পুনঃ নির্দেশ দিলেন, হে জিবরাইল! তুমি পুনরায় আমার রসুলের নিকট গমন করো এবং বলো, আমি তাঁর উম্মতের বিষয়ে তাঁকে প্রসন্ন করবো—অপ্রসন্ন করবো না।

সুরা মায়িদা ঃ আয়াত ১১৯, ১২০

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۭ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۭ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❒ আল্লাহ্‌ বলিবেন, 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাহাদিগের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে; তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্‌ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট; ইহা মহা সফলতা।'

❒ আস্‌মান ও জমিন এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহেরই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

উপরের আয়াতে উদ্ধৃত হজরত ঈসার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক যা বললেন সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, কৃালাল্লহু হাজা ইয়াওমু ইয়ানফাউ'স্‌ সদিক্বীনা সিদ্‌কুহুম (আল্লাহ্‌ বলবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে)। এ রকম বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, হজরত ঈসা যা কিছু বলেছেন— তা সবই সত্য! এভাবে কিয়ামতের দিন হজরত ঈসার সত্যতা প্রমাণিত করে তাঁর অবাধ্য উম্মতদেরকে অধিকতর অপদস্থ করা হবে। যেহেতু তারা মিথ্যাচারী, তাই 'সত্যবাদিরাই উপকৃত হবে'— এ রকম ঘোষণাই তাদের তিরস্কারের জন্য যথেষ্ট।

পূর্বের আয়াত দৃষ্টে প্রকাশ্যতঃ এ রকম প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ঈসা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আল্লাহ্‌পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই ধারণা অপনোদনের জন্যই এখানে পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সত্যবাদিরাই সেদিন উপকৃত হবে (মিথ্যাবাদিরা ক্ষমা ও উপকার পাবে না)। এ রকমও অর্থ হওয়া সম্ভব যে, হজরত ঈসার উক্তিতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি ভয়ের যে চিহ্ন ফুটে

উঠেছিলো, তা দূর করার জন্যই এখানে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে' (অতএব যারা সত্যাশ্রয়ী তাদের ভীত ও চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই)। পৃথিবীতে বিশ্বাসে, কথায় এবং আচরণে যে সত্যনিষ্ঠ, পরকালে তার সেই সত্যনিষ্ঠাই তাকে উপকৃত করবে। আর যে পৃথিবীতে মিথ্যামগ্ন ছিলো, সে-ও সেদিন সত্যকে স্বীকার করবে এবং বলবে— 'লামনাকু মিনাল মুসাল্লিনা ওয়া লামনাকু নুত্ই'মুল মাসাকিনা' (আমরা নামাজ পাঠ করতাম না এবং দরিদ্রদেরকে খাদ্য দিতাম না)। শয়তানও তখন এই স্বীকৃতি দেবে—'ইন্নাল্লহা ওয়াআ'দাকুম ওয়াআ'দাল হাক্বি ওয়া ওয়াআদ্তুকুম' (নিশ্চয় আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য, আর আমি যে অঙ্গীকার করেছি....)। অথবা সে সেদিন এ রকমও বলবে—'ওয়াল্লহু রব্বুনা মাকুন্না মুশরিকীন' (তারা বলবে, আল্লাহ্ই আমাদের প্রভুপালক, আমরা মুশরিক নই)। শয়তানের অনুসারীরা সেদিন এ রকম সত্য মিথ্যা অনেক কিছুই বলবে বটে, কিন্তু এতে করে তারা কোনো উপকারই লাভ করতে পারবে না। সেদিন তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সাক্ষ্য নেয়া হবে তাদের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে। এভাবে অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন অপদস্থ করা হবে চূড়ান্তভাবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'সদিক্বীন'(সত্যবাদিগণ) অর্থ নবী রসুলগণ। কালাবী বলেছেন—বিশ্বাসী বান্দাগণ। আতা বলেছেন, 'ইয়াওমা ইয়ান্ফাউ' কথাটির উদ্দেশ্য পৃথিবীর দিবস সকল—পরকালের দিন নয়। কারণ, পরকাল তো বিনিময় প্রদানের স্থান —আমলের স্থান নয়।

পরের বাক্যে সত্যবাদিরা কিভাবে উপকৃত হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'রদ্বিআল্লাহু আ'নহুম ওয়া রদ্বু আন্হু' (আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট)। তাসাওউফ পন্থীগণ বলেছেন, প্রেম ভালোবাসা যে আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দা — দু'দিক থেকেই হয়, এই কথাটি তার প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ তাফসীরকারগণ কথাটির অর্থ করেছেন এ রকম—আল্লাহ্পাক সত্যবাদিদের নিষ্ঠা ও শ্রমকে পছন্দ করবেন। এটাই আল্লাহ্পাকের প্রসন্নতা। আর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সওয়াব ও জান্নাত পেয়ে সত্যাশ্রয়ীরা প্রফুল্ল হবেন। এটাই তাঁদের সন্তুষ্টি। অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) থাকবে পরিপূর্ণ বিনিময় এবং অপর পক্ষ থেকে (বান্দার পক্ষ থেকে) থাকবে পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

শেষ কথাটি এই — 'জালিকাল ফাউজুল আ'জিম' (ইহা মহা সফলতা)। এই পরিপূর্ণ বিনিময়কে মহা সফলতা বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে সফলতা হবে চিরন্তন। পৃথিবীর সফলতা ক্ষয়িষ্ণু ও অস্থায়ী।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষ আয়াতটিই সুরা মায়িদার সর্বশেষ আয়াত। এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'আসমান ও জমিন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার

সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহ্র এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' এখানে 'তাদের মধ্যে' অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। কথাটি বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে 'মা ফিহিন্না।' 'মা' ব্যবহৃত হয় অচেতন সৃষ্টিকুলের সঙ্গে এবং 'মান' ব্যবহৃত হয় বিবেকবান বা সচেতন সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিবেকবানকে বিবেকহীনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু এখানে মা ফিহিন্না (তাদের মধ্যে) কথাটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিবেকবান, বিবেকহীন সকল সৃষ্টিকে। এর কারণ হচ্ছে—যারা বিবেকবান তারাও সৃষ্টি হিসেবে বিবেকহীনদের তুল্য। তারা বিবেক ও জ্ঞানের অধিকারী হলেও সে জ্ঞান ক্রটি বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে নয়। সকল ক্রটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে কেবল সেই চিরন্তন পবিত্র সত্তা।

সচেতন অচেতন সকল সৃষ্টি যে সৃষ্টি হিসেবে সমতুল—অন্য আয়াতে সে কথা বলা হয়েছে এভাবে, 'ইন্নাকা মাইয়েতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়েতুন' (তারাও মৃত, তুমিও মৃত)। অর্থাৎ তোমরা সকলেই সত্তাগত দিক থেকে অস্তিত্বহীন। প্রকাশ্যতঃ তোমাদের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হলেও তোমরা সকলে অনস্তিত্বনির্ভর (তোমাদের প্রকাশ্য এ অস্তিত্ব দয়া করে দান করেছেন মহা মহিম আল্লাহ্তায়ালা)। এই মূল জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ইঙ্গিত প্রদানার্থেই এখানে 'মান'—এর পরিবর্তে বসেছে 'মা' (মাফিহিন্না)। এ রকম প্রকাশভঙ্গির আরো একটি কারণ এই হতে পারে যে, কেবল জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য 'মান' ব্যবহৃত হলেও জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন সকলের জন্য 'মা' ব্যবহার সিদ্ধ। আর এখানে যেহেতু সমগ্র সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে, তাই চেতন অচেতন নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মা' শব্দটি।

'ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর' অর্থ—এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। অর্থাৎ সৃষ্টিকে রক্ষা করা অথবা ধ্বংস করা সকল কিছুই তাঁর পবিত্র অভিপ্রায়ের উপর নির্ভরশীল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

❐ প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি আস্‌মান ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদ্সত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

'আলহামদুলিল্লাহ্' অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কথাটির মধ্যে এই শিক্ষা রয়েছে যে, সকল অবস্থায় কেবল আল্লাহ্ই প্রশংসার্হ। এই শিক্ষাটিও এখানে

অনুক্ত রয়েছে যে, সৃষ্টির প্রশংসার মুখাপেক্ষী তিনি নন। সৃষ্টি তাঁর প্রশংসা করুক অথবা নাই করুক—সকল অবস্থায় তিনি সামগ্রিক প্রশংসার অধিকারী।

'আল্লাজি খলাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন) —এর অর্থ পূর্ব দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী। এর মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে—সকল প্রশংসা যে আল্লাহ্র, তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনের নিদর্শনটিই যথেষ্ট। এর অধিক প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। সকল সৃষ্টির মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বাভাবিক দৃষ্টিপাতের মধ্যেই এ দু'টো সৃষ্টি সতত দৃশ্যমান। আর এ দু'টোর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য অজস্র রহস্য ও উপদেশ। এর মধ্যেই রয়েছে দিবস ও রাত্রির নিয়মিত বিবর্তন। সুতরাং যারা বিচক্ষণ, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন, এই বিশাল সৃষ্টি যখন দৃশ্যমান—তখন এর স্রষ্টা অবশ্যই বিদ্যমান। কোনো কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি বলে থাকে, আকাশ চিরন্তন, চিরস্থায়ী। আল্লাহ্পাক আকাশকে সৃষ্টি করেছেন সময় সৃষ্টির পূর্বে। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়। অন্য সকল সৃষ্টির মতো আকাশও কিয়ামতের মহাপ্রলয়ের সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সৃষ্টি হাদেস (বিনাশী) —ক্বদীম (চিরন্তন) নয়।

'সামাওয়াত' অর্থ আকাশসমূহ। 'আরদ্ব' অর্থ পৃথিবী। এখানে আকাশকে বহু বচনে এবং পৃথিবীকে এক বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ আকাশের আকৃতি ও প্রকৃতি এক রকম নয়। আকাশের রয়েছে বহুবিধ বিভঙ্গ ও আকার। এ কারণে আকাশের সংখ্যা একাধিক। কিন্তু পৃথিবীর মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট হলেও এর মূল উপাদান একটি এবং আকারও একটি।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, এটি হচ্ছে তওরাত শরীফের সর্ব প্রথম আয়াত এবং সর্ব শেষ আয়াত হচ্ছে—'ক্বুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাজি লাম ইয়াত্তাখিজ ওয়ালাদা' (বল, প্রশংসা আল্লাহ্র —যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি)।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর সৃষ্টির সূচনা ও আলোচনা করেছেন তাঁরই প্রশংসাবর্ণন দ্বারা। বলেছেন—'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি খলাক্বস্ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) এবং মানুষের পরিণতি ও পরিসমাপ্তির আলোচনাও আল্লাহ্পাক করেছেন তাঁর প্রশংসা সহযোগে। বলেছেন, 'ওয়া ক্বুদ্বিয়া বাইনা হুম বিল্হাক্বি ওয়া ক্বিলাল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।'

'ওয়া জাআ'লাজ্ জুলুমাতি ওয়ান্ নূর' অর্থ সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'জায়ালা' অর্থ খলাক্বা (সৃষ্টি করা)। বায়যাবী বলেছেন, 'জায়ালা' ও 'খলাক্বা' শব্দ দু'টির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। 'খলাক্বা' অর্থ পরিমাপসম্ভূত সৃষ্টি করা। আর 'জায়ালা' শব্দটির অর্থে রয়েছে অপরের প্রতি নির্ভরতার ইঙ্গিত। অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর অংগীভূত করে দেয়া এবং এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুর সৃষ্টি করা বা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা। যেমন, 'জায়ালাল খাতামা মিন্ ফিদ্দ্বাত (রৌপ্য দ্বারা নির্মিত আংটি)। আরেকটি

দৃষ্টান্ত—'জায়ালান্ নুরা জুল্মাতান' (আলো রূপান্তরিত হলো অন্ধকারে)। প্রকৃত কথা এই যে, 'জায়ালা' শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে দু'টি পরস্পরবিরোধী বস্তুর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তাই এখানে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানের কথা বুঝাতে গিয়ে 'জায়ালা' শব্দটি ব্যবহারের পর বলা হয়েছে অন্ধকার ও আলোর কথা। এতে করে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অন্ধকার ও আলোর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ব্যাখ্যাটির দ্বারা সানুবিয়া সম্প্রদায়ের অযথার্থ ধারণাটিকেও অপনোদন করা যায় (তারা বলে নূর সরাসরি উত্তম এবং জুলমাত সরাসরি অনুত্তম)। অর্থাৎ ভালো কাজ করার শক্তিকে বলে নূর এবং খারাপ কাজ করার স্পৃহাকে বলে জুলমাত। আর নূর ও জুলমাত দু'টোই সত্তাগত দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং দু'টোই তাদের আপনাপন সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমি বলি, অন্ধকার মূলতঃ অস্তিত্বহীনতানির্ভর। সুতরাং অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে 'জায়ালা' শব্দটির সম্পর্ক হতে পারে না। কিন্তু এ আয়াতে যে জুলমাত বা অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, সেই অন্ধকার অস্তিত্বহীন নয়। বরং অন্ধকারের আগমন ও নির্গমন ঘটে সৃষ্টির সীমানাতেই। তাই আলো ও অন্ধকার—এ দু'টোর একটিও আপন অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল নয়। এ পৃথিবীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন অস্তিত্বের সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন পদার্থের সংখ্যাই অধিক। তাই জুলমাত বা অন্ধকারকে প্রকাশ করা হয়েছে বহুবচনে। অপর দিকে আলোকিত অস্তিত্বের সংখ্যা নিতান্তই কম— তাই নূর শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এক বচনে। নূরের সঙ্গে জুলমাতের সম্পর্ক এককের সঙ্গে একাধিকত্বের সম্পর্কের মতো।

হজরত হাসান বসরী বলেছেন, এখানে জুলমাত অর্থ কুফর বা অবিশ্বাস এবং নূর অর্থ ইমান বা বিশ্বাস। তাই জুলমাতকে প্রকাশ করা হয়েছে বহুবচনে। কারণ, অবিশ্বাসের পথ একাধিক। কিন্তু ইমানের পথ (সিরাত্বল মুস্তাক্বিম) কেবল একটি। তাই নূর শব্দকে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে একবচনে।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, একদিন রসুল স. আমাদের সামনে মাটিতে একটি সরলরেখা অংকন করলেন এবং বললেন, এটাই আল্লাহ্র পথ। এরপর তিনি স. ওই সরল রেখাটির ডানে বাঁয়ে আরো অনেক রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এ সকল পথের প্রতিটিতে রয়েছে শয়তানের দল যারা মানুষকে নিজেদের দিকে ডাকছে। এরপর তিনি স. এই আয়াত পাঠ করলেন—'ইন্না হাজা সিরাতিম্ মুসতাকিমা ফাত্তাবিউ'হু ওয়ালা তাত্তাবিউস্ সুবুলা ফা তাফার্রক্বা বিকুম আ'ন সাবিলিহি' (নিশ্চয় আমার এ পথই সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো, অন্য পথের অনুসন্ধান কোরো না—যদি করো, তবে তোমরা এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী।

অন্ধকার অস্তিত্বশীল থাকে আলো আগমনের পূর্বে। তাই এই আয়াতে প্রথমে অন্ধকার এবং পরে আলোর উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন অন্ধকারে। তারপর তার উপর নিক্ষেপ করেছেন নূর। সেই নূরের কিছু অংশ যে পেয়েছে, সে লাভ করেছে হেদায়েত। আর যার উপর সেই নূরের সম্পাত ঘটেনি, সে হয়েছে পথভ্রষ্ট। তাই আমি বলি, আল্লাহ্‌পাকের অসীম জ্ঞানানুযায়ী (অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করার পর) কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছে। আহমদ, তিরমিজি।

'ছুম্মাল্লাজিনা কাফারু বিরব্বিহিম ইয়া'দিলুন' অর্থ—এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। বাক্যটির সংযোগ রয়েছে আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আলহামদুলিল্লাহ্' কথাটির সঙ্গে। এই সংযোগের কারণে ইয়া'দিলুন (সমকক্ষ দাঁড় করায়) কথাটির উদ্দেশ্য হবে—এই বিশ্বচরাচর আল্লাহ্‌পাকই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে তিনিই দিয়েছেন অজস্র নেয়ামত। কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা এই নেয়ামতের অবমাননা করে (আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে এই নেয়ামত দানের মধ্যে অংশীদার বানায়)। আলোচ্য বাক্যটির সংযোগ 'খলাক্ব' (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গেও হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে এ রকম—আল্লাহ্‌তায়ালাই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এই সৃজনকর্মে অন্য কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। এতদসত্ত্বেও কাফেরেরা তাঁর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌তায়ালার সমকক্ষ মনে করে— যে মূলতঃ সৃজনক্ষমতাহীন। 'ছুম্মা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে প্রসংগান্তর ঘটানো হয়নি। বরং প্রকাশ করা হয়েছে বিস্ময়। বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—আল্লাহ্‌পাকের অসংখ্য অনুগ্রহ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে শিরিক করে। তাদের এ বিবেকবর্জিত ও গর্হিত অপকর্মটি অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

'বিরব্বিহিম' (তাদের প্রতিপালকের) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'কাফারু' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের) এর সঙ্গে। 'সমকক্ষ দাঁড় করায়' কথাটির সঙ্গেও এর নেপথ্য যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রের কারণে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম—তারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং তাঁর সঙ্গে করে অত্যন্ত অনুচিত আচরণ। এমতাবস্থায় 'ইয়া'দিলুন' (সমকক্ষ দাঁড় করায়) কথাটির অর্থ হবে— তারা আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথবা 'বিরব্বিহিম' এর সম্পর্ক সরাসরি 'ইয়া'দিলুনের' সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পূজনীয় প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে।

নজর বিন শুমায়েল বলেছেন, এখানে 'ইয়া'দিলুন' শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'উ'দুল' থেকে— যার অর্থ ফিরে যাওয়া অথবা মুখ ফিরিয়ে নেয়া। তিনি আরো লিখেছেন, 'বিরব্বিহিম' এর মধ্যে 'বা' শব্দটির অর্থ হবে 'আ'ন' (থেকে)। অর্থাৎ তারা আপন প্রভুপালকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ২, ৩

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰىٓ اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

❒ তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে যাহা তিনিই জ্ঞাত, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

❒ আস্‌মান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।

'হুওয়াল্লাজি খলাক্বাকুম মিন ত্বীন' অর্থ তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। এখানে 'কুম' শব্দটির পূর্বে 'আবুন' (পিতা) শব্দটি অনুক্ত রয়েছে। এই অনুক্ত শব্দটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদের পিতা (হজরত আদম) কে মৃত্তিকা থেকে সৃজন করেছেন।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, পৃথিবী থেকে কিছু মাটি নিয়ে এসো। নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য হজরত জিব্‌রাইল পৃথিবীতে নেমে এলে মাটি বললো, আমার অঙ্গহানি থেকে আমি আল্লাহ্‌র পরিত্রাণ চাই। একথা শুনে হজরত জিব্‌রাইল আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন, হে মৃত্তিকাধিকারী প্রভু! মৃত্তিকা তো তার অংশ কম হওয়ার বিপদ থেকে তোমার পরিত্রাণ প্রার্থনা করেছে (তাই আমি শূন্য হাতে ফিরে এসেছি)। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত মিকাইলকে মাটি আনতে নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় তাঁর হস্তক্ষেপ থেকে আল্লাহ্‌তায়ালার শরণ প্রার্থনা করলো। হজরত মিকাইলও ফিরে গেলেন শূন্য হাতে। শেষে আল্লাহ্‌তায়ালা মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইলকে মাটি আনার নির্দেশ দিলেন। মাটি পুনরায় আল্লাহ্‌তায়ালার পরিত্রাণ কামনা করলো। হজরত আজরাইল তখন বললেন, আমি আল্লাহ্‌র অনানুগত্য থেকে পরিত্রাণ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে লাল, কালো,

শাদা— বিভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির মাটি একত্র করে নিয়ে গেলেন আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারে। সেই সম্মিলিত মাটি থেকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করলেন হজরত আদমের শরীর। তাই তাঁর বংশধরেরা কেউ লাল, কেউ শাদা, কেউ কালো— আবার কেউ উগ্র, কেউ নম্র। আল্লাহ্তায়ালা তখন হজরত আজরাইলকে বললেন, জিব্রাইল ও মিকাইল দু'জনেই পৃথিবীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছে, তুমি করোনি। সুতরাং এ মাটি থেকে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করা হবে তাদের প্রাণ (হরণের ক্ষমতা) দিবো আমি তোমার নিয়ন্ত্রণে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের শরীরকে আকৃতি দান করলেন নরম মাটির মাধ্যমে। তারপর কিছুকাল সেই মৃত্তিকামূর্তিকে ফেলে রাখলেন। মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলো। এভাবে দীর্ঘদিন রাখার পর মূর্তিটি হয়ে গেলো মৃত্তিকানির্মিত পাত্রের ভাঙা অংশের মতো। তাতে আঘাত করলে তা থেকে নির্গত হতে শুরু করলো ঠন্ ঠন্ আওয়াজ। এরপর আল্লাহ্পাক তার নিজের পক্ষ থেকে রূহ্ সম্পাত করলেন মৃত্তিকা মূর্তিটিতে। ইমাম বাগবী এ রকম বলেছেন।

হজরত আবু মুসা বলেছেন, আমি রসুল স. থেকে শুনেছি— তিনি স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির বর্ণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষেরা কেউ লোহিতাভ, কেউ শ্বেতাভ, কেউ কৃষ্ণকায়। আবার কেউ নম্র, কেউ দুর্বিনীত। কেউ চরিত্রহীন। কেউ চরিত্রবান। আহমদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রার একটি মারফু বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমকে জাবিয়্যাহ্ প্রকৃতির মাটি দ্বারা নির্মাণ করেছেন এবং সেই মাটিকে বেহেশতের পানির সঙ্গে মিশিয়ে খামির তৈরী করেছেন। (আমি বলি, জাবিয়্যাহ্ শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ জাবিয়্যাহ্ ওই নিম্নভূমির মাটি যেখানে পানি জমে থাকে এবং যা কর্দমাক্ত। মনে হয় শব্দটির মাধ্যমে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, কর্দমাক্ত আঠালো মাটিকে জান্নাতের পানির সঙ্গে মিশিয়ে হজরত আদমের শরীরকে মসৃণ বানানো হলো)। হাসানের মাধ্যমে বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন, হাকেম এবং ইবনে আদী।

'ছুম্মা কৃদ্বা আজালা' কথাটির অর্থ অতঃপর এক সময়সীমা নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ হজরত আদমের নির্মাণ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্পাকের নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁর পৃথিবীর আয়ু কতদিন হবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির মূল উপকরণকে মাতৃগর্ভে চল্লিশদিন পর্যন্ত নুতফার (অপবিত্র পানির) আকারে রাখা হয়। তারপরে চল্লিশ দিন রাখা হয় রক্তপিণ্ডের আকারে। এর পরের চল্লিশদিন রাখা হয় গোশতের টুকরার উপরে। তারপর আল্লাহ্পাক

চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে এক ফেরেশতা প্রদান করেন। ওই ফেরেশতা গর্ভস্থিত শিশুর উত্তম ও অনুত্তম কর্ম, আয়ুষ্কাল, রিজিক এবং সে পুণ্যবান হবে না পাপিষ্ঠ— তা লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে তার মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয় রূহ্ বা আত্মাকে। সুতরাং, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ— তোমাদের কতিপয় লোক পুণ্যকর্ম করতে করতে চলে যাবে জান্নাতের অতি নিকটে। এমন কি জান্নাত ও তার মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র অর্ধ হাত। তখন অদৃষ্ট তার উপর প্রবল হবে। সে হয়ে পড়বে পাপের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত। ফলে সে চলে যাবে দোজখে। আবার কতিপয় লোক সারা জীবন ধরে ক্রমাগত পাপ করতে করতে পৌঁছে যাবে দোজখের এক হাত দূরত্বে। এমন সময় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিপি প্রবল হয়ে যাবে তার উপর। সে তখন বেহেশ্তবাসীদের মতো আমল শুরু করবে। অবশেষে চলে যাবে বেহেশতে। বোখারী, মুসলিম।

'ওয়া আজালুম্ মুসাম্মা ই'নদাহু'— (এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে যা তিনিই জ্ঞাত)। এ কথার অর্থ— সময়ের পরিমাপ ও নির্ধারণ আল্লাহ্পাকের চিরন্তন জ্ঞানে বিদ্যমান। সে জ্ঞান পরিবর্তনশীলতা থেকে পবিত্র। আল্লাহ্পাক ব্যতীত সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই।

'আজালুন' শব্দটির শেষ অক্ষরে যে তানভীন রয়েছে— তা আল্লাহ্পাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক। তাই বাক্যটিকে 'এবং' বা 'অতঃপর'— এ রকম সংযোগসূচক শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। বলা হয়েছে 'যা তিনিই জ্ঞাত'। তাছাড়া আজালুন এর বিশেষণ হিসেবে মুসাম্মা শব্দটির উল্লেখ তো রয়েছেই। তাই ই'নদাহু (তাঁর সামনে) শব্দটিকে অগ্রে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়েনি।

হাসান, কাতাদা এবং জুহাক, বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আজালা' (নির্দিষ্ট কাল) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়সীমা। আর পরে উল্লেখিত 'আজালুন' (নির্ধারিত কাল) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়সীমা। হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন, দু'টি সময়সীমা রয়েছে প্রতিটি মানুষের। একটি জন্ম থেকে মৃত্যু এবং অপরটি মৃত্যু থেকে হাশর। যে মানুষ পুণ্যবান, পরহেজগার এবং রক্তের সম্পর্ক সংরক্ষণকারী হয়, তার মৃত্যোত্তর জীবন থেকে কিছু আয়ু নিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হয় তার পৃথিবীর বয়স। আর যে মানুষ দুঃশ্চরিত্র ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী— তার পার্থিব জীবনের হায়াত কমিয়ে বাড়িয়ে দেয়া হয় তার কবরের জীবনের পরিসর।

মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে প্রথম আজালা অর্থ পার্থিব জীবনের পরিসর। আর দ্বিতীয় আজালুনের অর্থ পারলৌকিক জীবনের ব্যাপ্তি। হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আতিয়া বর্ণনা করেছেন এখানে প্রথমে উল্লেখিত আজালা'র অর্থ নিদ্রাভিভূত অবস্থা — যখন আল্লাহ্পাক প্রাণকে হরণ

করেন এবং তা ফিরিয়ে দেন জাগরণের প্রাক্কালে। আর পরের আজালুনের অর্থ মৃত্যুলগ্ন (যখন সাঙ্গ হয় পার্থিব জীবন)।

'ছুম্মা আন্তুম তামতারুন' (এতদ্সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ করো)। এখানে তামতারুন শব্দটি এসেছে মিরইয়াতুন্ থেকে। মিরইয়াতুন্ অর্থ সন্দেহ। মিরাউন থেকে তান্তারুন শব্দটি সংকলিত হয়েছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। মিরাআ অর্থ বচসা বা বিবাদ। এইভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত, অদৃষ্ট রীতি অথবা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছো বা বিতণ্ডা সৃষ্টি করছো।

ছুম্মা শব্দটি প্রয়োগ করা হয় বিস্ময় প্রকাশের ক্ষেত্রে। শব্দটি প্রয়োগ করে এখানে এই মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে— আশ্চর্য! সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও তোমরা বচসায় লিপ্ত হয়েছো। তোমাদের সকল নিয়মানুবর্তিতার স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনিই তোমাদের আয়ু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্ণয় করে দিয়েছেন মৃত্যুর সুনির্দিষ্টকাল। মৃত্যুর পর তিনিই পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এই পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কোনো কিছুই তাঁর নির্দেশ ও জ্ঞানের আওতাবহির্ভূত নয়।

হজরত আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ছয় প্রকার মানুষের উপর রয়েছে আল্লাহ্র, আমার এবং সকল পয়গম্বরের অভিশাপ— ১. যে আল্লাহ্র কিতাবের শব্দগত অথবা অর্থগত বিকৃতি ঘটায়। ২. যে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অদৃষ্টে অপ্রত্যয়ী। ৩. যে আল্লাহ্ কর্তৃক অপমানিত ব্যক্তিকে সম্মান করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক মর্যাদামণ্ডিত ব্যক্তিকে করে অপমান। ৪. আল্লাহ্ যাকে হারাম করেছেন তাকে যে মনে করে হালাল। ৫. আল্লাহ্ যাকে হালাল করেছেন তাকে যে মনে করে হারাম এবং ৬. যে আমার প্রদর্শিত পথকে পরিত্যাগ করে। বায়হাকী।

আমি বলি, আল্লাহ্র কিতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছে রাফেজীরা। তারা বলে কোরআন তিরিশ পারা নয়— চল্লিশ পারা। তারা আরো বলে, হজরত ওসমান পবিত্র কোরআনের ওই পারাগুলো বাদ দিয়েছেন। তারা এই অপবিত্র ধারণাটিও পোষণ করে যে— সুরা আহযাব ছিলো সুরা বাকারার মতই সুদীর্ঘ। রাফেজীদের মতো খারেজীরাও পথভ্রষ্ট। তারা রসুল স. এর পবিত্র বংশধরদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। আর একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় হচ্ছে মোতাজিলা—তকদিরের উপর তাদের কোনো আস্থা নেই। এই আয়াতে 'তোমরা সন্দেহ করো' বলে তাদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুকে হালাল মনে করে মারজিয়াহ্ নামক পথচ্যুত সম্প্রদায়টি। তারা আরো মনে করে মানুষ পুণ্য অথবা পাপ করতে সম্পূর্ণতঃই বাধ্য। আর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ বল প্রয়োগপূর্বক হালালকে হারাম ঘোষণা করে এবং রসুলের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করে বেদাতী ও ফাসেকের দল।

এর পরের আয়াতের (আয়াত ৩) শুরুতে বলা হয়েছে, ওয়া হুয়াল্লহু ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়া ফিল আরদ্ব (আসমান ও জমিতে তিনিই আল্লাহ্)। বলা বাহুল্য, এখানে 'হুয়া' (তিনি) শব্দটি আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বনাম যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণবত্তা সম্পর্কে পূর্বের আয়াতদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌পাককে নামবাচক বিশেষ্য ধরা হলে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে আসমান ও জমিতে আল্লাহ্‌ই কেবল উপাসনার যোগ্য প্রভুপালক। আর আল্লাহ্‌কে গুণবাচক বিশেষ্য ধরা হলে অর্থ হবে— আল্লাহ্‌ই আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্ (এই নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি এবং এই নামেই তাঁকে স্মরণ করা হয়)। ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াফিল আরদ্ব (আকাশ ও পৃথিবীতে)। এ কথার মাধ্যমে প্রকাশ্যতঃ স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রকাশ্য অর্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম— আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী উভয় স্থানে বিদ্যমান। এ রকম অর্থ করলে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, আকাশ ও পৃথিবী কি আল্লাহ্‌পাকের অধিষ্ঠান স্থল? প্রশ্নের উত্তর হবে, অবশ্যই নয় (কারণ আকাশ ও পৃথিবী সীমানাভূত সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ সীমানার কলংক থেকে পবিত্র)। অতএব, এখানে অর্থ হবে রূপক বা পরোক্ষ। ধারণা করতে হবে, আকাশ, পৃথিবী ও অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণরাজি ও সৃজনশীলতার নিদর্শন, প্রতীক বা প্রতিবিম্ব। এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি ইশারা, নির্দেশিকা বা প্রমাণ। এগুলোর কোনোটিই তাঁর অধিষ্ঠানস্থল বা আবাসস্থল নয়। কারণ, তিনি স্থানাতীত, কালাতীত, সীমানাতীত। বায়যাবী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিশৈলী ও রহস্যরাজি সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর এই জ্ঞানের ধারণাতীত সম্পৃক্তির কারণে রূপক অর্থে বলা হয়— তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান। 'ইয়া'লামু সিররাকুম ওয়া জাহ্‌রাকুম' অর্থ তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন। আর ওয়া ইয়ালামু মা তাকসিবুন অর্থ— তোমরা যা করো তা-ও তিনি অবগত। আয়াত শেষের আলোচ্য কথা দু'টোর মাধ্যমে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় মহাজ্ঞানের আওতাবর্হিভূত কিছু নেই। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তোমাদের অন্তর বাহির ও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ক্রিয়াকলাপ তাঁর নিকট সুবিদিত। তোমাদের হৃদয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে সকল শুভ ও অশুভ কর্ম তোমরা করো তিনি যথাসময়ে সেগুলোর যথাবিনিময় প্রদান করবেন। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাঁর জ্ঞানের ধারণাতীত পরিবেষ্টন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে সতত বিদ্যমান (সুতরাং সমর্পণই শ্রেয়)।

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○ فَقَدْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي
مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ○

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।

❒ সত্য যখন তাহাদিগের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহার যাথার্থ্য তাহারা অবহিত হইবে।

❒ তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই এবং তাহাদিগের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদিগের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদিগের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে, তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো নিদর্শন তাদের কাছে উপস্থিত হয় না যা থেকে তারা বিমুখ না হয়। এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বুঝতে বলা হয়েছে 'মিন আয়াতি রব্বি'। 'মিন' (মধ্যে) অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। শব্দটি সাধারণ অর্থ প্রকাশক। তাই এখানে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বা আয়াতের অর্থ হবে নবী রসুলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহ যেমন চন্দ্রের দ্বিধাবিভক্তি, প্রস্তরের বাক স্ফূরণ ইত্যাদি। কিন্তু আতা বলেছেন, এখানে আয়াত অর্থ হবে কোরআনের আয়াত। তাঁর মতে 'মিন আয়াতি' কথাটির 'মিন' এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক রূপে প্রয়োগিত হয়েছে।

দ্বিতীয়টিতে এরশাদ হয়েছে— সত্য যখন তাদের কাছে এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে 'হাক্বি' (সত্য) অর্থ হবে কোরআনুল করিম অথবা রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র অস্তিত্ব। বাক্যটির শুরুতে উল্লেখিত 'ফাক্বদ' শব্দটির 'ফা' এখানে তাফরি' বা অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত। তাই এখানে আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যাটি হবে এ রকম— যখন তারা অন্য মোজেজাগুলোকে অস্বীকার করেছে, তখন অংশতঃ অস্বীকার করেছে কোরআনকেও। কারণ, কোরআনও একটি মোজেজা। হেতু নির্দেশক হিসেবে এখানে 'ফা' শব্দটি প্রয়োগিত হয়েছে বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— অনন্য শব্দ সম্ভার ও অতুলনীয় মর্মবৈভবের কারণে মহাগ্রন্থ কোরআন মহাকালের এক মহান মোজেজা হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একে অমান্য করেছে। অমান্য করেছে আল্লাহ্তায়ালার মহান রসুলকেও— যার পবিত্র উপস্থিতিই এক বিস্ময়কর মোজেজা। এই অনিন্দ্যসুন্দর রসুল নির্বাচিত হয়েছেন মানব সম্প্রদায় থেকেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টির সম্মুখেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। সকলেই দেখেছে, তিনি উম্মি (অক্ষরের অমুখাপেক্ষী)। পৃথিবীর অস্থায়ী বিদ্যার সীমাবদ্ধতা ও কলংক থেকে তিনি মুক্ত বলে তাঁর পবিত্র কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের কী অবাধ নির্ঝরিণী। পূর্বের আকাশী গ্রন্থগুলোতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে এই সুমহান রসুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ। এছাড়া তাঁর অনন্য জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে ধন্য হয়েছেন খ্যাতনামা ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিত ও মাশায়েখ। এতদসত্ত্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অস্বীকৃতিতেই অনড়। সুতরাং তারা অন্য মোজেজাগুলোকে যে অস্বীকার করবে তা আর বিচিত্র কী?

এরপর বলা হয়েছে— যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার যাথার্থ্য তারা অবহিত হবে। এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের মন্দ প্রতিফলের সম্মুখীন অবশ্যই হবে। পৃথিবীতে ইসলামের ক্রমবিকাশের যুগে যখন তারা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে, তখন। অথবা তখন, যখন নেমে আসবে কিয়ামতের বিভীষিকা ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটির প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা মিন ক্বলিহিম মিন ক্বারনিন।' এ কথার অর্থ— তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি। এখানে 'কাম' শব্দটি বিজ্ঞপ্তিমূলক বা আধিক্যসূচক। আর 'মিন ক্বলিহিম' এর 'মিন' (মধ্যে) শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। 'ক্বারনিন' শব্দটির অর্থ যুগ বা সমসাময়িক। শব্দটির বহুবচন 'ক্বুরুন।' রসুল স. বলেছেন, 'খইরুল ক্বুরুনি ক্বরনি।' এর অর্থ— সকল দলের মধ্যে আমার সমসাময়িক দলই উত্তম। অথবা সকল যুগের মধ্যে আমার যুগই

উৎকৃষ্ট। যুগের সময়সীমা সম্পর্কে অনেক রকম অভিমত রয়েছে। যেমন দশ. বিশ, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, একশ, অথবা একশ বিশ বৎসর। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ক্বরুন অর্থ শতাব্দী (একশ বছর)। রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন বাশার মাযানীকে বলেছিলেন, তুমি এক ক্বরুন জীবিত থাকবে। তাঁর বয়স হয়েছিলো একশ বছর। যদি এই আয়াতের 'ক্বরুনিন' অর্থ যুগ ধরা হয়, তবে যুগকে ধ্বংস করার অর্থ দাঁড়াবে যুগের মানুষকে ধ্বংস বা বিনাশ করা।

এরপর বলা হয়েছে, 'তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি। এ কথার অর্থ— আমি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছিলাম শক্তি, সামর্থ্য, খ্যাতি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা। অজস্র পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করে রেখেছিলাম। নেয়ামতের সেই বিপুলতা আমি তোমাদেরকে (রসুলুল্লাহ্ স. এর উম্মতকে) দেইনি। এ সম্পর্কে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস উদ্ধৃত বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে দিয়েছিলাম বয়সের দীর্ঘ পরিসর। সে রকম দীর্ঘ আয়ু আমি তোমাদেরকে দেইনি। ওই দীর্ঘ জীবন বিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে— হজরত নুহের সম্প্রদায়, আদ, সামুদ সম্প্রদায় ইত্যাদি। এই বাক্যটিতে উদ্ধৃত 'লাকুম' শব্দটি সম্বোধনসূচক। কিন্তু এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে গায়েরে জমির (অনুপস্থিত সর্বনামসমূহ)। যেমন, 'ক্বলাহুম' 'ইয়াতিহিম' 'আলাম ইয়ারাউ' ইত্যাদি। সুতরাং এখানে অনুপস্থিত বা ভবিষ্যতের সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে বলা যেতে পারে। বরং এ রকম বলাই উত্তম। কিন্তু বসরার আলেমগণ বলেছেন, সম্বোধনটি করা হয়েছে ওই সময়ের মক্কার অধিবাসীদের প্রতি। তাঁদের মধ্যে রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দও রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তো সেখানে উপস্থিতই ছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, সম্বোধনটি করা হয়েছে সকল অনাগত (অনুপস্থিত) মানবতাকে লক্ষ্য করে।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া আরসালনাস্ সামাআ আলাইহিম মিদ্‌রারা (এবং আমি তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম)। আস্‌সামাআ— মর্ম হবে মুষলধারে বৃষ্টি। আর মিদরারা শব্দটি এসেছে দাররুন থেকে। দাররুন অর্থ দুধ। আরববাসীদের নিকট দুধ সর্বাপেক্ষা শক্তিবর্ধক পানীয়। তাই অধিক উপকারী ও উত্তম কিছু বুঝাতে গেলে দাররুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এখানে মিদরারুন শব্দটির অর্থ হবে অধিক উপকার প্রদায়ক বস্তু— যা প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে। হজরত ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন— উপর্যুপরি, ধারাবাহিক।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়া জাআলনাল আনহারা তাজরী মিন তাহ্‌তিহিম (আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম)। এ কথার অর্থ— তাদের বসতবাটির নিম্নদেশে আমি প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম স্রোতস্বিনী। তাই সেখানে জন্মেছিলো অনেক ফলবান বৃক্ষ। ফলে তাদের সাংসারিক জীবন ছিলো অত্যন্ত সুখের।

এরপর বলা হয়েছে, ফা আহ্‌লাকনাহুম বিজুনুবিহীম (অতঃপর তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে বিনাশ করেছি)। এ কথার অর্থ— তাদের নিকট যখন নবী প্রেরণ করা হলো, তখন তারা সেই প্রেরিত পুরুষগণকে অমান্য করলো। আর সেই অবাধ্যাচরণের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সে সময় তাদের পার্থিব বৈভব, শক্তিমত্তা এবং নির্বিকার জীবনযাত্রা তাদেরকে সে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর মতো শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সম্প্রদায়ও রেসালাতের প্রতি অবজ্ঞা করে চলেছে। এখন যদি আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলের অপমানের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করতে চান, তবে তাদের পার্থিব বৈভব ও প্রতাপ তাদেরকে কী করে রক্ষা করতে পারবে?

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াআনশা'না মিম্ বা'দিহীম কর্‌নান আখারীন' (এবং তাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি)। এই বাক্যটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী রসুলদের প্রতি যে সকল সম্প্রদায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলো। তাদের ওই অবাধ্যাচরণের কারণে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নতুন মানব সম্প্রদায়কে। সুতরাং হে অবিবেচক মক্কাবাসী এখনও সময় আছে তোমরা আমার প্রেরিত রসুলের প্রতি প্রত্যয়ী হও, অন্যথায় পূর্বের অবাধ্য উম্মতদের মতো তোমরাও বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আর তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে নতুন মানবগোষ্ঠী।

কালাবী ও মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, ইহুদী নজর বিন হারেছ, আবদুল্লাহ্ বিন আবী উমাইয়া এবং নওফেল বিন খুয়াইলিদ একবার বললো, হে মোহাম্মদ! আমরা কখনই তোমার প্রতি আস্থা স্থাপন করব না— যতক্ষণ না তুমি আমাদের চোখের সামনে একটি আসমানী কিতাব আনবে, যার সঙ্গে থাকবে চারজন ফেরেশতা এবং তারা এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে থাকবে যে, এটি আল্লাহ্‌র কিতাব— আল্লাহ্‌ই এই কিতাব প্রেরণ করেছেন। ফেরেশ্‌তারা আরও সাক্ষ্য দেবে যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল। ইহুদীদের এই জঘন্য উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ اَنْزَلْنَا
مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ
رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ
قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

❒ যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতারণ করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্তদ্বারা স্পর্শও করিত তবু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিগণ বলিত 'ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

❒ তাহারা বলে, 'তাহার নিকট কোন ফেরেশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?' যদি আমি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

❒ যদি তাহাকে ফেরেশ্‌তা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।

❒ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছে; পরিণামে, তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে যে কথা বলা হয়েছে, তার মর্ম হচ্ছে, হে প্রিয় রসুল! ইহুদীদের আচরণ অত্যন্ত জঘন্য। তাদের নিকট আকাশ থেকে কাগজে লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠানো হলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। নিজ হাতে তারা সেই গ্রন্থ স্পর্শ করলেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলবে এটা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আল্লাহ্‌পাক মহাজ্ঞানী। সকল কিছুই তাঁর মহাজ্ঞানের অধীন। তাই তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, আপনার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী ইহুদীরা সত্যপ্রত্যাখ্যানে চির অনড়। কস্মিনকালেও তারা ইমান গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়টির বক্তব্য এ রকম— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আপনার নিকট কোনো ফেরেশ্‌তা প্রেরিত হয় না কেনো? তাদের প্রশ্নটি অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাই হে প্রিয়তম রসুল! আপনি জেনে রাখুন যে, আমি যদি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করি তবে তো তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার অবকাশ আর তারা পাবে না। এখানে কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসার অর্থ—তাদের পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি হওয়া। পূর্বের উম্মতদের মধ্যে যারা এ রকম মোজেজা দর্শনের জন্য জিদ ধরেছিলো, তাদেরকে মোজেজা দেখানো হয়েছিলো বটে, কিন্তু এ ধৃষ্টতার জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্নও করে দেওয়া হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার অর্থ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। জুহাক বলেছেন, ফেরেশ্‌তারা তাদের আসল আকৃতি নিয়ে কাফেরদের সামনে এলে তারা ভয়ের চোটে সকলেই মৃত্যুবরণ করতো। এটাই 'তাদের কর্মের চূড়ান্ত মীমাংসা' হয়ে যাওয়ার অর্থ। 'আর তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতোনা'— কথাটির অর্থ, অতর্কিতে তাদের উপর নেমে আসত আযাব। ফলে তারা হয়ে যেতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আত্মরক্ষার উপায় অন্বেষণের কোনো সুযোগই আর তারা পেতো না।

তৃতীয়টিতে বলা হয়েছে, 'যদি তাকে ফেরেশ্‌তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আবদার অনুযায়ী আমি যদি কিতাব ও রসুল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোনো ফেরেশ্‌তাকে পাঠাতাম তবে তাকেও দান করতাম মানবাকৃতি। কাফেরদের আবদার ছিলো দু'ধরনের। কখনও তারা বলতো, 'লাওলা উন্‌যিলা ইলাইহি মালাকুন ফাইয়াকুনু মা'আহু নাজিরা।' আবার কখনও বলতো 'লাওশা'আ রব্বানা লাআনযালা মালাইকা।' আলোচ্য আয়াতে 'তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম' বাক্যটির মাধ্যমে তাদের ওই দুই আবদারের সম্মিলিত জবাব দেয়া হয়েছে। এখানে 'লাওজাআলনাহু রাজুলা' (যদি তাকে ফেরেশ্‌তা করতাম) কথাটির অর্থ— আমি তাকে পুরুষের আকৃতি দিয়ে পাঠাতাম। উল্লেখ্য যে, হজরত জিবরাইল কখনো কখনো প্রখ্যাত সাহাবী হজরত দাহীআ কালবীর আকৃতি ধরে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতেন। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃত আকারে ফেরেশ্‌তা দর্শন মানুষের শক্তি বহির্ভূত। নবী ও রসুলগণ সাধারণ মানুষের মতো নন। তাই তাঁরা কখনও কখনও ফেরেশ্‌তাদেরকে তাঁদের আসলরূপে দেখেছেন। আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, নবী রসুলগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টি—উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কধারী। স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তারা সকল প্রকার ফয়েজ আহরণ করেন। আর তা সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করেন সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে। এভাবে উভয়দিকের যোগসূত্র না থাকলে তাঁদের দ্বারা ফয়েজ আহরণ ও বিতরণের কাজটি কিছুতেই সম্ভব হতো না। নবী ও ফেরেশ্‌তা উভয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার কোনো এক গুণের (সিফাতের) সঙ্গে। ওই গুণটিই তাঁদের মাব্দায়ে তা'ইয়ুন (উৎপত্তিস্থল)। আর অন্যদের উৎপত্তিস্থল ওই গুণের প্রতিবিম্ব অথবা ছায়া প্রতিচ্ছায়া থেকে। সুতরাং মানুষের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাতে গেলে মানুষের নবীকে মানুষই হতে হয়। ফেরেশ্তার দ্বারা এই কাজটি হয় না। এই বাণী বহনের কাজে যদি ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করা হতো, তবে তাদেরকেও হতে হতো মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট। এ রকম না করলে মানুষ ওই ফেরেশ্তাদের পরিচয় লাভ করতে পারত না। বুঝতে পারতো না, তারা মানব সম্প্রদায়ভূত না অন্য কোনো সম্প্রদায় হতে আগত। এ রকম অপরিচিতি উপকার আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধক। তাই মানুষের নবী হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে মানুষকে, ফেরেশ্তাকে নয়।

নবী রসুলগণের আহ্বানের একটি মূল বিষয় হচ্ছে— অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনতে হবে। এই অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে ফেরেশ্তারাও রয়েছেন। সুতরাং তাঁরা নবী রসুলদের মতো দৃশ্যমান হলে তাদেরকে আর অদৃশ্য বলা যায় না। আর যদি তাঁরা দৃশ্যমান হন তবে তাদেরকে নবী রসুলের মতো অর্থাৎ মানুষের মতো আকার গ্রহণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'যদি তাকে ফেরেশ্তা করতাম তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম।' আর এ রকম করলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হতো আরও অধিক বিভ্রান্ত। মানুষের আকার বিশিষ্ট হওয়ার কারণে তারা ওই ফেরেশ্তাকে মানুষই মনে করতো এবং এখন যেমন তারা নবুয়ত ও রেসালাতকে অস্বীকার করে চলেছে, তখনও তেমনি অস্বীকৃতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতো। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, 'আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।'

জ্ঞাতব্যঃ নবী ও ফেরেশ্তাগণ সূর্যের দিকে তেরছা অবস্থায় স্থাপিত দর্পণ সদৃশ। তেরছা অবস্থায় স্থাপিত আয়নায় যেমন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ওই প্রতিফলনের মাধ্যমে যেমন কোনো অন্ধকার স্থান আলোকিত হয় তেমনি নবুয়তের আয়নায় আল্লাহ্তায়ালার জালাল ও জামাল প্রতিফলিত হয়ে আলোকিত করে বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়। সূর্যের আলো আয়নায় বিম্বিত হয় সরাসরি। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার কোনো না কোনো গুণ বা সিফাত নবী ও ফেরেশ্তাগণের উৎপত্তিস্থল। আর অন্ধকার স্থান আলোকিত হয় ওই আয়নার প্রতিবিম্ব সন্নিপাতের কারণে। সেকারণেই বলা হয়েছে নবী রসুল ভিন্ন অন্যদের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহ্পাকের কোনো না কোনো গুণের ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া (মূল গুণ নয়)।

অবিশ্বাসীরা রসুল স. কে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। তিনি স. এতে করে মনোক্ষুণ্ন হতেন। তাই সান্ত্বনা প্রদানার্থে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে যে কথা জানিয়েছেন— সে কথাই উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে। বলা হয়েছে, 'তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে;

পরিণামে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তা বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছে।' এই আয়াতে উল্লেখিত হাক্বা শব্দটির অর্থ জুহাক করেছেন— পরিবেষ্টন করা। কামুস গ্রন্থেও এ রকম অর্থ রয়েছে। কিন্তু রবি বিন আনাস এবং আতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— ধারাবাহিকতা।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১১

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

❒ বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল!'

আলোচ্য আয়াতে পৃথিবীতে পরিভ্রমণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'অতপর দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছিলো!' প্রথমেই বলা হয়েছে, পরিভ্রমণ করো। তারপর বলা হয়েছে, দেখো (অতঃপর দেখো)। ফা (কাইফা) শব্দটি পরিণতি প্রকাশক। ফা এর পরে বর্ণিত বিষয় এর পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যতিহীনভাবে সম্মিলিত হয়। অথচ এখানে ছুম্মা (অতঃপর— শব্দটি পূর্বের ও পরের বর্ণনার সঙ্গে ব্যবধানসূচক (অর্থাৎ অতঃপর এর পরের বিষয় পূর্বের বিষয়ের কিছুকাল পরে বাস্তবায়িত হয়)। সুতরাং এখানে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাচারীদের পরিণাম দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন, না কিছুকাল পরে? নির্দেশনার এই যতি ও যতিহীনতার সঙ্কট নিরসনের উপায় কী?

সঙ্কট নিরসনঃ উত্থাপিত সঙ্কট নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে— ভ্রমণ (সায়ের) কোনো তাৎক্ষণিক বিষয় নয়। ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণ। ভ্রমণের শুরু ও সমাপ্তির মধ্যে রয়েছে সময়ের বিস্তৃত পরিসর। মিথ্যাশ্রয়ীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। তাদের বিনাশপ্রাপ্ত বিরান জনপদে গমনের সঙ্গে সঙ্গে তা দৃশ্যমান হয়। আর ওই নিদারুণ পরিণতি থেকে উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারটি ঘটে ভ্রমণের শেষে। তাই এখানে প্রথম অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করা হয়েছে ফা (কাইফা)। আর দ্বিতীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি।

বায়যাবী লিখেছেন— এখানে ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। তাই আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে এ রকম, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করা মোবাহ্ (বৈধ), আর বিনাশপ্রাপ্ত অবাধ্যদের পরিণতি পর্যবেক্ষণ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। অর্থাৎ বাণিজ্য অথবা অন্য কোনো কারণে কোথাও

ভ্রমণে গেলে অবাধ্যদের বিনাশপ্রাপ্ত জনপদের নিদর্শন দেখা অবশ্য কর্তব্য। মাদারেক রচয়িতাও এ রকম লিখেছেন। তিনি এর সঙ্গে অতিরিক্ত যে কথাটি লিখেছেন তা হচ্ছে, ভ্রমণের নির্দেশটি ঐচ্ছিক এবং অবাধ্যদের ধ্বংসের নিদর্শন দেখার নির্দেশটি ওয়াজিব। আর ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমে ঐচ্ছিক ও অত্যাবশ্যক নির্দেশ দু'টির মধ্যে ব্যবধান ঘটানো হয়েছে।

আমি বলি, বায়যাবী ও মাদারেক রচয়িতার উক্তির ভিত্তি হচ্ছে— ফা (দেখো) নির্দেশটি কারণ সূচক। অর্থাৎ ভ্রমণ হচ্ছে দর্শনের কারণ। ভ্রমণের পর শুরু হয় দর্শনের কাজ। সুতরাং ভ্রমণ করা হলে দর্শনও ঘটবে— দর্শনের উদ্দেশ্য থাক অথবা না থাক। কিন্তু এখানে কাফেরদের চরম পরিণতি দর্শনই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। আর ভ্রমণ যেহেতু সেই দর্শনের কারণ বা মাধ্যম, তাই প্রথমে ভ্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর বিবৃত করা হয়েছে মূল উদ্দেশ্যটি (দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিলো)। কারণ ও উদ্দেশ্য দু'টি পৃথক বিষয়। তাই এখানে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহার করে নির্দেশ দু'টো একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। সঙ্কটের প্রশ্নটি এখানে অবান্তর। সুতরাং নিরসনের চিন্তাটি নিষ্প্রয়োজন।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২, ১৩

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

❐ বল, 'আসমান ও জমিনে যাহা আছে তাহা কাহার?' বল, 'আল্লাহেরই'; দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

❐ রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করছেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সকলকে জিজ্ঞেস করুন, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? এই ' মা' শব্দটি সাধারণ অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ এখানে মানুষ, জ্বিন, ফেরেশ্‌তা ও অন্য

সকল চেতন ও অচেতন সৃষ্টিকে সম্বোধন করে উদ্ধৃত প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটির একমাত্র জবাব— আল্লাহ্। তাই পরক্ষণেই বলে দেয়া হয়েছে বলুন, আল্লাহ্। অর্থাৎ এ সুবিশাল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যে আল্লাহ্ তা অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি এই অনড় প্রশ্নটির জবাবটিও সকলকে জানিয়ে দিন। বলুন, আল্লাহ্।

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্পাক মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করে আরশের উপরে রাখলেন। ওই পুস্তকে লেখা হলো এ কথা দৃঢ় সত্য যে, আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার রহমত আমার গজব অপেক্ষা অগ্রগামী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো এসেছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকটে রয়েছে একশত রহমত। তাঁর মধ্যে একটি রহমত বণ্টন করে দেয়া হয়েছে মানুষ, জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির মধ্যে। তাই তারা পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসে। বন্য পশুকুলও এ কারণে ভালোবাসে তাদের শাবককে। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ্পাক তাঁর কাছে জমা রেখেছেন। পুনরুত্থানের দিন ওই রহমত দেয়া হবে তাঁর প্রকৃত বান্দাদেরকে। মুসলিম।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসে সংখ্যাগত দিক দিয়ে একশত রহমতের কথা বলা হয়নি। অধিক ও অপেক্ষাকৃত কম অধিকের দৃষ্টান্তস্বরূপ নিরানব্বই, এক— এ রকম বলা হয়েছে। এ রকম বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিকুল যে রহমতপ্রাপ্ত হয়েছে তা বিনাশী। আর আল্লাহ্পাকের কাছে যা রয়েছে তা অবিনাশী। রহমত আল্লাহ্তায়ালার একটি গুণ। তাঁর সত্তা ও অন্য সকল গুণের মতো এই গুণটিও চিরস্থায়ী। ওই রহমতের ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র এক প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকুলের হৃদয়ে পতিত হলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা।

হজরত ওমর বিন খাত্তাবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর দরবারে বন্দী হিসেবে উপস্থিত করা হলো কয়েকজন অরণ্যবাসীকে। তাদের মধ্যে ছিলো এক রমণী। তার বক্ষদেশ ছিলো দুধে পরিপূর্ণ। সে হঠাৎ একটি শিশুকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলো তার দিকে। শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিলো সে এবং পরম যত্নে তাকে দুধ পান করালো। রসুল স. বললেন, দেখো, এই শিশুর মাতাটি তার সন্তানকে কি কখনও আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, কস্মিনকালেও নয়। তিনি স. তখন বললেন, এই রমণীটির সন্তান বাৎসল্য অপেক্ষা আল্লাহ্পাক তাঁর দাসদের উপর অনেক বেশী দয়ার্দ্র।

পৃথিবীতে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের রহমত বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন শারীরিক সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য, বিত্তবৈভব ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য, শান্তিপ্রদ সমাজ, রাষ্ট্রীয় সম্মান ইত্যাদি। পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলে

আল্লাহ্পাকের এ সকল রহমত লাভ করে। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত ও রহমত সম্পৃক্ত কেবল আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস, নবী-রসুল, আসমানী কিতাব, আখেরাত সম্পর্কীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞান, মৃত্যু, মৃত্যোত্তর জীবন, পুনরুত্থান ইত্যাদির সঙ্গে। এর পরিণামে রয়েছে জান্নাত এবং আল্লাহ্পাকের দীদার। এই প্রকৃতির রহমত পেয়ে থাকেন কেবল বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীরা। এই রহমতই যে প্রকৃত রহমত, বর্ণিত হাদিসে সে কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যেও বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে এভাবে—'কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। বাক্যটির শেষে বলা হয়েছে, ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্। এখানে 'ইলা' শব্দটির অর্থ হবে ফি (মধ্যে)। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক কবরের জগতে কিয়ামত পর্যন্ত সকলকে একত্র রাখবেন। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে পৃথক পৃথকভাবে পুনরুত্থিত করবেন এবং গ্রহণ করবেন তোমাদের পৃথিবীর কার্যকাণ্ডের হিসাব। তারপর তার যথাবিনিময় দেয়া হবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রহমত অর্থ আখেরাতের রহমত। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা জোরালো কণ্ঠে পরকাল, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান (হাশর) কে অস্বীকার করতো। তাই পূর্বের আয়াতে তাদের খারাপ পরিণতির কথা বিবৃত করার পর এই আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্পাক তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই প্রশ্নটির মাধ্যমে— আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? এরপর বলেছেন, দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাসীদেরকে দয়া করা তিনি তাঁর দায়িত্ব বলে নিজে নিজেই নির্ধারণ করে নিয়েছেন।

এখানে 'লা ইয়াজমাআ'ন্নাকুম' শব্দটির শুরুতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটিকে বলা হয় গুরুত্ব সঞ্চারক 'লাম' (লামে তাকীদ)। বিষয়বস্তুকে অধিকতর গুরুত্ববহ ও সুনিশ্চিত করে তুলবার জন্য এই লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানেও এই অক্ষরটি ব্যবহারের মাধ্যমে কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গটিকে নিঃসন্দিগ্ধ করা হয়েছে। শেষে স্পষ্টতঃ বলেও দেয়া হয়েছে— লা রইবা ফি (এতে কোনোই সন্দেহ নেই)।

আর রহমত একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ইহকালে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই আল্লাহ্পাকের এই রহমত বা দয়া পেয়ে থাকে। সুতরাং এ থেকে কেউ এ রকম ধারণা করতে পারে যে, আখেরাতেও বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলে আল্লাহ্পাকের রহমত পেয়ে যাবে। কিন্তু ধারণাটি যে সম্পূর্ণতঃই ভুল, সে কথা শেষ বাক্যটিতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আখেরাতে কাফেরেরা অবশ্যই বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা খসিরু আংফুসাহুম ফাহুম লা ইউমিনুন' (যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না)। এ কথার অর্থ—

তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরিক করার জন্য নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে। নষ্ট করে দিয়েছে আখেরাতে আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্তির যোগ্যতাকে। তাই পৃথিবীতে তারা যে রহমত লাভ করছিলো, সে রহমত লাভের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলবে। সে যোগ্যতা হচ্ছে প্রশান্ত স্বভাব ও পরিশুদ্ধ জ্ঞান।

ফাহুম লা ইউ'মিনুন (তারা বিশ্বাস করবে না)। বাক্যটির প্রথমে 'ফা' অক্ষরটির স্থাপনের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা চির অবিশ্বাসী তারা কস্মিনকালেও ইমান আনবে না। পরিপূর্ণ ও অসীম জ্ঞানের কারণে আল্লাহ্‌পাক এ কথা সুস্পষ্টরূপে অবগত। তাই তিনি বলেছেন, তারা বিশ্বাস করবে না।

'আল্লাজিনা খসিরু' (যারা নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে) — এ কথাটির পূর্বে 'ওয়াও আতেফাহ্‌' বা সংযোজক অব্যয় (এবং) উল্লেখ থাকলে পূর্বের বাক্য 'লা রইবা ফি' (কোনোই সন্দেহ নেই) এর সঙ্গে সংযোগ ঘটতো। কিন্তু এ রকম সংযোজন ঘটালে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকতো যে, কিয়ামত যদি সন্দেহাতীত কোনো বিষয় হয় তবে অবিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে কেনো? এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, কিয়ামত নয়— কিয়ামতের উপর ইমান না থাকাই কাফেরদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, 'আল্লাজিনা' শব্দটি এখানে একটি অনুক্ত ও মন্দ ক্রিয়ার কর্ম।

হজরত আবু উমামা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের রহমত সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু কাফেরেরা ইমানবিহীন হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বলে সেই রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পালিয়ে বেড়ায়— যেমন উদ্ভ্রান্ত উট পালিয়ে বেড়ায় তার মালিকের নিকট থেকে। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও হাকেম।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'ওয়ালাহু মা সাকানা ফিল্লাইলি ওয়ান নাহার' (রাত্রি ও দিবসে যা কিছু থাকে তা তাঁরই)। এখানে উল্লেখিত সাকানা শব্দটি গঠিত হয়েছে সুকনা থেকে। শব্দটির পরে সাধারণতঃ আসে স্থানবাচক কোনো কথা। যেমন— ফিল বাইত, ফিল মাসজিদ ইত্যাদি। কিন্তু এখানে স্থানের পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে সময়কে। রাত্রি ও দিবসকে। প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা বুঝানোর জন্যই এ রকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ সময়কে এখানে করা হয়েছে স্থানের স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এ কথাটি বলা যে, স্থানের মতো সময়ও শান্তিপ্রদায়ক হতে পারে। অন্য আয়াতেও এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'সাকান্‌তুম ফি মাসাকিনাল্লাজিনা জলামু আনফুসাহুম', — এখানে ফি-এর পরে স্থানের উল্লেখ এসেছে।

'মা সাকানা ফিল্‌লাইলি ওয়ান্নাহার'— এই বাক্যাংশটির মা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল বস্তুকে যেগুলোর উপর দিবস রজনী আবর্তিত হয়। সুকুনুন

থেকে সাকানা শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে— এ রকমও বলা যেতে পারে। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হবে, সকল কিছু আল্লাহ্র জন্য যিনি দিবস যামিনীর বিবর্তনের মধ্যে সে সকলকে শান্ত রাখেন অথবা আন্দোলিত করেন। কিন্তু এখানে আন্দোলিত হওয়ার কথা একারণেই প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে যে, আন্দোলন বা অস্থিরতা শান্তি বা প্রশান্তির পরিপন্থী। কোনো কোনো সময় একটি বিষয়ের উল্লেখের মাধ্যমে দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করা হয়ে থাকে। যেমন— 'সারাবিলু তাক্বিকুমুল হার্‌রা' (ওই পোশাক যা তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে)।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়াহুয়াস সামিউল আলীম' (এবং তিনিই সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। কথাটির মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসীদের শাস্তির সংবাদ। সংবাদটি এই— আল্লাহ্পাক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধারণা, বক্তব্য ও আচরণ– কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়। সুতরাং শাস্তি থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেই।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৪, ১৫

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

❒ বল, 'আমি কি আস্‌মান ও জমিনের স্রষ্টা' আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জীবিকা দান করে না,' এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই,' আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে 'তুমি অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

❒ বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে;

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'ক্বুল আগাইরাল্লহি আত্তাখিজু ওয়ালিইয়্যা' (বলুন, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবো)। কথাটি একটি অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাস্য হওয়াকে নিবারণ করা হয়েছে। অভিভাবক অর্থ এখানে— উপাস্য। সাধারণ অভিভাবকত্ব নয়। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'ফাতিরিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' (যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা)। সেই

স্রষ্টা—যিনি চিরবিদ্যমান। 'ফাতির' শব্দটি এখানে ইজাফাতে মা' নুবীয়্যা। অর্থগত সম্বন্ধ নির্দেশক। ফাতির কর্তা এবং আসমান ও জমিন হচ্ছে কর্ম। তাই বাক্যটির অর্থ হবে—আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াহুয়া ইউত্‌ই'মু ওয়ালা ইউত্‌আ'মু' (তিনিই জীবিকা দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না। এখানে 'তোআ'ম' অর্থ জীবিকা বা জীবনোপকরণ। (খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু)। অন্য সকল প্রয়োজনের মধ্যে খাদ্য বস্তুর প্রয়োজনই সর্বাধিক। তাই এখানে রিজিক না বলে বলা হয়েছে তোআ'ম।

কতিপয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী রসুল স.কে প্রচলিত ধর্মমত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলো। তাদের সেই অসৎ পরামর্শের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী বাক্যটি— 'ক্কুল ইন্নি উমিরতু আন আকুনা আউয়ালা মান আসলামা' (এবং বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই) এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের মধ্যে রসুল স. ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এরপরের বাক্যটি এ রকম—'ওয়ালা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকীন'— এ কথার অর্থ, (আমাকে এ রকমও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে) 'তুমি অংশীবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 'ক্বিলা' শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটিসহ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হবে—কস্মিনকালেও তুমি অংশীবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (ক্বিলা লা তাকুনান্না মিনাল মুশরিকিন)।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি যদি আমার প্রভুপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে।' এখানে মহাদিন অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটির বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— আমি ওই মহাদিবসের কথা স্মরণ করে ভীত ও চিন্তিত। এটা নিশ্চিত যে, আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই, অন্য কোনো কিছুকে উপাস্য নির্ধারণ করি— তবে ওই ভয়াবহ দিবসে আল্লাহ্‌পাক নিশ্চয়ই শাস্তি দান করবেন। এভাবে আয়াতটির মাধ্যমে কাফেরদের কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতটি দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে তোমরা শাস্তির উপযোগী হয়েছো। তাই তোমাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। এখানে 'আজাবা ইয়াওমিন' (মহাদিনের শাস্তি) কথাটি 'আখাফু' (আমি ভয় করি) এর কর্ম। 'আখাফু' শব্দটি 'ইন্‌আ'সাইতু রব্বি' (যদি আমার প্রভুপালকের অবাধ্যতা করি) কথাটির শর্তপূরক নয়। এখানে শর্তপূরক কথাটি রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ শর্তপূরক রীতিতে ব্যবহৃত হলেও কথাটি মূলতঃ শর্তপূরক নয়। সুতরাং অনুক্ত বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

❒ 'সেই দিন যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি তিনি তো দয়া করিবেন এবং ইহাই স্পষ্ট সফলতা।'

❒ আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

❒ তিনি আপন দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'মাই ইউস্‌রাফ আ'নহু ইয়াওমাইজিন ফাক্বদ্ রহিমাহু' (সেই দিন যাকে উহা হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি তিনি তো দয়া করবেন)। এ কথার অর্থ, সেই ভয়াবহ পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাবে কেবল সে-ই— যার প্রতি বর্ষিত হবে আল্লাহ্‌পাকের রহমত। অতএব যার উপর থেকে আযাব সরিয়ে দেয়া হবে তার প্রতি আল্লাহ্‌র হক আদায় করা অত্যাবশ্যক হবে না কেনো? এখানে ইয়াওমা ইজিন' শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'জবরে'র উপর।

ক্বারী আসেম এবং ক্বারী ইয়াকুব 'ইউস্‌রাফ' শব্দটিকে পড়েছেন 'ইউস্‌রিফ।' এ রকম পড়লে আযাব হবে কর্ম এবং মনে করতে হবে এর কর্তা আল্লাহ্ শব্দটি এখানে অনুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ক্বেরাত হচ্ছে ইউস্‌রাফ— যার ফায়েল বা কর্তা হচ্ছে আযাব।

'ওয়া জালিকাল ফাউযুল মুবীন' (এটা স্পষ্ট সফলতা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ফাউযুল অর্থ মুক্তি, সফলতা, ধ্বংস। কিন্তু এখানে ধ্বংস অর্থটি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, তা বাক্যের পূর্বাপর বর্ণনার পরিপন্থী। আবার এর অর্থ যে পরিত্রাণ— সে কথাও বলা যায় না। কেননা আযাব সরে যাওয়ার অর্থই মুক্তি। তাই এখানে শব্দটির অর্থ মুক্তি করা হলে তা হবে পুনরুক্তির দোষে দুষ্ট। সুতরাং এখানে ফাউযুন শব্দটির অর্থ হবে সফলতা। এ রকম অর্থের মাধ্যমে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শাস্তি অপসারিত হলেই জান্নাতে প্রবেশ হয়ে পড়ে অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ এ রকম কিছুতেই হতে পারে না যে— কারো উপর থেকে শাস্তি অপসারণ করা হলো, অথচ সে বেহেশতে প্রবেশ করলো না। এই ব্যাখ্যাটির দ্বারা মোতাজিলাদের মতবাদটিও ভুল প্রমাণিত হলো। তারা বলে

থাকে, শাস্তি অপসারণ এবং বেহেশতে অনুপ্রবেশের মধ্যে আরেকটি স্তর বা অধ্যায় রয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইঁ'ইয়াম সাস্‌কাল্লহু বিদুর্‌রীন ফালা কাশিফালাহু ইল্লাহুয়া' (আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্লেশ দান করলে— তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই)। এখানে 'দুররুন' শব্দটির অর্থ কঠিন দারিদ্র, পীড়া অথবা শাস্তি। আর 'ফালা কাশিফা' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— ওই কঠিন ক্লেশ মোচন করার ক্ষমতা কারো হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ক্লেশ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ দূর করতে সক্ষম নয়। যদি এ রকম না হতো, তবে আল্লাহ্‌পাক যে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, সে কথা প্রমাণিত হতো না। কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক সকল দোষক্রুটি, দুর্বলতা ও অপারগতা থেকে পবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে 'ওয়া ইঁইয়্যাম সাস্‌কা বিখইরিন ফাহুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদির' (আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান)। এ কথার অর্থ বিত্তবৈভব, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাকার সকল কল্যাণ আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্তে। তিনিই সকল কল্যাণকে অবশিষ্ট রাখেন, প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা দূর করে দেন। তিনি যদি কাউকে কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে তা অপসারণ করার ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

স্বসূত্রে বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পারস্যরাজ কেস্‌রা উপঢৌকন হিসেবে রসুল স.কে একটি খচ্চর প্রেরণ করলেন। তিনি স. খচ্চরটির লাগাম ধরে তার উপর আরোহণ করলেন। আমাকেও বসিয়ে নিলেন তাঁর পশ্চাতে। এভাবে কিছু পথ অতিক্রম করার পর তিনি স. বললেন, বৎস! আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রসুল! আজ্ঞা প্রতিপালনে আমি প্রস্তুত। তিনি স. বললেন, তুমি যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিপালন কোরো, আল্লাহ্‌ তোমাকে রক্ষা করবেন। এ রকম যথাআনুগত্য তোমাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন করবে। সুখের সময় আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়ো না। তাহলে দুঃখের সময়ে আল্লাহ্‌ তোমাকেও বিস্মৃত হবেন না। বিপদে তিনিই ত্রাতা। যদি কিছু চাইতে হয়, তবে তাঁর নিকটেই চেয়ো। সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে তাঁর সকাশেই সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আল্লাহ্‌র নির্ধারণ অনুসারেই সকল কিছু সংঘটিত হয়। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকল সৃষ্টি সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। তেমনি পৃথিবীর সকলে মিলে চেষ্টা চালালেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তবিরোধী হয়। অতএব তুমি সংকটে পতিত হলে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধারণ কোরো এবং পুণ্য কর্মে নিয়োজিত থেকো। পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সক্ষম না হলেও ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। অপছন্দনীয় পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ বড়ই উত্তম। এ কথাটিও জেনে রেখো যে, ধৈর্যের পরে আসে সাহায্য। সংকীর্ণতার পরে আসে প্রশস্ততা এবং সহজতা আসে কাঠিন্যের পরে। আহমদ ও তিরমিজি হাদিসটিকে উত্তম ও বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। তিরমিজির বিবরণটি সংক্ষিপ্ত। সেখানে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ধৈর্য ধারণ কোরো, পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থেকো— এ ধরনের কথাগুলো নেই।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'ওয়াহুয়াল ক্বহিরু ফাওক্বা ই'বাদিহি ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবির' (তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা)। 'ক্বহিরু' অর্থ পরাক্রমশালী, সকল কিছু যার পরাক্রমের নিকটে অবদমিত। কুদরত ও ক্বহর অর্থগত দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও কুদরত অপেক্ষা ক্বহর অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কুদরতের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীকে বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা হয়। আর ক্বহরের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পর্যুদস্ত করার অর্থটি প্রকাশ পায়।

'ফাউকা ইবাহিদি' অর্থ আপন দাসদের উপর। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিধেয়। প্রথম বিধেয়টি ছিলো আল ক্বাহির। এখানে 'ফাওক্বা' অপেক্ষা ক্বাহির অধিকতর পরাক্রম প্রকাশক হওয়াই সমীচীন।

'ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবির' অর্থ—তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা। মহাকুশলী তিনি। তাঁর নির্দেশের হেকমত বা কৌশল সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত। তিনি খবির বা জ্ঞাতা। সকল সংবাদ তাঁর মহাজ্ঞানের অধীন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর নিকট গোপন নয়।

কালাবীর বর্ণনায় রয়েছে, কতিপয় মক্কাবাসী মহানবী স. সকাশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! তোমার রসুল হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে, এমন লোক কোথায়? আমরা তো সে রকম কাউকে খুঁজে পেলাম না। আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তারা বলেছে, তাদের গ্রন্থে তোমার রেসালাত সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৯, ২০

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۘ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۠

❒ বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?' বল, 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি; তোমরা কি

এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহের সহিত অন্য ইলাহ্ও আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না;' বল, 'তিনি একক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।'

❒ যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাহাদিগের সন্তানগণকে; যাহারা নিজেরাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

এরশাদ হয়েছে— 'কুল আইয়্যু শায়্যিন আক্‌বারু শাহাদাহ্' (বলো সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী?)। প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তুকে বলা হয় 'শাই'। সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে 'শাই' অর্থ বস্তু। আকবর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব। কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? প্রশ্নটি করা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতাকে। এর উত্তরের অপেক্ষা না করে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে পরক্ষণেই এই নির্দেশটি প্রদান করেছেন— 'কুলিল্লাহু শাহীদুন বাইনি ওয়া বাইনাকুম' (বলো আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী)। এখানে আল্লাহ্ই উদ্দেশ্য এবং বিশেষ কারণবশতঃ এখানে বিধেয়টি লুপ্ত হয়েছে। আর কুলিল্লাহ্‌র পরে উল্লেখিত শাহীদুন বিধেয়টির আগে 'হুয়া' একটি অনুক্ত উদ্দেশ্য হিসেবে বিদ্যমান। অথবা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ এবং বিধেয় শাহীদুন। আর সম্পূর্ণ বাক্যটিই কুল শব্দটির মাফউল বা কর্ম। এখানে আল্লাহ্ যখন সাক্ষী, তখন তিনি নিজেই বড়ো সাক্ষী।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'শাই' শব্দটির অর্থ মাশহুদ (যে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) এবং শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। যদি তাই হয় তবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমার রেসালাত সঠিক কি না সে সম্পর্কে সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ্। আর আল্লাহ্‌পাক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাক্ষী কে? সেই আল্লাহ্ই যখন মোজেজার মাধ্যমে আমার রেসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন তখন আমার রেসালাত নিশ্চয়ই সত্য। এই ব্যাখ্যাটির জন্য বৃথা কোনো আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। এখানে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য অর্থ ওই মোজেজা সমূহ যা তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রদান করেছেন। আর ওই মোজেজাসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হচ্ছে মহা-গ্রন্থ আল কোরাআন। তাই পরক্ষণে বলা হয়েছে— ওয়া উহিয়্যা ইলাইয়্যা হাজাল কুরআনু লিউনজিরাকুমবিহি ওয়ামান বালাগা (এবং এই কোরআন আমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে যেনো তোমাদেরকে— যার নিকট এটা পৌঁছুবে— তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি)। এর অর্থ— হে প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে অর্বাচীন জনতা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র এককত্বে এবং আমার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে আমি এই কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকবো। এখানে 'কুম' শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে। মানবালাগা (সতর্ক করি) কথাটি কুম শব্দটির সঙ্গে

সম্পর্কিত। এভাবে কথা দু'টির সম্মিলিত সম্বোধনকৃতরা হবে ওই সকল মানুষ ও জ্বিন, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলো অথবা যারা পৃথিবীতে আগমন করবে কিয়ামত পর্যন্ত।

নবী ও রসুলগণের আবশ্যিক কর্তব্য হচ্ছে অনুগতদেরকে সুসংবাদ প্রদান এবং অবাধ্যদেরকে সতর্ককরণ। কিন্তু এখানে কেবল সতর্ককরণ কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকম করা হয়েছে প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতের কারণে। এ রকমও হতে পারে যে, সতর্ককরণ বা ভয় প্রদর্শন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অধিকতর ফলদায়ক। ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কেউ উপকৃত না হলে সুসংবাদের মাধ্যমে তার উপকার লাভের সম্ভাবনা বৃথা। কারণ এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া উপকারপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত পেলেও তা অন্যের নিকটে পৌঁছে দাও। বনী ইসরাইলদের বিবরণসমূহও প্রচার করতে পারো। এতে সংকীর্ণতার কোনো কারণ নেই (যদি তা হাদিস শরীফের অনুকূল হয়)। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সঙ্গে মিথ্যা সংযোগ করে, সে যেনো তার আশ্রয় নির্বাচন করে নরকে। বোখারী, মুসলিম। হাদিসে উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের বিবরণ অর্থ ওই সকল বনী ইসরাইলদের বিবরণ, যারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে মিথ্যাবাদী বনী ইসরাইলদের বিবরণের কোনোই মূল্য নেই।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব এবং হজরত মুগিরা বিন শো'বা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার কথা হিসেবে কোনো মিথ্যা কথা বর্ণনা করে— সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর ওই বান্দার মস্তক চিরসবুজ করে দিবেন, বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন — যে আমার কথা শুনে স্মৃতিবদ্ধ করলো, অনুধাবন করলো এবং অন্যের নিকট প্রচার করলো। এমনও হতে পারে, যে পৌঁছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে-ই অধিকতর বিচক্ষণ।

তিনটি বিষয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতা থাকা অনুচিত। ১. একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহ্পাকের উপাসনা করা। ২.মানুষের কল্যাণাকাঙ্খী হওয়া। ৩. বিশ্বাসীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ থাকা। এ কথাটি সন্দেহাতীত যে, তাদের আহবান পরে আগমনকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম বায়হাকী। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং দারেমী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জায়েদ বিন সাবেত থেকে। কিন্তু তিরমিজি ও আবু দাউদের বর্ণনায় 'তিনটি বিষয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে সঙ্কীর্ণতা থাকা অনুচিত'— কথাটি নেই।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী বলেছেন, যার কাছে কোরআন মজীদ পৌছেছে, সে যেনো রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং তাঁর নিকট থেকে কোরআন শুনেছে।

এরপর পুনরায় অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন করা হয়েছে এইভাবে— 'আইন্নাকুম লা তাশ্হাদুনা আন্না মাআল্লাহি আলিহাতান উখ্রা' (তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য উপাস্যও আছে?)। এ কথার অর্থ, হে মক্কাবাসী, তোমাদের সম্মুখে জ্ঞান ও কোরআন (আক্লি ও নক্লি) প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এতদসত্ত্বেও তোমরা বিবেকবর্জিত, মূঢ়। তাই তোমরা এখনও ধারণা করে চলেছো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকা সম্ভব। কেনো? আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কাবাসীরা আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য চেয়েছিলো। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর এককত্বের সাক্ষী। তাঁর এককত্বের বিষয়টি সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তদুপরি অবতীর্ণ করা হয়েছে কোরআন— যা একটি প্রত্যক্ষগোচর মোজেজা। এই সাক্ষ্যটি একটি সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য। অথচ হে মক্কাবাসী, এই অনন্য মোজেজা প্রত্যক্ষগোচর করার পরেও তোমরা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে শিরিক করতে চাও। কেনো? —এভাবে বিস্ময়বোধক প্রশ্ন প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের প্রশ্ন ও অপবিত্র ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

আমি বলি, সম্ভবত মক্কাবাসীরা তৌহিদী নয়, রেসালাতের সাক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলো। কেননা রেসালাতের সাক্ষ্যের জন্য তৌহিদের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু তৌহিদের সাক্ষ্যের জন্য রেসালাতের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'কুল লা আশ্হাদু' (বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! সাক্ষ্য সন্ধানী মক্কার জনতাকে জানিয়ে দিন উপাস্য নির্ধারণ সম্পর্কে তোমাদের দোদুল্যচিত্ততা ও শিরিকদুষ্টতাকে আমি সমর্থন করি না। আমি কিছুতেই তোমাদের বিকৃত বিশ্বাসের স্বপক্ষ নই।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'কুল ইন্নামা হুয়া ইলাহুঁউ ওয়াহিদুঁউ ওয়া ইন্নানী বারিউম মিম্মা তুশরিকুন' (বলো তিনি একক উপাস্য এবং তোমরা যে শরীক করো তা থেকে তিনি নির্লিপ্ত)। এ কথার অর্থ— উপাস্য হিসেবে, স্রষ্টা হিসেবে, চিরন্তন সত্তা হিসেবে, জীবনপোকরণ প্রদাতা হিসেবে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে, সকল গুণে গুণান্বিত হিসেবে, পূর্ণতা ও পবিত্রতার অধীশ্বর হিসেবে তিনি একক। তাঁর এই অতুলনীয় এককত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অন্য কেউই অংশীদার নয়। অন্য কারো আকৃতি, প্রকৃতি, সম্পৃক্তি থেকে তিনি পবিত্র। অন্যের শারীরিক, আত্মিক, স্থানগত, সংখ্যাগত, ধারণাগত অংশগ্রহণ থেকে তিনি মুক্ত। আমার এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, আল্লাহ্পাকের সত্তা তো অতি অবশ্যই অতুলনীয় এককত্বমণ্ডিত। অথচ এখানে বলা হয়েছে ইলাহুউ ওয়াহিদ (তিনি একক আল্লাহ্)। এ রকম বলার কারণ কী? এখানে কেবল 'ইলাহুন' বললেই তো চলতো। এ রকম প্রশ্নের উত্তর রয়েছে

আমার ব্যাখ্যাটির মধ্যেই। ইলাহুন অর্থ উপাস্য। এখানে কেবল ইলাহুন উল্লেখিত হলে এ রকম অপধারণার অবকাশ থাকতো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যও তাহলে রয়েছে। তাই ওয়াহিদ শব্দটি ইলাহ শব্দটির সঙ্গে সংযুক্ত করে (ইলাহুঁউ ওয়াহিদ বলে) ওই অপধারণার সম্ভাবনাটির মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এভাবে এ কথাটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে— আল্লাহ্পাকই প্রকৃত অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্বে, গুণাবলীতে এবং কার্যাবলীতে অন্য কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ইন্নামা শব্দটি সীমিত অর্থবোধক শব্দ নয়। বরং এর মধ্যে শব্দটি 'মা মাউসুলা' (সম্পর্কযুক্ত বিশেষ্য পদ)। আর 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি এখানে ওই বিশেষ্য পদের স্থলাভিষিক্ত। এভাবে 'ইন্নামা হুয়া ইলাহুঁউ ওয়াহিদ'—শব্দগুলো অবিচ্ছেদ্য। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— যিনি উপাস্য তিনি এক। তিনিই কেবল চিরন্তন ও সকল গুণাবলীর অধিকারী। সত্তায়, গুণে, কার্যে তাঁর অংশীদার কেউ নয়। তিনিই অংশীবিহীন, অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অংশীদারিত্বের ব্যাপারে যে সকল কথা বলে যাচ্ছো, সে সকল কথা আমি বলি না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি আল্লাহ্পাকের নিরঙ্কুশ এককত্বের।

শেষে বলা হয়েছে —'ওয়া ইন্নানি বারিউম মিম্মা তুশরিকুন' (এবং তোমরা যে শরীক করো তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। এখানে 'মিম্মা' শব্দটির 'মা' যদি 'মা মাউসুলা' (সম্পর্কযুক্ত বিশেষ্য পদ) হয় তবে আলোচ্য কথাটির অর্থ হবে— তোমরা যে প্রতিমাগুলোকে উপাস্য নির্ধারণ করে আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শিরিক করে চলেছো, সেগুলো থেকে আমি বিমুখ। আর 'মিম্মা' শব্দটির 'মা'—'মায়ে মাসদারিয়াহ্' হলে মা তাশকুরুন কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শিরিক করো। তাই আমি তোমাদের প্রতি অপ্রসন্ন, নির্লিপ্ত।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা আতাইনাহুমুল কিতাব'। এ কথার অর্থ, যাদেরকে আমি আসমানী কিতাব দিয়েছি। অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিল দিয়েছি। 'ইয়ারিফুনাহু'—অর্থ, তারা রসুল মোহাম্মদ স.কে চেনে। তারা তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে। ওই কিতাবসমূহে রসুল স. এর অবয়ব সম্পর্কিত বর্ণনা, বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বভাবচরিত্রের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা সেগুলো পাঠ করে। তাই রসুল স. কে চিনতে তাদের এতটুকুও অসুবিধে হয় না। তাদের রসুল পরিচিতির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এভাবে— 'কামা ইয়ারিফুনা আব্নাআহুম (যে রূপ চেনে তাদের সন্তানদেরকে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাজিনা খসিরু আনফুসাহুম ফাহুম লা ইউ'মিনুন' (যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা বিশ্বাস করবে না)। এ কথার অর্থ, তারা বিদ্বেষবশতঃ তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসুল স, সম্পর্কিত বিবরণাদি গোপন করেছে। এভাবে প্রতারণা, আত্মম্ভরিতা, অবাধ্যতা, ও আত্মঅত্যাচারের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তাই তারা রসুল স. এর রেসালাতকে যে

বিশ্বাস করবে না— এ কথা নিশ্চিত। আল্লাহ্তায়ালা আদি অন্তের জ্ঞান সম্ভূত। তাই তিনি ভালো করেই জানেন যে, প্রতারক ইহুদীরা কখনোই ইমান আনবে না। সে কথাই শেষ বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— তারা বিশ্বাস করবে না।

মক্কাবাসীরা বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! তোমার নবুয়তের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? আমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা বলেছে, তাদের কিতাবে তোমার সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। মক্কাবাসীদের এই অপমন্তব্যটির জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে— যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। অর্থাৎ ওই মিথ্যাবাদী ইহুদীরা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এভাবে তারা হয়েছে চিরবঞ্চিত। ইমান আনলে যে জান্নাত তাদের জন্য নির্ধারণ করা হতো, সেই জান্নাতকে তারা চিরকালের জন্য হারিয়েছে। চিরকালীন ঠিকানা হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে জলন্ত হুতাশন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজা এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য দু'টি স্থান নির্ধারিত রয়েছে। একটি বেহেশ্তে। অপরটি দোজখে। সুতরাং যে মৃত্যুর পর দোজখে যায়, তার বেহেশতের উত্তরাধিকারী হয় বেহেশ্তীরা। তাই অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন।' (তাহারাই সেগুলোর উত্তরাধিকারী)।

বাগবী বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে দান করবেন জাহান্নামীদের জান্নাত এবং জাহান্নামীদেরকে দান করবেন বিশ্বাসীদের জাহান্নাম। এটাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চরম ব্যর্থতা।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটি এভাবে বিবৃত করাই ছিলো সঙ্গত— যারা বিশ্বাস করবে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করবে। কিন্তু এখানে কথাটি বলা হয়েছে বিপরীতভাবে—যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। ক্ষতি ও ধ্বংসকে অধিকতর গুরুত্বদানের জন্য এখানে এ রকম বিপরীতধর্মী প্রকাশভঙ্গিকে বেছে নেয়া হয়েছে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ২১

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❐ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জালিমগণ সফলকাম হয় না।

আলোচ্য আয়াতে অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কেউ নয়। তারা মনগড়া ধর্ম প্রবর্তন করেছে। অথচ আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কোনো প্রত্যাদেশ করেননি। আবার যা প্রত্যাদেশ করেছেন, সে প্রত্যাদিষ্ট বিষয়কে তারা করেছে অস্বীকার। অর্থাৎ তাদের জন্য অবতীর্ণ কোরআনকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অবতীর্ণ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার নিরঙ্কুশ এককত্বের প্রমাণ। আরো রয়েছে তাঁর প্রিয় রসুলের রেসালাতের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এতদ্সত্ত্বেও তারা এই অলৌকিক নিদর্শনকে করেছে প্রত্যাখ্যান। সুতরাং তাদের চেয়ে অধিক জালেম আর কে? এই বক্তব্যটিই এখানে অস্বীকৃতিসূচক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ামান আজলামু মিম্মা নিফ্তারা আ'লাল্লাহি কাজিবান আও কাজ্জাবা বিআয়াতিহি' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে?)। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, ওই অবিশ্বাসীদের চেয়ে অধিক অবিবেচক আর কে হতে পারে—যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। অথবা এ রকম কথা বলে যা আল্লাহ্তায়ালার জন্য অত্যন্ত অশোভন, অসুন্দর। এভাবে তারা বিভিন্নরূপে আল্লাহ্তায়ালার অংশী সাব্যস্ত করে। কেউ তাঁর বান্দা ও রসুলকে বলে আল্লাহ্র পুত্র। আবার কেউ আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশকারী মনে করে উপাসনা করে পাথরের। অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এখানে 'আও' (অথবা) না বলে 'ওয়াও' (এবং) উল্লেখ করলে বক্তব্যটি হতো অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কেবল মক্কাবাসীরাই ছিলো এই আয়াতের লক্ষ্য বিন্দু। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করা এবং তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা — এ দু'টো অপরাধই তাদের মধ্যে ছিলো সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু এ দু'টো অপরাধকে 'এবং' (ওয়াও) দ্বারা সংযোজন করা হয়নি। 'এবং' এর স্থলে বসানো হয়েছে 'অথবা' (আও)। এ রকম বাকভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বর্ণিত অপরাধ দু'টোর যে কোনো একটিকে যে গ্রহণ করবে, সেই হবে অত্যাচারী। অথচ মক্কাবাসীরা দু'টো অপরাধেই অপরাধী। অবলীলাক্রমে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে। আর তাঁর নিদর্শনকেও প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তারা যে প্রকৃতই অত্যাচারী— সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

এখানে 'আও' শব্দটি উল্লেখ করার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এবং আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করা— অপরাধ দু'টো পরস্পরবিরোধী। সুতরাং ও দু'টো একত্র হওয়া অনুচিত। কিন্তু কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, বিপরীতধর্মী দু'টো গুরুতর অপরাধকে একত্র করার ব্যাপারে তারা ছিলো নির্দ্বিধ। আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা মিথ্যা রটনা করতো। বিনা প্রত্যাদেশে ও বিনা বিবেচনায় তারা বলে যেতো, আল্লাহ্

অমুক কাজকে হালাল করেছেন এবং অমুক কাজকে করেছেন হারাম। কখনও আবার বলতো, আল্লাহ্‌তায়ালার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি রয়েছে। আবার বলতো, আল্লাহ্‌পাক কিয়ামতের দিন আমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোর সুপারিশ গ্রহণ করবেন। তারা এ কথাও জানে যে, ধর্মাদর্শ প্রচারিত হয় নবী রসুলের মাধ্যমে। আবার প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.কে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে তারা করে অস্বীকার। বলে, মানুষ আবার কখনো রসুল হয় নাকি। রসুল তো হওয়া উচিত ফেরেশতাদের। তাদের এহেন বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায়— মানুষ কখনো রসুল হতে পারে না। রসুল হওয়া সম্ভব— আবার মানুষ কখনো রসুল হতে পারে না, এ রকম অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী কথা তারা অবলীলাক্রমে বলে যায়। সুতরাং তাদের চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে?

শেষে বলা হয়েছে —'ইন্নাহু লা ইউফলিহুজ্‌ জলিমীন'। এ কথার অর্থ, অত্যাচারীরা সফলকাম হয় না।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অসংলগ্ন ও অশোভন আচরণ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন—ওই সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপ, যারা বিনা প্রমাণে বিগ্রহবন্দনা করে অথচ প্রেরিত পুরুষদেরকে বলে, তোমরা প্রমাণ নিয়ে এসো।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

❒ স্মরণ কর, যেদিন তাহাদিগের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে তাহারা আজ কোথায়?'

❒ অতঃপর তাহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

❒ দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে-মিথ্যা তাহারা রটনা করিত উহা কিভাবে তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইল।

'ওয়া ইয়াওমা নাহ্‌শুরুহুম জামিয়া'—অর্থ, যেদিন তাদের সকলকে একত্র করবো। অর্থাৎ যেদিন আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এবং তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে একত্র করবো। এখানে ইয়াওমা (যেদিন) শব্দটি মাফউলেফিহি। এর ক্রিয়া এখানে অনুক্ত রয়েছে। অনুক্ত ক্রিয়াটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ

রকম—স্মরণ করো, যেদিন সকলকে একত্র করবো। নির্দিষ্ট কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ এখানে না থাকার কারণ এ রকমও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিবসে সকল গুরুতর পাপ ও ভয়ংকর বিপদসমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে সকলের। নির্দিষ্ট কোনো ক্রিয়ার উল্লেখ থাকলে সেদিনের সামগ্রিক ভয়াবহতা দৃষ্টিগোচর হবে না। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কেবল উল্লেখিত বিষয়টির দিকে। অথবা আল্লাহ্তায়ালার বক্তব্যটি হবে এখানে এ রকম— কিয়ামত দিবসে যখন আমি সকলকে একত্রিত করবো, তখন এমন ভয়ংকর দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হবে, যা বর্ণনাযোগ্য নয়। সূর্য হবে সন্নিকটবর্তী। স্বেদসমুদ্রে নিমজ্জিত হবে মানুষ। আরো অনেক কিছু হবে— যা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসে এ রকম অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে।

ছুম্মা নাকুলু লিল্লাজিনা আশরাকু। অর্থাৎ তখন (তিরস্কার করার জন্য) আমি মুশরিকদেরকে বলবো। এখানে 'নাকুলু' শব্দটির সম্পর্ক ঘটেছে 'নাহ্শুরু' শব্দটির সঙ্গে। ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ হাশর প্রান্তরে হিসাব নিকাশের অপেক্ষায় দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকবে। রসুল স. বলেছেন, ওই দিন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যে দিন আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন— যেমন তীরাধারের মধ্যে রাখা হয় তীর। ওই সময় তোমাদের দিকে আল্লাহ্পাক ভ্রুক্ষেপ করবেন না। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে।

রসুল স. আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নির্বাক অবস্থায় তোমাদেরকে এক হাজার বছর ধরে আটকে রাখা হবে। তখন সকলে থাকবে বাকরুদ্ধ। বায়হাকী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে।

এরপর বলা হয়েছে, 'আইনা শুরাকাউকুমুল্লাজিনা কুনতুম তাজ্উ'মুন' (যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে তারা আজ কোথায়?)। এ কথার অর্থ— যিনি প্রকৃত উপাস্য, তাঁর সঙ্গেই তোমরা শরীক করেছো। আর ওই শরীকগুলোকেই তোমরা আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের পক্ষে সুপারিশকারী স্থির করে নিয়েছো। হে অবাধ্য, হে পাপিষ্ঠ! বলো, আজ তোমাদের মিথ্যা উপাস্যগুলো কোথায়?

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে (২৩) বলা হয়েছে— 'ছুম্মা লামতাকুন ফিত্নাতুহুম ইল্লা আন ক্বালু ওয়াল্লহি রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকীন' (অতঃপর তাদের এছাড়া বলবার অন্য কোনো অজুহাত থাকবে না যে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না)। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের দিন দীর্ঘ সময় ধরে দ্বিধাসংশয়ে থাকার পর অবিশ্বাসীরা এ রকম বলবে। এখানে ফিৎনা শব্দটির অর্থ কুফর বা অবিশ্বাস, অথবা দ্বিধাসংশয়।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত কাতাদা ফিৎনা শব্দটির অর্থ করেছেন—অজুহাত। অর্থাৎ অজুহাতই তাদের জন্য ফিৎনা বা অশান্তি। ওই অজুহাতকেই তারা তখন পরিত্রাণের উপায় বলে ধারণা করবে। কিন্তু তাদের ধারণা হবে নিষ্ফল। যেমন 'ফিৎনা তুজ্ জাহাবী' একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ, আমি স্বর্ণ থেকে খাদকে পৃথক করে দিয়েছি। এ রকমও হতে পারে যে, ওই অজুহাতটি হবে তাদের জবাব। তাদের ওই জবাব যেহেতু মিথ্যা, তাই সেটাকে এখানে ফিৎনা বলা হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফিৎনা অর্থ তাজারবাহ (অভিজ্ঞতা)। জুজায বলেছেন, শব্দটি এখানে সমবেদনাসুলভ অর্থ প্রকাশক। বিপদ উপস্থিত হলে কোনো কোনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়। বলে, তোমার জন্যই আজ আমার এই দুর্দশা। দেবদেবীর প্রতি প্রণয়াসক্ত অবিশ্বাসীরাও তেমনি কিয়ামতের ভয়ঙ্কর বিপদ দেখে তাদের পূজিত দেবদেবীর উপর রাগান্বিত হয়ে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলো বলবে।

আমি বলি, শুধু দেবদেবী নয়—সেদিন তারা তাদের নেতৃবৃন্দের উপরেও প্রকাশ করবে চরম ঘৃণা। তারপর নিরুপায় হয়ে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়লা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিসা' (আল্লাহ্ থেকে তারা কোনো কথা গোপন করবে না)। আর এখানে বলা হচ্ছে— 'ওয়াল্লহি রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকিন' (আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না)। এই বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুসারে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিবসে অবিশ্বাসীরা দেখবে, আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু মুশরিকদেরকে ক্ষমা করছেন না। তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় তাদের মুশরিক হওয়াকে অস্বীকার করবে। বলবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে বাকরুদ্ধ করে দিবেন। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য তখন দিতে থাকবে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি। মনে মনে তারা এই আক্ষেপ করতে থাকবে যে, হায়! আমরা যদি মাটি হতাম (মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারতাম)। এ রকম উপায়বিহীন অবস্থায় তারা আর কোনো কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। হজরত ইবনে আব্বাস প্রদত্ত এই ব্যাখ্যাটির মূল কথা হচ্ছে, প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের অংশীবাদীতাকে অস্বীকার করে বসবে। এরপর বাকরুদ্ধ হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সাক্ষ্যের পর তারা আর কিছুই গোপন করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে—'উনজুর কাইফা কাজাবু আলা আংফুসিহিম ওয়া দ্বল্লা আনহুম মাকানু ইয়াফতারুন' (দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রটনা করতো তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো)। এ কথার অর্থ, পৃথিবীতে অবিশ্বাসীরা নিজেরাই হারাম হালাল নির্ধারিত করে বলতো, এই নির্ধারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে। আরও

বলতো, আল্লাহ্পাকের দরবারে আমাদের পূজনীয় দেবদেবীরাই আমাদের পক্ষের সুপারিশকারী। কিয়ামতের দিন আবার তাদের স্বরচিত এই মিথ্যাচারকেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তখনকার অবস্থাই বিবৃত হয়েছে এভাবে— দেখো, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আরও দেখো, তাদের রচিত মিথ্যা আজ কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, একবার আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবু জেহেল বিন হিশাম, ওলিদ বিন মুগীরা, নজর বিন হারেস, উতবা বিন রবিআ, শাইবা বিন রবিআ, উমাইয়া বিন খালফ্, উবাই বিন খল্ফ এবং হারেস বিন আমের একত্র হয়ে রসুল স. এর পবিত্র কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো, তারা নজরকে বললো, আবু কুতায়লা! মোহাম্মদ কি বলছে? নজর বললো আমি জানি না। জিহ্বা সঞ্চালন করছে মাত্র। আর পুরনো জামানার লোকদের সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলছে, যে সকল কথা আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে থাকি। উল্লেখ্য যে, নজর অতীত সম্প্রদায়ের কাহিনী মাঝে মাঝে বর্ণনা করতো। আবু সুফিয়ান বললো, মনে হয় সে কিছু কিছু সত্য কথাও বলছে। আবু জেহেল বললো, কখনোই নয়। এ রকম কথা তুমি বোলো না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ রকম বলার চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যুই শ্রেয়। তাদের এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ২৫

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

❒ তাহাদিগের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি, এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না; এমন কি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ বলে 'ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

'ওয়ামিনহুম মাঁই ইয়াস্‌তামিউ' ইলাইকা' (তাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পেতে রাখে)। —এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি যখন কোরআন আবৃত্তি করতে থাকেন, তখন তারা তা কান পেতে শোনে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াজায়াল্না আ'লা কুলুবিহিম আকিন্নাতান আই ইয়াফকুহুহু' (কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেনো তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে)। এখানে 'আকিন্নাতুন' শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 'কিনান'। আকিন্নাতুন অর্থ আবরণ, পর্দা বা অন্তরায়। এই শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে এখানে বলা হয়েছে, আমি ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি এজন্য যে, তারা যেনো কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াফি আজানিহি ওয়াকুরা' (তাদেরকে বধির করেছি)। তারপর উল্লেখ করা হয়েছে—ওয়া ইঁয়ারাও কুল্লা আয়াতিল্লা ইউ'মিনুবিহা (এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা ওতে বিশ্বাস করবে না)। এখানে আয়াত বা নিদর্শন অর্থ মোজেজাসমূহ। আল্লাহ্পাক তাদের চোখ ও অন্তরে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ওই অন্তরায়ের কারণে তারা রসুল স. এর সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে। এভাবে ক্রমাগত শত্রুতার কারণে তাদের অবস্থা এমতোপর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা হয়ে পড়েছে বিবেচনাহীন ও বিবেকহীন। তারা আর সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, তারা ওতে বিশ্বাস করবে না।

শেষে বলা হয়েছে—'হাত্তা ইজাজাউকা ইউজাদিলুনাকা ইয়াকুলুল্লাজিনা কাফারু ইন্হাজা ইল্লা আসাত্বিরুল আউওয়ালিন' (এমনকি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, এটাতো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়)। এখানে হাত্তা শব্দটি সংযোজক অব্যয়। এর সংযোগ রয়েছে আগের বাক্যের লা ইউ'মিনুনা (তারা ওতে বিশ্বাস করবে না) কথাটির সঙ্গে। আর 'ইজা' শব্দটি ক্রিয়ার আধার, শর্তের অর্থপ্রকাশক। এই শর্তের প্রতিফলন ঘটেছে 'ইউজাদিলুনাকা' (আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়) এর ব্যাখ্যারূপে 'তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে' কথাটিতে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে 'জা-উ' (তারা যখন আসে) ক্রিয়ার কর্তা থেকে ইউজাদিলুনাকা (আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়)) হচ্ছে অবস্থা বা হাল যার শর্তপ্রকাশক প্রতিফলন ঘটেছে ইয়াকুলু (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে) কথাটিতে। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাস ও সত্য প্রত্যাখ্যানের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে তারা। তাই তারা কোরআনকে বলছে সেকালের উপকথা। কারণ বিতর্ক করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। সত্যানুসন্ধান নয়।

এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, 'হাত্তা' শব্দটি এখানে হরফে যর বা অব্যয় এবং ইজা অব্যয়টি এখানে লা ইউ'মিনুনা (ওতে বিশ্বাস করবে না) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা, প্রখ্যাত ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ সিবওয়াইহ্ এর নিকটে 'ইজা' শব্দটির শর্ত হওয়াই অধিকতর শুদ্ধ। এমতাবস্থায় ইউজাদিলুনাকা (আপনার সাথে

বিতর্কে লিপ্ত হয়) কথাটি হচ্ছে তাদের অবস্থা এবং ইয়াক্বলু (বলে) হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তারা আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করে, আপনাকে অবিশ্বাসী বলে।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'সতর' অর্থ ছত্র বা সারি— যেমন, সারিবদ্ধ বৃক্ষ, ছন্দ বদ্ধ রচনা, সারিবদ্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি। শব্দটির বহুবচন হচ্ছে সুতুর এবং আস্তার। এর বহুবচনের বহুবচন হচ্ছে আসাতীর। আসাতীরুল আহাদিস অর্থ বাজে কথা বা সৌন্দর্যহীন বচন। বায়যাবী বলেছেন, আসাতীর অর্থ আবাতীল (অনর্থক বা বাস্তব বিবর্জিত কথা)।

আমি বলি, আসাতীর এর প্রকৃত অর্থ মিথ্যা কথা বা বাজে কথা হওয়াই সমীচীন। অতীত কাহিনীগুলো অতিরঞ্জিত, বাহুল্যদুষ্ট। ওই সকল উপকথায় সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত নেই। কাহিনী রচয়িতারা সেগুলোর যথাসংরক্ষণে যত্নবান ছিলো না। তাই সেগুলোতে ধারাবাহিকতারও বালাই নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আসাতীর শব্দটিই বহুল ব্যবহারের কারণে মিথ্যা কথা, উপকথা এবং কল্প কথার অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ আসাতীর শব্দটির অর্থগত দিক দিয়ে আবাতীলের (মিথ্যার) সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ২৬

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

❐ তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজদিগকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

'ওয়াহুম ইয়ান হাওনা আ'নহু ওয়া ইয়ান আওনা আ'নহু' অর্থ— তারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা থেকে দূরে থাকে। মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া এবং কাতাদাও উদ্ধৃত বাক্যটির অনুরূপ অনুবাদ করেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে। তারা রসুল স. এর আনুগত্য এবং পবিত্র কোরআনের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতো এবং অন্য লোকদেরকেও বিরত থাকতে বলতো। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেবকে লক্ষ্য করে। তিনি রসুল স.কে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি স. যে ধর্মাদর্শ ও মহাগ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন, তা মানতেন না। এভাবে

সত্য গ্রহণে বিরত থাকতেন তিনি। হাকেম ও অন্যান্য আলেমও এ রকম বলেছেন। এমতাবস্থায় এখানে উল্লেখিত 'তারা' সর্বনামটির লক্ষ্য আবু তালেব ও তার বন্ধুবর্গ।

সাঈদ বিন আবী হেলালের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম উল্লেখ করেছেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর পিতৃব্যপুত্রদেরকে লক্ষ্য করে। তারা ছিলো দশজন। প্রকাশ্যতঃ তারা ছিলো রসুল স. এর ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিলো ঘোর বিরোধী। অন্যের আক্রমণ থেকে রসুল স.কে রক্ষা করতো। কিন্তু রসুল স. এর ধর্মাদর্শ তারা মানতো না।

বাগবী লিখেছেন, কয়েকজন নেতৃস্থানীয় অংশীবাদী আবু তালেব সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। আর তার পরিবর্তে আমাদের নিকট থেকে কতিপয় সুদর্শন যুবককে গ্রহণ করুন। আবু তালেব বললেন, তোমাদের প্রস্তাব ন্যায়ানুগ নয়। এ কথা তোমরা কীভাবে বলো যে, আমি আমার সন্তানকে তোমাদের অধীন করে দিবো। তোমরা তাকে হত্যা করবে। আর তোমাদের সন্তানদেরকে আমি সযত্নে প্রতিপালন করবো!

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আবু তালেব বললেন, যদি কুরায়েশ জনতার নিকট আমার লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো, তবে আমি (ইসলাম গ্রহণ করে) তোমার আঁখিযুগলকে শীতল করে দিতাম। তবে জেনে রেখো, যতদিন আমি জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার শত্রুদেরকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখবো।

রসুল স. এর আহবানের প্রেক্ষিতে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন আবু তালেব, যার মর্মার্থ এ রকম— আমাকে সমাহিত করার পূর্ব পর্যন্ত তোমার শত্রুরা তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। তুমি প্রকাশ্যে তোমার আহ্বানকর্ম চালিয়ে যাও। এ কাজে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই। তুমি আপন কাজে প্রসন্নচিত্ত থাকো। জুড়িয়ে যাক তোমার নেত্রযুগল। তুমি আমাকে সঠিক আহ্বান জানিয়েছো। আমি জানি তুমি আমার কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। তুমি সত্যবাদী, আমানতদার। তুমি যে ধর্মের দিকে আমাকে ডাক দিয়েছো, সে ধর্মটি সকল ধর্মের সেরা। কিন্তু আমার রয়েছে তিরস্কারের আশংকা। নিকটজনের নিকট থেকে তিরস্কৃত হওয়ার ভয় যদি আমার না থাকতো তবে তুমি দেখতে আমি কত সহজে ইসলামকে কবুল করেছি।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া ইঁ'ইয়ুহ্ লিকুনা ইল্লা আনফুসাহুম ওয়ামা ইয়াশউ'রুন (আর তারা নিজেরাই শুধু নিজেদেরকে ধ্বংস করে, অথচ তারা উপলব্ধি করে না)। এ কথার অর্থ বিদ্বেষ ও শত্রুতা করে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে চলেছে। এতে করে রসুল স. মোটেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না। অথচ এই ক্রমাগত ক্ষতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি মাত্র নেই।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط
وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

❒ তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে 'হায়! যদি আমাদিগের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

❒ না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

আখেরাতে যখন অবিশ্বাসীদেরকে দোজখের আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে তখনকার অবস্থা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। নরকাগ্নিকে প্রবেশ করানোর পূর্ব মুহূর্তে দোজখের পাশে দণ্ডায়মান কাফেরদের তখনকার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সে কথাটিই বলা হয়েছে এভাবে—ওয়ালাওতারা ইজাওক্বিফু আলান্নার (তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে)। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে ওই দোজখীদের তখনকার চরম আক্ষেপপূর্ণ কথাটি। বলা হয়েছে— ফাক্বালু ইয়ালাইতানা নুরাদ্দু ওয়ালা নুকাজ্জিবা বিআইয়াতি রব্বিনা ওয়ানা কুনা মিনাল মু'মিনীন। (এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের পুনঃপ্রত্যাবর্তন ঘটতো, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম)।

পরবর্তী আয়াতে (২৮) দোজখীদের চরম আক্ষেপপূর্ণ কথাটির প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে—বাল্‌বাদালাহুম মাকানু তুখ্‌ফুনা মিন ক্বাব্‌লু (না, পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে)। এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, দোজখের আগুন দেখার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। নিশ্চিত নরকাগ্নি দর্শনে তারা সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে সেদিন। এখানে মিন ক্বাবলু কথাটির উদ্দেশ্য দুনিয়া এবং মাকানুইউখ্‌ফুন কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর ওই সকল বৈশিষ্ট্য— যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা

ভালোভাবে জানতো। এই জ্ঞানের কারণে তারা তাদের সন্তানদেরকে যে রকম চিনে সেরকম স্পষ্টভাবে চিনে রসুল স.কে। কিন্তু এই জ্ঞানকে তারা গোপন করতো। মিন্‌ক্বাবলু কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে আখেরাতের ওই সময়, যে সময়ে অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসকে গোপন করতে চেষ্টা করবে এবং বলবে— ওয়াল্লাহু রব্বিনা মাকুন্না মুশরিকিন।

নজর বিন শুমাইল বলেছেন, এখানে 'বাদালাহুম' কথাটির অর্থ হবে বাদাআনহুম— অর্থাৎ ওই সকল কথা যা তারা গোপন করতে চেষ্টা করতো। সেই গোপনতা সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে। মুবাররাদ মাকানু ইউখ্‌ফুনা কথাটিকে উদ্দেশ্য বলেছেন এবং বাদালাহুম কথাটিকে বলেছেন বিধেয়।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালাও রুদ্দু লা আ'দু লিমানুহু আ'নহু ওয়াইন্নাহুম লাকাজিবুন (এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো পুনরায় তারা তাই করতো এবং তারাই মিথ্যাবাদী)। এ কথার অর্থ— যারা অবিশ্বাসী হয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করেছে (মৃত্যুবরণ করেছে), তারা চির অবিশ্বাসী। পৃথিবীতে তাদেরকে পুনঃপ্রেরণ করা হলেও পূর্ব জীবনের মতো তারা আল্লাহ্‌পাকের অবাধ্য হবে। চিরভ্রষ্ট তারা। তাদের সত্তার সূচনায় রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার 'আল্‌মুদিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী) নামের প্রতিফলন। সুতরাং পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করলে 'আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'— কাফেরদের এ রকম কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ জানা ও মানা কখনও এক কথা নয়। যেমন, এখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা রসুল স. এর গুণাবলী সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। তাঁকে চেনে এমনভাবে, যেমনভাবে তারা চেনে তাদের আপন সন্তানকে। তারা তাদের কিতাবে রসুল স. সম্পর্কিত বিবরণাদি পাঠ করেছে, শুনেছে, জেনেছে এবং এখন স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে— অথচ ইমান গ্রহণ করছে না। অতএব এটা নিশ্চিত যে, নরকের ওই কিনার থেকে পুনরায় পৃথিবীতে নামালেও তারা ইমান আনবে না।

তিবরানী প্রণীত আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক হজরত আদমের নিকট তাঁর অবাধ্য বংশধরগণের দোজখে নিক্ষেপের তিনটি কারণ বর্ণনা করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, হে আদম! আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছিলাম। কারণ আমি এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, মিথ্যাচার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার প্রতি রয়েছে আমার চরম ঘৃণা। যদি আমি এ রকম না বলতাম, তবে আজ তোমার সকল সন্তান সন্ততির উপর আমি রহমত বর্ষণ করতাম। কাউকে দোজখে নিক্ষেপ করতাম না। কিন্তু আমার ওই নির্দেশ লজ্ঘিত

হয়েছে। অতএব, যারা আমার প্রেরিত নবী রসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং আমার অবাধ্য হয়েছে, সে সকল মানুষ ও জ্বিন দ্বারা আমি আজ নরক পরিপূর্ণ করবো। হে আদম! আমি যাদেরকে বিশেষভাবে জানবো— তারা পৃথিবীতে বারবার গেলেও বারবার লঙ্ঘন করতে থাকবে আমার নির্দেশ, কেবল তাদেরকেই আমি চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করবো দোজখে। যারা এ রকম নয়, তাদের জন্য আজ কোনো শাস্তি নেই। হে আদম! আমি তোমাকে আমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করলাম। তোমার সন্তানদের পাপ পুণ্য আজ ওজন করা হবে। তুমি দেখতে থাকো—কার পুণ্যের পাল্লা ভারী আর কার ভারী পাপের পাল্লা। পাপাপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা অনুপরিমাণ ভারী যার হবে, তাকেও আমি আজ জান্নাতে প্রবেশ করাবো। জেনে রেখো, আমি কেবল দোজখে প্রবেশ করাবো তাদেরকেই— যারা জালেম (অত্যাচারী)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ২৯, ৩০

وَقَالُوٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

❒ তাহারা বলে 'আমাদিগের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

❒ তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে?' তাহারা বলিবে 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য,' তিনি বলিবেন, 'তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।'

'ওয়া ক্বালু ইন্‌হিয়্যা ইল্লা হায়াতুনাদ্ দুন্‌ইয়া' কথাটির অর্থ— তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আর 'ওয়ামা নাহ্‌নু বি মাব্‌উ'ছিন' অর্থ— এবং আমরা পুনরুত্থিতও হবো না। এখানে 'হিয়্যা' শব্দটি সর্বনাম— যা হায়াত (জীবন) শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত। দুন্‌ইয়া শব্দটি আদ্‌না শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। মূল শব্দটি হচ্ছে দানউন। শব্দটির শাব্দিক অর্থ ক্বুরব (নৈকট্য)। আর 'ক্বালু' (তারা বলে) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের লাআ'দু (তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও) কথাটির সঙ্গে। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— পৃথিবীতে তাদেরকে

বাধ্যতামূলকভাবে প্রেরণ করা হলেও তারা আগের মতই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকবে এবং মিথ্যা বলবে। 'ক্বালু' শব্দটির সংযোগ আগের আয়াতের 'লাকাজিবুন' (তারাই মিথ্যাবাদী) কথাটির সঙ্গে হওয়াও সম্ভব। যদি তাই হয় তবে অর্থ দাঁড়াবে— অবিশ্বাসীদের বক্তব্যটি মিথ্যা এবং তারা এই মিথ্যা কথাটি বলেছিলো পৃথিবীতে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার 'ক্বালু' শব্দটির সংযোগ রয়েছে পূর্বের আয়াতের 'নুহু' (নিষেধ করা হয়েছে) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে অর্থ দাঁড়াবে— পুনরায় তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হলে তারা ওই কাজগুলোই করবে, যেগুলো নিষিদ্ধ। এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটিতে নেতিবাচক পৃথক বাক্যে বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে কাফেরেরা যে সকল অপবিত্র উক্তি করেছিলো, আল্লাহ্তায়ালা এখানে হুবহু সে কথাগুলোই উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন— তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন; এছাড়া অন্য কোনো জীবন নেই (আমরা পুনরুত্থিতও হবো না)। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষটিতে (৩০) এরশাদ হয়েছে— 'ওয়ালাও তারা ইজ্ উক্বিফু আ'লা রব্বিহিম (তুমি যদি দেখতে পেতে তাদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে)। এ কথার অর্থ, হে আমার প্রিয় রসুল! যখন অবাধ্যদেরকে জবাবদিহির জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে দাঁড় করানো হবে, তখন ওই দৃশ্যটি আপনার নিকট হবে আশ্চর্যজনক। এখানে আল্লাহ্র দরবারে দাঁড় করানো হবে কথাটির অর্থ— তখন তাদেরকে অপদস্থ করার জন্য প্রস্তুত করা হবে। 'আলা রব্বিহিম' কথাটির অর্থ এখানে— তাদের বিষয়টি ফয়সালার জন্য তাদেরকে অভিযুক্ত হিসেবে আল্লাহ্র সমীপে উপনীত করা হবে। এ রকমও হতে পারে যে ওই সময় অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্কে প্রকৃত প্রভু হিসেবে চিনতে পারবে।

ক্বলা আলাইসা হাজা বিল হাক্ব (তিনি বলবেন, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়?)। এ কথার অর্থ, আল্লাহ্তায়ালা অথবা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে নরকের প্রহরীরা তখন বলবে, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? আলোচ্য বাক্যটি যেনো একটি অনুক্ত প্রশ্নের বিপরীতে আরেকটি উত্তরসুলভ প্রশ্ন। ওই গোপন প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্পাক এখানে এরশাদ করছেন— তিনি বলবেন, এটা কি প্রকৃত সত্য নয়? অর্থাৎ এই সমাধি থেকে পুনরুত্থান, পাপপুণ্যের হিসাব, আমলনামা, শাস্তির আয়োজন— এগুলো কি প্রকৃত সত্য নয়? এই প্রশ্নটি তাদেরকে করা হবে, তাদেরকে জ্ঞানদান কিংবা উত্তম কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তাদেরকে লজ্জিত ও অপদস্থ করাই হবে এ রকম প্রশ্নবান নিক্ষেপের উদ্দেশ্য।

উপরে উদ্ধৃত আল্লাহ্পাকের অমোঘ প্রশ্নটির জবাবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তখন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য ('ক্বালু বালা ওয়া রব্বিনা')। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সেদিন বাধ্য হয়ে এ রকম সত্য সাক্ষ্য দান

করবে। কারণ বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ সেদিন তাদের নিকট হয়ে পড়বে প্রত্যক্ষ। স্বচক্ষে সত্য দর্শনকে তারা সেদিন অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পাবে না। শিরিক ও কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত রূপে তারা সেদিন নিজেদেরকে প্রকাশ করতে চাইবে। আর তাদের স্বীকারোক্তিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে তারা। বলবে— আমাদের প্রতিপালকের শপথ নিশ্চয়ই সত্য। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে কাফেরদের এই কথোপকথন হবে কিয়ামত দিবসে একটি বিশেষ স্থানে। এ রকম আরো অনেক স্থানে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তারা। সে সকল স্থানে কখনো সত্য বলে, আবার কখনো মিথ্যা বলে পরিত্রাণ পেতে চাইবে কাফেরেরা।

শেষে এরশাদ হয়েছে— 'ক্বলা ফাজুক্বল আজাবা বিমা কুনতুম তাক্‌ফুরুন' (তিনি বলবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে সে জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ করো)। এখানে 'বিমা' শব্দটির শুরুতে যে 'বা' অক্ষরটি রয়েছে, সেই অক্ষরটি কোনো না কোনো কারণ নির্দেশক। অথবা এর দ্বারা এক বিষয়ের পরিবর্তে অন্য কোনো বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩১, ৩২

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ যাহারা আল্লাহের সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি অকস্মাৎ তাহাদিগের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে 'হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ।' তাহারা তাহাদিগের পৃষ্ঠে নিজদিগের পাপ বহন করিবে, দেখ তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

❒ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাহাদিগের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?

'ক্বদ্ খসিরাল্লাজিনা কাজ্জাবু বিলিক্বাইল্লা' কথাটির অর্থ— যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে 'লিক্বা ইল্লা' মর্ম পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থানের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে হবে।

বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, অবিশ্বাসীরা কিয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস করে না। তাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, অকৃতকার্য। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে অস্বীকার করার কারণে তাই তাদেরকে চিরশান্তিময় জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে চরম যন্ত্রণাদায়ক চিরকালীন শাস্তি।

মোতাজিলারাও আল্লাহ্তায়ালার দীদার (আল্লাহ্ দর্শন), মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং শাফায়াত (সুপারিশ) কে অস্বীকার করে। তাই তারাও দীদার, মাগফিরাত এবং শাফায়াত থেকে হবে চিরবঞ্চিত। সুতরাং তারাও ক্ষতিগ্রস্তদের দলভূত। হাদিসে কুদসীর বর্ণনায় রয়েছে আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। বোখারী, মুসলিম।

বিশুদ্ধসূত্রে ওয়াছেলাহ্র মাধ্যমে তিবরানী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— ইব্রাহিম সায়েগ বলেছেন, দীদারে ইলাহীর পরিবর্তে যদি আমাকে অর্ধেক জান্নাতের অধিকার দেয়া হয়, তবু তা আমার মনঃপুত হবে না। এ কথা বলার পর তিনি পাঠ করলেন—'কাল্লা ইন্নাহুম আঁর্ রব্বিহিম ইয়াওমাইজন লামাহ্জুবুনা ছুম্মা ইন্নাহুম লাসালুল জাহিমু ছুম্মা ইউক্বালু হাজাল্লাজি কুনতুম বিহি তুকাজ্জিবুন' (কখনই নয়, আজ তারা অবশ্যই তাদের প্রতিপালকের অন্তরালভূত। অতঃপর তারা অবশ্যই নরকে প্রবিষ্ট হবে। অনন্তর বলা হবে, এটা হচ্ছে তোমাদের মিথ্যা মগ্নতার প্রতিফল)। এরপর তিনি বললেন, এখানে 'হাজা' শব্দটিতে রয়েছে দীদারের ইঙ্গিত। হাজা অর্থাৎ 'বির্ রুইয়াত'— এখানে 'বিহি' শব্দটির মাধ্যমেও আল্লাহ্দর্শনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা জায়াত্ হুমুস্ সায়াত।' এ কথার অর্থ, এমন কি অকস্মাৎ তাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হবে। বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'হাত্তা' শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'কাজ্জাবু' (মিথ্যা বলেছে) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে সকল লোক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মিথ্যা বলেছে, তারাই হবে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত। খসিরু শব্দটির সঙ্গে হাত্তা শব্দটির কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা অবিশ্বাসীদের হতাশা অন্তহীন। এছাড়া এখানে এ রকম সন্দেহও সৃষ্টি হতে পারে যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাচারিতারও তো অবসান ঘটে। যদি তাই হয়, তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত উপনীত হবে কেনো? (আর সাআত শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে কিয়ামত)। উত্থাপিত সন্দেহের নিরসনের নিমিত্তে আমি বলি, সাআত্ শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— মৃত্যুলগ্ন। কেননা মৃত্যুই মুমূর্ষু ব্যক্তির কিয়ামত। যে মৃত্যুবরণ করলো, তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক রসুল স. এর নিকটে এসে কিয়ামতের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে শুরু করলো। রসুল স. তাদের দলের সবচেয়ে কম বয়সী লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই কিশোরটি যদি পরিণত আয়ুসম্পন্ন হয়, তবে এর বার্ধক্য আসার পূর্বেই

তোমাদের কিয়ামত এসে যাবে। সুতরাং সাআত শব্দটির অর্থ যদি কিয়ামত ধরা হয়, তবে তা দূষণীয় হবে না। কেননা মৃত্যুই হচ্ছে কিয়ামতের প্রারম্ভিকা, পদধ্বনি বা যাত্রারম্ভ। মৃত্যুর আগমন অর্থই কিয়ামতের আগমন। মৃত্যুকে কিয়ামত বলার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, মৃত্যুর পর কিয়ামতের আগমন হবে দ্রুততর। তাই মৃত্যুলগ্নকেই কিয়ামত বলা হয়েছে।

'আস্সাআত্' অর্থ 'মৃত্যু' হলে 'হাত্তা' শব্দটির সংযোগ 'খসিরু' শব্দটির সঙ্গেও হতে পারে। কেননা খুস্রান অর্থ আসল পুঁজি বিনষ্ট হওয়া। মৃত্যুলগ্নে অবিশ্বাসীদের আসল জীবন শেষ হয়ে যায়। শুরু হয় অনন্ত জীবনের অনিশ্চিত যাত্রা।

বাগ্তাতান্ অর্থ অকস্মাৎ। শব্দটি অবস্থা প্রকাশক। অথবা সাধারণ কর্ম। কেননা অকস্মাৎ আগমন— আগমনেরই একটি প্রকাশ।

'ক্বালু ইয়া হাস্রাতানা আ'লা মা ফার্রাত্বনা ফিহা' অর্থ— তখন তারা বলবে, 'হায়! একে আমরা যে অবহেলা করেছি সে জন্যে আক্ষেপ।' এখানে 'ফিহা' শব্দটির 'হা' সর্বনামটি পার্থিব জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর অবহেলা করার অর্থ পুণ্যকর্মে অবহেলা করা। তাদেরকে তখন এ কথা জানানো হয়েছিলো যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত। সেই সত্যজ্ঞানের কথা স্মরণ করে তারা কিয়ামতের দিবসে বলবে, আমরা তো এ কথা শুনেছি অথচ হায়! এই কিয়ামতকে আমরা তখন অবহেলা করেছি। কিয়ামতের উপর আমরা তখন ইমান আনিনি।

'ওয়াহুম ইয়াহ্মিলুনা আওযারাহুম আ'লা জুহুরিহিম আলা সাআ মা ইয়াজিরুন' কথাটির অর্থ— তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে তাদের নিজেদের পাপ বহন করবে, দেখো, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট।

উমরা বিন কায়েস মালায়ীর বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দা কবরে পুনর্জীবিত হওয়ার পর তার সম্মুখে উপস্থিত হবে তার পুণ্যকর্মের একটি সুন্দর, পবিত্র ও সুবাসিত আকৃতি। আকৃতিটি বলবে, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বলবে, না। তবে তুমি অতিসুন্দর, সুবাসিত এবং পবিত্র। আকৃতিটি বলবে, আমি পৃথিবীতেও এ রকম ছিলাম। আমি আপনার পুণ্যকর্ম। দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার উপর আরোহণ করেছিলাম। আজ আপনি আমার উপর আরোহণ করুন। এরপর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— 'ইয়াওমা নাহ্শুরুল মুত্তাক্বিনা ইলার্রহমানি ওয়াফ্দা' (সেদিন মুত্তাকীগণকে রহমানের (আল্লাহ্র) নিকটে দূত হিসেবে উপস্থিত করবেন)। অবিশ্বাসীদের পাপসমূহও তখন তাদের সম্মুখে হাজির হবে অত্যন্ত কুৎসিত আকারে। কুৎসিত আকারটি তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? অবিশ্বাসীরা বলবে, না। তবে তুমি অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন ও দুর্গন্ধময়। আকারটি বলবে, আমি পৃথিবীতেও এ রকম ছিলাম। আমি তোমার অসৎকর্ম। পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার

উপরে আরোহী ছিলে। আজ তোমার উপরে আরোহী হবো আমি। এরপর বর্ণনাকারী পাঠ করলেন— ওয়াহুম ইয়াহ্মিলুনা আওযারাহুম আ'লা জুহুরিহিম (তারা তাদের পৃষ্ঠদেশে নিজেদের পাপ বহন করবে)।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. ভাষণদানের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। বললেন, গনিমতের সম্পদ অপহরণ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। এরপর তিনি স. যারা চতুষ্পদ জন্তু, সোনা, রূপা ইত্যাদির জাকাত দেয় না, তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্তে বললেন, সাবধান! কিয়ামতের দিন আমি যেনো তোমাদেরকে চিৎকাররত উট ঘাড়ে নিয়ে আমার সামনে আসতে না দেখি। এমতাবস্থায় যেনো বলতে না শুনি, ইয়া রসুলাল্লহ! আমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করুন। তখন এ রকম করে কেউ বললে আমি বলবো, এখন আল্লাহ্তায়ালার সম্মুখে আমার করণীয় কিছু নেই। আমি তো পৃথিবীতে তোমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলাম। হাদিসটি দীর্ঘ। এর মধ্যে ক্ষুধার্ত ঘোড়া এবং ছাগলের সামনে খাদ্য আনা হলে ওই ঘোড়া ও ছাগলের কি অবস্থা হবে, সোনা, রূপার জাকাত না দিলে কি অবস্থা হবে— ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। বোখারী, মুসলিম। আবু ইয়ালী এবং বায্যার এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিব্রানীর মারফু বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো গৃহ বা সম্পদ অধিকার করে, কিয়ামতের দিন ওই অতিরিক্ত ঘর বা সম্পদ ঘাড়ে নিতে তাকে বাধ্য হতে হবে।

জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিমের মারফু বর্ণনায় এসেছে, যে লোক কণিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখলে রাখবে, কিয়ামতের দিন তাকে পরিয়ে দেয়া হবে পৃথিবীর সাতটি স্তরের মালা। এ বিষয়ে হজরত হাকাম বিন হারেস এবং হজরত আনাস থেকে তিবরানী কর্তৃক আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবার তিবরানী ও আহমদ কর্তৃক হজরত ইয়ালী বিন মুর্রাহ্ এবং হজরত আবু মালেক আশ্য়ারী থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে।

এরপর পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে — 'ওয়ামাল হায়াতুত্ দুন্ইয়া ইল্লা লাইবুঁ ওয়া লাহ্উন' (পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয়)। এখানে লাইবুঁ শব্দটির অর্থ উপকারবিহীন এবং উদ্দেশ্যহীন কর্ম। আর লাহ্উন শব্দটির অর্থ ওই অনর্থক কাজ যা উপকারপ্রদায়ক কাজের অন্তরায়। বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম—আল্লাহ্পাকের সন্তোষলাভের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল পার্থিব সুখ শান্তির জন্য যে কর্ম করা হয় তা ক্রীড়া-কৌতুকতুল্য। কারণ এই পার্থিবতা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং পৃথিবীর মোহ অনন্ত জীবনের সাফল্যের অন্তরায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়লাদ্দারুল আখিরাতু খইরুল্লিল্লাজিনা ইয়াত্তাকুন' (এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়)।

এখানে 'যারা সাবধানতা অবলম্বন করে' কথাটির অর্থ— যারা শিরিক ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে। দারুল আখিরাত অর্থ পরকালের আবাস। পরকালের আবাস অবশ্যই শ্রেয়। এই চির নিরাপদ আবাসের নাম জান্নাত। সেখানকার উপকার ও আস্বাদ পার্থিব উপকার ও আস্বাদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। ওই চিরস্থায়ী কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে কেবল মুত্তাকীদের (সাবধানীদের) জন্য। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট পৃথিবীই সর্বোত্তম স্থান। তাই তারা পৃথিবীর মোহে আমস্তক নিমজ্জিত। এদের কার্যকলাপ মুত্তাকীগণের কার্যকলাপের বিপরীত। তাই তাদের কার্যকলাপকে ক্রীড়া-কৌতুকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আরও একটি বিষয় এখানে প্রমাণিত হয়েছে যে, যাদের আমল মুত্তাকীগণের আমলের অনুরূপ নয়— তাদের কার্যকলাপ ক্রীড়া ও কৌতুকের মতো।

শেষে বলা হয়েছে— 'আফালা তা'ক্বিলুন' (তোমরা কি অনুধাবন করো না?)। এ কথার অর্থ— তোমরা কি এতটুকুও বুঝোনা যে, দুনিয়ার কার্যকলাপ উত্তম না আখিরাতের। কেনো তোমরা এ কথাটি বুঝতে পারো না যে, পৃথিবী বিনাশশীল, আর আখিরাত চিরস্থায়ী। কেনো অনুধাবন করতে পারো না— যে সকল কথা ও কাজ চিরস্থায়ী কল্যাণের প্রতিবন্ধক, সেগুলো অতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য?

হজরত আলী থেকে তিরমিজি এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, একবার অবিশ্বাসী আবু জেহেল রসুল স.কে বললো, তোমার কথাকে আমি মিথ্যা বলি না। মিথ্যা বলি ওই কথাগুলোকে (কোরআনের আয়াতকে), যেগুলো তুমি আবৃত্তি করে থাকো। তার এমতো ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ
مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ○

❒ অবশ্য জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহের আয়াতকেই অস্বীকার করে।

❒ তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল

যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদিগের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহের আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, প্রেরিত পুরুষদিগের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।

'ক্বদ না'লামু ইন্নাহু লা ইয়াহ্জুনুকাল্লাজী ইয়াকুলুনা ফাইন্নাহুম লা ইউকাজ্জিবুনাকা ওয়ালাকিন্নাজ্ জলিমীনা বিআয়াতিল্লাহি ইয়াজহাদুন' (অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকেই অস্বীকার করে)। এখানে ক্বদ (অবশ্য) শব্দটি ক্রিয়াকে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ রকম বলেছেন প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম বায়যাবী। যেমন— ওয়ালা কিন্নাহু ক্বদ ইয়ামলিকুল মালা নাইলুহু (প্রাপক অবশ্যই তার প্রাপ্য সম্পদ পেয়ে থাকে)। এখানে 'ইন্নাহু' শব্দটিতে ব্যবহৃত 'হু' সর্বনামটি একটি অভিজাত সর্বনাম। এ রকম সর্বনাম মহামর্যাদামণ্ডিত ব্যক্তিত্বের পূর্বোল্লেখ ব্যতিরেকেই সরাসরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, একবার আখনাশ বিন শারীক আবু জেহেল বিন হিশামকে একান্তে পেয়ে বললো, হে আবুল হাকাম! এখানে তো কেবল তুমি আর আমি। এবার তবে বলো, মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ সত্যানুসারী, না মিথ্যাচারী? আবু জেহেল বললো, আল্লাহ্র শপথ। মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু কুসাইয়ের সন্তানদের কাছে রয়েছে নেতৃত্বের পতাকা, হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব, কাবা গৃহের অভিভাবকত্ব ও পঞ্চায়েত। এর সঙ্গে নবুয়তের সম্মানও যদি যুক্ত হয় তবে কুরায়েশদের জন্য আর রইলো কি (নবুয়তের বিরোধিতা করি আমি এ কারণেই)। আবু জেহেলের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকেই অস্বীকার করে।

হজরত নাহিয়াহ্ বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল রসুল স.কে বলেছিলো, আমি তোমাকে সন্দেহ করি না, মিথ্যাবাদীও বলি না। কিন্তু যে কথা তুমি প্রকাশ করছো সেটাকে আমি মিথ্যা বলি।

'জলিমীন' অর্থ সীমালংঘনকারীগণ। বলা বাহুল্য যে, রসুল স.কে অস্বীকার করার জন্যই আবু জেহেলকে ও তার অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে সীমালংঘনকারী। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, অনাচার ও অবাধ্যতা ছিলো তাদের অভ্যাস। তাই তারা রসুল স.কে অস্বীকার করেছিলো। ওই অস্বীকৃতির মধ্যে ছিলো মিথ্যাচারীতাও। তারা রসুল স.কে মিথ্যাবাদী না বললেও তাঁর নবুয়তকে মিথ্যা মনে করে। আর নবুয়তকে মিথ্যা বলার অর্থ যিনি নবুয়ত দান করেছেন তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে, ওয়া লাক্বদ কুজ্জিবাত রসুলুম মিন ক্বলিক (তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিলো)। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। এই মর্মে প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয় রসুল! অবিশ্বাসীদের অস্বীকৃতি কোনো নতুন বিষয় নয়, পূর্বের নবী রসুলগণকেও তাঁদের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং আপনি মনঃক্ষুণ্ণ ও নিরুৎসাহিত হবেন না।

ওয়ালাক্বদ কুজ্জিবাত কথাটির দ্বারা 'তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না' এ রকম বলা হয়নি। বরং কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, রসুলকে মিথ্যাবাদী বলা অর্থ আল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলা, কেননা রসুল নির্বাচন করেন স্বয়ং আল্লাহ্। রসুল স. নিজেও বলেছেন, যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্কে কষ্ট দিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাসাবারু আ'লা মা কুজ্জিবু ওয়া উজু হাত্তা আতাহুম নাস্রুনা' (কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে)। এ কথার অর্থ, পূর্ববর্তী নবীগণকে অবিশ্বাসীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও তাঁরা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন, আপনিও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ করুন। ধৈর্যধারণের পরিণামে আল্লাহ্পাকের অভিপ্রায় ও বিধানানুসারে তাঁদের নিকট যেমন সাহায্য এসেছিলো, তেমনি আপনার নিকটেও আল্লাহ্র সাহায্য আসবে।

এর পরের কথাটি হচ্ছে— 'ওয়ালা মুবাদ্দিলা লি কালিমাতিল্লাহ্' (আল্লাহ্র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না)। এখানে 'কালিমাতিল্লাহ্' কথাটির অর্থ নবীগণকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের সাহায্যের অঙ্গীকার। অন্য আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন ১. ওয়ালা ক্বদ সাবাক্বত কালিমাতুনা লি ইবাদিনাল মুরসালিনা ইন্নাহুম লাহুমুল মানসুরুন (আমার দাস রসুলদের প্রতি পূবাহ্ণে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে আমি তাদের সাহায্য করবো)। ২. ইন্না লানানসুরু রসুলানা (আমিই রসুলদেরকে সাহায্য করে থাকি)। ৩. ওয়া ইন্না জুনাদানা লাহুমুল গলিবুন (আমার সৈন্যরাই বিজয়ী)।

কালিমাতুল্লাহ্ কথাটির অর্থ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— অযথা বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে কিংবা চাঞ্চল্য প্রকাশ করার মধ্যে কোনো উপকার নেই। ধৈর্য ধারণই শোভনীয়। সময় মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে আল্লাহ্পাকের সাহায্য অবশ্যই অবতীর্ণ হবে। আর আল্লাহ্পাকের সেই বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ জাআকা মিন্‌নাবাইল মুরসালিন' (প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে)। প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ আখফাশ বলেছেন, এখানে 'মিন' শব্দটি মিন-এ জায়েদাহ্ (অতিরিক্ত মিন)। আবার বিশিষ্ট ব্যাকরণজ্ঞ সিবওয়াইহ্ এর মতে ইতিবাচক বাক্যে অতিরিক্ত 'মিন' এর ব্যবহার বৈধ নয়। তাই তিনি বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'মিন' শব্দটি মিন-এ তাবয়িজিয়াহ্ (বিশেষ অংশকে সনাক্তকারী মিন)। এভাবে বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোনো কোনো সংবাদ আপনার নিকটে পৌছেছে, যা আপনার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট।

রসুল স. তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। অথচ মূঢ় ও অবিমৃশ্য জনতা বার বার সত্য প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তাঁকে দুঃখ দিয়েই চলেছিলো। তারা প্রায়শই মোজেজা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখতে চাইতো। রসুল স.ও আন্তরিকভাবে চাইতেন— কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হোক, যাতে করে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইমান আনার ক্ষেত্রে আর কোনো অজুহাত সৃষ্টি করতে না পারে। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো—

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩৫

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۗ وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

❐ যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

'ওয়া ইন কানা কাবুরা আ'লাইকা ই'রাদুহুম ফা ইনিস তাতা'তা আন ইয়াবতাগিয়া নাফাক্বান ফিল আরদ্বি আওসুল্লামান ফিস্‌সামায়ি ফা তা'তিইয়াহুম বিআয়াতিন' (যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট কোনো নিদর্শন অন্বেষণ করো)। এখানে তাদের উপেক্ষা (ই'রাদ্ব) অর্থ অবিশ্বাসীদের নবুয়ত ও কোরআনের প্রতি উপেক্ষা। নাফাক্বান অর্থ সুড়ঙ্গ। শব্দটি এখানে ফিল আরদ্ব

(ভূমি) এর বিশেষণ। অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যদি ভূগর্ভে কোনো প্রবেশপথ সৃষ্টি করতে পারেন এবং ওই পথে প্রবেশ করে সেখান থেকে অবিশ্বাসীদের প্রস্তাবানুসারে কোনো মোজেজা আনতে সক্ষম হন। 'সুল্লামান ফিস্সামায়ি' শব্দটির অর্থ আকাশের ছাদে আরোহণের সিঁড়ি। অর্থাৎ হে রসুল! আপনি যদি আকাশারোহণযোগ্য কোনো সিঁড়ি নির্মাণ করতে পারেন এবং সেই সিঁড়ি বেয়ে আকাশে উঠে সেখান থেকে কোনো মোজেজা নিয়ে আসতে পারেন। এভাবে পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ হবে— হে আমার প্রিয় রসুল, আপনিতো আপনার পক্ষ থেকে কোনো মোজেজা প্রকাশ করতে পারবেন না। ভূগর্ভে নামলেও না, আকাশে উঠলেও না। সুতরাং কেনো আপনি অবিশ্বাসীদের জন্য এতো চিন্তাযুক্ত? তাদের উপেক্ষাকে সহ্য করুন। ধৈর্য ধারণ করুন।

এরপর বলা হয়েছে, ওয়ালাও শাআল্লাহু লা জামায়াহুম আ'লাল হুদা (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সকল কিছুর স্রষ্টা। বান্দার ইচ্ছাও আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। কিন্তু এই অবিশ্বাসীদেরকে (যারা আপনাকে ও কোরআনকে উপেক্ষা করে) আল্লাহ্পাক পথপ্রদর্শন করতে চান না। আর পথ প্রদর্শন কেবল আল্লাহ্ই করতে পারেন। আপনি হেদায়েতদানের মালিক নন— মাধ্যম মাত্র। অতএব আপনি বিচলিত হবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন।

শেষে বলা হয়েছে, ফালা তা কুনান্না মিনাল জাহিলিন (সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল, যারা মূর্খ, তারাই আপাতঃঅসাফল্যে বিচলিত হয়। আপনি তো রসুল। সুতরাং আপনি চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিবেন কেনো। এ রকমও অর্থ হতে পারে— হেদায়েত যে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়নির্ভর, এ কথা যারা জানে না, আপনি তাদের মতো অজ্ঞ হবেন কেনো। আপনি তো আমার রসুল।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۘ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ وَ قَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❐ যাহারা শ্রবণ করে শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করিবেন; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

❐ তাহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ্ সক্ষম, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই জানে না।'

'ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাজিনা ইয়াসমাউ'ন' (যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়)। কথাটির অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনার আহ্বান তো ওই সকল লোকই শুনবে (গ্রহণ করবে), যাদেরকে আল্লাহ্পাক প্রকৃত শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েছেন। এখানে শ্রবণ করার অর্থ শোনা ও উপলব্ধি করা। শোনার পরেই আসে উপলব্ধি ও মান্যতা। তাই বলা হয়েছে যারা শ্রবণ করে, তারাই ডাকে সাড়া দেয়।

'ওয়াল মাউতা ইযাব্য়াছুহুমুল্লহু ছুম্মা ইলাইহি তুরজাউন' (আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করবেন; অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে)। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা শুনবে কীভাবে? তাদের অন্তর তো মৃত। আল্লাহ্পাক তাদের কান, চোখ ও মন আচ্ছাদিত করেছেন। তাই সত্যের আহবান, সত্যদর্শন এবং সত্য উপলব্ধি তাদের ভাগ্যে ঘটে না। তারা বুঝতে পারে না, কোনটা সত্য— কোনটা মিথ্যা। তাই তারা মৃততুল্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাক তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। কেবল তখনই তারা হবে সত্যের মুখোমুখি। কিন্তু তখন তো ভুল শোধরানোর সময় নয়। প্রতিফল লাভের সময়। তাই তখন তাদেরকে দেয়া হবে চরমতম শাস্তি। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে— বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত করবেন। তাঁর দিকেই সকলের অবশেষ প্রত্যাগমন। সেখানে বিশ্বাসীরা হবে পুরস্কৃত এবং অবিশ্বাসীরা লাঞ্ছিত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বালু লাওলা নুয্যিলা আ'লাইহি আয়াতুম মির রব্বিহি' (তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?)। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী কুরায়েশ নেতারা বলে, আল্লাহ্র নিকট থেকে মোহাম্মদের উপর কোনো মোজেজা অবতীর্ণ হয় না কেনো? উল্লেখ্য যে, অনেক অলৌকিক নিদর্শন রসুল স. এর মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছিলো। কিন্তু চিরঅবিশ্বাসীরা চাচ্ছিলো, তাদের ইচ্ছামতো আরো অধিক নিদর্শন। তাই বলেছিলো, তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— ক্কুল ইন্নাল্লহা ক্বাদিরুন আলা আইঁইউনায্যিলা আয়াতান (বলো, 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম')। এখানে 'নিদর্শন অবতারণ করতে আল্লাহ্ সক্ষম' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়, এমন মোজেজা আল্লাহ্পাক অবশ্যই অবতীর্ণ করতে সক্ষম। যেমন বনী ইসরাইলের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিলো তুর পর্বত। পর্বতের নিচে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে অবাধ্য বনী ইসরাইলেরা তখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলো। অথবা ওইরূপ নিদর্শন, যা অস্বীকার করলে ধ্বংস অপরিহার্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাকিন্না আকছারুহুম লা ইয়া'লামুন' (কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক কাংখিত অনাকাংখিত, সকল মোজেজা অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম। মোজেজার মাধ্যমে তিনি তো কাফেরদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেও সক্ষম। কিন্তু নির্বোধেরা এ কথা জানে না।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ○ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ
وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ○

❒ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যাহা তোমাদিগের মত এক একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।

❒ যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রহিয়াছে; যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন!

'ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ত্বাইরিঁয়াত্বিরু বি জানাহাইহি ইল্লা উমামুন আমছালুকুম' (ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি ওড়ে না যা তোমাদের মতো এক একটি উম্মত নয়)। এ কথার অর্থ— ভূ-পৃষ্ঠের সকল বিচরণশীল প্রাণী ও ডানার সাহায্যে উড়ন্ত সকল পাখি তোমাদের মতোই সৃষ্ট এবং যুথবদ্ধ। মানুষের চলমানতাকে অধিক গতিশীল অর্থ প্রদানের নিমিত্তে কখনো কখনো ওই চলাকে বলা হয় উড়ে চলা। কিন্তু এখানে ডানাবিশিষ্ট উড়ন্ত পাখির কথাই বলা হয়েছে। তাই শব্দ ব্যবহার ঘটেছে এ রকম— ইয়াতিরু ফি জানাহাইহি। আলোচ্য বাক্যটির বক্তব্যবিষয়টি এ রকম— হে মানুষ! অন্য সকল সৃষ্টিও তোমাদের মতো। জন্ম মৃত্যু—সুস্থতা অসুস্থতা —আহার বিহার—বংশবিস্তার, সকল দিক দিয়ে তারা তোমাদের মতো। আল্লাহ্‌পাকের পরিচিতি লাভের যোগ্যতা কেবল দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে। তাই

তোমরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার সকল নিয়ম কানুনে তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির সমান্তরাল। মা ফার্‌রাতনা ফিল কিতাবি মিনশাইয়িন (কিতাবে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে ক্রটি করিনি)। এখানে 'মিন শাইয়িন' বাক্যাংশটির 'মিন' শব্দটি অতিরিক্ত এবং 'শাইয়িন' শব্দটি এখানে মাফউলে মুতলাক (সাধারণ কর্ম পদ) — মাফউলে বিহি (সহ কর্মপদ) নয়। কারণ 'ফার্‌রাতা' শব্দটির পরে 'বা' অক্ষর ব্যতীত মাফউলে বিহি হয় না।

এখানে 'আল কিতাব' অর্থ লাওহে মাহফুজ। আল্লাহ্‌পাক আদি অন্তের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই জানেন। তাই সকল কিছুর বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন লাওহে মাহফুজে। সুতরাং জড় অজড় সকল সৃষ্টির বিবরণ রয়েছে সেখানে। 'আল কিতাব' অর্থ এখানে কোরআন মজীদও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে 'মিন শাইয়িন' (সকল কিছু) কথাটির অর্থ হবে ধর্মীয় বিধানাবলী। আর তখন বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— আমি কিতাবে (কোরআন মজীদে) সকল প্রকার ধর্মীয় বিধান বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তরূপে লিপিবদ্ধ করতে ক্রটি করিনি।

'ছুম্মা ইলা রব্বিহিম ইউহ্‌শারুন' (অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তারা সকলে একত্র হবে)। এখানে 'হুম' (তাদের) সর্বনামটির সংযোগ রয়েছে 'একত্র হবে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আগের বাক্যে উল্লেখিত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রাণী, ডানা বিশিষ্ট উড়ন্ত পাখি— সকলকে সেদিন কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে। অবশ্য হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক বলেছেন, মৃত্যুই অন্যান্য সৃষ্টির হাশর (কিয়ামতের দিন তারা পুনরুত্থিত হবে না)। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকল প্রাণী, পাখি ও কীটপতঙ্গকে পুনরুত্থিত করে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। এমন কি সেদিন অত্যাচারিত শিংবিহীন ছাগলকেও শিংবিশিষ্ট ছাগলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে। তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে—তোমরা মাটি হয়ে যাও। তখন অবিশ্বাসীরা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে হায়! আমরা যদি এখন মাটি হয়ে যেতাম (তবে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতাম)।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দেয়া হবে। এমন কি যে নিরীহ ছাগল শিংবিশিষ্ট ছাগলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলো, সেও সেদিন বদলা নিতে পারবে।

তিবরানী তার আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সর্বপ্রথম উত্থাপিত হবে একটি শিং বিশিষ্ট ছাগল এবং একটি শিংবিহীন ছাগলের মোকদ্দমা। হজরত আবু জর গিফারী থেকেও এ রকম আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, বায্‌যার এবং তিবরানী। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এর পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে, ওয়াল্লাজিনা কাজ্জাবু বি আয়াতিনা সুম্মুন ওয়া বুকমুন ফি জুলমাত (যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রয়েছে)। এ কথার অর্থ— যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা শ্রবণেন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও বধির (সত্যের আওয়াজ তারা শুনতে পায় না) এবং মুখ থাকা সত্ত্বেও বাকহীন (সত্য-সাক্ষ্য তাদের মুখে উচ্চারিত হয় না)। তারা রয়েছে অন্ধকারে। সে অন্ধকার অবিশ্বাসের, মূর্খতার, অবাধ্যতার এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের।

হেদায়েত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি চির স্বাধীন, চির মুক্ত। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। আয়াতের শেষাংশে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'মাঁইয়্যাশাইল্লাহু ইউদ্বলিল্হু ওয়া মাঁইয়্যাশা' ইয়াজ্য়াল্হু আ'লা সিরাতিম্ মুসতাক্বিম' (যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন)।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৪০, ৪১

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○

❐ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদিগের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও?'

❐ 'না, শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে? ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।

'ক্বুল আরাআইতাকুম'— এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল আপনি বলুন। তোমরা ভেবে দেখো— কথাটির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নবোধক হামযা (হামযায়ে ইস্তেফহাম)। এখানে 'কাফ' অক্ষরটি সম্বোধনসূচক। এর দ্বারা রআইতা (ভেবে দেখো) কথাটির কর্তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আরবী অভিধানানুযায়ী 'কাফ' অক্ষরটি সম্পর্কে কিছু বলা নেই। অর্থাৎ অক্ষরটি কর্তাও নয় কর্মও নয়। এখানে বরং 'রআইতা' শব্দটির দু'টি কর্মই অনুক্ত। আয়াতের বাকভঙ্গিতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে।

ফাররা বলেছেন, আরববাসীরা 'আরাআইতুকা' (তুমি কি দেখেছো) কথাটির অর্থ করে—আমাদেরকে বলো। তাফতাজানী বলেছেন, 'আরাআইতা' শব্দটির মাধ্যমে জ্ঞানের দেখা, না চোখের দেখা বুঝানো হয়— সেটাই প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে। এখানে কিন্তু শব্দটির দ্বারা 'অনুসন্ধান করে দেখো'— এ রকম বুঝানো হয়েছে। কেননা চোখের দেখা জ্ঞানার্জনের উপলক্ষ এবং জ্ঞান সংবাদ দানের উৎস বা কারণ। এখানে কারণকে কারণ বিষয়কের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

'ইন আতাকুম আজাবুল্লহি আওআতাত্ কুমুস্সায়াতু আগইরল্লাহি তাদ্উ'ন ইনকুন্তুম সদিক্বীন' (আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?)। এ কথার অর্থ— হে মূর্খ অবিশ্বাসীরা! বিগত যুগের অবিশ্বাসীদের উপর যেভাবে আযাব নেমে এসেছিলো, সেভাবে যদি এখন তোমাদের উপর আযাব আপতিত হয়, কিংবা এই মুহূর্তে যদি ভয়াবহ কিয়ামত সংঘটিত হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয়ার্থী হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কি তোমরা তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে পরিত্রাণদাতা বা পরিত্রাণদাত্রী হিসেবে আহবান জানাবে? এই প্রশ্নটির অস্বীকৃতি জ্ঞাপক প্রশ্ন পরবর্তী আয়াতে (৪১) প্রতিধ্বনিত হয়েছে এভাবে—

'বাল ইয়্যাহু তাদ্উ'ন' (না, শুধু তাকেই ডাকবে?)। এরপর বলা হয়েছে— 'ফা ইয়াকশিফু মা তাদ্উ'না ইলাইহি ইন্শায়া' (ইচ্ছে করলেই তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করবেন)। এ কথার অর্থ, দুনিয়ায় যে বিপদ থেকে তোমরা পরিত্রাণ প্রার্থী, সেই বিপদকে তিনি ইচ্ছে করলে দূর করে দিতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে পরকালের আযাব দূর করবেন না। সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী তিনি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া তানসাওনা মা তুশ্রিকুন' (এবং যাকে তোমরা তাঁর শরীক করতে, তা তোমরা বিস্মৃত হবে)। এ কথার অর্থ বিপদগ্রস্ত হলে তোমরা তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ভুলে যাবে। এখানে ভুলে যাবে অর্থ ত্যাগ করবে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাক সকল বিপদের একমাত্র পরিত্রাতা— এ কথা জন্মগতভাবে সকল মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল। তাই চরম মুসিবতের সময় অংশীবাদীরাও এক আল্লাহ্র শরণাপণ্ন হতে বাধ্য হয়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُوْنَ ○ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

❒ তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।

❒ আমার শাস্তি যখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? অধিকন্তু তাহাদিগের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহা তাহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।

❒ তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন তাহাদিগের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম; অবশেষে, তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম; ফলে, তখনি তাহারা নিরাশ হইল।

❒ অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাক্বদ আরসালনা ইলা উমামিম্ মিন ক্ববলিকা ফা আখাজনাহুম বিল্ বা'সায়ি ওয়াদ্বদ্‌দররায়ি লায়াল্লাহুম ইয়াতাদ্বার্‌রাউন' (তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয়)। এখানে 'মিন ক্ববলিকা' কথাটির 'মিন' শব্দটি অতিরিক্ত (মিন এ জায়েদা)। 'বা'সায়ি' শব্দটির অর্থ সংকট (বিত্তসংকট)। দ্বররায়ি অর্থ দুঃখ-দারিদ্র্য। আর 'তাদ্বার্‌রাউন' অর্থ পীড়ন। আয়াতটির বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনুন, ওই সকল জাতির কথা— যাদের নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছিলাম, তারা ছিলো উন্নাসিক। তাই আমি তাদেরকে অর্থসংকটে এবং দুঃখদারিদ্রে নিপতিত করেছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তারা যেনো বিনয়াবনত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফালাওলা ইজ্ জাআহুম বা'সুনা তাদ্বার্‌রাউ' (আমার শাস্তি যখন তাদের উপর আপতিত হলো তখন তারা কেনো বিনীত হলো না?)। এ কথার অর্থ আমার শাস্তি তাদের উপর পতিত হওয়া সত্ত্বেও ওই উন্নাসিকেরা বিনয়াবনত হলো না কেনো? তওবা করলো না কেনো? এখানে না বোধক শব্দ 'লা' ব্যবহারের কারণে এই অর্থটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, বিনয়নম্র হওয়ার কারণ সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অবাধ্যরা সংযত হলো না কেনো? কেনো সাড়া দিলো না সত্যের আহ্বানে? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাকিন ক্বসাত ক্বুলুবুহুম' (অধিকন্তু তাদের হৃদয় হয়ে গিয়েছিলো কঠিন)।

এরপর বলা হয়েছে ওয়া জাইয়্যানা লাহুমুয্‌শাইতানু মা কানু ইয়া'মালুন (এবং তারা যা করছিলো শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো)। এ কথার উদ্দেশ্য— দুঃখ বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বোধোদয় হয়নি। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলে তারা তাদের আচরণকেই উত্তম মনে করছিলো। এটাই হচ্ছে তাদের তওবা না করার কারণ। অর্থাৎ তাদের কঠিন অন্তর এবং শয়তানের প্রতারণা ও প্রভাবেই তারা তওবার পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফালাম্মা নাসু মা জুক্‌কিরু বিহি' (তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হলো)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে যে বিধান দেয়া হয়েছিলো, সেই বিধানসমূহ যখন তারা মানলো না, তখন তাদের উপর নেমে এলো অর্থ সংকট ও দুঃখ বিপদ। তবুও তারা সজাগ হলো না।

এরপর বলা হয়েছে ফাতাহ্‌না আ'লাইহিম আব্‌ওয়াবা কুল্লি শাইয়িন (তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মোচন করে দিলাম)। এ কথার অর্থ—বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর তওবা করলো না বলে অন্যভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা শুরু করলাম। উন্মোচন করে দিলাম সকল নেয়ামতের দরজা। এটা হচ্ছে তাদের প্রতি প্রদত্ত সাময়িক অবকাশ।

হজরত উকবা বিন আমেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যখন কেউ পাপকর্মের উপর অনড় অবস্থান গ্রহণ করে, তখন তাকে পৃথিবীতে দেয়া হয় তার পছন্দনীয় বস্তুসমূহ। এর অর্থ, তাকে দেয়া হয়েছে কিছুদিনের অবকাশ। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— 'ফালাম্মা নাসু মা জুক্‌কিরু বিহি ফাতাহ্‌না আলাইহিম আব্‌ওয়াবা কুল্লি শাইয়িন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা ফারিহু বিমা উতু আখাজ্‌না হুম বাগ্‌তাতান ফা ইজাহুম মুব্‌লিসুন' (অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে মত্ত

হলো, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে, তখনই তারা নিরাশ হলো)। এ কথার অর্থ— সাময়িক সুযোগরূপে অজস্র নেয়ামত পেয়ে ওই ভোগোম্মত্ত জনতা যখন উল্লসিত, তখন হঠাৎ এক সময় আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখনই তাদের উপর নেমে এলো নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে, 'ফাকুতিয়া' দাবিরুল ক্বওমিল্লাজিনা জলামু' (অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দাবির' অর্থ মূল অংশ বা শিকড়। এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে— ওই অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের বংশধারাও হয়েছিলো সমূলে উৎপাটিত। এখানে 'তাদের মূলোচ্ছেদ করা হলো'— এ রকম না বলে বলা হয়েছে 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো'। এতে করে বুঝা যায় যে, তাদের মূলোচ্ছেদের মূল কারণ হচ্ছে সীমালংঘন বা জুলুম। তারা ছিলো আত্মঅত্যাচারী। ওই আত্মনিপীড়নই হয়েছিলো তাদের মূলোচ্ছেদের কারণ। আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি। যথাবিনিময় দিয়েছেন মাত্র।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' (এবং প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক)। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা একটি প্রশংসনীয় কাজ। কারণ, এতে করে বিশ্বাসী ও সৎ মানুষেরা সীমালংঘনকারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পান। তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং অশান্তি উদ্রেককারী কর্ম থেকে পৃথিবী পবিত্র হয়। নিরবচ্ছিন্ন পাপাচরণ আল্লাহ্তায়ালার শাস্তিকে অবধারিত করে। তাই ওই পাপিষ্ঠদেরকে ধ্বংস করে শান্তিকামী পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্র আযাব থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়। এখানে আল্লাহ্ অভিহিত হয়েছেন 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক' রূপে। এতে করে বুঝা যায়, অত্যাচারীদেরকে ধ্বংস করা বিশ্বজগত প্রতিপালনের একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্যাধির মূলোৎপাটন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করতে হলে অত্যাচারীর মূলোৎপাটনও অনিবার্য। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ দায়িত্বটি সম্পর্কেও সচেতন করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রশংসা করা অত্যাবশ্যক। কারণ তিনিই অত্যাচারীকে ধ্বংস করে দিয়ে নিশ্চিত করেন মানবতার স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা।

পরবর্তী আয়াতে, বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমত্তার এবং অতুলনীয় এককত্বের। বলা হয়েছে—

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ إِلٰهٌ
غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِهٖ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○ قُلْ
أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, কিরূপে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহের শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদিগের উপর আপতিত হইলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে?'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—কুল আরায়াইতুম ইন আখজাল্লহু সাময়াকুম ওয়া আব্‌ছরাকুম ওয়াখতামা আ'লা কুলু বি কুম মান ইলাহুন গইরুল্লহি ইয়াতিকুম বিহি। কথাটির অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে মুশরিকের দল! তোমরা আমাকে বলো— আল্লাহ্‌পাক যদি তোমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ উপাস্য রয়েছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দিবে? এই প্রশ্নটি এখানে ইসতেফ্‌হামে তাকরীরী (স্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন)। এ রকম প্রশ্নের মাধ্যমে এখানে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হে অংশীবাদী সম্প্রদায়, তোমরা তো এ কথা ভালো করেই জানো যে— শ্রুতি, দৃষ্টি এবং বোধসম্পন্ন হৃদয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। এখানে হৃদয় মোহর করার অর্থ হৃদয়ের সংবেদনশীলতা ও বোধকে অকেজো করে দেয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'উনজুর কাইফা নুসর্‌রিফুল্ আয়াতি ছুম্মাহুম ইয়াস্‌দিফুন' (দেখো, কিরূপে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদ্‌সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়)। এ কথার অথ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি দেখুন, আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পঞ্জিসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশ করি। এরপরেও তারা বিমুখ হয়।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'আয়াত' শব্দের অর্থ দলিল প্রমাণকে বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করা। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আয়াত' শব্দটির উদ্দেশ্য— আমি আমার অবিভাজ্য এককত্বের প্রমাণাদি কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। বায়যাবী নুসররিফুল আয়াতি কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে— আমি বারংবার প্রমাণসমূহ প্রকাশ করেছি। কখনো প্রকাশ করেছি জ্ঞানগত প্রমাণ। কখনো

দিয়েছি অনুপ্রেরণা। কখনো প্রদর্শন করেছি ভয়। আবার কখনো বিগত সম্প্রদায়সমূহের কাহিনী বর্ণনা করে করেছি সতর্ক। দিয়েছি উপদেশ।

এখানে ছুম্মাহুম (এতদ্সত্ত্বেও তারা) —কথাটির 'ছুম্মা' (এতদ্সত্ত্বেও) শব্দটি সময়ের ব্যবধান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবধান বুঝানো হয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ এবং অংশীবাদীদের সত্য বিমুখতার মধ্যে। অর্থাৎ এদিকে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ বিদ্যমান—এতদ্সত্ত্বেও অংশীবাদীরা সত্য থেকে দূরে সরে যায় (মুখ ফিরিয়ে নেয়)।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— ক্বুল আরায়াইতাকুম ইন আতা কুম আজাবুল্লাহি বাগতাতান আও জাহ্রাতান হাল ইউহ্লাকু ইল্লাল ক্বওমুজ্ জলিমুন। এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, হে অংশীবাদীরা! তোমরা আমাকে জানাও, সহসা অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর নেমে এলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে? এখানে 'বাগতাতান' শব্দটির অর্থ পূর্ব সংকেত ব্যতীত বা অকস্মাৎ। আর 'জাহারাতান' শব্দটির অর্থ প্রকাশ্য— আগে থেকেই যার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হাসান বলেছেন, বাগতাতান এবং জাহারাতান শব্দ দু'টোর অর্থ দিবসে অথবা নিশিথে। 'হাল ইউহ্লাক' কথাটি এখানে নেতিবাচক উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন (ইস্তেফ্হামে ইনকারী) প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস হবে না। আর এখানে 'জলিমুন' শব্দটির অর্থ, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯, ৫০

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○ قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ○

❒ রসুলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি; কেহ বিশ্বাস করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

❐ যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদিগের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।

❐ বল, 'আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে আমার নিকট আল্লাহের ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি, এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে আমি ফেরেশ্‌তা, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি'; বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?' তোমরা কি অনুধাবন কর না?

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— রসুলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। এ কথার অর্থ— আমি আমার রসুলগণকে প্রেরণ করি ইমানদারদের নিকট জান্নাতের সুসংবাদদানের জন্য এবং কাফেরদের নিকট জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং কাফেরেরা যে রকম চায়, সে রকম অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করা তাঁদের কাজ নয়। আর তাঁরা আল্লাহ্ যাকে চান না তাকে হেদায়েত করার ক্ষমতাও রাখেন না। রসুল হতে গেলে যে সকল গুণ অত্যাবশ্যক বলে কাফেরেরা মনে করে, রসুলগণ সে সকল গুণে গুণান্বিত নন। কাফেরেরা চায়— রসুলকে ফেরেশ্‌তা হতে হবে, পানাহার থেকে মুক্ত থাকতে হবে, আধিভৌতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু তারা জানে না, রসুলগণ এ রকম কোনো কিছু নন। সুসংবাদ প্রদান করা এবং সতর্ক করাই তাঁদের প্রধান দায়িত্ব।

পরের বাক্যে বলা হয়েছে— কেউ বিশ্বাস করলে ও নিজকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। এ কথার অর্থ— রসুলের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে, ইমান এনেছে এবং অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে নিজেকে সংশোধন করেছে, তাদের জন্য শাস্তির আশংকা নেই। আর তারা পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে না বলে দুঃখিতও হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে, সত্যত্যাগের জন্য তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। অর্থাৎ কাফেরেরা সত্যচ্যুত। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছে তারা। তাদের এই সত্যবিচ্যুতির কারণেই তাদের উপর নেমে আসবে আযাব।

শেষ আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— হে রসুল! আপনি বলুন, হে অবিশ্বাসীরা আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে আমার নিকটে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার (রিজিকের ভাণ্ডার) আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত সে কথাও আমি বলি না। আদি অন্তের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমাকে জানানো হয় নি। আর এটাও আমার বক্তব্য বিষয় নয় যে— আমি ফেরেশ্‌তা। ফেরেশ্‌তারা পানাহার, বিবাহ ইত্যাদি প্রয়োজন থেকে মুক্ত। আমি তো সে রকম নই। আমি কেবল সত্যধর্ম প্রচার করি।

আনুগত্য করি কেবল আল্লাহ্র। অনুসরণও করি কেবল তাঁর, তাঁর প্রত্যাদেশের। তাই আমার দাবি কেবল একটিই— আমি রসুল। এ দাবি অযৌক্তিক নয়। অসম্ভবও নয়। ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রসুলগণও এ রকমই ছিলেন।

অংশীবাদীরা মনে করতো মানুষ কখনও নবী বা রসুল হতে পারে না। রসুল হতে পারে কেবল ফেরেশ্তা অথবা অতিমানবিক কোনো অস্তিত্ব। আলোচ্য আয়াতে তাদের এই অযথার্থ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বাগবী বলেছেন, জ্ঞানান্ধ অংশীবাদীরা মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর মর্মার্থ হচ্ছে–– হে আমার রসুল! আপনি ওই অবিশ্বাসী জনতাকে বলে দিন— আমি এ কথা বলি না যে, আমি আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের অধিকারী। এই সাফা পর্বতকে সোনার পাহাড়ে পরিণত করবো এবং তোমাদের চাহিদা মতো তোমাদেরকে দান করবো— এ রকম কথা আমি কখনোই বলি না। এ রকম দাবিও আমি করি না যে, অদৃশ্য বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমার রয়েছে। আর প্রত্যাদেশ ছাড়া আমি অতীত ভবিষ্যতের কোনো কথা তোমাদেরকে বলতে পারবো না। আমি ফেরেশ্তাও নই। তাই ফেরেশ্তা হওয়ার দাবিও আমি জানাই নি। ফেরেশ্তারা আহার বিহার, প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং দাম্পত্য প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কিন্তু আমি তো প্রত্যাদিষ্ট মানুষ— রসুল। আমার দায়িত্ব কেবল প্রত্যাদেশানুসরণ।

পরের কথাটি হচ্ছে— বলুন হে আমার রসুল! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য রেখা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই তারা অনস্বীকার্য বিষয়কে অস্বীকার করে। আর বিশ্বাস করে অবিশ্বাস্য বিষয়সমূহকে। ইমানদারগণ এর বিপরীত। তারা চক্ষুষ্মান। তাই সত্য মিথ্যার বিভাজন চিহ্নটি তাদের নিকট সুস্পষ্ট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা রসুলকে, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত মোজেজাসমূহকে এবং অবতারিত কোরআনকে সত্য বলে মেনে নেয়। অন্ধ অবিশ্বাসীরা বিগ্রহবন্দনা করে। মনে করে বিগ্রহগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করবে। এ কথাও তারা বলে থাকে যে— ফেরেশ্তারা আল্লাহ্তায়ালার কন্যা। এ সকল জঘন্য বিশ্বাস ও আচরণ থেকে বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ তারা সত্য দৃষ্টিসম্পন্ন—চক্ষুষ্মান।

শেষ কথাটি এই— আফালা তাতাফাক্কারুন (তোমরা কি অনুধাবন করো না?)। এ কথার অর্থ— যদি তোমরা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও যে, সত্য ও মিথ্যা কখনও সমান নয়। সত্য গ্রহণীয়। মিথ্যা বর্জনীয়— তবে অবশ্যই তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। অতএব কেনো তোমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করো না।

وَاَنۡذِرۡ بِهِ الَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ اَنۡ يُّحۡشَرُوۡۤا اِلٰى رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيۡعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ ○

❐ যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে তিনি ব্যতীত তাহাদিগের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না। তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা সতর্ক কর; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।

ওয়া আনজির বিহিল্লাজিনা ইয়াখাফুনা আইঁ ইউহ্শারু ইলা রব্বিহিম (যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে)। এখানে 'আল্লাজিনা' শব্দটির পরে এসেছে 'ইয়াখাফুনা আইঁইউহ্শারু'। এতে করে বুঝা যায় যারা পুনরুত্থানের বিষয়টিতে সন্দিহান— আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বায়যাবী লিখেছেন, 'আল্লাজিনা' (যারা) শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— ওই সকল বিশ্বাসী, যাদের আমল কিছুটা শিথিল। অথবা পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে— এ রকম বিশ্বাসী অথবা দোদুল্যচিত্ত অবিশ্বাসী কিংবা খ্রীষ্টান। অথবা পুনরুত্থান বিষয়ে সন্দেহবাদী দল। মোটকথা পুনরুত্থান দিবসে যারা অদৌ বিশ্বাসী নয়— তারা এই আল্লাজিনা (যারা) শব্দটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা শেষোক্ত দলটিকে সতর্ক করা নিরর্থক।

বায়যাবী প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি ভুল। এখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, বিকৃত বিশ্বাসী— সকলকেই সতর্ক করা হয়েছে। এখানকার নির্দেশনা একটি সাধারণ নির্দেশনা। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— উহিয়্যা ইলাইয়্যা হাজাল কোরআনু লিউনজিরাকুম বিহি ওয়ামান বালাগা (এই কোরআন আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে প্রত্যাদেশরূপে, যাতে করে আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কোরআনের আহবান পৌছেছে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারি)। এই আয়াতটিতে কেবল আমল সম্পর্কে উদাসীন বিশ্বাসীদেরকে ভয় দেখানোর কথা নেই। এখানে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে আপামর জনসাধারণকে। তবে এ কথা ঠিক যে, যথার্থ বিশ্বাসী এবং যথাযথ আমলকারীদের জন্যই ভীতিপ্রদর্শন অধিক ফলদায়ক। এরূপ একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে— তারা যেনো কোনক্রমেই সাধনার পথে ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় না দেয়। লক্ষণীয় যে, রসুল স. এর যুগে প্রতিটি বিশ্বাসী সুদৃঢ় আমলে অভ্যস্থ ছিলেন। আলস্যের উপস্থিতি তাঁদের আমলে ছিলোই না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের 'আল্লাজিনা' শব্দটির লক্ষ্য নিখিল জনতা। এখানকার নির্দেশনাটি হচ্ছে— সকলেই যেনো তাদের

প্রতিপালকের সম্মুখীন হওয়ার জন্য নির্ধারিত পুনরুত্থান দিবসের কথা স্মরণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে নির্দিষ্ট করে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে ভীত ব্যক্তিদেরকে এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে— এই ভীতিপ্রদর্শন কেবল তাদেরই জন্য সর্বাধিক উপকারী। যেমন, 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' কথাটিতে কেবল মুত্তাকিদের কথা বিশেষভাবে এ কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত দ্বারা তারাই সর্বাধিক উপকৃত হয়— যদিও কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের নিমিত্তে।

এরপর বলা হয়েছে— লাইসা লাহুম মিন্‌দুনিহি ওয়ালিউঁ ওয়ালা শাফিউন (এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না)। এ কথাটি পূর্ববর্তী বাক্যের ধারাবাহিকতা। এ অবস্থায় বাক্যটির পূর্বাপর বক্তব্যের সম্মিলিত অর্থ হবে এ রকম— হে আমার রসুল! কোরআন দ্বারা হাশর দিবসের পুনরুত্থান অস্বীকারকারীকে এভাবে ভয় প্রদর্শন করুন–– সেদিন আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো অভিভাবক থাকবে না। কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না। সুতরাং হে জনতা! তোমরা অন্য কারো ইবাদত কোরো না এবং অন্য কারো সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। এখানে অন্যের সুপারিশ বা শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের শাফায়াতের প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতিক্রমে সেদিন কেবল রসুল স. নন, তাঁর উম্মতের অনেকে সুপারিশ করতে পারবেন। শাফায়াত আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি অকাট্য বিশ্বাস। এ সম্পর্কে এই জামাতের বক্তব্য হচ্ছে–– আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া সুপারিশ করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু তিনি যাদেরকে অনুমতি দান করবেন, তাঁরাও শাফায়াত করতে পারবেন। আর তাঁদের শাফায়াত তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালারই শাফায়াত। কারণ তিনিই দিয়েছেন শাফায়াতের অধিকার। এখানে যে শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে, সেই শাফায়াত হচ্ছে তাঁর অনুমোদনহীন শাফায়াত। এ রকম শাফায়াতকারী সেদিন কেউই হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— লায়াল্লাহুম ইয়াত্তাক্বুন (হয়তো তারা সাবধান হবে)। এখানে 'লায়াল্লা' শব্দটির অর্থ হয়তো অথবা সম্ভবত। কথাটির মর্ম হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি জনতাকে এ কোরআনের মাধ্যমে সতর্ক করতে থাকুন। সম্ভবতঃ এতে করে তারা সাবধান হবে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ, তিবরানী ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক স্থানে হজরত খাব্বাব, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল এবং হজরত আম্মারকে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরায়েশ সেখানে এসে বললো, মোহাম্মদ! তুমি এ সকল ছন্নছাড়া লোকদেরকে তোমার দরবারে নিযুক্ত করেছো অথচ অর্থ ও আভিজাত্যের দিক থেকে আমরাই অগ্রগামী। তুমিও তো অভিজাত। তবু তুমি এদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছো না কেনো?

এদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমরা তোমার সঙ্গে বসতে পারতাম। কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে 'ওয়াআনজিরবিহি' থেকে 'সাবিলুল মুজরিমিন' (৫১ থেকে ৫৫ আয়াত) পর্যন্ত।

ইবনে হাব্বান ও হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে— হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদসহ ছয় জনকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমাদেরকে রসুল স. এর সঙ্গে উপবিষ্ট দেখে একবার কুরায়েশ নেতারা বললো, এই অনভিজাত লোকগুলোকে বের করে দাও। তাহলে আমরা তোমার কাছে বসতে পারবো। এদের সঙ্গে বসতে আমাদের লজ্জা হয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

মুসলিম শরীফে রয়েছে— হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, একবার আমরা ছয়জন রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দু'জনের নাম আমি ভুলে গিয়েছি। বাকী চারজন হচ্ছি— আমি, ইবনে মাসউদ, হুজাইল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এবং বেলাল। কুরায়েশ নেতারা সেখানে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, ওকে তাড়িয়ে দাও। নাহলে আমাদের আভিজাত্য ক্ষুণ্ন হবে। রসুল স. চিন্তান্বিত হলেন। আল্লাহ্পাকের নির্দেশনার অপেক্ষায় অতিবাহিত হলো কিছু সময়। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৫২

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

❐ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদিগের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদিগের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে; করিলে তুমি সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কোরো না— এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! ওই সকল লোককে আপনি আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিবেন না, যারা বিশেষভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ইবাদত করে এবং জিকির করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ডাকে অর্থ— দোয়া

করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে ডাকার উদ্দেশ্য ফজর ও আসর নামাজ পাঠ করা। আরেক বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ডাকার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঠ করা। এ রকম অর্থ করার কারণ এই যে— একবার কিছু সম্পদশালী মুসলমান রসুল স.কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! নামাজের সময় দরিদ্রদেরকে আমাদের পশ্চাতের সারিতে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিন। অথবা আমাদের নামাজ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে নামাজ পড়তে বলুন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

'ইউরিদুনা ওয়াজহাহু' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে। অর্থাৎ যারা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করে। এই বিশুদ্ধতাই সকল আমলের ভিত্তি। তাই এখানে এরশাদ হয়েছে— হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভার্থে (বিশুদ্ধ অন্তরে) যারা ইবাদতে মগ্ন হয়, আপনি তাদেরকে তাড়াবেন না।

জ্ঞাতব্যঃ অলংকারশাস্ত্রের একটি সর্বসম্মত নিয়ম হচ্ছে, জাবেতাহ্। ইমাম আবদুল কাহের তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়টির বিবরণ দিয়েছেন। বিষয়টি 'মাতুল' নামক গ্রন্থের রচয়িতাও সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, নির্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৈশিষ্ট্যই ওই নির্দেশদানের কারণ। যেমন— তোমার সত্যবাদী বন্ধু জায়েদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করো। এখানে সুন্দর আচরণের নির্দেশের কারণ হচ্ছে বন্ধু জায়েদের সত্যবাদীতা। এই নিয়মটির দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থকার রহ. বলেছেন— — এখানে যাদেরকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে— তারা বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করে। যারা এ রকম করে, তারা সম্মানের পাত্র। তাই তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া সমীচীন নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'মা আলাইকা মিন হিসাবিহিম মিন শাইনইউঁ ওয়ামা মিন হিসাবিকা আ'লাইহিম মিন শাইইন ফা তাত্‌রুদাহুম' (তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুশরিকদের কথায় আপনার একান্ত অনুচর ওই সকল দরিদ্র মুসলমানকে বিতাড়ন করা বৈধ হতো— যদি তারা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতো। অথবা আপনি হতেন তাদের ক্ষতির কারণ। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি সে রকম নয়। তারা আপনার সংস্পর্শে থাকলে সকলেরই লাভ। তারা আপনার সংসর্গের বরকতে অনেক পুণ্য অর্জন করতে পারবে এবং তাদের রসুল হিসেবে আপনিও তাদের পুণ্যের সমান পুণ্যের অধিকারী হবেন। আপনি বরং আপনার সংসর্গ লাভের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সত্যানুসারী করুন। সঠিক দিকনির্দেশনা দিন।

এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটিতে— দরিদ্র মুসলমানদেরকে যারা তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়। সুতরাং আপনি আপনার একান্ত অনুগতদেরকে আপনার দরবার থেকে বহিষ্কার করবেন না।

শেষে বলা হয়েছে ফাতাকুনা মিনাজ্ জলিমীন। এ কথার অর্থ— আপনি ওই সকল দরিদ্র মুসলমানকে বিতাড়িত করলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনি রসুল। তাই আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হতেই পারেন না। অতএব এমতো অশোভন কর্ম আপনি করবেন না।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৫৩

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

❒ এইভাবে তাহাদিগের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, 'আমাদিগের মধ্যে কি ইহাদিগের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন?

'ওয়া কাজালিকা ফাতান্না বা'দ্বাহুম বিবা'দ্বিন' (এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি)। এখানে 'কাজালিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি একটি অতিরিক্ত সংযোজন। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম 'কাফ' সংযোজনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন লাইসা কা মিসলিহি শাইউন— এখানেও 'কাফ' অক্ষরটি অতিরিক্ত অক্ষর হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য বাক্যের 'জালিকা শব্দের মাধ্যমে কুরায়েশ নেতাদের পথভ্রষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং 'ফাতান্না' শব্দটি এখানে সাধারণ কর্ম (মাফউলে মতলক)। 'বা'দ্বাহুম (এক দলকে) শব্দটির উদ্দেশ্য কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। আর 'বিবা'দ্বিন' (অন্য দল) শব্দটির উদ্দেশ্য দরিদ্র মুসলমানগণ— যাদের উপস্থিতি কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের উস্মার কারণ হয়েছিলো।

আল্লামা তাফতাজানী বলেছেন, এখানে 'কাজালিকা ফাতান্না' এবং অন্য সকল স্থানে ব্যবহৃত 'কাজালিকা' শব্দটি সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাদৃশ্য বুঝানোটা এখানে আসল উদ্দেশ্য নয়। অথবা আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকমও হতে পারে যে, কুরায়েশ নেতাদেরকে যেমন আমি পরীক্ষা করেছি, তেমনি পরীক্ষা করেছিলাম হজরত নূহের সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে। এভাবে এ সকল নেতাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করেছি। হজরত নূহের সময়ের নেতাদের বক্তব্য অন্য আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— অবিশ্বাসীরা (হজরত নূহকে) বললো, আমরা তো দেখছি তুমি আমাদের মতোই মানুষ। আরো দেখছি, একদল অবিবেচক লোক তোমার অনুসারী হয়েছে— যারা আমাদের মধ্যে অধম। হজরত নূহ্

জবাবে বলেছিলেন— মাআনা লি তারিদিল্লাজিনা আমানু (যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আমি বিতাড়িত করতে পারি না)। আলোচ্য বাক্যটির মধ্যে কুরায়েশ নেতাদেরকে হজরত নূহের সম্প্রদায়ের নেতাদের সমান্তরাল করা হয়েছে। এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে— সকল যুগের গর্বিত নেতাদের দৃষ্টান্ত একই রকম। পথভ্রষ্টরা সকল যুগে একইভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'জালিকা' শব্দটির মাধ্যমে পার্থিব পরীক্ষার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং 'ফাতান্না' শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে ধর্মীয় পরীক্ষার। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— বিভিন্নভাবে আমি মানুষকে পরীক্ষা করি। কাউকে করি দরিদ্র। কাউকে বিত্তশালী। এভাবে ধর্মীয় বিষয়েও আমি একদলকে দিয়ে আরেকদলকে পরীক্ষা করে থাকি। এক্ষেত্রে আমি দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে বিত্তশালী অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দান করেছি। আর এই প্রাধান্য দানই হয়ে দাঁড়িয়েছে কুরায়েশ নেতৃবৃন্দের পথভ্রষ্টতার কারণ।

এরপর বলা হয়েছে— লিইয়াক্কুলু আ হাউলায়ি মান্নাল্লহু আলাইহিম মিম বাইনিনা (যেনো তারা বলে 'আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?)। এখানে 'তারা বলে' অর্থ— ওই বিত্তশালী নেতারা বলে। আর 'এদের প্রতিই অর্থ দরিদ্র মুসলিমবৃন্দের প্রতি। আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন'— অর্থ (আমাদেরকে বাদ দিয়ে) এদেরকেই কি আল্লাহ্তায়ালা ইমান ও হেদায়েত দান করলেন? এখানকার এই প্রশ্নটি একটি নেতিবাচক জবাব বিশিষ্ট প্রশ্ন (ইস্তিফ্হামে ইনকারী)। অর্থাৎ বিত্তশালী নেতারা এমতো প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলো যে— উত্তম কর্মে দরিদ্ররা অগ্রগামী হবে কেনো? ইসলাম যদি সত্যধর্মই হতো, তবে আমাদের মতো সম্পদশালীদেরকে দরিদ্ররা অতিক্রম করে কিভাবে? (সুতরাং ইসলাম সত্যধর্ম নয়)। এ রকম মনোভাবের কারণেই আল্লাহ্তায়ালার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলো কুরায়েশ নেতারা।

শেষে বলা হয়েছে— আলাইসাল্লহু বিআ'লামা বিশ্শাকিরীন (আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?)। এ কথার অর্থ— যারা কৃতজ্ঞভাজন হতে চায়, আল্লাহ্পাক তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ও যোগ্যতা দান করেন। আর যারা চায় না, তাদেরকে তিনি ইমানের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেন না। ওই বিপরীতমুখী দু'টি দল সম্পর্কে আল্লাহ্পাক কি সবিশেষ অবহিত নন? এই ব্যাখ্যাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমান গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ব নির্ধারিত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. বলেছেন, বিশ্বাসের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার 'আলহাদী' নামের সঙ্গে। আর অবিশ্বাসের সম্পর্ক তাঁর 'আলমুদিল্লু' নামের সঙ্গে। 'আলহাদী' অর্থ পথপ্রদর্শনকারী এবং 'আলমুদিল্লু' অর্থ পথভ্রষ্টকারী। সুতরাং হেদায়েত ও দ্বালালাত আল্লাহ্পাকের দু'টি বিশেষ গুণ। যে ব্যক্তি হেদায়েতের বৃত্তভূত সেই কেবল লাভ করে হেদায়েত। আর যে দ্বালালাতের সীমানাভূত সে হয় পথভ্রষ্ট। সুতরাং যার জন্য যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার জন্য ওই সীমানা অতিক্রম দুঃসাধ্য।

আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— অবিশ্বাসীরা ভাবতো দরিদ্ররা রসুল স. এর সংসর্গধন্য হবে কেনো? আমরা নেতৃত্বের পদে আসীন এবং বিত্তশালী। সুতরাং আমরাই আল্লাহ্‌র রসুলের সান্নিধ্যে উপবেশন করার যোগ্যতাধারী। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এই ধারণাকে প্রতিহত করার নিমিত্তে বলেছেন— আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? এ কথার অর্থ, আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন, কে কৃতজ্ঞ এবং কে কৃতজ্ঞ নয়। দরিদ্র মুসলমানেরা কৃতজ্ঞ। অবিশ্বাসী নেতারা অকৃতজ্ঞ। আর অকৃতজ্ঞরা রসুল সান্নিধ্য লাভের অনুপযুক্ত।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত সালমান ফারসী এবং হজরত খাব্বাব বিন আরত্ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে। আকরা বিন হাবেস তামীমী, উয়াইনিয়াহ্ বিন হাসান ফাজারী এবং আরো কয়েকজন নতুন মুসলমান রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলো সেখানে বসে রয়েছেন বেলাল, সুহায়েব, আম্মার, খাব্বাব এবং আরো কয়েকজন দরিদ্র ও নিরীহ মুসলমান। আগন্তকেরা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো ঘৃণার সঙ্গে। বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি যদি উচ্চ মর্যাদাসহ সভাপতির পদমর্যাদা লাভ করতে চান তবে এই অধমদেরকে আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিন। এদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমরা আপনার নিকট উপবেশন করবো এবং আপনার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবো। ওই দরিদ্র মুসলমানেরা ছিলেন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। ঘামে ভেজা সেই পরিচ্ছদ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিলো। রসুল স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন— এরা ইমানদার। কোনো ইমানদারকে আমি বিতাড়ন করতে পারি না। তারা বললো, তবে আমাদের জন্য পৃথক একটি স্থান নির্ধারণ করুন— যাতে আরববাসীরা আমাদেরকে অভিজাত বলে চিনে নিতে পারে। এ রকম সাধারণ দরবারে তুচ্ছ মানুষদের সঙ্গে বসতে আমরা লজ্জা করি। অতি উত্তম হয় যদি আমরা এলে আপনি এদেরকে চলে যেতে বলেন। আমরা চলে গেলে আপনি এদেরকে পুনরায় আপনার কাছে এনে বসাতেও পারেন। রসুল স. বললেন, হাঁ এটা হতে পারে। তারা বললো, আমাদেরকে এ কথাটি একটি ছোট্ট চিরকুটে লিখে দিন। রসুল স. কাগজ আনতে বললেন এবং হজরত আলীকে কাছে ডাকলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা তখন এক কোনায় বসেছিলাম। তখনো চিরকুট লেখা শুরু হয়নি। এমন সময় হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন এই আয়াত (ওয়ালা তাত্‌রুদিল্লাজিনা থেকে বিশ্‌শাকিরিন পর্যন্ত)। রসুল স. তখন আনীত কাগজটি ফেলে দিলেন। আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি নিকটে গেলে তিনি পাঠ করলেন— সালামুন আলাইকুম কাতাবা রব্বাকুম আ'লা নাফ্‌সিহির্‌রহমা (আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাদের প্রতিপালক করুণা বর্ষণ করা তাঁর নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন)। এরপর থেকে আমরা রসুল স. এর একান্ত সান্নিধ্যে উপবেশন করতাম। তিনি যখন ইচ্ছা করতেন তখন আমাদের

নিকট থেকে অন্যত্র চলে যেতেন। আমাদেরকে চলে যেতে বলতেন না। এরপর অবতীর্ণ হলো—ওয়াস্‌বির নাফ্‌সাকা মায়াল্লাজিনা ইয়াদ্‌উ'না রব্বাহুম বিলগাদাতি ওয়াল আ'শিয়্যি ইউরিদুনা ওয়াজ্‌হাহু (আপনি ওই লোকদের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনায় প্রাতে ও সায়াহ্নে তাদের প্রতিপালককে ডাকে)। এরপর থেকে নেতৃস্থানীয় কেউ এলেও রসুল স. আমাদেরকে সঙ্গে নিয়েই বসে থাকতেন। আমরা তাঁর এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতাম যে, তাঁর হাঁটুর সঙ্গে আমাদের হাঁটু লেগে থাকতো। তাঁর উঠার সময় হলে আমরা উঠতাম। তিনি যখন চলে যেতেন, আমরাও তখন সেখান থেকে চলে আসতাম। রসুল স. বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এ কারণে যে অন্তিম সময় পর্যন্ত আমি আমার উম্মতের সঙ্গে যুথবদ্ধভাবে বসে থাকবো। জীবনে ও মৃত্যুতে আমি তোমাদের সঙ্গী।

কালাবীর বর্ণনায় রয়েছে, আকরা, উয়াইনা এবং অন্যান্য বিত্তশালীরা একবার রসুল স. এর নিকট আবেদন জানালো, আপনি ওদের জন্য একদিন এবং আমাদের জন্য একদিন নির্ধারণ করুন। তিনি স. বললেন, আমি এরূপ করতে পারি না। তারা বললো, ঠিক আছে। মজলিশ একই হোক কিন্তু আপনি আমাদের দিকে মুখ করে বসবেন এবং তাদেরকে রাখবেন আপনার পশ্চাতে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হজরত খাব্বাব এবং হজরত সালমান থেকে বাগবী যে বর্ণনাটি এনেছেন, সেই বর্ণনাটি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরো অনেকে কেবল হজরত খাব্বাব থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটিতে অতিরিক্ত এ কথাটি রয়েছে যে— তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা আকরা এবং তার সাথী সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। বলেছেন— ওয়া কাজালিকা ফাতান্না বা'দ্বুহুম বিবা'দ্বিন (এভাবেই আমি এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি)। শায়েখ ইবনে কাসির লিখেছেন, বর্ণনাটি দুর্বল। কেননা আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর আকরা ও উয়াইনা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হিজরতের অনেক পরে— মদীনায়।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি কয়েকজন মুহাজিরের সঙ্গে বসেছিলাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। মাঝে মাঝে তাঁরা একে অপরের প্রায় বিবস্ত্র অবস্থা অবলোকন করছিলেন। একজন কোরআন মজীদ পাঠ করতে শুরু করলেন। আমরা মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করছিলাম। এমন সময় রসুল স. আমাদের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে কোরআন পাঠকারী নীরব হয়ে গেলেন। রসুল স. আমাদেরকে সালাম দিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি করছিলে? আমি বললাম, আমরা আল্লাহ্‌র কালাম শুনছিলাম। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর। তিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে উপবেশনের জন্য আমাকেও হুকুম দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। আমরাও তখন গোল হয়ে তাঁর মুখোমুখি বসলাম। আমার মনে হলো, তিনি স. আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে

চিনতে পারেননি। এরপর তিনি স. বললেন, হে নিঃস্ব মুহাজিরের দল! শুভ সমাচার শ্রবণ করো। কিয়ামত দিবসে তোমরা হবে পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী। ধনীদের অর্ধ দিবস পূর্বে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। ওই অর্ধ দিবস অর্থ পাঁচ শত বৎসর।

হজরত ইকরামা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার উতবা বিন রবীয়া, শাইবা বিন রবীয়া, মুতইম বিন আদী এবং হারেস বিন নওফেল-মান্নাফ গোত্রের কতিপয় নেতার সঙ্গে রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেবের কাছে গিয়ে বললো, যদি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ওই সকল ক্রীতদাসকে তাঁর সাহচর্যচ্যুত করে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে আমাদের অন্তরে এবং আমাদের দৃষ্টিতে সে হবে অধিক অনুসরণীয়। তাঁর আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হওয়া তখন আমাদের পক্ষে হবে অধিকতর সহজ। আবু তালেব তাদের কথা রসুল স.কে জানালে হজরত ওমর বিন খাত্তাব বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এ রকম করে দেখতে পারেন। আমরাও দেখবো, এতে তাদের উদ্দেশ্য কী। তখন অবতীর্ণ হয়েছে— ওয়া আনজির বিহিল্লাজিনা থেকে বিশ্‌শাকিরিন (৫১ থেকে ৫৩ আয়াত) পর্যন্ত।

কুরায়েশ নেতারা রসুল স. এর পবিত্র দরবার থেকে যাদেরকে দূর করে দিতে চাইতো, তাঁরা হচ্ছেন— হজরত বেলাল, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আবু হুযায়ফার মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত সালেম, হজরত উসাইদের মুক্ত করা দাস হজরত সাবিহ্‌ এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত মিকদাদ বিন আবদুল্লাহ্‌, হজরত আক্কদ বিন আবদুল্লাহ্‌ হাজখালী এবং আরো অনেকে। এঁদের প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং পূর্বে প্রদত্ত তাঁর পরামর্শের ব্যাপারে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

❒ যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও 'তোমাদিগের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক,' তোমাদিগের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

তোমাদিগের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি মন্দ কার্য করে অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❒ এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাহাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।

ওয়া ইজাজায়াকাল্লাজিনা ইউ'মিনুনা বিআয়াতিনা ফাকুল সালামুন আ'লাইকুম (যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকটে আসে তখন তাদেরকে তুমি বোলো 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক')। হজরত ইকরামা বলেছেন, ওই সকল লোককে উপলক্ষ করে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসুল স. এর পবিত্র দরবার থেকে নিঃস্ব মুসলমানদেরকে বের করে দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। রসুল স, তাঁদেরকে দেখলে সালাম প্রদান করতেন।

আতা খোরাসানী বলেছেন, যাঁদের প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলী, হজরত বেলাল, হজরত সালেম, হজরত আবু উবাইদা, হজরত মাস্আব বিন উমাইর, হজরত হামযা, হজরত জাফর, হজরত ওসমান বিন মাজউন, হজরত আম্মার বিন ইয়াসার, হজরত আরকাম বিন আরকাম এবং হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ। রদ্বিআল্লাহু আনহুম।

হজরত মাহান থেকে ফারইয়ানী এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, আমরা অনেক বড় বড় পাপ করেছি। রসুল স. নিঃশ্চুপ রইলেন। তখন অবতীর্ণ হলো— যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বোলো 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,' তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। এই আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ওই সকল অনুতাপ জর্জরিত মানুষকে অগ্রে সালাম প্রদান করুন। অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম পৌছে দিন। ফাকুল সালামুন আলাইকুম (বলুন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) কথাটির মধ্যে শুধু শান্তির সুসংবাদ দেয়া হয়নি। পরক্ষণেই এই শুভ সমাচারটিও জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে যে— আল্লাহ্পাক অনুগ্রহ করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— আন্নাহু মান আ'মিলা মিনকুম সুআম বিজাহালাতিন ছুম্মা তাবা মিম্বা'দিহি ওয়া আস্লাহা ফাআন্নাহু গফুরুর্রহীম (তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতা বশতঃ যদি মন্দ কাজ করে অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। এখানে 'আন্নাহু' শব্দের হু (কেউ) সর্বনামটি একটি অনড় সর্বনাম (যা এদিক ওদিক হবার নয়)। আর সম্পূর্ণ বাক্যটিই এখানে 'আর রহমাত' কথাটি থেকে উৎসারিত হয়েছে। অথবা 'বা' অক্ষরটি এখানে প্রচ্ছন্ন।

'বিজাহালাতিন' (মন্দ কাজ) শব্দটি এখানে 'আ'মিলা' শব্দটির অবস্থা প্রকাশক। আর কর্মপদ এখানে প্রচ্ছন্ন। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— পাপকর্মের ক্ষতিকর পরিণাম যে ধ্বংস, এ কথা না জেনে যদি কেউ পাপ করে। অথবা 'জাহালাতিন' শব্দটির অর্থ মুতাজাহিলান। অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ যদি কেউ পাপ করে বসে। বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় যারা মূর্খতার দিকে ধাবিত হয়েছে, জমা করেছে রাশি রাশি পাপ— এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়, পুনঃ পাপ পথে যাবে না এ রকম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবং নিজের আচরণকে সংশোধিত করে— তবে আল্লাহ্ তার প্রতি প্রদর্শন করবেন ক্ষমা ও দয়া। এখানে এ কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, পাপ মার্জনার কারণ হচ্ছে তওবা (সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন)। পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— ওয়া কাজালিকা নুফাস্‌সিলুল আয়াতি (এভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি)। এ কথার অর্থ— যেমন করে আমি এই সুরার আয়াত সমূহের বিবরণ দিয়েছি, তেমন করে বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দিয়েছি কোরআনের অন্যান্য আয়াতসমূহে। এ রকমও হতে পারে যে— এখানে আয়াত অর্থ সত্যের প্রমাণসমূহ যা অস্বীকৃত জনতার সম্মুখে বর্ণনা করা হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালি তাস্‌তাবিনা সাবিলুল মুজরিমীন (যাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়)। অর্থাৎ পাপিষ্ঠরা যেনো সঠিক পথের সন্ধান পায়। এখানে রয়েছে একটি অলিখিত বাক্য। ওই বাক্যটিসহ উদ্ধৃত বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সঠিক পথকে স্পষ্ট করে তুলতেই আমি আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করি এবং এভাবে পাপীদের সামনে সত্যপথ প্রকাশিত হয়ে যায়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৫৬, ৫৭

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ○ قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ ○

❒ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহবান কর তাহাদিগের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে'; বল, 'আমি তোমাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।'

❒ বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহেরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদিগের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— কুল ইন্নি নুহিতু আন আ'বুদাল্লাজিনা তাদ্উ'না মিন্দুনিল্লাহ্ (বলো, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে')। এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করো— যা অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন। আর আমি এক আল্লাহ্র উপাসনা করি। আমার পক্ষে রয়েছে কোরআন ও জ্ঞানের সন্দেহাতীত প্রমাণ ও যুক্তি। তাই আমাকে তোমাদের উপাস্যসমূহের উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এরপর এরশাদ হয়েছে— 'কুললা আত্তাবিউ' আহ্ওয়াআকুম ক্বদ্ দ্বলালতু ইজাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুহ্তাদিন' (বলো, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না')। এই বাক্যটির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের আশা-আকাংখাকে দূর করে দেয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা পুরোপুরি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুগত। তোমাদের ধারণা যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন। তোমরা তোমাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী। আর এ রকম যুক্তিপ্রমাণহীন মতবাদের আনুগত্য নিষিদ্ধ। তোমরা সম্পূর্ণতই ভ্রষ্ট, বিনষ্ট। তাই তোমাদের অনুসরণ আমি করতে পারি না। করলে আমিও হয়ে যাবো তোমাদের মতো বিপথগামী এবং হয়ে পড়বো সৎপথপ্রাপ্তদের পথ থেকে বিচ্যুত।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— কুল ইন্নি আ'লা বাইয়্যিনাতিম মির্রব্বি (বলো, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন! আমি তো আমার প্রভুপ্রতিপালক প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ লাভ করেছি। আর ওই প্রমাণের উপরেই আমি সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ অর্থ এখানে প্রতিপালকের বা আল্লাহ্র পরিচিতিও হতে পারে। অর্থাৎ আমি পেয়েছি ওই জ্ঞান ও প্রমাণ যে— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো— তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ আমি করি না। আর এখানে বলা হয়েছে ওই কথা— যার অনুসরণ অত্যাবশ্যক। সেটি হচ্ছে— স্পষ্ট প্রমাণ বা পরিচিতি।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া কাজ্জাবতুমবিহি (তোমরা যাকে প্রত্যাখ্যান করেছো)। এখানে 'যাকে' (বিহি) শব্দটি আগের বাক্যের স্পষ্ট প্রমাণ (বাইয়্যেনাত) এর সর্বনাম। সর্বনামটির শব্দরূপ স্ত্রী লিঙ্গ হলেও এর অর্থ পুং লিঙ্গের। অর্থাৎ শব্দটি স্পষ্ট প্রমাণ অথবা প্রতিপালকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এভাবে অর্থ হবে তোমরা আমার প্রভুপ্রতিপালককে মিথ্যা বলো, তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করো।

এরপর বলা হয়েছে— মাই'ন্দি মা তাস্তা'জিলুনা বিহি (তোমরা যা সত্বর চাইছো তা আমার নিকটে নেই)। এখানে তোমরা যা চাইছো অর্থ তোমরা যে শাস্তি কামনা করছো। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যে শাস্তি কামনা করে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতে। যেমন—'তোমার কাছে যা এসেছে তা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো। অথবা অবতীর্ণ করো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

'তোমরা যা চাইছো (মা তাজ্তা'জিলুনাবিহি) কথাটির উদ্দেশ্য কিয়ামতও হতে পারে। যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—'তারা যে বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে, তা তাদের সামনে উপস্থিত হলেও তারা ইমান আনবে না।'

এরপর বলা হয়েছে— ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্ (কর্তৃত্বও আল্লাহ্‌রই)। এ কথার অর্থ সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি অবতীর্ণ করবেন, না শাস্তি বিলম্বিত করবেন— সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

শেষে বলা হয়েছে, ইয়াক্বুস্সুল হাক্কা ওয়াহুয়া খইরুল ফাসিলীন (তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং মীমাংসাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ)। এখানে 'ইয়াক্বুস্সু' শব্দটির অর্থ বর্ণনা করা, বলা বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ সত্যের বর্ণনা দান করেন এবং তিনিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৫৮, ৫৯, ৬০

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰۤى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

❒ বল, 'তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদিগের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত, এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

❐ অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

❐ তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে, ক্বুল্‌লাউ আন্না ই'ন্‌দিমা তাস্‌তাযিলুনা বিহি লাক্বুদিইয়াল আমরু বাইনি ওয়া বায়না কুম (বলো, তোমরা যা সত্বর চাইছো তা যদি আমার নিকট থাকতো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেতো)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, হে মূর্খ জনতা, তোমরা যে আযাব অথবা কিয়ামত কামনা করছো, তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র। যদি এ বিষয়ে আমার কর্তৃত্ব থাকতো, তবে আমার ইচ্ছায় এখনই শাস্তি অবতীর্ণ হতো। আর এতে করে তোমাদের ও আমার মধ্যের বচসা এখনই মিটে যেতো। আর আমার ইচ্ছায় যদি কিয়ামত সংঘটিত হতো, তবে সত্য মিথ্যার মীমাংসাও হয়ে যেতো এখনই। তোমাদের ও আমার পারস্পরিক বাদানুবাদের যে ফয়সালা কিয়ামতের দিন হবার কথা তাও হয়ে যেতো এই মুহূর্তে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পারস্পরিক বিতণ্ডার মীমাংসা হবে কিয়ামতের দিন। অন্য এক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে। যেমন– –'তারপর তাঁর দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ ছিলো সে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে।'

আলোচ্য বাক্যটিতে পারস্পরিক বচসার মীমাংসার কথা সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, কোন দলের উপর সেদিন আযাব আপতিত হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে পরের বাক্যে এভাবে— ওয়াল্লহু আ'লামু বিজ্‌জলিমীন (এবং আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত)। অর্থাৎ তিনি ভালো করেই জানেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই শাস্তির উপযুক্ত এবং তাদেরকেই তিনি সেদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন। পরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— ওয়া ই'ন্‌দাহু মাফাতিহুল গইব (অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকটে রয়েছে)। এখানে 'ইন্‌দা' শব্দটি প্রথমেই ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়ত্তেই রয়েছে অদৃশ্যের কুঞ্জি। অন্য কারো অধিকার এতে নেই। 'মাফাতিহু' শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ কুঞ্জিসমূহ। এর এক বচন হচ্ছে মিফ্‌তাহুন

(কুঞ্জি)। কুঞ্জি বা চাবি হচ্ছে অর্গলবদ্ধ কোনো কিছুকে উন্মুক্ত করে দেয়ার যন্ত্র বা অস্ত্র। অদৃশ্যের কুঞ্জি (মিফতাহুল গইব) অর্থ— ওই জ্ঞান যা জানিত বস্তুর ঊর্ধ্বে, যার মাধ্যমে বাস্তব জগৎ তার রূপ পরিগ্রহ করে। ওই অদৃশ্যের কুঞ্জির একক অধিকার কেবল তাঁর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকই ওই অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। সুতরাং অদৃশ্যের কুঞ্জি তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকটে নেই।

ওই বিষয়সমূহই গায়েব বা অদৃশ্য যা এখন পর্যন্ত অস্তিত্বশীল হয়নি। যেমন, কিয়ামত, কখন বৃষ্টি হবে না হবে, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় থাকবে অর্থাৎ সে বেঁচে থাকবে না মৃত্যুবরণ করবে ইত্যাদি।

ওই বিষয়সমূহকেও গায়েব বা অদৃশ্য বলা যায়, যা বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল— কিন্তু আল্লাহ্‌পাক সে সম্পর্কে কাউকে জ্ঞান দান করেননি। যেমন মাতৃগর্ভের শিশু। কেউ জানেনা সে শিশু পুত্র না কন্যা। এখানে আলোচিত অদৃশ্যের কুঞ্জির মধ্যে এই দুই ধরনের অদৃশ্য জ্ঞানের কথাই রয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মাফাতিহুল গইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সেই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে— ১. কেউ জানেনা মাতৃউদরে কি রয়েছে— ছেলে না মেয়ে। ২. আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না যে, আগামীকাল তার কি অবস্থা হবে। ৩. বৃষ্টিপাত কখন হবে— সে কথাও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। ৪. কোন ব্যক্তি কোন স্থানে সমাহিত হবে সে কথাও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানা নেই। ৫. কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, কখন অনুষ্ঠিত হবে কিয়ামত। অন্য কারো এই জ্ঞান নেই। আহমদ ও বোখারীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, হজরত জিব্‌রাইলের এক প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসুল স. জানিয়েছেন, পাঁচ বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওই পাঁচটি বিষয়ের একটি হচ্ছে কিয়ামত। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন— ইন্নাল্লহা ই'নদাহু ইলমুস্‌সায়াতি ওয়া ইউনায্‌যিলু গইছা (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং তিনিই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন)।

আমি বলি, অদৃশ্য জ্ঞান বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ওই পাঁচ বিষয় ছাড়াও আরো অনেক অজানিত বিষয় রয়েছে। সেগুলোও গায়েবের (অদৃশ্যের) অন্তর্ভূত।

জুহাক বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি অর্থ পৃথিবীর কুঞ্জি এবং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার জ্ঞান। আতা বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি হচ্ছে ওই সকল সওয়াব ও আযাব— যা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হয়েছে। অদৃশ্যের কুঞ্জি সম্পর্কে

আরো অনেক উক্তি রয়েছে। যেমন— মৃত্যু কখন হবে, কোন শিশু হবে পুণ্যবান এবং কোন শিশু হবে পাপিষ্ঠ, কোন অবস্থায় নেমে আসবে মানুষের জীবনের যবনিকা ইত্যাদি। এই আলোচনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, অদৃশ্যের কুঞ্জি সম্পর্কে আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যা নির্বিরোধ।

এরপর বলা হয়েছে— লা ইয়া'লামুহা ইল্লাহুয়া (তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না)। গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র জন্যই সুনির্ধারিত। সে কথাটিই এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তিনিই সৃষ্টির সময় তাদের বিলম্বিত অথবা অবিলম্বিত আগমন ও নির্গমনের বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত। সকল রহস্য (হেকমত) সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। তবে তিনি যদি এ সকল বিষয়ে কাউকে কিঞ্চিত জ্ঞান দান করেন— তবে তা করতেও তিনি সক্ষম। আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এ কথাটিও জানা যায় যে, অস্তিত্বশীল হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইয়া'লামু মাফিল বার্রি ওয়াল বাহ্রি (জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত)। এ কথার অর্থ স্থলভাগের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে তিনি যেমন উত্তমরূপে অবগত, তেমনি অবগত সমুদ্র গর্ভের সকল জড় অজড় প্রাণী ও বৃক্ষরাজি সম্পর্কে।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ামা তাস্কুতু মিউঁওয়ারক্বাতিন ইল্লা ইয়া'লামুহা (তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না)। এখানে 'মা' শব্দটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশক। এবং 'মিন' নিমজ্জন বা ইস্তেগ্রাক অর্থ প্রকাশকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে— প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিতমক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— সকল বৃক্ষের সকল পাতার সংখ্যা এবং বৃক্ষশাখালগ্ন ও বৃন্তচ্যুত সকল পত্রিকার অবস্থা ও স্বরূপ সম্পর্কেও আল্লাহ্পাক ভালো করে জানেন।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালা হাব্বাতিন ফি জুলুমাতিল আরদ্বি ওয়ালা রত্বিউঁ ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিম্ মুবিন (মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রতাব্' অর্থ পানি এবং 'ইয়াবিস্' অর্থ মরুভূমি। আতা বলেছেন, এখানে 'রতাব্' অর্থ নামিদামি বা প্রসিদ্ধ এবং 'ইয়াবিস্' অর্থ জমাট পদার্থ। কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণিত শব্দ দু'টোর অর্থ জীবন ও মৃত্যু। 'ওয়ালা হাব্বাতিন', 'ওয়ালা রত্বিন' এবং 'ওয়ালা ইয়াবিসিন' শব্দত্রয়ের সংযোগ রয়েছে 'ওয়ারক্বাতিন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ এ সকল কিছুই তাঁর অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পত্রপতন, অঙ্কুরোদগম, সরস, শুষ্ক— সব কিছু সম্পর্কে জানেন। এমতাবস্থায় 'কিতাবুম্ মুবিন' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্তায়ালার অসীম অদৃশ্য জ্ঞান। আর 'ইল্লা ফি কিতাবিম্ মুবিন' (যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই) কথাটির অর্থ হবে— যা লাওহে মাহফুজে নেই।

এর পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রিকালে সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা করো তা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়'। এখানে 'তাওয়াফ্ফা' শব্দটির অর্থ— কোনো কিছুকে পূর্ণরূপে অধিকার করে নেয়া (আয়ত্তে আনা)। রূপক অর্থে শব্দটির উদ্দেশ্য হয় মৃত্যু। কিন্তু এখানে অর্থ করা হয়েছে— নিদ্রা। কেননা নিদ্রাও মৃত্যুর একটি ধরন। 'জারহুন' শব্দটির অর্থ— হাত পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ দ্বারা কোনো কাজ করা। এখানে তাই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্পাক কর্মমুখরতার জন্য দিবসকে এবং নিদ্রায় নিমজ্জিত হওয়ার জন্য রাত্রিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মানুষের পৃথিবীর জীবন এভাবেই বিবর্তিত হয়। কিন্তু সময়বিবর্তনের এই নিয়মটিকে অলংঘনীয় মনে করাও ভুল। অর্থাৎ এ রকম বলা যাবে না যে, কেউ রাতে কাজই করতে পারবে না এবং দিনে ঘুমাতেও পারবে না। এখানে আলোচ্য বাক্যটির শব্দ ব্যবহারে কিছু অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। বক্তব্যটির বিবরণভঙ্গি হতে পারতো এ রকম—'হুওয়াল্লাজি ইয়াতাওয়াফ্ফাকুম বিল্লাইলি ছুম্মা ইয়াবয়াছাকুম বিন্নাহারী ওয়া ইয়া'লামু মা জারাহ্তুম।

'যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়'— কথাটির অর্থ যাতে মানুষের পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। অবশ্য মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়েই মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বরং মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয় মাতৃগর্ভে আসার আগেই।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালার দিকে মৃত্যুর পর সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

শেষে বলা হয়েছে—'অনন্তর তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।' এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের সময় তোমাদের সকলকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানানো হবে এবং পুণ্য ও পাপের যথাবিনিময় প্রদান করা হবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে (৫৯) আল্লাহ্তায়ালার অদৃশ্য জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর পরের আয়াতে (৬০) বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে। নিদ্রা ও জাগরণের বিষয়টি উল্লেখ করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, নিদ্রা মৃত্যুতুল্য। নিদ্রা থেকে মানুষকে যেমন জাগ্রত করা হয়, ঠিক তেমনি সকলকে পুনরুত্থিত করা হবে মৃত্যু থেকে। ওই পুনরুত্থান ঘটবে কিয়ামতের পর।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

❐ তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

এরশাদ হয়েছে— ওয়াহুয়াল ক্বহিরু ফাওক্বা ই'বাদিহি (তিনিই আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী)। এখানে পরাক্রম (ফাওক্বিয়াত) অর্থ প্রাধান্য বিস্তারণ বা শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন। আর 'ক্বহিরু' অর্থ ওই বিজয় যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইউরসিলু আ'লাইকুম হাফাজাতা হাত্তা ইজা জায়া আহাদাকুমুল মাউতু তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা ওয়াহুম লা ইউফার্‌রিতুন (এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুটি করে না)। এখানে 'হাফাজাতা' অর্থ মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তা বা আমলনামার রক্ষক। এই আমলনামা কিয়ামতের দিন বিচারের সময় উপস্থাপন করা হবে। 'হাত্তা' শব্দটির মাধ্যমে এখানে আমলনামা সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ববহ করে তোলা হয়েছে। অথবা এই সংরক্ষণকে করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমের একটি নিদর্শন।

ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রুসুলুনা' (প্রেরিতরা) অর্থ মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা হজরত আজরাইল ও তাঁর সহযোগী ফেরেশ্‌তাবৃন্দ। নাখয়ীর মাধ্যমে আবু শায়েখও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ূতীর বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ্‌ বলেছেন, যে ফেরেশ্‌তা সব সময় মানুষের কাছে থাকে, পৃথিবীর আয়ু শেষে সেই ফেরেশ্‌তাই রূহ্‌ কবজ করে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার অধিকারে দিয়ে দেয়। সুতরাং আমল লেখক ফেরেশ্‌তাও মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার অধীনস্থ। মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা হজরত আজরাইল রাজস্ব আদায়কারীর মতো। অধীনস্থ কর্মচারী যেমন রাজস্ব আদায় করে তার কাছে দিয়ে দেয়, তেমনি অধীনস্থ ফেরেশ্‌তারাও মানুষের প্রাণ হরণ করে হজরত আজরাইলের হাতে সোপর্দ করে।

ইবনে হাব্বান এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, রবী বিন আনাসের নিকটে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হজরত আজরাইল কি একাই সকল মানুষের রূহ্ কবজ করেন? তিনি বললেন, রূহ্ কবজের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু তাঁর এই দায়িত্বের সহযোগী রয়েছেন অনেক। তাঁর এক পা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে আরেক পা পশ্চিমপ্রান্তে। পুনঃ জিজ্ঞেস করা হলো, ইমানদারদের রূহ্ কোথায় রাখা হয়? তিনি বললেন, সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার নিকটে।

আল্লামা কুরতুবী বলেছেন— এই আয়াত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আয়াত তিনটি হচ্ছে— ১. তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা (আমার দূতগণ তার মৃত্যুদান করে)। ২. ইয়া তাওয়াফাকুম মালাকুল মাওতুল্লাজি উক্‌কিলা বিকুম (মৃত্যুর জন্য নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণহরণ করে)। ৩. আল্লাহ্ ইয়া তাওয়াফ্‌ফাল আনফুসা (আল্লাহ্‌পাকই সকলের মৃত্যুদান করেন)।

উদ্ধৃত আয়াত তিনটির প্রথমটিতে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিতদের মাধ্যমে রূহ্ কবজ করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে হজরত আজরাইল কর্তৃক জান কবজের কথা এবং তৃতীয় আয়াতে প্রাণহরণের সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নিজের সঙ্গে। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিতরা হজরত আজরাইলের রূহ্ কবজ করার কাজের সহযোগী। মূল দায়িত্ব হজরত আজরাইলের। তাঁর সহযোগীরা কেবল মৃত্যুযন্ত্রণা সৃষ্টির মাধ্যমে হজরত আজরাইলের কাজে সাহায্য করে থাকে। রূহ্ কবজ করেন হজরত আজরাইল নিজে। আর প্রাণহরণের নির্দেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ্— সে কথাই বিবৃত হয়েছে তৃতীয় আয়াতটিতে।

কুরতুবী এমনও বর্ণনা করেছেন, যা হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— মৃত্যু আসন্ন এ রকম ব্যক্তির নিকট আগমন করেন চারজন ফেরেশ্‌তা। একজন দক্ষিণ পা, একজন বাম পা, একজন দক্ষিণ হস্ত অপর জন বাম হস্ত টেনে বের করেন তার প্রাণ। বর্ণনা করেছেন আবু হামেদ।

কালাবীর বিবৃতি— মৃত্যুদূত প্রাণহরণ করে সমর্পণ করেন শাস্তি অথবা শান্তি দূতের নিকট। জুয়াইবির তদীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ধৃত বস্তুর মতো পৃথিবীর সমগ্র বস্তু হজরত আজরাইলের অধীন। তিনি স্বহস্তে সংহার করেন যাবতীয় প্রাণ। তবে শান্তি ও শাস্তির ফেরেশতামণ্ডলী সহযোগী থাকে তাঁর কর্মে। পবিত্রাত্মা কবজ করে সমর্পণ করেন শান্তির ফেরেশতাকে আর অপবিত্র-আত্মা কবজ করে দিয়ে দেন শাস্তির ফেরেশতাকে। ইবনে মুসান্না হামাসীর বর্ণনা করেন, ইবনে আবীদ্ দুন্‌ইয়া ও আবু শায়েখ এ রকম বলেছেন। হজরত বারা বিন আজীবের বর্ণিত দীর্ঘ হাদিসে সে বর্ণনার পোষকতা লক্ষ্য করা যায়।

রসুল পাক স. বলেছেন, মৃত্যু নিকটবর্তী হলে বিশ্বাসী বান্দার পৃথিবীসম্পৃক্তি অপসারিত হতে থাকে। নিকটতর হতে থাকে আখেরাত। ওই সময় সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল অবয়ব বিশিষ্ট এক ফেরেশ্তা নেমে আসে তার কাছে। ওই ফেরেশ্তার কাছে থাকে জান্নাতের কাফন ও সুবাস। মুমূর্ষু ব্যক্তির একটু দূরে অবস্থান গ্রহণ করে সে। ইত্যবসরে মৃত্যুর ফেরেশ্তা এসে মুমূর্ষু ব্যক্তিটির শিয়রে উপবেশন করে এবং বলে— হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমা ও সন্তোষের প্রতি এসো। মুমূর্ষু ব্যক্তির রূহ্ সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়। উপুড় করা মশক থেকে নির্গত পানির মতো দ্রুত বের হয়ে আসে সেই পবিত্র আত্মা। ফেরেশ্তারা তখন ওই পবিত্র আত্মাকে বেহেশ্তি কাফনে এবং বেহেশ্তি সুবাসে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

রসুল পাক স. আরো বলেছেন, অবিশ্বাসী বান্দার মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হয় অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন এক ফেরেশ্তা। ওই ফেরেশ্তা তাকে ধমক দিতে থাকে এবং তার দিকে দৃষ্টিপাত করে রোষতপ্ত চোখে। একটু দূরে বসে যায় সে। ইত্যবসরে মৃত্যুর ফেরেশ্তা এসে তার শিয়রে বসে যায় এবং তার রূহ্ কবজ করে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় ওই কুৎসিতদর্শন ফেরেশ্তাটির হাতে।

জুহায়ের বিন মোহাম্মদের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুলপাক স. কে একবার প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! মৃত্যুর ফেরেশ্তা তো একজন। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সঙ্গে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করছে (একই সঙ্গে সকলের প্রাণ তিনি হরণ করেন কি করে?)। রসুল স. বললেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী একটি খাদ্যের থালার মতো। তাই কেউই তার দৃষ্টির আড়াল নয়।

ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, আশআস বিন আসলাম বলেছেন, হজরত আজরাইলের সামনে ও পিছনে দু'টি করে মোট চারটি চোখ রয়েছে। তাঁকে একবার হজরত ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, এক লোক পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর এক লোক পশ্চিম প্রান্তে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিপদাপন্নরা অথবা চলেছে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ— এমতাবস্থায় একই সঙ্গে কি করে আপনি এতো লোকের প্রাণহরণ করেন? হজরত আজরাইল বললেন, আমি সকলের আত্মাকে আল্লাহ্র হুকুমের দিকে ডাকি। এই ডাক শুনে সকলের আত্মা এসে পড়ে আমার হাতের মুঠোয়।

আশআস বিন আসলাম আরো বলেছেন, মালাকুল মউতের সামনে সম্পূর্ণ পৃথিবী একটি খাদ্যের থালার মতো। সেখান থেকে যখন যাকে ইচ্ছা তিনি তুলে নিতে পারেন।

এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত ইয়াকুবের এক প্রশ্নের উত্তরে হজরত আজরাইল বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক পৃথিবীকে এনে দিয়েছেন আমার আওতায়। আপনার সামনে রক্ষিত খাদ্যের বাসন থেকে আপনি যেমন ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন, তেমনি আমিও সময়মতো পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের রূহ্ কবজ করতে পারি।

আবু শায়েখ এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশ্তার সম্মুখে পৃথিবী একটি আহারের বাসনের ন্যায়। তিনি তাই যে কোনো স্থানে এবং সময়ে একাধিক ব্যক্তির রূহ্ কবজ করতে পারেন। জুহ্দ্ পুস্তকেও মুজাহিদের এই উক্তিটি রয়েছে।

আমি বলি, রসুল স. এর পবিত্র বাণী এবং তাঁর সহচরবৃন্দের মূল্যবান বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল সচেতন সৃষ্টির সঙ্গে যেমন সূর্যালোকের সম্পর্ক একই রকম, তেমনি পৃথিবী এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে সম্পর্ক হজরত আজরাইলের। তাই একজনের মৃত্যুর কারণে অন্য কারো মৃত্যু বিলম্বিত হয় না। এক মৃত্যু অন্য মৃত্যুর প্রতিবন্ধক নয়। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ— সকল প্রান্তে তাই দেখা যায় অনেক লোক একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করছে।

পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর কোনো কোনো অলিকেও এ রকম ক্ষমতা দান করেছেন। ওই অলি আল্লাহ্গণ একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে শারীরিক আকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালা হজরত আজরাইলের অনেক সহযোগীও দিয়েছেন। তারা হজরত আজরাইলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। তারা তাঁকে মৃত্যু ঘটানোর কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকেন। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের মৃত্যুর প্রাক্কালে একদল ফেরেশতা বেহেশতের অথবা দোজখের কাফন নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা হজরত আজরাইলের কবজকৃত রূহ্ নিয়ে উঠে যায় আকাশে। এই আয়াতে 'রুসুলুন' বলে ওই ফেরেশ্তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকবে। অথবা এখানে 'রুসুলুন' অর্থ হজরত আজরাইলের সাধারণ সহযোগীবৃন্দ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রুসুলুন শব্দটি বহুবচন। কিন্তু শব্দটি কেবল হজরত আজরাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ওয়াহুম লা ইউফার্‌রিতুন (তারা কোনো ত্রুটি করে না)— কথাটির অর্থ, হজরত আজরাইলের সহযোগীরা কখনো কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের কিঞ্চিত পূর্বাপরও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় না। আর আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত রূহ্ কবজ করার ক্ষমতাও তারা রাখে না।

তিবরানী, ইবনে মাজা এবং আবু নাঈমের বর্ণনাসূত্রে এসেছে, হজরত হারেস বিন খাজরাজ বলেছেন, একবার রসুল স. এক আনসারীর শিয়রে হজরত আজরাইলকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা! আমার এই একান্ত অনুচরের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করুন। হজরত আজরাইল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি প্রফুল্লচিত্ত থাকুন। শীতল রাখুন আপনার চক্ষুদ্বয়কে। জেনে রাখুন, আমি বিশ্বাসী লোকদের সঙ্গে কোমল আচরণ করি। আরো জেনে রাখুন হে রহমতের নবী! কোনো ব্যক্তির জীবন হরণের সময় তার পরিবার পরিজনেরা যখন চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকে, তখন আমি মৃত ব্যক্তির রূহ্‌ হাতে নিয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি, হে রোদনার্ত স্বজনেরা! আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমাদের এই প্রিয়জনের উপর কোনো অন্যায় আচরণ করিনি। তোমাদের প্রতিও আমি কোনো জুলুম করিনি । আর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরেও আমি এ কাজ করিনি। এ আমার স্বসিদ্ধান্ত নয় (আল্লাহ্‌ই সিদ্ধান্তদাতা)। এখন যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার ফয়সালায় প্রসন্ন থাকো, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় লাভ করবে। আর যদি অপ্রসন্ন হও, তবে তোমরা হয়ে যাবে পাপী এবং পাপের প্রতিফলও নিশ্চয় পাবে। আমি তো এভাবে বারংবার তোমাদের কাছে আসতেই থাকবো। অতএব তোমরা ভীত হও, সতর্ক হও। তাঁবুর মধ্যে, দূর দেশে, গুহায়— যে স্থানেই তোমরা থাকো না কেনো, সকলের নিকট আমার আগমন সুনিশ্চিত। এ কথার অর্থ— তোমরা যাযাবর হও, গৃহবাসী হও, পর্বতবাসী হও— বিশ্বাসী হও, অথবা হও অবিশ্বাসী— তাতে কিছু আসে যায় না। তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই মৃত্যুদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত আমার আগমনও নিশ্চিত। আমি তোমাদের ছোট বড় সকলকে চিনি। তোমরা তোমাদেরকে যতটুকু চেনো, তার চেয়েও আমি বেশী চিনি তোমাদেরকে। আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতি ব্যতীত আমি কোনো মশার প্রাণও হরণ করি না। আল্লাহ্‌পাকই প্রাণ হরণের নির্দেশ দাতা। এ রকম আলোচনা ইবনে আবীদ্‌ দুন্‌ইয়া, আবু শায়েখ এবং হাসানও করেছেন।

হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, হজরত আজরাইল নামাজের সময় (মসজিদের মধ্যে) খোঁজ খবর নিতে থাকেন। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্থ থাকে, তবে হজরত আজরাইল তার কাছে উপস্থিত হয়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন এবং ওই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্‌' কলেমার তালকিন দিতে থাকেন।

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَـٰسِبِينَ ۝

❒ অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

এরশাদ হয়েছে— 'ছুম্মা রুদ্দু ইলাল্লহি মাওলা হুমুল হাক্ব' (অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা প্রত্যানীত হয়)। এখানে 'মাওলা' শব্দটির অর্থ প্রকৃত প্রভু বা প্রতিপালক। 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি এখানে এ কথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্‌র দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। আর আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে অর্থ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব প্রদানের জন্য উপস্থিত হতে হবে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মৃত্যুর পর রহমত অথবা আযাবের ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

হজরত বারা বিন আজীব থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দার রূহ্ ফেরেশ্‌তারা উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এভাবে উর্দ্ধযাত্রার সময় বিভিন্ন ফেরেশ্‌তার দল জিজ্ঞেস করতে থাকে, এ পবিত্র আত্মা কার? আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তার তখন ওই ব্যক্তির পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি উল্লেখ করে বলে, এই আত্মা অমুকের পুত্র অমুকের। এভাবে ওই আত্মাকে পৃথিবী থেকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। তার জন্য আকাশের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আকাশের নৈকট্যধারী ফেরেশ্‌তারা তখন পবিত্র আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তাদের সঙ্গী হয়ে পরবর্তী আকাশ পর্যন্ত গমন করেন। এভাবে সাতটি আকাশ অতিক্রম করার পর আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেন, আমার এই বান্দার পুণ্য কর্মসমূহ ইল্লিয়্যিনে 'লিপিবদ্ধ' করে রাখো এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দাও। রসুল স. আরো বলেছেন, অবিশ্বাসী বান্দার আত্মাকেও ফেরেশ্‌তারা উপরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন ফেরেশ্‌তার দল তখন জিজ্ঞেস করে, এ অপবিত্র আত্মা কার? আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তারা ওই ব্যক্তির পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ নাম নিয়ে বলে, এই আত্মা ওমুকের পুত্র ওমুকের। এভাবে আত্মা বহনকারী ফেরেশ্‌তার দল পৌঁছে যায় প্রথম আকাশে। প্রথম আকাশের প্রহরী ফেরেশ্‌তাদেরকে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলে। কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— লা তুফাত্তাহু লাহুম আব্‌ওয়াবাস্ সামায়ি (তাদের জন্য আকাশের দরজা কখনোই উন্মুক্ত করা হবে না)। এরপর তিনি স. বললেন— আল্লাহ্‌পাক তখন বলবেন, সপ্তস্তর মৃত্তিকার নিচে 'সিজ্জিনে' তার নাম লিপিবদ্ধ করো। এই অমোঘ ঘোষণার পর ওই অপবিত্র আত্মাকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর রসুল স. উচ্চারণ

করলেন— ওয়া মাঁই ইউশ্‌রিক বিল্লাহি ফাকান্নামা খর্‌রা মিনাস্‌ সামায়ি ফাতাখাত্তাফাহুত্‌ তইরু আও তাহ্‌ই বিহির্‌ রিহু ফি মাকানিন সাহীক্ব (যে আল্লাহ্‌র শরীক করে, সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো। অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো)।

শেষে বলা হয়েছে— 'আলা লাহুল হুক্‌মু ওয়া হুয়া আস্‌রাউ'ল হাসিবীন' (দেখো, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর)। বাক্যটির অর্থ— এ কথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ্‌র। আর তিনি হিসাব গ্রহণে অতুলনীয়রূপে তৎপর। অর্থাৎ একজনের হিসাব গ্রহণ কালে অন্য জনের হিসাব গ্রহণ বিলম্বিত হবে না। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, পৃথিবীর অর্ধ দিবস সময়ের মধ্যে আমি সকল সৃষ্টির হিসাব সম্পন্ন করবো।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

❒ বল, 'কে তোমাদিগকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর, "আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

❒ বল, 'আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর।'

এরশাদ হয়েছে— 'কুল মাঁই ইউনাজ্জিকুম মিন জুলুমাতিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌রি' (বলো, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে পতিত হও)। এখানে 'জুলুমাত' (অন্ধকার) শব্দটির অর্থ করা হয়েছে বিপদ। বিপদ অন্ধকার সদৃশ। মানুষ স্থলভাগে ও সমুদ্র ভ্রমণকালে বিভিন্ন বিপদে পতিত হয়। কখনো পথ হারিয়ে ফেলে। কখনো তুফান, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তখন সাহায্যের জন্য সকলে বিশুদ্ধ অন্তরে কেবল

আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। কেননা অংশীবাদীরাও জানে, প্রতিমা বা দেবতা দ্বারা মানুষের কোনো উপকার বা ক্ষতি সাধিত হয় না।

এরপর বলা হয়েছে—তাদ্‌উ'নাহু তাদ্বর্‌রুআঁ'ও ওয়া খুফ্‌ইয়াতান (কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় করে)। এখানে 'তাদ্বর্‌রুআন' শব্দটির অর্থ অনুনয় করা বা বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। 'তাদ্বর্‌রুআন' (অনুনয়) এবং 'খিফাতান' (গোপন) —দু'টো শব্দই মূল ধাতু। কিন্তু শব্দ দু'টো কর্তৃকারকের অর্থবহ। উল্লেখ্য যে, গোপনে দোয়া করা এবং জিকির করা সুন্নত। রসুল স, বলেছেন, তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না (আল্লাহ্‌তায়ালা বধিরও নন কিংবা অনুপস্থিতও নন যে, তোমরা তাকে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকবে। বরং তিনি সকল সময়ে ও স্থানে সমভাবে উপস্থিত। তাঁর ওই অতুলনীয় বিদ্যমানতার কারণে তিনি অনুচ্চস্বরের ও অন্তরের প্রার্থনাও শ্রবণ করেন)। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এই যে— বিনয় ও বিশুদ্ধতার সঙ্গে ইবাদত করলে সে ইবাদতে রিয়ার (গর্বের) সম্ভাবনা থাকে না।

শেষে বলা হয়েছে— লা ইন আনজানা মিনহাজিহি লানা কুনান্না মিনাশ্‌শাকিরীন (আমাদেরকে এই বিপদ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো)। এখানে হাজিহি (এ) অর্থ— এই ঘোর অন্ধকার সদৃশ বিপদ থেকে। আলোচ্য বাক্যটি বিপদগ্রস্তদের একটি প্রার্থনার উদ্ধৃতি। প্রার্থনাটিতে বলা হয়েছে— এই বিপদ থেকে যদি আমরা পরিত্রাণ পাই, তবে মহাপরিত্রাতা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম হচ্ছে— যিনি ত্রাণকর্তা তাঁর অনুগ্রহকে স্বীকার করা এবং ওই অনুগ্রহের হক আদায় করা। অর্থাৎ অনুগ্রহদাতার সন্তোষের পথে চলা।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— কুলিল্লাহু ইউনাজ্জিকুম মিনহা ওয়ামিন কুল্লি কার্‌বিন ছুম্মা আনতুম তুশরিকুন (বলো, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ওই বিপদ থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরীক করো)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলে দিন, কেবল আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ওই বিপদের ঘোর অন্ধকার থেকে এবং সকল প্রকার দুঃশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেন। এর পরেও তোমরা তাঁর সঙ্গে শরীক করো। তোমরা ভালো করেই জানো যে— প্রতিমা বা দেব দেবী নয়, একমাত্র আল্লাহ্‌ই সকল বিপদের একমাত্র উদ্ধারকারী। তবুও তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করো। প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হও। এভাবে ধাবিত হও শিরিকের পথে। এখানে তুশরিকুন শব্দটি আগের বাক্যের শাকেরীন শব্দের বিপরীত। অর্থাৎ শরীক করা ও কৃতজ্ঞ হওয়া পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়। 'ছুম্মা আনতুম' কথাটির মাধ্যমে ওই বিষয় দু'টোকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۝ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

❐ বল, 'তোমাদিগের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।' দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

❐ তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে অথচ উহা সত্য। বল, 'আমি তোমাদিগের কার্যনির্বাহক নহি।'

❐ প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।

ক্বুল হুয়াল ক্বাদিরু আ'লা আঁইয়াব্‌য়াছা আ'লাইকুম আ'জাবাম্ মিন্ ফাওক্বিকুম আওমিন তাহ্‌তি আরজুলিকুম (বলো, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্‌পাকই আকাশ থেকে এবং মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে সক্ষম। যেমন তিনি আকাশী শাস্তি দিয়েছিলেন হজরত নূহের সম্প্রদায়কে অঝোর বৃষ্টি ও তুফানের মাধ্যমে। আদ্ সম্প্রদায় এবং হজরত লুতের সম্প্রদায়কেও দিয়েছিলেন অগ্নিপাত ও প্রস্তরপাতের শাস্তি। আর কাবাগৃহ ধ্বংসের নিমিত্তে অগ্রসরমান হস্তি বাহিনীকে আবাবিল পাখির কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে করে দিয়েছিলেন ভূতলশায়ী। আর তিনি মৃত্তিকার তলদেশ থেকেও শাস্তি আনয়ন করেছিলেন। তাই মাটি ফেটে প্রবল জলস্রোত নির্গত হয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলো হজরত নূহের সম্প্রদায়কে। অবাধ্য ফেরআউনও লাভ করেছিলো সলিল সমাধি। আর কারুণকে প্রোথিত করা হয়েছিলো মৃত্তিকায়।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ঊর্ধ্বদেশের শাস্তি অর্থ— নিষ্ঠুর সম্রাটের অত্যাচার। আর তলদেশের শাস্তির অর্থ হচ্ছে অবাধ্য ও

দুষ্ট ক্রীতদাস। জুহাক বলেছেন, এখানে ঊর্ধ্বদেশ ও তলদেশের শাস্তি অর্থ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শাস্তি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঊর্ধ্বদেশের শাস্তি হচ্ছে অতি বৃষ্টি এবং তলদেশের শাস্তি হচ্ছে অজন্মা বা খরা।

আও ইয়ালবিসাকুম শিইয়্যাআঁও ওয়া ইউজিক্বা বা'দ্বাকুম বা'সা বা'দ্বিন (অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম)। এখানে 'ইয়ালবিসা' শব্দটির অর্থ মিলিয়ে দেয়া। 'শিইয়্যাআন' অর্থ পরস্পরবিরোধী চিন্তা ভাবনা ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন দল। বা'সা অর্থ আযাব, যুদ্ধের ভয়াবহতা। কামুস। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে তোমরা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্পাক এটা করতে সক্ষম।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াতের (৬৫) 'ক্বুল হুওয়াল ক্বাদিরু' থেকে 'ফাওক্বাকুম' পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, 'আউজু বিওয়াজহিকাল কারীম'। তখন অবতীর্ণ হলো— 'আও ইয়ালবিসাকুম' থেকে 'বা'সা বা'দ্বিন' পর্যন্ত। রসুল স. তখন বললেন, (প্রথমোক্ত আজাব থেকে) এটা অনেক সহজ ও সহনীয়। বোখারী প্রমুখ।

দ্রষ্টব্যঃ শেষোক্ত অংশ (এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনিই সক্ষম) বাক্যটির বাস্তবায়ন শুরু হয় পঁয়ত্রিশ হিজরী সালে। ওই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে উষ্ট্রের যুদ্ধ (জংগে জামাল) এবং সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ওই সকল যুদ্ধে মুসলমানদের হাত রঞ্জিত হয় মুসলমানের রক্তে।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর সফরসঙ্গী ছিলাম। বনী মুআবিয়ার মসজিদের পাশ দিয়ে গমন করছিলাম আমরা। রসুল স. থামলেন। মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। আমিও দু'রাকাত নামাজ পড়লাম। নামাজের পর রসুল স. দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, আমি আমার প্রভু প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা জানালাম। প্রথমটি হচ্ছে, আমার উম্মতকে যেনো হজরত নূহের উম্মতের মতো পানিতে ডুবিয়ে মারা না হয়। আল্লাহ্পাক আমার এই দোয়া কবুল করেছেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— আমার উম্মত যেনো দুর্ভিক্ষগ্রস্ত না হয়। আল্লাহ্পাক আমার এই দোয়াটিও কবুল করেছেন। তৃতীয়টি হচ্ছে— আমার উম্মতেরা যেনো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়— আল্লাহ্পাক আমার এই প্রার্থনাটিকে কবুল করেন নি। বাগবী।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান আনসারী বর্ণনা করেছিলেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, রসুল স. এক মসজিদে বসে তিনটি বিষয়ে দোয়া করেছেন— যার দু'টি কবুল হয়েছে, একটি

হয়নি। প্রথম দোয়াটি ছিলো— ইসলামের কোনো শত্রুকে যেনো আমার উম্মতের উপরে বিজয়ী করা না হয়। দ্বিতীয় দোয়াটি ছিলো— আমার উম্মত যেনো কখনো ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষকবলিত না হয়। এই দোয়া দু'টি কবুল হয়েছে। তৃতীয়টি কবুল হয়নি। তৃতীয়টি ছিলো— আমার উম্মত যেনো গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হয়। বোখারী।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. আমাদেরকে বললেন, আমার তিরোধানের পর তোমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে অবিশ্বাসী হয়ো না। তোমরা তো তখন একজন অন্যজনের উপর তরবারীর আঘাত করতে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসুল (এ রকম সাক্ষী প্রদানের পরেও কি আমরা অবিশ্বাসকে গ্রহণ করবো?)। একজন সাহাবী বলে উঠলেন, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করবো— এ রকম কখনো হতে পারে না। আমরা তো মুসলমান। তখন অবতীর্ণ হলো— 'উনজুর কাইফা নুসার্‌রিফুল আয়াতি লায়াল্লহুম ইয়াফ্‌ক্বহুন' (দেখো, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে)।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'ওয়াকাজ্‌জাবা বিহি ক্বাওমুকা ওয়া হুয়াল হাক্‌কু কুল লাস্‌তু আ'লাইকুম বিওয়াকিল' (তোমার সম্প্রদায় তো একে মিথ্যা বলেছে অথচ এটা সত্য। বলো, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলেছে। অথচ তা চিরন্তন সত্য। আপনি তাদেরকে এ কথা বলুন যে, আমি (রসুল) তোমাদেরকে জোর করে হেদায়েত দান করবো বা অস্বীকার করার কারণে তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো— এ রকম দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। কারণ প্রকৃত কার্যনির্বাহক আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। আমি নই।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'লিকুল্লি নাবাইম্ মুস্‌তাক্বার্‌রুন- ওয়াসাওফা তা'লামুন' (প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে)। এ কথার অর্থ—'অবিশ্বাসীদের জন্য আযাব অবধারিত', এ সংবাদটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। ওই সময়ের কখনো অগ্র- পশ্চাৎ ঘটবে না। অতএব হে অবিশ্বাসীরা! সত্বর তোমরা জানতে পারবে যে, প্রদত্ত সংবাদটি অবিসংবাদীতরূপে সত্য। আযাব তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। হয় পৃথিবীতে। না হয় আখেরাতে।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

❐ তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।

মুশরিকদের মজলিশে বসতে নিষেধ করা হয়েছে এই আয়াতে। ওই সময় মক্কার মুশরিকেরা তাদের মজলিশে বসে কোরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলতো। ত্রুটি নির্দেশ করতো বিভিন্ন আয়াতের। কোরআনকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলে মেতে উঠতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশায়। তাই আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে ওই সকল মজলিশ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন—'তুমি যখন দেখো তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়'। আয়াতটি কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়নি এবং জেহাদের আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি রহিতও হয়নি। এখানে কেবল এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের বিদ্রূপপ্রবণ এবং সমালোচনামুখর অধিবেশন পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ তাদের মজলিশ প্রকৃতপক্ষে শয়তানের মজলিশ। আর শয়তানের মজলিশে বসা নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কর্ম। রসুলুল্লাহ্‌ স. এবং বিশ্বাসীদের জন্য তাই ওরকম অধিবেশনে উপবেশন করা শোভনীয় নয়।

শয়তানের অধিবেশন থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। তাই পরক্ষণে এরশাদ হয়েছে—'এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।' এখানে 'জলিমীন' শব্দটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে সীমালংঘনকারী বা জালেমরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তাহলে কাবাগৃহের চত্বরে কিভাবে উপবেশন করবো? কাবাগৃহের তাওয়াফ্‌ইবা করবো কিভাবে? মুশরিকেরা তো অধিকাংশ সময় সেখানেই মজলিশ বসায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে—

সাহাবীগণ তখন বললেন, আমরা যদি তাদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ না করি তবে তো আমরা পাপী হয়ে যাবো। তাঁদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৬৯, ৭০

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ۝ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا
شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا
كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

❐ উহাদিগের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদিগের নহে যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদিগের কর্তব্য যাহাতে উহারাও সাবধান হয়।

❐ যাহারা তাহাদিগের দ্বীনকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদিগের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও; যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না; ইহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যান হেতু ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

ওয়ামা আ'লাল্লাজিনা ইয়াত্তাকুনা মিন হিসাবিহিম মিন শাইইন (ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে)। এখানে 'মিনহিসাবিহিম' কথাটির 'মিন' শব্দটি মিন এ তাবইজ (আংশিক অর্থ প্রকাশক)। আর 'মিনশাইইন' এর 'মিন' হচ্ছে মিন এ জায়েদ (অতিরিক্ত 'মিন')। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— কিয়ামতের দিন যখন অবিশ্বাসীদের অপকর্মের হিসাব নেয়া হবে, তখন বিশ্বাসীদেরকে এ প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। অর্থাৎ যারা মুত্তাকী (সাবধানী) তারা অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী নয়।

'ওয়ালাকিন জিকরা' (তবে উপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য)— কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তবে বিশ্বাসীদের উচিত তারা যেনো মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকার জন্য অংশীবাদীদেরকে সামর্থানুযায়ী উপদেশ দেয়। এ রকম উপদেশকে তারা হয়তো কখনো গ্রহণ করতেও পারে। তাই শেষে বলা হয়েছে— লায়াল্লাহুম ইয়াত্তাকুন (যাতে তারাও সাবধান হয়)। এই 'সাবধান হয়' কথাটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'সাবধানতা অবলম্বন করে' কথাটির সঙ্গেও সম্পৃক্ত করা সম্ভব। যদি তাই হয় তবে অর্থ হবে এ রকম— বিশ্বাসীরা যেনো অবিশ্বাসীদেরকে সদুপদেশ দান করা নিজেদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করে এবং নিজেরাও সাবধান হয় (অবিশ্বাসীদের মজলিশে বসা থেকে বিরত থাকে)।

এর পরের আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ওয়া জারিল্লাজিনাত্তাখাজু দিনাহুম লায়িবাঁও ওয়া লাহ্ওয়া (যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে)। এ কথার অর্থ—অবিশ্বাসীদের আচরণীয় ধর্ম ক্রীড়া-কৌতুকপূর্ণ। প্রতিমা পূজা, বাহিরা ও সায়বা (দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া পশু) — এগুলো তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের এই স্বকপোলকল্পিত ধর্মের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত— কোনো স্থানে তারা উপকৃত হবে না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, সদ্য অবতীর্ণ সত্য ধর্ম ইসলামকে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানকে তারা ক্রীড়া-কৌতুক বলে মনে করে। সত্যের প্রতি অবলীলাক্রমে বর্ষণ করে বিদ্রূপবান।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উৎসবের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেবল মুসলমানেরা ছাড়া অন্যেরা ওই দিনগুলোকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে। কিন্তু মুসলমানেরা উৎসবের দিনকে ইবাদতের দিন হিসেবেই বহাল রেখেছে। যেমন— ঈদ, জুমআ, তাকবীর, কোরবানী, সদকায়ে ফিতর, খুতবা ইত্যাদি।

'জারিল্লাজিনা' কথাটির মাধ্যমে এখানে জানানো হয়েছে যে, মুশরিকদের কথা ও কার্যাবলীর দিকে ভ্রূক্ষেপই করা চলবে না। অথবা 'জার' শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে ধমক দেয়া কিংবা ভয় দেখানো। যেমন, অন্য আয়াতে এসেছে— জারনি ওয়ামান খালাকতু ওয়াহিদা (আমাকে ছেড়ে দাও)।

কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— মুশরিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না, তাদের অপআচরণের প্রভাব থেকে নিজেকে বিরত রাখো। এ অর্থটি গ্রহণ করলে মেনে নিতে হবে যে, জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে।

ওয়া গর্‌রাত হুমুল হায়াতুদ্ দুন্‌ইয়া(পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে) — কথাটির অর্থ, তারা নিমগ্ন হয়েছে পার্থিব জীবনের প্রতারণায়। তাই পুনরুত্থান দিবসের কথা বিস্মৃত হয়েছে তারা।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া জাক্‌কির বিহি আন্ তুব্‌সালা নাফ্‌সুম বিমা কাসাবাত-লাইসা লাহা মিন্‌দুনিল্লাহি ওয়ালিইঁউ ওয়ালা শাফিউ'ন (এই কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো; যাতে পরিণামে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ফাঁদে না পড়ে, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না)। এখানে 'তুব্‌সালা' শব্দটির পূর্বে 'লা' (না) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য শব্দটিসহ অর্থ করা হয়েছে এ রকম— 'ফাঁদে না পড়ে'। 'বাসাল' শব্দের অর্থ বন্ধ করে রাখা বা ঠেকিয়ে রাখা। কামুস গ্রন্থে রয়েছে— শব্দটির অর্থ সাহায্যকারী বন্ধু, যিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আযাবকে প্রতিহত করতে পারেন। 'শাফিউন' অর্থ সুপারিশকারী, যিনি সুপারিশ করে আযাব থেকে রক্ষা করেন।

এরপর বলা হয়েছে ওয়া ইন তা'দিলহকুল্লা আ'দ্‌লিল্‌লা ইউখাজু মিন্‌হা (এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সকল সম্পদ দিয়ে দিলেও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। এখানে 'আ'দল' শব্দটি ধাতুগত অর্থ প্রকাশ করেছে। তাই 'লা ইউখাজু' শব্দটির সর্বনাম তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু অন্য আয়াতে 'আ'দলুন' শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থপ্রকাশক হয়েছে। যেমন—'লা ইউখাজু মিনহা আ'দলুন'। তাই 'লা ইউখাজু' শব্দটির সম্পর্ক সেদিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। 'আদলুন' অর্থ ফিদ্‌ইয়া বা বিনিময়। বিনিময় সবসময় সমমানের হয় বলে এখানে বিনিময়কে আ'দল বলা হয়েছে। এখানে 'কুল্লা আ'দলিন' অর্থ 'বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দিলেও'। এরপর বলা হয়েছে— উলাইকাল্লাজিনা উব্‌সিলু বিমা কাসাবু লাহুম শারাবুম্ মিন্ হামিমিউঁ ওয়া আ'জাবুন আলিমুম বিমা কানু ইয়াকফুরুন (এরাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে; সত্য-প্রত্যাখ্যান হেতু এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি)। এখানে উলাইকা (এরাই) শব্দটির মাধ্যমে ওই সকল লোকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছিলো। উব্‌সিলু অর্থ তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। অর্থাৎ তাদেরকে আযাবের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। হামিমীন অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের উত্তপ্ত সলিল (অত্যুষ্ণ পানীয়)। আর আ'জাবুন আ'লীম কথাটির অর্থ অগ্নি ও অন্যান্য শাস্তি। এখানে 'বিমা কানু' শব্দটির 'বা' অক্ষরটি একটি কারণ নির্দেশক অব্যয়। অথবা 'বিমা কানু' একটি পৃথক বাক্য। কিংবা কথাটি 'উলাইকা' শব্দটির দ্বিতীয় বিধেয়।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

❐ বল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদিগের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে; যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে ঠিক পথে আহবান করিয়া বলে আমাদিগের নিকট আইস।" বল, 'আল্লাহের পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

❐ এবং সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতেও, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

কুল আনাদ্‌উ' মিনদুনিল্লাহি মালা ইয়ানফাউ'না ওয়ালা ইয়াদ্বুর্‌রুনা ওয়া নুরাদ্‌দু আ'লা আ'ক্বাবিনা ব'াদা ইজহাদানাল্লহ্ (বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর)। কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, তোমাদের মতো আমরাও কি প্রতিমাপূজারী হবো? কেনো হবো? পূজা পেলেও তো প্রতিমাগুলো তার উপাসকদের কোনো উপকার করতে পারে না। আর পূজা না পেলে করতে পারে না কোনো অপকার। আল্লাহ্‌পাক দয়া করে আমাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। দিয়েছেন সত্য ধর্ম ইসলাম। এর পরেও হে মূর্তি পূজকেরা তোমরা কি এমতো আশা করো যে, আমরা অবিশ্বাসের ডাকে সাড়া দেবো?

এরপরে বলা হয়েছে— কাল্লাজিস্ তাহ্ওয়াত্হুশ্ শাইয়া তিনু ফিল আরদ্বি হাইরানালাহু আস্হাবুঁই ইয়াদ্উঁ নাহু ইলাল হুদা'তিনা (আমরা কি সেই ব্যক্তির মতো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবো যাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে; যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহবান করে বলে 'আমাদের নিকটে এসো')। এখানে 'হাওয়া' শব্দটির অর্থ যাওয়া। 'ইসতাহ্ওয়াতুহু' অর্থ— তাকে নিয়ে যেতে চাওয়া, নিয়ে যাওয়া। কাল্লাজিনা শব্দটির 'কাফ' অক্ষরটি এখানে যবর বিশিষ্ট। এটাকে কর্মকারক বলা যেতে পারে। অথবা 'নুরাদ্দু' শব্দটির সর্বনামের প্রকৃতি এখানে বুঝানো হয়েছে। এভাবে প্রথম অবস্থায় বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমরা কি পুনরায় অংশীবাদীতার দিকে ফিরে যাবো, যেভাবে ফিরে গিয়েছে ওই সকল লোক— যাদেরকে শয়তান পথ ভুলিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে— আমরা কি শিরিকের দিকেই ফিরে যাবো তাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষার্থে— যাদেরকে শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে সঠিক পথের দিশা।

শায়াতিন শব্দটির অর্থ অবাধ্য জ্বিন এবং আল আরদ্বি শব্দটির অর্থ মরুভূমি বা জনশূন্য প্রান্তর। এভাবে অর্থ হবে— শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ভুলিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। হাইরানা শব্দটি ইস্তাহ্ওয়াত্হু শব্দের কর্মপদী সর্বনামের অবস্থাজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকে, বুঝতে পারে না— কোথায় যাবে, কি করবে। 'আলহুদা' শব্দটি এখানে মূল ধাতু এবং কর্ম কারকের অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ সোজা পথ। ইয়াদ্উ'নাহু এর ব্যাখ্যা ই'তিনা। ইয়াদ্উ'না শব্দটির বক্তব্য প্রকাশক। অর্থাৎ তার সহচরগণ তাকে ডাকছে। বলছে, আমাদের কাছে এসো। অথচ সে তাদের ডাক শুনলো না এবং তাদের কাছেও এলো না।

যে ব্যক্তি ইসলামের পথ থেকে সরে যায়, মুসলমানেরা তাকে ইসলামের পথে উদাত্ত আহ্বান জানালেও যে ওই আহ্বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না— আল্লাহ্তায়ালা তার তুলনা করেছেন ওই সকল লোকের সঙ্গে, যাদেরকে শয়তান গভীর অরণ্যে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। তার সাথীরা তাকে ডাকছে। কিন্তু সে শুনছে না।

'আনাদ্উ' প্রশ্নটি একটি না সূচক উত্তরসম্বলিত প্রশ্ন (ইসতেফ্হামে ইনকারী)। অর্থাৎ আমরা এখন এরূপ করবো না এবং উপমিতি সূচক পূর্ণ বাক্যটি পূর্বোক্ত 'নুরাদ্দু' শব্দের সর্বনামের অবস্থাজ্ঞাপক।

শেষে বলা হয়েছে— ক্বুল ইন্না হুদাইয়াল্লহি হুয়াল হুদা ওয়া উমির্‌না লিনুসলিমা লিরব্বিল আ'লামীন। কথাটির অর্থ হে আমার রসুল! আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌র পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— ওয়াআন আকিমুস্‌ সালাতা ওয়াত্তাক্বুহু (এবং আদিষ্ট হয়েছি সালাত কায়েম করতে এবং তাঁকে ভয় করতেও)। আগের আয়াতে 'লিনুস্‌ লিমা' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটি ছিলো অতিরিক্ত। অথবা 'বা' অক্ষরের অর্থ প্রকাশক হিসেবে সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অক্ষরটি। আর আলোচ্য আয়াতের 'আন' শব্দটি লুপ্ত সুনির্দিষ্ট। তাই ক্রিয়া এখানে মূল ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা লিমুসলিমা শব্দের 'লাম' অক্ষরটি তা' লিলিয়াহ্‌ (কারণ প্রকাশক) এবং উমির্‌না (আদিষ্ট হয়েছি) শব্দটির কর্ম এখানে উহ্য রয়েছে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমাদেরকে দেয়া হয়েছে রসুলের অনুসরণের আদেশ, যেনো আমরা সকলে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাস হয়ে যাই (সালাত কায়েম করি এবং তাঁকে ভয় করি)। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও নৈকট্য, রসুলুল্লাহ্‌ স. এর আনুগত্য ও নৈকট্যের উপর নির্ভরশীল।

সবশেষে বলা হয়েছে— ওয়া হুয়াল্‌লাজি ইলাইহি তুহ্‌শারুন। কথাটির অর্থ—— এবং তাঁরই নিকটে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ্‌তায়ালার সকাশে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে চূড়ান্ত বিচারের জন্য সকলকে একত্র করা হবে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৭৩

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۭ۬ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۭ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۭ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

❐ তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়; তাঁহার কথাই সত্য; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

এরশাদ হয়েছে— ওয়া হুওয়াল্লাজি খলাক্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা বিল হাক্কি (তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)। এখানে বিল হাক্কি শব্দটির অর্থ যথাকুশলতার সঙ্গে বা যথাবিধি। অথবা এর অর্থ বাস্তবরূপ দেয়া। কিংবা 'বা' অক্ষরটির অর্থ এখানে 'লাম'। অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য (তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী)।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া ইয়াওমা ইয়াক্বুলু কুন্ ফাইয়াকুন্ (যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হয়ে যায়)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন তিনি মৃতদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, উঠে দাঁড়াও। তখন সকলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কথাটি নিঃসন্দিগ্ধ। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— ক্বাওলুহুল হাক্ব (তাঁর কথাই সত্য)।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালাহুল মুলকু ইয়াওমা ইউনফাখু ফিস্সুরি (যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই)। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণী সত্য। অন্য আয়াতেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। যেমন— (কিয়ামতের দিন তিনি বলবেন) 'আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? একমাত্র আল্লাহ্রই কর্তৃত্ব— যিনি বিজয়ী'। আলোচ্য বাক্যটিতে উল্লেখিত 'সুর' শব্দটির অর্থ শিংগা। একবার এক বেদুইন রসুল স. এর নিকটে শিংগা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি স. বললেন, শিংগা ওটাই যাতে ফুৎকার দেয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে ইবনে মুবারক তাঁর জুহুদ নামক গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর আলবা'ছ নামক গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈও হাদিসটি সংকলন করেছেন। ইবনে হাব্বানও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। আবু দাউদও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান কিতাবুল আজামাহ্ নামক গ্রন্থে ওহাব বিন মুনাব্বাহ্র মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ শিংগা সৃষ্টি করেছেন স্বচ্ছ কাঁচের মতো উজ্জ্বল শাদা মোতি দ্বারা। তারপর আরশকে নির্দেশ দিয়েছেন— হে আরশ, শিংগাকে ধারণ করো। আরশ তখন শিংগাকে ধারণ করলো। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, 'হয়ে যাও'। তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হলেন হজরত ইস্রাফিল। হজরত ইস্রাফিলকে নির্দেশ দিলেন, শিংগাটি গ্রহণ করো। হজরত ইস্রাফিল শিংগা গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্পাক যতগুলো জীবন সৃষ্টি করেছেন ততগুলো ছিদ্র রয়েছে ওই শিংগায়। দু'টি রূহের জন্য একটি ছিদ্র রয়েছে— এমন কখনো নয়। শিংগার মধ্যস্থলে রয়েছে আকাশ পৃথিবীর গোলকের মতো এক বিশাল গহ্বর। ওই গহ্বরে মুখ লাগিয়ে রয়েছেন হজরত ইস্রাফিল। আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইস্রাফিলকে বললেন,

শিংগায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিলাম। সেই থেকে হজরত ইসরাফিল আরশের সম্মুখভাগে বসে ডান পা আরশের নিচে প্রবেশ করিয়ে বাম পা সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন এবং নিস্পলক নেত্রে আল্লাহ্পাকের নির্দেশের জন্য প্রহর গুণে চলেছেন।

হজরত জায়েদ বিন আরকাম থেকে উত্তম সূত্রে আহমদ ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমরা কিভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করবো। আল্লাহ্পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় শিংগাওয়ালা যে শিংগা মুখে নিয়ে মস্তক ঝুঁকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে আল্লাহ্পাকের নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম সন্ত্রস্ত হলেন। তিনি স. বললেন, তোমরা এই কালামটি পড়তে থাকো— হাসবুনাল্লহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের উত্তম রক্ষক)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাকেম, আলব'াছ গ্রন্থে বায়হাকী এবং আওসাত গ্রন্থে তিবরানী। এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. তখন তাঁর সহচরবৃন্দকে এই দোয়াটি পাঠ করতে বলেছিলেন— হাসবুনাল্লহু ওয়ানি'মাল ওয়াকিল আ'লাল্লাহি তাওয়াক্কালনা। এ রকম হাদিস হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি, হাকেম এবং বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। আর আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি প্রত্যুষে দু'জন ফেরেশতাকে শিংগার কাছে পাহারারত রাখা হয়। শিংগায় ফুঁক দানের নির্দেশ কখন আসে, সেই অপেক্ষায় তাঁরা থাকেন।

ইবনে মাজা ও বায্যাবের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'জন শিংগা ফুঁৎকারীর হাতে রয়েছে দু'টি শিংগা। দু'জনেই তাঁরা ফুঁৎকারের নির্দেশ শ্রবণের জন্য সতত উৎকর্ণ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেছেন, শিংগায় ফুঁৎকার দানের দায়িত্ব বহনকারী দুই ফেরেশতা দুই আকাশে অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের একজনের মাথা পূর্বপ্রান্তে এবং পা পশ্চিম প্রান্তে। অন্যজনের মাথা পশ্চিম প্রান্তে এবং পা পূর্বপ্রান্তে। তারা দু'জনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ফুঁৎকারের নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষমান । এ সকল বর্ণনাদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, দু'জন ফেরেশ্তা রয়েছেন শিংগা ফুৎকারের দায়িত্বে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে একটি করে শিংগা।

হজরত কা'ব আহ্বার থেকে উত্তমসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শিংগায় ফুঁক দানের দায়িত্ব বহনকারী ফেরেশতা এক পায়ের হাঁটু মুড়ে অপর পা খাড়া রেখে পিঠ ঝুঁকিয়ে শিংগা মুখে নিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত রয়েছে। তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন হজরত ইস্রাফিলের ডানা সংকুচিত হয়ে আসবে, তখনই দিতে হবে ফুঁৎকার।

জননী আয়েশা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ রকম বলতে শুনেছি। শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, এই হাদিসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিংগা ফুঁৎকারের দায়িত্বে রয়েছেন অন্য ফেরেশ্তারা— হজরত ইস্রাফিল নন। অথচ ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসমূহে দৃষ্ট হয়েছে যে, হজরত ইস্রাফিলই শিংগা ফুঁৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই পরস্পরবিরোধী বিবরণ সমূহের সামঞ্জস্য সাধনার্থে বলা হয়েছে— ওই শিংগাধারী ফেরেশতাদ্বয় যখন হজরত ইস্রাফিলের দু'টি ডানা সংকুচিত হতে দেখবেন, তখনই প্রথমবারের মতো ফুঁৎকার দিবেন তাদের শিংগায়। ওই ফুঁৎকার শুনে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে। এরপর দ্বিতীয়বারের মতো শিংগায় ফুঁৎকার দিবেন হজরত ইস্রাফিল।

আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান তাঁর 'আজামাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু বকর হাজালী বলেছেন, শিংগায় ফুঁৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার এক পা রয়েছে পৃথিবীতে। সে হাঁটু গেড়ে হজরত ইস্রাফিলের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তার সৃষ্টির পর সে কখনও চোখের পলক ফেলেনি। সে কেবল এই অপেক্ষায় রয়েছে যে কখন শিংগায় ফুঁৎকারের নিদর্শন প্রকাশিত হবে (কখন হজরত ইস্রাফিলের ডানা সংকুচিত হতে শুরু করবে)।

সবশেষে বলা হয়েছে— আ'লীমুল গইবি ওয়াশ্শাহাদাতি ওয়াহুয়াল হাকিমুল খবীর (অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত)। এখানে গইব শব্দটির অর্থ অস্তিত্বপূর্ব অবস্থা (যা এখনো অবয়ব ধারণ করেনি)। শাহাদাতুন অর্থ প্রত্যক্ষগোচর সৃষ্টি— যা অস্তিত্বশীল। আল্লাহ্পাক দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছুর স্রষ্টা। সকল সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে সদা বিদ্যমান। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো অণু-পরমাণুও তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি প্রজ্ঞাময় এবং বিজ্ঞানময় (সবিশেষ অবহিত)। অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীনতার সকল রহস্য তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তাই তিনি কিয়ামত, হিসাব, শাস্তি, বিনিময়— সৃষ্টিকুলের সামগ্রিক অবস্থা উত্তমরূপে অবগত।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

❐ স্মরণ কর, ইব্রাহিম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

ওয়া ইজক্বলা ইব্রাহীমু লিআবিহি আযারা আতাত্তাখিজু আসনামান আলিহাতান (স্মরণ করো, ইব্রাহিম তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলো, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেন?)। আযর শব্দটি আরবী নয়। কেউ কেউ বলেছেন আরবী। আযর শব্দের অর্থ শক্তি। আর ওয়াযার শব্দটির অর্থ ভার বা ওজন। এ ওয়াযার থেকেই এসেছে আযর।

প্রকৃত কথা এই যে, আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা ছিলেন না— ছিলেন পিতৃব্য। আরব দেশে পিতৃব্যকেও পিতা বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে তাই হজরত ইব্রাহিমের চাচা আযরকে তাঁর পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— না'বুদু ইলাহাকা ওয়াইলাহা আবাইকা ইব্রহিমা ওয়া ইসমাইলা ওয়া ইস্হাক্বা ইলাহাও ওয়াহিদা (আমরা ইবাদত করি আপনার প্রতিপালকের এবং আপনার পিতৃপুরুষগণ— ইব্রাহিম, ইস্মাইল ও ইস্হাকের প্রতিপালকের)।

আযরের আসল নাম ছিলো নাখোর। সে প্রথমে তার পিতৃপুরুষের ধর্মানুসারে আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাসী ছিলো। পরে সম্রাট নমরুদের সভাসদ হওয়ার কারণে লোভ লালসায় পড়ে মুশরিক হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম রাযী বলেছেন, আযর হজরত ইব্রাহিমের চাচা ছিলো— বাপ নয়। তাঁর পূর্বের এক দল আলেমও এ রকম অভিমত পোষণ করেন।

আল্লামা জুরকানী 'শারহে মাওয়াহীব' গ্রন্থে লিখেছেন, শিহাব হাইসামী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে— তওরাত ও ইঞ্জিল বিশেষজ্ঞগণ এবং সকল ঐতিহাসিক বলেছেন, আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা।

আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী লিখেছেন, আমার নিকট সূত্রপরম্পরায় এ কথাটি পৌঁছেছে যে, হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জারীর এবং সুদ্দী বলেছেন, আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা নয়। তাঁর পিতার নাম মারেখ। সুয়ুতী

এ কথাও লিখেছেন যে, ইবনে মুনজিরের তাফসীরে উল্লেখিত একটি আসারে (সাহাবীগণের উক্তি) আমি এ কথাটি পেয়েছি যে— আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা।

কামুস গ্রন্থে রয়েছে, আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের চাচা। তাঁর পিতার নাম ছিলো তারিখ্ অথবা তারিহ্। অথবা দু'টোই। এই আয়াতের ব্যাখ্যা থেকেও প্রমাণিত হয় যে আযর হজরত ইব্রাহিমের পিতা নন। সুরা বাকারায়ও এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন— 'ওয়ালা তাসআল আ'ন আস্‌হাবিল জাহীম' এই আয়াতের তাফসীর সূত্রে আমি সেখানে উল্লেখ করেছি যে—বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে বনী আদমের উত্তম সময়গুলোর মধ্যে একটি উত্তম সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আমি শেষ পর্যন্ত সেই যুগে এসেছি, যে যুগ ছিলো আল্লাহ্‌র জ্ঞানে। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর সকল ঊর্ধ্বতন পিতৃ-পুরুষ আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ এককত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা কেউই মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু আযর ছিলো মুশরিক। তাই সে হজরত ইব্রাহিমের চাচাই হবে— — পিতা নয়। আল্লামা সুয়্যুতী হজরত আদম থেকে রসুলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত সকল নবী রসুলের পিতৃ-পুরুষদেরকে মুসলমান প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি পুস্তিকাও লিখেছেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক, জুহাক এবং কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের পিতার ছিলো দু'টি নাম, আযর ও তারিখ— যেমন হজরত ইয়াকুবের আরেকটি নাম ছিলো ইস্রাইল। মুকাতিল এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের পিতার নাম ছিলো তারিখ। আর তার উপাধি ছিলো আযর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ ঘটবে। বিমর্ষ আযরের চেহারায় তখন ফুটে উঠবে দোজখীদের চিহ্ন। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার অবাধ্য হবেন না? আযর বলবে, আজ আমি তোমার বিরোধিতা করবো না। হজরত ইব্রাহিম তখন প্রার্থনা জানাবেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আপনি তো আমার সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আপনি আমাকে অপমান করবেন না। আমার পিতা দুর্দশাগ্রস্ত। আমার জন্য এর চেয়ে অধিক অপমানজনক অবস্থা আর কী হতে পারে? আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা হুকুম করবেন, হে ইব্রাহিম! নিচের দিকে তাকাও। হজরত ইব্রাহিম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন কর্দমাক্ত একটি পুরুষ উদের মতো প্রাণীকে পা ধরে নরকে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহ্‌পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত। এই বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে আযর ছিলো হজরত ইব্রাহিমের পিতা।

সুলায়মান তায়মী বলেছেন, আযর অর্থ বক্র বা বাঁকা। এটি একটি অপছন্দনীয় শব্দ। এর ফারসী অর্থ হচ্ছে পায়ের গ্রন্থি।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং মুজাহিদ বলেছেন, আযর একটি প্রতিমার নাম। ওই প্রতিমার পূজারীদেরকে বলা হতো আযর। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আযর ছিলো আসলে আবদে আযর (আযরের ক্রীতদাস)। পরে আবদ শব্দটি লুপ্ত হয়েছে। প্রচলিত হয়েছে আযর নামটি। আযর প্রতিমার নাম ছিলো— কথাটি মেনে নিলে এখানে একটি সর্বনামবিশিষ্ট ক্রিয়া উহ্য রয়েছে বলে মেনে নিতে হয়। তখন আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— (তুমি কি আযরের পূজা করো) তুমি কি তাকে প্রভু মনে করো? তখন এ কথাই বলা উদ্দেশ্য হবে যে, হজরত ইব্রাহিমের পিতা কেবল আযর নামক প্রতিমার উপাসনা করতেন না, অন্যান্য প্রতিমাও ছিলো তাঁর উপাস্য। তাই এখানে 'তাত্তাখিজু' শব্দের পরে 'আস্‌নামান আলীহাতান' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিমাপূজকেরা সন্দেহাতীতরূপে পথভ্রষ্ট। তাই হজরত ইব্রাহিমের উক্তিরূপে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— 'ইন্নি আরাকা ওয়া ক্বাওমাকা ফি দ্বলালিম মুবিন'। কথাটির অর্থ— আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৭৫

وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝

❒ এইভাবে ইব্‌রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'ওয়া কাজালিকা নুরী ইব্‌রাহীমা মালাকুতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' (আমি ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই)। এখানে নুরী শব্দটি অতীতকালবোধক। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে বলছেন, আমি ইব্রাহিমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখিয়েছি। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমানকালের সিগা (শব্দ প্রকরণ)।

কামুস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, মালাকুত অর্থ প্রাবল্য ও পরাক্রম। শব্দটি এসেছে মালাকুন থেকে। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয় সুবিশাল সাম্রাজ্যের কথা। জাওহারী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, মালাকুত কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার সাম্রাজ্যকে বলা হয়। কেননা প্রকৃত অর্থে তাঁর সাম্রাজ্যই সুবিশাল। এই সাম্রাজ্যের সম্পর্ক প্রধানতঃ আকাশমণ্ডলীর সঙ্গে। কারণ আকাশমণ্ডলী পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক

বড়। আর আকাশমণ্ডলীও পৃথিবীতে কেবল আল্লাহ্তায়ালারই একচ্ছত্র অধিকার। মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, 'মালাকুতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত আল্লাহ্পাকের অপার ক্ষমতা ও প্রশাসনের নিদর্শনসমূহ।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাটি ছিলো এ রকম— হজরত ইব্রাহিমকে একটি পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর তখন উঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো সকল পর্দা। এভাবে তাঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো সকল আকাশ, পৃথিবীর নিম্নতম স্তর এবং আরশে মোয়াল্লা। এমন কি তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত বেহেশ্তও দেখে নিয়েছিলেন। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'ওয়া আতাইনাহু আজ্রাহু ফিদ্দুন্ইয়া' (আমি ইব্রাহিমকে এই পৃথিবীতেই তার বেহেশতের স্থান দেখিয়ে দিয়েছি)।

হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, হজরত আলী বলেছেন, চোখের সামনে থেকে পরদা উঠিয়ে নেয়ার পর হজরত ইব্রাহিম দেখলেন, এক স্থানে এক পুরুষ এবং নারী ব্যভিচারে রত। তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। আরেক স্থানেও তিনি এ রকম ব্যভিচারের ঘটনা দেখলেন। তাদের জন্যও তিনি বদদোয়া করলেন। তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। আরেকটি স্থানে তিনি একই ঘটনা দেখে বদ্দোয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেই আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে ইব্রাহিম! তুমি এমন প্রার্থনাকারী যার প্রার্থনা কবুল করা হয়। কিন্তু তুমি আমার বান্দাদের জন্য এভাবে বদদোয়া কোরো না। পাপী বান্দাদের সঙ্গে আমার তিন প্রকারের সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে— পাপ করার পর যদি সে তওবা করে, তবে আমি তার তওবা কবুল করি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— সে পাপী হলেও আমি তার বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করি, যে হয় আমার একনিষ্ঠ দাস। তৃতীয়টি হচ্ছে— শেষ বিচারের সময় পাপী অবস্থায় উপস্থিত আমার বান্দাকে আমি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দেই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে— সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

হজরত কাতাদা বলেছেন, 'মালাকুতাস্সামাওয়াতি' অর্থ চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র। আর মালাকুতুল আরদ্ব অর্থ পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি।

শেষাংশে বলা হয়েছে— ওয়ালিইয়াকুনা মিনাল মু'ক্বিনিন (যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়)। এখানে ইয়াক্বীন শব্দটির অর্থ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ত ক্রিয়া সহযোগে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি হজরত ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষগোচর করিয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত

করিয়েছি। এভাবে তাঁর জ্ঞানগত বিশ্বাসকে (ইয়াক্বীনকে) আমি করেছি প্রত্যক্ষ বিশ্বাস (আইনুল ইয়াক্বীন)। এভাবেই সে হয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসের (হক্কুল ইয়াকিনের) অধিকারী। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দলভুক্ত আমি করেছি তাঁকে এভাবেই।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ
الْاٰفِلِيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ
رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○ اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❐ অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক, অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পছন্দ করি না।'

❐ অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক;' যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❐ অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ,; যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহের শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।

❐ 'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের প্রথমেই বলা হয়েছে— অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, 'এটাই আমার প্রতিপালক'। এ কথার অর্থ রাত্রি সমাগমের পর হজরত ইব্রাহিম আকাশে দেখলেন ধ্রুবতারা বা শুকতারা। সেই তারার দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিমা পূজার সাথে সাথে নক্ষত্রেরও পূজা করতো। তারকাপূজারীদের বিশ্বাস ছিলো সকল কাজের নিয়ন্ত্রণ আকাশের তারাগুলোই করে থাকে। তাদেরকে এই ভ্রষ্ট বিশ্বাস থেকে উদ্ধারের জন্য হজরত ইব্রাহিম দলিল প্রমাণ দিতে শুরু করলেন এভাবে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক? (তোমাদের কি মনে হয়)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'হাজা' (এটাই) শব্দটির পূর্বে একটি প্রশ্নবোধক 'হামযা' অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত হামযা সহযোগে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— এটাই কি আমার প্রভু? এ রকম প্রশ্নের অর্থ হয়— এ রকম হওয়া তো অসম্ভব। নক্ষত্রপূজকদেরকে একই সঙ্গে সচকিত ও সত্যানুসন্ধানী করে তুলবার জন্য তিনি এ রকম বাকভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'এটাই আমার প্রতিপালক'— কথাটির সরাসরি অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। কথাটির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেননা হজরত ইব্রাহিম 'এটাই আমার প্রতিপালক'— এ কথা যখন বলেছিলেন তখন তিনি ছিলেন আল্লাহ্পাকের এককত্বের তত্ত্বানুসন্ধানকারী এক দুর্বার পথিক। গন্তব্য তখনো দূর। অতএব পথযাত্রাকালে এ রকম মন্তব্য কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। বাগবী বলেছেন, তখন হজরত ইব্রাহিম ছিলেন বালক। যে বয়সে শরিয়তের নির্দেশ প্রবর্তিত হয়, সেই বয়সে তখনো তিনি পৌঁছান নি। তাই উদ্ধৃত উক্তিটির জন্য তাঁকে তৌহিদ বিরোধী মনে করা যেতে পারেই না। বায়যাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক এক কিশোর মাত্র।

শরহে যুলাসাতুস্ সায়ের গ্রন্থে আল্লামা আবু বকর লিখেছেন, নক্ষত্র চন্দ্র ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন অনুসন্ধান করার সময় হজরত ইব্রাহিমের বয়স ছিলো পনের মাস। এ সকল উক্তি অবশ্য ভুল। বরং শুরুতেই যে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাটি দেয়া হয়েছে— সেটাই অধিকতর শুদ্ধ। এ কথা ভুললে চলবে না যে, সকল নবী রসুল সকল সময়ের জন্য তৌহিদপন্থী (এক আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী)। কোনো একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁরা অংশীবাদী হতে পারেন না। কেমন করে পারবেন? তাঁরা যে নিষ্পাপ। আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দিয়েছেন পাপবিমুক্ত ও পবিত্র অস্তিত্ব। তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক— সকল অবস্থায় তাঁরা সত্যাধিষ্ঠিত।

কাযী আয়ায তাঁর শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ওয়ালাক্বাদ আতাইনা ইব্‌রাহীমা রুশ্‌দাহু মিনক্বলু (আমি শিশুকালেই ইব্রাহিমকে হেদায়েত দান করেছি)। মুজাহিদ এবং অন্যান্য আলেম তাই এ রকমই বলেছেন।

ইবনে আতা বলেছেন, তাঁর সৃষ্টির পূর্বেই তাঁকে রসুল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, জন্মগ্রহণের পর হজরত ইব্রাহিমের নিকট এক ফেরেশ্‌তা এসে বললো, হৃদয় দিয়ে আল্লাহ্‌কে চিনে নিন এবং মুখে তা প্রকাশ করুন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমি তো এ রকমই করেছি। 'ঠিক আছে আমি এরূপ করবো'— এ রকম কথা তিনি বলেননি। বলেছেন, আমি তো এ রকমই করেছি। এটাই ছিলো তাঁর জন্মপূর্ব অবস্থার রুশদ বা হেদায়েত।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচ্য আয়াত সেই পরিচালন-ব্যবস্থা দর্শনের একটি অধ্যায়— এ অধ্যায়ান্তর ক্রমাগত পরিণত হয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসে (৭৬ আয়াত থেকে ৭৯ আয়াত পর্যন্ত দেয়া হয়েছে জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন পথযাত্রা, অধ্যায়ান্তর এবং পরিণতি বিষয়ক বিবরণ)। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এক সময় অস্তমিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলো কখনো প্রতিপালক নয়— প্রতিপালকের পরিচিতির পথে এগুলো এক একটি নিদর্শন মাত্র। এভাবে আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিমের সৃষ্টিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়িত হয়েছে 'এভাবে ইব্রাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই'— কথাটি। এই ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে বলতে হয়— পৃথিবীতে পদার্পণের পর প্রথমবারের মতো তিনি যখন তারকা দর্শন করলেন, 'এটাই আমার প্রভু'—কথাটি তখনকার। আর তখনই শুরু হয়েছিলো তাঁর 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা' দর্শনের অধ্যায়। এই ব্যাখ্যাটির ভিত্তিতে বর্ণনাকারীগণ একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন। ঘটনাটি এ রকম—

নমরূদ বিন কিনয়ান ছিলো ইরাকের সম্রাট। সে-ই ছিলো সর্বপ্রথম রাজমুকুট পরিধানকারী। প্রজা সাধারণকে সে নির্দেশ দিয়েছিলো— তার (নমরুদের) পূজা করতে হবে। তার দরবারে ছিলো কয়েকজন গণক ও জ্যোতির্বিদ। তারা গণনা করে বললো, রাজন! এ বছর আপনার রাজ্যে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। বড় হয়ে সে-ই আপনার ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তার মাধ্যমেই ধ্বংস হবেন আপনি এবং নিশ্চিহ্ন হবে আপনার সাধের সাম্রাজ্য।

এক বর্ণনায় এসেছে, পূর্ববর্তী কিতাবে হজরত ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইরাক রাজ্যের ধ্বংস হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ ছিলো। গণকেরা সে কথাই জানিয়েছিলো নমরুদকে।

আল্লামা সুদ্দী লিখেছেন, একবার নমরুদ স্বপ্নে দেখলো— আকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে একটি তারকা। তারকাটির আলো চন্দ্র-সূর্যের আলোর মতো। এই ভয়ানক স্বপ্ন দেখে নমরুদ ভয় পেয়ে গেলো। সে গণকদেরকে ডেকে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীরা বললো, এ বছরই জন্ম নেবে ওই শিশুটি, যে হবে আপনার, রাজপরিবারের এবং সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নমরুদ রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে দিলো— এ বছর যতো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে। আর এখন থেকে বৎসর শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো দম্পতি সঙ্গম করতে পারবে না। নারী ও পুরুষেরা থাকবে পৃথক পৃথক স্থানে। এ ঘোষণার পর প্রতি দশজনের জন্য একজন করে পাহারাদার নিযুক্ত করলো নমরুদ। নমরুদের ওই ঘোষণাটিতে এ কথাও বলা ছিলো যে, ঋতুবতী রমণীরা কেবল তাদের স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। ঋতুমুক্ত অবস্থায় পারবে না। এ রকম বলার কারণ এই ছিলো যে, নমরুদের সাম্রাজ্যের লোকেরা কখনো ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে রতিকর্ম করতো না। এতকিছু সাবধানতা অবলম্বন করার পরও আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় কার্যকর হলো। কারণ অকৃতকার্যতা তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়নের অন্তরায় নয়। নমরুদের কঠোর ঘোষণা ও পাহারা সত্ত্বেও একদিন হজরত ইব্রাহিমের পিতা তাঁর মাতার সঙ্গে পবিত্রাবস্থায় মিলিত হলেন। তার ফলে মাতৃগর্ভে আগমন করলেন হজরত ইব্রাহিম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, নমরুদ প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার কাছে একজন করে পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলো। হজরত ইব্রাহিমের জননী ছিলেন অল্পবয়সিনী। আর গর্ভধানের কোনো চিহ্নও তাঁর শরীরে ছিলো না। তাই তাঁর নিকট কোনো পাহারাদার রাখা হয়নি।

সুদ্দী লিখেছেন, ভীত সন্ত্রস্ত নমরুদ সকল পুরুষকে রেখে দিলো সেনা নিবাসে। এভাবে সে নারী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেললো। সে নিজেও অবস্থান গ্রহণ করলো ওই সেনা নিবাসে। একদিন এক বিশেষ কাজে রাজধানীতে লোক পাঠানোর প্রয়োজন পড়লো তার। বিশ্বাসী লোক হিসেবে আযরকেই একাজের জন্য নির্বাচন করলো সে। তাকে ডেকে বললো, একটি বিশেষ কাজে রাজধানীতে পাঠাতে হচ্ছে তোমাকে। তোমার উপর আমি আস্থা রাখি। তুমি নিশ্চয় বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। তবু তোমাকে আমি কসম দিয়ে বলছি, কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসো। স্ত্রীর নিকট যেয়ো না। আযর বললো, স্ত্রীর নিকট গমন করার চেয়ে আপনার প্রসন্নতাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। নমরুদের নির্দেশ মতো আযর রাজধানী শহরে গিয়ে উপস্থিত হলো। নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করার পর সে ভাবলো স্ত্রীকে এক নজর দেখে এলে দোষের তো কিছু নেই। এ কথা ভেবে সে স্বগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না। মিলিত হলো পত্নীর সঙ্গে। ওই মিলনের ফলে মাতৃউদরে এলেন হজরত ইব্রাহিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যেদিন হজরত ইব্রাহিম মাতৃউদরে আগমন করলেন, ওই দিনই গণকেরা নমরুদকে বললো সেই শিশুটি আজ মাতৃউদরে এসেছে। নমরুদ নির্দেশ দিলো সকল শিশু সন্তানকে হত্যা করা হোক। এদিকে হজরত ইব্রাহিম জননীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হলো। প্রসববেদনা শুরু হতেই তিনি লোকালয় থেকে চলে গেলেন এক অরণ্যে— যেনো তাঁর সন্তান প্রসবের কথা কেউ জানতে না পারে। অরণ্যের তৃণশয্যার উপরে ভূমিষ্ঠ হলেন হজরত ইব্রাহিম। সেখানেই তাঁকে রেখে স্বগৃহে ফিরে এলেন ইব্রাহিম জননী। স্বামীকে বললেন, সদ্যজাত শিশুটি ওই অরণ্যের অমুক স্থানে তৃণশয্যায় শায়িত রয়েছে। পুত্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল পিতা সেখানে গিয়ে পবিত্র শিশুটি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়লো। সেখানে একটি সুড়ঙ্গ খনন করে শিশু ইব্রাহিমকে লুকিয়ে রাখলো সে। সুড়ঙ্গ মুখে চাপা দিয়ে রাখলো একটি পাথর। এরপর থেকে লোক চক্ষুর অগোচরে ইব্রাহিম জননী নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগলেন সেখানে। এভাবে তিনি প্রতিদিন শিশুকে দুধ পান করিয়ে আসতেন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, প্রসববেদনা অনুভব করার সাথে সাথে হজরত ইব্রাহিমের জননী ওই রাতেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আশ্রয় নিলেন অনতিদূরের একটি পাহাড়ের গুহায়। ওই পর্বত গহ্বরেই ভূমিষ্ঠ হলেন নবী ইব্রাহিম। শিশু সন্তানকে সেখানে রেখে গৃহে ফিরে এলেন নবী ইব্রাহিমের মাতা। এরপর থেকে নিয়মিত গোপনে সেখানে গিয়ে তিনি শিশুকে দুধ পান করিয়ে আসতেন। প্রায়শঃই তিনি দেখতেন, শিশু ইব্রাহিম তাঁর নিজের হাতের আঙ্গুল চুষে পানাহারের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। হজরত আবু রওক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিমের মাতা একদিন ভাবলেন, দেখি তো শিশুর আঙ্গুলে কী রয়েছে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন একটি আঙ্গুল থেকে বের হচ্ছে পানি এবং দ্বিতীয় আঙ্গুল থেকে বের হচ্ছে মধু। আর তৃতীয় আঙ্গুল থেকে দুধ, চতুর্থ আঙ্গুল থেকে খেজুর এবং পঞ্চম আঙ্গুল থেকে বের হয়ে আসছে ঘি।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আযর তাঁর স্ত্রীকে বললো, কী সন্তান হয়েছে তোমার। ছেলে না মেয়ে? তিনি বললেন, ছেলে। কিন্তু ছেলেটি মৃত। এ কথা শুনে আযর নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। ওদিকে নবী ইব্রাহিম অস্বাভাবিকরূপে দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকলেন। অন্য শিশু এক মাসে যতটুকু বড় হয়, তিনি একদিনে ততটুকু বাড়তে থাকলেন। অন্য শিশু এক বছরে যতখানি বাড়ে, তিনি এক মাসে বেড়ে উঠলেন ততখানি। এভাবে ওই পর্বত গহবরে তিনি কাটালেন পনেরটি মাস। একদিন জননীকে বললেন, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো। তখন সাঁঝ অতিক্রান্ত হয়েছে। চরাচর জুড়ে নেমে এসেছে রাত্রির নিকষ আঁধার। জননী তাঁর পবিত্র সন্তানকে গুহার বাইরে নিয়ে এলেন। আঁধারঘেরা নিসর্গের প্রতি প্রথম

দৃষ্টিপাত করলেন হজরত ইব্রাহিম। ভাবলেন, আমার সেই প্রভু প্রতিপালক কোথায়, যিনি আমাকে পানাহার করিয়ে বড় করে তুলেছেন? তিনিই তো আমার উপাস্য। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, একটি অতি উজ্জ্বল তারকা বিশাল আকাশে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তবে কি এটি আমার প্রভু? এক সময় তারকা অদৃশ্য হয়ে গেলো। তিনি বললেন, আমি তো তাকে চাইনা যার সদাবিদ্যমানতা নেই। এরপর আকাশে দেখা দিলো আলো ভরা গোল চাঁদ। তিনি বললেন, তবে এটাই কি আমার প্রতিপালক! নিষ্পলক নেত্রে তিনি তাকিয়ে রইলেন সুউজ্জ্বল চন্দ্রটির দিকে। কিন্তু নিশাবসানে সে চাঁদ অন্তর্হিত হলো। অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিলো ভোরের সূর্য। তিনি সবিস্ময়ে বললেন, তবে এটাই কি! দিনান্তে সেই প্রখর সূর্যও ডুবে গেলো চরাচর থেকে। হজরত ইব্রাহিম বুঝলেন, এ সকলের তাহলে সদাবিদ্যমানতা নেই। অর্থাৎ এগুলোর প্রতিপালক হওয়ার যোগ্যতাই নেই। মাতার সঙ্গে তিনি ফিরে এলেন স্বগৃহে। দেখলেন, পিতা ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা অক্ষয়, অব্যয়, সদাবিদ্যমান এক আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় রত। তিনি অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। পিতাকে শুধু বললেন, আমার জননী বলেছেন, আপনিই আমার পিতা। আমি এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে গুহাভ্যন্তরে বেড়ে উঠেছি। পবিত্র পুত্রদর্শনে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম পর্বতের গুহায় ছিলেন দশ বছর। অপর বর্ণনায় এসেছে সাত বছর। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে সতেরো বছর।

আমি বলি, উপরের বর্ণনাগুলো সত্য বলে ধরে নিলেও হজরত ইব্রাহিমের মাতা-পিতা যে কাফের ছিলেন, সে কথা প্রমাণিত হয় না। তবে বর্ণনাগুলোতে হজরত ইব্রাহিমের পিতারূপে আযরের নাম এসেছে। আর আযর যে কাফের ছিলো তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং হাদিস শরীফে। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে আযরের নাম প্রসঙ্গে কোনো কোনো বর্ণনাকারী সন্দেহ পোষণ করেছেন। মূল বর্ণনায় কেবল বলা হয়েছে 'হজরত ইব্রাহিমের পিতা'। সেগুলোতে স্পষ্ট করে 'আযর' শব্দটির উল্লেখ নেই। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, যখন গুহার মধ্যে হজরত ইব্রাহিম বড় হয়ে গেলেন, তখন তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন— আমার প্রতিপালক কে? মা বললেন, আমি। হজরত ইব্রাহিম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক কে? মা জবাব দিলেন, তোমার পিতা। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার পিতার প্রতিপালক কে? মা উত্তর দিলেন, নমরুদ। হজরত ইব্রাহিম বললেন, নমরুদের প্রতিপালক কে? মা বললেন, চুপ করো, বাবা চুপ করো। হজরত ইব্রাহিম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ইব্রাহিমজননী গৃহে ফিরে গিয়ে স্বামীর কাছে বললেন, আমার মনে হয় তোমার ছেলেই নমরুদের সাম্রাজ্যে বিপ্লব ঘটাবে। এরপর তিনি হজরত ইব্রাহিমের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো শোনালেন। সব শুনে, পিতা উপস্থিত হলেন হজরত ইব্রাহিমের গুহাবাসে। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার জনক, আমার পালনকর্তা কে?

পিতা বললেন, তোমার জননী। হজরত ইব্রাহিম বললেন, আমার জননীর পালনকর্তা কে? পিতা বললেন, আমি। হজরত ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পালনকর্তা কে? তিনি বললেন, নমরুদ। হজরত ইব্রাহিম প্রশ্ন করে বসলেন, নমরুদের পালনকর্তা কে? এ কথা শুনে পিতা তাকে চপেটাঘাত করলেন এবং বললেন, চুপ। তারপর যখন রাতের আঁধার নেমে এলো তখন হজরত ইব্রাহিম গুহামুখে এসে বাইরের দিকে তাকালেন। দেখলেন আকাশে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে। আপন মনে তিনি বললেন, এটাই কি তবে আমার পালনকর্তা? এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম একদিন তাঁর মাতা-পিতাকে বললেন, আমাকে এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে চলো। জনক-জননী তখন তাঁকে গুহা থেকে বের করে নিয়ে এলেন। তখন রাত। হজরত ইব্রাহিম একস্থানে দেখলেন কিছু উট, ছাগল এবং ঘোড়া। পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? পিতা বললেন, এগুলো উট, ঘোড়া এবং ছাগল। হজরত ইব্রাহিম বললেন, নিশ্চয়ই এদের কোনো স্রষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন। এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুকতারা অথবা ধ্রুবতারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রাতটি ছিলো কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিকের একটি রাত। তাই তিনি প্রথম রাতে দেখেছিলেন শুকতারা এবং শেষ রাতে দেখেছিলেন চন্দ্র। আলোচ্য আয়াতেও তাই বলা হয়েছে প্রথমে নক্ষত্র পরে চন্দ্র ও শেষে সূর্যোদয়ের কথা।— এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইব্রাহিমের জনক জননী ছিলেন কাফের। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, কাফের অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু ঘটেছিলো। যাহোক, এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বিভিন্ন রকম। সূত্রগুলোও শিথিল। অপর দিকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হাদিসে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত আদম থেকে রসুলুল্লাহ্ স. এর পিতা-মাতা পর্যন্ত সকল উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তন মাতা-পিতা সকলেই ছিলেন ইমানদার। রসুলুল্লাহ্ স. পবিত্র পুরুষের পৃষ্ঠদেশ থেকে পবিত্র মাতার গর্ভে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হয়ে আসছিলেন। তাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়া তাক্বাল্লুবুকা ফিস্ সাজিদীন (আর আমি তোমাকে সেজদাকারীদের মাধ্যমে পরিক্রমণ ঘটিয়েছি)। আর আরববাসীরা পিতৃব্যকেও পিতা নামে ডেকে থাকে। তাই এ রকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিমের দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় তাঁর পিতা তারিখ ইন্তেকাল করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর প্রতিপালনের ভার অর্পিত হয় তাঁর চাচা আযরের উপর। তাই লালন-পালনকারী হিসেবে আযরকে আলোচ্য আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের পিতা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

এরপর বলা হয়েছে— ফালাম্মা আফালা ক্বালা লা উহিব্বুল আফিলিন (অতঃপর যখন ওই নক্ষত্র অস্তমিত হলো তখন সে বললো, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না)'। এ কথার অর্থ— যা ক্ষয় হয়, লয় হয়, অস্তমিত হয় তার উপাসনা করতে আমি সম্মত নই। আমি তো উপাসনা করবো তাঁর, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীলতা থেকে পবিত্র।

পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'ফালাম্মা রাআল ক্বমারা বাযিগান ক্বলা হাজা রব্বি' (অতঃপর সে যখন চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলো, তখন সে বললো, 'এটাই আমার প্রতিপালক')। এ কথার অর্থ চন্দ্রকে নক্ষত্রাপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল দেখতে পেয়ে হজরত ইব্রাহিম বললেন, এটাই আমার প্রতিপালক। তিনি ছিলেন পূর্ণ সচেতন জ্ঞানানুসন্ধানী। তাই নক্ষত্রের অস্তমিতিকে তিনি গ্রহণ করলেন তৌহিদের পথের একটি প্রমাণ হিসেবে। এর অতিরিক্ত দলিল ছিলো নিষ্প্রয়োজন। তবু তিনি অংশীবাদীদের নিকট অধিকতর প্রমাণ স্থাপনের জন্য প্রমাণের পরিধিকে প্রশস্ততর করেছিলেন। তাই প্রমাণ হিসেবে নক্ষত্রের পর চন্দ্র এবং তারপর সূর্যের প্রমাণকে গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে— ফালাম্মা আফালা ক্বলা লাইল্লাম ইয়াহ্দিনি রব্বি লা আকুনান্না মিনাল ক্বওমিদ্ দ্বল্লীন (যখন এটা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎ পথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো')। এ কথার অর্থ— চন্দ্রও যখন ডুবে গেলো, তখন হজরত ইব্রাহিম নতুন নিদর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সরল পথের সন্ধান দান না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি হয়ে পড়বো দিশাহীন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্তির অমূল্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তিনি এ কথা বলেছিলেন। যেমন রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য না এলে আমি হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম না। না দান করতে শিখতাম, না পড়তে পারতাম নামাজ। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সত্যপথের দিকে আহবান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নক্ষত্রের মতো চন্দ্রও কখনো উপাস্য হতে পারে না। কারণ, নক্ষত্রের মতোন চন্দ্রও অস্তমিত হয়, পরিবর্তিত হয়। এগুলোর কোনোটিই চিরন্তন নয়। তাই যে এগুলোকে প্রতিপালক মনে করবে সে অবশ্যই হয়ে যাবে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত। উদয় ও অস্ত দু'টো অবস্থাই অচিরন্তনতার নিদর্শন। কিন্তু উদয়ের চেয়ে অস্তের মধ্যে ক্ষয়ের নিদর্শনটি অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে। তাই হজরত ইব্রাহিম এখানে নক্ষত্র ও চন্দ্রের অস্তমিত হওয়াকে উপাস্য না হওয়ার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এর পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ফালাম্মা রায়াশ্ শামসা বাযিগাতান ক্বলা হাজা রব্বি হাজা আকবার (অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখলো তখন সে বললো, 'এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ব বৃহৎ।') এখানে 'সর্ব বৃহৎ' অর্থ নক্ষত্র ও চন্দ্র অপেক্ষা বৃহৎ। আরবী ভাষায় শামস্ (সূর্য) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর হাজা (এটা) নির্দেশক বিশেষ্যটি পুংলিঙ্গ। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সূর্যের দিকে। কেননা হাজা শব্দটির বিধেয় 'রব' (প্রতিপালক) শব্দটি পুংলিঙ্গ। যে

নির্দেশক বিশেষ্য নির্দেশিত বস্তু এবং বিধেয় এর মধ্যবর্তী স্থানে হয়, তার মধ্যে নির্দেশিত বস্তুর স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ হওয়া কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, হাজা শব্দটির মাধ্যমে সূর্যের উদিত হওয়াকে অথবা সূর্যের প্রখরতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আমি বলি, শামস্ শব্দটি কেবল শ্রুতিগত দিক থেকে স্ত্রী লিঙ্গ। যেহেতু এর তাস্গীর রূপ শামসিয়াতুন। উল্লেখ্য যে, হজরত ইব্রাহিমের মাতৃভাষা আরবী ছিলো না। তাঁর ভাষায় সূর্য ছিলো পুংলিঙ্গ। তাই আয়াত আরবী হলেও আয়াতের বক্তব্যে হজরত ইব্রাহিমের বাকভঙ্গিকেই বলবৎ রাখা হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গ বাচক 'হাজা' শব্দটি।

সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গায়রুল্লাহ্র উপাসনার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত করে তোলার জন্যই হজরত ইব্রাহিম বলেছেন, হাজা আকবার (এটাই সর্ব বৃহৎ)। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ সূর্যও যখন অস্তমিত হয় এবং তা উপাসনার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন চন্দ্র, নক্ষত্র এবং অন্যান্য সৃষ্টবস্তুনিচয় উপাস্য হওয়ার অযোগ্য। পরের বাক্যে সে কথাটিই বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

ফালাম্মা আফালাত্ ক্বলা ইয়া ক্বওমি ইন্নি বারিউম্ মিম্মা তুশ্রিকুন (যখন এটাও অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র শরীক করো তা থেকে আমি নির্লিপ্ত')। এ কথার অর্থ— দেখো হে আমার সম্প্রদায়, সূর্যও অস্তমিত হয়। সুতরাং নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য আলোকজ্জ্বল ও বৃহৎ হলেও প্রতিপালক হওয়ার উপযুক্ত নয়। এগুলোর অবস্থা সতত বিবর্তনশীল। এগুলোর সব কয়টিই এক ও অবিভাজ্য পরিবর্তনকারী স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। তিনি এগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করছেন। এই বৃহৎ নিদর্শনগুলোর অবস্থা যদি এ রকমই হয়, তবে স্বহস্তনির্মিত প্রতিমাগুলো তো উপাস্য হওয়ার আরো অধিক অনুপযুক্ত। এভাবে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এক ও অবিনশ্বর আল্লাহ্কে উপাস্য প্রমাণ করার পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র শরীক করো— তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। এ কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক জনতার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ্পাকের এককত্ব প্রমাণের জন্যই তিনি নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে যাচ্ছিলেন। এভাবে শেষ সিদ্ধান্তটি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। এভাবে মুশরিক জনতাকে নিরুত্তর করে দেয়াই ছিলো তাঁর আসল উদ্দেশ্য। এরপর আরো পরিষ্কার করে তিনি তৌহিদের যে শাশ্বত বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন— তা উদ্ধৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (৭৯)।

বলা হয়েছে— ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন (আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই)। এখানে 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন' কথাটির মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টি সর্ববিষয়ে এক আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। সৃষ্টি সম্ভাব্যের বৃত্তভূত। আর তিনি অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল ওজুদ)। তিনিই সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্বশীল করেছেন। আমি সেই অবিভাজ্য ও চিরন্তন প্রভুপ্রতিপালকের দিকে মনোনিবদ্ধ করলাম। কারণ আমি অংশীবাদী নই। আমি বিশ্বাসী।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৮০

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

❒ তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অবধান করিবে না?

'ওয়া হাজ্জাহু কৃওমুহু' (তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো)। এ কথার অর্থ—আল্লাহ্পাকের একক উপাস্য হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হওয়ার পর পরাজিত অংশীবাদীরা হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত হলো। তারা চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোকে ভয় করো। নতুবা তাদের রোষে পতিত হবে। নমরুদকেও ভয় করো। তা না করলে সে তোমাকে হত্যা করবে। অথবা জ্বালিয়ে দিবে।

এরপর বলা হয়েছে— হজরত ইব্রাহিম বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। কথাটির অর্থ, জ্ঞানগত দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরেও তোমরা অহেতুক আমার সঙ্গে বিবাদ করছো কেনো। আমার আল্লাহ্ই তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার বয়স কম। আর অক্ষরের মুখাপেক্ষীও আমাকে করা হয়নি। তোমাদের দৃষ্টিতে অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত হলেও এ কথা পরিষ্কাররূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ্পাক স্বয়ং আমাকে সরাসরি পথপ্রদর্শন করেছেন। দেখিয়েছেন প্রকৃত পথ এবং দিয়েছেন অকাট্য প্রমাণ।

এরপর বলা হয়েছে— আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক করো তাকে আমি ভয় করি না। কথাটির অর্থ— সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে এমকানের) কোনো কিছুই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সৃষ্টি— স্রষ্টা নয়। ভূচতুষ্টয়ও (আগুন, পানি, মাটি বাতাস) আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টবস্তু। সম্রাট নমরুদও তেমনি আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি। সুতরাং সচেতন অচেতন কোনো সৃষ্টিই উপাস্য হতে পারে না। আমি তাই কাউকে ভয় পাই না। তোমাদের দেব-দেবীদেরকেও না। কারণ সৃষ্টি হিসেবে আমরা সকলেই সমতুল। বরং কোনো কোনো সৃষ্টি তো আমাপেক্ষাও অধিক অক্ষম। যেমন, তোমাদের প্রতিমাগুলো, উদ্ভিদসমূহ এবং সকল জড় পদার্থ।

এক বর্ণনায় এসেছে— যখন হজরত ইব্রাহিম পর্বত গুহা থেকে বের হয়ে এলেন, তখন মুশরিক জনতা তাঁর প্রতি তত আগ্রহী ছিলো না। আযর মূর্তি নির্মাণ করতো এবং তা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করতো। একদিন তিনি হজরত ইব্রাহিমকে, কয়েকটি মূর্তি বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করতে বললেন। হজরত ইব্রাহিম মূর্তিগুলো নিয়ে বাজারে গিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন, আমার নিকট থেকে কেউ কি এমন কোনো জিনিস ক্রয় করতে চাও— যা ক্ষতিকারক, উপকার করার কোনো ক্ষমতা যাদের একেবারেই নেই। এ রকম বলার ফলে কেউ আর মূর্তি ক্রয় করলো না। শেষ বেলায় তিনি মূর্তিগুলোকে একটি পুকুরের পানিতে উপুড় করে ধরে মূর্তিপূজকদের শুনিয়ে বলতে থাকলেন, নাও। এবার পানি পান করো।

'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে'— কথাটির অর্থ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে করেন তবে কেবল আমার উপর আপতিত হবে বিপদ। সে বিপদ তিনি যে কোনো মাধ্যমে আমার উপর অবতীর্ণ করতে পারেন। আর তিনি যদি আমাকে নির্বিপদ রাখতে চান তবে তোমাদের উপাস্যগুলোর কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির এমতোক্ষমতা নেই যে তারা আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

এরপর বলা হয়েছে—'সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার অসীম ও অননুভব্য জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, কেবল তাঁর ইচ্ছায় এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিফলিত ইচ্ছার মাধ্যমে সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে উপকার অথবা অপকার সাধিত হয়। আর সৃষ্টির অনস্তিত্ব, অস্তিত্ব এবং সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর অসীম জ্ঞানের আওতাভূত, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের অধীন।

শেষে বলা হয়েছে— 'আফালা তাতাজাক্কারুন' (তবে কি তোমরা অবধান করবে না?) এ কথার অর্থ— তিনিই পরিপূর্ণ ও চিরঅক্ষয় সত্তা। তিনি অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী এবং চিরবিজয়ী। আর সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অক্ষমতা। আর তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো তো সম্পূর্ণতই জড় বস্তু। ইচ্ছা অথবা শক্তি কোনো কিছুই সেগুলোর নেই। এই চিরসত্য কথাটি কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮১, ৮২

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

❐ তোমরা যাহাকে আল্লাহের শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই তাহাকে আল্লাহের শরীক করিতে তোমরা ভয় কর না; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।'

❐ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদিগের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদিগেরই জন্য, তাহারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক করো আমি তাকে কিরূপে ভয় করবো?' এ কথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে অংশীবাদী জনতা, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার অংশী বানিয়ে নিয়েছ তাদেরকে আমি ভয় করি কিরূপে? আমি তো জানি আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে অন্য কেউ বা কোনো কিছু আমার কোনো অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। এর পরেও কি তোমাদের মতো আমি গায়ের আল্লাহ্‌কে ভয় করবো? কেনো করবো?

এরপর বলা হয়েছে— 'যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোনো সনদ দেননি তাকে আল্লাহ্‌র শরীক করতে তোমরা ভয় করো না।' এ কথার অর্থ— কী বিস্ময়ের ব্যাপার! তোমরা চির স্বাধীন, চির অমুখাপেক্ষী প্রভুপ্রতিপালকের সঙ্গে চির পরাধীন ও চিরমুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে শরীক করছো— যার পক্ষে তোমাদের নিকটে জ্ঞানগত অথবা বিশ্বাসগত কোনো প্রমাণ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও

তোমরা কী অবোধ, কী মূর্খ, কী অপবিত্র। তোমরা তাকে ভয় করছো না। ভয় তো করা উচিত তোমাদের। কারণ তোমরা অংশীবাদী। আর আমি তো নির্ভয়। কারণ আমি এক আল্লাহ্‌য় একনিষ্ঠ বিশ্বাসী।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং যদি তোমরা জানো তবে বলো দু'দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?' এ কথার অর্থ— তৌহিদপন্থিদের বিশ্বাস, বুদ্ধি ও কর্ম আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশের পূর্ণ অনুকূল। পক্ষান্তরে অংশীবাদীদের বিশ্বাস, বুদ্ধি ও কর্ম অশুদ্ধ, অপবিত্র, প্রমাণহীন। সুতরাং বিশ্বাসীরাই নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। অবিশ্বাসীরা নয়। কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে একত্ববাদী হওয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— হে অংশীবাদীর দল, চির নিরাপত্তা যদি চাও, তবে এসো তৌহিদের পথে। এখানে 'ইনকুনতুম তা'লামুন' (যদি তোমরা জানো) অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! তোমরা যদি জানো যে, একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করা উচিত অন্য কাউকে নয়, তবে শিরিককে পরিত্যাগ করে তৌহিদকে গ্রহণ করো। অথবা কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি তোমরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং জ্ঞানী হও, তবে আমার এ প্রশ্নটির যথা উত্তর প্রদান করো— দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?

পরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো—তখন মুসলমানেরা চরমভাবে মুষড়ে পড়লেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের নফসের উপর জুলুম করেনি, বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সীমালংঘন করেনি। অতএব আমাদের মুক্তির উপায় কী? রসুল স. বললেন, জুলুম অর্থ শিরিক। আপন পুত্রকে প্রদত্ত হজরত লোকমানের ওই উপদেশ কি তোমরা শোনোনি— হে বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক কোরো না। কেননা শিরিক একটি জঘন্য অপরাধ। বোখারী।

হজরত ইব্রাহিম অংশীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী কে? অংশীবাদীরা কোনো জবাব দিলো না। তখন তিনি নিজেই উচ্চারণ করলেন— 'আল্লাজিনা আমানু' (যারা বিশ্বাস করেছে)। উক্তিটি হজরত ইব্রাহিমের হতে পারে— যা আল্লাহ্‌পাক এখানে সংকলিত করেছেন। অথবা কথাটি আল্লাহ্‌পাকের নিজের কথাও হতে পারে।

বকর বিন সাওদার মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, এক আক্রমণকারী অতর্কিতে আক্রমণ করে এক মুসলমানকে হত্যা করলো। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে সে হত্যা করলো আরেক মুসলমানকে। তৃতীয়বার হত্যা করলো আরেকজনকে। তারপর সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। বললো, এ অবস্থায় মুসলমান হলে আমার কি কোনো উপকার হবে? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। লোকটি মুসলমান হয়ে গেলো। এরপর সে পুনরায় একে একে তিনজন মুসলমানকে হত্যা করে বসলো। কেউ কেউ মনে করেন, ওই লোকটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৩

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

❐ এবং ইহা আমার যুক্তি যাহা ইব্রাহিমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

হজরত ইব্রাহিম সম্পর্কে এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা হয়েছে, এই আয়াতটিও সেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইব্রাহিম নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে প্রতিপালক বলেছিলেন, আবার অস্তমিত হতে দেখে সেগুলোর প্রতিপালক হওয়াকে অস্বীকারও করেছিলেন। এটা তাঁর চিন্তা ভাবনা বা 'তাফাক্কুর' ছিলো না। কারণ পবিত্রাত্মাগণের চিন্তা-প্রসূত কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বরং তিনি এ রকম করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়কে সচেতন করার জন্য। আয়াতেও তাই বলা হয়েছে——'এবং এটা আমার যুক্তি যা ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়।'

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'যুক্তি' হচ্ছে ওই যুক্তি যা হজরত ইব্রাহিম নমরুদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। সুরা বাকারার আলোচনায় নমরুদের সঙ্গে হজরত ইব্রাহিমের বিতর্কের বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর শুদ্ধ।

এখানে 'হুজ্জাতুনা' শব্দটির অর্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত যুক্তি বা দলিল। এখানে বলা হয়েছে ওই যুক্তি আল্লাহ্‌পাকই হজরত ইব্রাহিমকে দিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে—'যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি।'— কথাটির অর্থ আমি যাকে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই। অর্থাৎ জ্ঞান ও হেকমতের উচ্চস্তর প্রদান করে তাকে মর্যাদামণ্ডিত করি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা হাকিমুন আ'লীম' (তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী)। এ কথার অর্থ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক কুশলী (হাকিম)। তাই তিনি কাউকে করেন উচ্চ এবং কাউকে অধম। এগুলো তাঁর হেকমতের নিদর্শন। আর এগুলো সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। কারণ প্রকৃত অর্থে তিনিই জ্ঞানী।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن
ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ
نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝
وَإِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ وَمِنْ
ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

❒ এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইস্‌হাক ও ইয়াকুব ও ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুণকেও; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

❒ এবং জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত;

❒ আরও সৎ পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইস্‌মাইল, আল-ঈসায়া, ইউনুস, ও লুতকে; এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

❒ এবং ইহাদিগের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতচতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব ও তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।'— এ কথার অর্থ, আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম পুত্র ইসহাককে এবং প্রপৌত্র ইয়াকুবকে। আর তাদেরকে দিয়েছিলাম হেদায়েত।

এরপর বলা হয়েছে—'পূর্বে নূহকেও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম।' হজরত ইব্রাহিমের পূর্বপুরুষ ছিলেন হজরত নূহ। সেই হজরত নূহের হেদায়েত দানের কথা আলোচ্য বাক্যটিতে উল্লেখিত হয়েছে। বাক্যটির মাধ্যমে বুঝা যায়, কোনো ব্যক্তির পূর্বপুরুষ এবং উত্তর পুরুষের আভিজাত্য ও কৃতিত্বও ওই ব্যক্তিকে প্রদত্ত অনুগ্রহের একটি নিদর্শন। এখানেও তাই হজরত ইব্রাহিমকে প্রদত্ত অনুগ্রহ হিসেবে তাঁর পূর্বপুরুষ হজরত নূহ এবং উত্তর পুরুষ হজরত ইসহাক ও হজরত ইয়াকুবের হেদায়েত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

আমি বলি, উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির আলোকে সহজেই অনুমিত হয় যে, রসুলুল্লাহ স. এর পূর্বপুরুষগণের কেউই অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি স. তো আল্লাহ্পাকের সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন। আর প্রেমের চাহিদা হচ্ছে— প্রিয়জনের আভিজাত্যকে পরিপূর্ণ ও নিষ্কলুষ রাখা।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুণকেও।' এ কথার অর্থ— আমি নূহ্ অথবা ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে সৎ পথে পরিচালিত করেছি দাউদ বিন আল ইয়াসা, সুলায়মান বিন দাউদ, আইয়ুব বিন আমুস্ বিন রাজাখ বিন রউম বিন ইস বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম এবং ইউসুফ বিন ইয়াকুব, বিন ইসহাক, মুসা বিন ইমরান বিন ইয়াসমার, বিন কাহিত, বিন লাবী, বিন ইয়াকুব এবং হজরত মুসার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারুণকে। উল্লেখ্য যে, হজরত হারুণ ছিলেন হজরত মুসার এক বছরের বড়।

এখানে 'মিন জুর্‌রিইয়াতিহী' (বংশধরের মধ্যে) — কথাটির 'হা' (তার) সর্বনামটি হজরত ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত। কারণ এতক্ষণ ধরে হজরত ইব্রাহিমের প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়ে চলেছে। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বনামটি এখানে হজরত নূহের স্থলাভিষিক্ত। কেননা হজরত ইব্রাহিমের পূর্বে হজরত নূহ্ এর প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। আর তৎসন্নিহিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত হয়েছে হজরত ইউনুস ও হজরত লুতের নাম। তাঁরা ছিলেন হজরত নূহ এর বংশধর। হজরত ইব্রাহিমের নয়। সুতরাং এখানে 'তাঁর বংশধর' অর্থ হবে হজরত নূহ্ এর বংশধর। এটাই সমধিক স্পষ্ট।

শেষে বলা হয়েছে—'আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।' এ কথার অর্থ, হজরত নুহ্ এবং হজরত ইব্রাহিমের বংশধরগণ ছিলেন পুণ্যবান। আমি তাই তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছি। এভাবেই সকল সৎপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কার দিয়ে থাকি।

হজরত ওমর থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জিব্‌রাইলের এক প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. বলেছিলেন ইহ্‌সান (ইবাদতের সৌন্দর্য সচেতনতা) হচ্ছে এই— তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের এমন একাগ্র উপাসনা করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো। এমন যদি না হয় তবে বিশ্বাস রেখো যে, তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। বোখারী, মুসলিম।

দ্বিতীয় আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে—'এবং জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, মূসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম।' এ কথার অর্থ— আমি আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম জাকারিয়া বিন আজম, ইয়াহ্‌ইয়া বিন জাকারয়িা, ঈসা বিন মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং ইলিয়াস বিন মাতা বিন ফুখাস বিন আইজার বিন হারুণকে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ইদ্রিস এবং হজরত ইলিয়াস ছিলেন একই ব্যক্তি— যেমন ইয়াকুব এবং ইসরাইল একই ব্যক্তির নাম। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এ কথাটিকে প্রমাণ করে না। হজরত ইদ্রিস হজরত নূহের বংশভূত ছিলেন না। ছিলেন হজরত নূহের পিতামহের বংশধারার সাথে যুক্ত। হজরত নূহের পিতার নাম লামাক। লামাকের পিতা মাতুশালাখ। মাতুশালাখের পিতা ছিলেন খুনুখ এবং খুনুখের পিতা ছিলেন হজরত ইদ্রিস। হজরত আদমের উত্তর পুরুষের মধ্যে হজরত ইদ্রিসই ছিলেন প্রথম রসুল। কলম দিয়ে লিখার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'কুল্লুম্ মিনাস্‌সলেহীন' (তারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত)। এ কথার অর্থ— উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল পাপ থেকে মুক্ত। নিষ্পাপ। নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে আদিষ্ট বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে সলেহ্ বা সজ্জন বলা যায় না। নিষিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে যৎসামান্য সম্পৃক্তিও নিষ্পাপ বা সলেহ্ হওয়ার প্রতিবন্ধক। অবশ্য সাধারণভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকেও সলেহ্ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা সলেহ্ বা সজ্জন নন। তবে বৃহৎ পাপ থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীরা যৎসামান্য ক্ষুদ্র পাপে পাপী হলেও সজ্জন নামে অভিহিত হতে পারেন। রূপক অর্থে তাদেরকে সজ্জন বলাতে দোষের কিছু নেই। এ কথাটিও সত্য যে, বিশুদ্ধ অন্তরে তওবাকারীরাও পুণ্যবান বা সলেহ্ হয়ে যান। এ ধরনের সলজ্জিত ও সানুতপ্ত প্রত্যাবর্তনকারীরাও নিষ্পাপ। কিন্তু নবী রসুলগণের নিষ্পাপত্ব প্রকৃত, পূর্ণ এবং পরিণত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—'আরও সৎ পথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল' ঈসায়া, ইউনুস ও লুতকে। এ কথার অর্থ— আমি রসুল মোহাম্মদ স. এর পূর্ব-পুরুষ ইসমাইল বিন ইব্রাহিমকে, আল'ঈসায়া বিন উখতুব বিন আজুরকে, ইউনুস বিন মাতাকে এবং ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত বিন হারানকেও সৎপথে চালিত করেছিলাম।

ইয়াসা নামটি অনারব। তাই এ নামের পূর্বে আলীফ লাম সহযোগে 'আল' শব্দটি বসানো হয়েছে। যেমন, ইয়াজিদ। শব্দটির পূর্বে 'আল' বসিয়ে বলা হয় আল ইয়াজিদ। জনৈক কবি বলেছেন— আমি ওলিদ ইবনে আল ইয়াজিদকে বরকতময় পেয়েছি— খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন সুদৃঢ়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং' প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।' এ কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সকল নবী রসুল তাঁদের আপন আপন সময়ে সকল মানুষ, জ্বিন এবং ফেরেশ্তাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে—'এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরলপথে পরিচালিত করেছিলাম।' এখানে 'ওয়ামিন আবায়িহিম' (এদের পিতৃ পুরুষ) কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম'— কথা দু'টোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথবা সম্পৃক্ত 'তার (হজরত নূহ্ এর) বংশধর' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ 'ওয়ামিন আবায়িহিম' কথাটির মিন (মধ্যে) শব্দটি এখানে আংশিক অর্থ প্রকাশক। কেননা হজরত নূহের বংশধরগণ সকলেই নবী কিংবা রসুল ছিলেন না। এবং সকলে সৎপথে পরিচালিতও হননি।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯, ৯০

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝

❐ ইহা আল্লাহের পথ, স্বীয় দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন; তাহারা যদি শির্ক করিত তবে তাহাদিগের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।

❐ ইহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

❐ ইহাদিগকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর; বল, 'ইহার জন্য আমি তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এটা আল্লাহ্র পথ, স্বীয় দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন'। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই নবী রসুলগণকে সরাসরি হেদায়েত দান করে থাকেন। তাঁরাই হচ্ছেন 'যাকে ইচ্ছা তিনি এর দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন'— কথাটির লক্ষ্যস্থল।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা যদি শিরিক করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হতো'। এ কথার অর্থ— শিরিক সকল কৃতকর্মকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেয়। শিরিক (অংশীবাদীতা) এমনই জঘন্য পাপ যে এ মহাপাপ থেকে নিজের কৃতকর্মকে রক্ষা করা কারো জন্য কখনই সম্ভব নয়। নবী, রসুলগণ এ মহাপাপ থেকে চিরমুক্ত। তাঁদের দ্বারা শিরিক সংঘটিত হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু শিরিকের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যই এখানে এভাবে বলা হয়েছে যে, ওই সকল হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যেও যদি কেউ শিরিক করে— তবুও তার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। অতএব অন্যদের জন্য শিরিকমুক্ত থাকা যে অপরিহার্য—তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'এদেরকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত প্রদান করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় নবী রসুলদেরকে দিয়েছি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত। এখানে আল কিতাব শব্দটি জাতিবাচক নাম পদ বা ইসমে জিন্স। এই নাম পদের ব্যবহারের মাধ্যমে নবী ও রসুলদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করার বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁদেরকে কর্তৃত্ব এবং নবুয়তদানের কথাও বলে দেয়া হয়েছে। কর্তৃত্ব বুঝাতে 'হুকুম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে— যার অর্থ কর্তৃত্ব বা সাম্রাজ্য। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমি তাদেরকে সাম্রাজ্যাধিকারী বানিয়েছি এই জন্য যেনো মানুষেরা তাদের আনুগত্যকে স্বীকার করে। অথবা 'হুকুম' অর্থ এখানে হেকমত বা জ্ঞান। কিংবা সকল বিষয়ে সত্য সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যদি এরা এগুলোকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।' এ কথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা যদি আমার প্রদত্ত কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং আমি এই অনুগ্রহ বহনের গুরুদায়িত্ব অন্য এক সম্প্রদায়ের উপর অর্পণ করেছি। ওই সৌভাগ্যমণ্ডিত সম্প্রদায় হচ্ছে মদীনাবাসীরা। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করে না। তারা প্রদত্ত অনুগ্রহকে এবং আমাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসানুযায়ী আমলও করে। হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ক্বওমান' (এক সম্প্রদায়) অর্থ মদীনাবাসীগণ। উল্লেখ্য যে, এখানে প্রত্যক্ষভাবে মদীনাবাসীদেরকে চিহ্নিত করা হলেও 'এক সম্প্রদায়' কথাটির মধ্যে পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন অন্যান্য সাহাবীসহ পরবর্তী যুগের সকল মুসলমান। আবু রেজা আত্তারদী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীবাসী যদি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়তকে অস্বীকার করে, তবে আমি নির্ধারণ করে রেখেছি যে, এ সমস্তের ভার অর্পণ করবো আসমানের ফেরেশ্‌তাদের উপর। তারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে না।

তৃতীয় আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে—'এদেরকেই আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং— তুমি তাদের পথের অনুসন্ধান করো।' এ কথার অর্থ— এই নবী রসুলদেরকেই আল্লাহ্‌তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেছেন। দিয়েছেন তৌহিদ, দ্বীন এবং নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত শরিয়ত। এই দানের মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে সঠিক পথে চালিয়েছেন। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি এদের পথ অনুসরণ করুন। কথাটির মাধ্যমে মুশরিকদের ধর্মপথের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে চরম ঘৃণা। কারণ তারা তাদের পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসারী। নবী রসুলদের অনুসারী নয়। মনে রাখতে হবে যে, পূর্ববর্তী নবী রসুলের অনুসরণ করার অর্থ এখানে তাঁদেরকে এবং তাঁদের ধর্মমতকে সত্য বলে স্বীকার করা। তাঁদের শরিয়তের বিধানের অনুসরণ করা নয়। রসুল স. শ্রেষ্ঠতম রসুল। তাঁর শরিয়তই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁর পক্ষে পূর্ববর্তী নবী রসুলের শরিয়তের অনুসরণ কিছুতেই শোভনীয় নয়। আর তাঁর উম্মতের জন্যও এ রকম অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। প্রকৃত কথা এই যে, রসুল স.কে এখানে এ কথাটি বলে দেয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার পূর্বসুরীরা যেমন সৎপথে চলতেন আপনিও তেমনি সৎপথে চলুন। তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো শরিয়ত। আপনাকেও তেমনি দেয়া হয়েছে। তারা যেমন তাদেরকে প্রদত্ত শরিয়তানুযায়ী চলতেন, আপনিও তেমনি আপনাকে প্রদত্ত শরিয়তানুযায়ী চলুন।

আল্লামা বায়যাবী উল্লেখ করেছেন, 'হুদাহুম' (তাদের সৎপথ) কথাটির অর্থ– – আল্লাহ্‌র এককত্বে বিশ্বাস এবং ওই সকল মূল বিধান যা পালন করতে সকল রসুল সাধারণভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত। শরিয়তের শাখা প্রশাখাগত কোনো বিধানের কথা এর মধ্যে পড়ে না। কারণ শাখাগত বিধানে তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ এখানে মূল বিষয়ে সকল নবী ও রসুল সম্মিলিত। আর শাখা-প্রশাখাগত বিধানের অনুসরণ অসম্ভবও। তাই এ রকম কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে, এখানে রসুল স.কে পূর্ববর্তী নবীগণের শরিয়তের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা তিনি বিগত যুগের এক বা একাধিক শরিয়তের অনুসারী ছিলেন।

আমি বলি, নবী রসুলগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ পালনের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। তাই তাঁদের পূর্বসুরীদের শরিয়তের অরহিত বিধান মান্য করা ছিলো তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আর এটাও তাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, তাঁরা রহিত বিধানের স্থলাভিষিক্ত নতুনতর বিধান মান্য করে চলবেন। এখানে 'ইক্বতিদাহ্' (অনুসরণ) শব্দটির 'হা' হচ্ছে সাক্‌তাহ্ (তাজবীদের নিয়ম বিশেষ)। 'হা' শব্দটি এখানে সর্বনাম নয়।

শেষে বলা হয়েছে—'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না, এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন— আমার এ কোরআন ও ধর্মপ্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট বিনিময় প্রত্যাশী নই। আমার পূর্বসুরীগণও তাঁদের উম্মতের নিকট বিনিময় প্রত্যাশী ছিলেন না। বিনিময় প্রত্যাশা তাদের জন্য যেমন নিষিদ্ধ ছিলো তেমনি আমার জন্যও নিষিদ্ধ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন হাদিস এবং ফিকাহ্ শিক্ষাদান করে বিনিময় প্রার্থনা করা অসিদ্ধ। বিষয়টি বিনিময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো কিছু নয়। এটি হচ্ছে উপদেশ। জ্বিন ও ইনসানের জন্য কল্যাণময় উপদেশ।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে মুরসালরূপে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার মালিক ইবনে জয়িফ নামক এক ইহুদী বিতর্কের উদ্দেশ্যে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলো। গায়ে পড়ে ঝগড়া শুরু করে দিলো সে। রসুল স. বললেন— যিনি মুসার উপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র শপথ! বলো, তুমি কি তওরাতের মধ্যে এ কথাটি লিপিবদ্ধ দেখতে পাওনি— মোটা আলেমকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। ইহুদী মালেক ছিলো মোটা। তাই সে এ কথা শুনে রেগে গেলো। বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ কোনো মানুষের প্রতি কোনো হুকুম অবতীর্ণ করেননি। তার সাথীরা এ কথা শুনে বললো, কী বলছো তুমি? তবে কি আল্লাহ্ মুসার উপরেও কোনো কিছু অবতীর্ণ করেন নি? তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ
مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ
قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ
قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

❒ তাহারা আল্লাহের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই'; বল, তবে মুসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিলো, যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদিগের পিতৃ-পুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না যাহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল উহা কে অবতারণ করিয়াছিলো? বল, 'আল্লাহ্ই'; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদিগের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।

মালেক বিন জয়িফ ছিলো ইহুদীদের ধর্মীয় নেতা। কিন্তু সে যখন বললো, 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো হুকুম অবতীর্ণ করেন নি'— তখন ইহুদীরা তাকে নেতৃপথ থেকে অপসারণ করলো। এ রকম লিখেছেন বাগবী।

সুদ্দী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের ধর্মীয় নেতা ফাখাস বিন আজুরাকে লক্ষ্য করে। 'আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি'— ফাখাসই এ রকম বলেছিলো। সুরা নিসা'র আলোচনায় এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু তালহা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীরা বলেছিলো, হে মোহাম্মদ! আল্লাহ্ কি তোমার উপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহ্র কসম, আসমান থেকে কখনও কোনো কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। তাদের এই অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— তারা আল্লাহ্র যথাযথ মর্যাদা

দান করে নাই যখন তারা বলে 'আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি।' এ কথার অর্থ— মানুষের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্পাকের নেয়ামত ও রহমত সম্পর্কে ইহুদীরা আদৌ অবহিত নয়। অজ্ঞ তারা। তাই আল্লাহ্পাকের দানের যথামর্যাদা দান করতে পারেনি। তারা রসুল প্রেরণের বিষয়টিকে সরাসরি অস্বীকার করলো। অথচ নবুয়ত ও রেসালাতই মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ্তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ।

এরপর বলা হয়েছে—'বলো, তবে মুসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিলো, যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ করো ও যার অনেকাংশ গোপন রাখো।' এ কথার অর্থ— তোমাদের নবী হজরত মুসার কিতাবও তো ছিলো মানুষের জন্য নূর ও হেদায়েত। তোমরা ওই নূর ও হেদায়েত বিভিন্নরূপে বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছো। কিন্তু ওই কিতাবের কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ করো, অধিকাংশই করো না। এখানে 'বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ' করার অর্থ বিভিন্ন কাগজের টুকরায় তওরাতের আয়াত লিপিবদ্ধ করা। ইহুদীরা যে কাগজের টুকরোগুলোতে তওরাত লিপিবদ্ধ করতো, সেগুলোর অধিকাংশই গোপনে রেখে দিতো। আর কিছু অংশ প্রকাশ্যে প্রচার করতো। তাদের ওই গোপন কাগজগুলোতে ছিলো হজরত ঈসা আ. এবং হজরত মোহাম্মদ স. এর প্রশংসা, তাঁদের আগমনের সুসংবাদ, তাঁদের নিদর্শনসমূহ, রজমের আয়াত ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যটিতে এই অত্যন্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম সম্পর্কে ইহুদীদেরকে শাসানো হয়েছে। প্রকারান্তরে বলে দেয়া হয়েছে, ইহুদীরা নিশ্চিত কুপ্রবৃত্তিতাড়িত। এরপর বলা হয়েছে—'এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।' অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এই বাক্যটি দ্বারা ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলে দেয়া হয়েছে— তোমাদের প্রতি অবতারিত তওরাতে এমন অনেক বিষয় নেই যা কোরআনে রয়েছে। আল্লাহ্পাকই দয়া করে তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে সে সকল জ্ঞান তোমাদেরকে জানাচ্ছেন। এ অনন্য সুযোগ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের ছিলো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, ধর্মীয় বিষয়ের যে সকল বিষয় ও পরিভাষা সহজবোধ্য ছিলো না, সে সকল বিষয়কে রসুল স. এর মাধ্যমে তোমাদের নিকট সহজবোধ্য করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ইন্না হাজাল কোরআনু ইয়াকুস্সো

আ'লা বনী ইসরাইলা আকছারাল্লাজি হুম ফিহি ইয়াখতালিফুন' (নিশ্চয়ই এই কোরআন বনী ইসরাইলদের মতবিরোধের বিষয়ে যথার্থ বর্ণনা প্রদান করছে)।

'তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা জানতে না, কথাটির অর্থ রসুল স. এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে যে দুর্লভ জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো, সেই জ্ঞানকে তারা নষ্ট করে ফেলেছে (গ্রহণ করেনি)।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। অর্থাৎ বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীরা! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তোমরা ছিলে মূর্খ। তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও ছিলো অজ্ঞ।

রসুল স. এর মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে যথার্থ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই মহান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানতে না।

এরপর বলা হয়েছে— ক্বুলিল্লাহ্ (বলো, আল্লাহ্) এ কথাটির সংযোগ রয়েছে 'মান আন্যালাল কিতাব' (বলো, আল্লাহ্ই কিতাব নাজিল করেন) কথাটির সঙ্গে অর্থাৎ তওরাত ও কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন কে— এই প্রশ্নটি উত্থাপনের পর ইহুদীরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। তখন আল্লাহ্পাক নির্দেশ দিলেন— 'ক্বুলিল্লাহ্ (বলুন আল্লাহ্)। অর্থাৎ অন্যান্য আসমানী কিতাবের মতো তওরাত ও কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ্পাক স্বয়ং।

শেষে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা জারহুম ফি খওদ্বিহিম ইয়াল্আবুন' (অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও)। এ কথার অর্থ— ইহুদীদের অসত্য আলোচনা নিরর্থক ও ক্রীড়া কৌতুক সদৃশ। অতএব হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীদেরকে নিরর্থকতার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকতে দিন। তাদের পথপ্রদর্শনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হবেন না। এখানে 'ফি খওদ্বিহিম' (নিরর্থক আলোচনা) কথাটির সংযোগ ঘটেছে 'জারহুম' (মগ্ন হতে দাও) কথাটির সঙ্গে এবং 'ইয়াল্আ'বুন' (আলোচনারূপ খেলা) কথাটি এখানে কর্মবাচক সর্বনাম। অর্থাৎ 'হুম' (তাদেরকে) শব্দ থেকে অথবা খওদ্বিহিম শব্দের সর্বনাম (হিম) থেকে অবস্থা প্রকাশক হয়েছে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— 'ফি খওদ্বিহিম' এর সংযোগ এখানে 'ইয়াল্আ'বুন' এর সঙ্গে। 'খওদ্বুন' শব্দটির অর্থ ইহুদীদের নিরর্থক আলোচনা বা বিভ্রান্ত ধারণা।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

❒ এই কিতাব কল্যাণময় করিয়া অবতারণ করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সতর্ক কর; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদিগের সালাতের হেফাজত করে।

'ওয়া হাজা কিতাবুন আনযালনাহু মুবারাকুম্ মুসাদ্দিক্কুল্লাজিনা বাইনা ইয়াদাইহি' (এই কিতাব কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক)। এ কথার অর্থ— এই কিতাব কোরআন একটি কল্যাণকর গ্রন্থ। এই কল্যাণকর গ্রন্থ ইতোপূর্বে অবতীর্ণ তওরাতকে সত্য বলে স্বীকার করে। এখানে 'মুবারক' শব্দটির অর্থ কল্যাণকর। আর 'পূর্বেকার কিতাব' কথাটির অর্থ তওরাত।

'ওয়ালি তুনজিরা উম্মালক্কুরা ওয়া মান হাওলাহা' (এবং যদ্বারা আপনি মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সতর্ক করে থাকেন)। এখানে 'ওয়ালি তুনজিরা' (যেনো আপনি সতর্ক করেন) কথাটির সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। আগের বাক্যের 'কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি' কথাটির মধ্যে এই ধারণাটি বিদ্যমান। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার রসুল! ওই কল্যাণময় গ্রন্থটি এজন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকেরা উপকৃত হয় এবং এর দ্বারা আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন। এভাবে 'উম্মুল ক্কুরা' শব্দটির অর্থ মক্কা বা মক্কাবাসী। 'মান হাওলাহা' কথাটির অর্থ মক্কার চতুস্পার্শ্ব বা মক্কার চতুস্পার্শ্বের অধিবাসী। মক্কা থেকেই সমস্ত পৃথিবী সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুল ক্কুরা' বা ধরণীর নাভীমূল। কথাটির এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, মক্কাই পৃথিবীবাসীদের কেবলা এবং পবিত্র হজ পালনের স্থান। এভাবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে উম্ শব্দটির অর্থ হবে মূল বা উৎস। আর শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে উম্ শব্দের অর্থ হবে মামুম বা অধিষ্ঠান। শেষে বলা হয়েছে—'যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা ওতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে।' এ কথার অর্থ— পরকাল বিশ্বাসীরাই রসুল এবং রসুল

কর্তৃক আনীত কিতাবে বিশ্বাসী। এমতোবিশ্বাসের কারণে তারা তাদের নামাজের হেফাজত করে। পরকালে বিশ্বাস করলে স্বভাবতই হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত হয়। ফলে প্রতীতি জন্মায় রসুলের প্রতি, কোরআনের প্রতি এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রতি। তাই তারা আল্লাহ্‌পাকের প্রধান নির্দেশ নামাজের যথাসংরক্ষণে ব্রতী হয়। এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশসমূহের মধ্যে কেবল নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ নামাজই ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। আলোচ্য বাক্যটির মাধমে প্রচ্ছন্নভাবে এ কথাটিও বলে দেয়া হয়েছে যে, ইহুদীরা রসুল মোহাম্মদ স. কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না কোরআনকেও। তেমনি তওরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। যদি থাকতো তবে তারা শেষ রসুল ও শেষ মহাগ্রন্থ কোরআনকেও বিশ্বাস করতো। কেননা কোরআন, তওরাত এবং কিয়ামতের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। এগুলোর যে কোনো একটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে অন্য দু'টি আপনাআপনি বিশ্বাসের বলয়ভূত হয়ে যায়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৯৩

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ
مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

❒ যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়,' যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে 'আল্লাহ্‌ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব,' তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে 'তোমাদিগের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।'

ওই ব্যক্তি জালেম যে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে। যেমন মালিক বিন জয়িফ বলে, আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি কিছু অবতীর্ণ করেন নি। আমর বিন লুহাই এবং তার অনুসারীরা বলে, আল্লাহ্‌ সায়েবা এবং হাম কে হারাম করে দিয়েছেন এবং কোনো কোনো উটের উপর আরোহণ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আর ওই পশুর

জীবিত বাচ্চা পুরুষদের জন্য হালাল কিন্তু রমণীদের জন্য হারাম। বাচ্চা মৃত হলে সকলের জন্য হালাল। এ সকল ধর্মদ্রোহীদেরকে লক্ষ্য করে এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে— 'যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে।'

এরপর বলা হয়েছে—'কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না।' বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে মিথ্যাবাদী মুসায়লামা সম্পর্কে। সে ছিলো গণক। কিছু কিছু ছন্দময় বাক্য গঠন করে সে বলতো— এগুলো প্রত্যাদেশ। এগুলো আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। তাই আমি নবী।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, মিথ্যুক মুসায়লামা রসুল স. এর দরবারে দু'জন দূত প্রেরণ করলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, তোমরা কি মুসায়লামাকে নবী বলে স্বীকার করো? দূতদ্বয় বললো, হাঁ। তিনি স. বললেন, দূত হত্যার নিয়ম থাকলে আমি এখনই তোমাদের মস্তক ছেদন করতাম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, একদিন আমি শায়িত অবস্থায় তন্দ্রার ঘোরে দেখলাম— আমাকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি। আর দু'হাতে পরানো হয়েছে দু'টো সোনার কাঁকন। কাঁকন দু'টোকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারলাম না। প্রত্যাদেশ হলো— কাঁকন দু'টো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও। আমি ফুঁ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলো কাঁকন দু'টো। আমি বুঝলাম, কাঁকন দু'টোর অর্থ— মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ইয়ামিনবাসী আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামাবাসী মুসায়লামা কাজ্জাব।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং যে বলে 'আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন আমিও তার অনুরূপ অবতারণ করবো,' তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? বাগবী বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে আবদুল্লাহ্ বিন আবী সারাহ্ সম্পর্কে। আবদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল স. তাকে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সে বিশ্বাসভাজন ছিলো না। রসুল স. যখন বলতেন 'সামিয়াম বাসিরান'। সে লিখতো— আলীমান হাকিমান। আবার রসুল স. বলতেন, 'আলীমান হাকিমান, 'সে তখন লিখতো—'গফুরার রহীমান।' একদিন অবতীর্ণ হলো—'ওয়ালাক্বদ্ খলাক্বনাল ইনসানা মিন সুলালাতিম মিন্‌তিন' (আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে)। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি লিখতে নির্দেশ দিলেন। মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত এই আয়াতটি খুবই ভালো লাগলো আবদুল্লাহ্‌র। সে হঠাৎ বলে উঠলো—'ফা তাবারাকাল্লহু আহ্‌সানাল খলিক্বিন' (আল্লাহ্‌পাক কতোইনা সুন্দর স্রষ্টা)। রসুল স. বললেন, এ বাক্যটিও লিপিবদ্ধ করো। এই আয়াতটিও সদ্য অবতীর্ণ। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ভাবলো— আশ্চর্য! আমার উপরেও তাহলে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। এ রকম

চিন্তার ফলে সে হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। মিশে গেলো মুশরিকদের দলে। হজরত ইকরামা, ইবনে জারীর এবং সুদ্দীও এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যথাস্থানে এর বিবরণ দেয়া হবে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসুল স. যখন মাররুজ জাহ্‌রান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন অনুতপ্ত আবদুল্লাহ্ এসে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। হাফেজ ফাত্‌হুদ্দীন ইবনে সাইয়্যেদিন্নাস তাঁর রচিত রসুল স. এর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহের জন্য সুপারিশ করেছিলেন হজরত ওসমান। রসুল স. হজরত ওসমানের সুপারিশ কবুল করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারাহ ছিলেন খাঁটী ইমানদার। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আর কেউ কোনো সন্দেহ করেননি। শেষে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সেজদারত অবস্থায়।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে, তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য বাক্যটি। 'আমিও এর অনুরূপ অবতারণ করবো'— কথাটি আল্লাহ্ সম্পর্কে উপহাস বৈ কিছু নয়। আর আলোচ্য বাক্যটি ওই উপহাসেরই প্রত্যুত্তর।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে নজর বিন হারেসের প্রতি। সে সুরা 'আন্‌নাযিয়াত গরক্বান' কে উপলক্ষ করে একটি শ্লেষপূর্ণ বাক্য রচনা করেছিলো। ওই বাক্যটির অর্থ ছিলো— শপথ আটা ভক্ষণকারী, খামীর প্রস্তুতকারী এবং রুটি নির্মাতার।

এরপর বলা হয়েছে—'যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন জালেমগণ মৃত্যুযন্ত্রণায় পতিত হবে।' এখানে বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! যদি আপনি দেখতে পেতেন। অর্থাৎ এখানে রসুল স. কে সম্বোধন করে জালেমদের মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে একটি উহ্য কর্ম। 'আজ্‌জ্বলিমুনা' (জালেমগণ) শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও ভণ্ড নবীদেরকে। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার কালামকে উপহাস করতো। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে জ্বলিমুন অর্থ ইহুদী ও ভণ্ড নবীসহ সকল কাফের। 'দেখতে পেতে' কথাটি এখানে শর্তসূচক অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে এখানে বলে দেয়া হয়েছে, হে আমার রসুল! যদি আপনি জালেমদের মৃত্যু যন্ত্রণার স্বরূপ দর্শন করতেন, তবে ভীত সন্ত্রস্ত দৃশ্যই দেখতেন। 'গামারাত' শব্দটির অর্থ কষ্ট বা যন্ত্রণা। শব্দটি বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। কামুস গ্রন্থে রয়েছে—'গামারাতুশ্‌শাই' অর্থ-– কোনো বস্তুর কঠিন বা কষ্টদায়ক অবস্থা। শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ— আবৃত করা বা ঢেকে নেয়া। গামারাহুল মাউ এবং ইগ্‌তামারাহুল মাউ অর্থ— একে পানি ঢেকে নিয়েছে বা নিমজ্জিত করেছে। চরম সংকটময় মুহূর্তকে বুঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কারণ তখন মানুষ সবদিক দিয়ে বিপদাচ্ছাদিত হয়।

সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'গামারা' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ— কোনো বস্তুর প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এ কারণে অধিক পানিকে 'গামারা' বলা হয়। কারণ তা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে দেয়। সিহাহ্ রচয়িতার ব্যাখ্যানুসারে এখানে 'গামারাত' শব্দটির মর্ম হবে— নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। মৃত্যু জীবনের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয় বলেই এখানে মৃত্যুযন্ত্রণাকে বলা হয়েছে 'গামারাত্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো।' এ কথার অর্থ— মৃত্যুর প্রাক্কালে ঋণের টাকা আদায়কারীর মতো অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে ফেরেশ্তারা বলবে, মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে চাইলে এক্ষণে জীবন বের করো।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।' এভাবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কাফেরদের মিথ্যা কথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে অবমাননাকর শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। তাদের মিথ্যাকথাগুলো ছিলো এ রকম— আল্লাহ্তায়ালার সন্তান রয়েছে, আল্লাহ্পাক মানুষের নিকট কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি ইত্যাদি। আর আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে কাফেরদের ঔদ্ধত্যগুলো হচ্ছে— মিথ্যা নবুয়তের দাবি, 'আমিও এর অনুরূপ অবতারণ করবো' (আমার কাছেও প্রত্যাদেশ আসে) ইত্যাদি।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন— নজর বিন হারেস একবার বললো, লাত ও উজ্জা প্রতিমাদ্বয় আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ৯৪

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

❐ তোমরা আমার নিকট নিঃসংগ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদিগের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদিগের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

কিয়ামতের দিনে অবিশ্বাসীদের দুরবস্থার কথা বিবৃত হয়েছে এই আয়াতে। সেদিন তারা নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় জবাবদিহির জন্য হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব কেউ তখন পাশে থাকবে না। সঙ্গে থাকবে না পৃথিবীর কোনো সম্পদ। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না ওই দেব-দেবীরাও, যাদের পূজা তারা করতো। সেদিনের নিঃসঙ্গ অবস্থা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফুরদু' শব্দটি। শব্দটি 'ফরদুন' শব্দের বহুবচন।

আয়াতে বলা হয়েছে—'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো, যেমন তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম। এ কথার অর্থ হে কাফের সম্প্রদায়! পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তোমরা যেরূপ বস্ত্রহীন ও খতনাবিহীন ছিলে— ঠিক সেভাবে আজ তোমরা উপস্থিত হয়েছো বিচারের ময়দানে।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছো'; এ কথার অর্থ— পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম সম্পদ, সম্মান, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন— অনেক কিছু। কিন্তু আজ দেখো, তোমাদের আর কোনো কিছুই নেই। তোমরা এখন নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ। বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে,— তোমরা এখন তোমাদের জন্মের সময়ের মতো বস্ত্রহীন, বৈভবহীন। পৃথিবীর জীবনে তোমরা ছিলে আখেরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে তোমাদের বয়স, বুদ্ধি এবং সম্পদ দ্বারা এমন কোনো পুণ্যকর্ম সম্পাদন করোনি, যা আখেরাতে সঙ্গে নিয়ে আসা যায়। তোমরা তাই এখন রিক্ত, শূন্য, নিঃসম্বল।

অতঃপর বলা হয়েছে—'তোমরা যাদেরকে শরীক করতে সেই সুপারিশকারিদেরকে তোমাদের সঙ্গে দেখছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তা-ও নিষ্ফল হয়েছে।' এখানে 'মা বাইনাকুম' (তোমাদের মধ্যকার) শব্দটিকে ক্বারী নাফে, ক্বারী হাফস্ এবং ক্বারী কাসাঈ পড়তেন 'মা বাইনাকাম'। 'তাক্বাত্তায়া মা বাইনাকুম' অর্থ— তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে। 'বাইনা' শব্দটি এখানে ধাতু মূল— যার অর্থ ছিন্ন করা, আবার সংযোগ করা। অর্থাৎ শব্দটি বিপরীত অর্থবোধক, আবার শব্দটি বিশেষ্য এবং আধারও। অর্থাৎ দু'ভাবে শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। 'মা কুনতুম তাযউ'মুন' কথাটির মাধ্যমে বলা হয়েছে— তোমরা ধারণা করতে, দেবতারা তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আরো ধারণা করতে, পরকাল বলতে কিছু নেই। আজ দেখো, তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

❒ আল্লাহ্‌ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে নির্গত করেন; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?

প্রথমেই বলা হয়েছে—'আল্লাহ্‌ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকই গুচ্ছ থেকে বীজ, খর্জুর বৃক্ষ থেকে গুচ্ছ উৎপাদন করেন। বলেছেন হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী। জুজায বলেছেন, এখানে শুষ্ক শস্যবীজ এবং শুকনো আঁটি থেকে সবুজ বৃক্ষ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ওই ফাটল বা ভ্রূণের কথা বলা হয়েছে— যা গমের বীজ এবং খেজুরের আঁটির মধ্যে থাকে। আল্লাহ্‌পাকই ওই ভ্রূণের স্রষ্টা। জুহাক বলেছেন, ফালেক অর্থ স্রষ্টা। এখানে 'হাব্বুন' শব্দটির অর্থ খাদ্যের শস্যবীজ, যেমন— গম, চাউল, বুট ইত্যাদি। 'হাব্বুন' শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে 'হাব্বাতুন'। আর 'নাওয়া' (আঁটি) শব্দটিও বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে 'নাওয়াতুন।' শব্দটির অর্থ— ফলমূলের আঁটি বা বীজ, যা মানুষের মূল আহার্য বস্তু নয়। যেমন— খেজুর, আঙ্গুর, আনার ইত্যাদির আঁটি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইউখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিত' (তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকই মৃত-তুল্য বীর্য ও আঁটি থেকে সৃষ্টি করেন প্রাণবন্ত প্রাণী ও জীবন্ত উদ্ভিদ।

তারপর বলা হয়েছে—'ওয়া মুখরিজুল মাইয়্যিতি মিনাল হাই' (প্রাণহীনকে জীবন্ত থেকে নির্গত করেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালাই জীবন্ত প্রাণী ও সবুজ বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি করেন মৃত-তুল্য বীর্য ও শুষ্ক শস্যবীজ। এখানে 'নির্গত করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'মুখরিজু' শব্দটি। শব্দটি রূপান্তরিত কর্তৃকারক।

শেষে বলা হয়েছে—'জালিকুমুল্লহ্ ফাআননা তু'ফাকুন' (এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে)। এ কথার অর্থ— এই তো তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ্। এই তো তাঁর সৃষ্টির নিদর্শন। জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণতঃই তাঁর অধিকারে। যে অক্ষম সে তো ইবাদতের অযোগ্য। সে প্রভাবিত, কিন্তু অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নয় । সুতরাং বুঝে নাও, তিনিই একমাত্র উপাস্য। জীবন ও মৃত্যু ঘটানোর এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাই তাঁর উপাস্য হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র উদাসীন দাস সকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কোন দিকে যেতে চাও?

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

❒ তিনি উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন; এইসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।

'ফালিক্বুল ইসবাহ্' অর্থ— তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান। 'ইসবাহ্হুন' শব্দটি মূল ধাতু। এর অর্থ— প্রত্যুষের মধ্যে প্রবেশ করা। পরোক্ষভাবে এখানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে উষা। বলা হয়েছে, রাতের অন্ধকার ভেদ করে আল্লাহ্পাকই উষার উন্মেষ ঘটান। উল্লেখ্য যে, উষার উন্মেষ ঘটে ওই অন্ধকার থেকে, যে অন্ধকার উষাকাল সংলগ্ন।

'ওয়া জায়ালাল্ লাইলা সাকানা' অর্থ— তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্পাকের বাণী সত্য। তাই দেখা যায়, মানুষ সহ অধিকাংশ পশু-পাখি দিবসের কর্মমুখরতার পর রাতে নিদ্রাভিভূত হয়ে তাদের শ্রান্তি ও ক্লান্তি অপসারণ করে। রাত তাই সকল কর্মের শ্রান্তিহারক। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, দিনে সৃষ্টিকুলের সঙ্গে ব্যাপক মেলা মেশার ফলে আল্লাহ্র জিকির থেকে ঘটে এক ধরনের বিস্মরণ। সেই বিস্মরণের ক্লান্তি অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু রাত এলে পার্থিব সম্পৃক্তি হয়ে পড়ে শিথিল। তাই তখন নীরবে নিভৃতে আল্লাহ্তায়ালার প্রেমে বিভোর হয়ে বিস্মৃতিজনিত ক্লান্তি থেকে আত্মাকে মুক্তি দেয়া যায়। এই মুক্তির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বিশ্রাম।

'ওয়াশ্ শামসা ওয়াল ক্বমারা হুসবানা' অর্থ— এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'হুসবানা' শব্দটি শব্দমূল বা ধাতু। এর অতীত কাল বোধক রূপ হচ্ছে হাসাবা। এর অর্থ হিসাব করা বা গণনা করা। 'হিসবানুন' শব্দটিও একটি মূল শব্দ। শব্দটির অতীতকালবোধক রূপ হচ্ছে হাসিবা। শব্দটির অর্থ গণনা করা বা অনুমান করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'হুসবান' শব্দটি 'হিসাবুন' শব্দটির বহু বচন। এখানে এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, সময়ের বিবর্তনকে চিহ্নিত করার জন্য, অর্থাৎ দিন-রাত্রি, মাস-বছরের হিসাব রাখার জন্য আল্লাহ্পাক চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

শেষে বলা হয়েছে—'জালিকা তাক্বদিরুল আজিজিল আ'লীম'। এ কথার অর্থ— এ সকল পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। আল্লাহ্পাকই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রকে দান করেছেন যথাযথ বিন্যাস। আর এগুলোর আকৃতি, প্রকৃতি, সংখ্যা— সকল কিছু সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। আর সকল কিছুই তাঁর অপার পরাক্রমের অধীন।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৯৭

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

❒ তিনিই তোমাদিগের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এখানে বিশেষভাবে নক্ষত্র সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন— যেনো তদ্দারা তোমরা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। নিশীথের ঘোর অন্ধকার স্থলভাগ ও সমুদ্রকে সমভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পথিক ও নাবিক উভয়েই তখন হয়ে পড়ে দিশাহীন। আল্লাহ্‌পাকই সকল পথহারাদের প্রকৃত দিশারী। তাই তিনি রাতের আকাশে প্রোজ্জ্বল করে তোলেন নক্ষত্রকে— যেনো ওই নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে নিশীথের সকল পথিক ও নাবিক সহজেই খুঁজে পেতে পারে সঠিক পথের দিশা।

শেষে বলা হয়েছে—'ক্বদ্ ফাস্‌সালনাল আয়াতি লিক্বওমিই ইয়া'লামুন' (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে রেখেছেন তাঁর এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম, জীবন-মৃত্যুর উৎসারণ, ঊষার উন্মেষ, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্র— এ সকল কিছুই হচ্ছে তাঁর অপার, অতুলনীয়, অবিভাজ্য পরাক্রম ও জ্ঞানের নিদর্শন। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরাই কেবল পাঠ করতে পারেন এই বিশদ নিদর্শনের অধ্যায়। জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে সদা উন্মোচিত রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর অসংখ্য প্রমাণ। কিন্তু এ সকল প্রমাণ থেকে উপকৃত হতে পারেন কেবল জ্ঞানীরা। মূর্খেরা নয়।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ৯৮

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝

❒ তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

'তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন'— কথাটির অর্থ, আল্লাহ্পাক সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আদি পিতা হজরত আদম থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামুস্তাক্বাররুঁ ওয়া মুস্তাওদাউ'ন' (এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রয়েছে)। এখানে 'মুস্তাক্বাররুন' (স্থায়ী বাসস্থান) শব্দটি কর্তৃকারক। অথবা মাজদারে মীমী (মিম বিশিষ্ট মূল ধাতু)। কিংবা ইসমে জরফ (আধারাধিকরণ)। এভাবে কথাটির অর্থ হবে— তোমাদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান নির্ধারণ করেছেন। অথবা— তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান নির্ধারিত রয়েছে। কিংবা— তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অবস্থানের স্থান।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মাতৃউদরে অবস্থানের সময় এবং 'মুস্তাওদাউন' (অস্থায়ী বাসস্থান) অর্থ— কবর জীবনের শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মাতৃগর্ভ 'মুস্তাওদাউন' অর্থ কবর।

হজরত সাঈদ বিন যোবায়ের বলেছেন,'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ মায়ের গর্ভ এবং 'মুস্তাওদাউন' অর্থ পিতার পৃষ্ঠ।

হজরত উবাইয়ের অভিমত এর বিপরীত। মুজাহিদ বলেছেন, মুস্তাক্বাররুন অর্থ পৃথিবী এবং মুস্তাওদাউন অর্থ কবর। অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে— ওয়া লাকুম ফিল আরদ্বি মুস্তাক্বাররুন (এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে)।

হাসান বসরী বলেছেন, 'মুস্তাক্বাররুন' অর্থ কবর এবং 'মুস্তাওদাউন' অর্থ পৃথিবী।

আমি বলি, 'মুস্তাক্বাররুন' (স্থায়ী আবাস) অর্থ জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর 'মুস্তাওদাউন' অর্থ অন্য সকল অবস্থান। সে অবস্থানগুলো মাতৃউদর হতে পারে, পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে পারে, পৃথিবীর বিভিন্ন বাসস্থান অথবা কবরের জীবনও হতে পারে।

শেষে বলা হয়েছে—'অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছেন'। আগের আয়াতে নক্ষত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছিলো 'লি কওমিঁ ইয়্যালামুন', (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)। আর এখানে বলা হচ্ছে— 'লি ক্বওমিঁ ইয়্যাফক্বহুন' (অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য)। বিবরণভঙ্গির এ রকম পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি রহস্য দৃশ্য গোচর কোনো বিষয় নয়— অনুধাবনের বিষয়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ
مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى
ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

❒ তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করেন। পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা উৎপাদন করেন, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়। তখন উহাদিগের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।

বৃক্ষের সৃষ্টি রহস্যের একটি দিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। এখানে বলা হয়েছে—'তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তার দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন; অনন্তর তা থেকে সবুজ পাতা উদগত হয়, পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য দানা উৎপাদন করেন।' সকল পবিত্রতা আল্লাহ্‌র। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, একই বৃষ্টিপাতের ফলে সকল উদ্ভিদের জন্ম হয়। কিন্তু সেগুলোর স্বাদ এক রকম নয়। একেক গাছের ফল এক এক রকম স্বাদবিশিষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন।' এখানে খেজুরের কাঁদি বুঝাতে 'ক্বিন্‌ওয়ানুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ক্বনুউন'। ক্বনুউন অর্থ কাঁদি বা গুচ্ছ। 'দানিয়াতুন' অর্থ— পরিপক্ক খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।' এখানে 'সৃষ্টি করেন' কথাটির সংযোগ রয়েছে আয়াতের প্রথমে বর্ণিত 'সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেন' — কথাটির সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং জয়তুন ও দাড়িম্বও; এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও।' এখানে 'আজ্‌জাইতুনা' 'ওয়ার্‌ রুম্‌মানা' (জয়তুন ও দাড়িম্ব) কথাটির পূর্বে 'শাজারুন' (বৃক্ষ) কথাটি অনুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জয়তুন এবং দাড়িম্ব (ডালিম) ফলগুলো দেখতে এক রকম নয়। এগুলোর আকার ও বর্ণ পৃথক। তাই এখানে বলা হয়েছে—'একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও।' অর্থাৎ আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ এবং স্বাদের দিক থেকে জয়তুন এবং ডালিম কখনো এক রকম আবার কখনো বিভিন্ন রকম।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলো পরিপক্ক হয়, তখন সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করো'। এ কথার অর্থ হে মানুষ! তোমরা জ্ঞানচক্ষুসহ ফলবান বৃক্ষের প্রতি এবং সুপক্ক ফলের সমারোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। দেখো ফল ও ফসলের উন্মেষকালে সেগুলো কতোই না ক্ষুদ্র আকার নিয়ে পরিণতির দিকে যাত্রা শুরু করে। এরপর পরিবর্তিত হতে থাকে সেগুলোর আকার, প্রকার এবং আস্বাদ। এই রহস্যময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিবর্তনের প্রতি তোমরা জ্ঞান ও অভিনিবেশসহ দৃষ্টিপাত করো।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না ফি জালিকুম লাআয়াতিল্‌লি ক্বওমিঁই ইউ'মিনুন।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্য নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ বৃক্ষের জন্ম, ফুল, ফল ও ফসলের এই সুনিয়ন্ত্রিত বিবর্তন মহাশক্তিধর, বিজ্ঞানময় মহান আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্বের একটি অবাক নিদর্শন। এই সৃজনশীলতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয়। যারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, তারাই কেবল এসকল নিদর্শন থেকে আল্লাহ্‌তায়ালার এককত্বের নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ আহরণ করে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০০

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۟

❐ তাহারা জিনকে আল্লাহের শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহের প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

মহা নিসর্গে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। সেই সকল নিদর্শনের উল্লেখ করে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়াই ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। তাই আগের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র এককত্বের পক্ষে অনেক দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের পর এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে

অংশীবাদীদের অপবিশ্বাস ও অপআচরণের বিবরণ। অংশীবাদীদের প্রতি ঘৃণা এবং অংশীবাদীদেরকে সতর্ক করার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'তারা জ্বিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে'। এখানে জ্বিন অর্থ ফেরেশতা। কারণ জ্বিনের মতো ফেরেশতারাও দৃষ্টিবহির্ভূত সৃষ্টি। মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্‌তায়ালার কন্যা ভেবে ফেরেশতাদেরকে পূজা করতো। জ্বিন শব্দটির অর্থ এখানে শয়তানও হতে পারে। শয়তানের অনুপ্রেরণাতেই অংশীবাদীরা দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে। অতএব মূলতঃ শয়তানকেই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে শরীক বানায়। শয়তান কখনও কখনও তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপর ভর করে থাকে। তাই বলা যেতে পারে, প্রতিমা পূজার সাথে সাথে তারা শয়তানেরও পূজা করে। এ রকমও হতে পারে যে, মুশরিকেরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভালো কাজের স্রষ্টা এবং শয়তানকে মন্দ কাজের স্রষ্টা মনে করে। এই ধারণাটি স্পষ্টতঃই শিরিক। কারণ সৃষ্টিকরণের ক্ষমতা আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া আর কারো নেই। মুশরিকেরা এই চিরন্তন সত্য সম্পর্কে অনবগত। তারা এ কথা মানে না যে, জ্বিন, ফেরেশতা, মানুষ সহ এই বিশাল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং। মুশরিকেরা মিথ্যাবাদী। তারা বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকে অংশী বানায়। যেমন ইহুদীরা বলে, হজরত উযায়ের আল্লাহ্‌তায়ালার পুত্র। খৃষ্টানেরা বলে, আল্লাহ্‌র পুত্র হচ্ছে হজরত ঈসা। আর প্রতিমা পূজকেরা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌তায়ালার কন্যা। অথচ তাদের পক্ষে জ্ঞানগত এবং বিশ্বাসগত কোনো দলিল নেই। আল্লাহ্‌পাক সকল অংশীবাদীতা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—

'সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আ'ম্মা ইয়াসিফুন' (তিনি মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বে)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০১, ১০২

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۭ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

❐ তিনি আস্‌মান ও জমিনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

❒ এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক!

প্রথমে বলা হয়েছে—'বাদিউ'স্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব।' এ কথার অর্থ তিনি আসমান জমিনের স্রষ্টা। আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্তায়ালার এক অতুলনীয় ও অপূর্ব সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাদিউ' শব্দটির অর্থ— মুব্দাউন। অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্পাক সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও মহাপৃথিবী। এভাবে আল্লাহ্পাক রেখেছেন তাঁর অতুলনীয় সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। অনস্তিত্বকে এভাবেই তিনি পরিয়েছেন অস্তিত্বের পরিচ্ছদ।

এরপর বলা হয়েছে—'তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোনো ভার্যা নেই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।' আল্লাহ্ পাক যে স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান ধারণ থেকে পবিত্র এবং বিশাল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যে তিনিই, তার কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

১.আল্লাহ্তায়ালার সত্তা চিরন্তন ও অবিনাশী। তিনিই সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা। সৃষ্টি তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে এবং সকল প্রয়োজন পূরণার্থে আল্লাহ্তায়ালার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাই স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজন থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

২. আল্লাহ্পাকই সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীর বা অবয়বের স্রষ্টা। পিতৃত্ব শরীরের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তিনি কিভাবে আকার বা দেহের অধীন হবেন? তিনি তো আকারাতীত।

৩. নারী পুরুষের সম্মিলনের মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর নারী পুরুষ সমশ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ উভয়ে মনুষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো কোনো গোত্র, সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীভুক্ত নন। তিনি এ সকলের একক স্রষ্টা। তিনি অতুল। সৃষ্টি অস্থায়ী, আর তিনি চিরস্থায়ী। সুতরাং তিনি সৃষ্টির মতো স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান ধারণ করবেন কিরূপে?

৪. সৃষ্টি হিসাবে সন্তান পিতার সমতুল। কিন্তু কোনো সৃষ্টিই আল্লাহ্তায়ালার সমতুল এবং সমকক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির পিতা হবেন কিভাবে?

৫. আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। প্রকাশ্য ও গোপন সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। কিন্তু সৃষ্টি এ রকম অসীম ও অপরিমেয় জ্ঞানের অধিকারী হতেই পারে না। সুতরাং সৃষ্টি তাঁর সন্তান হবে কিভাবে?

৬. পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যেহেতু তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ছাড়া উপাস্য যখন আর কেউ নেই এবং তিনিই যখন সকল কিছুর একক স্রষ্টা, তখন তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো। এই নির্দেশনাটির মাধ্যমে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, যিনি সৃজন ও প্রতিপালন করেন, তিনিই কেবল উপাস্য হবার যোগ্য। উপাসনার যোগ্যতা অন্য কারো নেই। তাই নির্দেশ এসেছে, সুতরাং তাঁকে একক স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালক হিসাবে মেনে নাও এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইঁয়ু ওয়াকিল।' এ কথার অর্থ তিনি সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিচালনা আল্লাহ্তায়ালারই দায়িত্বভূত। সুতরাং সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হও এবং তাঁরই উপাসনা করো। তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবেন এবং তোমাদের পুণ্য কর্মের যথা বিনিময় দান করবেন।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৩

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

❒ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন কথাটির অর্থ, তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিগাহ্য নন। ইবনে আবী হাতেম এবং শিথিল সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, জ্বিন, মানুষ, শয়তান এবং ফেরেশ্তাসহ সকল সৃষ্টি সারা জীবন ধরে যদি আল্লাহ্তায়ালাকে চাক্ষুষ করতে চায়, তবু তাঁকে দেখতে পাবে না।

এই আয়াতের মাধ্যমে মোতাজিলারা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ্তায়ালার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে— পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন অসম্ভব। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, পরকালে বেহেশতবাসীরা আল্লাহ্তায়ালার দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আর এই আয়াত মোতাজিলাদের অভিমতকে প্রমাণ করে না। কারণ, 'লা তুদ্রিকু' (দেখতে পাবে না বা অধিগম্য নন) কথাটি বর্তমান কালবোধক। ভবিষ্যতকালের জন্য এ রকম শব্দরূপ পরোক্ষ অর্থে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যত তো এক কথা নয়। তাই এ কথাটি মেনে নিতে হবে যে, এখানে (পৃথিবীতে) আল্লাহ্র দীদার সম্ভব নয়।

অভিমতটি ঐকমত্যোৎসারিত। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভব— এ রকম কথা কেউই বলেননি। পৃথিবীতে অনেক কিছুই অসম্ভব, কিন্তু আখেরাতে তা সম্ভব। পৃথিবীর অসম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে আখেরাতকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন নয়। এ রকম অর্থ করলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এবং পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে আর কোনো ব্যবধান থাকে না। এ রকম একার্থকতা অসিদ্ধ।

'আলআবসার' শব্দরূপটি বহুবচন। তাই শুধু দর্শন এখানে উদ্দেশ্য নয়— উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টিগত দর্শন। শব্দটির প্রথমে উল্লেখিত আলিফ লাম (আল)কে যদি আহাদী (লামে আহাদী) বলা হয়, তবে দর্শনের উদ্দেশ্য হবে পৃথিবীর দর্শন। তাই অর্থ হবে— পৃথিবীর কোনো চোখ আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে না। কিন্তু এখানে পরকালে বেহেশতের মধ্যে ইমানদারদের চোখও দেখতে পারবে না— এ কথাটি কি প্রমাণিত হয়? আলিফ লামকে ইস্‌তেগরাকি (নিমজ্জক) বলাও যায় না, কারণ আয়াতের বক্তব্যভঙ্গি নেতিবাচক। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে— তিনি সকল দৃষ্টির অধিগম্য নন। কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে— তিনি কোনো দৃষ্টিরই অধিগম্য নন। অর্থাৎ বেহেশতেও বেহেশতবাসীদেরকে দর্শনদানে ধন্য করবেন না।

'হুলিয়া' পুস্তকে আবু নাইমের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন—'রব্বি আরেনি আন্‌যুরু ইলাইকা' (হে আমার প্রতিপালক, দেখা দাও— আমি তোমাকে দেখবো)। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌পাক হজরত মুসাকে এরশাদ করেছেন, 'হে মুসা! আমাকে যে জীবিত অবস্থায় দেখবে, সে মরে যাবে। আমাকে দেখলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে প্রস্তর ও অন্যান্য পদার্থনিচয়। বৃক্ষরাজিও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আমাকে দেখলে। শাখা-প্রশাখাগুলো হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত, বিধ্বস্ত। বেহেশতবাসের সময় কেবল বেহেশতবাসীরা আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। তাদের দৃষ্টিশক্তি সেখানে নিষ্প্রভ হবে না এবং তাদের অবয়ব হবে সেখানে অবিনাশী।'

'ইদরাক' শব্দটির অর্থ আকার ও তত্ত্বসহ দেখতে পাওয়া। শব্দটির সঙ্গে 'রুইয়াত' (দর্শন) শব্দটির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। রুইয়াত অর্থ শুধুই দর্শন। আর ইদরাক অর্থ একই সঙ্গে দেখা ও পাওয়া অর্থাৎ দৃষ্টি দ্বারা বেষ্টন করে নেয়া। অথবা পরিপূর্ণরূপে দর্শিত বস্তুর সম্মুখবর্তী হওয়া। কিংবা দর্শিত বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পাওয়া। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ফালাম্মা তারাআল জামআ'নি ক্বলা আসহাবু মুসা ইন্না লামুদ্‌রাকুনা ক্বলা কাল্লা' (দু'টি দল একে অপরকে দেখলো। মুসার সাথীরা বললো, নিশ্চয় তারা আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। মুসা বললেন, কখনো নয়)। এই আয়াতে হজরত মুসার দল এবং ফেরাউন দলের পারস্পরিক দর্শন প্রমাণিত হয়েছে —কিন্তু 'ইদরাক' (পরিপূর্ণরূপে পাওয়া বা আধিকার করা) প্রমাণিত হয়নি।

‘রুইয়াত’ (কেবল দর্শন) এবং ‘ইদরাক’ (দৃষ্টি বেষ্টনীর মধ্যে পাওয়া)— দু’টো শব্দের অর্থ যদি এক বলে মেনে নেয়াও যায়, তবুও এতে করে আল্লাহ্ দর্শন কস্মিনকালেও সম্ভব নয়— কথাটি প্রমাণিত হয় না। এখানে বলা হয়েছে— তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। কিন্তু তাঁর দর্শন কোনোদিনও সম্ভব নয়— এ রকম কথা এখানে নেই।

এরপর বলা হয়েছে—‘ওয়া হুয়া ইউদ্‌রিকুল আব্‌সার’ (কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত)। এ কথার অর্থ— তাঁর অতুলনীয় দৃষ্টি ও জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—‘ওয়া হুয়াল্ লাতিফুল খবির’ (এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত)। কামুস রচয়িতা বলেছেন, ‘লাতিফ্’ অর্থ— আপন দাসদেরকে কল্যাণ দানকারী, উপকার প্রদাতা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয়জনদের প্রতি দয়াবান। কামুস রচয়িতা আরো বলেছেন, ‘লাতিফুন’ অর্থ— গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, ‘লাতিফ’ ওই সত্তা— যা অননুভব্য। সিহাহ্ প্রণেতার ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ যথানিয়মে সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হবে। এভাবে আয়াতটির অর্থ হবে— সৃষ্টি তাঁকে দৃষ্টির সীমানাভূত করতে পারবে না। কারণ তিনি অনুভূতির অতীত। কিন্তু তিনি সৃষ্টির দৃষ্টিকে অধিকার করতে সক্ষম। কেননা বিষয়টি তাঁর জ্ঞানায়ত্ত।

সুরা আন্‌আ’মঃ আয়াত ১০৪

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

❒ তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য আসিয়াছে; সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।

স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনের পর মধ্যবর্তী কোনো অবস্থান আর থাকে না। যে স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে, সে-ই উপকৃত হয়। আর যে না দেখে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। স্পষ্ট প্রমাণকে যে কাজে লাগায়, তারই সত্যদর্শন ঘটে এবং সে-ই ইমান আনয়ন করে। এভাবে সে নিজেরই উপকার করে। আর যে জ্ঞানান্ধ এবং সত্য অনুধাবন থেকে বিমুখ, সে করে আত্মহনন। তার খারাপ পরিণতি চাপিয়ে

দেয়া কোনো ব্যাপার নয়। বরং এ হচ্ছে তার স্বোপার্জিত পরিণতি। আলোচ্য আয়াতে এ কথাগুলোই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে—'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য এসেছে; সুতরাং কেউ তা দেখলে তার দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ামা আনা আ'লাইকুম বিহাফিজ' (আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলে দিন, হে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী জনতা, আমি তোমাদের কৃতকর্মের সংরক্ষক নই। পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার প্রদানকারীও আমি নই। আমি তো কেবল শুভসমাচারপ্রদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের আমাদের সকলের কৃতকর্মের সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্। রসুল স. এর মাধ্যমে পৃথিবীবাসীদেরকে এ কথাই জানিয়ে দিতে দয়ার্দ্র অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন যে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত। এই প্রমাণের মাধ্যমে সত্যপথ দর্শন অথবা অদর্শন এখন তোমাদের সিদ্ধান্তভূত বিষয়। পুরস্কার ও তিরস্কারের পথ এখন নির্বাচন করবে তোমরাই। আমি কারো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদাতা নই। আমার দায়িত্ব তো কেবল আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা এবং তাঁর সন্তোষের সুসংবাদ প্রদান করা।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১০৫

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

❐ এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে, অবিশ্বাসীগণ বলে 'তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ।' কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

'ওয়া কাজালিকা নুসার্‌রিফুল আয়াতি' (এভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি)। এখানে 'সারফুন' শব্দটির অর্থ— কোনো বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ রকম রূপান্তরিত বিবৃতির উদ্দেশ্য থাকে সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে তোলা। এই পারিভাষিক রূপান্তরের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি।'

কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'সারফুল হাদিস' অর্থ— বক্তব্যকে কিছুটা সম্প্রসারণ করা এবং সৌন্দর্যায়িত করা। মুদ্রা সম্পর্কিত পরিভাষা (সারফু ফিদ্দারাহিমা) থেকে

শব্দটি সংগৃহীত হয়েছে— যার অর্থ, কোনো মুদ্রার মূল্য অন্য কোনো মুদ্রাপেক্ষা অধিক হওয়া। 'সারফুল কালাম' শব্দটির অর্থও 'সারফুল হাদিস' শব্দের অর্থের মতো। 'লাহু আলাইহি সারফুন' কথাটির অর্থ— একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ প্রাধান্যপ্রাপ্ত বস্তুটি যেনো প্রাধান্যহীন বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে— ফলে, অবিশ্বাসীগণ বলে, 'তুমি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে এ কথা বলছো।' এ কথার অর্থ— বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শনাবলী বিবৃত করার কারণে ধর্মপ্রচারের কাজ সুসংগতরূপ ধারণ করেছে। তাই অবিশ্বাসীরা বলে, তুমি তো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব অধ্যয়ন করে এ রকম কথা বলছো। 'ওয়ালি ইয়াকুল' (ফলে অবিশ্বাসীরা বলে)— কথাটির সূত্র এখানে অনুক্ত রয়েছে। আর এখানকার 'লাম' অক্ষরটি পরিণতি প্রকাশক। এ পরিণতিটি হচ্ছে—'তুমি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে বলছো'।

'দারাসতাল কিতাবা' অর্থ পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করে। 'দরস' অর্থ অধ্যয়ন।

হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন— এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে লক্ষ্য করে জানাচ্ছেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি যখন মক্কাবাসীর সামনে কোরআন পাঠ করবেন, তখন তারা বলবে— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে ভাবেই হোক না কেনো এ কথাগুলো তুমি কোনো না কোনো স্থান হতে শিখে এসেছো। মক্কায় ছিলো দু'জন পারস্যবাসী ক্রীতদাস। ইঞ্জিল শরীফের বিশেষজ্ঞ ছিলো তারা। মক্কাবাসীরা ধারণা করতো রসুল স. ওই দু'জনের নিকট থেকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান আহরণ এবং পুনঃপ্রচার করে চলেছেন মাত্র।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়ালি নুবাইয়্যিন্নাহু লিক্বওমিঁ ইয়্যালামুন' (কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য)। এ কথার অর্থ— যদিও সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল জ্ঞানীরা। কারণ তারা কোরআনের মর্ম অনুধাবন করে এবং এর নির্দেশনাকে মান্য করে চলে। তাই মনে হয় কোরআন যেনো কেবল জ্ঞানীদের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে।

বাইয়্যিন্নাহু শব্দটির 'হু' সর্বনামটি এখানে কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তিত। সুতরাং এখানে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করার অর্থ কোরআনের আয়াত বিবৃত করা। অতএব সর্বনামটি কোরআনের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হওয়াই সমীচীন।

প্রকৃত কথা এই যে— এখানে বিভিন্ন প্রকারে ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত কোরআনের মধ্যে রয়েছে তিনটি বিষয়— ১. পরিপূর্ণরূপে কোরআনের প্রচার। ২. ওই ব্যক্তি হতভাগ্য যে কোরআনকে বলে মানুষের শেখানো বাণী। ৩. ওই ব্যক্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে কোরআনের বাণী শোনে এবং মান্য করে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০৬, ১০৭

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

❐ তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; এবং অংশীবাদীদিগের হইতে দূরে থাক।

❐ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শির্ক করিত না এবং তোমাকে তাহাদিগের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদিগের অভিভাবকও নহ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তার অনুসরণ করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লা হুয়া)। এটাই আপনার প্রতিপালকের (রবের) পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কোরআনের মূল কথা।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং অংশীবাদীদের থেকে দূরে থাকো' এ কথার অর্থ অংশীবাদীরা চির ভ্রষ্ট। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, তাদের ধারণার প্রতি মনোযোগী হবেন না এবং তাদের সঙ্গে বচসা বিতণ্ডায় লিপ্ত হবেন না।

পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরিক করতো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে মুশরিকদেরকে শিরিক থেকে মুক্ত করতে পারেন। কারণ তিনি অপার ক্ষমতাধর। কিন্তু তিনি কাউকে ইমান গ্রহণে বাধ্য করেন না। অবাধ্যদের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত গন্তব্য। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি জ্বিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী— সকলেই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়াধীন। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ই পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোতাজিলারা বলে, অবিশ্বাস বা কুফর আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়বহির্ভূত বিষয়। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ কেউ বা কোনো কিছু আল্লাহ্‌পাকের অতুলনীয় ও অপার অভিপ্রায়ের বহির্ভূত হতেই পারে না।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অবিশ্বাসীদের কৃতকর্মের প্রহরী বা রক্ষক নন। তাদের পাপাচারের জন্য আপনাকে কখনো অভিযুক্ত করা হবে না। আতা বলেছেন, এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অবাধ্যদের এমতোরক্ষক নিযুক্ত হননি যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করবেন। আপনি তো আমার রসুল— প্রচারক, বাণীবাহক, শিক্ষক।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কখনো অবাধ্যদের অভিভাবক নন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য দুঃশ্চিন্তিত হবেন কেনো? আপনি তো আমার রসুল।

হজরত মুয়াম্মার ও হজরত কাতাদা থেকে সূত্রপরম্পরায় ইবনে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো নব্য মুসলমানেরা কাফেরদেরকে গালাগালি করতো। প্রত্যুত্তরে তারাও গালি দিতো মুসলমানদেরকে। এই গালাগালি বন্ধ করার নিমিত্তেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১০৮

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❒ আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে; এইভাবে, প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদিগের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত— 'ইন্নাকুম ওয়ামা তা'বুদুনা মিন্‌দুনিল্লাহি হাসবু জাহান্নাম' (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করো— সকলে জাহান্নামের ইন্ধন) অবতীর্ণ হলো, তখন মুশরিকেরা বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের প্রভু প্রতিমাগুলোর দোষ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। নইলে আমরাও তোমার প্রভুর দোষ বর্ণনা করবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি। আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে—'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।'

আল্লামা সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হলো কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। বললো, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করে দিন। ভাবতে লজ্জা হয়, আপনার মৃত্যুর পর আমরা যদি মোহাম্মদকে হত্যা করি তবে লোকে বলবে— তার চাচাই তাকে নিরাপদে রাখতো। এখন চাচা নেই বলে কাপুরুষেরা তাকে হত্যা করেছে। ওই নেতাদের দলে ছিলো আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, নজর বিন হারেস, উমাইয়া বিন খাল্‌ফ, উবাই বিন খাল্‌ফ, উকবা বিন আবী মুয়ীত, আমর ইবনে আস এবং আসওয়াদ বিন আবুল বুখতারী। তারা আরো বললো, আপনি আমাদের প্রিয় নেতা। কিন্তু মোহাম্মদ আমাদেরকে ও আমাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলোকে কষ্ট দিচ্ছে। যদি আপনি পছন্দ করেন, তবে মোহাম্মদকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুন। সে যেনো আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে কিছু না বলে। আমরাও তার আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু বলবো না।

আবু তালেব রসুল স. কে ডেকে বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ইচ্ছা— তুমি আমাদের ও আমাদের প্রভুদের সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু বলবে না। আমরাও তোমার প্রভু সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য করবো না। আর এরা তো ন্যায্য কথাই বলছে। সুতরাং প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! তুমি এদের কথা মেনে নাও। রসুল স. বললেন, তোমরা শুধু আমার একটি কথা মেনে নাও। মানলে তোমরা লাভ করবে সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব। অনারবেরাও হয়ে যাবে তোমাদের নেতৃত্বের অধীন। আবু জেহেল বললো, তোমার পিতার কসম! এরূপ একটি কথা কেনো— দশটি কথা মানতে আমরা রাজী। রসুল স. বললেন, তোমরা কেবল বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। কিন্তু কুরায়েশ নেতারা এই পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করতে অস্বীকৃত হলো এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো সেখান থেকে। আবু তালেব বললেণ, বৎস! তুমি এছাড়া অন্য কথা বলো— যা তারা মানতে পারে। রসুল স. বললেন, আমার এক হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এ কথা বলা থেকে বিরত

থাকবো না। কুরায়েশ নেতারা নতুন করে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকো। না হলে আমরা তোমাকে ও তোমার নির্দেশদাতাকে গালি দিবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।

এই আয়াতে প্রকাশ্যতঃ অংশীবাদীদের দেবদেবীদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ রকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে গালমন্দ থেকে রক্ষা করার জন্য। কারণ অজ্ঞ ও অবাধ্যরা এতে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে গালাগাল করবে। আয়াতের বর্ণনাদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ের অবাধ্যদেরকে পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। তাদেরকে কিছু না বলাই উত্তম। সত্য মিথ্যার ন্যূনতমবোধও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'এভাবে' প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।' এ কথার অর্থ অবাধ্যদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলকে গালি দেয়া একটি অত্যুত্তম কর্ম। অন্যান্য পথভ্রষ্ট দলও তাদের মত ও পথকে সুন্দর মনে করে। আমিই তাদেরকে তাদের অপকর্মগুলো তাদের চোখে সুশোভন করে দিয়েছি।

এখানে সম্প্রদায় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উম্মত' শব্দটি। মানবতা বহু মত ও পথে বিভক্ত। প্রতিটি দলই তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে সুন্দর বলে জানে। আল্লাহ্‌পাক যাকে ভালো কাজের সুযোগ দান করেন— তার চোখে পুণ্যকর্মই সুশোভন। আর যাকে পুণ্য পথে চলবার সুযোগ দেননি তার চোখে অসৎ কর্মই সুশোভন। প্রকৃত কথা হচ্ছে, পথ প্রদর্শন এবং পথভ্রষ্টতা— দু'টোই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীন।

এই আয়াত দ্বারা এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য যা উপকারী তা প্রদান করতে আল্লাহ্‌তায়ালা বাধ্য নন। তাই ইমান ও সৎকর্ম সকলের জন্য উপকারী হলেও সকলের চোখে ইমান ও সৎকর্মকে সুশোভন করেননি। তাই বিশ্বাসীরা বিশ্বাস ও পুণ্যকর্মকে এবং অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস ও মন্দ কর্মকে পছন্দ করে।

শেষে বলা হয়েছে— অতঃপর, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন। এ কথার অর্থ— অবশেষে সকলকে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। তখন সকলের কৃতকর্মকে সামনে আনা হবে। নিশ্চিত করা হবে যথা পুরস্কার এবং যথাশাস্তি।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, (কালাবী সূত্রেও বাগবী এ রকম লিখেছেন)— একবার কুরায়েশ নেতারা রসুল স.কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি বলে থাকো মুসার হাতে ছিলো একটি লাঠি। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেরিয়ে আসতো বারোটি পানির প্রস্রবণ। আরো বললো, ঈসা মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। এ কথাও তুমি বলে থাকো যে, সালেহ্ তার সম্প্রদায়ের জন্য পাথরের মধ্য থেকে একটি উট বের করে দিয়েছিলেন। তুমিও এ রকম একটি মোজেজা দেখাও। যদি দেখাতে পারো তবে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নেবো। রসুল স. বললেন, কী মোজেজা দেখতে চাও তোমরা? কুরায়েশেরা বললো, এই সাফা পাহাড়টিকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সোনার পাহাড়ে পরিণত করে দাও। বাগবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, অবিশ্বাসীরা তখন এ কথাও বলেছিলো, আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখাও— যেনো আমরা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারি যে, তুমি যা বলছো তা সত্য। অথবা ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো— যেনো তারা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে জারীর ও বাগবী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন বললেন, তোমাদের আবেদন যদি আমি বাস্তবায়ন করি, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি এ রকম করতে পারো, তবে আমরা সকলেই তোমার অনুসারী হয়ে যাবো। সাহাবীগণও বললেন, তাদের আবেদন পূর্ণ করা হোক। তাহলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। রসুল স. দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিণত করার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভূত হলেন হজরত জিব্‌রাইল। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল!। আপনি প্রার্থনা করলে সাফা পাহাড় সোনার পাহাড় হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরেও আবেদনকারী জনতা যদি ইমান না আনে, তবে তাদের প্রতি আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গজব। সুতরাং আপনি ক্ষান্ত হন। তাদের আবেদনে সাড়া দেবেন না। এতে করে যারা প্রকৃতই সত্যান্বেষী তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করবে। আর যারা তা নয়— তারা পূর্ববৎ অবিশ্বাসে নিমগ্ন থাকবে। রসুল স. বললেন, আমি চাই তাদেরকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক— যাতে করে তারা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং যারা তওবা করতে চায় তারা যেনো তওবার পথে এগিয়ে আসে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَـئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَـةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَـا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِـهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

❒ তাহারা আল্লাহের নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদিগের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিত; বল, 'নিদর্শন তো আল্লাহের এখতিয়ারভুক্ত'; তাহাদিগের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে বিশ্বাস করিবে না ইহা কিভাবে তোমাদিগের বোধগম্য করান যাইবে?

❒ তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে বিশ্বাস করে নাই তেমনি আমিও তাহাদিগের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।

মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় নির্ভর। তাই আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসতো, তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করতো; বলো, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অবিশ্বাসীরা বলে, নিদর্শন বা মোজেজা প্রত্যক্ষ করতে পারলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যাবো। হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে এ কথা জানিয়ে দিন যে, নিদর্শন সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানির্ভর। আমি কোনো নিদর্শনের অধিকারী নই। এরপর বলা হয়েছে— তাদের নিকট নিদর্শন এলেও তারা যে বিশ্বাস করবে না, এটা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে। এখানে 'মা ইউশ্‌ই'রিকুম (তারা বুঝবে না) কথাটির 'মা' নেতিবাচক অর্থপ্রকাশক অথবা 'মা' শব্দটি এখানে একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। আলোচ্য বাক্যে কারণের কারণকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কারণকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমান এখানে কারণ। এবং মোজেজা হচ্ছে কারণের কারণ। আর কারণের কারণ (মোজেজা বা নিদর্শনকে) অস্বীকার করার মাধ্যমে মূল কারণকে (ইমানকে) অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নিদর্শন দেখলেও তারা ইমান আনবে না। এখানে অংশীবাদী ও বিশ্বাসী উভয় দলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে— (হে বিশ্বাসী ও অংশীবাদীরা) তোমরা জানো না, নিদর্শন দেখতে

পেলেও অবিশ্বাসীরা ইমান আনবে না। কারণ তারা চিরভ্রষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা' তাঁর অসীম ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে নিদর্শন প্রত্যাশীর বিশ্বাস বিমুখতাকে আগে থেকেই জানেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'লা ইউ'মিনুন' (বিশ্বাস করবে না) —কথাটির 'লাম' এখানে লামে যায়েদ (অতিরিক্ত লাম)। যেমন— অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'হারামুন আ'লা ক্বারইয়াতিন্ আহ্লাকনাহা আন্নাহুম লা ইয়ারজিউ'ন'। এখানেও অতিরিক্ত লামের ব্যবহার ঘটেছে। সুতরাং এখানে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াতে পারে এ রকম— তোমাদের কি এ কথা জানা আছে যে, নিদর্শন প্রদর্শনের পর তারা ইমান আনবে?

কোনো কোনো আলেমের মতে, এখানে আন্নাহা (নিশ্চয়ই তা) শব্দটির অর্থ হবে লাআ'ল্লাহা (সম্ভবতঃ তা)। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা কি জানো, নিদর্শন প্রকাশের পর অংশীবাদীরা কোন পথে চলবে? সম্ভবতঃ তারা ইমানের পথে আসবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'লা ইউ'মিনুন' কথাটির পরে 'আওইউ'মিনুন' কথাটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটিসহ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা এ কথা জানো না যে, নিদর্শন প্রদর্শনের পর তারা ইমান আনবে কিংবা আনবে না।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে—'তারা যেমন প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি, তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিবো।' এ কথার অর্থ— এ কথা নিশ্চিত যে, কাংক্ষিত নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও অংশীবাদীরা বিশ্বাসী হবে না। ইতোপূর্বেও তারা এ রকম বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তারা আমার রসুলকে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত করতে বলেছিলো। ওই নিদর্শনও তাদেরকে দেখানো হয়েছিলো। এ রকম আরো অনেক নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসের পথে আসেনি। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীত যে, নিদর্শনের পরে নিদর্শন প্রদর্শিত হলেও তারা ইমান আনবে না। তাই আমি তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে তাদের স্বরচিত অবাধ্যতার পরিসরে উদ্ভ্রান্তের মতো বিচরণ করার সাময়িক সুযোগ দান করবো। তাদেরকে কখনো সত্যপথে পরিচালিত করবো না।

সুরা আন্‌আম ঃ আয়াত ১১১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۝

❑ আল্লাহ্ তাহাদিগের নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদিগের সহিত কথা বলিলেও এবং সকল বস্তুকে তাহাদিগের সম্মুখে হাজির করিলেও যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

মানুষের মূল সম্পদ ইমান। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এ ইমান কেউ লাভ করতে পারে না। অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন দেখলেও না। আলোচ্য আয়াতে সে কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সঙ্গে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সম্মুখে হাজির করলেও যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না।' এখানে মৃতেরা কথা বলার অর্থ — যদি মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জীবিত হয়ে রেসালাতের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। অর্থাৎ মৃতেরা যদি জীবিত হয়ে বলে, 'মোহাম্মদ স. আল্লাহ্‌র রসুল'— তবুও অবিশ্বাসীরা ইমান আনবে না।

'ক্বুবুলাম মা কানু লিইউ'মিনু' অর্থ— তবু তারা ইমান আনবে না। অর্থাৎ এ চির অবিশ্বাসীদের নিকট যদি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হয়, মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জীবিত হয়ে যদি বলে 'মোহাম্মদ সত্য নবী' এবং যদি সকল বস্তু তাদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তবুও তারা ইমান আনবে না (যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন)। এখানে ক্বুবুলাম শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর অর্থ সামনে আসা। শব্দটি 'ক্বিলান', 'ক্বিলুন' অর্থ 'ক্বিলাতুন' এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে— দল। অথবা শব্দটি একটি রূপান্তরিত সাদৃশ্যপূর্ণ বিশেষণবাচক শব্দ (সিফাতে মুশাব্বাহ্)। এর অর্থ

কাফীল (দায়বদ্ধতা)। অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে অবিশ্বাসীদেরকে ইমান গ্রহণের যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই আহ্বানের দায়িত্ব বা দায়।

'তবুও তারা বিশ্বাস করবে না'— কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের চিরভ্রষ্ট হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আত্মার জগতে (আলমে আরওয়াহ্তে) নির্ধারিত হয়েছে। তাদের উৎপত্তিস্থলের সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার 'আলমুদিল্লু' (পথভ্রষ্টকারী) নামের সঙ্গে। তাই চিরভ্রষ্টরা কখনো ইমান আনবে না।

'ইল্লা আঁইয়াশা আল্লাহ্' কথাটির অর্থ— যদি না আল্লাহ্ অন্যরকম ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আত্মার জগতে যদি কারো ইমানদার হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায় যদি কারো অনুকূল হয়, তবে সে-ই কেবল ইমানদার হতে পারবে। এ রকম না হলে কস্মিনকালেও ইমান পাওয়া যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাকিন্না আক্ছারাহুম ইয়াজহালুন' (কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ)। অংশীবাদীরা সকলেই মূর্খ। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— 'অধিকাংশ অজ্ঞ'। এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অংশীবাদীরা অধিকাংশই জানে না যে, অজস্র অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে ইমান লাভ করা যায় না। বিশেষ করে এই বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অধিকাংশের কোনো জ্ঞান নেই বলেই এখানে বলা হয়েছে— কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ। তাই তারা বার বার মোজেজা বা অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়। এখানে 'হুম' (তাদের) সর্বনামটি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— চির অংশীবাদীরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। হাজার মোজেজা দেখলেও না। এ কথাটি অধিকাংশ মুসলমানের অজানা। তাই তারা এমতোকামনা করে যে— কাংখিত মোজেজা প্রকাশিত হলে অংশীবাদীরা সত্যধর্মকে বিশ্বাস করবে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১১২, ১১৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

❒ এইরূপে মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে;

যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

❒ এবং তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যাহা করে তাহাতে যেন তাহারা লিপ্ত থাকিতে পারে।

আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য মানুষ ও জ্বিনেরা শয়তান। এই শয়তানেরা সকল নবী রসুলের শত্রু। আর এই শত্রুতা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে তাই বলা হয়েছে— এরূপে মানব ও জ্বিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। বাক্যটির মাধ্যমে মোতাজিলাদের অভিমত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। কিন্তু আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তিনি অবাধ্য মানুষ ও জ্বিনের শত্রুতারও স্রষ্টা।

হজরত কাতাদা, মুজাহিদ এবং হাসান বলেছেন, মানুষও শয়তান হয়। সীমালংঘনকারী এবং অবাধ্যরাই শয়তান।

আমি বলি, মানুষ ও জ্বিনের মতো অন্য সৃষ্টিও শয়তান হয়। যেমন হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমাদেরকে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন। এরপর নিষেধাজ্ঞাটি উঠিয়ে নিয়ে কেবল কপালে ঘন কালো দুই ফোঁটা বিশিষ্ট কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, নিঃসন্দেহে এগুলো শয়তান। মুসলিম।

শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে— প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্রতারিত করে। আলেমগণ বলেছেন, শয়তান যখন সরাসরি প্রতারণা করতে অক্ষম হয় তখন সে অবাধ্য মানুষকে প্ররোচিত করে। শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে তখন ওই শয়তান প্রভাবিত মানুষ বিশ্বাসী মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। হজরত আবু জর বলেছেন, রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করেছেন, শয়তান মানুষ ও জ্বিনের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্পাকের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা কোরো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়! তিনি স. বললেন হ্যাঁ। আর মানুষ শয়তান, জ্বিন শয়তান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর।

মালেক বিন দীনার বলেছেন, জ্বিন শয়তানের চেয়ে মানুষ শয়তান অধিকতর নির্মম এবং পাষণ্ড। আল্লাহ্পাকের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থী হলে জ্বিন শয়তান দূরে সরে যায়, কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে পাপের পথে টানতে থাকে।

হজরত ইকরামা, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবী বলেছেন, ওই শয়তানকে মানুষ শয়তান বলা হয়, যে মানুষের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আর ইবলিসের সার্বক্ষণিক সঙ্গীকে বলা হয় জ্বিন শয়তান। মানুষ কখনো শয়তান হয় না। ইবলিস তার বাহিনীকে দু'টি ভাগে ভাগ করে রেখেছে। একভাগকে নিযুক্ত করা হয়েছে জ্বিনদেরকে প্রতারণা দানের জন্য এবং অন্য দলটিকে নিযুক্ত করা হয়েছে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য। শয়তানের ওই দু'টি দলই নবী রসুলগণের শত্রু। ওই দু'দল শয়তানের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক মেলামেশা। তারা একে অন্যকে বলে— আমরা এভাবে বিশ্বাসীদেরকে ধোকা দিয়ে থাকি। তোমরাও এভাবে ধোকা দিতে থাকো। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে— প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। এখানে 'যুখরুফাল ক্বওলি গুরুরা' অর্থ— চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচনা দান।

এরপর বলা হয়েছে— যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে তারা এ রকম করতো না। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি চাইতেন, শয়তান নবী রসুলদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না তবে নিশ্চয়ই শয়তান এ রকম করতে পারতো না। কারণ কোনো কিছুই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ হতে পারে না। মোতাজিলারা বলে, আল্লাহ্পাক কেবল উত্তম কর্মের স্রষ্টা। আর অনুত্তম কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজে। তাদের অভিমত সত্য নয়। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্পাকই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা। ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের। সকল কর্মের।

শেষে বলা হয়েছে, 'ফাজারহুম ওয়ামা ইয়াফতারুন' (সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করো)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি আপনাকে প্রদত্ত অংশীবাদীদের অপবাদকে উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবেন না। আল্লাহ্তায়ালাই আপনার সহায়। তিনিই আপনার শত্রুদেরকে যথাসময়ে যথাশাস্তি প্রদান করবেন।

পরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেনো তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেনো তারা পরিতুষ্ট হয়। আর তারা যা করে তাতে যেনো তারা লিপ্ত থাকতে পারে।' এ কথার অর্থ— শয়তানের প্ররোচনাদানের উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল-অবিশ্বাসীদের অন্তর যেনো শয়তানের প্রতি স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অবিশ্বাসের মধ্যেই যেনো তারা লাভ করে স্থায়ী পরিতুষ্টি। আর আমৃত্যু তারা যেনো অবিশ্বাসমগ্ন হয়ে থাকতে পারে।

অংশীবাদী কুরায়েশেরা বলতো, হে মোহাম্মদ! তোমার ও আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার জন্য তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে নিযুক্ত করো। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ○ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

❒ বল, 'তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব?— যদিও তিনিই তোমাদিগের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন!' যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

❒ সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পুর্ণ এবং তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে; তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

❒ তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

'আফা গইরল্লহি আব্‌তাগি হাকামাউ ওয়া হুয়াল্লাজি আনযালা ইলাইকুমুল কিতাবা মুফাস্‌সালা।' এখানে 'আফা গইরা' শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি একটি সংযোজক অব্যয়। সংযোগযোগ্য কথাটি এখানে অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত কথা সহযোগে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি কি তোমাদের প্রস্তাব মেনে নেবো এবং তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করবো, যিনি সিদ্ধান্ত দান করবেন, আমাদের মধ্যে কে সত্য এবং কে মিথ্যা ? অথচ আল্লাহ্‌পাক আমাদের উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন,

যে কোরআন একটি জাগ্রত নিদর্শন— পূর্ববর্তী আকাশী গ্রন্থগুলোর মতো অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদায়ক। এতে সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এখন সন্দেহের অবকাশ আর কোথায়?

আলোচ্য বক্তব্যটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্য 'হাকামা' (নিখুঁত মীমাংসাকারী) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে যে ন্যায়বিচারক, তার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় 'হাকামা'। আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কাররূপে এ কথাটিই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— পবিত্র কোরআনের অলৌকিক, নির্ভুল, বিস্ময়কর এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার পরে অন্য কোনো মোজেজার প্রয়োজন নেই। অন্য কোনো মীমাংসাকারী নির্ধারণের অবকাশও নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লাজিনা আতাইনা হুমুল কিতাবা ইয়া'লামুনা আন্নাহু মুনায্যালুম মির্‌রব্বিকা বিলহাক্ক' (যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে)। এ কথার অর্থ — ইহুদীরা ভালোভাবে জানে যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমাগত। কোরআন সত্য। তারা তওরাত অধ্যয়ন করতো। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বাণীর বাকভঙ্গি, প্রকৃতি ও মহিমা সম্পর্কে ছিলো ওয়াকিফহাল। তাই কোরআন মজীদের আয়াত শুনলে তারা সহজেই বুঝতে পারতো যে, এই কোরআনও আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র বাণী। আরো বুঝতে পারতো, এই কোরআন যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তিনি অক্ষরের অমুখাপেক্ষি (উম্মী)। আসমানী কিতাবের বিষয়ে অভিজ্ঞ, এ রকম কোনো বিদ্বান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগও নেই। সুতরাং কোরআন যে মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমাগত এবং সত্যসহ অবতীর্ণ, এ কথা ইহুদীরা খুব ভালো করেই জানে।

শেষে বলা হয়েছে— সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এখানে আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলের মাধ্যমে আপামর জনসাধারনকে এ কথাটিই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে— হে আমার প্রিয় রসুল! যারা কোরআনের পবিত্র বাণী শ্রবণ করে, তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করুন — তারা যেনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত না হয়। যেনো স্বতঃস্ফুর্তভাবে আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অবতীর্ণ এই মহাগ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নেয়।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে — 'ওয়া তাম্মাত কালিমাতু রব্বিকা সিদ্‌ক্বাঁও ওয়াআদ্‌লান' (সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ)। এ কথার অর্থ — আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ কোরআনের আদেশ ও নিষেধ সমূহের ভিত্তি পূর্ণ ও পরিণত

সত্য এবং ন্যায়ের উপর। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত কাতাদা এবং মুকাতিল। সিদ্‌ক্বাঁও ওয়া আ'দ্‌লা (সত্য ও ন্যায়)— দু'টো শব্দের শেষেই ব্যতিক্রমধর্মী অথবা অবস্থাপ্রকাশক 'যবর' রয়েছে। অথবা এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের ব্যতিক্রমী চিরবিদ্যমানতার কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে চিরন্তন।

এরপর বলা হয়েছে, 'লা মুবাদ্‌দিলা লিকালিমাতিহি'(তাঁর বাক্য পরিবর্তনকারী কেউ নেই)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের বাণী অপরিবর্তনীয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। এমন কেউই নেই, যে তাঁর নির্দেশকে রদবদল করতে পারে। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— রসুল মোহাম্মদ স. এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই আর কোনো আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ হবে না। কোরআন মজীদই সর্বশেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ। তাই এই গ্রন্থের নির্দেশ ও নিষেধাবলী আর কখনো পরিবর্তিত হবে না।

শেষে বলা হয়েছে, 'ওয়াহুয়াস্‌সামিউ'ল আ'লীম।' এ কথার অর্থ— তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আর সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ বলেই তিনি সকলের প্রকাশ্য ও গোপন চিন্তা, কথা ও আচরণ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। তাই অবাধ্যদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। এখানে 'দুনিয়ার অধিকাংশ লোক' অর্থ অবিশ্বাসীদের দল। কেননা অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চেয়ে সংখ্যাগুরু। আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনাটি এ রকম— হে আমার রসুল! দেখুন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবাধ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অবিশ্বাসী। তারা সম্পূর্নরূপে সত্যচ্যুত। তাই তাদের কথায় কর্ণপাত মাত্র করবেন না। কেনো করবেন? আপনি তো আমার রসুল। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রচার। আর তারা চায় আপনাকে আল্লাহ্‌তায়ালার পথ থেকে বা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে।

শেষে বলা হয়েছে— তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের বিধানের পরোয়া না করে বৈধা-বৈধ সম্পর্কে তারা তাদের অনুমানকে অনুসরণীয় করে নিয়েছে। যেমন, মৃত ভক্ষনকে মনে করেছে বৈধ, বাহিরাকে (কল্পিত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশুকে) মনে করছে অবৈধ ইত্যাদি। তাদের এ সকল অপবিশ্বাসের পক্ষে বিশ্বাসগত বা জ্ঞানগত কোনো দলিল প্রমাণই তাদের নেই। তাই তাদের আচরণীয় ধর্মমত মিথ্যা। তাই তারা যা বলে তা সর্বৈব মিথ্যা।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১১৭) আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই সত্যানুসারী ও মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে উত্তমরূপে জানেন।

আবু দাউদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার কয়েকজন লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমরা নিজ হাতে পশু জবাই করলে তার গোশত খেতে পারবো, অথচ আল্লাহ্‌পাক যাকে মেরে ফেলবেন সেই মৃত পশুর গোশত খেতে পারবো না— কারণ কী? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত ।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১১৮, ১১৯, ১২০

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا لَكُمْ
اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ
الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

❒ তোমরা তাঁহার নিদর্শনে বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হইয়াছে তাহা আহার কর;

❒ তোমাদিগের হইয়াছে কি যে যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা আহার করিবে না? —যদিও তোমরা নিরুপায় না হইলে যাহা তোমাদিগের জন্য নিষিদ্ধ তাহা তিনি বিশদভাবেই তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজদিগের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে তাহাদিগের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

আগের আয়াতে (১১৬) অবিশ্বাসীদের কথামত চলতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানেও তেমনি তাদের আরেকটি ধারণার অনুসরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। রসুল স. কে প্রশ্নকারী অবিশ্বাসীরা মৃত পশুর গোশতকে হালাল এবং জবাইকৃত পশুর গোশতকে হারাম মনে করতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের বিকৃত ধারণার

অনুসরণের বিরুদ্ধে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁর নিদর্শনে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা আহার করো।' এ কথার অর্থ তোমরা যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করো, তিনি যাকে হালাল বলেছেন তাকে হালাল এবং যাকে হারাম বলেছেন তাকে হারাম বলে মানো। তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ জারী করা হলো যে— আল্লাহ্‌র নামে যা জবাই করা হয়েছে তা আহার করো। কারণ তা হালাল। আয়াতটি শুরু হয়েছে এভাবে — ফা কুলু মিম্মা জুকিরাস্‌মুল্লহি আলাইহি......। আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'ফা' অক্ষরটি এখানে কারণ প্রকাশক।

পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে — 'ওয়া মালাকুম আল্লা তাকুলু মিম্মা জুকিরাস্‌মুল্লহি আলাইহি' (তোমাদের হয়েছে কি যে যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না?)। এখানে বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত 'মা' শব্দটি প্রশ্নবোধক। শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য এবং 'লাকুম' শব্দটি এর বিধেয়। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লা আজিদু ফিমা উহিয়্যা মুহার্‌রামা' (বলো, আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তাতে আমি হারাম কিছু পাইনি)।

এরপর বলা হয়েছে— ইল্লা মাদ্বতুরির্‌তুম ইলাইহি। এ কথার অর্থ— যদিও তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। এখানে 'মা' শব্দটি সময় নির্দেশক। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ ওই সকল বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যেগুলো সকল সময়ের জন্য ভক্ষন করা হারাম। কেবল অনন্যোপায় অবস্থায়— যখন জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, তখন জীবন রক্ষার জন্য হারাম বস্তু ভক্ষন করা যেতে পারে। হারাম তখনো হারামই থাকে। কিন্তু জীবন রক্ষার অত্যাবশ্যক তাগিদে তখন হারাম ভক্ষন করলে গোনাহ্‌ হবে না।

একটি প্রশ্নঃ এখানে বলা হয়েছে, 'যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না কেনো'— এ রকম বলার পর পরক্ষণেই আবার কেনো বলা হলো, 'যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবে তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।' এভাবে একই নির্দেশের পুনারাবৃত্তি করা হলো কেনো?

উত্তরঃ অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম ভক্ষণ সিদ্ধ, যদিও তখনও হারামের হুকুমটি থাকে অনড়। হালালের হুকুম কিন্তু এ রকম নয়। হালাল কোনো অবস্থায় কখনোই অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয়। আর আলোচ্য আয়াতে হালালের এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই বর্ণনাভঙ্গিটি হয়েছে এ রকম।

শেষে বলা হয়েছে— 'অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক ওই সকল লোককে ভালোভাবে চিনেন, যারা অজ্ঞ ও খেয়াল-খুশীর অনুসারী। আর অজ্ঞানতা ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণের কারণে যারা সত্য ছেড়ে মিথ্যার প্রতি অর্থাৎ হালাল ছেড়ে হারামের প্রতি ধাবিত হয়।

পরের আয়াতে (১২০) বলা হয়েছে— তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন করো। এ কথার অর্থ — তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার পাপাচার পরিত্যাগ করো। প্রকাশ্য পাপের সম্পর্ক কান, নাক, চোখ, জিহ্বা, হাত, পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে। আর দর্প, হিংসা, লোভ ইত্যাদি গোপন পাপের সম্পর্ক হৃদয় ও অসৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে।

কালাবী এবং অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'ইছমুন' শব্দটির মাধ্যমে ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য পাপ অর্থ— যাদের সঙ্গে পরিণয় নিষিদ্ধ, তাদেরকে বিবাহ করা এবং গোপন পাপ অর্থ অবৈধ যৌনাচার।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য পাপ বলে বুঝানো হয়েছে উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করাকে। আর গোপন পাপ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে ব্যভিচারকে।

এক বর্ণনায় এসেছে, কালাবী বলেছেন, দিনে বিবস্ত্র হয়ে পুরুষদের কাবা ঘর তাওয়াফ হচ্ছে প্রকাশ্য পাপ। আর গোপন পাপ হচ্ছে রাতে মহিলাদের বিবস্ত্র হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করা।

এরপর বলা হয়েছে— যারা পাপ করে তাদেরকে তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। এ কথার অর্থ— পাপের শাস্তি অবধারিত। পৃথিবীতে। অথবা পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় স্থানে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২১

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝

❐ যাহাতে আল্লাহের নাম লওয়া হয় নাই তাহা আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ; শয়তান তাহার বন্ধুদিগকে তোমাদিগের সহিত বিবাদ করিতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদিগের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী হইবে।

শুরুতেই বলা হয়েছে— যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তা আহার কোরো না। এই নির্দেশটির মাধ্যমে ইমাম আহমদ প্রমাণ করেন যে, ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে পশু জবাই করলে ওই পশুর গোশত ভক্ষণ হারাম। দাউদ জাহেরী, আবু সওর, শা'বী এবং মোহাম্মদ ইবনে সিরীনও এ রকম বলেছেন।

ইমাম মালেক বলেছেন, ভুলে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে পশু জবাই করার বিষয়টি আলোচ্য আয়াতের নির্দেশভূত নয়। এ অভিমতের পক্ষে তিনি হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স.কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কেউ যদি জবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যায়, তবে ওই জবাইকৃত পশু সম্পর্কে হুকুম কী? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র নাম প্রতিটি মুসলমানের মনে রয়েছে (সে নাম মুখে উচ্চারিত হোক বা না হোক)। হাদিসটি বর্ণনা করছেন দারা কুতনী।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মুসলমান যদি জবাই করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যায়, তবে পরে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নেবে। তারপর খাবে। দারা কুতনী। উল্লেখ্য যে, দারা কুতনী বর্ণিত এই দু'টি হাদিসই দুর্বল। আর হজরত আবু হোরায়রার হাদিসের সুত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান বিন সালেম। ইমাম আহমদ বলেছেন, মারওয়ান বিন সালেম নির্ভরযোগ্য নয়। নাসাঈ ও দারা কুতনীও তাকে পরিত্যক্ত বলেছেন। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারী মা'কালও অপরিচিত।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এক্ষেত্রে ইমাম মালেকের অনুরূপ। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার নিয়ম হচ্ছে— এককভাবে বর্ণিত কোনো হাদিস দ্বারা কোরআনের কোনো প্রমাণকে সুনির্দিষ্ট করা ঠিক নয় (তাই হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিস দ্বারা আলোচ্য আয়াতের সাধারণ অর্থকে সুনির্দিষ্ট করা যাবে না)। এদিকে হেদায়া প্রণেতা হানাফিদের নিয়মকে শক্তিশালী করার জন্য উল্লেখ করেছেন, যদি আলোচ্য নির্দেশটির সাধারণ অর্থ করা হয়, তবে যে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলো, তাকে একটি অস্বাভাবিক এবং কষ্টকর অবস্থায় পড়তে হবে। এই অস্বাভাবিকতাকে দূর করা প্রয়োজন। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ভুল করে। তাই আয়াতে প্রকাশ্য অর্থের উপর অনড় অবস্থান গ্রহণ করলে কলহ বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানেরা বিষয়টি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলে সেই মতভেদের প্রবহমানতা এখনও পরিদৃষ্ট হতো। হেদায়া প্রণেতার এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য দুর্বল।

ইমাম শাফেয়ীর মতে 'মালামইউজ্ কারিস্‌মুল্লহি আলাইহি' (যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি)। কথাটির অর্থ— মৃত এবং ওই জবাইকৃত পশু গইরুল্লাহ্‌র নামে জবাই করা হয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়া ইন্নাহু লাফিস্‌কুন' অর্থ— এটা অবশ্যই পাপ। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে পাপ হবে তখনই, যখন জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম উল্লেখ করা হবে। যেমন এই সুরার শেষ দিকে এসেছে— আও ফিসক্বান উহিল্লা লিগইরিল্লহি বিহি (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করার কারণে ওই পশু অবৈধ)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে জবাই করলেও হালাল হবে। জননী আয়েশা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিরিকের যুগ অতিক্রম করেছে (সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে) —এ রকম কেউ কেউ আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না জবাইকালে তারা বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলেছিলো কি না (আমরা কি ওই গোশত খেতে পারবো?)। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নাও। তারপর খাও। বোখারী। এই হাদিসের ব্যাখ্যাসুত্রে বাগবী বলেছেন, বিস্‌মিল্লাহ্‌ না পড়ে জবাই করা পশু যদি হারাম হতো, 'তবে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া হয়েছে কি না'— এ রকম সন্দেহই ছিলো ওই হারাম প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর রসুল স. ও সরাসরি বলে দিতেন— এ রকম গোশত ভক্ষণ হারাম। কিন্তু তিনি তা বলেন নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, জবাইকালে মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হালাল হওয়ার কোনো শর্ত নয়। এ ছাড়া ইমাম আবু দাউদের মারাসিল গ্রন্থে মিল্লাতের একটি মুরসাল হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মুসলমানের জবাই করা পশু হালাল— আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হোক অথবা না হোক।

হানাফিগণ বলেন, মিল্লাতের হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র নাম না নেয়ার অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র নাম নিতে ভুলে যাওয়া। জননী আয়েশার হাদিসটিও আমাদের এই ধারণার বিপরীত নয়। বরং আমাদের অভিমত তাঁর হাদিসের সাহায্যপুষ্ট। কেননা প্রশ্নকারী নিশ্চিত জানতেন যে— জবাইকারী মুসলমান। তার সন্দেহ কেবল এই যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে কি না। এতে করে প্রমাণিত হয়, সাহাবীগণ মনে করতেন জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া জবাইকৃত পশুর গোশত হালাল হওয়ার একটি শর্ত। আর 'আল্লাহ্‌র নাম নাও। তারপর খাও'— রসুল স. এর এই কথাটি ছিলো মুসলমানদের প্রকাশ্য অবস্থার প্রেক্ষিতে। প্রকাশ্যতঃ কোনো মুসলমান ইচ্ছাকৃতভাবে জবাইকালে আল্লাহ্‌র নাম নেয়াকে পরিত্যাগ করে না। তাই মুসলমানদের বাজার থেকে ক্রয়কৃত গোশত ভক্ষণ করা হালাল। কারণ বাহ্যিকভাবে এটাই বুঝা যায় যে, মুসলমানদের বাজারের গোশত নিশ্চয় কোনো মুসলমানই জবাই করে থাকবে— যদিও বিধর্মীদের দ্বারা জবাইয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে।

এবার আসা যাক ইমাম শাফেয়ীর অভিমতে। তাঁর দলিলে এই আয়াতটি— 'মালাম ইউজ্‌ কারিস্‌মুল্লহি আ'লাইহি' অর্থাৎ জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি — কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত প্রাণী এবং ওই সকল জবাইকৃত পশু— যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে। বিষয়টি সাধারণ অবস্থার বিপরীত। ইতোপূর্বে জবাই এবং শিকারের আলোচনা পর্বে এ কথাও প্রমাণ করা

হয়েছে যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়া একান্ত প্রয়োজন। সুরা মায়িদার তাফসীরে জবাই বিষয়ক অনেক মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনবশতঃ সেগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

শারহুল মুকাদ্দামতুল মালিকিয়াহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আবুল কাশেম সূত্রে এসেছে, ইমাম মালেকের নিকট জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম না নেয়া পশুর গোশত খাওয়াও হালাল। কিন্তু ইমাম মালেকের মুদাওয়ানা নামক ফেকাহ্ গ্রন্থে এ রকম অনুমতি দেয়া হয়নি এবং এটাই ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ্ পরিত্যক্ত হলে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না।

ইবনুল হারেস এবং ইবনুল বাশীর বলেছেন, জবাইকালে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা না করা সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ পরিদৃষ্ট হলেও এ বিষয়টিতে সবাই একমত যে— যে ব্যক্তি জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে বার বার ভুলে যায় এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলার পরোয়া না করে, তার জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম। কারণ ওই ব্যক্তি মুতাহাওয়ান। মুতাহাওয়ান বলে ওই ব্যক্তিকে— যে জবাইয়ের সময় বারংবার বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়। আল্লাহ্‌তায়ালাই অধিক অবগত।

তিবরানী ও অন্যান্য আলেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন পারস্যবাসীরা মক্কার কুরায়েশদের নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করলো যে— তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হও। তাকে জিজ্ঞেস করো, ছুরি দ্বারা তোমরা যা জবাই করো তাতো হালাল বুঝলাম। কিন্তু যা মৃত (আল্লাহ্ যার মৃত্যু ঘটিয়েছেন)— তাকে তোমরা হারাম বলো কেনো? (তোমাদের হত্যা কি আল্লাহ্‌র হত্যার চেয়ে উত্তম?)। আবু দাউদ ও হাকেমও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বিতর্কটি পারস্যবাসীদের ছিলো না, ছিলো মক্কার কুরায়েশদের। যাহোক, অবিশ্বাসীদের এমতো বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অবশিষ্টাংশ অবতীর্ণ হলো এভাবে— শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথা মতো চলো তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী হবে। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা তোমাদেরকে বিতর্কে লিপ্ত করতে চায়। করতে চায় তাদের বিশ্বাস ও কর্মের অনুসারী। কিন্তু জেনে রেখো, তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে নিঃসন্দেহে তোমরাও হয়ে যাবে অংশীবাদী।

এখানে ব্যবহৃত 'শায়াতীন' শব্দটির উদ্দেশ্য— পারস্যের ওই সকল শয়তান প্রকৃতির মানুষ। অথবা শয়তান জ্বিন। 'ওহী' শব্দটির অর্থ এখানে প্ররোচিত করা বা কুমন্ত্রণা দেয়া। 'আউলিয়া' শব্দটির উদ্দেশ্য— মক্কার অংশীবাদীরা। অথবা সাধারণভাবে সকল অবিশ্বাসীরা। আর 'ইতায়াত' শব্দটির উদ্দেশ্য— হারামকে হালাল মনে করা।

উল্লেখ্য যে, মুশরিক বা অংশীবাদী হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালার আনুগত্য এবং ধর্মীয় বিধান পরিত্যাগ করে অন্যের কথামতো চলা। যে এ রকম করে, সে নিঃসন্দেহে মুশরিক। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য শিরিক। জুজায বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম যে বলে, সে অংশীবাদী। আমি বলি, এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, এই হালাল ও হারাম প্রমাণিত হতে হবে কোরআন মজীদের আয়াতের মাধ্যমে।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১২২

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

❒ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাহাকে আমি পরে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেই স্থান হইতে বাহির হইবার নহে? এইরূপে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কৃতকর্ম শোভন করিয়া রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি রূপক উদাহরণ (ইসতেআরায়ে তামসিলিয়াহ্)। এখানে 'মৃত' শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে অবিশ্বাসীদেরকে। কারণ তাদের অন্তর মৃত। সত্যের স্পর্শ থেকে উদাসীনতার কারণে তাদের এই আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃত ব্যক্তি যেমন উপকারী ও অনুপকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না, তেমনি অবিশ্বাসীরাও সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে অনুভূতিহীন। আর এখানে জীবিত করার অর্থ ইমানের নূর দ্বারা অন্তরকে জীবিত করে দেয়া। নূর অর্থ ইমানদার ব্যক্তির ওই জন্মগত জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি, যার দ্বারা সে সত্য ও মিথ্যাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এ নূর তার স্বভাব বা ফিৎরতের নূর। এই নূর পরিশুদ্ধ জ্ঞান, প্রশান্ত প্রবৃত্তি এবং আল্লাহ্তায়ালার বিধিবিধানের অনুকূল।

'মাছালা' শব্দটির অর্থ— মতো, ন্যায় বা অনুরূপ। শব্দটির মাধ্যমে এখানে এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিশ্বাসী কখনও অবিশ্বাসীর মতো নয়। বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ প্রদত্ত আলোর ধারক আর অবিশ্বাসীরা ভ্রষ্টতার অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। একজনকে পথ প্রদর্শন করছে আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞান ও শরিয়ত। আর অন্যজনকে পথভ্রষ্ট করেছে অবিবেচনা ও শরিয়তবিমুখতা। একজনের অন্তঃকরণ জীবন্ত। আর অন্যজনের অন্তঃকরণ মৃত।

আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর এবং আবু জেহেলকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। জুহাকের মাধ্যমে ইবনে জারীরও এ রকম বলেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হজরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জেহেল। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— একবার রসুল স. কাবা প্রাঙ্গণে সেজদাবনত হলেন। ওই সময় আবু জেহেল তাঁর উপর নিক্ষেপ করলো উটের নাড়ি-ভূঁড়ি। হজরত হামযা গিয়েছিলেন শিকারে। ঘরে ফিরেই তিনি আবু জেহেলের এই অপকর্মের সংবাদ পেলেন। হাতে ছিলো তাঁর ধনুক। ওই ধনুক হাতে নিয়েই ক্রোধান্বিত পদক্ষেপে অতি দ্রুত তিনি উপস্থিত হলেন আবু জেহেলের বাড়ীতে। হজরত হামযাকে রোষতপ্ত দেখে আবু জেহেল চরম বিনয়ের সঙ্গে বলতে শুরু করলো— আবু ইয়া'লী! তুমিতো জানোই মোহাম্মদ কি সব কথা শুরু করেছে। সে আমাদের প্রতিমাগুলোকে যখন তখন গালি দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে মন্দ বলে। কতই না অজ্ঞ সে। হজরত হামযা বললেন, এর চেয়ে অধিক মূর্খ ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র উপাসনা ছেড়ে পাথরের উপাসনা করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র দাস ও রসুল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। হজরত ইকরামা এবং কালাবী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আম্মার বিন ইয়াসার এবং আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। তাদের মধ্যকার ঘটনাটি ঘটেছিলো হজরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। ওই ঘটনার পরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত ওমর এবং আবু জেহেলকে কেন্দ্র করে। হাসান বসরী এবং আবু সিনানও এরকম বলেছেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি ঘটনার মধ্যে সাধারণ ঐক্যমত্য এই যে, এখানে 'যে অন্ধকারে রয়েছে' কথাটির লক্ষ্য আবু জেহেল। মতভেদ রয়েছে কেবল 'যাকে আমি জীবিত করেছি' কথাটি সম্পর্কে। কথাটি হজরত ওমর, হজরত হামযা অথবা হজরত আম্মারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সময়ের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিলো না। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ওই সময়েই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাঁদের তিনজনই 'যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলবার জন্য আলো দিয়েছি'— কথাটির লক্ষ্যস্থল হতে পারেন। আয়াতে আবু জেহেলের এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে—

মুসলমানেরা যেহেতু তাদের পিতৃ-পুরুষ এবং পিতৃ-পুরুষের আচরণীয় ধর্মের বিরোধিতা করে, তাই তারাই মুসলমানদের চেয়ে উত্তম। কিন্তু আয়াতে উত্তম অনুত্তমের আলোচনা বা প্রতিতুলনা নেই। বরং এখানে সরাসরি বলে দেয়া হয়েছে মৃত ও জীবিত যেমন সমান নয়, তেমনি অবিশ্বাসীরা কখনো বিশ্বাসীদের মতো নয়। আয়াতে কেবল বিশ্বাসীদের পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করা হয়েছে। আর সম্পূর্নরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীকে।

শেষে বলা হয়েছে— এরূপে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃত-কর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে। এ কথার অর্থ— আবু জেহেল ও তার অনুসারীরা ভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে। তাই মিথ্যাই তাদের চোখে সুন্দর। আমিও তাই মিথ্যাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিলাম।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৩

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۭ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

❒ এইরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদিগকে প্রধান করিয়াছি যেন তাহারা সেখানে চক্রান্ত করে; কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদিগের নিজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

মানুষের সমাজ পরিচালিত হয় সমাজনেতাদের দ্বারা। জনতার পক্ষে নেতাদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন। আর আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়ম হচ্ছে, সাধারণ জনতাই নবী রসুলগণের একনিষ্ঠ অনুসারী যেনো হয়। তাই দেখা যায় নবী রসুলের আহ্বানে সাধারণ জনতা সাড়া দিচ্ছে। আর সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা হয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ। অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদের পরিণতি যে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। অপরাধী জনতার চেয়ে অপরাধী নেতারাই বড় অপরাধী। তাই আয়াতে তাদের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— এরূপে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদেরকে প্রধান করেছি যেনো তারা সেখানে চক্রান্ত করে। এ কথার অর্থ— তখন যেমন কুরায়েশ নেতারা সত্যধর্ম ইসলামের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, রসুল স. এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম চক্রান্ত করে চলেছে— তেমনই অবস্থা ছিলো আগের যুগের সমাজ নেতাদের। তারাও তাদের জনপদে প্রেরিত নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে এ রকম চক্রান্ত ও প্রতারণা করতো। অপরাধীদের নেতাদেরকে এভাবে আমি আবকাশ দিয়ে থাকি— যেনো তারা অধিকতর পাপাচারী হয় এবং আরও হয় অধিক

শাস্তির উপযোগী। এখানে ব্যবহৃত 'জায়ালনা' শব্দটির অর্থ যদি 'করেছি' অথবা 'বানিয়ে দিয়েছি' ধরা হয়, তবে এর কর্ম হবে দু'টি। একটি হচ্ছে— ফি ক্বারইয়াতিন (জনপদে) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে— মুজ্‌রিমিহা (অপরাধীদের)। আর মুজ্‌রিমিহা শব্দটি বসবে 'আকাবিরা (প্রধানগণ) শব্দটির স্থলে। অথবা 'আকাবিরা' হবে দ্বিতীয় কর্ম এবং প্রথম কর্ম হবে 'মুজরিমিহা'। কিংবা 'আকাবিরা মুজ্‌রিমিহা' সম্মিলিতরূপে হবে একটি কর্ম। আর যদি 'জায়ালনা' অর্থ 'আমি করেছি' অথবা 'আমি শক্তি দিয়েছি' হয়, তবে মিলিতাবস্থায় 'আকাবিরা মুজ্‌রিমিহা' হবে তার কর্ম। 'সিগাহ ইস্‌মেতাফজীল' সম্বন্ধবাচক হলে এবং সম্বোধিত বিষয় বহুবচন হলে সম্বন্ধবাচক শব্দটি একবচন বা বহুবচন— যে কোনো এক প্রকারে ব্যবহার করা সিদ্ধ। আলোচ্য আয়াতে 'আকাবিরা' শব্দটি এসেছে বহুবচনরূপে।

এখানে মকর শব্দটির অর্থ— প্রতারণা বা চক্রান্ত । কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। আর সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, বাধাদানের মাধ্যমে কাউকে তার মূল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দেয়া অথবা ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো।

কুরায়েশদের চক্রান্ত ছিলো এ রকম— তারা মক্কায় প্রবেশের সময় সব কয়টি পথে লোক বসিয়ে রাখতো। তাদের কাজ ছিলো, দূরের কেউ রসূল স. এর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া। 'মোহাম্মদ তো গণক', 'সে তো যাদুকর ছাড়া অন্য কিছু নয়'— এ সকল কথা বলে আগন্তুকদের মন বিষিয়ে দেয়া।

চক্রান্তের পরিণাম চক্রান্তকারীর উপরই আবর্তিত হয়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে চক্রান্তকারীরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকে। আলোচ্য আয়াতের শেষে সে কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— কিন্তু তারা শুধু তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

হজরত কাতাদা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার বললো— প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দু'টি ঘোড়ার মতো আবদে মান্নাফের সন্তানেরা আমার সঙ্গে আভিজাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। রসুল স. এর বংশের লোকেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে বললেন, আমাদের মধ্যে রয়েছে একজন রসুল— যার প্রতি অবতীর্ণ হয় প্রত্যাদেশ। আবু জেহেল বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মানবো না। কস্মিনকালেও তার অনুগত হবো না। তার মতো প্রত্যাদেশ যদি আমার উপরও অবতীর্ণ হয়, কেবল তখনই হয়তো তাকে মেনে নিতে পারি।

এক বর্ণনায় এসেছে, ওলিদ ইবনে মুগীরা একবার বললো, নবুয়ত যদি প্রকৃতই কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় হয়, তবে নবুয়ত লাভের অধিকার তোমার চেয়ে আমারই বেশী। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, বিত্তশালী। ওলিদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

❒ যখন তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে 'আল্লাহের রসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ রিসালতের ভার কাহার উপর অর্পন করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে চক্রান্তের জন্য আল্লাহের নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে।

নবী ও রসুলগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নিজস্ব নির্বাচনের ফল। বংশ, সম্পদ, বয়স, চেষ্টা সাধনা— কোনো কিছুই নবুয়ত লাভের যোগ্যতা নয়। আর আল্লাহ্‌তায়ালাই ভালো করে জানেন, তিনি রেসালতের ভার কার উপর অর্পন করবেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করবার অধিকার কারো নেই। তাই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে— যখন তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আসে, তখন তারা বলে, আল্লাহ্‌র রসুলগণকে যা দেয়া হয়েছিলো, আমাদেরকে তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ্ রেসালতের ভার কার উপর অর্পন করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফে সানি র. লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাকের সত্তা ও গুণাবলীর সরাসরি প্রতিবিম্ব হচ্ছে নবী ও রসুলগণের আদি সূচনা বা উৎপত্তিস্থল। আর যারা নবী ও রসুল নয় তাদের আদি সূচনা বা উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের নাম ও গুণাবলীর প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া। তাই নবী ও রসুলগণের উপর আল্লাহ্‌পাকের সত্তার তাজাল্লী বা বিকাশ প্রতিবিম্বিত হয় প্রত্যক্ষভাবে আর অন্যদের প্রতি প্রতিবিম্বিত হয় পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বনের মধ্যে ফেরেশ্‌তাকুলও রয়েছেন। সুতরাং তারাও নবী রসুলগণের মতো নিষ্পাপ। তাঁদের উৎসস্থল বা সূচনা যদিও এক, তবুও তাঁর দিক রয়েছে দু'টি। একটি অপ্রকাশ্য এবং অন্যটি প্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য দিকটি বিশেষভাবে ফেরেশ্‌তাদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তাঁরা অদৃশ্য। আর নবী রসুলগণ প্রকাশ্য দিকটির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত বলে তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র এই পৃথিবী বা প্রকাশ্য জগৎ।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নৈকট্যের (বেলায়েতের) দিক থেকে ফেরেশ্তাকুলই শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁরা নবী রসুল অপেক্ষা আল্লাহ্তায়ালার অধিকতর নৈকট্যভাজন। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নবুয়তের দিক থেকে। নবুয়তই আল্লাহ্পাক প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। আল্লাহ্পাকের সত্তার সরাসরি তাজাল্লী, বিকাশ বা বিচ্ছুরণ নবী রসুলগণের উপরেই প্রতিভাসিত হয়। তাই তাঁরা ফেরেশ্তাগণের চেয়ে আল্লাহ্পাকের অধিকতর প্রিয়ভাজন।

প্রেমিক তাঁর প্রিয়জন নির্ধারণ করেন প্রেমের নিরিখে। বাহ্যিক কোনো যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। প্রকৃত প্রেম প্রত্যক্ষ। আর যোগ্যতা বা কারণ একটি পরোক্ষ বিষয়। প্রেম ভালোবাসার স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালা এ কথা ভালো করেই জানেন। তাই তিনি সকল কারণ ও যোগ্যতার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে আপন সিদ্ধান্তে তাঁর একান্ত প্রিয়জনদের উপর অর্পণ করেন রেসালতের অনন্যসাধারণ দায়িত্ব। আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি স্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অন্তরকে সর্বাধিক পবিত্র, প্রেমময় এবং আনুগত্যপূর্ণ দেখলেন। তাই তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন সর্বাপেক্ষা আপন হিসেবে। পুনর্বার দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্পাক দেখলেন, রসুল স. এর সাথীদের অন্তর্দেশ অন্য মানুষের অন্তর্দেশ থেকে উত্তম। তাই তাঁদেরকে নির্বাচন করলেন রসুল স. এর সহচর হিসেবে। তাঁরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই তাঁরা যা উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহ্র নিকটে উত্তম। আর তাঁরা যা অনুত্তম মনে করেন, তা অনুত্তম আল্লাহ্র নিকটেও।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— যারা অপরাধ করেছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। এখানে 'সাগারুন্' শব্দটির অর্থ অপমান বা লাঞ্ছনা। 'ইন্দাল্লহ্ কথাটির মর্ম— কিয়ামতের দিন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইন্দাল্লহ্' কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— 'মিন ইনদিল্লাহ্' (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে (তাদের উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি)। 'আ'জাবুন শাদীদ্' অর্থ কঠোর শাস্তি। এই কঠোর শাস্তি পৃথিবী ও আখেরাত উভয় স্থানে হবে। যেমন অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে নিহত হয়েছে। হয়েছে বন্দী। বদর যুদ্ধের দিনেও তারা হয়েছিলো চরম লাঞ্ছনার শিকার। আর পরকালে তাদের জন্য নরক তো অবধারিত। এখানে 'বিমাকানু' শব্দটির 'বা' হচ্ছে কারণ নির্দেশক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায় এ রকম— পাপাচারের কারণে, অথবা সত্যের প্রতিপক্ষ হওয়ার কারনে পরকালে তারা প্রবেশ করবে নরকাগ্নিতে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

❒ আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করেন।

আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন— এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুল স. কে 'শরহে সদর' (বক্ষ সম্প্রসারণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্পাক ইমানদারদের অন্তরে এক প্রকার নূর নিক্ষেপ করেন— ফলে তাদের অন্তর্জগত হয়ে যায় প্রসারিত, বিস্তৃত (ওই অবস্থাকেই বলা হয় শরহে সদর)।

আমি বলি, কথাটির অর্থ— মারেফাতে হক (সত্যের পরিচিতি) লাভের জন্য অন্তর উন্মোচিত হওয়া। ওই উন্মোচিত হৃদয়ই প্রকৃত ইমানকে ধারণ করে।

একবার সাহাবীগণ রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শরহে সদরের নিদর্শন কী? তিনি স. বললেন, চিরস্থায়ী আবাসের প্রতি আকর্ষণ, পৃথিবী বিমুখতা, মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুতি— এগুলোই হচ্ছে শরহে সদরের নিদর্শন। হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মুরসালরূপে ফারইয়াবী বর্ণনা করেছেন আবু জাফর থেকে। ইবনে জারীর এবং আবদ বিন হুমাইদও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

সুফী সম্প্রদায়ের মতে প্রবৃত্তির বিনাশ সাধিত হলে শরহে সদর হয়। তখন অপপ্রবৃত্তির (নফ্সানিয়াতের) কোনো চিহ্নই আর পরিদৃষ্ট হয় না। আধ্যাত্মিক পথিকগণ যখন বেলায়েতে কোব্রায় (নবীগণের নৈকট্যের বৃত্তে) উপনীত হন, তখনই অর্জিত হয় প্রকৃত ইমান।

এরপর বলা হয়েছে— এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ সিবওয়াইহ্ বলেছেন, এখানে ব্যবহৃত 'হারাজ' শব্দটির 'র' অক্ষরের উপর যবর দিয়ে পড়তে হবে। এটি একটি মূল শব্দ। অর্থগত দিক থেকে শব্দটি কর্তৃবাচক এবং এটি গুণবাচক শব্দরূপ। শব্দটি রূপান্তরযোগ্য ও বিশেষণাত্মক। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্পাক অবিশ্বাসীদের হৃদয় অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন। তাই ওই সঙ্কুচিত ও রুদ্ধ হৃদয়ে ইসলামের আলো প্রবেশ করে না। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র কথা শুনলে ওই সকল লোকের হৃদয় আরো বেশী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আর দেব-দেবীর পূজা অর্চনার কথা শুনলে তাদের হৃদয়ের অর্গল খুলে যায়।

হজরত ওমর একবার এই আয়াত পাঠ করে বনী কেনানা নামক আরব গোত্রের এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, 'হারাজাতুন' শব্দটির অর্থ কী? লোকটি বললো, আমাদের ভাষায় শব্দটির অর্থ দুর্গম অরণ্যের এমন বৃক্ষ— যেখানে গৃহপালিত বা বুনো কোনো পশু পৌঁছতে পারে না। হজরত ওমর বললেন, কপটদের (মুনাফিকদের) অন্তরও তদ্রূপ। উত্তম কোনো কিছু তাদের বদ্ধ অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

মুনাফিকদের জন্য ইসলামের অনুসরণ দুঃসাধ্য। এ দৃষ্টান্তটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহনের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কথার অর্থ— সশরীরে আকাশে উঠে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব মুনাফিকদের হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য দৃষ্টান্তটির অর্থ— ইমান যেনো মুনাফিকদের নিকট আকাশে উধাও হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। আকাশারোহণ যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ওই উধাও ইমানকে খুঁজে পাওয়া।

শেষে বলা হয়েছে— যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন। এ কথার অর্থ, মুনাফিকদের হৃদয় এভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়ে আল্লাহ্পাক তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। এখানে ব্যবহৃত 'রিজসুন' শব্দটির অর্থ, পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী— উভয় স্থানের লাঞ্ছনা বা শাস্তি। কালাবী বলেছেন, যাতে কল্যাণের লেশমাত্র নেই তাকেই বলে— রিজসুন। জুজায বলেছেন, এর অর্থ গোনাহ্ বা পাপ। মুজাহিদ বলেছেন, শয়তান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— এর অর্থ শয়তানকে বিজয়ী করে দেয়া। এখানে আ'লাইহিম (তাদের

উপর) না বলে বলা হয়েছে 'আলাল্লাজিনা লা ইউ'মিনুন (যারা বিশ্বাস করে না)। এতে করে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাস না করা বা ইমান না আনাই তাদের লাঞ্ছনার কারণ।

আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে মোতাজিলাদের বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তারা বলে, আল্লাহ্ কেবল উত্তম কর্মের স্রষ্টা, মন্দ কর্মের নয়। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে— তিনিই ভালো ও মন্দ উভয় কর্মের একক স্রষ্টা (সৃষ্টি আল্লাহ্র আর অর্জন বান্দার)।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৬

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

❐ ইহাই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে তাহাদিগের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

সরল পথ ব্যতিরেকে নির্ভুল গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর এ রকম সরল সোজা পথ মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি নির্মাণ করতে পারে না। যে আল্লাহ্ মানুষের বক্ষ সম্প্রসারণ ও সংকোচন করেন, যিনি সকল দোষত্রুটি ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে পবিত্র— সেই আল্লাহ্ই কেবল সরল পথের নির্দেশনা দিতে সক্ষম। সে কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— এটাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। 'সিরত্বল মুসতাক্বিম' অর্থ সরল পথ। এই পথ বিজ্ঞানময় এবং আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত নিয়মের অনুকূল। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোরআন মজীদ কর্তৃক উপস্থাপিত এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. কর্তৃক অনুসৃত পথই হচ্ছে সরল পথ। এক কথায় এই পথের নাম ইসলাম। এখানে ব্যবহৃত মুসতাক্বিমা শব্দটি বর্তমান অবস্থাবোধক। পূর্বোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে শব্দটির অর্থ হবে ন্যায়ানুগতা, সাম্য। আর শেষোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে অর্থ হবে সরল, সোজা— যেখানে বক্রতা নেই।

এরপর বলা হয়েছে— যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি। এখানে ক্বওমী ইয়্যাজ্‌জাক্কারুণ (যারা উপদেশ গ্রহণ করে)— কথাটির উদ্দেশ্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। কেননা কোরআন মজীদের আয়াত দ্বারা এই দলই সর্বাধিক উপকার লাভ করেছে। এই পথপ্রাপ্ত দলের বিশ্বাস হচ্ছে— আল্লাহ্পাকই সর্বশক্তিমান। সকল দিক দিয়েই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয় এবং সমকক্ষহীন। আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র বিশ্বের সকল ভালো ও মন্দ সংঘটিত হয়ে চলেছে। তিনি সকলের সকল প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্কেও সম্যক অবগত। তাঁর সকল কর্ম প্রজ্ঞামণ্ডিত। তিনি ন্যায়বিচারক। তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের অধিকার কারো নেই।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে শান্তির আলয় এবং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য তিনিই তাহাদিগের অভিভাবক।

'লাহুম দারুস্ সালামি ই'নদা রব্বিহিম' (তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয়)। এখানে 'দারুস্‌সালাম' অর্থ শান্তির আলয় বা জান্নাত। জান্নাত সকল অশান্তিময়তা থেকে মুক্ত। অথবা দারুস্‌সালাম অর্থ ওই গৃহ, যেখানে জান্নাতিদের শান্তিময় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালার এক নাম সালামুন। হতে পারে ওই নামে কোনো গৃহের নাম দারুস্‌সালাম। আর যে গৃহ আল্লাহ্‌তায়ালার নামাঙ্কিত, সেই গৃহ যে অত্যুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন— তা বলাই বাহুল্য।

ই'নদা রব্বিহিম কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে, জিম্মাদারীতে বা দায়িত্বে। আল্লাহ্‌তায়ালার দায়িত্বে বিদ্যমান ওই গৃহের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ওয়া হুয়া ওয়ালিয়্যুহুম বিমা কানু ইয়া'মালুন (এবং তারা যা করতো তার জন্য তিনিই তাদের অভিভাবক)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে (বিশ্বাসীদেরকে) ভালোবাসেন। তিনিই বিশ্বাসীদের ওলি (প্রেমিক বা অভিভাবক)। ওলি অর্থ সকল বিষয়ের অভিভাবক হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্‌পাক বিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে বক্ষ সম্প্রসারণ করেন। ইমান দান করেন। বিশুদ্ধ করেন। কবরে মুনকির ও নকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রশ্নের সামনে তৌহিদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তিনি তাদেরকে দান করবেন পরিপূর্ণ সওয়াব, নৈকট্য এবং রহমত।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১২৮, ১২৯

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

❐ যেদিন তিনি তাহাদিগের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন 'হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদিগের অনুগামী করিয়াছিলে', এবং মানব সমাজের মধ্যে তাহাদিগের বন্ধুগণ বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছি এবং তুমি আমাদিগের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইয়াছি' সেদিন আল্লাহ্ বলিবেন, 'অগ্নিই তোমাদিগের বাসস্থান, তোমরা সেথায় স্থায়ী হইবে', যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

❐ এইরূপে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য জালিমদিগের একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করিয়া থাকি।

প্রথমেই বলা হয়েছে— যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন এবং বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে একত্র করবেন, তখন জ্বিন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলে। এভাবে অনেক লোককে তোমরা তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে।

এরপর বলা হয়েছে— এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে উপকৃত হওয়ার অর্থ— জ্বিনদের নিকট থেকে কোনো কোনো মানুষ যাদু ও গণনা শিক্ষা করে। ওই যাদু ও গণনার কারণে জ্বিনেরা তাদের কোনো কোনো প্রয়োজন পূরণ করে। এভাবে জ্বিনেরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। জ্বিনদের মাধ্যমে ওই প্রবৃত্তিজাত প্রাপ্তিকে এখানে বলা হয়েছে উপকৃত হওয়া। এ রকম আরো কিছু কিছু উপকার প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, বিজন মরুপ্রান্তরে চলমান কোনো পথিক যদি বলে— আউ'জু বিসাইয়্যিদি হাজাল ওয়াদি মিন সুফাহায়া কুওমিহি (আমি জ্বিন সম্প্রদায়ের ক্ষতি থেকে এই প্রান্তরের জ্বিন সর্দারের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থী— তবে সে সমস্ত রাত জ্বিনের ক্ষতি থেকে পরিত্রান লাভ করে। মানুষের দ্বারা জ্বিনেরাও উপকৃত হয়। এ রকম উপকারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে— কোনো কোনো মানুষ জ্বিনের উপাসনা করে, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে ইত্যাদি।

'আজালানা' শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে কিয়ামত দিবসকে। অর্থাৎ ওই দিবসে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে জ্বিনেরা এ রকম বলবে যে— তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।

শেষে বলা হয়েছে— সেদিন আল্লাহ্ বলবেন, অগ্নিই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। এখানে 'যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন'— কথাটির অর্থ হতে পারে বিভিন্ন রকম। যেমন--

১. আল্লাহ্র ইচ্ছায় ওই সময়টুকুর সুযোগ— যে সময়টুকু লাভ হবে দোজখে প্রবেশের পূর্বে।
২. আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছানুসারে প্রাপ্য ওই অবকাশটুকু, যে অবকাশের পর দোজখীদেরকে স্থানান্তরিত করা হবে জামহারীর দিকে (স্থায়ী অগ্নিবাসের দিকে)।
৩. 'ইল্লা' অর্থ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক চাইলে সার্বক্ষণিক দোজখীরাও কিছু কিছু আনুসাঙ্গিক আযাব থেকে মুক্ত থাকবে।
৪. হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইল্লা মাশাআল্লাহ্ (যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন) —কথাটির মাধ্যমে ওই সকল দোজখীদেরকে পৃথক করা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক আগের থেকেই জানেন যে, এরা পাপিষ্ঠ হলেও অনুপরিমান ইমানের অধিকারী। দোজখ এদের চিরস্থায়ী আবাস নয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্য রকম ইচ্ছা করবেন। অর্থাৎ দোজখের সাময়িক শাস্তিদানের পর তাদেরকে দোজখ থেকে বহিষ্কৃত করবেন। এখানে মাশায়া (যদি ইচ্ছা করেন) শব্দটির 'মা' অর্থ 'মান' (যে ব্যক্তি)।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রব্বাকা হাকিমুন আ'লীম' (তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের সঙ্গে যে আচরণ করবেন তা হবে অবশ্যই প্রজ্ঞামণ্ডিত এবং তিনি সকলের সকল খবর জানেন। এ কথাও জানেন যে, কার অন্তরে রয়েছে বিশ্বাস এবং কার অন্তরে অবিশ্বাস।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাসের উপরে বর্ণিত উক্তিটির মর্মার্থ সম্ভবতঃ এই যে–- যাদের কাছে কোনো নবী ও রসুলের আহবান পৌঁছেনি, অথচ

আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন যে সত্যের আমন্ত্রণ পেলে তারা সাড়া দিতো — তাদেরকেই আল্লাহ্‌পাক কোনো এক সময় দোজখ থেকে নিষ্কৃতিদান করবেন। আর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাকের জানা রয়েছে যে — সত্যের ডাক শুনলেও তারা সাড়া দিতো না, তাদের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা নির্ধারণ করবেন চিরস্থায়ী অগ্নিবাস।

পরের আয়াতে (১২৯) বলা হয়েছে, এরূপে তাদের কৃতকর্মের জন্য জালেমদের একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি। এ কথার অর্থ— আমি অবিশ্বাসী জ্বিন ও মানুষকে আমার সাহায্য থেকে সম্পর্কচ্যুত করে দিয়েছি। দিয়েছি তাদেরকে পারস্পরিক উপকৃত হওয়ার সুযোগ। তাই তারা একদল— অন্যদলের উপর প্রবল হয়। উপকৃত হয় একে অন্যের নিকট থেকে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব।

এখানে নুওয়াল্লি (পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা প্রাবল্য) শব্দটির অর্থ আলেমগণ বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন —

১. আমি তাদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই।

২. এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর কল্যাণকামী। তারা ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগীতা করে থাকে। তেমনি অবিশ্বাসীরা মন্দ কর্মে সমমতি সম্পন্ন এবং তারা মন্দ কর্মে একে অপরের সহযোগী হয়।

৩. হজরত মুয়াম্মারের বর্ণনা থেকে কাতাদা বলেছেন, এখানে একদলকে অন্য দলের উপর প্রবল করার অর্থ— দোজখীদের এক দলকে অন্য দলের অগ্রগামী করা (এক জনের পশ্চাতে একজন— এভাবে দোজখে প্রবেশ করানো)।

নুওয়াল্লি শব্দটি এসেছে মোওয়ালাত থেকে— যার অর্থ একজনের পর একজন চলা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'মোওয়ালাত' শব্দটির অর্থ হস্তান্তর করা বা ন্যস্ত করা। এভাবে 'এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি'— কথাটির অর্থ দাঁড়াবে, আমি কখনো অবিশ্বাসী মানুষকে অবিশ্বাসী জ্বিনের হাতে এবং কখনো অবিশ্বাসী জ্বিনকে অবিশ্বাসী মানুষের হাতে ন্যস্ত করি।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে আবু সালেহ্ সূত্রে কালাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটির তাফসীর হবে এ রকম— যখন আল্লাহ্‌পাক কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন উত্তম ব্যক্তিবর্গকে তাদের পরিচালক নির্ধারণ করেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন খারাপ লোকদেরকে বানিয়ে দেন তাদের পরিচালক। এই ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ

রকম— আমি এক অত্যাচারী দলকে অন্য অত্যাচারী দলের উপর প্রবল করে দেই এবং এভাবে একদলের দ্বারা অন্য দলকে পর্যুদস্ত করি। এক বর্ণনায় এসেছে, যে জালেমকে সাহায্য করে, আল্লাহ্‌পাক তার উপর জালেমকে প্রবল করে দেন।

এই ব্যাখ্যাটির সপক্ষে হজরত আলীর একটি উক্তিও উপস্থাপন করা যায়। হজরত সা'সা বিন সুহান থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে মুলযমের তরবারীর আঘাতে আহত হজরত আলী যখন শাহাদাতের দ্বারপ্রান্তে, তখন জনতা আবেদন জানালো— হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদের জন্য পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করে দিন। হজরত আলী বললেন, যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের কল্যাণ চান, তবে পুণ্যবান পরিচালককে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিবেন। আল্লাহ্‌পাক আমাদের মঙ্গল চেয়েছিলেন বলেই হজরত আবু বকর কে আমাদের পরিচালক নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, জালেমদের দ্বারাই আল্লাহ্‌পাক মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তারপর শাস্তি দান করেন জালেমদেরকে।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৩০, ১৩১

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَ
يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○ ذٰلِكَ اَنْ
لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ○

❐ আমি উহাদিগকে বলিব, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদিগের মধ্য হইতে কি রসূলগণ তোমাদিগের নিকট আসে নাই যাহারা আমার নিদর্শন তোমাদিগের নিকট বিবৃত করিত এবং তোমাদিগকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে 'আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করিলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল ইহাও উহারা স্বীকার করিবে,

❐ ইহা এই হেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত তখন কোন জনপদকে উহাদের অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

এ বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত যে, মানুষের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসুল নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু জ্বিনদের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে

তাদের মধ্য থেকে নবী ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো কিনা— সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জুহাক বলেছেন, অবশ্যই জ্বিনদের মধ্যে নবী ও রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো। উপরে উদ্ধৃত আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, দ্যাখো, আল্লাহ্পাক স্বয়ং এখানে বলেছেন—'ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইনসি আলাম ইয়া'তিকুম রসুলুম মিনকুম' (আমি তাদেরকে বলবো, হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি রসুলগণ তোমাদের নিকট আসেনি)।

কালাবী বলেছেন, শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মহা আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের জন্য মানুষকে এবং জ্বিনদের জন্য জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হতো। আর শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স.ই মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের রসুল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন।

মুজাহিদ বলেছেন, আগের যুগে মানুষের জন্য ছিলো মানুষ নবী। আর জ্বিনদের জন্য ছিলো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ওয়ালাও ইলা ক্বওমিহি মুনজিরিন (আর যদি তার কওমের প্রতি কোন ভীতিপ্রদর্শনকারী থাকে)। এখানে 'ভীতি প্রদর্শনকারী' কথাটির অর্থ— নবী বা রসুলের প্রতিনিধি। সমসাময়িক নবী-রসুলগণের প্রতিনিধি বা দূত হিসেবে কোনো কোনো জ্বিন তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ভয়প্রদর্শনকারীরূপে নিযুক্ত হতেন। তাঁরা নবী রসুলগণের পক্ষ থেকে সত্যধর্মের বাণী প্রচার করতেন। আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করতেন। তাঁরা নবী ছিলেন না। ছিলেন নবীর প্রতিনিধি বা দূত। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) কথাটির অর্থ হবে— কেবল মানুষের মধ্য থেকে। অর্থাৎ নবী কেবল মানুষের মধ্য থেকেই হয়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে—'ইউখরিজু মিনহুমাল্ লু'লু ওয়াল মারজান' (সেখান থেকে উত্তোলিত হয় লু'লু এবং মারজান প্রস্তর)। এখানে হুমা (সে দু'টি থেকে) সর্বনামটি দ্বিবচন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য একটি। অর্থাৎ লবনাক্ত সমুদ্র থেকে মোতি এবং লু'লু (মূল্যবান পাথর বিশেষ) বের করেন। অন্য এক আয়াতে রয়েছে—'ওয়া জাআলাল ক্বমারা ফিহিন্না..... (আর সেগুলোতে আমি চন্দ্রকে করে দিয়েছি ....)। এখানকার 'হিন্না' (সেগুলোতে) শব্দটি বহুবচন হলেও এর উদ্দেশ্য বা অর্থ একবচন। কেননা চাঁদ তো একটি আকাশেই আছে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ ও জ্বিন— সকলের পথ প্রদর্শনের জন্য নবী ও রসুল পাঠানো হয়েছিলো। ওই নবী-রসুলগণ অধিকাংশই ছিলেন মানুষ। আবার কেউ কেউ ছিলেন জ্বিন।

মানুষের জন্য মানুষ নবী এবং জ্বিনদের জন্য জ্বিন নবী তখন সত্যধর্ম প্রচার করতেন। এক আয়াতে বলা হয়েছে— যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাদের জনপদ থাকতো, তবে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোনো ফেরেশতাকে (রসুল করে) পাঠানো হতো। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, জ্বিনদের হেদায়েতের জন্য জ্বিনকেই রসুল করে পাঠানো হয়েছিলো। কারণ রসুল এবং রসুলের অনুসারীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত এবং স্বভাবগত সম্পর্ক থাকতেই হয়। তাছাড়া মানুষের মতো জ্বিনেরাও বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে হজরত আদমের পূর্বে। আর বিবেকবান বলেই তাদের প্রতি আল্লাহ্পাকের আদেশ ও নিষেধ প্রযোজ্য। সুতরাং মানুষ নবী সৃষ্টির পূর্বে তাদের হেদায়েতের জন্য নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো জ্বিনকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হতো। এক আয়াতে বলা হয়েছে— আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো। এতে করে বুঝা যায়, মানুষের মতো জ্বিনদের জন্য রসুল প্রেরণের প্রচলন ছিলো। নতুবা তাদের শাস্তির কথা উঠতো না। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— রসুল প্রেরণ ব্যতিরেকে আমি কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।

হিন্দুস্তানে হিন্দু জ্বিনেরা অবতার বলে পরিচিত। পৌরাণিক পুস্তকগুলোতে দেখা যায়, ধর্মপ্রচারকরূপে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেও কেউ কেউ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরাই ছিলেন ভারতবাসীদের কথিত পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত অবতার। আর তারা ছিলেন জ্বিন। জ্বিনদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মানুষেরাও হয়তো তাঁদের মাধ্যমে কিছু উপকার লাভ করেছিলো। আর সেগুলোকে ভিত্তি করেই দেখা দিয়েছিলো শতসহস্র বিকৃতি ও বিচ্যুতি। আর সে কারণেই হয়তো আল্লাহ্পাক পরবর্তী সময়ে জ্বিনদের নবী হওয়ার প্রথাটি বিলুপ্ত করে দিয়েছেন।

নবী রসুলগণের দায়িত্ব ছিলো— আল্লাহ্পাকের নিদর্শন প্রদর্শন এবং মানুষকে সতর্ককরণ। তাই এরপর বলা হয়েছে— যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করতো এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো।

এখানে 'এই দিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিন সত্যকথা বলা ছাড়া অবিশ্বাসীদের আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— তারা বলবে 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, আজ এই কিয়ামতের দিন সত্যসাক্ষ্য দেয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। তাই স্ববিরোধী হলেও স্বীকার করছি, আমরা অপরাধী। যথাসময়ে নবী ও রসুলগণ আমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে আহবান আমরা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। মুকাতিল বলেছেন, কিয়ামতের দিন বাকরুদ্ধ অবিশ্বাসীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ রকম সাক্ষ্যদান করবে।

শেষে বলা হয়েছে— বস্তুতঃ পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিলো, আর তারা যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিলো তাও তারা স্বীকার করবে না। এ কথার অর্থ —তারা হয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর প্রতি অতিরিক্ত মোহগ্রস্ত। সেখানে সত্য ও মিথ্যার প্রসঙ্গ ছিলো তাদের নিকট গুরুত্বহীন। পার্থিব জীবন যে প্রতারক— সে কথা তারা বুঝতে পারেনি। নবী ও রসুলগণ সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্দেশনাকেও তারা সেখানে আমল দেয়নি।

পরের আয়াতে (১৩১) বলা হয়েছে— এটা এই হেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত তখন কোনো জনপদকে তার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়। এই আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত 'জালিকা' (এটা) শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল প্রেরণের প্রতি। এর পরের শব্দ 'আন' (যে) এখানে ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত। অথবা আন এখানে সহজ অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অভিজাত সর্বনাম রূপ এখানে উহ্য। 'মুহ্লিকুল ক্বোরা' কথাটির অর্থ— জনপদ ধ্বংস কারী। আর 'গফিলুন' শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— যাদেরকে নবী প্রেরণপূর্বক সতর্ক করা হয়নি। 'বি জুলমিন' শব্দটি বর্তমান অবস্থা প্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক অত্যাচার করে কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দেন না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, কোনো জনপদকে আল্লাহ্পাক ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার করে ধ্বংস করে দেন না, যতক্ষণ না তাদের প্রতি প্রেরিত হয় নবী ও রসুল।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩২,১৩৩,১৩৪,১৩৫

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ
كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ○ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

❒ প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

❒ তোমার প্রতিপালক অভাব মুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদিগের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন,— যেমন তোমাদিগকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

❒ তোমাদিগের নিকট যাহা ঘোষণা করা হইতেছে উহা বাস্তবায়িত হইবেই; তোমরা তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

❒ বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহা করিতেছ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কাহার পরিণাম মঙ্গলময় এবং জালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— ওয়া লিকুল্লি দারাজাতুম্ মিম্মা আ'মিলু (প্রত্যেকে যা করে তদানুসারে তার স্থান রয়েছে)। এ কথার অর্থ— প্রত্যেকের অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার আমলের ভিত্তিতে। তাই কেউ কেউ হয় বিশেষ ও অশেষ পুণ্য ও মর্যাদার অধিকারী। হয় আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন। আবার কেউ কেউ হয় আল্লাহ্পাকের রহমত থেকে চিরবঞ্চিত ও কঠোর শাস্তির উপযোগী। আল্লাহ্তায়ালা সকলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'ওয়ামা রব্বুকা বিগফিলিন আম্মা ইয়া'মালুন' (এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন)।

পরের আয়াতে (১৩৩) বলা হয়েছে—'ওয়া রব্বুকাল গনিয়্যু জুর্রহমাতি' (তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দাসদের উপর আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরিয়তের ভার অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে তাঁর অভাব মোচন অথবা উপকার প্রাপ্তির কোনো উদ্দেশ্য নেই। কারণ তিনি গনি (অভাবমুক্ত)। আর তিনি দয়াশীলও। তাই তিনি দয়া করে তাঁর প্রিয় রসুলগণের মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত শরিয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব দানের উদ্দেশ্য— মানুষ ও জ্বিন যেনো এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উপকৃত হয়, পূর্ণতা লাভ করে। পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিদান না করা তাঁর দয়াশীলতার একটি অনন্য নিদর্শন। পাপিষ্ঠদেরকে তিনি অবকাশ দান করেন। দেন তওবা ও সংশোধনের সুযোগ।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন— যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! আল্লাহ্পাক ইচ্ছে করলে তোমাদের পাপাচারের কারণে

তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আর তোমরা ধ্বংস হয়ে গেলে আল্লাহ্তায়ালার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র, মুক্ত। আবার ইচ্ছে করলে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে সরিয়ে তদস্থলে অন্য কাউকেও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। এখানে অন্য কাউকেও অর্থ— যে বা যারা অনুগত, তাদেরকে। আর আল্লাহ্তায়ালা এ রকম করেছেনও। যেমন— ইতোপূর্বে তো তোমাদের অস্তিত্বই ছিলো না। অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ্তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। আর দ্যাখো, এখনও তিনি তোমাদেরকে সংশোধনের অবকাশ দিয়েই চলেছেন। দয়া করে এখনও টিকিয়ে রেখেছেন তোমাদের অস্তিত্ব।

এর পরের আয়াতে (১৩৪) বলা হয়েছে—'তোমাদের নিকট যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই; তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! কিয়ামত, হাশর, হিসাব, সওয়াব, আযাব ইত্যাদি সম্পর্কে আমার রসুল তোমাদের নিকট যে কথাগুলো বলে চলেছেন, সেগুলো সংঘটিত হবেই। এগুলো ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা তোমাদের নেই। সুতরাং তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো, তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন— যদি না তোমরা সংশোধিত হও।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১৩৫) বলা হয়েছে— বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছো করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! ঠিক আছে। আমার কথার প্রতি তোমরা যখন কর্ণপাত মাত্র করছো না, তখন তোমরা তোমাদের ভ্রষ্টতার উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো। এখানে 'মাকানাতিকুম' কথাটির অর্থ— যা করছো করতে থাকো। 'মাকানাতুন' এখানে শব্দমূল। কথাটির অর্থ— কোনো কিছুর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। অর্থাৎ যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য আছে ততটুকু করা। অথবা কথাটি এখানে ইসমে জরফ (অধিকরণার্থক বিশেষ্য)। অর্থাৎ এর দ্বারা পরোক্ষ অবস্থা বুঝানো হয়েছে। কাউকে তার স্বঅবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ করলে বলা হয়— 'আ'লা মাকানাতিকুম' (স্বস্থানে অটল থাকো)। অর্থাৎ যে অবস্থায় আছো, সে অবস্থায় থেকে আপন কর্ম করে যাও (যা করছো করতে থাকো)। এ কথা বলে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। যেনো বলা হয়েছে— ঠিক আছে হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা যখন সত্যকে গ্রহণ করবেই না, তখন সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্যের প্রতি শত্রুতার নীতিতেই অটল থাকো (কিন্তু জেনে রেখো, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ)।

'ইন্নি আ'মিলুন' কথাটির অর্থ— আমিও আমার কাজ করে যাচ্ছি। আমি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট রসুল। তাই আমার কাজ ধর্মনিষ্ঠ হওয়া। সত্যের উপর অনড় থাকা। আর আমি এ কাজই করে চলেছি।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময় এবং জালেমগণ কখনো সফলকাম হবে না।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন আমাদের সকলকে আপনাপন কর্মের জবাবদিহির জন্য শেষ বিচারের ময়দানে হাজির হতে হবে। তখন তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাবে, কে সফল এবং কে অসফল। আর এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যারা আত্মঅত্যাচারী— অভাবমুক্ত ও দয়াশীল আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যের উপাসনায় মগ্ন, তারা কখনই সফলতার মুখ দেখবে না।

বাগবী বলেছেন, অংশীবাদীদের নিয়ম ছিলো এ রকম— তারা তাদের ক্ষেত ও বাগানের ফসল ও ফল, গৃহপালিত পশুর শাবক এবং অন্যান্য সম্পদের একাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং অপরাংশ তাদের দেবদেবীর জন্য জমা রাখতো। আল্লাহ্‌র অংশ থেকে ব্যয় করতো অতিথি ও দরিদ্রদের জন্য। আর চাকর বাকরদের জন্য খরচ করতো দেব-দেবীর অংশ থেকে। আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কিছু অংশ দেব-দেবীদের অংশের সঙ্গে মিশে গেলে তারা তার পরোয়া করতো না। কিন্তু দেব-দেবীর অংশ থেকে আল্লাহ্‌র অংশে কিছু অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আলাদা করে ফেলতো। বলতো, আল্লাহ্ তো সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত। কিন্তু দেব-দেবীরা অনেক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। আরো অনেক অদ্ভুত নিয়ম ছিলো তাদের। যেমন— আল্লাহ্‌র অংশের কোনো সামগ্রী বিনষ্ট হলে অথবা কম হয়ে গেলে, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপই করতো না। কিন্তু দেব-দেবীর অংশের কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে অথবা কম হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করে দিতো। তাদের এসকল বিচার-বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াতগুলো।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৩৬

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

❐ আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহের জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহের জন্য এবং ইহা আমাদিগের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহের কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহের অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে পৌঁছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট!

অংশীবাদীরা তাদের স্বধারণার অনুগামী। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের তোয়াক্কা তারা করেই না। তাই আয়াতের শুরুতেই তাদের অপআচরণের বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্য থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্য।

পরের বিবরণটি এ রকম— যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছায় না এবং যা আল্লাহ্র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট! এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র অংশে ঘাটতি দেখা দিলে দেব-দেবীদের অংশ থেকে তা পূরণের চেষ্টা করে না। অথচ দেব-দেবীর অংশে টান পড়লে আল্লাহ্র অংশ থেকে তা পূরণ করে দেয়। এ রকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্পাকই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। শস্য ও গবাদি পশুও তিনি সৃষ্টি করেছেন। অথচ নির্বোধ অংশীবাদীরা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে মহান ও একক স্রষ্টা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে অংশী (শরীক) নির্ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, নিষ্প্রাণ প্রতিমাগুলোকে অধিকতর গুরুত্ব দানও করেছে। তাই সেগুলোর অংশের ঘাটতি তারা পূরণ করে আল্লাহ্র অংশ থেকে। অথচ আল্লাহ্র অংশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা মাত্র করে না। প্রতিমার অংশ থেকে তো করেই না।

কাতাদা বলেছেন, অভাব-অনটন দেখা দিলে মুশরিকেরা আল্লাহ্র অংশের খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করতো। কিন্তু তাদের দেব-দেবীদের অংশের খাদ্য স্পর্শ করতো না। (কতই না ঘৃণ্য তাদের নির্ধারণ এবং মীমাংসা)।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩৭

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

❒ এইরূপে তাহাদিগের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদিগের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

আগের আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা এই আয়াতেও প্রবহমান। আগের আয়াতে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ্ এবং দেব-দেবীগুলোর মধ্যে শস্য ও গবাদি পশুর অংশীবাদী রীতির কথা। ওই অপবিত্র রীতিটি ছিলো তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত শোভন। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাও যে শোভন— সেকথা বলা হয়েছে। আয়াতের বক্তব্য শুরু হয়েছে এভাবে—'এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।' আগের আয়াতের যোগসূত্র রক্ষার জন্য এই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— এরূপে (ওয়া কাজালিকা)। এখানে সন্তান হত্যা অর্থ শিশু সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া। অথবা দেবতার নামে উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করা। এই নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ কর্মটিও তাদের দৃষ্টিতে ছিলো শোভন। আয়াতে বলা হয়েছে— তাদের দেবতারাই তাদের অনেকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'শুরাকায়ুহুম' (দেবতাগণ) অর্থ— শয়তান। অর্থাৎ শয়তানই তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণাদানের মাধ্যমে এ ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলো যে, শিশু সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে না ফেললে তোমরা অভাব অনটনে পড়ে যাবে। এখানে শয়তানকে 'শুরাকা' বলার কারণ এই যে— অংশীবাদীরা আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতিরেকেই শয়তানের কুমন্ত্রণাকে অত্যাবশ্যক আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করে নিয়েছে। শয়তানই তাদের আসল দেবতা।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'শুরাকা' অর্থ দেব-দেবীদের সেবক বা প্রতিনিধি— যারা অংশীবাদীদেরকে সন্তান হত্যায় উদ্বুদ্ধ করতো। তাদের অনুপ্রেরণাতেই অংশীবাদীরা মানত করতো এভাবে — এ রকম সন্তান হলে আমরা দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গ করবো (মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করবো)। দেব-দেবীদের সন্তুষ্টিই ছিলো অংশীবাদীদের মূল উদ্দেশ্য। তাই এ রকম নির্মম হত্যাকাণ্ডও ছিলো তাদের চোখে সুন্দর। এখানে 'লিইউরদুহুম' (শোভন করেছে) কথাটির অর্থ— সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য। আর 'ওয়া লিইয়ালবিসু আ'লাইহিম দিনুহুম' অর্থ— এবং তাদের সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। এ কথার অর্থ— হজরত ইসমাইলের যে ধর্মাদর্শের উপর তারা ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেই ধর্ম সম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য (তাদের দেবতারা তাদের অনেকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'দিনুহুম' (ধর্ম সম্বন্ধে) কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে দ্বীন ইসলামকে। অথবা এখানে 'দিনুহুম' কথাটির উদ্দেশ্য ওই দ্বীন বা আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব (তৌহিদ) নির্ভর ধর্ম— যাকে মান্য করা অংশীবাদীদের জন্য ছিলো অত্যাবশ্যক।

এখানে 'লিইউরদু' এবং 'লিইয়ালবিসু' শব্দ দু'টিতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি কারণ সূচক। আর যদি অংশীবাদীদের কাজের মূল কর্তা শয়তানকে ধরা হয় এবং দেবমন্দিরের সেবকদেরকে ধরা হয় সর্বনাম, তবে এখানে 'লাম' অক্ষরটি হবে কর্মের পরিণতি প্রকাশক।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এ রকম করতো না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও। এ কথার অর্থ, চিরঅবিশ্বাসী ও চির হতভাগ্য অংশীবাদীদের হেদায়েত আল্লাহ্তায়ালার কাম্য নয়। একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার কারণে হেদায়েত লাভের যোগ্যতাকে তারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলেছে। তাই সকল কিছুর উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্পাক তাদেরকে জোর করে হেদায়েত দান করবেন না। সুতরাং হে আমার প্রিয় রসুল! বৃথা আক্ষেপ করবেন না। তাদেরকে তাদের মিথ্যা ধারণা ও কর্ম নিয়েই জীবনপাত করতে দিন।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৩৮

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

❒ তাহারা তাহাদিগের ধারণা অনুসারে বলে 'এই সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ এই সব আহার করিতে পারিবে না,' এবং কতক গবাদি পশু রহিয়াছে যাহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ এবং কতক পশু আছে যাহাদিগকে জবাই করিবার সময় তাহারা আল্লাহের নাম লয় না। এই সমস্তই তাহারা বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে; তাহাদিগের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে দিবেন।

'ওয়াক্বালু হাজিহি' অর্থ— তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে। 'আনআ'মুঁ ওয়া হার্ছুন হিজরুন' অর্থ— এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র হারাম। 'হিজরুন' (নিষিদ্ধ) এখানে শব্দমূল। একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ— সকল ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আন্আ'ম (পশু) শব্দটির উদ্দেশ্য— ওই সকল পশু, যেগুলোকে মুশরিকেরা তাদের দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গ করে। ওই সকল পশুকে তারা বলে— বাহিরা, সায়েবা, ওসিলা এবং হাম।

‘লা ইয়াত্আ’মুহা ইল্লা মান্ নাশায়ু বিযা’মিহিম’ অর্থ— আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া অন্য কেউ এসব আহার করতে পারবে না। অর্থাৎ মহিলারা এসকল পশুর গোশত খেতে পারবে না। খেতে পারবে কেবল পুরুষ এবং দেবদেবীর সেবকেরা। এখানে ‘বিযা’মিহিম’ কথাটির উদ্দেশ্য— বিনা প্রমাণে মুশরিকেরা এ রকম হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে। আল্লাহ্র নির্দেশের তোয়াক্কা করে না।

‘ওয়া আ’নআমুন হুর্রিমাত জুহুরুহা’ অর্থ— এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যেগুলোর পিঠে আরোহণ করা নিষিদ্ধ। ওই পশুগুলো হচ্ছে বাহিরা, সায়েবা এবং হাম।

‘ওয়া আ’নআমুল্লা ইয়াজকুরুনাস্মাল্লহি আ’লাইহা অর্থ— এবং কতক পশু রয়েছে যেগুলোকে জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না। অর্থাৎ ওই সকল উৎসর্গীকৃত পশু জবাই করার সময় মুশরিকেরা তাদের দেব দেবীদের নাম নিয়ে জবাই করে। আল্লাহ্র নাম নেয় না। আবু ওয়ায়েল বলেছেন, এখানে আল্লাহ্র নাম নেয় না অর্থ— আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম করে না। কেননা অংশীবাদীতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও যে কোনো শুভ কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ছিলো তখনকার একটি সাধারণ প্রথা। সুতরাং এখানে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হবে এ রকম— তারা ওই পশুর উপর আরোহণ করে হজে গমন করে না। অথবা অন্য কোনো পুণ্যকর্মের প্রতি ধাবিত হয় না।

‘ইফ্তিরাআন আ’লাইহি’ অর্থ— এ সমস্তই তারা বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্যে। এখানে ‘ইফ্তারা আন’ (অপবাদ) শব্দটি কর্মকারক। অথবা অবস্থাজ্ঞাপক। এখানে ‘আ’লাইহি’ (তার উপর) শব্দটির যোগসূত্র রয়েছে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত ‘ক্বলু’ (তারা বলে) শব্দটির সঙ্গে। অথবা এর সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— তারা এ রকম বলে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার অভিপ্রায়ে। কিংবা ‘ইফ্তারা আন’ শব্দটি এখানে ‘মাফউলে লাহু’ (কারণবাচক কর্ম) — যার কারণ হচ্ছে ক্বওল বা উক্তি। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার কারণে এ রকম বলে।

শেষে বলা হয়েছে— ‘সাইয়াজ্যিহিম বিমা কানু ইয়াফ্তারুন’ (তাদের এই মিথ্যা রটনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাদেরকে দিবেন)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে অথবা তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রটনার প্রতিফল (শাস্তি) সত্বর তিনি তাদেরকে অবশ্যই দিবেন।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ
وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

❒ তাহারা আরও বলে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদিগের পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদিগের স্ত্রীদিগের জন্য অবৈধ, আর উহা যদি মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সকলে উহাতে অংশীদার, তাহাদিগের এইরূপ বলিবার প্রতিফল তিনি তাহাদিগকে দিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

❒ যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশতঃ নিজদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না।

হারাম হালাল নির্ধারণের অধিকার যে কেবল আল্লাহ্‌র— অংশীবাদীরা সে কথা মানে না। তারা নিজেরাই ইচ্ছামত হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে নেয়। তাদের এ রকম দলিল প্রমাণহীন নির্ধারণের আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে। বলা হয়েছে— 'ওয়া ক্বালু মা ফি বুতুনি হাজিহিল আনআ'মি খলিসাতুল্ লিজুকুরিনা ওয়া মুহার্‌রমুন আ'লা আযওয়াজিনা ওয়া ইঁয়্যাকুম্ মাইতাতান ফাহুম ফিহি শুরাকাউ' (তারা আরো বলে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এটা আমাদের স্ত্রীদিগের জন্য অবৈধ, আর তা যদি মৃত হয় তবে নারী পুরুষ সকলে তাতে অংশীদার)। এখানে 'এই সব গবাদি পশুর গর্ভে' অর্থ— বাহিরা ও সায়েবার গর্ভে। দেব-দেবীদের জন্য নিবেদিত এসকল পশুর গর্ভের জীবিত বাচ্চার গোশত কেবল পুরুষেরা খেতে পারবে— আর বাচ্চা মৃত হলে তার গোশত খেতে পারবে নারী পুরুষ সকলেই— এটাই ছিলো অংশীবাদীদের নিজস্ব তৈরী বিধান। জীবিত শাবক বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে খলিফাতুন শব্দটি। এর শেষ অক্ষর 'তা' একটি গুরুত্বপ্রকাশক অক্ষর। অথবা মুবালিগাহ্ (আধিক্য প্রকাশক)।

ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, 'খলিসুন' এবং 'খলিসাতুন' শব্দ দু'টো সমার্থক। অর্থাৎ 'তা' অক্ষরটি এখানে তাকিদ বা মুবালিগা কোনোটাই নয়। ব্যাকরণজ্ঞ ফাররা বলেছেন, 'তা' অক্ষরটি এখানে স্ত্রীলিঙ্গকে নির্দেশ করেছে। কেননা 'আনআম' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এখানে তাই পেটের বাচ্চাকেও স্ত্রীলিঙ্গ ধরতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, 'মা ফি বুতুনিহা' (গর্ভে যা আছে) কথাটি 'খলিসাতুন' শব্দটির মাধ্যমে এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিরা ও সায়েবার গর্ভজাত জীবিত মাদী শাবক পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট বা হালাল (খলিসাতুন)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তাদের এ রকম কথার প্রতিফল তিনি তাদেরকে দিবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা এই যে স্বরচিত হালাল হারামের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সম্পৃক্ত করেছে (বলেছে, এই হালাল হারামের বিধান আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন)— এর জন্য শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত শাস্তি প্রজ্ঞাময়তা-মিশ্রিত। কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তাই অংশীবাদীদের উদ্দেশ্য, ধারণা ও কর্মকাণ্ডের সকল সংবাদ তাঁর জানা।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে— 'যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ এবং অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিলো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকই সকল সৃষ্টির একমাত্র রিজিক দাতা। অথচ অংশীবাদীরা মনে করলো সন্তান লালন পালন করতে গেলে তাদের অর্থ সম্পদ কমে যাবে। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। এসকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয় নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা। আর নিজে নিজে হালাল হারাম নির্ধারণ করে তা আল্লাহ্‌র নামে চালিয়ে দেয়াও আর একটি গর্হিত কর্ম। এসব যারা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় তো কি? তারা অবশ্যই বিপথগামী। আর তারা আগে থেকেই ছিলো সত্যপথ বিচ্যুত। বাগবী বলেছেন, রবিয়া, মোজার ও অন্যান্য আরব গোত্র অভাব অনটনের আশংকায় কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিতো। কিন্তু কেনানা সম্প্রদায় এ রকম করতো না। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

❒ তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, জায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন — ইহারা একে অন্যের সদৃশ ও, বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার দেয় প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদিগকে পছন্দ করেন না।

❒ গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহা জীবিকারূপে তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু;

'ওয়া হুওয়াল্লাজি আন্শাআ জান্নাতিম্ মা'রুশাতিঁউ ওয়া গইরা মা'রুশাতিন (তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছেন)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে উল্লেখিত মা'রুশাতিন্ (লতা) শব্দটির অর্থ— ওই লতা, যা মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে— যেগুলোকে মাচার উপর বিছিয়ে দেয়া হয়। যেমন— লাউ, আঙ্গুর খরবুজা ইত্যাদি। আর গইরা মা'রুশাতিন অর্থ— ওই সকল বৃক্ষ, যেগুলো শক্ত কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং শাখা বিস্তার করে। যেমন— খেজুর, যব, গম ইত্যাদি। জুহাক বলেছেন মা'রুশাত এবং গইরি মা'রুশাত— দু'টোরই উদ্দেশ্য এখানে আঙ্গুরের লতা। প্রথমোক্তটির অর্থ— ওই লতা, মানুষ যেগুলোকে মাচার উপর উঠিয়ে দেয়। আর শেষোক্তটির অর্থ— ওই বুনো লতা যেগুলো জংগলে বা পাহাড়ে আপনা আপনি গজিয়ে উঠে।

ওয়ান্নাখ্লা ওয়ায্ যারআ' মুখতালিফান উকুলুহু' (এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য শস্য)। এখানে উকুলুন শব্দটির অর্থ ফল। ওই ফল, যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদবিশিষ্ট। 'উকুলুহু' শব্দটির 'হু' সর্বনাম এখানে আয্যারআ' (বৃক্ষ-উদ্যান সমূহ) এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অথবা আন্নাখ্লার প্রতি। এখানে খেজুর বৃক্ষকে বৃক্ষ-উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা বৃক্ষ -

উদ্যানের সঙ্গে রয়েছে খেজুর বৃক্ষের সম্পর্ক বা সংযোগ। তেমনি ভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শস্যের সংগেও রয়েছে উদ্যানের সংযোগ। খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি হলেই সঙ্গে সঙ্গে তাতে ফল ধরে না। কিন্তু এখানে উল্লেখিত হয়েছে 'খেজুর বৃক্ষ'। এ রকম উল্লেখ হচ্ছে হাল এ মুকাদ্দারাহ্ (পরিমাণের অবস্থা প্রকাশক)।

'ওয়ায্যাইতুনা ওয়ার্ রুম্মানা মুতাশাবিহাঁও ওয়াগইরা মুতাশাবিহিন' (যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন— এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও)। এ কথার অর্থ— যায়তুন ও আঙ্গুরের রয়েছে অনেক আকার ও প্রকার। কোনো কোনোটির মধ্যে রয়েছে মিল। আবার কোনো কোনোটির মধ্যে রয়েছে অমিল।

'কুলু মিনছামারিহি ইজা আছমারা' (যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে)। এ কথার অর্থ— বর্ণিত ফল ফলাদি তোমরা পূর্ণরূপে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেও ভক্ষণ করতে পারবে। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, শরিয়তের হক আদায়ের পূর্বে বৃক্ষের মালিক তার বৃক্ষজাত ফল ভক্ষণ করতে পারবে।

'ওয়া আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হাসাদিহি' (আর ফসল তুলবার দিনে তার দেয় প্রদান করবে)। এখানে 'হাসাদিহি' শব্দটিকে 'হিসাদিহি' পড়লেও অর্থান্তর ঘটবে না। কারণ দু'টো শব্দই সমার্থক। এ রকম দু'রকম উচ্চারণ বিশিষ্ট সমার্থক শব্দের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— সারামা এবং সিরামা, জাযারুন এবং জিযারুন। এখানে 'হক্ক' অর্থ দেয়। এই দেয় কি রকম এবং তা কিভাবে প্রদান করতে হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে কিঞ্চিত মতভেদ রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, তাউস, হাসান, জাবের ইবনে জায়েদ এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের মতে— এখানে দেয় অর্থ জাকাত বা ওশর। দশ ভাগের এক ভাগ। অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহ্পাকের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। আর এখানকার 'তার দেয় প্রদান করবে'— নির্দেশটি একটি সাধারণ নির্দেশ। সুতরাং সকলের জন্য এই নির্দেশটি অবশ্য পালনীয়। এদিকে আবার আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, সম্পদের জাকাত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার দেয় ওয়াজিব নয় (কিন্তু জাকাত সর্ব সাধারণের উপর প্রযোজ্য নয়)।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত তালহা বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তিনি স. তাকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ, রমজানের রোজা এবং জাকাতের কথা জানালেন। লোকটি বললো, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো কিছু কি আমার জন্য অবশ্য পালনীয়? তিনি বললেন, না। তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় (অতিরিক্ত ইবাদত, দান অথবা অন্য কোনো পুণ্যকর্ম) করো তবে তা হবে উত্তম। এই হাদিসের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে বুঝা যায়। আর এখানে রয়েছে ইমাম আবু হানিফার একটি অভিমতের প্রমাণ। তিনি বলেছেন, আনার জাতীয় ফলের জাকাত ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওয়াজিব নয়।

তাঁদের মতে জাকাত ওয়াজিব হয় কেবল অপরিহার্য খাদ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। সুরা বাকারায় রয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি, তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো। এই আয়াতের তাফসীরে জাকাতের বিস্তারিত মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

ইমাম জয়নাল আবেদীন, আতা, মুজাহিদ এবং হাম্মাদ বলেছেন, এখানে 'দেয় প্রদান করবে' অর্থ— জাকাত ছাড়া অন্য দেয় প্রদান করবে। কেননা আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর জাকাত ফরজ করা হয়েছে হিজরতের পর মদীনায়।

ইব্রাহিম বলেছেন, এখানে 'দেয় প্রদান করবে' অর্থ— উৎপন্ন ফলের একটি অংশ প্রদান করবে। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, এখানে 'দেয়' অর্থ ঝরে পড়া ছড়া। নুহাস্ তাঁর নাসেখ গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে 'দেয়' অর্থ ঝরে পড়া ছড়া। মুজাহিদ বলেছেন, খেজুর কর্তনের সময় তখনকার মানুষ খেজুরের একটি গুচ্ছ পথের পাশে টাঙ্গিয়ে রাখতো। পথিকেরা সেগুলো খেতো।

ইয়াযিদ বিন আসেম বর্ণনা করেছেন, লোকেরা খেজুর কাটার সময় এক কাঁদি খেজুর মসজিদের এক কোনায় ঝুলিয়ে রাখতো। দরিদ্র জনতা লাঠি দিয়ে ওই খেজুর পেড়ে খেতো।

হজরত ফাতেমা বিন্‌তে কায়েস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ধনীদের সম্পদের মধ্যে জাকাত ছাড়াও দরিদ্রদের কিছু অধিকার রয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত— তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাও, এতে কোনো কল্যাণ নেই। তিরমিজি, ইবনে মাজা, দারেমী। সুরা বাকারায় এই আয়াতের যথা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আর এখানে 'দেয়' অর্থ সকল দেয়— অবশ্য পালনীয় হোক অথবা ইচ্ছাধীন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এখানে উল্লেখিত 'দেয় প্রদান করবে' নির্দেশটি ছিলো একটি সাধারণ নির্দেশ, যা সকলকেই পালন করতে হতো। এরপর যখন ওশর ওয়াজিব করে দেয়া হলো তখন এই নির্দেশটি হয়ে গেলো রহিত।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে মুকসিম বর্ণনা করেছেন, কোরআন মজীদে উল্লেখিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সকল নির্দেশ জাকাত ফরজ হওয়ার পর রহিত হয়ে গিয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তুসরিফু ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মুসরিফীন' (এবং অপচয় করবে না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না)। ইসরাফ অর্থ অপচয়। শব্দটি মিতব্যয়ীতার বিপরীতার্থক। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমাতিক্রমকেই বলা হয় ইস্‌রাফ বা অপচয়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'ইসরাফ' অর্থ— সকল সম্পদ দান করে দেয়া। আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি ওই আয়াতের সমধর্মী যেখানে বলা হয়েছে— পরিপূর্ণরূপে হস্ত উন্মোচন কোরো না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস একবার তাঁর পাঁচ শত গাছের খেজুর দরিদ্র জনতাকে দান করে দিলেন। পরিবার পরিজনের জন্য কিছুই রাখলেন না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। ইবনে জুরাইজ থেকে ইবনে জারীরও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'অপচয় করবে না' কথাটির অর্থ— নিজের সকল সম্পদ দান করবে না, করলে দরিদ্র হয়ে যাবে।

আমি বলি, পরিবার পরিজনের যথাঅধিকার খর্ব করে দান করলে তা অবশ্যই অপচয় হবে। কিন্তু তাদের যথাপ্রাপ্য পরিশোধ করার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলে তা কিছুতেই অপচয় বলে গণ্য হবে না। বরং এ রকম করাই উত্তম। বলেছেন জুজায।

রসুল পাক স. এরশাদ করেছেন, উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আমার কাছে থাকলেও তা আমার জন্য আনন্দদায়ক নয়। আনন্দদায়ক হবে তখনই, যখন আমি তিন রাতের মধ্যেই ওগুলো দান করে দিতে পারবো। কাছে রাখবো কেবল ততটুকুই, যতটুকু রাখলে আমার ঋণ পরিশোধ হয়। বোখারী।

একবার যথা অনুমতি নিয়ে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের দরবারে প্রবেশ করলেন হজরত আবু জর। হজরত ওসমান তখন হজরত কা'বের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করছিলেন। তিনি বললেন, হে কা'ব! বলো, সদ্য প্রয়াত আবদুর রহমান ইবনে আউফের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? হজরত কা'ব বললেন, তিনি যদি আল্লাহ্‌র হক যথাপ্রতিপালন করে থাকেন, তবে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ নিষ্কলুষ। এ কথা শুনে হজরত আবু জর তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে হজরত কা'বকে প্রহার করলেন এবং বললেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি— পর্বত পরিমাণ স্বর্ণাধিকারী হলেও আমি তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে ফেলবো, আর আল্লাহ্ তা কবুল করে নেবেন। ওই সম্পদের ছয় আউকিয়াহ্ নিজের কাছে রেখে দেয়াও আমার পছন্দ নয়। হে ওসমান! তোমাকে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রসুল স. এর নিকট থেকে এই হাদিসটি স্বকর্ণে শোনোনি? প্রশ্নটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। হজরত ওসমান প্রতিবারেই বললেন— আমি শুনেছি।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে একবার রসুল স. দেখলেন, হজরত বেলালের নিকট রয়েছে প্রচুর খেজুর। তিনি স. বললেন, একি বেলাল? হজরত বেলাল বললেন, আমি এগুলোকে আগামীকালের জন্য রেখেছি। তিনি স. বললেন,

তোমার কি ভয় করে না? এই জমানো সম্পদের উত্তাপ দোজখের মধ্যেও তোমার দেহে অনুভূত হবে। হে বেলাল! নির্দ্বিধায় ব্যয় করতে থাকো। আরশাধিকারীর পক্ষ থেকে ন্যূনতার আশংকা কোরো না। বায়হাকী।

একবার হজরত আবু হোরায়রা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কোন্ দান সর্বোত্তম? তিনি স. বললেন, অনটনের সময় পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন থেকে যথাসম্ভব দান। এই দান তোমার পরিবার থেকেই শুরু কোরো। আবু দাউদ।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, 'অপচয় করবে না' কথাটির অর্থ— দান খয়রাত করা বন্ধ করবে না। অর্থাৎ অত্যাবশ্যক দান থেকে বিরত থাকবে না।

মুকাতিল বলেছেন, 'অপচয় করবেনা' অর্থ— ক্ষেতের ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর দানে দেব-দেবীদেরকে অংশী বানাবে না। জুহ্‌রী বলেছেন, অপচয় করবে না অর্থ— পাপ কাজে সম্পদ ব্যয় করবে না। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রতিপালন করতে কুণ্ঠিত হবে না— এ কথা বুঝাতেই এখানে বলা হয়েছে 'অপচয় করবে না।' আবু কুবাইস পাহাড়ের সমান সোনাও যদি কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সীমার মধ্যে ব্যয় করে, তবুও তাকে অপচয়কারী বলা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র আনুগত্য বহির্ভূত এক দিরহাম ব্যয় করলেও সে হয়ে যাবে অপচয়কারী। আয়াস বিন মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশের সীমা থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামই অপচয়।

ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু জায়েদ বলেছেন, বিচারকদেরকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে 'অপচয় করবে না'। বিচারকদের প্রতি আল্লাহ্‌পাকের এই নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেনো প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণ না করে। এই উক্তির প্রেক্ষিতে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে ওই হাদিসের অনুরূপ যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের নিকট থেকে উত্তম সামগ্রী গ্রহণ কোরো না।

পরের আয়াতে (১৪২) বলা হয়েছে— 'গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও ক্ষুদ্রাকার পশু রয়েছে। আল্লাহ্ যা জীবিকারূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' এখানে উল্লেখিত 'হামুলাতান' শব্দটির অর্থ— ভারবাহী পশু। যেমন, উট, ষাঁড় ইত্যাদি। 'ফারসান' অর্থ ক্ষুদ্রাকার পশু— যেগুলো ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় না। যেমন— ভেড়া, ছাগল, গো-শাবক, উষ্ট্র শাবক ইত্যাদি। 'কুলু' শব্দের অর্থ আহার করো। এই নির্দেশের মাধ্যমে জীবিকারূপে পশুর গোশত আহার বৈধ করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'মিম্মা' (মিন্‌মা) শব্দটির অন্তর্ভূত 'মিন' হচ্ছে আংশিক অর্থ প্রকাশক মিন (মিন্ এ তাবইজিয়াহ্)। কারণ আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত সকল জীবিকা ভক্ষণের সামর্থ্য তো কারোই নেই। বরং ভক্ষণ করবে অংশতঃ।

এখানে 'শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না' কথাটির অর্থ— শয়তানের পথে চোলো না। অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বোলো না।

সুরা আন্‌আ'ম ঃ আয়াত ১৪৩, ১৪৪

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۠

❐ এই পশুগুলি আট প্রকার ঃ মেষ হইতে দুইটি ও ছাগল হইতে দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কিংবা মাদি দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণ সহ আমাকে অবহিত কর।'

❐ এবং উট হইতে দুইটি ও গরু হইতে দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কিংবা মাদি দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ্ যখন এই সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহ্‌পাকই হালাল হারামের বিধান দানের একমাত্র অধিকারী। অথচ মুশরিকেরা নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করেছে। তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুর উদরে জন্ম নেয়া পশুকে পুরুষের জন্য হালাল এবং মেয়েদের জন্য হারাম নির্ধারণ করে নিয়েছে তারা। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ওই অপবিত্র ধারণার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে— এ পশুগুলো আট প্রকার ঃ মেষ থেকে দু'টো ও ছাগল

থেকে দু'টো; বলো নর দু'টোই কিংবা মাদি দু'টোই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দু'টোর গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত করো।' এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আপনি ওই অংশীবাদীদেরকে বলুন, বলো হে অবিবেচক জনতা! তোমাদের হালাল হারাম কবে কোথায় কে নির্ধারণ করলো? তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তবে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করে দেখাও— আল্লাহ্তায়ালা নর, মাদি পশু অথবা মাদি পশুর গর্ভজাত নর ও মাদি শাবকগুলোকে কখন হারাম করলেন?

পরের আয়াতে (১৪৪) বলা হয়েছে— 'এবং উট থেকে দু'টি ও গরু হতে দু'টি; বলো 'নর দু'টিই কিংবা মাদি দু'টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা মাদি দু'টির গর্ভে যা আছে তা'? আগের আয়াতে বলা হয়েছে, আট ধরনের পশু মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে। ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু— এই চার ধরনের নর মাদি মিলে হয় আট প্রকার। আগের আয়াতে ভেড়া ও ছাগলের নর ও মাদি মিলে চার এবং আলোচ্য আয়াতে উট ও গরুর নর মাদি মিলে চার— এভাবে দেয়া হয়েছে আট প্রকার হালাল পশুর বিবরণ। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, বলো হে বিভ্রান্ত জনতা! কোন প্রকার পশু আল্লাহ্পাক হারাম করেছেন— নর না মাদি? মাদির গর্ভেও তো নর ও মাদি উভয় প্রকার পশুর জন্ম হয়? তবে বলো, নর না মাদি— কোনটি তোমাদের জন্য হারাম? এই আয়াত অবতীর্ণ হলে আবুল আহওয়াস মালেক ইবনে আউফ জাশামী রসুল পাক স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, মোহাম্মদ! আমরা জানতে পারলাম তুমি নাকি আমাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করছো? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আট প্রকার পশুর গোশত ভক্ষণ এবং সেগুলো থেকে ভারবহন, আরোহন, চাষাবাদ ইত্যাদি উপকার গ্রহণ বৈধ করেছেন। অথচ তোমরা সেগুলোর কোনো কোনোটিকে কারো কারো জন্য হারাম করে দিয়েছো! বলো, কোনগুলো হারাম— নর না মাদি, না মাদি পশুর গর্ভজাত নর বা মাদি— না দু'টোই? রসুল স. এর এ কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলো মালেক ইবনে আউফ। সে এ কথা বলতে পারলো না যে, নর পশু হারাম। তাহলে তো সকল নর পশু সকলের জন্য হারাম হয়ে যায়। আর মাদির গর্ভে তো নর ও মাদি উভয় প্রকার পশুর জন্ম হয়। তাই সেগুলোর উপরেও তো হালাল হারামের বিধান সমভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

রসুলপাক স. এর প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারা জনতাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা পুনঃ নির্দেশ দিচ্ছেন— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ওই মূঢ় অংশীবাদীদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করুন, হে অবিমৃশ্য জনতা! তোমরা বলো, — 'আল্লাহ্ যখন এই সব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?'

অবশেষে এরশাদ হয়েছে—'সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' বলা বাহুল্য, মক্কাবাসী মুশরিকদেরকেই এখানে জালেম (অত্যাচারী) বলা হয়েছে— যারা ছিলো স্বরচিত হালাল হারামের অনুসারী। উমর বিন লুহাই ও তার অনুসারীরাই ছিলো এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। তাই বিশেষভাবে তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে— আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

প্রকৃত অর্থেই অংশীবাদীরা অত্যাচারী। তারা প্রকৃত বিশ্বাসের প্রতি আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আর্তিকে গলাটিপে মেরেছে। এই আত্মঅত্যাচারই প্রকৃত অত্যাচার। তারা আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ এককত্বকে অস্বীকার করেছে, অমান্য করেছে তাঁর প্রেরিত রসুলকে। নিজেরাই হালাল হারাম নির্ধারণ করে বলেছে— আল্লাহ্‌তায়ালাই এই হালাল হারাম নির্ধারণ করেছেন। অথচ তাদের এই অপধারণার পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। তারা মিথ্যাচারী, জালেম, সীমালংঘনকারী। আত্ম-অত্যাচারে প্রসন্ন। এ রকম সম্প্রদায় সৎপথপ্রাপ্তির অনুপযুক্ত। তাই আল্লাহ্‌পাকও এ রকম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

রসুল স. এর প্রশ্ন-শরে শরাহত নিরুত্তর অংশীবাদীরা এবার জানতে চাইলো— তাহলে আল্লাহ্ হারাম নির্ধারণ করেছেন কোনগুলোকে? তাদের এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ১৪৫

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَاعِمٍ یَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ یَّكُوْنَ مَیْتَةً اَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِیْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○

❐ বল, 'আমার প্রতি যে- প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছুই পাই না মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা, এইসব অপবিত্র— অথবা যাহা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম লওয়ার কারণে; তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালংঘন না করিয়া উহা গ্রহণে বাধ্য হইলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মুশরিকেরা তাদের ইচ্ছামতো বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুর গোশত কারো কারো জন্য হারাম করে দিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান তাদের ছিলো না। তাই এ বিষয়ে জ্ঞানদান করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে, হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছু পাই না; মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা এই সব অপবিত্র।' এখানে 'আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে' কথাটির মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রত্যাদেশ ছাড়া হারাম হালাল নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকই তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে হালাল হারাম নির্ধারণের একক অধিকর্তা। আর এখানে প্রত্যাদেশ বা ওহী অর্থ রসুলপাক স. এর প্রতি প্রদত্ত সকল ওহী। কেবল কোরআনই ওহী নয়। 'আজিদু' (আমি পাই) কথাটি এখানে অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, দু'টি কর্মপদের দাবিদার। একটি কর্ম হচ্ছে 'তোয়ামু' (খাদ্য)— যা এখানে অনুক্ত রয়েছে। আর একটি কর্ম হচ্ছে 'মুহাররামান' অর্থাৎ 'তার মধ্যে নিষিদ্ধ আমি কিছুই পাই না'। 'লোকে যা আহার করে'— সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে, এ কথাটির পূর্বে অর্থাৎ 'মুহার্‌রমান' এর পূর্বে 'তোয়ামান' (খাদ্য) কথাটি উহ্য রয়েছে ইসতিছনায়ে মুত্তাসিলকে (ব্যতিক্রমী সংযোজককে) সুসঙ্গত বা অর্থপূর্ণ করার নিমিত্তেই তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত— এখানে 'মাইতাতুন' অর্থ মড়া যা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অর্থাৎ কোনো মানুষ যাকে বধ করেনি। সুরা মায়িদায় অবশ্য আরো হারামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন— লাঠির আঘাতে, পাথরের আঘাতে, উপর থেকে পড়ে, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে এবং হিংস্র প্রাণী কর্তৃক বধকৃত পশুকেও হারাম বলা হয়েছে সেখানে। আর এখানে কেবল উল্লেখ করা হয়েছে 'মড়া'। অন্য আয়াতেও উল্লেখিত হারামগুলোর আংশিক অথবা সম্পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এ কথা তো সন্দেহাতীত যে, আল্লাহ্পাক কর্তৃক ঘোষিত সকল হারামই হারাম— কোরআন মজীদের যে স্থানেই সেগুলোর উল্লেখ থাক না কেনো।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে। ঘটনাটি হচ্ছে— একবার মুশরিকেরা রসুল স. কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, তুমি ও তোমার সঙ্গীসাথীরা যে পশুগুলোকে হত্যা করো এবং যেগুলোকে বধ করে শিকারী কুকুর ও শিকারী পাখি— সেগুলো হালাল। আর আল্লাহ্তায়ালা যেগুলোর মৃত্যু ঘটিয়েছেন, সেগুলোকে বলো হারাম। কেনো? এই বিশেষ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই এখানে বলা হয়েছে কেবল মড়া (স্বাভাবিকভাবে মৃত) হারাম।

বহমান রক্তও হারাম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে উল্লেখিত 'আও দামাম্ মাসফুহা' কথাটির অর্থ— বহমান রক্ত, যা পশু জবাইয়ের সময় পশুর ঘাড়ের শিরা থেকে নির্গত হয়। জবাইকৃত পশুর কলিজা ও শিরায় যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়— তা খাওয়া অবশ্য হারাম নয়। কারণ তা প্রবাহিত রক্ত নয়। যে রক্তকণিকা গোশতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য— তা খাওয়াও হালাল। কারণ সেগুলোও বহমান রক্ত নয়।

এরপর বলা হয়েছে শূকরের মাংস হারাম হওয়ার কথা। তারপর বলা হয়েছে—'কেননা, এই সব (মড়া, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস) অপবিত্র। এখানে অপবিত্রতাকে শূকরের মাংসের সঙ্গেই সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাই শূকরের সকল কিছুই হারাম। আর শূকরের কোনো অংশ থেকে উপকার লাভ করাও বৈধ নয়। এমনকি মৃত বা জীবিত কোনো শূকর ক্রয় বিক্রয়ও বৈধ নয়। শূকর থেকে কোনো প্রকার উপকার লাভ করা অবৈধ।

এরপর বলা হয়েছে— অথবা যা অবৈধ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে (আও ফিসক্বান উহিল্লা লি গইরিল্লাহি বিহি)। এখানে 'ফিসক্বান' (অবৈধ) শব্দটির সংযোগ রয়েছে খিনজিরের (শূকরের) সঙ্গে। আর 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম নেয়ার কারণে' (উহিল্লা লি গইরিল্লাহি বিহি) কথাটিই অবৈধ (ফিসক্বান) শব্দটির বিশেষণ। আগের বাক্যের 'এই সব অপবিত্র' (ফা ইন্নাহু রিজসুন) ঘোষণাটি তাই গইরুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের) নামে জবাই করা পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। ফিসক্বান শব্দটির প্রকৃত অর্থ তাই ঘৃণ্য (কারণ তা অপবিত্র)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে ফিসক্বান শব্দটি 'উহিল্লাবিহি' কথাটির মাফউলে লাহু (স্বতঃসিদ্ধ কর্মপদ)। এ কথাটি মেনে নিলে উহিল্লা (উৎসর্গীকৃত) শব্দটির সংযোগ ঘটবে আগের বাক্যের ইয়াকুনা (হয়) কথাটির সঙ্গে। তখন 'ইয়াকুনা' শব্দটির বিশেষ্য পরিণত হবে কর্মপদস্থিত কর্তায় (নায়েবে ফায়েলে)। এভাবে বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধিতা করে যে পশু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হয়েছে (তা অবৈধ)।

শেষে বলা হয়েছে— তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। 'ফা মানিদ্বতুর্‌রা' অর্থ— (হারাম ভক্ষণে বাধ্য হলে)। 'গইরা বাগিন' অর্থ— অবাধ্য না হয়ে। আর 'ওয়ালা আ'দিন' অর্থ— সীমালংঘন না করে। অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য, প্রবৃত্তিতাড়িত না হয়ে, আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্যতার উদ্দেশ্য না নিয়ে, হারামকে হালাল মনে না করে এবং সীমালংঘন না করে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত না করে কেউ যদি কখনো

হারাম ভক্ষণ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম না হয়— তবে ওইরূপ ব্যক্তিকে সৎ নিয়ত ও পরিস্থিতিগত কারণে আল্লাহ্পাক ক্ষমা করে দিবেন। কারণ তিনিই প্রকৃত ও পরমতম দয়ালু।

মাসআলাঃ কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াতে যেগুলোকে ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে, সেগুলোই কেবল হারাম। হাদিস শরীফে যে সকল বস্তু হারাম করা হয়েছে, সে সকল বস্তু প্রকৃতরূপে ও পূর্ণরূপে হালাল নয়। কারণ ওই হাদিস একক বর্ণিত (খবরে আহাদ)। আর একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের অকাট্য নির্দেশকে রহিত করা যায় না। তাঁরা বলেন, এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন জননী আয়েশা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। ইমাম মালেকও এই অভিমতের অনুসারী। তাঁর মতে হাদিস শরীফে উল্লেখিত হারামগুলোর প্রকৃত অর্থ মাকরূহ (নিন্দনীয়)— মাকরূহে তাহরিমি (নিষিদ্ধরূপী নিন্দনীয়) নয়। এই অভিমতের আলেমগণ আরো বলেন, সুরা মায়িদায় শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, পতনের কারণে নিহত ইত্যাদি মৃত পশুও এই আয়াতের 'মড়া' কথাটির অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতব্যঃ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি তাঁর 'তাফসীরে ইতকান' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, অংশীবাদীরা যখন আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকে হারাম এবং আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকে হালাল বলেছিলো, তখন তাদের অপধারণার বিপরীতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে অংশীবাদীরা! জেনে নাও, যে সকল চতুষ্পদ পশুকে (বাহিরা, হাম ইত্যাদিকে) তোমরা হারাম বলছো, সেগুলো হালাল। আর যে সকল বস্তুকে (মড়া, প্রবহমান রক্ত, শূকরকে) হালাল বলছো, সেগুলোই হারাম। কেউ যদি বলে, তুমি মিষ্টি খেয়োনা তবে তার বিপরীত জবাব হচ্ছে, আমি মিষ্টি খাবোই খাবো। জবাবদাতার দৃঢ় মনোভাব এ রকম বক্তব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আলোচ্য আয়াতটির দৃষ্টান্তও এ রকম। এখানেও কাফেরদের নির্ধারিত হালাল হারামের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। আয়াতের বক্তব্য এখানে হাঁ বা না সূচক (সমর্থন বা অসমর্থনসূচক) নয়। বরং সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান এবং পূর্ণ বৈপরীত্য প্রকাশক। এই ব্যাখ্যাটিকে ইমামুল হারামাইনও পছন্দ করেছেন। বলেছেন, ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত উত্তম উদ্দেশ্য সংবলিত।

আমি বলি, সুরা মায়িদায় উল্লেখিত শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, পতনের ফলে মৃত ইত্যাদিকে আলোচ্য আয়াতের 'মড়া' কথাটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ সুরা মায়িদায় 'মড়া' শব্দটির উল্লেখ করার পরে বিভিন্নভাবে নিহত পশুর হারাম হওয়া সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কেবল উল্লেখিত হয়েছে 'মড়া' শব্দটি।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদসহ অধিকাংশ আলেম বলেছেন, হারামের তালিকা এই আয়াতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

বায়যাবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি মনসুখ (রহিত) নয়, বরং মুহকাম (সুস্পষ্ট)। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত হারাম সম্পর্কিত অন্য কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি— এ রকম বলা যায় কি? যদি না যায়, তবে একক বর্ণিত হাদিস দ্বারা কোরআনের আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নইতো ওঠে না। আমি বলি, বায়যাবীর এই অভিমতটি ভুল। কেননা কোনো আয়াত বা হাদিসে উল্লেখিত কোনো হুকুমের সঙ্গে যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া না হয়, তবে ওই হুকুমটি হবে একটি স্থায়ী হুকুম। আর আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞানের মধ্যে হুকুমটি হবে সাময়িক। এ রকম নস্ বা কোরআনের দলিল রহিত হওয়ার উপযুক্ত হয় তখনই, যখন নাসেখ (রহিতকারী) আয়াত অবতীর্ণ হয়ে আগের আয়াতটিকে মনসুখ (রহিত) করে দেয়। তাই নাসেখ ও মনসুখের বিবরণকে বলা হয় পরিবর্তনের বিবরণ (বয়ানে তাবদিলী)। এ রকম না হলে মনে করতে হবে আল্লাহ্তায়ালা রহিতকারী হুকুম সম্পর্কে এখনই জানলেন— আগে জানতেন না। কিন্তু এ রকম হওয়া সম্পূর্ণতঃই অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্তায়ালার জ্ঞান আদি ও অন্তহীন, অসীম। আবার আলোচ্য আয়াতের মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর হারাম হওয়ার হুকুমটিও একটি স্থায়ী হুকুম। আর এটিকে চূড়ান্ত হুকুম ধরা হলে বুঝতে হবে এই তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য সকল বস্তু হালাল এবং এ হালালও স্থায়ী। যদি তাই হয়, তবে বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশুগুলোও হালাল হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম হওয়াও অসম্ভব। কারণ অন্য আয়াতেও হারাম বস্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাদিস শরীফেও কোনো কোনো বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে আলোচ্য আয়াতের হুকুম একটি সাধারণ হুকুম। আর সুরা মায়িদায় এই আয়াতের হুকুমসহ বিশেষভাবে অন্যান্য হারামেরও বিবরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপানকেও হারাম করা হয়েছে— যা এর পূর্বে হারাম ছিলো না। কোরআন মজীদের এক আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন— যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা (ইতোপূর্বে) পান করেছে তা দূষণীয় নয়। সুতরাং বুঝা গেলো, আলোচ্য আয়াতে মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর হারাম করার মাধ্যমে এই তিনটি ছাড়া বাকী সবগুলোকে হালাল বলা হয়নি। তাই অন্যত্র বর্ণিত কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে হারামকৃত বস্তুগুলোও হারাম। একক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত হারামও হারাম। অতএব প্রমাণিত হলো যে, একক বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমেও কোরআনের কোনো সাধারণ হুকুমকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া জায়েয। কিয়াসের মাধ্যমেও এ রকম করা যায়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, এই সুনির্দিষ্টকরণ একই

সময়ে করা যাবে না। আর সময়ের অগ্র পশ্চাতের কারণে এক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেয়াও স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রতিপালনীয় নিয়ম হচ্ছে— প্রথমে কোরআনের সাধারণ নির্দেশকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে কোরআনেরই অন্য কোনো আয়াত দ্বারা। তারপর সুনির্দিষ্টকরণ করা যাবে হাদিসের মাধ্যমে। এমতোক্ষেত্রে নাসেখ বা রহিতকারী হবে ওই আয়াত অথবা ওই হাদিস যা আরো সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত। একই সময়ে নাসেখ ও মনসুখ, দু'টোকে মেনে নিলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে মড়া, বহমান রক্ত এবং শূকর ছাড়া অন্য সকল কিছু হালাল। বরং প্রকৃত কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি ওই আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে—'আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, সকল পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল অপবিত্র বস্তুকে।' লক্ষ্যণীয় যে, এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে পবিত্র ও অপবিত্রের কথা— যা বিস্তারিত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে। আর এই বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে হাদিস শরীফে। সেখানে বলা হয়েছে, হিংস্র প্রাণী এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। অথচ হাদিস কোরআনের হুকুমকে রহিত করতে পারে না, বিশেষভাবে সীমাবদ্ধও করতে পারে না। বরং হাদিস হচ্ছে কোরআনের সংক্ষিপ্ত হুকুমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। তাই আমি বলি, একক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হাদিস শরীফের এই বিস্তৃত বর্ণনাকে সকল যুগের মানুষ গ্রহণ করেছে। এমন কি তাহরীমে সিবা' (হিংস্র জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কে) এর স্বপক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও ইমাম মালেক এই অভিমতটিকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন। তাই তিনিও একক বর্ণিত ওই হাদিসের ভিত্তিতে হিংস্র জংলী পশুকে মাকরূহে তাহরীমি (হারামের নিকটবর্তী) বলেছেন। সুতরাং এককবর্ণিত হাদিসের বিশুদ্ধতা ঐকমত্যসমর্থিত। আর ঐকমত্যপুষ্ট হওয়ার কারণে হাদিসটি উপনীত হয়েছে কোরআনেরই প্রমাণ (দলিলে কেতয়ী) রূপে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, এই নিয়মে হাদিসের মাধ্যমে কোরআনের হুকুম রহিত হওয়া জায়েয।

উল্লেখ্য যে — উদ, খেঁকশিয়াল, ধেড়ে ইঁদুর এবং গুইসাপের গোশত ভক্ষণ সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধেও যায় না। কেননা তিনি ওগুলোকে হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর হিংস্র প্রাণীর গোশত হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ রয়েছে কেবল— বর্ণিত প্রাণীগুলো হিংস্র কি না, সে সম্পর্কে। আরো উল্লেখ্য যে, সুরা মায়িদার 'আল ইয়াওমা উহিল্লা লাকুমুত্ তইয়্যেবাত'— আয়াতের তাফসীরে হালাল ও হারাম পশু সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই বিস্তারিত জানতে হলে ওই তাফসীরটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

❐ ইহুদীদিগের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদিগের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম; তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিল না; তাহাদিগের অবাধ্যতার দরুন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। আমি তো সত্যবাদী।

❐ অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদিগের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না'।

প্রথমে বলা হয়েছে—'ইহুদীদের জন্য নখরবিশিষ্ট সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম।' এখানে নখরবিশিষ্ট সমস্ত পশু অর্থ— উট, হিংস্র পশু ও পাখি। কুতাইবি বলেছেন, পাখিদের মধ্যে নখরবিশিষ্ট পাখি হচ্ছে ওই পাখিগুলো— যেগুলোর পাঞ্জা রয়েছে। আর নখরবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু হচ্ছে ওই পশুগুলো যেগুলোর রয়েছে ক্ষুর। কুতাইবি আরো বলেছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণও এ রকম বলেছেন। ক্ষুরকেই পরোক্ষার্থে নখর বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ কোনো জঘন্য জুলুমের কারণে শাস্তিস্বরূপ ইহুদীদের জন্য সকল পশু হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। মুসলমানদের জন্যও অনেক পশু হারাম করা হয়েছে। কিন্তু এই নিষিদ্ধতা শাস্তিস্বরূপ করা হয়নি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম; তবে এগুলোর পৃষ্ঠদেশের অথবা অন্ত্র কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি নিষিদ্ধ ছিলো না'। এখানে 'মা হামালাত জুহুরুহুমা' অর্থ— পশুর পৃষ্ঠদেশের ও পাঁজরের চর্বি। আবীল হাওয়াইয়া (নাড়ীভুঁড়িসম্বলিত) শব্দটি আল হাওয়াবিহ্‌ অথবা আল হাওয়াইয়াআ শব্দের বহুবচন। এর সম্পর্ক রয়েছে জুহুরুহুমা (সে দু'টির পিঠ) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ যে চর্বি নাড়ীর সঙ্গে মিশে রয়েছে। 'মাখতালাত্ব বিআ'জমিন' কথাটির অর্থ— পিঠ ও নিতম্বের চর্বি, যা মিশ্রিত রয়েছে হাড়ের সঙ্গে। এভাবে পিঠ, পাঁজর এবং নিতম্বের চর্বি নিষিদ্ধ করার পর হালাল রয়ে গেলো কেবল পেট এবং গ্রীবাদেশের অস্থিসংলগ্ন চর্বি।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের অবাধ্যতার দরুণ তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম।' ইহুদীরা ছিলো চরম অবাধ্য। নবী হত্যা, আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিচ্যুতি, সুদ ভক্ষণ, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ— এ রকম জঘন্য কর্মগুলো ছিলো ইহুদীদের অবাধ্যতার নিদর্শন।

একটি প্রশ্নঃ ইহুদীরা তো ওই জঘন্য পাপগুলোকে পাপই মনে করতো না। তবে তারা শাস্তি পেলো কীভাবে?

উত্তরঃ আখেরাতে ইহুদীরা যাতে করে অধিকতর শাস্তির উপযোগী হয়, তাই তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞা। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্তায়ালা মদ, মড়া, শূকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মৃত জীবের চর্বির কী হুকুম? এর দ্বারা তো নৌকায় পালিশ করা হয় এবং চামড়ার উপরিভাগকে করা হয় তৈলাক্ত। আবার চর্বি দ্বারা জ্বালানো হয় প্রদীপ। তিনি স. বললেন, না। মৃত জীবের চর্বি হারাম। তারপর বললেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি মৃত জীবের চর্বি হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা চর্বিকে রান্নার জ্বালানীরূপে প্রস্তুত করে বিক্রয় করতো এবং ওই বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করতো। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে।

শেষে বলা হয়েছে—'ওয়া ইন্না লাসাদিকুন' (আমি তো সত্যবাদী)। এ কথার অর্থ— মন্দকর্মের শাস্তি, পুণ্যকর্মের পুরস্কার এবং অন্যান্য যে সকল সংবাদ আমি জানিয়েছি, সেগুলোর ব্যাপারে নিঃসন্দেহে আমি সত্যবাদী।

পরের আয়াতে (১৪৭) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যদি তারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বলো, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক, এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্পাকের রহমত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আপনাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সে নির্দেশনাকে যদি ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করে তবে আপনিও তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্পাকের দয়া সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলেই তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। মনে কোরো না যে, এই অবকাশ চিরস্থায়ী। তিনি এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্তি থেকে মুক্তি দেন না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্পাক সর্বব্যাপী দয়ার্দ্র। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদাতা। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তাঁর শাস্তি রদ করা হয় না।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ط اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

❒ যাহারা শির্‌ক করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ শির্‌ক করিতাম না, এবং কোন কিছুই নিষিদ্ধ করিতাম না।' এইভাবে তাহাদিগের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বল, 'তোমাদিগের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল।'

❒ বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহেরই; তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদিগের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতেন।'

❒ বল, 'আল্লাহ্ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ-সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে হাজির কর।' তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদিগের সাথে ইহা স্বীকার করিও না; যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় তুমি তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'যারা শিরিক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরিক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না।' রসুল স. এর প্রশ্নের যথাউত্তর না দিতে পেরে মুশরিকেরা এ রকম বলেছিলো। তাই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, 'যারা শিরিক করেছে তারা বলবে'। এখানে উদ্ধৃত মুশরিকদের বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে—আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া ভালো-মন্দ কোনো কাজই সংঘটিত হয় না। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শিরিক করতো না।

আমরাও করতাম না। আর আল্লাহ্পাক যা হালাল করেছেন তাকেও আমরা বলতাম না হারাম। সুতরাং আমাদের দোষ কোথায়? মুশরিকেরা নিতান্তই মূর্খ। নতুবা তারা এ রকম কথা বলতো না। তারা জানে না, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি— সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি বিষয়। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ও শক্তি ভালো ও মন্দ উভয় কাজকে বাস্তবায়ন করে। তাই তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টির সম্পর্ক কেবল ভালো কাজের সঙ্গে অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তিনি তুষ্ট। আর অবিশ্বাসী ও অসৎ লোকদের প্রতি অতুষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে মানুষকে এই তুষ্টির পথে আহ্বান জানান। অথচ অংশীবাদীরা এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। সৃষ্টি করে জটিলতা।

এরপর বলা হয়েছে—'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করেছিলো, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিলো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাঁর নবী-রসুলগণের মাধ্যমে একই আহ্বান জানিয়েছিলেন। নিষেধ করেছিলেন আল্লাহ্তালার সঙ্গে শরীক করতে। কিন্তু তারাও এ রকম টালবাহানা করে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির পথের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো । মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো প্রেরিত পুরুষগণকে। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের অবমাননা করে নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছিলো হালাল ও হারাম। তাদের এই সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তিও তারা যথাসময়ে পেয়েছিলো। এভাবেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার শাস্তি ভোগ করে।

শেষে বলা হয়েছে—'বলো, তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ করো; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো এবং শুধু মিথ্যাই বলো।' যুক্তি বা জ্ঞান বুঝাতে এখানে 'ই'লমিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ ওই এলেম, জ্ঞান বা যুক্তি যা আল্লাহ্তায়ালার কিতাব থেকে সংগৃহীত হয়। অথবা এর অর্থ— ওই দলিল বা প্রমাণ, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শিরিককে পছন্দ করেন এবং তারা যাকে হারাম বলে, তাকে সত্যি সত্যি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে হারাম করা হয়েছে। এ রকমও হতে পারে যে— এখানে এলেম বা যুক্তি অর্থ ওই জ্ঞান বা যুক্তি যা উত্থাপিত দাবির অনুকূলে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ্পাক এখানে তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, তোমাদের নিকট (তোমাদের অভিমতের পক্ষে) কোনো যুক্তি আছে কি? যদি থাকে তবে তা উপস্থাপন করো। তোমরা তো কল্পনাবিলাসী এবং তোমাদের বিভ্রান্ত কল্পনাপ্রবণ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারী। আর তোমরা মিথ্যাবাদীও।

পরের আয়াতে (১৪৯) বলা হয়েছে—'বলো, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্রই; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, আল্লাহ্র

প্রমাণই চূড়ান্ত প্রমাণ। আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন। কিন্তু তোমরা এ রকম বলতে পারো না। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা, শক্তি রহস্যময় ও অসীম। তোমরা সসীম। তাই তাঁর হেকমত বা রহস্য তোমরা জ্ঞানায়ত্ব করতে অক্ষম। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তোমাদের নেই। তোমাদের কর্তব্য তো কেবল তাঁর নির্দেশের যথাঅনুসরণ এবং তাঁর সন্তোষ অনুসন্ধান। তিনি তো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক— আল্লাহ্‌। আর তোমরা তাঁর দাস। তাই তোমরা তাঁর হেকমতের বিশ্লেষণ করতে সমর্থ নও। সুতরাং তোমরা যথাকর্তব্য প্রতিপালনের চিন্তা ছেড়ে তাঁর দুর্জ্ঞেয় ও জ্ঞানাতীত রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে কেনো? তিনি তো জবাবদিহিতার দায় থেকে চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন। ইচ্ছাময়।

মোতাজিলারা বলে, কুফর বা অবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অবিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার দাসদের অভিপ্রায়জাত। আলোচ্য আয়াত দ্বারা মোতাজিলারা তাদের অভিমত প্রমাণ করতে চায়। বলে, অবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ের সম্পর্ক থাকলে অংশীবাদীদের 'আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শিরিক করতাম না'— কথাটিকে অগ্রাহ্য করা হতো না। নিঃসন্দেহে মোতাজিলাদের এই অভিমতটি ভুল। আমাদের উদ্ধৃত তাফসীরের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তাই এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে— চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌তায়ালারই। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন। অংশীবাদীদের উক্তিকে এখানে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একারণে যে, তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ-অসন্তোষের ধার ধারে না। সন্তোষের পথে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। আহ্বানকারী নবী রসুলগণকে করে অবমাননা। প্রকাশ্যে শিরিক করা সত্ত্বেও মনে করে— এ পথেই রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি। আরো বলে, বাহিরা, সায়েবা, হাম ইত্যাদি হারাম হওয়া যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারেই ঘটেছে, তাই তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলে এবং সন্তুষ্ট না হলে আমরা তো এ রকম করতেই পারতাম না। মুশরিকেরা মূর্খ। আর মোতাজিলারা অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও সন্তোষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনি।

এর পরের আয়াতে (১৫০) বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্‌ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দিবে তাদেরকে হাজির করো। এখানে 'হালুম্মা' শব্দটির অর্থ— নিয়ে এসো বা হাজির করো। শব্দটি ইস্‌মে ফেল (ক্রিয়া বিশেষ্য)। হেজাজবাসীদের ভাষায় এর কোনো বিবর্তিত রূপ বা ধাতুরূপ নেই। শব্দটি এক বচন, বহু বচন— সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'শুহাদাআকুম' অর্থ— এ সম্বন্ধে যা সাক্ষ্য দেবে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির পূর্ণ অর্থ হবে এ রকম—

হে আমার রসুল! বলুন, আল্লাহ্তায়ালা যে বাহিরা, হাম ইত্যাদি পশু হারাম করেছেন, সে সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে উপস্থিত করো। তাহলে সকল প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তোমাদের সকলের পথভ্রষ্টতার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হবে। কেননা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারীদের মতো ওই সাক্ষ্যদাতাদের নিকটেও এ সম্পর্কে কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এটা স্বীকার কোরো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যদি ওই সাক্ষ্যদাতারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং তাদের সাক্ষ্য যে মিথ্যা, সে কথা উপযুক্ত যুক্তিসহ প্রমাণ করে দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে— যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না। এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরকালের প্রতি তাদের কোনোই আস্থা নেই। তারা খেয়াল-খুশী মতো আল্লাহ্তায়ালার সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে। তাদের ওই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ আপনি করবেন না। করতে তো পারবেনই না। কারণ, আপনি তো আমার রসুল। আমার আনুগত্যই তো আপনার জীবনের মূল ব্রত। অংশীবাদীদের স্বরচিত হালাল হারাম সম্পর্কিত ধারণা এভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর জনতা জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্তায়ালা তবে কোন কোন বিষয় হারাম করেছেন? এমতো প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ১৫১

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

❐ বল, 'আইস, তোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাই; উহা এইঃ 'তোমরা তাঁহার কোন শরীক করিবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদিগের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দিয়া

থাকি। প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাইবে না; আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিবে না।' তোমাদিগকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

আয়াতের শুরুতেই রয়েছে 'কুল' শব্দটি। এর অর্থ— বলো বা বলুন। এ সম্বোধনটি করা হয়েছে রসুল স. কে। বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, এসো! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই। শোনো— তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। এখানে 'তায়া'লাও' শব্দটির অর্থ— এসো। এই রূপান্তরিত শব্দটি বহুবচনবোধক। উচ্চ মর্যাদাশালী ব্যক্তি নিম্ন মর্যাদাধারী ব্যক্তিকে এভাবে আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো লোককে এভাবে সম্বোধন করতে পারে। আলোচ্য বাক্যে দু'টি নিষেধাজ্ঞার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১. তোমরা আল্লাহ্র কোনো শরীক করবে না। ২. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটির বাক্যরূপ হওয়া উচিত ছিলো এ রকম— পিতা-মাতার সঙ্গে অসদাচরণ করবে না। নিষেধাজ্ঞার বাক্যরূপ 'করবে না' 'যাবে না'— এ রকমই হয়। কিন্তু এখানে 'সদ্ব্যবহার করবে'— এ রকম বলে প্রকৃতপক্ষে নিষেধাজ্ঞাটিকে অধিকতর গুরুত্ববহ করা হয়েছে। ফলে নিষেধাজ্ঞাটির প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম— পিতামাতার সঙ্গে অসদাচরণ থেকে বিরত থাকাটাই যথেষ্ট নয়। তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারণ তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার না করাই অসদাচরণ বা পাপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। এ কথার অর্থ— অভাব অনটনের দুশ্চিন্তায় তোমরা তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দাও। এ রকম করা নিষেধ। জেনে নাও, আমিই সকল সৃষ্টিকে জীবনোপকরণ (রিজিক) দিয়ে থাকি। তোমরা কেউ কারো রিজিকদাতা নও। তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমিই রিজিক দিয়েছি। তোমাদেরকেও দিচ্ছি। তোমাদের সন্তানদেরকেও দেবো। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে রিজিক সংকুচিত হওয়ার ভয়ে জীবন্ত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত কোরো না।

হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ১. কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক কোরো না— যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ২. পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না— যদিও তোমার পিতা-মাতা তোমাকে তোমার স্ত্রী এবং সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেন (হাদিসটি বর্ণিত হলো সংক্ষিপ্তরূপে)। আহমদ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এক লোক রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌র নিকটে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করা— অথচ আল্লাহ্‌তায়ালাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্নকারী পুনরায় বললেন, এরপর কোনটি? তিনি স. বললেন, রিজিকের অনটন হবে মনে করে শিশু সন্তানকে হত্যা করা (সংক্ষেপিতরূপে)। বোখারী, মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।' এখানে 'ফাওয়াহিশা' শব্দটির অর্থ বৃহৎ পাপ (কবীরা গোনাহ্) অথবা ব্যভিচার কিংবা অশ্লীল আচরণ। এই অশ্লীল আচরণগুলো প্রকাশ্য— যা করা হয় হাত, পা, চোখ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। আবার গোপন অশ্লীল আচরণগুলো হচ্ছে— অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি। এগুলোর মূল সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত আলী ইবনে আবী তালেব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি একদিন গমন করলেন মীনা প্রান্তরে। আমি ও হজরত আবু বকর ছিলাম তাঁর সঙ্গী। আরববাসীরা রসুল স. এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলো। তিনি স. মীনায় অবস্থানরত বিভিন্ন গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। সালাম দিলেন। সকলে তাঁর সালামের জবাবও দিলো। সেখানে উপস্থিত ছিলো মাফরুক বিন আমর, হানী বিন কবিসা, মাছনা বিন হারেসা, নোমান বিন শরীক প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। মাফরুক ছিলেন হজরত আবু বকরের সুহৃদ। ভাষাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি রসুল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন? তিনি স. সম্মুখবর্তী হলেন। তাঁর পবিত্র মস্তকের উপর একটি বস্ত্র খণ্ড ঝুলিয়ে ছায়া বিস্তার করলেন হজরত আবু বকর। রসুল স. বললেন, আমার আহ্বান এই— তোমরা সাক্ষ্য প্রদান করো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, অংশীবিহীন এবং আমি তাঁর রসুল। তোমরা আমাকে কোনো কষ্ট প্রদান করবে না, আমার প্রতিপক্ষ হবে না। বরং আমাকে রক্ষা করবে। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওই বার্তাই প্রচার করবো, যা তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন। কুরায়েশেরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাঁর রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছে। অবস্থান গ্রহণ করেছে সত্যের বিরুদ্ধে এবং মিথ্যার পক্ষে। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো অতুলনীয় প্রশংসার অধিকারী। মাফরুক বললেন, আপনার আহ্বানের

অন্যান্য অনুসঙ্গগুলো কি কি? রসুল স. তখন এই আয়াতের 'কুল তায়া'লাও' থেকে 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন' পর্যন্ত (১৫১ থেকে ১৫৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত) পাঠ করলেন। মাফরুক বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আল্লাহ্র কসম এটা কোনো মানুষের কালাম নয়। মানুষের কালাম হলে আমি অবশ্যই চিনতে পারতাম। আরো পাঠ করুন। রসুল স. পাঠ করলেন—'ইন্নাল্লহা ইয়া'মুরু বিল্‌আ'দলি ওয়াল ইহ্‌সানি ওয়া ইতাই জিল্ কুরবা ওয়া ইয়ানহা আ'নিল ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই ইয়াই'জুকুম লায়াল্লাকুম তাজাক্কারুন' (নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, উত্তম আচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে সাহায্যদানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যাবতীয় অশ্লীল, অন্যায় ও অসৎ কাজ করতে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যেনো তোমরা সদুপদেশ প্রাপ্ত হও)। মাফরুক বললেন, হে ভ্রাতা! আপনি নিঃসন্দেহে উন্নত চরিত্রের মানুষ। আপনার আহ্বান অতি উত্তম। আপনার সম্প্রদায়ের যে সকল লোক আপনার বিরোধিতা করছে, তারা মিথ্যাবাদী। হানি বিন বুরাইসা বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! আমি আপনার কথা শুনলাম এবং পছন্দ করলাম। আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে— আপনি যা পাঠ করলেন তা সত্য। রসুল স. বললেন, সত্বর আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদেরকে দান করবেন সাম্রাজ্য এবং কল্যাণকর সন্তান (দান করবেন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য, আর সেখানকার লোকেরা হবে আপনাদের পরিচারক)। আপনারা তখন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। নোমান বিন শরিক বললেন, হে কুরায়েশ ভ্রাতা! নিশ্চয় আপনার প্রদত্ত সুসংবাদ সত্য। রসুল স. তখন তেলাওয়াত করলেন—'ইন্না আরসালনাকা শাহিদাঁও ওয়া মুবাশ্‌শিরাঁও ওয়া নাজিরাঁও ওয়াদায়িইয়ান ইলাল্লহি বিইজ্‌নিহি ওয়া সিরাজাঁও ওয়া মুনিরা'। (আর অবশ্যই আমি আপনাকে সাক্ষ্য, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং তাঁর নির্দেশেই আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী ও দীপ্ত প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি)। এর পর তিনি স. হজরত আবু বকরের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।' এ কথার অর্থ— যে সকল মারাত্মক অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় সে সকল কারণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলমান কিংবা অমুসলমানকে হত্যা করা যাবে না। মারাত্মক অপরাধগুলো হচ্ছে— ধর্মত্যাগ, খুন, ব্যভিচার, মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ, রাষ্ট্রদ্রোহ, রাহাজানি ইত্যাদি। এ সকল অপরাধ না করলে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল' এ রকম

সাক্ষ্য যে দেয়, তাকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু তিনটি অপরাধের শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। ১. বিবাহিত ও বিবাহিতার ব্যভিচার। ২. খুন। ৩. ধর্ম পরিত্যাগ। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন— 'ওয়া ইন নাকাছু আইমানাহুম মিম্‌বা'দী আ'হ্‌দিহিম ওয়া তোয়া'নু ফি দিনিকুম ফাক্বাতুলু আইম্‌মাতাল কুফরী' (আর যদি তারা প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অশ্লীল কথা বলে, তাহলে অবিশ্বাসীদের নেতাদেরকে হত্যা কোরো)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ফা ইন বাগাত্‌ ইহ্‌দাহুমা আ'লাল উখরা ফাক্বাতিলুল্লাতি তাব্‌গি' (যদি একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহী হয়, তবে বিদ্রোহী দলকে হত্যা কোরো)। অন্য আরেক স্থানে এরশাদ করেছেন— 'ইন্নামা জাযাউল্লাজিনা ইউহারিবুনাল্লহ্‌' (যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করে, অবশ্যই তাদের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে.....)। এই সকল আয়াতের নির্দেশানুসারে বুঝা যায়— চুক্তিভঙ্গকারী কাফের, ধর্মত্যাগী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খুনী ও ডাকাতকে হত্যা করা বৈধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'জালিকুম ওয়াস্‌সা কুম বিহি লায়াল্লাকুম তা'ক্বিলুন' (তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেনো তোমরা অনুধাবন করো)। এ কথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপদেশ দান করলেন তোমরা যাতে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করো এবং লাভ করো হেদায়েত। জ্ঞানের পূর্ণতাই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়েত। আর হেদায়েতের বিপরীত শব্দ— সাফাহাত বা মূর্খতা।

সুরা আন্‌আ'মঃ আয়াত ১৫২

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

❒ পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দিবে; আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যখন তোমরা কথা বলিবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হইলেও ন্যায্য বলিবে এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে; এইভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।' এখানে 'ওয়ালা তাক্বরাবু' কথাটির অর্থ— নিকটবর্তী হবে না। 'আল্লাতি হিয়া আহ্সানু' অর্থ— সদুদ্দেশ্যে ছাড়া। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আত্মসাৎ, অপব্যবহার অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পিতৃহীনদের সম্পদের ধারে কাছে যেয়ো না। সদুদ্দেশ্য নিয়ে যাও। অর্থাৎ তাদের সম্পদের যথা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে যাও।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'আল্লাতি হিইয়া আহ্সানু' কথাটির উদ্দেশ্য ব্যবসা। 'হাত্তা ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহু' অর্থ— বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। 'আশুদ্দা' শব্দটি শাদ্দুন এর বহুবচন। যেমন 'আফলাসু' শব্দটি 'ফালসুন' এর বহুবচন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আশুদ্দা' শব্দটি একক অর্থ প্রকাশক। এর অর্থ— (শক্তির) পরিপূর্ণতা। আশুদ্দা বা বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত উপনীত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। জোর করে বা অন্য কোনো উপায়ে কাউকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বয়ঃপ্রাপ্ত করা যায় না। আর যে বয়ঃপ্রাপ্ত তার সম্পদের নিকটবর্তী হওয়ার তো প্রয়োজনই নেই। বয়ঃপ্রাপ্তরা নিজেরাই নিজেদের সম্পদের সংরক্ষণকারী।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতিমদের সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার করা হতো। তারা বড় হলে অবশ্য নিজেরাই এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। তখন আর কেউ অপব্যবহার করতে সাহস পেতো না। আল্লাহ্পাক তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিমদের সম্পদের নিকটে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে কিছু বলেননি। কারণ তারা নিজেরাই তাদের সম্পদের হেফাজত করতে সক্ষম।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ইত্যাদি শুভ উদ্দেশ্য ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিমদের সম্পত্তির নিকটে যেয়ো না। আর যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিবে তাদের হাতে।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানে 'হাত্তা' (পর্যন্ত) শব্দটি অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্কের সীমানা নির্ণায়ক। তাই আলোচ্য বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা ওই সময় পর্যন্ত পিতৃহীনদের সম্পদের যথাসংরক্ষণ নিশ্চিত কোরো, যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় (কোনোক্রমেই তাদের সম্পদ নষ্ট কোরো না)।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দিবে।' এ কথার অর্থ— তোমরা ওজনে কম বেশী করবে না। এ রকম না সূচক নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপরীতার্থক নির্দেশ দেয়া। এভাবে বাক্যটির আদেশসূচক রূপ হবে এ রকম— তোমরা পরিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে দিবে।

এরপর বলা হয়েছে—'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না'। কথাটির মধ্যে এই নির্দেশনা রয়েছে যে— পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় কাউকে অতিরিক্ত প্রদান করো তবে তা অতি উত্তম হবে। আর এ রকম করা কোনো সাধ্যাতীত বিষয় নয়।

শিথিল সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে মারদুবিয়ার একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক মাপের নিয়ত করেছে এবং সঠিক মাপ দিয়েছে, কিয়ামতের দিন তাকে অভিযুক্ত করা হবে না। অর্থাৎ তার নিয়ত সঠিক রয়েছে বলে অজ্ঞাতসারে ওজনে কম বেশী হয়ে গেলেও আল্লাহ্ পাক তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবেন না। কারণ, বিষয়টি তার সাধ্যাতীত। তাই আল্লাহ্পাক বলেছেন—'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না।'

হজরত সাবীদ ইবনে কায়েস থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এর উপরে একটি ঘোড়ার মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব বর্তেছিলো। তিনি তখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, যথামূল্য প্রদান করো। তারপর অতিরিক্ত কিছু দাও।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক লোক রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে কর্কশ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে তার পাওনা দাবি করে বসলো। তার দুর্হৃদ ব্যবহারে কোনো কোনো সাহাবী তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। রসুল স. বললেন, ক্ষান্ত হও। পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।-তারপর বললেন, তার কাছ থেকে যে বয়সের উট নেয়া হয়েছিলো, সেই বয়সের উট তাকে প্রত্যর্পণ করো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবিকল ওই বয়সের উট যদি পাওয়া না যায়। তার চেয়ে উত্তম উট যদি পাওয়া যায়। রসুল স. বললেন, তবে তাই দিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম।

হজরত আবু রাফে থেকে মুসলিম কর্তৃকও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এক লোকের কাছ থেকে রসুল স. অর্ধ ওসাক (আনুমানিক তিন মন) ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণ পরিশোধের সময় তিনি স. তাকে দিলেন এক ওসাক। বললেন, অর্ধ ওসাক তোমার এবং বাকী অর্ধ ওসাক আমার (উপহার)। আর এক পাওনাদার এলে রসুল স. তাকে এক ওসাকের বদলে দিলেন দুই ওসাক। বললেন, এক ওসাক তোমার পাওনা। আর এক ওসাক আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি উপহার। তিরমিজিও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটির সূত্র পরম্পরায় কোনো রকম দুর্বলতা নেই। তাই প্রাপ্য থেকে কম গ্রহণ

করাই প্রাপকের জন্য উত্তম। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক ওই বাহাদূর ব্যক্তির উপর যে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ঋণ দেয়া নেয়ার ক্ষেত্রে বাহাদূরী প্রদর্শন করে। বোখারী। প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া বা নেয়া সাধারণতঃ স্বভাববিরোধী। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা এ রকম বদান্যতা প্রদর্শন অত্যাবশ্যক করেননি। এটাই 'আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না' বাক্যটির মর্মার্থ।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর একটি অভিমতের সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেছেন, ঋণদাতা যদি ঋণীর নিকট থেকে হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করে অথবা তার কোনো বাহনে বিনা ভাড়ায় আরোহণ করে কিংবা তার কোনো পশু বিনা ভাড়ায় স্বগৃহে রেখে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ঋণদানের পূর্বে বা প্রাক্কালে এ রকম অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণের শর্ত করা যাবে না। অন্য ইমামত্রয় বলেছেন, ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার এ রকম উপকার গ্রহণ জায়েয নয়। বরং এ রকম করা মাকরূহে তাহরীমি (হারামের নিকটবর্তী)। সুরা বাকারার মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তোমরা কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে।' এ কথার অর্থ— যখন তোমরা বিচারসভার সভাপতি হিসেবে অথবা সাক্ষ্য হিসেবে কথা বলবে— তখন অবশ্যই কথা বলবে ন্যায়ের পক্ষে— যদিও তা স্বজন বাদী অথবা বিবাদীর বিপক্ষে যায়। বাক্যটির মাধ্যমে এখানে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমানের উপর ভর করেও সাক্ষ্য দেয়া যাবে না— যদিও তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখানে 'শাহাদাত' শব্দটির মাধ্যমে চাক্ষুষ সাক্ষ্যদানকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুঝতে হবে, প্রত্যক্ষগোচরতা ছাড়া দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় না। আর দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সত্যসাক্ষ্য প্রদান করাও সম্ভব নয়। একবার রসুল স. উপর্যুপরি তিনবার উচ্চারণ করলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরিক তুল্য। এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত— 'ফাজতানিবুর্ রিজ্‌সা মিনাল আওছানি ওয়াজতানিবু ক্বওলায্ যুরী হুনাফায়া লিল্লাহি গইরা মুশরিকীন' (তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে মূর্তি পূজার মতো শিরিকের অপবিত্রতা থেকে বিরত থাকো এবং বেঁচে থাকো মিথ্যা কথা থেকে)। হজরত হুজাইম বিন ফাতেক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও ইবনে মাজা। আহমদ ও তিরমিজি

বর্ণনা করেছেন, হজরত আহমদ বিন হুজাইম থেকে। ইবনে মাজার বর্ণনায় 'এরপর তিনি পাঠ করলেন এই আয়াত'— কথাটি নেই।

হজরত বুরাইদার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিচারক তিন ধরনের। এক ধরনের বিচারক যাবে জান্নাতে। বাকী দু'ধরনের বিচারক প্রবেশ করবে দোজখে। যারা ন্যায্য বিচার করেছে তারাই হবে জান্নাতী। আর যে জেনে বুঝে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে সে হবে নরকবাসী। না বুঝে ভুল রায় যারা দেয় তারাও হবে নরকাগ্নির ইন্ধন। আবু দাউদ।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে'। এখানে আ'হ্‌দিল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার হচ্ছে— কসম এবং মানত। অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার সকল আদেশ নিষেধের পূর্ণ অনুসরণ, বাস্তবায়ন এবং ন্যায়ের উপর দৃঢ়পদ থাকা। 'আওফু' অর্থ পূর্ণ করো। শব্দটি আদেশ সূচক। এখানে অঙ্গীকার পূর্ণ করো অর্থ— আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিপরীত কিছু কোরো না এবং দৃঢ় শপথ ভঙ্গ কোরো না। আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দৃঢ়রূপে কার্যকরী কোরো। আর ওই সকল বিষয় থেকেও নিজেকে বিরত রেখো, যেগুলো সন্দিগ্ধ (হালাল না হারাম তা স্পষ্ট বুঝা যায় না)।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এ দু'টোর মাঝখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলো সন্দিগ্ধ। এই সন্দিগ্ধতা থেকে যে বেঁচে থাকবে, সে-ই কেবল তার ধর্মকে নিষ্কলুস করে নিতে পারবে। আর যে এই সন্দিগ্ধতাকে প্রশ্রয় দেবে, সে অবশেষে উপনীত হবে হারামের সীমানায়। যেমন, নিষিদ্ধ কোনো চারণভূমির আশে পাশে বিচরণকারীর ওই চারণভূমিতে প্রবেশের রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত নোমান বিন বশির থেকে।

তিবরানী রচিত সগীর নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত হজরত ওমরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে— হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। সুতরাং, যা সন্দেহজনক তা পরিত্যাগ করো এবং গ্রহণ করো সন্দেহমুক্তকে।

শেষে বলা হয়েছে—'এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো'। এ কথার অর্থ— এতক্ষণ ধরে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে যে সঠিক নির্দেশনা দান করলেন, তা থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তাঁর নির্দেশানুসারে চলো।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

❒ এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং ইহারই অনুসরণ করিবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না; করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

'ওয়া আন্না হাজা সিরাতি মুস্‌তাক্বিমান ফাত্‌তাবিউ'হু' (এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ করবে)। ফার্‌রা বলেছেন, এখানে 'ওয়াআন্না হাজা' কথাটির পূর্বে একটি ক্রিয়া অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত ক্রিয়াটিসহ বাক্যটি শুরু হতে পারতো এভাবে— 'ওয়া আত্‌লু আ'লাইকুম আন্না হাজা'। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলছি যে, এটাই আমার পথ। 'সিরাতি মুসতাক্বিমা' (সরল পথ) এখানে অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ হাজা (এই পথই) কথাটির মাধ্যমে কেবল এই সুরায় বর্ণিত বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সুরায় রয়েছে তিনটি মৌলিক বিষয়ের বর্ণনা— তৌহিদ, রেসালত এবং নবীগণ প্রবর্তিত দ্বীন। এখানে মূল বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— ধর্ম রক্ষা সম্ভব কেবল রসুলের একনিষ্ঠ অনুসরণের মাধ্যমে। নবীগণের দ্বীন, আমারই পথ, আমারই দ্বীন।

আমি বলি, এখানে 'আন্না' শব্দটির পূর্বে হরূফে জর (যের প্রদায়ক অক্ষরও) উহ্য থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে এর সংযোগ ঘটবে 'বিহী' (তার সাথে) শব্দের সঙ্গে। বায়যাবী বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে 'লাম' অক্ষরটি। কেননা প্রথম বাক্যটির পর পরই বলা হয়েছে, ফাত্তাবিউ'হু (এরই অনুসরণ করবে)। এভাবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— এ পথেরই অনুসরণ করবে, কারণ এ পথই আমার সরল পথ। আর পথের সারল্যই হচ্ছে, পথ পরিক্রমনের যোগ্যতা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'এ পথই' কথাটির দ্বারা কেবল এ রকম বিষয়বস্তুসম্বলিত এ আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাগবী বলেছেন, আয়াতটি মোহকাম (সুস্পষ্ট)। পূর্বের আয়াত (১৫২) থেকে যে সকল নির্দেশাবলীর বিবরণ চলে এসেছে— সেগুলো রহিত হয়নি। নির্দেশনাগুলো পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের শরিয়তেও ছিলো নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধতাই

সকল আসমানী কিতাবের মৌলিক নির্দেশনা। সুতরাং যে এ সকল নির্দেশনার অনুসরণ করবে সে সরল পথ ধরে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর যে অনুসরণ করবে না তার পথের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে দোজখ।

শেষে বলা হয়েছে—'করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেনো তোমরা সাবধান হও।' এ কথার অর্থ— তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ো না। যদি হও তবে সরল পথ থেকে ছিটকে পড়বে। তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে শরিয়ত প্রতিপালনের দায়িত্ব। এর মূল কথা হচ্ছে— অনুসরণ করতে হবে কিতাব ও সুন্নতকে। এটাই আমার দেয়া সরল পথ। এই পথকে পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। কিতাব মানবে, সুন্নত মানবে না অথবা কিতাব ও সুন্নতের কিছু অংশ মানবে, কিছু অংশ মানবে না— এ রকম চলবে না। এ রকম করলে তোমরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য যে, কিতাব ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ আনুগত্য না করার কারণে উৎপত্তি হয়েছে রাফেজী, খারেজী, জাবারিয়া, কাদ্রিয়া, মুজাস্সামাহ্ ইত্যাদি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকে সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন, আল কোরআন। এ কথাটি সুরা বাকারার একটি আয়াতের তাফসীরে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আয়াতটি এই— 'কুল্লামা আদ্বআ লাহুম মাশাও ফিহি ওয়া ইজা আজলামা আ'লাইহিম ক্বমু' (যখন তাদের জন্য আলোকিত হয়, তারা তাতে পথ চলে; আর তাদের উপর আঁধার নেমে আসলে তারা থেমে পড়ে)।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, একদিন রসুল স. আমাদের সম্মুখে মাটির উপরে একটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এটাই আল্লাহ্র পথ। এরপর ওই রেখাটির বামে এবং দক্ষিণে আরো অনেক রেখা অংকন করলেন। তারপর বললেন, এই পথগুলোর প্রতিটিতে বসে রয়েছে এক একটি শয়তান। তারা মানুষকে তাদের পথগুলোর দিকে আহ্বান জানিয়ে চলেছে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াতটি। আহমদ, নাসাঈ, দারেমী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমার আনীত ধর্মের আন্তরিক অনুরাগী হও। বাগবী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাঁর শরহে সুন্নাহ্ নামক গ্রন্থে। আরবাঈন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইমাম নববী। তিনিও হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۟

❒ এবং মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ— যাহাতে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ছুম্মা আতাইনা মুসাল কিতাবা' (অতঃপর মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব)। 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয় প্রসঙ্গান্তরে গমনের জন্য। লক্ষ্যণীয় যে, এখানে বলা হয়েছে— অতঃপর মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব। অথচ কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে হজরত মুসার উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই প্রশ্ন, এখানে এভাবে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হলো কেনো? এর জবাব স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আতাইনা' (দিয়েছিলাম) শব্দটি সম্পর্কিত হবে, 'ওয়াস্‌সাকুম' (তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি) এর সঙ্গে এবং এখানে 'ছুম্মা' ব্যবহৃত হয়েছে কেবল বিলম্বিত বর্ণনা প্রদানের জন্য। সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ প্রদর্শনের জন্য নয়। যেনো বক্তব্য বিষয়টি এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি এ কথাটিও জেনে নিন যে, আমি মুসাকেও এ রকম সদুপদেশ সম্বলিত কিতাব দিয়েছিলাম। অথবা বক্তব্য বিষয়টি এখানে এ রকম— এতক্ষণ ধরে আপনার নিকট বিবৃত সদুপদেশাবলী চিরন্তন। আপনাকে যে সকল সদুপদেশ দান করেছি, সে রকম সদুপদেশ আমি মুসাকেও দান করেছিলাম। তাই আপনি ছাড়া, মুসা অন্য সকল নবী রসুলদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। এ রকম অর্থ করলে বুঝতে হবে 'আতাইনা' (দিয়েছিলাম) কথাটির পূর্বে কুল (বলুন) শব্দটি উহ্য রয়েছে এবং পূর্ববর্তী যে সকল আয়াতের শুরুতে কুল শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে এখানকার উহ্য কুল— এর সম্পর্ক। এভাবে অর্থ হবে— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে এ কথাও জানিয়ে দিন যে, আমি মুসাকেও এ রকম কিতাব দিয়েছিলাম। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির প্রকৃত অর্থ হবে 'ওয়াও' (এবং)। এ রকম অর্থ করা হলে সময়ের অগ্র-পশ্চাতের প্রশ্নটি আর উঠবে না। যেমন, সুম্মাল্লহু শহীদ (আর আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সাক্ষী)। এখানে সুম্মা অর্থ এবং, আর।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এই আয়াতের বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকে লক্ষ্য করে। কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে অনুপস্থিতদের উপর। তাই

এখানে ঘটেছে এ রকম শব্দরূপের ব্যবহার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী-রসুলের উপর প্রবর্তন করেছিলাম বিভিন্ন শরিয়তের। সেগুলোর প্রত্যেকটিতে এ রকম সদুপদেশ ছিলো— যেরূপ সদুপদেশ দেয়া হলো এখন, এ কোরআনের মাধ্যমে। আর এই কোরআনে আমি আরো কিছু অতিরিক্ত বিধান দান করেছি।

'তামামান আ'লাল্লাজি আহ্সানা' (যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পন্ন)। এ কথার অর্থ— পূর্ববর্তী নবী-রসুলের শরিয়তের একনিষ্ঠ অনুসরণ যারা করেছিলো, তারা লাভ করেছিলো পূর্ণ সফলতা। কিন্তু যারা আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় এককত্বের প্রতি ইমান আনেনি এবং তাদের প্রতি প্রবর্তিত শরিয়তের অনুসরণ করেনি, তারা যেমন তওরাত থেকে উপকৃত হয়নি তেমনি উপকৃত হবে না কোরআন থেকে। আর তারা সফলও হবে না। এখানে 'আলাল্লাজি আহ্সানা' (সৎকর্মপরায়ণ যারা) কথাটির উদ্দেশ্য হজরত মুসা। অর্থাৎ যারা হজরত মুসার শরিয়তের পূর্ণ অনুসরণ করেছে, তারা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতে পরিপূর্ণ। 'আল্লাজি' শব্দটি একবচন, বহুবচন— সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কথাটির উদ্দেশ্য হজরত মুসার ওই সকল উম্মত— যারা ইমানের সঙ্গে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (আল্লাজি আহ্সানা) বাক্যাংশটিকে পড়তেন আল্লাজিনা আহ্সানু। এই উচ্চারণরীতির মাধ্যমে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে।

হজরত আবু উবাদা বলেছেন, 'আল্লাজি আহ্সানা' অর্থ নবী-রসুলগণ। এ অর্থটি গ্রহণ করলে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যরূপটি হবে এ রকম— আমি সকল নবী-রসুলের উপরে অধিকতর মর্যাদা প্রদানের জন্য কিতাব দান করেছি। তাকে তওরাত দান করে তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছি।

'ওয়া তাফসিলাল্ লিকুল্লি শাই ইঁউ ওয়া হুদাঁও ওয়া রহমাতা (যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ এবং দয়া স্বরূপ)। এখানে তাফসিল (বিশদ বিবরণ) শব্দটি একটি মূল শব্দ, যা কর্মকারক এবং মৌসুফ মাহ্জুফ (উহ্য বিশেষ্য) এর বিশেষণ হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'বিশদ বিবরণ' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল বিস্তারিত বিবরণাবলীকে, যেগুলো দ্বীন ধর্মের জন্য অত্যাবশ্যক।

শেষে বলা হয়েছে— লায়া'ল্লাহুম বিলিক্বাই রব্বিহিম ইউ'মিনুন (যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে)। এ কথার অর্থ— মুসাকে আমি তওরাত দিয়েছিলাম এ জন্যে, যেনো তাঁর সময়ের লোকেরা আল্লাহ্র সম্মুখে যে এক সময় জবাবদিহির জন্য দাঁড়াতেই হবে, সে সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে হাশর, সওয়াব ও আযাবকে (আখেরাতের শাস্তি ও স্বস্তিকে)।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ اَنْ
تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۙ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّاۤ اَهْدٰى
مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ
اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝

❒ এই কিতাব আমি অবতারণ করিয়াছি যাহা কল্যাণময়। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে;

❒ যেন তোমরা না বলিতে পার যে, 'কিতাব তো শুধু আমাদিগের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অনবহিতই ছিলাম,'

❒ কিংবা যেন তোমরা না বলিতে পার যে, 'যদি কিতাব আমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিশা পাইতাম।' এখন তো তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ-নির্দেশ ও দয়া আসিয়াছে। অতঃপর যে-কেহ আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যাহারা আমার নিদর্শন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদিগের এই আচরণের জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

'এই কিতাব আমি অবতারণ করেছি যা কল্যাণময়'— এ কথার অর্থ, রসুল মুসার উপরে আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, আর এখন অবতারণ করছি এই কোরআন। কল্যাণময়তার দিক থেকে এই কোরআন তওরাত অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগামী। এর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মর্মার্থ ব্যাপক। এটাই সর্বশেষ কিতাব। এখন সকল মানুষের জন্য এই কিতাবই একমাত্র অনুসরণীয়। এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে পরবর্তী বাক্যে এভাবে— 'সুতরাং, এর অনুসরণ কোরো এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।'

পরের আয়াতে (১৫৬) বলা হয়েছে—'যেনো তোমরা না বলতে পারো যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিলো; আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তো অনবহিতই ছিলাম।' এখানে 'দুই সম্প্রদায়' (ত্বইফাতাইনি) অর্থ ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপরও কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু সেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জিলের চেয়ে অধিকতর প্রসিদ্ধ নয়। তাই প্রসিদ্ধ কিতাব দু'টির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরববাসীদেরকে লক্ষ্য করে এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে— এই কোরআন তোমাদের প্রতি তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ করা হলো, যেনো তোমরা এর বক্তব্য সহজে বুঝে নিতে পারো। এ কথা যেনো বলতে না পারো যে তওরাত ও ইঞ্জিলের ভাষাতো আমরা বুঝি না (সুতরাং অনুসরণ করবো কিভাবে)।

এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে পরবর্তী আয়াতেও (১৫৭)। বলা হয়েছে— কিংবা যেনো তোমরা না বলতে পারো যে, যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো তবে আমরা তো তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিশা পেতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ নির্দেশ ও দয়া এসেছে।

বাগবী লিখেছেন, অবিশ্বাসীদের একটি দল বলেছিলো, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো আমাদের প্রতিও যদি কোনো কিতাব অবতীর্ণ হতো, তবে কতই না উত্তম হতো। এখানে উল্লেখিত 'বাইয়্যিনাতুম্ মির্‌রব্বিকুম' কথাটির অর্থ— প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। 'হুদান' অর্থ পথ নির্দেশ এবং 'রহমত' অর্থ দয়া। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে সুবিবেচকদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ, সত্যানুসন্ধানীদের জন্য নির্ভুল পথনির্দেশ এবং অনুগতদের জন্য রহমত। আলোচ্য বাক্যের বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! দ্যাখো তোমাদের আপন ভাষায় সর্বশেষ কিতাব আল কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে। এতে রয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণ, পথনির্দেশ ও দয়া।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর যে কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? যারা আমার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের এই আচরণের জন্য আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিবো।' এ কথার অর্থ— ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী কে— যে স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ এবং দয়ার আধার এই আল কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ও এর কল্যাণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে এ কথাও আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমার নিদর্শনের প্রতি বৈমুখ্য একটি গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ। যারা এই অপরাধে অপরাধী তাদেরকে অবশ্যই আমি নিকৃষ্ট শাস্তি (সুআল আ'যাব) দান করবো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

❒ তাহারা শুধু ইহারই প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদিগের নিকট ফেরেশ্‌তা আসিবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে। যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন যে-ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করে নাই তাহার বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে না। কিংবা যাহার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিল না তাহার সৎকর্মও কোন কাজে আসিবে না; বল, 'প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।'

'হাল ইয়ান জুরুনা ইল্লা আন তা'তিয়াহুমুল মালায়িকাতু আও ইয়া'তিয়া রব্বুকা আও ইয়া'তিয়া বা'দ্বু আয়াতি রব্বিক্' (তারা শুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে) এ কথার অর্থ— মক্কাবাসীরা কি শুধু এরই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের নিকট কোনো ফেরেশ্‌তা এসে রসুল স. এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সাক্ষ্য দিবেন অথবা অবতীর্ণ হবে তাঁর কোনো বিশেষ নিদর্শন? এখানে 'হাল ইয়ান জুরুনা' (তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে) কথাটি একটি নেতিবাচক জবাববিশিষ্ট প্রশ্ন (ইসতিফহামে ইনকারী)। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা আসলে ইমানের জন্যে প্রতীক্ষা করছে না, প্রতীক্ষা করছে তাদের মূর্খজনোচিত দাবি পূরণের জন্য। সে দাবিগুলো হচ্ছে— কোনো ফেরেশ্‌তা কিংবা আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং তাদের নিকটে এসে রসুল স. এর পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করবেন অথবা রসুল স. এর সত্যতার পক্ষে অবতীর্ণ হবে কোনো বিশেষ নিদর্শন। 'আল মালায়িকাতু' শব্দটির অর্থ ফেরেশ্‌তা। সাক্ষ্যদাতা ফেরেশ্‌তা অথবা মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা।

বায়যাবী বলেছেন, মক্কাবাসী মুশরিকেরা আসলে প্রতীক্ষারত ছিলো না। কিন্তু তাদের ভাব ছিলো এ রকম, যেনো তারা প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাদের ওই অভিব্যক্তিকে সত্য বলে ধরে নিয়েই এখানে বলা হয়েছে— তারা কি শুধু এরই প্রতীক্ষা করে।

এ রকমও হতে পারে যে 'ফেরেশ্‌তা আসবে' কথাটির অর্থ এখানে— হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশ্‌তারা সমবেত হবে। 'তোমার প্রতিপালক আসবেন'— কথাটির অর্থও তেমনি কিয়ামতের দিন হাশর প্রান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং যখন বিচারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হবেন। এ সম্পর্কে সুরা বাকারায় বলা হয়েছে— 'হাল ইয়ানজুরুনা ইল্লা আঁইয়াতইয়াইহুমুল্লহু ফি জিলালিম মিনাল গমামি ওয়াল মালায়িকাতি ওয়া কুদ্বিয়াল আমরা'(তারা কি অপেক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়া থেকে তাদের নিকট আসবেন আল্লাহ্‌ এবং ফেরেশতামণ্ডলী। আর নিষ্পত্তি হয়েছে বিষয়টি)।

ইয়াওমা ইয়া'তি বা'দু আয়াতি রব্বিকা (যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে)। এ কথার অর্থ— যেদিন প্রকাশিত হবে কিয়ামতের আলামত। বাগবী লিখেছেন কথাটির অর্থ, যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অভিমতটির সমর্থক। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর একটি মারফু বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর একদিন বক্তৃতাপ্রদানকালে বললেন, এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকও আসবে— যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করবে, মিথ্যা বলবে দাজ্জালের আবির্ভাবকে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়কে এবং রসুল স. এর শাফায়াতকে। কতিপয় লোক যে সাময়িক দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর শাস্তিমুক্ত হবে— সে কথাকেও অস্বীকার করে বসবে কেউ কেউ।

কিয়ামতের আলামতঃ হজরত হুযায়ফা বিন উসায়েদ গিফারী বর্ণনা করেছেন, আমরা একদিন নিজেদের মধ্যে কিয়ামত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। সহসা রসুলুল্লাহ্‌ স. সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, যতদিন পর্যন্ত কিয়ামতের পূর্বে দশটি নিদর্শন প্রকাশিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সেই দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ১. ধুম্র কুণ্ডলী ২. দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫. হজরত ঈসার অবতরণ ৬. ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, তিনবার পৃথিবী ধসে যাওয়া ৭. একবার পূর্বদিকে ৮. দ্বিতীয়বার পশ্চিম দিকে ৯. আরেকবার আরব দ্বীপে এবং ১০. পরিশেষে ইয়ামেনের আগুন— ওই আগুনগুলো মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এডেনের একটি কূপ থেকে আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের প্রান্তরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, দশটি নিদর্শনের মধ্যে একটি হবে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা'বায়ু। ওই ঝঞ্ঝা তুফান সকল মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন দু'টি হচ্ছে— পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং দিবসের প্রারম্ভে দাব্বাতুল আরদ্বের বহিঃপ্রকাশ। নিদর্শন দু'টোর প্রকাশকাল হবে পরস্পর সংলগ্ন। মুসলিম।

হজরত নাওআস বিন সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। বললেন, আমার পৃথিবীবাসের সময়ে যদি তার আবির্ভাব ঘটে, তবে আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা করবো। আর আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর যদি সে আত্মপ্রকাশ করে, তবে আত্মরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের। তোমরা সত্যপথে থাকলে নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। দাজ্জাল হবে নওজোয়ান। তার মাথায় থাকবে ঝাঁকড়া চুল। তার এক চোখ হবে ফোলা। মনে হবে চোখটি যেনো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। আবদুল উজ্জা বিন কাতানের সঙ্গে দাজ্জালের চেহারা তুলনা করা যায়। যদি তোমরা দাজ্জালের সাক্ষাত পাও, তবে সুরা কাহাফের প্রথম দিকের কিছু আয়াত পাঠ কোরো। যদি এ রকম করো তবে দাজ্জালের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। ইরাক এবং সিরিয়া দেশের মধ্যবর্তী খালাহ্ নামক স্থানে হবে তার আবির্ভাব। সে তার বাম এবং দক্ষিণের সকল কিছু ধ্বংস করতে থাকবে। হে আল্লাহ্র দাস সকল! তোমরা আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি (ইমানের প্রতি) সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। তার মধ্যে একটি দিন হবে এক বৎসরের সমান। আরেকটি দিন হবে এক মাসের সমান এবং অন্য আরেকটি দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো হবে এখনকার এক দিনের মতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে দিনটি এক বৎসরের সমান হবে সেই দিনে কি আমরা এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ পড়বো? তিনি বললেন, না। অনুমান করে এখনকার দিনের মতো একটি করে দিন নির্ধারণ করে নিয়ে প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে কি দ্রুত গতিসম্পন্ন হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাতাস যেমন বৃষ্টিকে পশ্চাতে রেখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে, তেমনি হবে তার গতি। তাকে যারা দেখবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বিশ্বাস করবে। দাজ্জালের হুকুমে তখন ওই লোকগুলোর জনপদে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। জন্ম হবে উদ্ভিদের। গৃহপালিত পশুগুলো চারণভূমি থেকে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে যখন, তখন দেখা যাবে তাদের স্তনগুলো দুধে ভরপুর। তারপর দাজ্জাল আরো কিছু লোকের সম্মুখীন হবে। তাদেরকেও সে তাকে বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান জানাবে। কিন্তু ওই লোকেরা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল অন্যত্র গমন করার পর ওই লোকগুলো

পড়ে যাবে বিপদে। তাদের সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃস্ব হয়ে পড়বে তারা। এরপর দাজ্জাল এক বিজন প্রান্তরের পথ ধরে গমন করবে। সে মৃতকে জীবিত করে দেখাবে। সকল সম্পদ থাকবে তার সঙ্গে, যেমন মৌচাকের সঙ্গে থাকে মৌমাছিরা। এরপর দাজ্জাল এক যুবককে তার তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে এবং তার শরীরের বিভিন্ন অংশ ফেলে দেবে বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু দাজ্জাল তার নাম ধরে ডাক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবক জীবিত হয়ে হাসতে হাসতে আত্মপ্রকাশ করবে। পৃথিবী জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। এমতাবস্থায় আকাশ থেকে অবতরণ করবেন হজরত ঈসা। তিনি আকসার মসজিদে শাদা মিনারের উপরে দু'জন ফেরেশ্‌তার কাঁধে ভর দিয়ে নামবেন। সামান্য মস্তক অবনত হলে তাঁর মস্তক থেকে ঝরে পড়বে রৌপ্যবিন্দুর মতো স্বেদবিন্দু। তার নিঃশ্বাস যে অবিশ্বাসীর উপর পতিত হবে, সে তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত পতিত হতে থাকবে তাঁর নিঃশ্বাস। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বেড়াবেন। অবশেষে বাবে লাদ নামক স্থানে তাকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে ফেলবেন। এরপর হজরত ঈসার নিকটে কতিপয় লোক আসবে যাদেরকে আল্লাহ্‌পাক দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। হজরত ঈসা তাদের মুখমণ্ডল থেকে আবিলতা অপসারণ করবেন এবং তারা যে জান্নাতের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, সে কথা তাদেরকে বলবেন।

এরপর আল্লাহ্‌পাক হজরত ঈসার নিকট এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠাবেন যে, আমার এমন কিছু বান্দা রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি কারো নেই। তাই তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে তুর পর্বতে গমন করো। এরপর পৃথিবীতে দলে দলে ছড়িয়ে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের দল। প্রতিটি উচ্চ ভূমির পশ্চাৎদেশ থেকে তারা হঠাৎ বের হয়ে পড়বে। তারা হবে অসংখ্য। তাদের প্রথম দল তিবরিয়া সাগর অতিক্রম করার সময় সেখানকার সকল পানি পান করে ফেলবে এমনভাবে যে, পানির কোনো চিহ্নই সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের পরবর্তী দল সেখানে এলে বলবে, এখানে কখনোই কোনো পানির অস্তিত্ব ছিলো না। পথ চলতে চলতে তারা উপনীত হবে বায়তুল মাকদিসে খামর পর্বতে। বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আমরা হত্যা করবো আকাশবাসীকে। এই বলে তারা তাদের ছোট ছোট তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করবে। তীরগুলো মাটিতে পড়লে তারা দেখবে সেগুলোর অগ্রভাগে লেগে রয়েছে রক্ত। ওই রক্ত দেখে তারা খুব খুশী হবে। আল্লাহ্‌র রসুল হজরত ঈসা সে সময়ে তাঁর সাথীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তুর পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকবেন। অবস্থা তখন এমনই সংকটাপন্ন হবে যে, একটি ষাঁড়ের রান হবে তাদের জন্য অতি উত্তম— যেমন এখনকার একশত স্বর্ণমুদ্রা উত্তম। হজরত ঈসা ও তাঁর সহচরবৃন্দ ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। তাঁর প্রার্থনা গৃহীত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইয়াজুজ মাজুজদের ঘাড়ে ফোঁড়া অথবা গলায়

গলগণ্ড রোগ সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে নিরাময়হীন ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা একে একে সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। তুর পাহাড় থেকে নেমে আসবেন হজরত ঈসা এবং তাঁর সাথীরা। কিন্তু দেখবেন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইয়াজুজ মাজুজদের উৎকট দূর্গন্ধে ভরা অসংখ্য মরদেহ। অসহ্য দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে হজরত ঈসা তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন উটের মতো দীর্ঘ গলদেশ বিশিষ্ট এক ঝাঁক পাখি পাঠিয়ে দেবেন। পাখিগুলো তাদের মৃতদেহগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌পাক যেখানে ইচ্ছে করবেন সেখানে নিক্ষেপ করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা ওই মৃতদেহগুলো নিক্ষেপ করবেন নাহবল নামক স্থানে।

জ্ঞাতব্যঃ কামুস রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, ইমাম তিরমিজির হাদিস গ্রন্থে রয়েছে নাহবল নামক স্থানের কথা। কিন্তু উচ্চারণটি ঠিক নয়। নুন এর স্থলে মিম অক্ষর বসালে শব্দটি হবে মাহবল। আর এটাই সঠিক উচ্চারণ।

মৃত ইয়াজুজ মাজুজদের তীর এবং তীরাধারগুলোকে সাত বছর ধরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করবে তখনকার মুসলমানেরা। এভাবে ইয়াজুজ মাজুজ নিধনের পর সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হবে তুমুল বৃষ্টি। ওই বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে সারা পৃথিবী। কোনো কিছুই তখন আর অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র থাকবে না। পৃথিবীতে নূতন করে উৎপন্ন হবে সব্‌জি ও অন্যান্য উদ্ভিদ। তখনকার মাটি হবে অত্যন্ত উর্বর। ফলমূল হবে আকারে অনেক বড়। একটি আনার অথবা বেদানা ভক্ষণ করলে পরিতৃপ্ত হবে একটি দল। তারা আনারের খোসা দিয়ে বানাবে ঘরের ছাদ। দুধের মধ্যেও দান করা হবে অনেক বরকত। একটি বড় গোত্রের মানুষের জন্য একটি উটের দুধই হবে যথেষ্ট। গাভীর দুধ যথেষ্ট হবে একটি উপ-গোত্রের জন্য এবং একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে একটি ছাগলের দুধ। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন প্রবাহিত করে দিবেন একটি সুবাসিত বাতাস। ওই বাতাস ইমানদার লোকের বগলে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জীবনাবসান হবে। এভাবে ইমানদারেরা চলে গেলে পৃথিবীতে পড়ে থাকবে কেবল অসৎ লোকেরা। তারা শুরু করবে বিশৃংখলা ও হানাহানি— যেমন করে নিজেদের মধ্যে বিশৃংখলা ও হানাহানি সৃষ্টি করে গর্দভের দল। এদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে কিয়ামত। তিরমিজি। মুসলিমও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। তবে তাঁর বর্ণনায় এই কথাগুলো নেই।

হজরত হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের কাছে থাকবে স্বচ্ছ সলিল ও জ্বলন্ত অনল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই স্বচ্ছ সলিলই হবে অগ্নিকুণ্ড এবং ওই জ্বলন্ত অনল হবে সুমিষ্ট সলিল। তোমরা দাজ্জালকে পেলে তার আগুনে ঝাঁপ দিও। তবেই তোমরা লাভ করবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে এই কথাগুলো— দাজ্জালের এক চোখ হবে অন্ধ এবং পর্দাবৃত। আর থাকবে একটি বৃহৎ নখর। তার দু'চোখের

মাঝখানে লেখা থাকবে— কাফের। ওই লেখাটি কেবল ইমানদারেরা পড়তে পারবে— তাদের অক্ষরজ্ঞান থাকুক অথবা নাই থাকুক।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, দাজ্জালের সাথে থাকবে বেহেশত ও দোজখের প্রতিকৃতি (বেহেশতের আরাম অথবা দোযখের কষ্ট)। সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটাই হবে আসলে জান্নাত। আর যেটাকে সে বলবে জান্নাত সেটাই হবে আসলে দোজখ। মুসলিমে বর্ণিত হজরত হুযায়ফার বর্ণনায় এ রকমই বলা হয়েছে। মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হজরত আবু সাঈদ খুদরীর আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালকে দেখলে ইমানদারেরা বলবে, এই সেই দাজ্জাল, যার কথা রসুল স. বলেছেন। দাজ্জাল তখন তাদেরকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেঁড়ে আলাদা করে ফেলবে। তাদের দ্বিখণ্ডিত দেহের মাঝখানে বসে সে বলবে, হে ইমানদারেরা! ওঠো। দণ্ডায়মান হও। মৃত ইমানদারেরা তখন জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল বলবে, কী— এবার কি আমার উপর বিশ্বাস এসেছে? ইমানদারেরা বলবে, হ্যাঁ এবার আমাদের বিশ্বাস হয়েছে আরো বেশী মজবুত (তুমি নিশ্চয়ই দাজ্জাল)।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, দাজ্জালের কঠিনতম ফেৎনাটি হবে এ রকম— সে এক আরববাসীকে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত উটনীকে জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে প্রভুপালক বলে স্বীকার করবে? লোকটি বলবে, অবশ্যই করবো। তখন শয়তান উটনীর রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হবে। ওই উটনীটির থাকবে পুরুষ্ট স্তন এবং উঁচু কুঁজ। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে— পিতৃহারা ও ভ্রাতৃহারা এক লোকের নিকট গিয়ে দাজ্জাল বলবে, তোমার পিতা ও ভাইকে আমি যদি জীবিত করে দেই তবে তুমি কি আমাকে প্রভুপ্রতিপালক বলে মানবে? লোকটি বলবে, অবশ্যই মানবো। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দু'টি শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার আকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

অনালোচিত আলোচনা ঃ ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন বর্ণিত আলামতগুলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর আয়ুষ্কাল যদি একদিনও বাকী থাকে তবু আল্লাহ্ ওই দিনকে করে দিবেন সুদীর্ঘ এবং এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে হবে আমাদের। অথবা বলেছেন, সে হবে আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামের মতো (তার নাম হবে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্)। এখনকার মতো ওই সময়েও অত্যাচার ও অবিচারে ভরে থাকবে সারা পৃথিবী। পৃথিবীতে সে প্রতিষ্ঠা করবে সাম্য ও

ন্যায়বিচার। তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতদিন না আরব সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে আমার আহলে বাইতের একজন। আমার নামের মতো তার নামও হবে মোহাম্মদ।

হজরত উম্মে সালমার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক খলিফার মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হবে। তখন মদীনাবাসীদের একজন চলে যাবেন মক্কায়। মক্কাবাসীরা তাকে গৃহ থেকে বের করে নিয়ে আসবে। তিনি কিন্তু জনতার এমতো আচরণে প্রসন্ন হবেন না। তৎসত্ত্বেও রুকন (হজরে আসওয়াদ) এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যস্থলে তিনি জনতাকে বায়াত করাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিরিয়া থেকে প্রেরিত হবে একটি বাহিনী। কিন্তু আল্লাহ্পাক তাদেরকে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী বায়দা নামক স্থানে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিবেন। মানুষ এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হবে। তাঁর কাছে আসবে সিরিয়ার আবদাল এবং ইরাকের একটি দল। তারা সকলে তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করবে। ওই ব্যক্তি হবেন রসুলের আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। আর কেবল ইসলামের জন্য তিনি মাটিতে বিছিয়ে দিবেন তাঁর বুক (সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম)। সাত বৎসর পৃথিবীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি পরলোক গমন করবেন। মুসলমানেরা তাঁর জানাজা পড়বে। আবু দাউদ।

আবু দাউদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, একদিন হজরত আলী হজরত হাসানকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আমার এই প্রিয় পুত্র সাইয়েদ। রসুল স. নিজে এঁকে সাইয়েদ বলেছেন। এঁর পরবর্তী বংশধারা থেকে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন— যাঁর নাম হবে তোমাদের নবীর নামের অনুরূপ। স্বভাবগত দিক দিয়েও তিনি হবেন তোমাদের নবীর মতোন— যদিও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে সে রকম হবেন না। সমগ্র পৃথিবীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন ন্যায়ের শাসন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম মাহদী সম্পর্কে এ কথাও এসেছে যে, তখন এক ব্যক্তি বলবে, হে ইমাম মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন। ইমাম মাহদী তখন ওই ব্যক্তিকে দু'হাত ভরে দান করবেন, যতটুকু সে বহন করতে পারে। তিরমিজি।

হাকেম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীরা তার প্রতি তুষ্ট থাকবে। তখন মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হবে পৃথিবীতে। উৎপন্ন হবে প্রচুর ফল ও ফসল। ওই অভূতপূর্ব প্রাচুর্য দেখে তখনকার লোকেরা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য বলবে হায়! আজ যদি তারা জীবিত থাকতো তবে ফল ও ফসলের এই বিশাল সমারোহ দেখে পরিতৃপ্ত হতে পারতো। ইমাম

মাহদী সাত, আট অথবা নয় বছর পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তারপর চলে যাবেন পরপারে।

'যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। কিংবা যার বিশ্বাস কল্যাণপ্রসূ ছিলো না তার সৎকর্মও কোনো কাজে আসবে না'। আলোচ্য বক্তব্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— ইমান আনতে হবে যথা সময়ে। অর্থাৎ মৃত্যুকষ্ট শুরু হওয়ার পূর্বে। ইমান আনতে বলা হয়েছে অদৃশ্য বিষয়সমূহের উপর। যখন মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা এসে উপস্থিত হয়, যবনিকা উম্মোচিত হয় পরকালের— তখন তো বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ আর অদৃশ্য থাকে না। তাই তখনকার ইমান গৃহীতও হয় না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, সৎকর্ম বা আমল ব্যতীত শুধু ইমানের মাধ্যমে কোনো উপকার লাভ হয় না। তাই মৃত্যুর পূর্বে ইমান আনা হলেও আমলবিহীন ইমানও গ্রহণীয় নয়।

আমি বলি, এই আয়াতের মর্মার্থ এটা নয় যে, সৎকর্মহীন ইমান গ্রহণীয় নয়। এখানে বরং এ কথাই বলা হয়েছে যে, পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে ইমান আনলেও নেক আমল করার আর সুযোগ থাকে না। তাই ওই সময়ের নেক আমলহীন ইমান গ্রহণ করা হয় না। এ রকমও জবাব দেয়া যেতে পারে যে, একই সঙ্গে উল্লেখিত দু'টি কর্মের যদি একটি না সূচক হয়, তবে অপর কর্মটিও ওই না সূচকতার বৃত্তভূত হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—'ওয়ালা তুতিয় মিনহুম আছিমান আওকাফুরা' (এবং তাদের পাপ ও অবিশ্বাস ফলপ্রসূ হবে না)। এখানে 'আছিমান' (গোনাহ্) এবং 'কাফুরা' (অবিশ্বাস) শব্দ দু'টির মাধ্যমে আনুগত্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ইছমান শব্দটি এখানে 'লা' শব্দের অন্তর্গত এবং কাফুরা শব্দটি এখানে এসেছে 'আও' শব্দের পরে। কিন্তু আনুগত্য নিষিদ্ধকরণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এখানে আছিমান ও কাফুরা— দু'টি শব্দেরই সঙ্গে)। এই ব্যাখ্যানুসারে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে এ রকম— যে সারা জীবন ধরে ইমান আনে নি, তার মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ের ইমান কোনো উপকারে আসবে না এবং যে জীবদ্দশায় কোনো পুণ্যকর্ম করেনি, তার জন্যও মৃত্যুর সময়ের ইমান কোনো উপকারে আসবে না।

বাগবী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের অর্থ হবে এ রকম— মৃত্যুযন্ত্রণার সময় কোনো কাফের ইমান আনলে তা গৃহীত হবে না এবং কোনো ফাসেক তওবা করলে তা কবুলও হবে না। এখানে 'ফি ইমানিহা' কথাটির মধ্যে যে ইমানের উল্লেখ রয়েছে সেই ইমানের পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে তওবা। তওবা বলতে অবিশ্বাস থেকে তওবা এবং পাপ থেকে তওবা দু'টোই বুঝায়।

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ্ পশ্চিম দিকে তওবার জন্য একটি তোরণ নির্মাণ করেছেন। ওই তোরণের প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথের পরিসরের সমান। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় না ঘটা পর্যন্ত ওই তোরণ কখনও রুদ্ধ হবে না। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে'— কথাটির মাধ্যমে ওই তোরণ রুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তাই কথাটির অর্থ হবে— যেদিন তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন স্বরূপ পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঘটবে এবং রুদ্ধ হয়ে যাবে তওবার তোরণ। হজরত সাফওয়ান বিন আসসাল থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তওবা কবুল করার জন্য রাতে আল্লাহ্ তাঁর হস্ত প্রসারিত করে দেন, যেনো দিনের পাপীরা তওবা করে। আর দিনে তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করেন এ জন্যে যেনো রাতের পাপীরা তওবার সুযোগ পায়। এভাবে দিবস ও নিশিথের বিরতিহীন তওবার এই সুযোগ চলতেই থাকবে, যতক্ষণ না সূর্যোদয় ঘটবে পশ্চিম আকাশে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বে যে তওবা করবে, আল্লাহ্পাক তার তওবা কবুল করবেন।

হজরত মুয়াবিয়া থেকে আহমদ, দারেমী এবং আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স, জানিয়েছেন, তওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত নিষিদ্ধ হবে না এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দরজাও বন্ধ হবে না।

উপরের বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, 'সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে বিশ্বাস করেনি'— কথাটির অর্থ হবে, সেদিন যে ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে তওবা করেনি। কিন্তু কোনো কোনো হাদিসে 'ইমান' শব্দের দ্বারা তওবা ছাড়া অন্য অর্থ বুঝানো হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে স্বসূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পশ্চিম দিকে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। পশ্চিম দিকে সূর্য উঠতে দেখলে সকলেই ইমান আনবে। তখন পুণ্যকর্মের সুযোগও থাকবে না। সে সময়ের পুণ্যকর্মবিহীন ইমান উপকারে আসবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যারা ইমান আনবে না এবং ইমানসহ সৎকর্ম করবে না— তাদের ইমান তাদেরকে কোনো সুফলই দান করবে না। ওই বিষয়

তিনটি হচ্ছে— ১. দাজ্জালের আবির্ভাব ২. দাব্বাতুল আরদ্বের বহিঃপ্রকাশ এবং ৩. পশ্চিমাকাশের সূর্যোদয়। এই হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত তিনটি ঘটনার পূর্বে যারা ইমান আনবে না, তাদের ইমান গৃহীত হবে না।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি বর্ণিত নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইমান আনবে না এবং নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে ইমান আনবে— তাদের ইমানকে গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি কারো জন্ম বর্ণিত নিদর্শন সমূহের আংশিক অথবা সামগ্রিক প্রকাশের পরে হয়, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি ইমান আনে, তবে তা গৃহীত হবে।

কিতাবুল ওফা নামক গ্রন্থে ইবনে জাওজী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। বিবাহ করবেন। তাঁর সন্তানাদি হবে। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হওয়া পর্যন্ত তিনি বসবাস করবেন এই পৃথিবীতে। তারপর পৃথিবী পরিত্যাগ করবেন। আমার কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হবে। কিয়ামত দিবসে আমি ও হজরত ঈসা আবু বকর ও ওমরকে নিয়ে পুনরুত্থিত হবো।

শেষে বলা হয়েছে— 'কুলিনতাজিরু ইন্না মুনতাজিরুন' (বলো, প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী মক্কাবাসী সকল! তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা শেষে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাবে— আমরা সফল এবং তোমরা বিফল।

সুরা আন্আ'মঃ আয়াত ১৫৯

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

❒ যাহারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদিগের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নাই; তাহাদিগের বিষয় আল্লাহের ইখ্তিয়ারভুক্ত; আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

'ইন্নাল্লাজিনা ফার্‌রাকু দিনাহুম' (যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানান মতের সৃষ্টি করেছে)। এ কথার অর্থ— যারা ধর্মের কোনো কোনো বিধান বিশ্বাস করেছে এবং কোনো কোনো বিধানকে করেছে অস্বীকার। অথবা যারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে খৃষ্টান ও ইহুদীদেরকে। বনী ইসরাইলেরা কেউ কেউ হয়েছে খৃষ্টান এবং কেউ কেউ হয়েছে ইহুদী। অথচ সকলের ধর্মাদর্শ মূলতঃ এক। এ উক্তিটি কিন্তু ভুল। কেননা ইহুদীধর্মের ভিত্তিমূল ছিলো হজরত মুসার নবুয়ত ও শরিয়তের উপর। আর খৃষ্টধর্মের ভিত্তি ছিলো হজরত ঈসার আনীত ধর্মমতের উপর। তাঁদের দু'জনেরই মৌলিক ধর্মাদর্শের ভিত্তি হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপর। এরপর ইহুদীরা হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করে বসলো। আর খৃষ্টানেরা অস্বীকার করে বসলো রসুলুল্লাহ্ স. এর নবুয়তকে। তাই তারা সকলে হয়ে গেলো অবিশ্বাসী। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সে কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে— তারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় সত্যধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলো তাদের অনেক মনগড়া প্রথা। এভাবে তারা স্বমতের বশবর্তী হয়ে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন দল, উপদল। এই ব্যাখ্যানুসারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধর্মবিকৃতকারী সকল দল, উপদল এই আয়াতের মর্মার্থের অন্তর্ভূত করা যায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতেরাও প্রতি পদে ওই ঘটনাগুলোই ঘটাবে, যা বনী ইসরাইলেরা ঘটিয়েছিলো। এমন কি বনী ইসরাইলদের কেউ যদি মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ না কেউ এ রকম করবে। বনী ইসরাইলেরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বাহাত্তরটি দলে। আর তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে আমার উম্মতেরা। ওই তিয়াত্তরটি দলের মধ্যে বায়াত্তরটিই হবে জাহান্নামী। কেবল একটি হবে জান্নাতী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! জান্নাতী দলটির পরিচয় কী? তিনি স. বললেন, যে দল হবে আমি ও আমার সহচরবৃন্দের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিরমিজি, আবু দাউদ।

হজরত মুয়াবিয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিয়াত্তরটি দলের মধ্যে বাহাত্তরটি নিক্ষিপ্ত হবে দোজখে। আর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে কেবল একটি দল। ওই দলটি জমহুরের। অতি শীঘ্র আমার উম্মতের মধ্যে প্রবল প্রবৃত্তিপ্রবণ মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। পোষা কুকুর যেমন তার মালিকের সঙ্গে অলিতে গলিতে বা রাস্তার মোড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষী করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি তারা হবে প্রবৃত্তিপরায়ণতালগ্ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, তিরমিজি ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম। তিরমিজি ও হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাটি এ রকম— ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছে একাত্তরটি দলে। তাদের একটি দল ছাড়া অন্যগুলো জাহান্নামী। বায়াত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে খৃষ্টানেরা। তাদের মধ্যেও একটি দল ছাড়া অন্য দলগুলো দোজখী। আর আমার উম্মতের তিয়াত্তরটি দলের মধ্যে বাহাত্তরটিই প্রবেশ করবে জাহান্নামে। কেবল একটি দল যাবে জান্নাতে।

হজরত ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. জননী আয়েশাকে বলেছেন, হে আয়েশা! যারা ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে তারাই বেদাতী এবং তারাই কুপ্রবৃত্তির অনুগত (আলোচ্য বাক্যে তাদের কথাই বলা হয়েছে)। তিবরানী প্রমুখও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সুদৃঢ় সূত্রপরম্পরার মাধ্যমে। উত্তম সূত্রে তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে।

হজরত ইরবাস বিন সারিয়াহ্ থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। ওই বক্তৃতা শুনে আমরা ভীত হলাম। অশ্রু নির্গত হতে শুরু করলো সকলের চোখ থেকে। তিনি স. বললেন, আমি উপদেশ দিচ্ছি— তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তোমাদের নেতার অনুগত হও, যদিও সে নেতা হাবসী ক্রীতদাস হয়। আমার অন্তর্ধানের পর তোমরা দেখতে পাবে অনেক মতবিরোধ। তখন তোমরা আমার আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ দৃঢ়ভাবে ধারণ কোরো। এই পথই হেদায়েতের পথ। তাই অত্যন্ত মজবুতভাবে তোমরা এই পথকে আঁকড়ে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে এবং নতুনত্ব থেকে বেঁচে থাকবে। প্রতিটি নতুনত্বই বেদাত এবং প্রতিটি বেদাতই ভ্রষ্টতা। তিরমিজি ও ইবনে মাজার বর্ণনায় 'আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন'— কথাটি নেই। অন্য বিবরণগুলো সেখানে অবিকল এক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে মাসাবীহ্ রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা আমার আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদেরই অনুসরণ করবে তোমরা। আর যারা এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দোজখের দিকে যাত্রা করেছে, তোমরা তাদের অনুসরণ কোরো না। ইবনে মাজা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমার উম্মতেরা কোনো ভুল বিষয়ে একমত হবে না। জমহুরের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। যারা জমহুরের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত তারা জাহান্নামী।

হজরত মুয়াজ থেকে আবু দাউদ ও আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র বিধান বিবর্জিত স্বমতাবলম্বী দল থেকে দূরে থাকো। ভালোবাসো জমহুরের জামাতকে।

হজরত আবু জর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি (সত্যানুসারী) জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করলো, সে তার কণ্ঠ থেকে খুলে ফেললো ইসলামের রজ্জু। আবু দাউদ, আহমদ। এখানে জামাত অর্থ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের জামাত।

আল্লাহ্তায়ালা রসুল স. কে কিতাবসহ প্রেরণ করেছেন। কিতাব ছাড়াও তিনি তাঁর প্রিয় রসুলকে আরো কিছু প্রত্যাদেশ দিয়েছেন, যেগুলোর মর্ম আল্লাহ্তায়ালার। কিন্তু ভাষা হজরত জিবরাইলের অথবা রসুল স. এর নিজের। ওই প্রত্যাদেশগুলোকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মতলু। আবার কিতাব বা আল কোরআনের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট। সেগুলো অজটিল, তাই সন্দেহমুক্ত। আর কিছু আয়াত জটিল ও রহস্যময়। ওই আয়াতগুলোকে বলে আয়াতে মুতাশাবেহাত্— যা সর্বসাধারণের অবোধ্য। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার নবী-রসুলগণ ওই আয়াতগুলোর মর্মার্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত। কেননা আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং এরশাদ করেছেন— 'ছুম্মা ইন্না আ'লাইনা বায়ানাহ্' (অতঃপর নিশ্চয়ই আমার দায়িত্ব হচ্ছে সেগুলোকে বর্ণনা করা)। ওহীয়ে মতলু এবং ওহীয়ে গায়ের মতলুর মাধ্যমে রসুল স. যে জ্ঞান পেয়েছিলেন, সেই জ্ঞান তিনি দান করেছেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছে সেই জ্ঞানেরই ধারাবাহিকতা। তাই আল্লাহ্র কিতাব, রসুলের জীবনাদর্শ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণের অভিমতকে মান্য করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। যে সকল আয়াত ও হাদিসের মর্মার্থ স্পষ্ট নয়, সেগুলো সম্পর্কে সাহাবীগণের মতামতকে শিরোধার্য করতে হবে। যারা স্বমতাবলম্বী এবং প্রবৃত্তিতাড়িত, তাদের কথার মধ্যে কোরআনের অনুকূল যতটুকু পাওয়া যাবে, ততটুকু মান্য করতে হবে। আর যা কোরআনের অনুকূল নয়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ তারা সুবিধাবাদী। রসুল স. এবং সাহাবীগণের তাফসীরকে তারা বিকৃত করে দেয়। এভাবে তারা অস্বীকার করে বসে আল্লাহ্র দীদার, কবরের আযাব, আমলনামা, পাপ-পুণ্যের ওজন, পুলসিরাত এবং হিসাব-নিকাশকে । তারা আল্লাহ্র কালামকে বলে সৃষ্ট। অথচ আল্লাহ্র কালাম যে চিরন্তন, সে বিষয়ে কোরআন ও হাদিসে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সংঘটিত হয়েছে সাহাবীগণের ঐকমত্যও। ওই সকল প্রবৃত্তিতাড়িতরা প্রকৃত ধর্মকে ত্যাগ করে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গ্রহণ করেছে কিছু অংশ। আর কিছু অংশ করেছে পরিত্যাগ। এ রকম করেছে মোতাজিলারাও। তারা বলে থাকে, বান্দার জন্য যা কল্যাণকর, তা বান্দাকে দান করা আল্লাহ্তায়ালার উপরে বাধ্যতামূলক। তারা তকদীরকে অস্বীকার করে। তওবা করা সত্ত্বেও কবীরা গোনাহ্ মাফ হওয়াকে বলে অসম্ভব। তারা এ রকমও বলে থাকে যে, বান্দা নিজেই তার আপন কর্মের স্রষ্টা। তারা বলে, আল্লাহ্তায়ালাই তার বান্দাগণের স্রষ্টা। কিন্তু বান্দাদের কর্মের স্রষ্টা তারা নিজেই। তাই এই দলটি প্রকৃত ইসলামী পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে হয়েছে অগ্নিপূজকদের তুল্য। অগ্নিপূজারীরা বলে শুভকর্ম ও নূরের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তায়ালা। আর পাপ ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা শয়তান। এভাবে তারা ওই দু'টি শক্তিকে মনে করে নিয়েছে তাদের সৃষ্টিকর্তা। একটির স্রষ্টা শুভ এবং অন্যটির অশুভ। মোতাজিলারাও তেমনি দুই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের অভিমত হচ্ছে— সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা যদিও আল্লাহ্, কিন্তু বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা সে নিজেই।

রসুল স. বলেছেন, কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় অগ্নি-উপাসক (তুল্য)। তাদের পীড়িত ব্যক্তির সেবাযত্ন কোরো না। আর মারা গেলে তাদের জানাযায় যেয়ো না। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ।

রসুল স. বলেছেন, ইসলামে ওই দু'দলের কোনো অংশ নেই। দল দু'টো হচ্ছে মারজিয়াহ্ এবং কাদরিয়াহ্ (মারজিয়াহ্‌রা বলে, কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান আনলেই সকল আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যাবে— ইবাদত বন্দেগী করার কোনো প্রয়োজনই নেই। তারা যেহেতু ইমানদার, তাই তারা পাপ করলেও আযাব হবে না)। তিরমিজি।

জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন ছয় ধরনের মানুষের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র, আমার ও অন্যান্য নবীর অভিসম্পাত। তারা হচ্ছে— ১. আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজনকারী। ২. তকদীর অস্বীকারকারী। ৩. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অবৈধ কর্মে নিয়োগকারী— আল্লাহ্ যাদেরকে সম্মান দান করেছেন তাদের অপদস্থ এবং যাদেরকে করেছেন অপদস্থ, তাদেরকে সম্মানকারী। ৪. যে সকল বস্তুকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন সে সকল বস্তুকে হালালকারী। ৫. আমার বংশের লোকদের সঙ্গে এমন আচরণকারী— যা আল্লাহ্‌পাক করেছেন নিষিদ্ধ এবং ৬. আমার আদর্শ পরিত্যাগকারী। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রজিন তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর 'মাদখাল' নামক পুস্তকে।

আমি বলি, আল্লাহ্‌র কিতাবের সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজনকারী দলটি হচ্ছে রাফেজী। তাদের বিশ্বাস— কোরআন মজীদে আরো অনেক আয়াত ছিলো, সাহাবীগণ সেগুলো বাদ দিয়েছেন। অথচ কোরআন মজীদেই রয়েছে— 'ইন্না লাহু লা হাফিজুন' (নিশ্চয় আমি কোরআনকে সংরক্ষণ করবো)। এই আয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তকদীর অস্বীকারকারী দলটি হচ্ছে কাদরিয়াহ্। তারা মনে করে মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা এবং আপন ভাগ্যলিপি রচনাকারী। আর খারেজীরা হচ্ছে ওই দল— যারা রসুল স. এর বংশধরদের সঙ্গে ওইরূপ আচরণ করে— যা আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ। রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগকারী দলটি হচ্ছে বেদাতী সম্প্রদায়। তারা স্বমতের অনুসারী। পবিত্র কোরআনের 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দানকারী। সলফে সালেহীন প্রদত্ত কোরআনের ব্যাখ্যা তারা মানে না। এরা সৃষ্টির গুণাবলীকে আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর সমতুল্য মনে করে। আল্লাহ্‌তায়ালাকে মনে করে শরীর

বিশিষ্ট। তাদের মতো আরো দু'টি দল রসুল স. এর আদর্শ পরিত্যাগকারীদের মধ্যে গণ্য। রাফেজীরা তো ধর্ম পরিত্যাগকারীদের মতোই। তারা কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে। কোরআন নির্ভরতাকেই করেছে অস্বীকার। তারা বলে, হজরত ওসমান কোরআনের এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়েছেন। ইচ্ছে মতো কোরআনের সঙ্গে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। রসুল স. এর সুন্নতকেও পরিত্যাগ করেছে রাফেজীরা। তারা সাহাবীগণকে মুরতাদ ও কাফের বলে। অথচ সাহাবীগণই হাদিস শরীফের বর্ণনাকারী। তাঁরা রসুল স. এর পবিত্র বাণী সরাসরি শুনে প্রচার করেছেন। তাই তাঁদেরকে অস্বীকার করলে রসুল স. এর সকল হাদিসকে অস্বীকার করা হয়। রাফেজীরা সাহাবীগণের ঐকমত্যকেও অস্বীকার করে। আর মনগড়া হাদিস তৈরী করে সেগুলোর সঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক, ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। তাদের মূল নীতি হচ্ছে তাকিয়া বা আত্মগোপন। এর অর্থ হচ্ছে— জনসাধারণের নিকট সব কিছু প্রকাশ করা যাবে না। হজরত আলী এবং আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামগণ তাকিয়া অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা নাকি বলেছিলেন, দেয়ালেরও কান আছে। সুতরাং সাবধান! জনসমক্ষে আসল কথা প্রকাশ কোরো না। প্রকৃত হেদায়েত নাকি এভাবেই ইমামগণের মাধ্যমে গোপনে গোপনে চলে এসেছে। নিঃসন্দেহে এ সকল বিশ্বাস হচ্ছে শয়তানি বিশ্বাস— যা প্রকারান্তরে অবিশ্বাস বৈ অন্য কিছু নয়। ইহুদী মুনাফিকেরাই রাফেজী মতবাদের প্রকৃত রচয়িতা। ওই মুনাফিকদের অগ্রণী হচ্ছে— আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা। সে ছিলো ইহুদী এবং মুনাফিক। আস্সাইফুল মাসলুল গ্রন্থে তাদের অপবিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

রাফেজীরা নিজেদেরকে বলে শিয়া। কোরআনের এটিও একটি মোজেজা যে, রাফেজীদের অভ্যুদয়ের পূর্বেই তাদেরকে শিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই এখানে পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'ওয়া কানু শিয়াআন' (এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে)।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. স্বয়ং আমাকে বলেছেন, তোমার দৃষ্টান্ত হজরত ঈসার মতো। তাঁকে ইহুদীরা ঘৃণা করতো। আর খৃষ্টানেরা করতো অতি ভক্তি। ইহুদীরা তাঁকে বলে ব্যভিচারিণীর পুত্র। আর খৃষ্টানেরা বলে আল্লাহ্র পুত্র। হজরত আলী বলেছেন, আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে দুই শ্রেণীর মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল ধ্বংস হবে অতিরিক্ত ভালোবেসে। তারা আমাকে এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করবে, যে মর্যাদা আমার মধ্যে নেই। আরেক

দল ধ্বংস হবে আমাকে ঘৃণা করে। তারা মনে করবে আমি ইসলামের শত্রু। আহমদ।

হজরত আলীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল রাফেজী নামে অভিহিত হবে। প্রকৃত ইসলামকে ত্যাগ করবে তারা। বায়হাকী।

হজরত আলী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার অন্তিম যাত্রার পর অভ্যুদয় ঘটবে রাফেজীদের। তাদেরকে পেলে হত্যা কোরো। নিঃসন্দেহে তারা মুশরিক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তাদেরকে চিনবো কিভাবে? তিনি স. বললেন, তারা সীমালংঘন করে তোমাকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করবে— যা তোমার মধ্যে নেই। তোমার পূর্বসূরীদেরকে অপবাদ দিবে তারা। দারা কুতনী। দারা কুতনী কর্তৃক অন্য একটি সূত্রেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে যে কথাগুলো অতিরিক্ত রয়েছে, তা হচ্ছে— তারা আমার আহলে বাইতের মহব্বতের দাবিদার হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা আহলে বাইতকে ভালোবাসবে না। তাদেরকে চিনবার সহজ উপায় হচ্ছে তারা আবু বকর ও ওমরকে গালি দিবে। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। আমি সেগুলোকে আমার আস্‌সাইফুল মাসলুল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।

আলোচ্য আয়াতের পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'লাসতা মিনহুম ফি শাইয়্যিন' (তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই)। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! বিভিন্ন দলে বিভক্ত ওই সকল ভ্রষ্টদের সঙ্গে আপনার কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। আরবী পরিভাষানুসারে এখানে লাস্‌তা মিনহুম কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি তুমি এরূপ করো তবে জেনো, তোমার সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্নামা আমরুহুম ইলাল্লহ্' (তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত)। এ কথার অর্থ— বিভিন্ন দলে বিভক্ত ওই সকল লোকদেরকে শাস্তিদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। সত্যপথ থেকে দূরত্বের পরিমাণানুসারে তিনি তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। শেষে বলা হয়েছে— 'ছুম্মা ইউনাব্বিউহুম বিমা কানু ইয়াফয়া'লুন' (আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাবেন। প্রথমে শাস্তি দিবেন তাদের অপবিশ্বাসের জন্য। তারপর মন্দ আমলের জন্য।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

❒ কেহ কোন সৎকার্য করিলে সে তাহার দশগুণ পাইবে এবং কেহ কোন অসৎকার্য করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহারা অত্যাচারিতও হইবে না।

❒ বল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

'মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আ'শ্‌রু আমছালিহা' (কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে) কথাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানে একটি জটিলতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সেই সম্ভাব্য জটিলতাটি হতে পারে এ রকম— আল্লাহ্‌পাকই পুণ্য ও পাপের বিনিময় নির্ধারণ করেছেন। সেখানে বিবেক বুদ্ধির কোন প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু কাজ ও বিনিময়ের মধ্যে তেমন কোনো সাদৃশ্যও নেই। পুণ্যকথা ও পুণ্যকর্মের বিনিময় বেহেশ্‌ত। আর অসৎ উক্তি এবং অসৎকর্মের বিনিময় হচ্ছে দোজখ। শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে দেয়া হয় অর্থ। কিন্তু শ্রম ও অর্থ কখনো এক কথা নয়। তবুও অর্থকেই কাজের বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক তেমনি সৎ ও অসৎকর্মের বিনিময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই বিনিময় আবার দশগুণ হয় কি করে? দশগুণ হতে পারে তখনই, যখন বিনিময় নির্ধারণ করে কয়েকজন শ্রমিককে কাজে নিয়োগের পর কাজ শেষে কোনো কোনো শ্রমিককে নির্ধারিত বিনিময়ের দশগুণ দেয়া যায়। যেমন— একই কাজে দু'জন শ্রমিককে নিয়োগ করে বলা হলো, কাজ শেষে দু'জনকে এক টাকা করে দেয়া হবে। ওই টাকা দেয়ার পর একজনকে যদি দশ টাকা দেয়া হয়, তখনই কেবল দশগুণের কথা ভাবা যায়। কিন্তু দু'জনকেই দশ টাকা করে দিলে এ কথা বলা যাবে না যে, বিনিময় নির্ধারিত হয়েছিলো দশগুণ। অর্থাৎ যথামূল্য হিসেবে এক টাকা দিলেই কেবল দশগুণ দেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে দশগুণের কথা বলা হয়েছে ঢালাওভাবে। তাই বলা যেতে পারে বক্তব্যটি জটিল অর্থাৎ স্পষ্ট নয়। এই জটিলতা বা অস্পষ্টতা নিরসনার্থে বলা

যেতে পারে যে, এখানে উল্লেখিত দশগুণ বিনিময় সকলের জন্য নয়। প্রথমে একই কাজের জন্য সকলকে একই রকম বিনিময় দান করা হবে। তারপর কাউকে কাউকে দেয়া হবে এর দশগুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ততার (খালেস নিয়তের) তারতম্যানুসারে আল্লাহ্পাক বিনিময় বর্ধিত করে দেবেন। তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে তাই কেউ কেউ দশগুণ, আবার কেউ কেউ সত্তর অথবা সাতশ' গুণ পর্যন্ত বিনিময় লাভ করবেন। আবার কেউ কেউ বিনিময় লাভ করবেন অগণিত, অসংখ্য। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দৃষ্টে সে কথাই প্রতীয়মান হয়। তাঁর হাদিসে রয়েছে রসুল স. বলেছেন, ধর্মকে বিশুদ্ধ করে নেয়ার পর একটি পুণ্যকর্ম করলে আল্লাহ্পাক তাঁর ইচ্ছানুসারে তাকে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত পুণ্য দান করতে পারেন। কিন্তু পাপকর্মের বিনিময় এভাবে বাড়ানো হবে না। এভাবেই বান্দারা আল্লাহ্পাকের সকাশে উপনীত হবে। বোখারী, মুসলিম। এক্ষেত্রে রসুল স. পুণ্যকর্মের বিনিময় বৃদ্ধির বিষয়টিকে ইসলামের সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃত্তির পবিত্রতা অর্জনের পরই কেবল বিশুদ্ধচিত্ততা (এখলাস) নির্ভর ইহ্সান লাভ হয়। আর এখলাস হচ্ছে চিত্তবিশুদ্ধী ও প্রশান্ত প্রবৃত্তি।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, আগের নবীর উম্মতের পুণ্যকর্মের জন্য যে বিনিময়, সেই বিনিময়ের দশগুণ বিনিময় দেয়া হবে শেষ নবীর উম্মতকে অর্থাৎ একই কাজের জন্য পূর্ববর্তী উম্মত যে সওয়াব লাভ করবে, ওই একই কাজের জন্য এই উম্মত লাভ করবে তার দশগুণ।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় তোমাদের হায়াত সংক্ষিপ্ত। ইহুদী ও খৃষ্টানদের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্তটি এ রকম— একদল শ্রমিক নিয়োগ করে বলা হলো, তোমরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করলে একটি করে মুদ্রা পাবে। আরেক দল শ্রমিককে বলা হলো, তোমরা দ্বিপ্রহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করলে পাবে একটি মুদ্রা। এরপর শ্রমিকদের তৃতীয় দলটিকে বলা হলো, তোমরা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কাজ করলে পাবে দ্বিগুণ বিনিময় (দুইটি মুদ্রা)। শ্রমিকের প্রথম দলটি ইহুদী, দ্বিতীয় দলটি খৃষ্টান এবং তৃতীয় দল হচ্ছে মুসলমান। আল্লাহ্পাক এই তিন দলকে এভাবেই বিনিময় দান করবেন। তাঁর এমতো সিদ্ধান্ত জানতে পেরে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা অপ্রসন্ন হয়ে বলবে, আমাদের কাজ বেশী অথচ পারিশ্রমিক কম। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাদের হক নষ্ট করেছি? তারা বলবে, কিন্তু এই বৈসাদৃশ্যের কারণ কী। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, এটা হচ্ছে আমার অনুগ্রহ। আমি যাকে ইচ্ছা করি, তাকেই আমার অনুগ্রহদানে ধন্য করি। বোখারী।

আমি বলি, বর্ণিত হাদিসটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের নেক আমলের সওয়াব দেয়া হবে পূর্ববর্তী উম্মতের নেক আমলের সওয়াবের দ্বিগুণ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে দশগুণ বিনিময়দানের কথা। বিষয়টি সামঞ্জস্য সাধনার্থে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সাধারণভাবে এই উম্মতের প্রত্যেককে পূর্ববর্তী উম্মতের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। আর কাউকে কাউকে দেয়া হবে দশগুণ। বিশুদ্ধতার (এখলাসের) মান অনুসারে এই সওয়াব দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়ামান জাআ বিস্‌সায়্যিআতি ফালা ইউজ্‌জা ইল্লা মিছ্‌লাহা ওয়া হুম লা ইউজ্‌লামুন' (এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তারা অত্যাচারিতও হবে না)। এ কথার অর্থ— মন্দ কর্মের গোনাহ্ কখনো বাড়ানো হবে না। হজরত আবু জর গিফারীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, দ্যাখো, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন— কেউ কোনো সৎ কাজ করলে তাকে তার দশগুণ প্রতিফল দেয়া হবে (গোনাহ্‌র পরিমাণ বাড়ানো হবে না)। পাপের শাস্তি দেয়া হবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী। আবার অনেক পাপীকে আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দেবেন। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসবে, তার দিকে আমি এগিয়ে যাবো এক হাত। কেউ এক হাত অগ্রসর হলে আমি অগ্রসর হবো দু'হাত। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে আমি তার দিকে গমন করবো দৌড়ে। যে পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে, সে যদি মুশরিক না হয়, তবে আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো ক্ষমাশীল হয়ে। বাগবী।

বর্ণিত হাদিসের শেষ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, যদি আমি চাই তবে আমি তার সঙ্গে মিলিত হবো ক্ষমাশীল হয়ে। এ কথায় বুঝা যায় যে, পাপ মার্জনা করতে আল্লাহ্‌পাক বাধ্য নন। মার্জনার বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে মাফ করবেন, আর যদি তা না করেন তবে শাস্তি অবধারিত। আলোচ্য বাক্যে সে কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। এটা পাপীদের প্রাপ্য। আর এই প্রাপ্যকে কখনো অত্যাচার বলা যায় না।

বাগবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, সদ্‌কা (দান) ব্যতীত অন্য সকল পুণ্যকর্মের বিনিময় দানের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, সদ্‌কার বিনিময় সাতশ' গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে।

আমি বলি, হজরত ইবনে ওমরের উপরোক্ত উক্তির স্থলে রয়েছে কোরআন মজীদের এই আয়াত—'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা

একটি শস্য দানার মতো, যে শস্য দানাটি সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশ'টি দানা। আর আল্লাহ্ যাকে চান তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন।' এই আয়াতে সাতশত গুণ বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সম্পদ দানের ক্ষেত্রে। কিন্তু হজরত ইবনে ওমরের হাদিসে বলা হয়েছে, কেবল সদ্কার কথা। অর্থাৎ সদ্কার সওয়াব দেয়া হবে সাতশত গুণ। রসুল স. বলেছেন, তসবিহ্ (সুবহানআল্লাহ্) এবং তাহ্মিদ (আলহামদুলিল্লাহ্) সদ্কাতুল্য। প্রতিটি তাহ্লিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ)ও সদ্কাতুল্য। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু জর গিফারী থেকে।

আল্লাহ্র জিকিরের সওয়াব সদকার সওয়াব অপেক্ষা বেশী। হজরত আবু দারদা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলবো যা সকল আমল অপেক্ষা উত্তম? যে আমল তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের নিকট অতি পবিত্র এবং যে আমল তোমাদের মর্যাদাকে সকল আমল থেকে উন্নত করে? যে আমল স্বর্ণ, রৌপ্য দান করার চেয়েও উচ্চ, জেহাদের অংশগ্রহণ করে শত্রু বধ করা এবং নিজে শহীদ হয়ে যাওয়ার চেয়েও যে আমল অধিক নন্দিত? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুগ্রহ করে বলুন। তিনি স. বললেন, সর্বক্ষণ আল্লাহ্র স্মরণ। ইবনে মাজা, হাকেম, তিরমিজি, আহমদ।

তিবরানীর আওসাত গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র জিকির অপেক্ষা উত্তম কোনো সদ্কা নেই।

পরের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছে—'বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে বলুন আল্লাহ্পাক জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে আমাকে নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর প্রত্যাদেশ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে আমাকে পথ প্রদর্শন করে চলেছেন।

শেষে বলা হয়েছে— দীনান্ ক্বিয়্যামান মিল্লাতা ইব্রহীমা হানিফা ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন (এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ, সে ছিলো একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না)। এখানে 'দীনান্ ক্বিয়্যামান' অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। বাগবী লিখেছেন, 'মুসতাদ্বীমুন' এবং 'ক্বায়্যিম' শব্দ দু'টো সমার্থক। 'মিল্লাতা ইব্রাহিম' অর্থ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ। আর 'হানিফা' অর্থ একনিষ্ঠ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মক্কাবাসী, তোমরা হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবি করো। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের ধর্ম একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। তিনি ছিলেন এক আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ। আর তোমরা অংশীবাদী। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তো কস্মিনকালেও অংশীবাদী ছিলেন না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

❒ বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহেরই উদ্দেশ্যে'।

❒ 'তাঁহার কোন শরীক নাই, এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আত্মসমর্পণকারীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম'।

'কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন' অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে। এখানে সলাত অর্থ নামাজ। নুসুকি বা নাসাকুন অর্থ হজ এবং ওমরাতে কোরবানী করা— এই ইবাদতগুলো। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ হজ। কেউ কেউ বলেছেন দ্বীন বা ধর্ম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে নামাজ ছাড়া অন্য সকল ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। এই অর্থগুলো কামুস এবং সিহাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাহ্‌ইয়া' অর্থ আমার জীবন এবং 'মামাতি' অর্থ আমার মৃত্যু। শব্দ দু'টো ধাতু বা শব্দমূল। 'আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে' কথাটির অর্থ এখানে আমার জীবন এবং আমার মৃত্যুর মালিক আল্লাহ্। তিনি আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই আমাকে দান করবেন মৃত্যু। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— ইমান ও আনুগত্যশোভিত আমার এই জীবন, যার উপর আমি মৃত্যুবরণ করবো, তার সকল কিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে মাহ্‌ইয়া অর্থ জীবদ্দশার আনুগত্যসমূহ— যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি এবং মামাতি অর্থ মৃত্যুকালীন আনুগত্যসমূহ— যেমন, অসিয়ত, গোলাম আযাদ ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আমার জীবনের সকল ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য এবং মৃত্যুর পর আমার প্রাপ্য সওয়াব রয়েছে আল্লাহ্‌র জিম্মায়। কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— নন্দিত পুণ্যকর্ম সমূহের সঙ্গে একীভূত আমার জীবন এবং ইমানের সঙ্গে আমার অন্তিম যাত্রার বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার অধীনে ন্যস্ত।

পরের আয়াতে (১৬৩) বলা হয়েছে—'তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ রকমই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার কোনো শরীক নেই। আমি আদিষ্ট হয়েছি এ কথা প্রচারের নিমিত্তেই। এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হিসেবে যে বার্তা আমি পেয়েছি, তার প্রতিই আমি তোমাদেরকে আহবান জানিয়ে যাচ্ছি। অতএব, তোমাদের উপলব্ধি হওয়া উচিত যে, আমি তোমাদের কিরূপ হিতাকাংখী।

বাগবী লিখেছেন, একদিন কুরায়েশ নেতারা রসুল স. কে বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের মতাদর্শের অনুসারী হও। তাদের এমতো অপবিত্র ও অযথার্থ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্আ'ম ঃ আয়াত ১৬৪, ১৬৫

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ বল, 'আমি কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুঁজিব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটাইয়াছিলে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

❒ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদিগের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করিয়াছেন; তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

বলো, আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজবো? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। —এখানকার প্রশ্নটি একটি নেতিবাচক জবাববিশিষ্ট প্রশ্ন। আলোচ্য বাখ্যাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্র ইবাদতে আমি কি অন্য কাউকে অংশীদার করবো? অন্য কাউকে আমার প্রভুপ্রতিপালক সাব্যস্ত করবো? কক্ষনো নয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালাই হচ্ছেন সকল কিছুর একমাত্র প্রভুপ্রতিপালক। আমার মতো সকল সৃষ্টি তাঁর প্রতিপালনাধীন। সুতরাং, কোনো সৃষ্টি প্রভুপ্রতিপালক বা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আগের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছিলো— সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শানুসারে আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। —এ কথায় মনে হতে পারে, যে রসুল স. হয়তো হজরত ইব্রাহিমের ওইরূপ অনুসরণ করেন, যেরূপ অংশীবাদীরা অনুসরণ করে তাদের বাপ-দাদার ধর্মাদর্শের। এ রকম মনোভাবের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই এখানে এভাবে বলা হয়েছে— 'আগইরাল্লহি আব্গী রব্বাঁও ওয়া হুয়া রব্বু কুল্লি শাইয়্যিন' (বলো, আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজবো? অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক)।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওলিদ ইবনে মুগীরা মানুষকে বলতো, তোমরা আমার মতাদর্শের অনুসারী হও। এতে করে যদি পাপ হয় তবে সে পাপের দায়িত্ব বহন করবো আমি। তার এ কথা প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ হয়েছে পরের বাক্যটি। বলা হয়েছে— প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। এ কথার অর্থ— শিরিকের পাপের বোঝা বহন করবে সে-ই, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য নির্বাচন করবে। কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। একজনের প্রাপ্য শাস্তি অন্যজনকে দেয়া হবে না।

শেষে বলা হয়েছে—'অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।' এ কথার অর্থ— কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা মানুষের ধর্ম সংক্রান্ত মতপার্থক্যের অবসান ঘটাবেন। সকলেই সেদিন জানতে পারবে, কার ধর্ম সত্য এবং কার মতাদর্শ মিথ্যা। তাই কৃতকর্ম অনুসারে সেদিন কেউ হবে পুরস্কৃত এবং কেউ তিরস্কৃত।

পরের আয়াতে (১৬৫) বলা হয়েছে—'তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে উম্মতে মোহাম্মদী! পূর্ববর্তী উম্মতকে অপসারিত করার পর আল্লাহ্পাক তোমাদেরকেই বানিয়েছেন পৃথিবীর প্রতিনিধি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্য তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকই তোমাদেরকে সর্বশেষ উম্মত বানিয়েছেন। একজন অপেক্ষা অন্যকে দিয়েছেন অধিকতর উন্নত মর্যাদা। এখন তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখী। এখন এখানেই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তোমাদের মধ্যে কে কৃতজ্ঞ এবং কে কৃতঘ্ন।

সবশেষে বলা হয়েছে—'তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র শাস্তি অতি নিকটে। তাই তাঁর শাস্তিকে বিলম্বিত মনে করা ঠিক হবে না। অবিশ্বাসীদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তিদান করা হবে মনে করে ইমান ও তওবাকে বিলম্বিত করা যাবে না। যা অবশ্যম্ভাবী, তা কিন্তু দূরে নয়, নিকটেই। কারণ ওই শাস্তি নিশ্চিত। 'ইন্না রব্বাকা' (নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক) কথাটিতে সেই উদ্দেশ্যটিই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'সারিউল ই'ক্বাব্' অর্থ— শাস্তিদানে সত্বর। এই সত্বরতা শাস্তিদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সরাসরি আল্লাহ্তায়ালার জাত বা সত্তার সঙ্গে এর সংযোগ নেই। আল্লাহ্তায়ালার সত্তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রয়েছে ক্ষমা ও দয়ার। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় (ওয়া ইন্নাহু লা গফুরুর্রহীম)। এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাক অতি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। কিন্তু তিনি সকল সৃষ্টির প্রভুপ্রতিপালকও। তাই সৃষ্টির নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। তাই তিনি অবাধ্যদের শাস্তিদাতাও। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর দয়া ও ক্ষমা তাঁর শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। সে কারণেই তিনি বার বার তাঁর দাসদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তওবা বা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সম্পূর্ণ সুরা আন্আ'ম আমার উপর এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলো সত্তর হাজার ফেরেশ্তা। তাদের সুবহানআল্লাহ্ এবং আলহামদুলিল্লাহ জিকিরে তখন পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিলো কোলাহলমুখর। তিবরানী, আবু নাঈম, ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল স. সুবহানআল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় অবতীর্ণ হয়েছিলো অসংখ্য ফেরেশ্তা। তাদের উপস্থিতির কারণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো আকাশের সকল দিগন্ত। হাকেম। এই হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ সুরা আন্আ'ম এক সঙ্গে নাজিল হয়েছিলো। কিন্তু এর বিভিন্ন আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত (শানে নুজুল) ছিলো পৃথক পৃথক।

সম্ভবতঃ প্রেক্ষিতগুলোর ঘটনাবলী ঘটেছিলো খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে। এবং সেগুলোর প্রকৃতি ছিলো প্রায় একই রকম। সমধর্মী ওই ঘটনাগুলোকেই এই সুরার বিভিন্ন আয়াতের প্রেক্ষিত বা প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো তো স্পষ্টই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে— কোনো বিরতি দিয়ে নয়, একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে সম্পূর্ণ সুরা আন্‌আ'ম।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর বলেছেন, কোরআন মজীদের সুরাগুলোর মধ্যে সুরা আন্‌আ'ম হচ্ছে একটি অনন্যসাধারণ মর্যাদাবিশিষ্ট সুরা। বায়হাকী শো'বুল ইমান গ্রন্থে একটি অপ্রসিদ্ধ সূত্রে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, কোনো রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সুরা আন্‌আ'ম পাঠ করলে আল্লাহ্‌পাক ওই রোগ নিরাময় করবেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১, ২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

الٓمّٓصٓ ۝ كِتٰبٌ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ فَلَا یَكُنۡ فِیۡ صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنۡذِرَ بِهٖ وَذِكۡرٰی لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۝

❐ আলিফ, লাম, মীম, ছা'দ।

❐ তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা সতর্ক কর; এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহা উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে।

আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ— এ রকম বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোরআন মজীদের কোনো কোনো সুরার প্রারম্ভে বিদ্যমান। এগুলোকে বলা হয় হুরূফে মোকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। এগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসুলের এক ধরনের রহস্যময় আলাপন, যা দুর্জ্ঞেয়। বিষয়টি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসুলের একান্ত বিষয়। সাধারণ মানুষ এখানে যোগ্যতারহিত। আর এ বিষয়ে সাধারণকে জ্ঞান দান করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্‌র রসুলও তাঁর পরম প্রিয় প্রভুপ্রতিপালকের অভিপ্রায়ানুসারী। তাই তিনিও এ সম্পর্কে প্রকাশ্য বর্ণনা দান করেন নি। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছেন— সকল গ্রন্থেরই একটি গোপন রহস্য থাকে। আর কোরআনের গোপন রহস্য হচ্ছে, কোনো কোনো সুরার প্রথমে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি। হজরত আলী রা. বলেছেন, প্রতিটি পুস্তকের একটি সার সংকলন থাকে। আর কোরআন মজীদের সার সংকলন হলো এই

বিচ্ছিন্ন হরফগুলো। এ সম্পর্কে প্রবীনগণের ঐকমত্য এই যে— 'ইন্নাহা সির্‌রুন বাইনাল্লহি ওয়া বাইনা নাবীইয়্যিহি সল্লাল্লহু ওয়া আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (এগুলো একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর মধ্যকার গোপন রহস্য)। এ রকম বাকভঙ্গি গোপনতম আলামতের ইঙ্গিতবহ। রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসারীগণের মধ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব এই রহস্য সম্পর্কে অবগত। যেমন— ইমামে রব্বানি হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী কাদ্দাসা সির্‌রুহ্। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক দয়া করে হুরূফে মোকাত্তায়াতের রহস্য আমার নিকট উন্মোচন করেছেন। কিন্তু সাধারণ্যে এ সম্পর্কে বিবরণ প্রদান অসম্ভব।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'কিতাবুন উনযিলা ইলাইকা' (তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে)। 'কিতাবুন' শব্দটি এখানে বিধেয়। এর উদ্দেশ্য রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ— 'হাজা কিতাবুন' (এই কিতাব) অথবা আলিফ, লাম, মীম সোয়াদ যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তার বিধেয় হবে কিতাবুন। আর 'উনযিলা ইলাইকা' (তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে)— কথাটি হবে কিতাবুন এর সিফাত বা বৈশিষ্ট্য।

এরপর বলা হয়েছে—'যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক করো; এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা উপদেশ। অতঃপর তোমার মনে যেনো এর সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে।' এখানে 'ফালা ইয়াকুন ফি সদ্‌রিকা হারাজুম্ মিনহু' কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন সম্পর্কে আপনার মনে যেনো কোনো দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। 'হারাজুম' এর শাব্দিক অর্থ— দ্বিধা. সংকোচ, জড়তা বা আড়ষ্টতা। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'হারাজুম' শব্দটির অর্থ হবে সন্দেহ। কেননা সংকোচ হচ্ছে সন্দেহের কারণ। এটা এক ধরনের সংকীর্ণতা বা সংকুচিত অবস্থা। এর বিপরীত অবস্থা হচ্ছে বক্ষের প্রশস্ততা— যা বিশ্বাসের কারণ। বক্ষের প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা সম্পর্কে সুরা আন্‌আ'মে উল্লেখিত হয়েছে— 'ফামাঁ ইয়্যুরিদিল্লহু আঁইয়াহ্‌দিইয়াহু ইয়াশ্‌রাহ্ সদ্‌রাহু লিল ইসলাম'। যথাস্থানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আবুল আলিয়া বলেছেন, কোরআন প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় করাই হারাজ বা সংকোচ। অর্থাৎ এই ভেবে আড়ষ্ট হওয়া যে, কোরআনের প্রচার করলে মানুষ বিরোধিতা করবে এবং কষ্ট দিবে। নির্ভিকচিত্তে সফলতার পথে অগ্রসর হতে গেলে এ রকম আড়ষ্টতা পরিত্যাজ্য।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে যে দ্বিধা বা আড়ষ্টতার কথা বলা হয়েছে, তা এ রকম— আল্লাহ্‌পাকের এই বিশাল নেয়ামত মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যথাযথ হক আদায় করতে আমি পারবো কি না। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! কোরআনের যথাযথ হক আদায় করতে

পারবেন কি না— এ কথা ভেবে আপনি অনর্থক দ্বিধান্বিত হবেন না। এভাবে 'অতঃপর তোমার মনে যেনো এর সম্পর্কে কোনো দ্বিধা না থাকে' বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার প্রিয় রসুল! নিশ্চয় আপনার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা, সংকোচ বা সন্দেহকে প্রশ্রয় দেবেন না। কাউকে ভয় পাবেন না। কাউকে পরোয়া করবেন না। আমি আপনার রক্ষক। কোরআনের পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারবো না— এমতো সন্দেহও পোষণ করবেন না। আমি আপনার জন্য সকল কিছু সহজ করে দেবো। কোরআনের যথা অধিকার প্রতিপালনের তৌফিকও দান করবো।

'লিতুনজিরবিহি' কথাটির অর্থ— যাতে আপনি এর দ্বারা সতর্ক করেন। অর্থাৎ এই পবিত্র কিতাব আপনার প্রতি এ কারণে অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, আপনি এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করবেন। এভাবে কথাটি 'অবতীর্ণ করা হয়েছে' বক্তব্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'কোনো দ্বিধা না থাকে'— কথাটির সঙ্গেও আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কিত। এভাবে 'সতর্ক করো' কথটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! এই কোরআন সম্পর্কে আপনার মনে যেনো কোনো দ্বিধা না থাকে। দ্বিধামুক্ত হলেই কেবল আপনি অবিশ্বাসীদেরকে এর মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন করতে পারবেন। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। অবিশ্বাসীদেরকে ভয় করবেন না। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবেন যে, এই কোরআন প্রচারের পথে আল্লাহ্‌তায়ালাই আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমাকে তৌফিক দান করবেন।

'ওয়া জিকরা লিল মু'মিনীন' অর্থ— এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটা উপদেশ। 'জিকরা' (উপদেশ) শব্দটির সংযোগ রয়েছে কিতাবুন (কিতাব) এর সঙ্গে। অথবা এই শব্দটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। কিংবা একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম। নতুবা তুনজিরা (সতর্ক করো) শব্দটির সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার কারণে শব্দটি এখানে যের বিশিষ্ট হয়েছে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

❐ তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

এই আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো। এখানে 'তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে' কথাটির অর্থ 'আল-কোরআন' এবং 'আল-হাদিস'। কোরআন এবং হাদিস— দু'টোই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, কোরআনের মর্ম এবং ভাষা দু'টোই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর হাদিসের মর্ম আল্লাহ্ প্রদত্ত। কিন্তু ভাষা রসুল স. এর। কোরআন হচ্ছে 'ওহিয়ে মাতলু' এবং হাদিস হচ্ছে 'ওহিয়ে গায়ের মাতলু'। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো। অর্থাৎ কোরআন ও হাদিসের একনিষ্ঠ অনুসারী হও।

এরপর বলা হয়েছে-'এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না'। এ কথার অর্থ— তোমরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়ে কোনো পথভ্রষ্ট জ্বিন অথবা মানুষের অনুসারী হয়ো না। উল্লেখ্য যে, নবী-রসুল এবং আউলিয়ায়ে কেরাম উদ্ধৃত নিষেধাজ্ঞাটির অন্তর্ভূত নন। কারণ তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহভাজন ও নৈকট্যভাজন। আর আল্লাহ্তায়ালাই কোরআনের অন্যত্র তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো'। এখানে 'কলিলাম্ মা' অর্থ অল্পই। এর বিশেষ্য এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ— ক্বলিলান এবং তাজাক্কুরান এর মধ্যে 'মা' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। এটি কোনো ধাতুগত 'মা' নয়। অধিকতর স্বল্পতা বুঝানোর জন্যই 'অল্প' ও 'উপদেশ' (ক্বলিলান এবং তাজাক্কারুণ) এর মধ্যে শব্দটি বসানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ক্বলিলান তাজাক্কারুণ' অর্থ অল্প উপদেশ গ্রহণ করো। আর ক্বলিলাম্ মা তাজাক্কারুণ অর্থ খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্কে স্মরণ করে বা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশই উপদেশ গ্রহণ করে না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪, ৫

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ○ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

❒ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি! আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

☐ যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদিগের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, ' নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম'।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো নিশীথে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিলো।' এখানে 'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি' কথাটির অর্থ— অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করার ইচ্ছে করেছি অথবা ওই সকল জনপদের অধিবাসীদেরকে সাহায্যবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। এখানে 'বা'সুন' শব্দটির অর্থ আযাব বা শাস্তি। 'বায়াতান' শব্দটি একটি মূল শব্দ এবং শব্দটি এখানে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— যখন তারা নিশীথে স্বগৃহে নিদ্রামগ্ন ছিলো। আর 'ক্বায়লুলা' অর্থ দিবানিদ্রা বা দিবসের শয্যাসুখ। আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি এ রকম— ওই সকল জনপদের অধিবাসীরা ছিলো অবিশ্বাসী, সীমালংঘনকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তারা তাদের আপনাপন নবীদের আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছিলো। অবিশ্বাস ও অংশীবাদীতার মধ্যে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রাত্যহিক জীবন ছিলো নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। তাই সত্যধর্মের আহ্বানের প্রতি তারা প্রদর্শন করে যাচ্ছিলো চরম ঔদাসিন্য। অকস্মাৎ আল্লাহ্পাক তাদের প্রতি অবতীর্ণ করলেন ভয়াবহ আযাব। কোনো কোনো জনপদের অধিবাসী তখন ছিলো নিদ্রামগ্ন। আমার অভিপ্রায়ানুসারে নিশীথের ওই নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেই তাদের উপর অবতীর্ণ হলো আযাব। যেমন আযাব পতিত হয়েছিলো নবী লুতের সম্প্রদায়ের উপর। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় ছিলো দ্বিপ্রহরে নিদ্রামগ্ন বা বিশ্রামরত। ওই নিশ্চিন্ততার মধ্যে হঠাৎ একদিন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলাম আমি। এ রকম শাস্তি আমি অবতীর্ণ করেছিলাম নবী শোয়ায়েবের সম্প্রদায়ের উপর। তখন হঠাৎ গগনভেদী বিকট আওয়াজের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম আমি। ওই সকল অবাধ্যরা ছিলো অদূরদর্শী ও সত্যবিমুখ। আযাবের প্রতি ছিলো তাদের অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা। তাই তাদের নিরুদ্বিগ্ন নিদ্রা ও বিশ্রাম ছিলো চরম ঔদাসীন্যপূর্ণ।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো তখন তাদের কথা শুধু এটাই ছিলো যে, নিশ্চয় আমরা ছিলাম 'জালেম'।' এখানে 'দা'ওয়া' শব্দটির অর্থ উক্তি বা কথা। আর 'দু'আ' অর্থ— প্রার্থনা বা দোয়া।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ সিব্ওয়াইহ্ বলেছেন, আরববাসীরা বলে, হে আল্লাহ্! মুসলমানের উত্তম দোয়ার মধ্যে আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করো। অর্থাৎ আমাদেরকেও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখো। কিন্তু যে জনপদবাসীদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিলো তাদের কথা কিন্তু এ রকম দোয়া বা প্রার্থনার মতো ছিলো

না। ভীষণ শাস্তি দর্শনে তারা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো যে— নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালেম। এভাবে অপরাধ স্বীকার করার পরেও তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। কারণ এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান যে— শাস্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর তা আর উঠিয়ে নেয়া হয় না। শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করতে হয় যথাসময়ে— আযাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৬, ৭

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ○

❐ অতঃপর যাহাদিগের নিকট রসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

❐ তৎপর তাহাদিগের নিকট সজ্ঞানে তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টোর প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'অতঃপর যাদের নিকট রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করবো।' হজরত আবু তালহা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তোমাদের রসুলের আহ্বানের কী জবাব দিয়েছিলে? আর সকল নবী-রসুলকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার বিধানসমূহ মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছিলে?

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্‌বাহ্ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইস্রাফিল ফেরেশতাকে ডাকা হবে। হজরত ইস্রাফিল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ্‌পাক জিজ্ঞেস করবেন, লওহে মাহফুজ তোমাকে যা দিয়েছিলো তুমি তার কী করেছো? তিনি বলবেন, আমি তা জিবরাইলকে পৌঁছে দিয়েছি। তখন ডাকা হবে হজরত জিবরাইলকে। বলা হবে, ইস্রাফিল তোমাকে যা দিয়েছে তুমি তার কী করেছো? তিনি জবাব দিবেন, আমি তা পয়গম্বরগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এরপর পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলো, তোমরা সেগুলোর কী করেছো? তাঁরা উত্তর দিবেন, আমরা সেগুলো মানুষের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছি। এটাই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, আমার সম্পর্কে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন তোমরা কী বলবে? সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলেছিলেন, আমরা সকলে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবো যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছিয়েছেন। যথাযথভাবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। সদুপদেশ দিয়েছেন। রসুল স. বলেছিলেন, হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো।

হজরত মুয়াবিয়া বিন যায়েদাহ্ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে ডাকবেন এবং বলবেন, আপনি কি আমার দাসদের নিকট আমার বাণী পৌছিয়েছিলেন? আমি উত্তর দিবো, হ্যাঁ। আমি আপনার বার্তা যথাস্থানে পৌছে দিয়েছি। হে উপস্থিত জনতা! অনুপস্থিতদেরকে আমার এই বাণী পৌছে দিও। এটা তোমাদের দায়িত্ব। কিয়ামতের দিন যখন তোমরা বাকরুদ্ধ হবে, তখন সর্বপ্রথম সত্য সাক্ষ্যদান করবে তোমাদের হাত ও পা।

আবু শায়েখ তাঁর 'আল উজমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু সানান বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণের জন্য ডাকা হবে লাওহকে। ভীত সন্ত্রস্ত লাওহকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে, যে গুরু দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছিলো, তা তুমি পালন করেছো কি? লাওহ বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, তোমার এ কথার সাক্ষ্য কে? লাওহ বলবে, ইস্রাফিল। তখন ডাকা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। ভীত ও কম্পিত হজরত ইস্রাফিলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, লাওহ কি সঠিকভাবে আমার বিধান তোমার কাছে পৌছে দিয়েছিলো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। লাওহ বলবে, আল্লাহ্‌পাকের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, ইস্রাফিল আমাকে অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করেছে।

ইবনে মোবারকের আজ্‌জুহদ গ্রন্থে রয়েছে, আবু হীলা বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে সকলের আগে ডাকা হবে হজরত ইস্রাফিলকে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে বলবেন, তুমি কি আমার হুকুম যথাস্থানে পৌছে দিয়েছো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। আমি জিবরাইলকে সবকিছু পৌছে দিয়েছিলাম। তখন ডাকা হবে হজরত জিবরাইলকে। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে বলবেন, ইস্রাফিল কি আমার বিধান তোমার নিকটে সঠিকরূপে পৌছে দিয়েছে? হজরত জিবরাইল বলবেন, হ্যাঁ। তাঁর এই স্বীকৃতিদানের পর হজরত ইস্রাফিল হয়ে যাবেন দায়মুক্ত। আল্লাহ্‌পাক তখন হজরত জিবরাইলকে বলবেন, তুমি আমার বিধানাবলী কী করেছো? তিনি বলবেন, হে আমার পরওয়ার দিগার! আমি আপনার বিধানাবলী নবীগণের নিকট পৌছে দিয়েছি। এরপর নবীগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, জিবরাইল কি আমার বিধানসমূহ তোমাদের নিকট ঠিক ঠিক পৌছে দিয়েছিলো? নবীগণ বলবেন, হ্যাঁ।

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হবে আমার বিধানসমূহ পেয়ে তোমরা কী করেছো। তাঁরা বলবেন, আমরা আমাদের উম্মতের নিকট সেগুলো প্রচার করেছি। এরপর নবীগণের উম্মতদেরকে প্রশ্ন করা হবে আমার নবী রসুলেরা তোমাদের নিকট কি আমার বিধান প্রচার করেছিলো? উম্মতেরা কেউ বলবে, না। কেউ বলবে, হ্যাঁ। নবীগণ বলবেন, হে আমাদের আল্লাহ্! আপনি দয়া করে অনুমতি দান করলে আমরা মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, কারা তোমাদের সাক্ষী? নবীগণ বলবেন, মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মত। শেষ নবীর উম্মতগণকে ডাকা হবে তখন। বলা হবে, তোমরা কি সাক্ষ্য দিতে পারো যে, এই নবী-রসুলগণ তাদের উম্মতের নিকট যথাযথভাবে আমার বিধান পৌঁছে দিয়েছিলো? উম্মতে মোহাম্মদী জবাব দিবে, হ্যাঁ। অন্যান্য উম্মতেরা বলবে, এরা তো পৃথিবীতে এসেছিলো আমাদের অনেক পরে। সুতরাং এরা কি করে আমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে? আল্লাহ্তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীকে বলবেন, তোমরা তবে কিভাবে সাক্ষ্য প্রদান করছো? ওই সময় তো তোমরা পৃথিবীতে আগমনই করনি। জবাবে উম্মতে মোহাম্মদী বলবে, হে আমাদের পরম প্রভুপ্রতিপালক! আপনি আমাদের প্রতি রসুল প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন। ওই পবিত্র বাণীসম্ভার পাঠ করতে গিয়ে আমরা লিপিবদ্ধ দেখতে পেয়েছি, আপনি আপনার নবী রসুলগণের মাধ্যমে তাঁদের আপনাপন উম্মতদের নিকট আপনার নির্দেশনা ও বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

শেষ উম্মতের এই সাক্ষ্যদান সম্পর্কে সুরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া কাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াসাতা'। ওই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত একটি হাদিস সংকলিত হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

'ওয়ালা নাস্আলান্নাল মুর্সালিন' অর্থ— অবশ্যই রসুলগণকেও জিজ্ঞেস করবো। কথাটির অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, আমি আমার নবীগণকে তখন জিজ্ঞেস করবো, তোমাদের উম্মতেরা কী জবাব দিয়েছে? অন্য একটি আয়াতেও প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। যেমন— যেদিন আল্লাহ্ সকল নবী-রসুলকে একত্র করে বলবেন (তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে) তোমাদের বক্তব্য কী? তাঁরা বলবেন, এ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে—'তৎপর তাদের নিকট সজ্ঞানে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবোই, আর আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না।' এ কথার অর্থ— যখন নবীগণ বলবেন, এ সম্পর্কে আমাদের জানা নেই অথবা যখন পূর্ববর্তী উম্মতেরা নবীগণের ধর্ম প্রচারের বিষয়টিকে অস্বীকার করবে এবং উম্মতে

মোহাম্মদী যখন নবীগণের ও তাদের উম্মতের কার্যাবলীর যথাবিবরণ দান করবে। এখানে 'বি ই'লমিন' অর্থ— অবহিতির সাহায্যে। অথবা আমি তাদের প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা জানতাম। প্রথম অবস্থায় শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কর্মকারকের। আর 'আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না' কথাটির অর্থ— আমি তো নবীগণের ধর্মপ্রচার, নবীগণের উম্মতের স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতিসূচক জবাব এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে অনবগত ছিলাম না। অর্থাৎ পূর্বাপর সকল কিছু সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌পাক নবী ও তাঁদের উম্মতগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এই জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে— নবীগণের অনন্য মর্যাদা ও উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। আর এর মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾

❐ সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হইবে, যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে;

সেদিন ওজন ঠিক করা হবে— কথাটির অর্থ, যেদিন নবীগণ ও তাঁদের উম্মতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেদিন মীযানকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে ন্যায্যভাবে। আর সকলের পাপ-পুণ্য ওজন করা হবে সঠিকভাবে। 'আল ওয়াজনু' (ওজন) শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য। এর বিধেয় হচ্ছে 'ইয়াওমাইজিন' (সেদিন)। আর 'আলহাক্কুন (ঠিকভাবেই) শব্দটি এখানে উদ্দেশ্যের সিফাত বা গুণ। অথবা আলহাক্কুন হচ্ছে বিধেয় এবং এর উদ্দেশ্য এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে— ওই হক বা সঠিকতা, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এ কথাটি মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক।

হাদিসে জিবরাইলে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বর্ণনায় এসেছে— হজরত জিবরাইল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইমান কী? রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌ ফেরেশ্‌তা, নবী-রসুল, বেহেশত-দোজখ, মীযান এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা। এ কথাটিও বিশ্বাস করা যে, ভালো ও মন্দ আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়। যে এগুলোর উপর বিশ্বাস রাখবে, সেই হবে প্রকৃত ইমানদার। হজরত জিবরাইল বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। হাদিসটি বায়হাকী তাঁর আল বাআ'ছ নামক গ্রন্থে হজরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে

মোবারক বর্ণনা করেছেন তার আজ্‌জুহুদ গ্রন্থে। হজরত সালমান থেকে বর্ণনা করেছেন আজরি তাঁর আশ্‌শরিয়ত পুস্তকে। আবু শায়েখ তাঁর তাফসীরে হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে উল্লেখ করেছেন, মীযানের হবে একটি মুখ ও দু'টি পাল্লা। পাপ-পুণ্যের ওজন কিভাবে হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ। কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের আমলনামা তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত ও হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। তার আমলনামা হবে নিরানব্বইটি। আমলনামাগুলোর আকৃতিও হবে বিশাল। আল্লাহ্‌পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই আমলনামার কোনো কিছু কি তুমি অস্বীকার করতে চাও? আমলনামা লিপিবদ্ধকারীরা কি তোমার কোনো হক নষ্ট করেছে? লোকটি বলবে, না। হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তারা আমার কোনো হক নষ্ট করেনি। বঞ্চিতও করেনি আমাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, তুমি যা বলছো তা যথার্থ নয়। আমার কাছে জমা রয়েছে তোমার একটি পুণ্য। আজ তোমার কোনো অধিকারই নষ্ট করা হবে না। এরপর বের করা হবে একটি ছোট্ট কাগজ যার মধ্যে লেখা থাকবে— 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু'। লোকটি বলবে, হে আমার দয়াময় প্রভু! এই বিশালাকৃতির আমলনামাগুলোর বিপরীতে এই ছোট্ট কাগজটি দিয়ে আর কী হবে। আল্লাহ্‌পাক বলবেন, আজ তোমার উপর কোনো জুলুম করা হবে না। এরপর নিরানব্বইটি বিশাল আমলনামা রাখা হবে মীযানের এক পাল্লায়। অপর পাল্লায় স্থাপন করা হবে ছোট্ট কাগজটি। সাথে সাথে কাগজের টুকরা রাখা পাল্লাটি হয়ে যাবে অধিকতর ভারী। আল্লাহ্‌তায়ালার নামের চেয়ে অধিক ভারী যে আর কিছুই নয়।

হাসান বসরী সূত্রে আহমদ বলেছেন, শেষ বিচারের সময় মীযান প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এরপর এক লোককে ডেকে এনে এক পাল্লায় উঠানো হবে এবং অপর পাল্লায় রাখা হবে তার আমলনামা। দেখা যাবে তার পাপে ভরা আমলনামা তার চেয়ে অধিক ভারী। দোজখী সাব্যস্ত হবে সে। তাই ডানে বামে না তাকিয়ে দোজখের দিকে যাত্রা শুরু করবে। তখন তাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, চলে যাচ্ছো কেনো? এখনো তো আমলনামার ওজন শেষ হয়নি। পুনরায় ওজন শুরু হবে। আবার তাকে উঠোনো হবে এক পাল্লায় আর অপর পাল্লায় রাখা হবে তার বিশাল পাপের বোঝা। এরপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' লেখা একটি ছোট্ট কাগজ লোকটির প্রাল্লায় রাখা হবে। আর কাগজটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির পাল্লাই হয়ে যাবে অধিক ভারী।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিচারের দিন একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবেন হজরত আদম। তিনি তখন থাকবেন দু'টি সবুজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। দেখে মনে হবে, যেনো দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি সবুজ খেজুর বৃক্ষ। তিনি আপন স্থানে দাঁড়িয়ে দোজখে গমনকারীদের দেখতে থাকবেন। তখন আমার এক উম্মতকে দোজখের দিকে যেতে দেখে তিনি আমাকে ডাকবেন। বলবেন, আহমদ! এদিকে এসো। আমি বলবো, হে মহামানবতার জনক! আমি উপস্থিত। তিনি বলবেন, তোমার এক উম্মতকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনে আমি দ্রুত ওই ফেরেশতাদের কাছে ছুটে যাবো, যারা দোজখীদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। বলবো, হে আল্লাহ্র দূত! একটু অপেক্ষা করুন। দলনেতা ফেরেশতা বলবে, আমি অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। আমি যেমন নির্দেশ পাই, তেমনি কাজ করি। এর বিপরীত কিছু করার সাধ্য আমার নেই। বর্ণনাকারী বলেছেন, ওই ফেরেশতার কথা শুনে রসুল স. নিরাশ হয়ে পড়বেন। তিনি স. তখন বাম হাতে আপন কেশ গুচ্ছ মুষ্টিবদ্ধ করে আল্লাহ্র আরশের দিকে তাকিয়ে বলবেন, হে আমার পরম প্রিয় প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমার উম্মতকে আপনি অপমানিত করবেন না। তখন আরশ থেকে ঘোষিত হবে মোহাম্মদের কথা শোনো এবং ওই লোককে মীযানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। রসুল স. বলেছেন, লোকটিকে মীযানের নিকটে নিয়ে আসার পর পুনরায় ওজন শুরু হবে। আমি আমার আস্তিন থেকে ছোট্ট একটি শাদা কাগজ বের করে বিস্মিল্লাহ্ বলে মীযানের ডান পাশের পাল্লায় রাখবো। সঙ্গে সঙ্গে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ঘোষণা করা হবে— সফলতা, সফলতা। নির্দেশ হবে একে জান্নাতে নিয়ে যাও। লোকটি ফেরেশতাদেরকে বলবে, হে বেহেশতের বাহিনী! একটু দাঁড়াও। আমি মহাসম্মানিত ব্যক্তির নিকটে কিছু জিজ্ঞেস করবো। এরপর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি কে? আপনার পবিত্র মুখাবয়ব কতই না উজ্জ্বল। আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবারে আপনি কতইনা সম্মানিত। কী বিশাল অনুগ্রহ আপনার, আপনি আমাকে নিশ্চিত নরকযাত্রা থেকে উদ্ধার করেছেন। আমি বলবো, আমি তোমার নবী মোহাম্মদ। যে শাদা কাগজটির কারণে তোমার পাল্লা ভারী হয়েছে, ওই কাগজে লিখিত রয়েছে কিছু দরূদ— যা তুমি আমার নিকটে প্রেরণ করেছিলে। ওই দরূদের কারণেই তুমি পরিত্রাণ লাভ করলে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যার আমলনামা ওজন করা হবে তাকে রাখা হবে মীযানের একটি পাল্লায়। অপর পাল্লায় রাখা হবে তার আমলনামা। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন,

বিচারের দিন পাপ-পুণ্য ওজনের সময় কোনো কোনো বিশাল বপুধারী লোকের ওজন হবে মশার পাখার চেয়েও কম। এরপর তিনি স. পাঠ করবেন— 'ফালা' নুক্বিমু লাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়ায্না (কিয়ামত দিবসে তাদের আমল ওজনযোগ্য বিবেচনা করবো না)।

আবু নাঈম এবং আজরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অতিরিক্ত পানাহারে অভ্যস্ত বিশাল দেহবিশিষ্ট কোনো কোনো লোককে মীযানের এক পাল্লায় রাখা হবে। তবুও দেখা যাবে তাদের চেয়ে পাপের পাল্লাটিই অধিকতর ভারী। ফেরেশতারা এ রকম সত্তর হাজার লোককে এক সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে দোযখে ফেলে দিবেন।

মানুষের আমল সেদিন হবে আকৃতিবিশিষ্ট। ওই আকৃতিগুলোকে সেদিন ওঠানো হবে মীযানের এক পাল্লায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দু'টি বাক্য এমন— যা বলতে সহজ কিন্তু ওজনে ভারী। আল্লাহ্পাকের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ওই ছোট্ট বাক্য দু'টি হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' এবং 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

ইসপাহানী তাঁর তারগীব নামক গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ্' শব্দটি অর্ধেক পাল্লাকে এবং 'আলহামদুল্লিাহ্' শব্দটি সম্পূর্ণ পাল্লাকে ভারী করে দেয়।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ। আর 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেয়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকেরও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বায্যার এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অন্তিম সময়ে হজরত নুহ্ তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' (বিশ্বাস করতে ও পাঠ করতে) এর নির্দেশ দিচ্ছি। জেনে রেখো, আকাশ-পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে— সমস্ত কিছু এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' রাখলে ওই পাল্লাটিই বেশী ভারী হবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়া'লী, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বলেছেন,সকল আকাশ এবং সপ্তস্তরবিশিষ্ট জমিনসহ সমগ্র সৃষ্টি এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' স্থাপন করা যায়, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্র' পাল্লাটি হবে অধিক ভারী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ! পৃথিবী ও তার মৃত্তিকাস্থিত সকল কিছু এবং আকাশ ও আকাশ জগতের সকল কিছু এক পাল্লায় রাখার পর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ রাখলে অপর পাল্লাটিই হয়ে যাবে অধিকতর ভারী।

হজরত আবু দারদা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের সময় দেখা যাবে উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অন্য কোনো কিছুই অধিক ভারী নয়।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে উত্তম সূত্রে বায্যার, তিবরানী, আবু ইয়া'লী, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন দু'টো আমলের কথা বলবো, যা সুবহ কিন্তু ওজনের সময় হবে অত্যন্ত ভারী। হজরত আবু জর বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! দয়া করে অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, পবিত্র চরিত্র এবং মৌনতা (স্বল্প ভাষ্যতা)। যার অধিকারে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ দু'টো আমলের চেয়ে উত্তম আমল আর নেই।

ইমাম আহমদ আজ্‌জুহদ পুস্তকে হাযেম নামক এক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর দরবারে বসে এক লোক কাঁদছিলেন। হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হয়ে বললেন লোকটি কে? রসুল স. লোকটির পরিচয় জানালেন। হজরত জিবরাইল বললেন, আদম সন্তানদের সকল আমলের ওজন হয় কিন্তু অশ্রুর ওজন হয় না। মহান আল্লাহ্ এক ফোঁটা অশ্রু দিয়ে একটি আগুনের সমুদ্র নিভিয়ে দিবেন।

হজরত মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয় তখন আল্লাহ্পাক চোখের অসিলায় অশ্রু বিসর্জনকারীর সমস্ত শরীর দোজখের জন্য হারাম করে দেন। যে গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে, ওই গণ্ডদেশ বিশিষ্ট মুখাবয়বে কখনই ফুটে উঠবে না অপমান বা অপদস্থতা। প্রতিটি বিষয় পরিমাপযোগ্য। কিন্তু চোখের জল কখনো পরিমাপযোগ্য নয়। এক বিন্দু আঁখি জল একটি বিশাল অগ্নিসিন্ধুকে নির্বাপিত করে দিতে পারে।

আমি বলি, উপরের বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ওজন করা হবে ব্যক্তিকে ও তার পাপ-পুণ্যকে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তখন পাপ-পুণ্যগুলো হবে আকৃতি বিশিষ্ট। পাপাকৃতিগুলোকে স্থাপন করা হবে এক পাল্লায় এবং অপর পাল্লায় স্থাপন করা হবে পুণ্যের আকৃতিগুলোকে। পুণ্যের পাল্লা

ভারী হলে পুণ্যের আকৃতিগুলোকে রেখে দেয়া হবে জান্নাতের একটি স্থানে। তারপর ওই পুণ্যের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, যাও। তুমি তোমার সুন্দর পুণ্যগুলোর সঙ্গে মিলিত হও। ওই ব্যক্তি তখন জান্নাতে প্রবেশ করে মিশে যাবে তার পুণ্যগুলোর সঙ্গে। আপন পুণ্যগুলোকে সে তখন সহজেই চিনতে পারবে।

পাপীদের পাপাকৃতি হবে অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন। সেগুলো হবে অত্যন্ত হাল্‌কা। অসত্য ও অবাধ্যতার ওজন এ রকম হাল্‌কাই হয়। ওজনের পর পাপিষ্ঠদের পাপানুকৃতিগুলোকে নিক্ষেপ করা হবে নরকের নির্ধারিত স্থানে। পাপিষ্ঠদের বলা হবে এবার যাও, নরকে প্রতীক্ষমান তোমাদের অসুন্দর আমলগুলোর সঙ্গে মিলিত হও। নরকে প্রবেশ করে পাপিষ্ঠরা সহজেই তাদের পাপানুকৃতিগুলোকে চিনতে পারবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জুমার নামাজ পাঠের পর স্বগৃহে ফিরে এসে গৃহবাসী যেমন তার আপন আবাস সহজেই চিনে নেয়, তেমনি জান্নাতী ও জাহান্নামীরা জান্নাতে ও জাহান্নামে রক্ষিত তাদের আমলগুলোর কারণে সহজেই তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান চিনে নিতে পারবে। স্বগৃহে ফিরে আসা নামাজপাঠকারীর চেয়েও অধিক পরিচিত হবে তাদের জান্নাতের ও জাহান্নামের অবস্থানগুলো। হাদিসটি অবশ্য অশক্ত সূত্রসম্বলিত।

ইবনে মোবারকের বর্ণনায় রয়েছে, হাম্মাদ বিন আবী সালমান উল্লেখ করেছেন, বিচারের দিবসে এক লোকের সামনে হাজির করা হবে তার নিকৃষ্ট আমলগুলোকে। হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র বস্তু বৃষ্টির ফোঁটার মতো পতিত হবে মীযানের একটি পাল্লায়। ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কেউ তখন বলবে এটা ওই শিক্ষাদানের পুণ্য যে সৎ শিক্ষা তুমি মানুষকে দিয়েছো। পর্যায়ক্রমে ওই শিক্ষা একজনের নিকট থেকে অন্যজন পেয়েছে। ওই পুণ্যপ্রবাহের বিনিময় আজ দেয়া হলো তোমাকে। ইব্রাহিম নাখয়ী সূত্রে ইবনে আবদুর রাজ্জাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

তিবরানীর বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, জানাযার সঙ্গে গমনকারীর জন্য রয়েছে— দুই কিরাত পুণ্য, যা পাহাড় সদৃশ।

ইসপাহানীর বর্ণনায় রয়েছে, জননী আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ফরজ নামাজের একটি ওজন রয়েছে। তাই ফরজ নামাজের কোনো ত্রুটি করলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু সূত্রে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, ফরজ নামাজে ত্রুটি থাকলে

আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, দ্যখো, আমার এই বান্দার কোনো নফল ইবাদত রয়েছে কিনা। যদি থাকে, তবে ওই ইবাদত দ্বারা ফরজ নামাজের ক্ষতিপূরণ করে নাও।

কোনো কোনো হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়, দৈহিক ইবাদতের পুণ্য ওই দেহের সঙ্গে ওজন করা হবে। তিবরানী তাঁর আওসাত পুস্তকে হজরত জাবের থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ-পুণ্য ওজনের সময় বান্দার ওই অর্থব্যয়কে সর্বপ্রথম ওজন করা হবে, যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছিলো।

বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানকে সত্য বলে জেনেছে এবং মেনেছে এবং জেহাদে গমনের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য অথবা অন্য কোনো মুজাহিদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করেছে— তার ওই ঘোড়া, ঘোড়ার আহার্য, মল-মূত্র, সব কিছু পাপ-পুণ্য ওজনের সময়ে পুণ্যের পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। হজরত আলী থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে কেউ কোনো ঘোড়া প্রতিপালন করলে ওই ঘোড়ার খাদ্য এবং ঘোড়ার পায়ের চিহ্নসমূহ পাপ-পুণ্য ওজনকালে তার পুণ্যের পাল্লায় রেখে দেয়া হবে।

হজরত আলী থেকে উত্তমসূত্রে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমাকে বলেছেন, তোমার কোরবানীর পশু জবাইকালে তুমি নিজে সেখানে উপস্থিত থেকো। জবাইকৃত পশুর প্রবহমান রক্ত তোমার ক্ষমার কারণ হবে। আরো শোনো, কোরবানীকৃত পশুর রক্ত ও গোশত সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে কিয়ামতের দিন পুণ্যের পাল্লায় রাখা হবে। এ কথা শুনে হজরত আবু সাঈদ খুদরী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ বিধানটি কি কেবল আপনার বংশধরদের জন্য? তিনি স. বললেন, না, সকলের জন্য।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায়হাকী, হজরত আবু জর গিফারী থেকে ইবনে হাব্বান, এবং দুর্বল সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ওজুর পর পরিষ্কার বস্ত্র দিয়ে ওজুর পানি মুছে নেয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু না মোছাই উত্তম। কেননা কিয়ামতের দিন অন্যান্য আমলের সঙ্গে ওজুকেও ডাকা হবে। ইবনে আবী শায়বা তাঁর স্বরচিত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ওজুর পর ভেজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো বস্ত্র দ্বারা মুছে ফেলাকে পছন্দ করেন নি। তিনি বলতেন, ওজুর জন্য ব্যবহৃত পানি পুণ্যের পাল্লায় ওজন করা হবে।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, আমি একজনকে একটি উট দান করেছিলাম। ওই উটের বাচ্চা হলে আমি সে বাচ্চাটি

ক্রয় করতে মনস্থ করলাম। এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করতেই রসুল স. বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। এই উটকে ও তার সকল অধঃস্তন শাবককে তোমার পুণ্যের পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে জাহাবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমল ওজনের সময় আলেম সম্প্রদায়ের কলমের কালি এবং শহীদগণের রক্তও ওজন করা হবে। কলমের কালি তখন হবে রক্ত অপেক্ষা অধিক ভারী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফামান ছাকুলাত মাওয়াযিনুহু ফা উলায়িকা হুমুল মুফলিহুন' (যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে)। এখানে 'মাওয়াযিনুন' শব্দটি 'মাওযু' শব্দের বহুবচন। শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। মুজাহিদ বলেছেন, মাওয়াযিনুন শব্দটি মিযানুন শব্দের বহুবচন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেক আমল ওজনকারী পাল্লা। এ ব্যাখ্যাটিকে গ্রাহ্য করলে মেনে নিতে হয় যে, সেদিন প্রত্যেকের দাঁড়িপাল্লা (মীযান) হবে পৃথক পৃথক।

'আল মুফলিহুন' অর্থ সফলকাম। এখানে সফলকাম বলা হয়েছে তাদেরকে, যাদের পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা অনেক ভারী। আল্লাহ্পাক বিশেষভাবে যে সকল পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন, তারা এই সফলতার আওতায় পড়েন না। কারণ পাপ-পুণ্যের ওজনের মাধ্যমে নয়, তাদের পরিত্রাণ লাভ হবে ক্ষমার মাধ্যমে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯, ১০

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

❒ আর যাহাদিগের পাল্লা হাল্কা হইবে তাহারাই নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিত।

❒ আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদিগের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

এখানেও 'মাওয়াযিনুন' শব্দটির মাধ্যমে পুণ্যের পাল্লাকেই বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে— যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হালকা হবে। এ অবস্থা হবে অবিশ্বাসীদের। যে সকল পাপী বিশ্বাসীর পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে তারাও আলোচ্য বাক্যটির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসীরাই বাক্যটির লক্ষ্য। কেননা কোরআন মজীদের বর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বাসীদের পাশাপাশি অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। কেবল পাপকর্মে অথবা পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মে অভ্যস্ত বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ সাধারণত আলোচিত হয় না। আগের আয়াতে (৮) যেহেতু পুণ্যবান বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তাই ধরতে হবে আলোচ্য আয়াতটি আলোচিত হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।

'আল্লাজিনা খসিরু আনফুসাহুম' অর্থ— যারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা জন্মগত সৎস্বভাবগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে শাস্তি পাওয়ার উপযোগী হয়েছে।

'বিমা কানু বি আয়াতিনা ইয়াজ্‌লিমুন' অর্থ—'যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো।' সুরা আলক্বারিআ'হ্‌র তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ্।

হজরত আবু বকরের পরকাল যাত্রার পর হজরত ওমর একদিন উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমলনামা ওজনের দিন পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সত্যানুসরণের জন্য। সত্যকে যে পাল্লায় রাখা হবে, সে পাল্লা ভারী হবেই হবে। আর ওই সকল লোকের পুণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে যারা পৃথিবীতে ছিলো মিথ্যানুসারী। আর মিথ্যাকে যে পাল্লায় রাখা হয়, সে পাল্লা হাল্কা হবেই হবে।

আমি বলি, এখানে মীযান অর্থ পুণ্যের পাল্লা। এবং মিথ্যা অর্থ ওই সকল মিথ্যা বিশ্বাস ও কর্ম, যেগুলোকে বাতিলপন্থীরা পুণ্যকর্ম বলে মনে করে। তাদের ওই পুণ্যকর্মগুলো আল্লাহ্‌র নিকটে সরাসরি কুফর ও বেদাত। আল্লাহ্‌র নিকটে সেগুলোর কোনো ওজনই নেই। কাফের ও বেদাতীদের পুণ্যকর্ম হচ্ছে মরুভূমিতে পরিদৃশ্যমান মরীচিকার মতো। দূর থেকে মনে হয় পানি। কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় কিছুই নেই। কাফের ও বেদাতীরাও তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার সকাশে উপস্থিত হলে কিছুই পাবে না। আল্লাহ্‌পাক তাদের পরিপূর্ণ হিসাব গ্রহণ করবেন।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'আমিতো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি পৃথিবীতে দিয়েছি তোমাদের বসবাসের অধিকার। দিয়েছি চাষাবাদ, বাণিজ্য, বৈভব, পরিবার পরিজন ইত্যাদি। আমার এই দানের কারণেই তোমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছো পৃথিবীতে।

এরপর বলা হয়েছে— এবং ওতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। এখানে মায়াইশা শব্দটি মাইশাতুন শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে ঘর-বাড়ী, চতুষ্পদ জন্তু, পানাহারের সামগ্রী, সাংসারিক সামগ্রী ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জীবনোপকরণ দান করেছি। শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' এ কথার অর্থ— আপাদমস্তক আমার অনুগ্রহে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। কৃতজ্ঞতা যারা প্রকাশ করে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১১

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

❐ আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদিগের রূপ দান করি, এবং তৎপর ফেরেশ্‌তাদিগকে আদমের নিকট নত হইতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যাহারা নত হইল সে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

'ওয়া লাক্বদ খালাক্বনাকুম' (আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি)। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদেরকে অস্তিত্বদানের পূর্বেই আমি নির্ভুল দৃষ্টিকোণের মধ্যে তোমাদের আদি-অন্তের বাস্তবতাকে পরখ করে নিয়েছি। সম্ভাব্য জগতের বৃত্তে তোমাদের অবস্থান ও গুরুত্ব আমি নির্ধারণ করে নিয়েছি পূর্বেই । আমার অতুলনীয় ও অদৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেই প্রথমে নিরুপিত হয়েছে তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা। সেই সূচনা থেকে সৃষ্ট হয়েছো তোমরা। তোমাদের সেই পরিকল্পিত অস্তিত্ব, সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্ব, স্থূল জগতের অস্তিত্ব এবং তোমাদের চিরকালীন অস্তিত্ব— সকল অস্তিত্বের স্রষ্টা একমাত্র আমি। সৃজনশীলতা কেবল আমার। অন্য কারো নয়। তাই হে মানুষ! দোদুল্যমানতাকে পরিহার করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ কথাটি মেনে নাও যে, আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

'ছুম্মা সাওওয়ারনাকুম' (অতঃপর তোমাদের রূপ দান করি)। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আমি তোমাদের প্রথম পিতা আদমের জ্ঞানের পরিমাপ করেছি প্রথমে। তারপর তাকে দিয়েছি মানুষের আকার। সেই ধারাবাহিকতা ধরে বয়ে

চলেছে যথাবিবেকসম্পন্ন এবং যথাআকৃতিধারী মানুষের বংশধারা। আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন— এ কথার অর্থ, হে মানুষ! আমি তোমাদের প্রকৃতি নির্ধারণ করে প্রথমে সৃষ্টি করেছি তোমাদের পিতাদেরকে। তারপর মাতৃউদরে তোমাদেরকে দিয়েছি মানুষের রূপ।

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম— আমি তোমাদের সকল পিতৃ-পুরুষের সূক্ষ্ম আকৃতি সৃষ্টি করার পর সকলকে স্থাপন করেছি তোমাদের প্রথম পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশে। তিনিই তোমাদের আদি পিতা। তাই তার আকার নিয়েই তোমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে চলেছো এই মাটির পৃথিবীতে। এভাবে আমি তোমাদের রূপ দান করেছি।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সাওওয়ারনাকুম' কথাটির অর্থ হবে— তোমাদেরকে আমি রূহের (আত্মার) জগতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার সময়ে সূক্ষ্ম আকার দান করেছিলাম। সেই শপথের অনুষ্ঠানে আমার দেয়া সূক্ষ্ম আকার নিয়ে অসংখ্য পিপীলিকার মতো তোমরা সমবেত হয়েছিলে।

হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে 'সৃষ্টি করি' এবং 'রূপ দান করি' কথা দু'টোর অর্থ— আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের পিতাদের পৃষ্ঠদেশে। তারপর তোমাদের মাতৃকুলের উদরে তোমাদেরকে দিয়েছি মানুষের রূপ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মায়ের গর্ভে। তারপর সেখানেই তাদেরকে দিয়েছি চক্ষু, কর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পরিপূর্ণ মানুষের প্রাথমিক রূপ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিলম্ব বুঝানোর জন্য এখানে ছুম্মা (অতঃপর) শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে ওয়াও (এবং) অর্থে। তাই এখানে কথাটি হবে এ রকম— আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তোমাদেরকে রূপ দান করেছি। এখানে রূপ বা আকৃতি দানের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সকল সৃষ্টি আকারবিশিষ্ট নয়। যেমন রূহ, নফস ইত্যাদির দর্শন গ্রাহ্য আকার বা রূপ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তৎপর ফেরেশতাদেরকে আদমের নিকট নত হতে বলি; ইবলিস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যারা নত হলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।' আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমকে সেজদা দানের নির্দেশ জারী করেছিলেন ফেরেশতাকুল ও ইবলিসের উপর। কিন্তু সকল ফেরেশতা সেজদা করলেও ইবলিস সেজদা করেনি, সেই কথাই বলা হয়েছে এখানে। সুরা বাকারার তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরের আয়াতে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা এসেছে। বলা হয়েছে—

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ○

❒ তিনি বলিলেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে তুমি নত হইলে না?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।'

'ক্বালা মা মানায়াকা আল্‌লা তাস্‌জুদা ইজ্‌ আমারতুকা (তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো যে তুমি নত হলে না?)। এখানে আঁল্‌লা তাস্‌জুদা (তুমি নত হলে না) কথাটির 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন, লি আল্লা ইয়া'লামু কথাটির 'লা' শব্দটি অতিরিক্ত। এই 'লা' ক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। এখানে তাই 'কী তোমাকে নিবৃত্ত করলো' বলে আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশকে অধিক গুরুত্ববহ বা মজবুত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ না মানা (হজরত আদমের নিকট নত না হওয়া) একটি চরম গর্হিত অপরাধ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'লা' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত নয়। কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা হয় তবে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে কারণে এখানে বক্তব্য বিষয়টি এ রকম হবে যে— কী (কোন্ কাজ) তোমাকে সেজদার নির্দেশ লংঘনে বাধ্য করলো।

কেউ আবার বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির কিছু অংশ অনুক্ত রয়েছে। ওই অনুক্ত অংশসহ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— কোন্ বস্তু তোমাকে নির্দেশ বাস্তবায়ন থেকে বিরত রেখেছে। আর তোমার নত না হওয়ার কারণই বা কী? কোনো কিছুই আল্লাহ্‌তায়ালার অজানা নয়। তবু এ রকম প্রশ্ন করার কারণ এই যে, এতে করে ইবলিস যেনো তিরস্কৃত হয় এবং তার অবাধ্যতা ও প্রতারণার স্বরূপ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে যায়। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। অর্থাৎ যেখানে নির্দেশসূচক শব্দরূপ রয়েছে, সেখানে নির্দেশপালন আবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ক্বালা আনা খইরুম মিনহু খলাক্বতানী মিন্ নার ওয়া খলাক্বতাহু মিন্ ত্বীন' (সে বললো, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছো এবং তাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করেছো।' শব্দগত দিক থেকে

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশ্নের যথা উত্তর এটা নয়। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে এটাই প্রকৃত উত্তর। অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো কারণ নয়, হজরত আদমের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষই ছিলো নত না হওয়ার প্রধান কারণ। আর অন্তরের গোপন নির্দেশটিই প্রতিভাত হয়েছে ইবলিসের আলোচ্য জবাবে। ইবলিস তাই বলে বসলো, আমি তো আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে। আর কর্দম থেকে সৃষ্টি করেছো আদমকে। শয়তানের এই জবাবটি আল্লাহ্‌নির্ভর নয়, যুক্তিনির্ভর। তার যুক্তির সার কথাটি হচ্ছে— আগুন উত্তম এবং মৃত্তিকা অধম। উত্তম কখনো অধমের সম্মুখে নত হতে পারে না। তাই আগুন থেকে সৃষ্ট আমি মাটি থেকে সৃষ্ট আদমের নিকট নত হইনি। এখানে 'নার' অর্থ আগুনের প্রভা— যা স্বভাবতঃ ঊর্ধ্বমুখী। আর 'ত্বীন' অর্থ আগুনের বিপরীত অন্ধকার, অধম মৃত্তিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইবলিসই প্রথম আনুমানিক যৌক্তিকতা প্রবর্তন করেছে। আবার বলা বাহুল্য, তার ওই অনুমান বা কিয়াস ছিলো সম্পূর্ণতঃই ভুল। সুতরাং যে ব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে কিয়াসকে আপন অভিমতের বাহন করে, আল্লাহ্‌পাক তাকে সম্পর্কিত করে দেন ইবলিসের সঙ্গে। ইবনে সিরীন বলেছেন, কেবল অনুমাননির্ভর যুক্তিকে অবলম্বন করে সূর্যপূজকেরা সূর্যকে উপাস্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে সিরীনের বক্তব্য থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, কিয়াস অবাস্তব বা কল্পনানির্ভর। ইবলিস তো এখানে তার কিয়াসকে দাঁড় করিয়েছে শরিয়তের বিধানের বিপরীতে। হজরত ইবনে আব্বাস তাই বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে কিয়াসকে আপন অভিমতের বাহন করে, আল্লাহ্‌পাক তাকে সম্পর্কিত করে দেন ইবলিসের সঙ্গে। এ কথাটি একটি চরম ভ্রান্তি যে দৃশ্যতঃ কোনো বস্তুর উত্তম বা অধম অবস্থার উপরে উত্তমতা বা অধমতা নির্ভরশীল নয়। শ্রেষ্ঠত্ব এবং অশ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌তায়ালার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ্‌পাক সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকেই দান করেছেন সর্বোত্তম মর্যাদা। প্রথম মানুষ হজরত আদমকে তিনি সৃজন করেছেন তাঁর অলৌকিক ও অতুলনীয় হাতে। আপন আত্মার এক আনুরূপ্যবিহীন প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করেছেন তাঁর প্রতি। দিয়েছেন সকল কিছুর শিরোনামসম্ভূত জ্ঞান। আরো শর্ত দিয়েছেন— তাঁর সন্তান-সন্ততিরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থেকে নিদের্শিত পুণ্য কর্মসমূহ সম্পাদন করলে লাভ করবে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য। সুতরাং আগুন থেকে সৃষ্ট

জ্বিন বা অন্য কোনো সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ নয়। মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট মানুষই শ্রেষ্ঠ। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত ভীত হয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার আমানতের গুরুভার বহনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত প্রেমোন্মাদনাবশতঃ নির্দ্বিধায় সেই আমানত বহন করতে সম্মত হয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ গবেষণাজনিত (ইজতেহাদী) ভুল তো ক্ষমার্হ। তৎসত্ত্বেও ইবলিসের কিয়াসী ভুলের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হলো কেনো?

উত্তরঃ গবেষণাজনিত ভুলের কারণে গবেষণাকারীকে অভিযুক্ত করা হয় না। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, মুজতাহিদকে (গবেষণাকারীকে) সত্যানুসারী হতে হবে। এবং তাকে অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালার একান্ত অনুগত। কিন্তু ইবলিস তো সে রকম নয়। আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশের অনুগত সে নয়। তাই সে সত্যানুসারীও নয়। বরং সে আপন শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানী এবং হজরত আদমের সঙ্গে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিদ্বিষ্ট। যে এ রকম করে, তাকে কখনও সত্যানুসারী গবেষক বলা যায় না। যে এ রকম সে কখনই ক্ষমার্হ নয়। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্‌পাক একস্থানে এরশাদ করেছেন— আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। ফেরেশতারা বললেন— আপনি কি এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। আমরাই আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করবো এবং প্রশংসাকীর্তন গাইবো। ফেরেশতাদের এই ইজতেহাদটিও ছিলো একটি গবেষণাজনিত ভুল। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন— আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। ফেরেশতারা ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের ভুল চিন্তার কারণে আল্লাহ্‌পাক তাদের ভুলকে প্রত্যাখ্যান করলেও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেননি। ফেরেশতাদের পরবর্তী উক্তি থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁরা ছিলেন সত্যানুগত। তাই তারা বলেছিলেন— সকল পবিত্রতা আপনার। আপনি যা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তা ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই অবগত নই। নিশ্চয়ই আপনি অধিক জ্ঞাত ও বিজ্ঞানময়।

বিজ্ঞজনদের অভিমত এই যে, মাটির মধ্যে রয়েছে বিনয়, নম্রতা ও সহনশীলতা। তাই মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট হজরত আদমকে প্রথম থেকেই দেয়া হয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের ঠিকানা। মাটির মধ্যে আরো রয়েছে অনুতাপ, অক্ষমতা এবং ক্রন্দন। তাই মাটির মানুষের লাভ হয়েছে তওবা, হেদায়েত এবং উচ্চ মর্যাদা। অপর দিকে আগুনের মধ্যে রয়েছে উগ্রতা, উত্তাপ ও চাঞ্চল্য। এই স্বভাবের কারণেই শুরু থেকে অগ্নি থেকে সৃষ্ট ইবলিসের মধ্যে ছিলো উগ্র অহংকার এবং

নির্দেশ লংঘনের প্রবৃত্তি। তাই তার উপর আপতিত হয়েছে নির্দয় অভিসম্পাত। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনলের উপর মৃত্তিকার শ্রেষ্ঠত্ব। আগুনের উপর মাটির শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ এই যে— মাটি সব কিছুকে আত্মস্থ করে। আর আগুন সৃষ্টি করে বিপর্যয়। মাটি উদ্ভিদ ও অন্যান্য সৃষ্টির জীবনোপকরণের উৎস এবং প্রাণের ধারক। আর আগুন তরুলতাসহ সকল কিছুকে ভস্ম করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, মানুষের সকল উপাদান মৃত্তিকাজাত নয়। তেমনি ইবলিস ও তার সম্প্রদায়ের অন্যান্য জ্বিনেরাও সর্বাংশে আগুন নয়। বরং বলতে হবে, মানুষের মুখ্য উপাদান মাটি এবং জ্বিনদের মুখ্য উপাদান আগুন। তাই এখানে 'আগুন দ্বারা' এবং 'কর্দম দ্বারা'— এ রকম বলা হয়েছে। অবিকল আগুন বা মাটি বলা হয়নি।

'মিন্ ত্বীন' (মাটি দ্বারা)— এ কথাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলমে খালক বা পৃথিবীই মানুষের মর্যাদা লাভের প্রধান ক্ষেত্র। তাই এই পৃথিবীতে মানবসত্তার অন্তর্ভুক্ত আলমে আমরের সূক্ষ্ম জগতের কলব, রুহ, সির, খফি, আখফা লতিফা পঞ্চক মৃত্তিকার অনুগামী। তাই এখানে আলমে খালকের রঙ দ্বারাই আলমে আমর রঞ্জিত হয়। আর আলমে খালকের প্রধান উপাদান মৃত্তিকাও রঞ্জিত হয় আলমে আমরের আলোয়। কারণ, শোষণ ও রঞ্জন মৃত্তিকার একটি মৌলিক স্বভাব। রূহ সূর্যকিরণের মতো এখানে প্রতিফলিত হয় দেহের আয়নায়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. বলেছেন, আলমে আমরের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের গুণের প্রতিবিম্ব পর্যন্ত নফসের চরম উন্নতি। এই প্রতিবিম্ব ভেদ করে মূল সিফাত বা গুণের মুখোমুখী সে হতে পারে না। তবে আখফার (গোপনতম মর্যাদার) উন্নতি কোনো কোনো সিফাতের নিকটবর্তী হয়ে যেতেও পারে। আলমে আমরের লতিফাসমূহ আলমে খালক থেকে যা অর্জন করে তা হচ্ছে সিফাতের প্রকাশ্য দিকসম্ভূত অর্জন। ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া অন্য তিনটির (বাতাস, পানি ও আগুনের) উন্নতির চরম স্তর হচ্ছে সিফাতের গোপন দিক। জাহেরী ও বাতেনী সিফাতের (প্রকাশ্য ও গোপন গুণরাজির) পার্থক্যটি এ রকম— প্রকাশ্য গুণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টির অনুমিতি দুঃসাধ্য যে এই সিফাতের বিকাশ কি জাতসহ না জাত বিমুক্ত। কিন্তু বাতেনী সিফাতের বিকাশ সকল অবস্থায় জাতসহ অনুমাননীয়। আর নিছক জাতের বিকাশ কেবল মৃত্তিকার জন্যই নির্ধারিত। দৃষ্টান্তটি এ রকম—স্বচ্ছ পদার্থের উপর সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয় না, বরং ভেদ করে চলে যায়। সূর্যকিরণ কেবল প্রতিবিম্বিত হয় অস্বচ্ছ ও স্থূল আধারে।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝

❒ তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত।'

❒ সে বলিল 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

❒ তিনি বলিলেন, 'যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না।' এ কথার অর্থ— হে ইবলিস, তুমি জান্নাত ও আসমান থেকে নেমে যাও। কারণ এ স্থান হচ্ছে আল্লাহ্র অনুগত দাসদের স্থান— যারা বিনয়ী, কৃতজ্ঞ এবং আনুগত্যনিষ্ঠ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের জন্য অহংকার প্রদর্শন বৈধ নয়। অহংকার তো কেবল আল্লাহ্র। ইবলিস সেই একচ্ছত্র অহংকারে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছিলো বলেই আল্লাহ্র দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তাকে বের করে দেয়া হয়েছে আকাশ থেকে।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। মুসলিম। মুসলিমের এক স্থানে আরো বর্ণিত হয়েছে, এক লোক জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ্র রসুল! কোনো কোনো মানুষ তো সুন্দর বস্ত্র, উত্তম পাদুকা পছন্দ করে (এগুলো কি অহংকারের চিহ্ন)। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ নিজে সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকেই পছন্দ করেন। আর অহংকার তো সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিপরীত। অহংকারতো মানুষকে অসুন্দর ও অপদস্থ করে।

হজরত হারেসা বিন ওয়াহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদের বলবো— বেহেশতবাসী এবং দোজখবাসী কে? জনতার দৃষ্টিতে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিই বেহেশ্তবাসী। সে যদি আল্লাহ্র প্রতি তার বিশ্বাসের কসম করে বসে, তবে আল্লাহ্ তার কসম পূর্ণ করে দেন। আর ওই ব্যক্তি দোজখবাসী যে মন্দ স্বভাবসম্পন্ন, দুঃশ্চরিত্র, উগ্র এবং অহংকারী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, মহত্ত্ব আমার উত্তরীয় এবং অহংকার আমার পরিধেয়। এ দু'টো নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করবে, আমি তাকে নরকে নিক্ষেপ করবো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো। মুসলিম।

এরপর বলা হয়েছে— সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথার অর্থ— হে অভিশপ্ত ইবলিস, তুমি আমার ও আমার বন্ধুদের দৃষ্টিতে অধমতম? সকলেই তোমাকে মন্দ বলবে। প্রতিটি রসনা থেকে তোমার জন্য উচ্চারিত হবে অভিসম্পাত।

কামুস ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে— সগির অর্থ ওই ব্যক্তি, যে অধমতার স্তরে থেকেও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অর্থটির মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অহেতুক নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার অর্থ অপদস্থ ও অসম্মানিত হওয়া। আলোচ্য বাক্যে ইবলিসকে ওই অসম্মানিত দলের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে— ফাখরুজ ইন্নাকা মিনাস্ সগিরিন (বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত)।

রসুল স. বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। স্বদৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র হলেও মানুষের দৃষ্টিতে মহৎ। আর যে গর্ব করে আল্লাহ্‌পাক তাকে অপমানিত করেন। সে স্বদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শূকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। শো'বুল ইমান গ্রন্থে বায়হাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মন্দ, যে দম্ভ প্রকাশ করে এবং দাম্ভিকতার সঙ্গে চলে। সে মহামহিম আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিচ্যুত। তিরমিজিও হজরত আসমা থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্ট এবং দুঃষ্প্রাপ্য।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— সে বললো, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও। এ কথার অর্থ— ইবলিস বললো, আমার আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হোক। ইস্রাফিল যখন দ্বিতীয় শিংগায় ফুঁ দিবে এবং যখন মানুষ তাদের আপনাপন কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, ওই সময় পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু থেকে মুক্ত রাখা হোক। এই অবকাশটুকু আমি চাই।

এর পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।' আলোচ্য আয়াতে ইবলিসকে অবকাশ প্রদানের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। তাকে প্রদত্ত অবকাশের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে অন্য একটি আয়াতে। বলা হয়েছে— নির্ধারিত দিন পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো। এই 'নির্ধারিত দিন' অর্থ কোন দিন— তা আমাদের অজানা। আল্লাহ্‌তায়ালাই এ বিষয়ে উত্তমরূপে অবগত। হতে পারে এই নির্ধারিত দিন অর্থ ওই দিন, যেদিন হজরত ইস্রাফিল তাঁর শিংগায় ফুঁ দিবেন। সেদিন সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে ইবলিসও।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাক কেবল তাঁর অনুগত দাসদের প্রার্থনাই কবুল করেন না, অবাধ্যদের প্রার্থনাও তিনি কবুল করে থাকেন। অবাধ্যদের প্রার্থনার মাধ্যমে তাদেরকে প্রদত্ত অবকাশ হচ্ছে

এক চরম পরীক্ষা— যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। আপন কৃতকর্মের জন্য সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন (তওবা) ছাড়া ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোনো পথ নেই। এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে— অবাধ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে অবকাশ প্রার্থনার চেয়ে প্রার্থনা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ○ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

❒ সে বলিল, 'তুমি আমার সর্বনাশ করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পাতিয়া থাকিব;

❒ অতঃপর আমি তাহাদিগের নিকট আসিবই তাহাদিগের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদিগের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না;

❒ তিনি বলিলেন 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদিগের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

❒ এবং বলিলাম 'হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

ক্বলা ফাবিমা আগওয়ায়তানী লা আক্বউ'দান্না লাহুম সিরাত্বকাল মুস্‌তাক্বীম' অর্থ— সে বললো, তুমি আমার সর্বনাশ করলে, এজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁত পেতে থাকবো। এখানে 'ফাবিমা' শব্দের ফা' অক্ষরটি পরিণাম প্রকাশক এবং 'বা' অক্ষরটি বর্ণনামূলক। আর 'মা' অক্ষরটি এখানে মাস্‌দারী বা মূল অক্ষর। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ

রকম— ইবলিস বললো, হে আল্লাহ্! মানুষের (আদমের) জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হলো, পথচ্যুত হতে হলো। তাই আমিও কসম খেয়ে বলছি, যে কৌশলে সম্ভব মানুষকে (আদম সন্তানদেরকে) পথভ্রষ্ট করবো।

'লা আক্বউ'দান্না' শব্দটিতে রয়েছে লামে তাকীদ (দৃঢ়তা ব্যঞ্জক লাম)। তাই 'বিমা' শব্দটির সম্পর্ক 'আক্বউ'দান্না' এর সঙ্গে হতে পারে না। কোনো কোনো আলেম তাই বলেছেন, 'বিমা আগওয়ায়তানী' কথাটির 'বা' অক্ষরটি কসমের জন্য, অর্থাৎ কুপথে পরিচালিত করার কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— তোমার আদেশ ও কুদরতের কসম। 'লাআক্বউ'দান্না' কথাটি সেই কসমের উত্তর। আর 'সিরাতুন' (পথ) অর্থ এখানে ইসলাম বা ইসলামের পথ। যেমন বলা হয়— আসালাত্ তুরীক্বাছ্ ছা'লাবু (এই পথ দিয়ে খেঁকশিয়াল দ্রুত পালিয়েছে)। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে যের বিশিষ্ট শব্দকে যবর বিশিষ্ট করে নেয়া হয়েছে। যেমন 'দ্বারাবা যায়দুজ্ জাহ্‌রা ওয়াল বাত্‌না' (যায়েদ পিঠ ও পেটের উপর মেরেছে)। এভাবে সরল পথে ওঁত পেতে থাকার মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম—আমি মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করে যাবো— যেমন বাণিজ্যবাহিনী লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতেরা পথের ধারে ওঁত পেতে বসে থাকে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে—'অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবোই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না?' শত্রুরা সাধারণতঃ চারটি দিক থেকে আক্রমণ করে থাকে। তাই এখানে চারটি দিক থেকে আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটির আসল অর্থ হবে— সবদিক থেকে, যে দিক থেকে সম্ভব।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উপর ও নিচ থেকে আক্রমণের কথা এখানে বলা হয়নি এ কারণে যে, উপর থেকে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। আর নিম্নদিক থেকে আক্রমণ করা সাধারণতঃ অসম্ভব। আরো লক্ষ্যণীয় যে, সম্মুখ ও পশ্চাতের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে 'মিন্' শব্দটির মাধ্যমে (মিম্‌বাইনি আইদীহিম ওয়ামিন্ খলফিহিম)। আর ডান ও বামের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে 'আন্' সহযোগে (ওয়া আ'ন্ আইমানিহিম ওয়া আ'ন শামাইলিহিম)। এভাবে সামনে ও পিছনে যাওয়া ও আসা এবং দক্ষিণে ও বামে সরে যাওয়া এবং সরে আসার কথা বলা হয়েছে।

হজরত আলী বিন তালহার বর্ণনা সূত্রে বাগবী কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয়তানের 'সম্মুখ থেকে আসবো'— কথাটির অর্থ, আমি মানুষকে আখেরাতের বিষয়ে সন্দিহান করে তুলবো। পশ্চাৎ দিক থেকে আসবো

অর্থ— আমি মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করবো পৃথিবীর মোহ। দক্ষিণ দিক থেকে আসবো অর্থ— আমি তাদেরকে ধর্মের বিধিবিধান সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ করে তুলবো এবং বাম দিক থেকে আসবো অর্থ, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিবো নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। আতিয়া ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন।

হজরতইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মিম্‌বাইনি আইদীহিম' কথাটির অর্থ— আমি মানুষকে পৃথিবীর প্রেমে মগ্ন করে দিবো। 'মিন্ খালফিহিম' অর্থ— আমি তাদেরকে উদাসীন করে দিবো আখেরাতের স্মরণ থেকে। বলবো, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর— এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। 'আ'ন আইমানিহিম' অর্থ— আমি তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবো দক্ষিণ দিক থেকে বা পুণ্যকর্ম থেকে। আর 'আ'ন্ শামাইলিহিম' অর্থ— তাদেরকে ধাবিত করবো বাম দিকে বা পাপের দিকে। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, হে মানুষ! ইবলিস তোমাদের কাছে সামনে, পিছনে, ডানে ও বাঁয়ে থেকে আসতে পারে কিন্তু উপর দিক থেকে আসতে পারে না। কারণ উপর থেকে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌র রহমত। আর ওই রহমতের অন্তরায় হওয়ার সাধ্য তার নেই। আল্লামা সুয়ূতিও এই বিবরণটি এনেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আমি তাদের নিকট আসবোই কথাটির অর্থ— যে দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে সেদিকেই আমি আমার প্রতারণার ফাঁদ পাতবো। বাকী তিনটি দিক (পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম) থেকে আসবো অর্থ— আমি তাদের অগোচরে তাদের নিকটবর্তী হয়ে কুমন্ত্রণাদানের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হবো। মুজাহিদের এই উক্তি সম্পর্কে ইবনে জুরাইজ বলেছেন, এখানে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতারণার ফাঁদ পাতবো কথাটির অর্থ হবে, জ্ঞাতসারে আমি তাদেরকে এমন প্রতারণায় লিপ্ত করবো যাতে করে তারা জ্ঞাতসারেও ভুল করতে থাকবে।

'তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না' অর্থাৎ ইমানদার পাবে না। এই উক্তিটি ইবলিসের একটি ধারণাপ্রসূত উক্তি। কারণ সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই সে ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিতরূপে বলতেই পারে না। অন্য এক আয়াতে এসেছে— ওয়া লাক্বাদ সদ্দাক্বা আ'লাইহিম ইবলিসু জন্নাহু ফাত্তাবাআ'হু ইল্লা ফারিক্বা' (আর ইবলিস তার ধারণা তাদের উপর ফলপ্রসূ করলো, একজন ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো) এই আয়াতের মাধ্যমে অবশ্য দেখা যায় শয়তানের ধারণা অনেকটা ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু এ রকম মন্তব্য সে জ্ঞাতসারে বলেনি। অনুমান ফলপ্রসূ হওয়া এবং নিশ্চিতরূপে ভবিষ্যতের আগাম খবর দেয়া— নিশ্চয় এক কথা নয়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। তাই দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞ।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— তিনি বললেন, এই স্থান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। এখানে 'ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থা বুঝাতে 'মাজউমান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কামুস অভিধানে রয়েছে, 'জাআমাহু' অর্থ নিন্দিত ও অপমানিত। ইমাম জুহুরী বলেছেন, জাআমাহু জা'মান, জায়ামাহু জাইমান এবং জাম্মাহু জাম্মান— শব্দ তিনটি সমার্থক। বাগবী বলেছেন, 'জাইমুন' এবং 'জাআমামুন' শব্দ দু'টির অর্থ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন 'জাম্মুন' শব্দটির চেয়ে জাইমুন এবং জা'মুন এর মধ্যে অধিকতর কঠোরতা রয়েছে। আর 'মাদহুরান' শব্দটির অর্থ এখানে বারংবার ধিকৃত বা লাঞ্ছিত হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। এ কথার অর্থ— হে ইবলিস! শুনে নাও, সকল মানুষ তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। আরো শুনে নাও, যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তুমি ও তোমার সেই সকল অনুসারী দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'এবং বললাম হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার করো; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এই আয়াতে বিবৃত প্রসঙ্গটি সুরা বাকারার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০, ২১

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

❐ অতঃপর তাহাদিগের লজ্জাস্থান, যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা, প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশ্‌তা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এই জন্যই তোমাদিগের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।'

❐ সে তাহাদিগের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তোমাদিগের হিতাকাংক্ষীদের একজন'।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিলো তা, প্রকাশ করবার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো'। কামুস অভিধানে রয়েছে, ওয়াস্‌ওয়াসা অর্থ কুমন্ত্রণা— যা শয়তান কর্তৃক অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। ক্ষতিকর ধারণা মাত্রই কুমন্ত্রণা। বাগবী লিখেছেন, কুমন্ত্রণা অর্থ ওই কথা যা শয়তান মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। 'ওয়াস্‌ওয়াসা' শব্দটির শাব্দিক অর্থ— অলংকারের শব্দ অথবা পায়ের আওয়াজ। 'লাহুমা' শব্দটির 'লাম' এখানে 'লামে আজালিয়া' (কালবোধক)। আর 'লিইউব্‌দিউ' শব্দটির 'লাম' পরিণাম প্রকাশক। অথবা উদ্দেশ্যজ্ঞাপক। কেননা হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে বিবস্ত্র করে মন্দকর্মে লিপ্ত করাই ছিলো শয়তানের উদ্দেশ্য।

'সাও আতিহিমা' অর্থ গোপন অঙ্গ যা হজরত আদম ও হজরত হাওয়া কখনো দেখতেন না। নিজের অথবা অপরের। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, বিনা প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী নিজের অথবা একে অপরের গোপনাঙ্গ দর্শন করা একটি নিন্দনীয় কর্ম। শরিয়ত ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান— সকল দিক দিয়েই বিষয়টি নিতান্তই নিন্দনীয়।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন'।

এ কথার অর্থ— ইবলিস হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে বললো, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটে যেতে বারণ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলে তোমরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে অথবা লাভ করবে অমরত্ব। আর আল্লাহ্‌পাক চান না যে তোমরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাও অথবা লাভ করো অমরত্ব। তাই তিনি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা নবীদের উপর ফেরেশ্‌তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে থাকেন। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা নবীগণের উপর ফেরেশ্‌তাদের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণেরই। তবে এখানে এ কথাটি স্পষ্ট যে, হজরত আদম ও হাওয়া ফেরেশ্‌তাদের ওই আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন। ফেরেশ্‌তাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের ইবাদত নিরবচ্ছিন্ন ও নিখুঁত। এ সকল বিশেষত্ব হজরত আদম ও হজরত হাওয়াও কামনা করতেন। কিন্তু তাঁরা তখন পর্যন্ত এ কথা জানতেন না যে, তাঁরা নিজেরাই সামগ্রিক বিচারে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফেরেশ্‌তারা নৈকট্যভাজন, কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের প্রিয়ভাজন। আর প্রিয়ভাজন যারা তারাই শ্রেষ্ঠ।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, 'আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের একজন।' শপথ বলতে এখানে 'ক্বাসামা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য এবং গুরুত্ববহ করে

তুলবার জন্যই ইবলিস এভাবে কথা বলেছিলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, ইবলিস আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে ধোকা দিয়েছিলো। এতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র নামে কাউকে শপথ করতে দেখলে সাধারণতঃ বিশ্বাসী নর-নারীরা প্রতারণায় পতিত হয়। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— ইবলিস বললো, হে আদম হাওয়া! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের হিতাকাংখী। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের অনেক আগে। তাই আমি তোমাদের চেয়ে প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ। সুতরাং তোমরা আমার নির্দেশনাকে মান্য করো। তাহলে সঠিক পথে চলতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, ইবলিসই প্রথম আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়েছিলো। আর হজরত আদম ও হাওয়া চিন্তা করতে পারেননি যে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে। এই সরল বিশ্বাসের কারণেই ইবলিসের প্রতারণা ফলবতী হয়েছিলো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ
لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٜ وَاِنْ لَّمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ
وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝

❐ এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদিগের লজ্জাস্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করি নাই এবং শয়তান যে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তাহা তোমাদিগকে বলি নাই?'

❒ তাহারা বলিল 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা নিজদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

❒ তিনি বলিলেন, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদিগের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

❒ তিনি বলিলেন, 'সেখানেই তোমরা জীবনযাপন করিবে, সেখানেই তোমাদিগের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।'

শুরুতে বলা হয়েছে— 'এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চিত করলো।' বাগবী বলেছেন, এখানে 'তাদেরকে' অর্থ হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে। অর্থাৎ দু'জনকেই প্রবঞ্চিত করেছিলো ইবলিস। এখানে 'গুরুর' শব্দটির অর্থ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ধোকা, মিথ্যাবচন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'দাল্লাহুমা' শব্দটি এসেছে 'তাদ্‌লিইয়াতুন' থেকে। তাদ্‌লিইয়াতুন এবং ইদ্‌লাউ অর্থ— নিচের দিকে নামিয়ে দেয়া, ঝুলিয়ে দেয়া। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে— অধঃপতিত করা। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে— ইবলিস প্রবঞ্চনা দানের মাধ্যমে হজরত আদম ও হজরত হাওয়াকে উচ্চ মর্যাদা থেকে অধঃপতিত করেছিলো। স্খলিত করেছিলো আনুগত্যের স্তর থেকে।

এরপর বলা হয়েছে—'তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা উদ্যানপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো।' 'বৃক্ষ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো'— এ কথায় বুঝা যায়, প্রথম মানব-মানবী হজরত আদম ও হজরত হাওয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেননি। কিঞ্চিত আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। আর আস্বাদ গ্রহণের সাথে সাথে শরীর থেকে খসে পড়লো তাঁদের বেহেশতি পরিচ্ছদ। আবদ বিন হুমাইদের বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ বলেছেন, প্রথম মানব দম্পতির পোশাক ছিলো নূরের।

সুদ্দী ফারহাবীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, প্রথম মানব-মানবীর পোশাক ছিলো নখ নির্মিত। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে ওই পোশাক অন্তর্হিত হলো। আর তার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ রয়ে গেলো হাত ও পায়ের নখ রূপে। এভাবে বিবস্ত্র হওয়ার পর যে উদ্যানপত্রের দ্বারা তাঁরা নিজেদেরকে আবৃত করেছিলেন সেই উদ্যানপত্র হচ্ছে ডুমুর বৃক্ষের পত্র।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদম ছিলেন দীর্ঘকায়। উচ্চতায় ছিলেন দীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষের মতো। মস্তকে পরিদৃশ্যমান হতো প্রলম্বিত কেশগুচ্ছ। হঠাৎ নিজেকে বিবস্ত্র দেখতে পেয়ে দৌড়ে আত্মগোপন করলেন একটি ঘন বৃক্ষ সন্নিবেশিত উদ্যানে। সেখানে একটি বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো তাঁর লম্বা চুল। তিনি বৃক্ষটিকে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। বৃক্ষটি বললো, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। অদৃশ্য আওয়াজ উচ্চারিত হলো— হে আদম! তুমি কি আমার নিকট থেকে পালাতে চাও? তিনি বললেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তোমাকে ছেড়ে কোথায় পালাবো? কিন্তু আমি যে এখন বিবস্ত্র, লজ্জিত।

এরপর বলা হয়েছে—'তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদেরকে বলিনি?' এখানে 'এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি'— কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়, নিষেধাজ্ঞাটিকে বাস্তবায়ন ছিলো অত্যাবশ্যক। আর ফল ভক্ষণের কথা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ না করা হলেও বিষয়টি এই নিষেধাজ্ঞারই অন্তর্ভুক্ত।

মোহাম্মদ বিন কায়েস বলেছেন, লজ্জিত আদম আ. কে আল্লাহ্পাক তখন বললেন, আমি তো ওই বৃক্ষের ফল তোমার জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম— তবু তুমি ভক্ষণ করলে কেনো? হজরত আদম বললেন, হাওয়া আমাকে খাইয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা তখন হাওয়া আ. জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি এ কাজ করলে? তিনি বললেন, সাপ আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ রকম পরামর্শ দিলে কেনো? সাপ বললো, ইবলিস আমাকে এ রকম করতে বলেছে। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে হাওয়া, তুমি বৃক্ষ থেকে রক্ত (রস) ঝরিয়েছো। তাই প্রতি মাসে কয়েকদিন তোমারও রক্ত ঝরবে। হে সর্প! আমি তোমার পা কেটে দিচ্ছি। তুমি এখন থেকে চলবে বুকে হেঁটে হেঁটে। মানুষ তোমাকে দেখলেই তোমার মস্তকে আঘাত করবে। আর হে ইবলিস! তুমি তো চির অভিশপ্ত।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' এ কথার অর্থ— হজরত আদম ও হজরত হাওয়া বললেন, হে আমাদের দয়ার্দ্র প্রভুপালক! আমরা ভুল বুঝে তোমার নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করে আত্ম-অত্যাচার করেছি। তাই আমরা লজ্জিত,

অনুতপ্ত ও রোরুদ্যমান। আমরা তোমার সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তুমি দয়া করে আমাদেরকে মার্জনা করো। নতুবা আমরা হয়ে যাবো চিরক্ষতিগ্রস্ত। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মার্জনা না করা হলে বৃহৎ ক্ষুদ্র, সকল পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। মোতাজিলারা বলে, সগীরা (ক্ষুদ্র) গোনাহ্র শাস্তি দেয়া হবে না। আমরা বলি, সগীরা গোনাহ মাফ করা হয় তখনই যখন কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।

এর পরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে—'তিনি বললেন, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো।' ইহ্‌বিতু (নেমে যাও) শব্দটি বহুবচনবোধক। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনরূপে। অর্থাৎ শব্দটির মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে হজরত আদম ও হাওয়াকে। কেননা এখানকার 'নেমে যাও' নির্দেশটির মধ্যে ইবলিস অন্তর্ভুক্ত নয়। তাকে অধঃপতিত করা হয়েছিলো এই ঘটনার অনেক আগে। এখানকার নির্দেশটি বর্তমান কালবোধক। তাই ইহ্‌বিতু (নেমে যাও) সম্বোধনটি দ্বিবচনই হবে। অবশ্য একে বহুবচন বলা যেতে পারে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। সেটি হচ্ছে— হজরত আদম ও হাওয়ার অনাগত বংশধরেরাও এই নির্দেশটির অন্তর্ভূত। এখানে বহুবচন বিশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে হয়তো সে কারণেই।

কেউ কেউ বলেছেন, 'নেমে যাও' নির্দেশটির মধ্যে ইবলিসও অন্তর্ভুক্ত। হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং ইবলিস— তিনজনকেই এক সঙ্গে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে— তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। এ রকমও হতে পারে যে, ইবলিসকে এবং আদম-হাওয়াকে পৃথকভাবে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ওই পৃথক নির্দেশাবলীর লক্ষ্য ছিলো তিনজন (হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং ইবলিস)। পৃথকভাবে প্রদত্ত নির্দেশিতদের কথা এই আয়াতে এক সঙ্গে জানানো হয়েছে। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনবোধক শব্দরূপ।

আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো এই— ১. তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ করো। ২. সেখানে নির্ধারিত হলো তোমাদের বসবাস। ৩. তোমাদের জীবনোপকরণ ওই পৃথিবীতে নির্ধারণ করা হলো। ৪. সেখানে তোমরা হবে একে অন্যের শত্রু— এক পক্ষে হজরত আদম, হজরত হাওয়া এবং অনাগত মানবতা। আর অপর পক্ষে ইবলিস এবং তার জ্বিন ও মানুষ অনুসারীর দল। ৫. মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদেরকে অবস্থান করতে হবে সেখানে।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।' এ কথার অর্থ— এ পৃথিবীতেই হবে মানুষ ও জ্বিনের জীবনযাপন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৬

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

❐ হে বনি আদম! তোমাদিগের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহের নিদর্শন সমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আল্লামা বাগবী বলেছেন, মূর্খতার যুগের মানুষ উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো। দিনের বেলা তাওয়াফ করতো পুরুষেরা। আর রাতের বেলায় মেয়েরা। তারা বলতো, যে কাপড় পরে আমরা গোনাহ করেছি, সে কাপড় পড়ে তাওয়াফ করবো না। তাদের এই পাপাচারের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত কাতাদা বলেছেন, বিবস্ত্রা রমণীরা তাওয়াফের সময় তাদের গোপনাংগে হাত রেখে বলতো, আজ এর কিছু অংশ অথবা এর সম্পূর্ণটাই বস্ত্রবিবর্জিত। আজ আমি এটিকে ব্যবহৃত হতে দিবো না। এ ধরনের কথাবার্তাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে— হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার জন্য ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি।'

এখানে 'সাওআতিকুম' কথাটির অর্থ আবরণযোগ্য অঙ্গ। শব্দটি 'সাওআতুন' শব্দের বহুবচন। শরীরের আবরণযোগ্য অঙ্গ বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখা একটি অত্যন্ত অসুন্দর ও লজ্জাজনক কর্ম। তাই গোপন অঙ্গসমূহকে বলা হয় সাওআতুন।

'আনযালনা' শব্দটির অর্থ অবতীর্ণ করা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে 'আনযালনা আলাইকুম লিবাসান' (আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি)। এখানে কিন্তু 'আনযালনা' শব্দটির মাধ্যমে সরাসরি আসমান থেকে 'পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করা হয়েছে' এ রকম বলা হয়নি। তাই এখানে আনযালনা শব্দের অর্থ 'অবতীর্ণ

করেছি' না হয়ে হবে 'দিয়েছি' বা সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ— হে মানুষ! আসমানী ব্যবস্থাপনা এবং স্বর্গীয় রীতির নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'আনযালা' শব্দের এ রকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অন্য আয়াতেও রয়েছে। যেমন— ওয়া আনযালা লাকুম মিনাল আ'নআম (তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি)। আরেক স্থানে বলা হয়েছে— ওয়া আনযালনাল হাদীদ্ (তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি লৌহ)। এ রকমও হতে পারে যে, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— হে মানুষ! লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিধানের হুকুম অবতীর্ণ করেছি। এ অর্থটি গ্রহণ করলে সহজেই প্রমাণিত হবে যে— গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত রাখা নিষিদ্ধ। তাই নগ্নতা মানুষের জন্য একটি বিপদ। এই বিপদটিই সর্বপ্রথম নেমে এসেছিলো মানুষের উপর। শয়তানই মানুষকে প্রথম এই বিপদে ফেলেছিলো। তার প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার সাথে সাথে বেহেশতেই বিবস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন প্রথম মানব-মানবী। সেই শয়তানই তাঁদের অনাগত বংশধরদেরকে নগ্নতার প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। তাই নগ্নতা ও বেহায়াপনা সকল সময়ে সকল যুগে পরিহার্য।

'রিশান' অর্থ উত্তম পোশাক বা বেশ-ভূষা। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। বায়যাবী বলেছেন, শব্দটির অর্থ সৌন্দর্য। হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, জুহাক এবং সুদ্দী বলেছেন, শব্দটির অর্থ সম্পদ। যেমন বলা হয়— তারাইয়্যাশার রজুলু (ওই ব্যক্তি সম্পদশালী হয়েছে)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।' সাবধানতার পরিচ্ছদ বুঝাতে আলোচ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে 'লিবাসুত্ তাক্বওয়া' কথাটি। এই সাবধানতার পরিচ্ছদ বা লেবাসে তাকওয়াকে আলেমগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, লেবাসে তাকওয়া অর্থ ইমান। হাসান বসরী বলেছেন, লজ্জা। আতিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সৎকর্মই হচ্ছে লেবাসে তাকওয়া। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বলেছেন, লেবাসে তাকওয়া অর্থ উত্তম কারুকার্য বা সুন্দর চিত্র।

হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, সাবধানতার পরিচ্ছদ অর্থ আল্লাহ্র ভয়। কালাবী বলেছেন, পবিত্রতাই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ। ইবনুল আমবারী বলেছেন, এই আয়াতের বক্তব্যের মধ্যেই লেবাসে তাকওয়ার আসল অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ করার রীতি পরিত্যাগ করে তাওয়াফের সময় যে বস্ত্র পরিধান করা হবে সেই বস্ত্রই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ। মোটকথা, যে বস্ত্র নগ্নতার পাপ থেকে রক্ষা করে সেই বস্ত্রই হচ্ছে সাবধানতার বস্ত্র বা পরিচ্ছদ। কিন্তু হজরত জায়েদ ইবনে আলী বলেছেন, সমর প্রান্তরে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে পোশাক পরিধান করা হয়

সেই পোশাকই হচ্ছে সাবধানতার পোশাক। যেমন, লৌহবর্ম ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলেছেন, দুনিয়াবিরাগী সাধকেরা যে কম্বল পরিধান করে থাকে, সেই কম্বলই হচ্ছে সাবধানতার পরিচ্ছদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' এখানে আয়াতিল্লা কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার ওই বিধান বা নিদর্শন, যা আল্লাহ্র রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আর 'জিক্র' (স্মরণ) শব্দটি এখানে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত। এখানকার অন্তর্নিহিত সেই উপদেশটি হচ্ছে দয়া করে লজ্জা নিবারণের জন্য আল্লাহ্তায়ালা যে পোশাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন, সেই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে আল্লাহ্তায়ালার শুকরিয়া আদায় করো এবং আত্মরক্ষা করো আল্লাহ্পাকের নির্দেশের বিরোধিতা থেকে। মনে রেখো, সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৭

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

❒ হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে— যে-ভাবে তোমাদিগের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদিগের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না; যাহারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছি।

শয়তানের প্ররোচনা থেকে সদা সতর্ক থাকবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'হে বনী আদম! শয়তান যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে— যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিলো, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিলো।'

এরপর বলা হয়েছে—'সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দ্যাখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।' এখানে 'সে এবং তার দল' অর্থ শয়তান এবং তার বংশধর। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।

আর হজরত কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে শয়তান ও তার অনুসারী জ্বিন সম্প্রদায়। বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! তোমরা শয়তানের কারসাজি থেকে সাবধানে থেকো। কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনাদানের মাধ্যমে সে সব সময় তোমাদের পদস্খলন ঘটাতে তৎপর। আর তোমরা শয়তান ও তার অনুসারীদের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতেও সক্ষম নও। কারণ সে ও তার দল তোমাদেরকে দ্যাখে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। অতএব, তোমরা আল্লাহ্পাকের স্মরণসংযুক্ত হও। নিরবচ্ছিন্ন এই সংযোগের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আর এভাবেই তোমরা শয়তানের আক্রমণ থেকে থাকতে পারবে পূর্ণ নিরাপদ। যুননুন মিসরী বলেছেন, শয়তান তোমাকে দ্যাখে, কিন্তু তুমি তাকে দেখো না। অতএব তুমি ওই সত্তার সাহায্যার্থী হও যিনি শয়তানকে দেখেন, কিন্তু শয়তান যাঁকে দেখতে পায় না।

শেষে বলা হয়েছে—'যারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।' এ কথার অর্থ— আমি শয়তানকে অবিশ্বাসীদের অভিভাবক নিযুক্ত করেছি। তাই অবিশ্বাসীরা তাদের অভিভাবক শয়তানের পরামর্শে ও উৎসাহে সত্যকে অবজ্ঞা করে এবং অনুসরণ করে চলে মিথ্যাকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২৮

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

❐ যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, 'আমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।' বল, 'আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কী আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?'

প্রথমে বলা হয়েছে—'যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণকে এ রকম করতে দেখেছি।' এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথার অর্থ শিরিক, উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তাওয়াফ ইত্যাদি অপকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তারা এই যুক্তি দেখায় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাও তো এ রকম করতো। আর নিশ্চয় আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা আল্লাহ্র নির্দেশেই এ রকম করে এসেছেন।

এখানে উল্লেখিত 'ফাহেশাতান' শব্দটির অর্থ অশ্লীল আচরণ। অর্থাৎ শিরিক। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য

হচ্ছে— উলঙ্গ অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ। অবশ্য সাধারণভাবে ফাহেশা কথাটির মধ্যে সকল প্রকার কবীরা গোনাহ অন্তর্ভুক্ত। মক্কার মুশরিকদেরকে অশ্লীল আচরণসমূহ পরিত্যাগ করতে বললে তারা তাদের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করতো। একটি হচ্ছে— তারা বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি। সুতরাং এগুলো নির্ভুল না হয়েই পারে না। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে— আল্লাহ্ই এ রকম করতে আদেশ করেছেন। তাদের প্রথম যুক্তিটির জবাব এখানে দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় যুক্তিটির জবাব। অন্য আয়াতে অবশ্য তাদের প্রথম যুক্তিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে— তাদের পূর্বপুরুষেরা কি কিছুই বুঝতো না এবং তারা কেনো সঠিক পথে চলতো না? আর এখানে আলোচ্য বাক্যটির পরক্ষণেই দেয়া হয়েছে তাদের দ্বিতীয় যুক্তিটির উত্তর।

বলা হয়েছে—'বলো, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না।' এই বাক্যটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অশ্লীলকর্মের নির্দেশদানও অশ্লীলতা। আরো প্রমাণিত হয়, ভালো-মন্দ সকল কর্মই আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক সৃজিত। আর স্বচ্ছ জ্ঞানের মাধ্যমে ভালো এবং মন্দ উপলব্ধি করা যায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে দু'টি প্রশ্ন এবং দু'টি উত্তর রয়েছে। যেমন— প্রশ্নঃ তোমরা অশ্লীল আচরণসমূহ করে চলেছো কেনো? উত্তরঃ আমরা আমাদের পিতা পিতামহদেরকে এ রকম করতে দেখেছি। প্রশ্নঃ তোমাদের পিতা পিতামহরা কোথা থেকে এ রকম হুকুম পেয়েছে? উত্তরঃ আল্লাহ্ই তাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। আর আমরা প্রতিপালন করে চলেছি সেই হুকুমেরই ধারাবাহিকতা। সুতরাং আমরা মনে করি, আল্লাহ্ আমাদেরকেও হুকুম দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য যে, এই আয়াতে পূর্বপুরুষদের প্রমাণবিহীন আমলের অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সার্বিক অনুকরণ নিষিদ্ধ করা হয়নি। পূর্বপুরুষেরা অনুমোদিত শরিয়তের বিধানের আমল করলে সেই আমলের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু শরিয়ত বহির্ভূত আমলের অনুকরণ নিষিদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে—'তোমরা কী আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। বাক্যটির মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে— তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে স্বরচিত কোনো কথা বোলো না। যা জানো তাই বলো। যা জানো না তা বোলো না।

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

❒ বলো, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদিগের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

❒ এক দলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত।

এরশাদ হয়েছে—'কুল আমারা রব্বি বিল ক্বিস্‌ত (বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার)।' হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলক্বিস্‌ত' কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'। জুহাক বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য তৌহিদ। মুজাহিদ বলেছেন, ইনসাফ বা ন্যায় বিচার। অর্থাৎ 'ক্বিস্‌ত' অর্থ ওই কর্ম, যাতে কোনো অতিরিক্ততা ও ন্যূনতা নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়া আক্বিমু উজুহাকুম ই'নদা কুল্লি মাস্‌জিদিঁউ ওয়াদ্‌উ'হু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীন (প্রত্যেক নামাজে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে)। এখানে 'আক্বিমু' (লক্ষ্য স্থির রাখবে) কথাটি কর্ম। এর ক্রিয়া ('নামাজ') কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে।' ওই উহ্য ক্রিয়াসহ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি এ কথা বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিটি নামাজে লক্ষ্য স্থির রাখবে। বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র আল্লাহ্‌কে সেজদা করবে। এই নির্দেশটির মাধ্যমে প্রথমে নামাজের সময় এবং পরে নামাজের স্থান অর্থাৎ মসজিদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

মুজাহিদ এবং সুদ্দী আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর বর্ণনা করেছেন এ রকম— তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, নামাজের সময় কাবামুখী হয়ে যাও।

জুহাক বলেছেন, অর্থ হবে এ রকম— যদি তোমরা কোনো মসজিদের ধারে কাছে অবস্থান করো এবং যদি দ্যাখো নামাজ শুরু হতে চলেছে, তবে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে নাও। এ কথা বলো না যে, আমি আমার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বো। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম। তবে তিনি অতিরিক্ত এ কথাটিও বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মসজিদের এমন ইমাম অথবা তত্ত্বাবধায়ক হয়, যার অনুপস্থিতিতে ওই মসজিদের নামাজের জামাত বিঘ্নিত হতে পারে— তবে ওই ব্যক্তি তার বর্তমান অবস্থান স্থলের মসজিদে আযান শোনার পরেও তার নিজস্ব দায়িত্বভূত মসজিদের দিকে চলে যেতে পারে। এ রকম করা জায়েয।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যটির তাফসীর করেছেন এ রকম— আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, একনিষ্ঠ হও, অন্য কোনো দিকে মুখ ফিরিয়ো না। এখানে 'ওয়াদ্‌উ'হু' অর্থ— কেবল তাঁর (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করো। আর মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীন অর্থ— আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও উপাসনাকে অংশীবাদীতা, দর্প এবং যশাকাঙ্খা থেকে পবিত্র রাখো।

শেষে বলা হয়েছে—'কামা বাদাআকুম তাউ'দুন (তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে)।' এ কথার অর্থ— যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে মাটি এবং অপবিত্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে এবং সেদিন তোমাদেরকে তোমাদের আমল অনুসারে বিনিময় প্রদান করা হবে। এখানে প্রথম সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি এ রকম বলার কারণ হচ্ছে— আল্লাহ্‌পাকই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়া। এ কথাটিও বুঝিয়ে দেয়া যে যিনি প্রথমে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি দ্বিতীয় সৃষ্টিতে অবশ্যই সক্ষম।

কোনো কোনো আলেম আলোচ্য বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্‌পাক প্রথমে যেমন তোমাদেরকে নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর এবং খতনাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হাশরের ময়দানে সকলকে খালি পা এবং বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় উঠানো হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সেদিন কি নারী পুরুষ সকলেই বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে? তিনি স. বললেন, আয়েশা! ওই দিনের অবস্থা হবে অত্যন্ত কঠিন (কারো প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ সেদিন পাবে না)।

বোখারী, মুসলিম এবং তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন রসুল স. সহসা দাঁড়িয়ে বললেন, হে মানুষ! জেনে নাও, পুনরুত্থান দিবসে তোমরা হবে পাদুকা, বস্ত্র, এবং খতনাবিবর্জিত। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন— তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।

পুনরুত্থান দিবসে সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিধান করানো হবে হজরত ইব্রাহিমকে। এ প্রসঙ্গে বহু বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক সংকলিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত একটি হাদিসে এসেছে, পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে হজরত আবু সাঈদ খুদরী পরিচ্ছন্ন পরিধেয় চাইলেন। পরিধেয় আনা হলে তিনি তা পরিধান করে বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তি ওই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটেছিলো? হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে উত্তমসূত্রে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত মুয়াজ তাঁর মৃত মাকে নতুন কাপড়ের কাফন পরালেন এবং বললেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম কাপড়ের কাফন পরাবে। কেননা পুনরুত্থান দিবসে ওই কাপড় পরেই তাকে ওঠানো হবে।

সাঈদ বিন মানসুরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে উত্তম বস্ত্রের কাফন পরাও। কেননা ওই কাপড়সহ তাকে পুনরুত্থান দিবসে ওঠানো হবে।

উপরে বর্ণিত হাদিস তিনটি কিন্তু ওই হাদিসটির মতো শক্তিশালী নয়, যে হাদিসে বলা হয়েছে বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত হওয়ার কথা। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হওয়ার হাদিসগুলো শহীদগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হজরত আবু সাঈদ খুদরী শহীদদের জন্য প্রযোজ্য হাদিসকে সম্ভবত সকল মৃত ব্যক্তির জন্য ধরে নিয়েছিলেন। হাদিসের বর্ণনা ভিন্নতার সামঞ্জস্য সাধনার্থে বায়হাকী বলেছেন, সেদিন কেউ কেউ পুনরুত্থিত হবে বস্ত্রাবৃত অবস্থায়। আবার কেউ কেউ পুনরুত্থিত হবে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায়।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময় সকলে থাকবে বস্ত্রাবৃত। কিন্তু হাশর প্রান্তরে সমবেত হওয়ার শুরুতেই সকলে হয়ে পড়বে বস্ত্রহীন।

কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, যে সকল হাদিসে পরিধেয় বস্ত্রসহ ওঠানোর কথা বলা হয়েছে, ওই সকল হাদিসে উল্লেখিত বস্ত্র হচ্ছে পুণ্যকর্মসমূহ। যেমন, এক আয়াতে এসেছে—'ওয়া লিবাসুত্ তাক্বওয়া জালিকা খইরুন' (সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট)।

হজরত জাবের এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, যে আমলের উপর মানুষ মৃত্যুবরণ করবে সে আমলের উপরেই হবে তার পুনরুত্থান। মুসলিম, ইবনে মাজা। হজরত জাবের আরো বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, মানুষের পুনরুত্থান হবে তার আমলের উপর— যার উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান হবে ইমানের উপর এবং অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মানুষের বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হওয়ার ব্যাপারটি সৃষ্টির সূচনালগ্নেই নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্পাক বলেছেন—'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে কাউকে বিশ্বাসী এবং কাউকে অবিশ্বাসী বানিয়েছেন।' এই নির্ধারণের উপরেই হবে তাদের পুনরুত্থান।

আবুল আলীয়া বলেছেন, মানুষ ওই অবস্থার দিকে আসবে, যে অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন জ্ঞানের অন্তর্ভূত।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, নিজ নিজ ভাগ্যলিপি অনুসারে সকলে সেদিন পুনরুত্থিত হবে।

হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব বলেছেন, যে সৃষ্টির উন্মেষকাল থেকে মন্দ, সে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস ও শাস্তির দিকেই চলে যাবে— যদিও সে সাময়িকভাবে পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন, ইবলিস বহু দিন ধরে পুণ্যকর্ম করার পরেও শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে শাস্তির দিকে। আর যে সূচনাকাল থেকে পুণ্যবান, পরবর্তিতে সে জান্নাতের পথই ধরবে— যদিও সাময়িকভাবে মন্দকর্মে লিপ্ত থাকে। যেমন হজরত মুসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ যাদুকরগণ। জঘন্য যাদুকর্মে নিয়োজিত ছিলো তারা। কিন্তু শেষে এসে পড়েছিলো ইমানের পথে।

সহল বিন সা'দের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, কেউ কেউ দোজখীদের মতো মন্দকর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও অবশেষে জান্নাতী হয়। আবার কেউ জান্নাতিদের মতো আমল করা সত্ত্বেও অবশেষে হয়ে যায় জাহান্নামী। জীবনের শেষ অধ্যায়ের উপরেই নির্ণীত হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। বোখারী, মুসলিম। পরবর্তী আয়াতে (৩০) রয়েছে এ কথারই প্রতিধ্বনি।

বলা হয়েছে—'এক দলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের এক দলকে তাঁর চিরস্থায়ী জ্ঞানের মধ্যে হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেছেন। তাই তিনি তাদেরকে দিয়েছেন ইমান এবং পুণ্যকর্মের সুযোগ। আর এক দলকে তিনি চেয়েছেন পথভ্রষ্ট করতে। তাই পথভ্রষ্টতাই হবে তার সর্বশেষ পরিণতি।

শেষে বলা হয়েছে—'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছিলো এবং নিজেদেরকে তারা সৎপথগামী মনে করতো।' এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয়। তাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করলেও সকল অবস্থায় অবিশ্বাসী ও অবিশ্বাস নিন্দার্হ।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইসলাম-পূর্ব সময়ের রমণীরা বিবসনা হয়ে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা এক হাত তাদের লজ্জাস্থানের উপর রেখে বলতো, আজ সম্পূর্ণটাই উন্মোচন করা হবে অথবা উন্মোচন করা হবে আংশিক। আমি আজ এ অঙ্গ কাউকে ব্যবহার করতে দেবো না। এ সকল কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩১

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۟

❒ হে বনি আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে। আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অমিতাচার করিবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।

ইয়া বনী আদামা খুজু যিনাতাকুম ই'নদা কুল্লি মাস্‌জিদ্‌ (হে বনী আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে)। মুফাসসিরগণের ঐকমত্য এই যে, এখানে 'যিনাত' শব্দটির অর্থ ওই পোশাক যার দ্বারা সতর ঢাকা হয়। মুজাহিদ বলেছেন, ওই পরিচ্ছদই সুন্দর পরিচ্ছদ যা সতরকে আচ্ছাদিত করে— যদিও তা হয় চোগা (পাজামা বিশেষ)। কালাবীও এ রকম বলেছেন।

বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যিনাত' শব্দের অর্থ পরিচ্ছদ এবং 'মাস্‌জিদ্‌' অর্থ মসজিদ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তাওয়াফ এবং নামাজের জন্য পরিচ্ছদাবৃত হয়ে মসজিদে গমন করো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবনে হুম্মাম বলেছেন, উলঙ্গ অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ নিষিদ্ধ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমাদের মাজহাব অনুসারে তাওয়াফের সময় সতর ঢাকা ওয়াজিব, কিন্তু তা তাওয়াফের শর্ত নয়। বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করলেও তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবস্ত্র হওয়ার পাপ অবশ্যই হবে। এভাবে ফরজ নামাজ উলঙ্গ হয়ে পড়লেও নামাজ হয়ে যাবে, কিন্তু উলঙ্গ হওয়ার কারণে গোনাহ হবে অবশ্যই। সতর ঢাকা

ওয়াজিব, কিন্তু তা শর্ত নয়। সুতরাং আলোচ্য বাক্যটির দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নির্জনে বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করলে এবং নামাজ পড়লে তাওয়াফ ও নামাজ আদায় হবে না। তবে সকল আলেমের ঐকমত্য এই যে, নামাজ পাঠকালে সতর ঢাকা ফরজ। তাই সতর না ঢাকলে নামাজ হবে না। নির্জনে অথবা লোকালয়ে যেখানেই হোক না কেনো।

কাযী ইসমাইল প্রমুখ মালেকী মাজাহাবের অনুসারী কোনো কোনো আলেমের অভিমত এর বিপরীত। কিন্তু ঐকমত্যের বিপরীতে এ রকম দু'একজনের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। জননী আয়েশার একটি মারফু বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাক সাবালিকা মেয়েদের ওড়না ছাড়া নামাজ কবুল করেন না। আবু দাউদ, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে খুজাইমা। তিরমিজি হাদিসটিকে বলেছেন উত্তম। আর হাকেম হাদিসটিকে বলেছেন বিশুদ্ধ।

আমি বলি, 'মাসজিদ' শব্দটি এখানে শব্দমূল। আর এখানে সিজ্দা অর্থ নামাজ। এখানে নামাজের এই অঙ্গটির উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নামাজকে। এ রকম আংশিক উল্লেখের মাধ্যমে সামগ্রিকতাকে বুঝানোর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।' (ওয়ারকাউ' মায়ার্রকিই'ন)। এখানে রুকু অর্থ নামাজ। অন্যত্র বলা হয়েছে— কোরআন থেকে তোমাদের জন্য যা সহজ, তা পড় (ফাক্বরাউ মা তাইয়াস্সারা মিনাল ক্বোরআন)। এখানেও 'ক্বোরআন' অর্থ নামাজ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটিতে কেবল নামাজে সতর ঢাকার কথাই বলা হয়েছে। তাওয়াফের সঙ্গে এই আয়াতটি সম্পৃক্ত নয়।

মূর্খতার যুগে আরববাসী বিবস্ত্র হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো। বলতো, যে কাপড় পড়ে আমরা আল্লাহ্র নাফরমানী করেছি, সে কাপড় পড়ে তাওয়াফ করা ঠিক হবে না। এ রকম অপধারণার বশবর্তী হয়ে তখন নারী পুরুষ সকলেই কাবা গৃহ তাওয়াফ করতো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করেছেন— হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি........(আয়াত ২৬)। তাওয়াফ সম্পর্কিত এই আয়াতের ভূমিকাস্বরূপ ইতোপূর্বে শয়তান কর্তৃক প্রথম মানব-মানবীর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের প্ররোচনাদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শয়তান কর্তৃক মানুষকে বিবস্ত্র করার প্রথম ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন হজরত আদম ও হজরত হাওয়া। ওই আয়াতগুলোই ছিলো বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ নিষিদ্ধ হওয়ার পটভূমিকা ও কারণ। ওই সকল আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালাই নগ্নতাকে আড়াল করার জন্য সৃষ্টি করেছেন পোশাক-পরিচ্ছদ। এটা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে প্রদত্ত একটি অত্যুত্তম অনুগ্রহ। এটাই তাকওয়া।

পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক প্রদত্ত নির্দেশগুলোর মর্মার্থ এ রকম— হে মানুষ! শয়তান তোমাদের আদি পিতামাতাকে নগ্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। তোমাদেরকেও সে নগ্ন করে বিপথগামী করতে চায়। আর এ জন্য দোহাই দেয় তাদের পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণের। কিন্তু উত্তমরূপে জেনে নাও যে, এই আচরণটি একটি চরম অলজ্জিত আচরণ। মূর্খ অংশীবাদীরা আরো বলে, আল্লাহ্ই নাকি তাদেরকে এ রকম লজ্জাহীনতার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ কখনো কাউকে লজ্জাহীন হতে আদেশ দেন না।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে গোপনাঙ্গ উন্মোচন একটি চরম নির্লজ্জতা। সকল অবস্থায় নগ্নতা নিষিদ্ধ। পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তি নগ্নতাকে জঘন্য অপরাধ বলে মনে করে। জ্ঞানী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে নগ্নতা অত্যন্ত ঘৃণিত। আর তাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদতের সময় বিবস্ত্র হওয়া তো আরো অধিক জঘন্য। এই অপকর্মটি হারাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং তাওয়াফের সময় বিবস্ত্র হওয়া, হজের সময় গোশত ও মসলাযুক্ত আহার্য গ্রহণকে হারাম মনে করা — এ সকল কিছুই হারাম। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন — 'হে রসুল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জন্য যে সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত বস্তু এবং বিশুদ্ধ জীবনোপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা নিষিদ্ধ করেছে?' আল্লাহ্তায়ালা আরো বলেছেন — 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রভুপ্রতিপালক সকল অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন।

গোপনাঙ্গ উন্মোচন করা হারাম। আল্লাহ্পাকই এই অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। কিন্তু তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সতর আবৃত করা কোনো শর্ত নয়। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, কেউ বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ করলে তার ফরজ তাওয়াফ হয়ে যাবে। কিন্তু নিষিদ্ধ নগ্নতার কারণে সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। কিন্তু অধিকাংশ ইমাম ফরজ তাওয়াফ বিবস্ত্র অবস্থায় হবে— এ কথা বলেননি। কেননা হজরত আবু বকরকে দলনেতা করে রসুল স. মক্কায় একটি হজযাত্রীর দল প্রেরণ করেছিলেন। আমিও ছিলাম ওই দলে। রসুল স. তখন আমাকে বলেছিলেন, কোরবানীর দিন জনসমাবেশকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করে দিও— এরপর থেকে কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। বিবস্ত্র অবস্থায় কেউ তাওয়াফও করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধপক্ষদের দলিল এই যে, বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফ করলে তাওয়াফের ফরজ আদায় হবে না। যেমন কোরবানীর দিন রোজা রাখলে ফরজ রোজা আদায় হয় না। আর সূর্যোদয়কালে, দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়লেও ফরজ নামাজ আদায় হয় না।

নামাজের সময় সতর ঢাকা ফরজ। নগ্ন হয়ে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না। সাধারণভাবে সতর ঢাকা ফরজ হওয়া এবং সতর উন্মোচন হারাম হওয়া অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর তাওয়াফের সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্কও নেই। অবশ্য এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, কাবাগৃহ তাওয়াফ করাও নামাজ। কিন্তু তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা বৈধ করে দেয়া হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, হাকেম, দারা কুতনী, ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান। ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। হাদিসটিকে যদি এই আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায়, তবে এর সম্পর্ক তাওয়াফের সঙ্গেও হয়ে যেতে পারে। যদি বলা যায় অন্য আয়াতের মতো এই আয়াতও সাধারণভাবে নগ্নতাকে নিষিদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং যদি মনে করা যায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফের পরিপ্রেক্ষিতে— তথাপিও এ কথাটি প্রমাণিত হবে না যে, এই আয়াত তাওয়াফ সম্পর্কিত বর্ণনার ধারাবাহিকতা। কোনো ঘটনা সম্পর্কে অথবা কোনো প্রশ্নের সূত্রে নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ওই নির্দেশ থেকেই জানা যায় বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এবং উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নির্দেশ জানা যায় না— এ কথাটিও ঠিক নয়। অন্য আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশটি জানা যায়। তাই ইবনে হুম্মামের উত্থাপিত আপত্তিটি ঠিক নয়।

মাসআলাঃ রহমাতুল উম্মত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে সতর ঢাকা নামাজের শর্ত। ইমাম মালেকের অনুসারীদের মধ্যে এ অভিমত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জমহুরের অনুসরণে বলে থাকেন সতর ঢাকতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোনো মহিলা যদি সতর না ঢেকে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কেননা সতর ঢাকা নামাজের শর্ত। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, সতর ঢাকা নিজের উপরে ওয়াজিব— কিন্তু নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত নয়। সুতরাং সতর ঢাকার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ নগ্ন হয়ে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সতর না ঢাকার জন্য সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। মালেকী মাযহাবের পরবর্তী দলের অভিমত হচ্ছে, সতর আবৃত না করলে কিছুতেই নামাজ শুদ্ধ হবে না। ইবনে হুম্মাম পরবর্তী যুগের এই ঐকমত্যকে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, পরবর্তী জামানার ঐকমত্য পূর্ববর্তী জামানার মতভেদের কারণে বিনষ্ট হয় না।

অনুষঙ্গঃ সতর ঢাকা যে ওয়াজিব— সে কথা আলোচ্য আয়াতের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সতরের যথাসংজ্ঞা এখানে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ শরীরের কোন কোন অঙ্গ— কী পরিমাণ ঢেকে রাখতে হবে— সে কথা এই আয়াতে নেই। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে হাদিস শরীফের গ্রন্থে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, পুরুষের সতর হচ্ছে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহ্‌মদ ইমাম মালেকের দু'টি অভিমতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি ইমাম আবু হানিফার অনুকূল। অন্যটি হচ্ছে— সুনির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ অঙ্গের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। এই অভিমতটির সমর্থনে উপস্থাপন করা হয়েছে হজরত আনাসের একটি হাদিস, যার মধ্যে রয়েছে— তারপর রসুল স. তাঁর উরুদেশ থেকে পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে নিলেন। তাঁর সেই শুভ্র উরুদেশ এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। বোখারী, মুসলিম। আহমদের বর্ণনায় রয়েছে— তারপর তহবন্দ সরে গেলো।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে শায়িত ছিলেন। তাঁর দুই উরু অথবা হাঁটুর নিচের অংশ উন্মুক্ত ছিলো। এমন সময় হজরত আবু বকর প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. যেভাবে শুয়ে ছিলেন, সেভাবে থেকেই প্রবেশের অনুমতি দিলেন। একটু পরে এলেন, হজরত ওমর। তিনিও বাইরে থেকে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রসুল স. শায়িত অবস্থা থেকেই অনুমতি দান করলেন। কিছুক্ষণ পর এলেন হজরত ওসমান। তিনিও প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রসুল স. শায়িত অবস্থা পরিত্যাগ করে সরে যাওয়া পরিধেয় ঠিক করে উঠে বসলেন। এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে 'দুই উরু অথবা হাঁটুর নিচের অংশ উন্মুক্ত ছিলো।' এখানে উরু না হাঁটু— সে কথা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই বর্ণনাটি দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হয়নি। ইমাম আহমদ কিন্তু নির্দিষ্ট করে এ কথাই বর্ণনা করেছেন যে— তখন উন্মুক্ত ছিলো তাঁর উরুদেশ। হাদিসটি তিনি বর্ণনা করেছেন জননী হাফসা থেকে। বর্ণনাটি অবশ্য দলিল হিসেবে গ্রাহ্য। তাহাবী এবং বায়হাকীও জননী হাফসা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় রয়েছে— জননী হাফসা বলেছেন, একদিন রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করছিলেন। তখন তাঁর উরুদেশ ছিলো উন্মুক্ত। এমন সময় এলেন হজরত আবু বকর .... শেষ পর্যন্ত।

হজরত আবু মুসার বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. একদিন বসেছিলেন একটি কূপের পাড়ে। তার দুই হাঁটু ছিলো উন্মুক্ত। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ওসমান। তাঁকে দেখে রসুল স. তাঁর উন্মুক্ত হাঁটু আবৃত করলেন। বোখারী।

জমহুরের অভিমতের পক্ষে রয়েছে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, উরুদেশ উন্মোচন করবে না। জীবিত বা মৃত ব্যক্তির উরুদেশ দেখবে না। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, হাকেম, বায্যার। কোনো কোনো আলেম হাদিসটি বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। হাদিসটির সূত্র-শৃংখল এ রকম, ইবনে জুরাইজ—হাবীব ইবনে সাবেত—আসেম ইবনে জামুরাহ। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই সূত্রশৃংখলভূত ইবনে জুরাইজ এবং হাবীবের মধ্যে কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ইবনে আবী হাতেম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে জুরাইজ এবং হাবীবের সংযোগসূত্র ছিলেন হাসান ইবনে জাকওআন। আর এ সূত্রটি শিথিল। তাছাড়া আসেম থেকে হাবীব হাদিসটি শুনেছেন— এ তথ্যটিও প্রামাণ্য নয়। এটাও বর্ণনাটির একটি দুর্বল দিক। ইবনে মুঈন বলেছেন. আসেম থেকে হাবীব স্বকর্ণে কোনো হাদিস শোনেননি। তাদের দু'জনের মধ্যে রয়েছে আরো একজন বর্ণনাকারী— যে নির্ভরযোগ্য নয়। বায্যার বলেছেন, ওই দু'জনের মধ্যে রয়েছে আমর ইবনে খালেদ।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটির উরুদেশ ছিলো অনাবৃত। তিনি স. বললেন, উরুদেশ আবৃত করো। কারণ উরুদেশও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। তিরমিজি, হাকেম, আহমদ। কোনো কোনো আলেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্রভূত আবু ইয়াহ্ইয়া কাত্তাতের বিরুদ্ধেও দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে।

রসুল স. একবার হজরত জারহাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হজরত জারহাদ ছিলেন মসজিদে। আর তখন তার উরুদেশ ছিলো অনাবৃত। তিনি স. বললেন, জারহাদ! উরু ঢেকে নাও। কারণ উরুও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। আহমদ। এই হাদিসের সূত্রপ্রবাহভূত এক বর্ণনাকারীর নাম আবু জারআ। বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি অপ্রসিদ্ধ।

হজরত মোহাম্মদ বিন জাহাশ বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. হজরত মুয়াম্মারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হজরত মুয়াম্মার তখন বসেছিলেন হাঁটু উঁচু করে। আর তখন তার উরুদেশের কিছু অংশ উন্মুক্ত ছিলো। তিনি স. বললেন, হে মুয়াম্মার! উরু আবৃত করো। কারণ উরুও অনুন্মোচনীয়। আহমদ, বোখারী, হাকেম। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন, আবু কাসীর ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। অবশ্য মুহাদ্দিসগণের একটি দল আবু কাসীরের বর্ণনাকে গ্রাহ্য করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমি কাউকে বিরূপ মন্তব্য করতে শুনিনি।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি— হাঁটু থেকে নাভিমূল পর্যন্ত আবরণযোগ্য অঙ্গ (সতর)। দারাকুতনী। কিন্তু এই হাদিসের সূত্রভূত ইবাদ বিন কাসীর এবং সাঈদ ইবনে রাশেদ পরিত্যক্ত।

আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে— নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবরণযোগ্য অঙ্গ। দারাকুতনী। এই হাদিসের সূত্রভূত সাওয়ার বিন দাউদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন উকাইলী। কিন্তু ইবনে মুঈন তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মেনেছেন।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোতে উরুদেশ আবৃত করতে বলা হয়েছে। এগুলো কিন্তু ওই হাদিসগুলোর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ নয় যেগুলোর মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে উরুদেশ উন্মোচনের বৈধতা। কিন্তু আলেমগণ সাবধানতা অবলম্বনার্থে ওই হাদিসগুলোকেই গ্রহণ করেছেন— যেগুলোতে বলা হয়েছে 'উরুদেশ আবরণযোগ্য।' বোখারী বলেছেন, হজরত আনাসের হাদিসটি অধিকতর দৃঢ়। আর হজরত জারহাদের হাদিসটি সতর্কতাসম্ভূত। ওই হাদিসগুলোও সুদৃঢ়, যেগুলো হজরত আনাসের হাদিসের অনুরূপ। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বস্ত্রবিবর্জিত ব্যক্তি বসে নামাজ পড়বে এবং নামাজ পাঠের সময় দুই হাত দিয়ে ঢেকে রাখবে তার গোপনাঙ্গ। আর রুকু ও সেজদা আদায় করবে ইশারায়। কারণ নামাজের বাইরে এবং ভিতরে সতর আবৃত রাখা ফরজ। তাই তিনি এই ফরজ আদায় করতে গিয়ে বসে নামাজ পড়তে বলেছেন এবং রুকু ও সেজদা করতে বলেছেন ইশারায়।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, দুই হাঁটুও আবরণযোগ্য। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, হাঁটুও আবৃতযোগ্য অঙ্গ। এই হাদিসের সূত্রভূত উক্বা বিন আলকামাকে দুর্বল বলেছেন আবু হাতেম রাজী এবং নসর বিন মানসুর। আবু হাতেম বলেছেন, সে অপরিচিত এবং পরিত্যক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী। ইবনে হাব্বান বলেছেন তার বর্ণনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী এবং আমর বিন শোয়াইবের পিতামহ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ হাঁটুকে আবৃতযোগ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেননি। আমরা বলি,হাঁটু অর্থ উরুদেশ ও পায়ের সংযোগস্থল। এই সংযোগ স্থলের উপরিভাগ খোলা রাখা হারাম। এবং এর নিম্নভাগ খোলা রাখা বৈধ। আমরা সাবধানতা অবলম্বনার্থে হারামকে কারণের উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

মাসআলা ঃ স্বাধীনা রমণীদের সমস্ত শরীর আবৃতযোগ্য। ইমাম আবু হানিফার মতে মুখমণ্ডল, পা, পায়ের গোড়ালী এবং কব্জি পর্যন্ত দুই হাত আবৃতযোগ্য অঙ্গ নয়। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ এ রকম অভিমত পোষণ করেন। অন্য বর্ণনানুসারে তাঁরা মুখমণ্ডল এবং পা ছাড়া অন্য সকল অঙ্গ আবৃতযোগ্য বলে মনে করেন।

রসুল স. বলেছেন, ওড়না ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কাদের নামাজ কবুল হয় না। তিনি স. আরো বলেছেন, মেয়েরা সম্পূর্ণতই গোপনাঙ্গ বিশেষ। হজরত ইবনে মাস্‌উদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। আবু দাউদের মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কব্জি ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দর্শনযোগ্য নয়।

জননী সালমা বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! তহবন্দ (নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ) ব্যতীত কোর্তা ও ওড়না পরে কি নামাজ পড়তে পারবো? তিনি স. বললেন, পারবে— যদি কোর্তা এ রকম লম্বা হয় যাতে করে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদেশ ঢাকা পড়ে যায়। দারা কুতনী। এই বর্ণনাসূত্রভূত আব্দুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্‌কে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইয়াহ্‌ইয়া। আবু হাতেম বলেছেন, তার বর্ণনা দলিল হওয়ার অযোগ্য। উল্লেখ্য যে, হাদিসটিকে মারফু মনে করা ঠিক নয়। কেননা ইমাম মালেক এবং আলেমদের একটি দল হাদিসটিকে জননী সালমার নিজস্ব কথা বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলাঃ আন্‌নাওয়াযিল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ললনাকুলের কণ্ঠস্বরেরও পর্দা করতে হবে। তাই রসুল স. বলেছেন, পুরুষেরা সশব্দে সুবহানাল্লাহ্‌ পড়বে এবং ললনারা হাতে হাতে তালি বাজাবে। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এই হাদিসের ভিত্তিতে যদি কেউ এ রকম বলে যে, নামাজের সময় মেয়েরা উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়লে তাদের নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে, তবে তার এ কথা ভুল হবে না।

মাসআলাঃ ইমামে আজম বলেছেন, ক্রীতদাসীর সতর পুরুষের সতরের মতো। কিন্তু তার পেট ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে। কারণ তা আবৃতযোগ্য। কিন্তু ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, ক্রীতদাসীর আবৃতযোগ্য অঙ্গ অবিকল পুরুষের আবৃতযোগ্য অঙ্গের মতো। অর্থাৎ তার পেট ও পিঠ আবৃতযোগ্য অঙ্গ নয়। অবশ্য কোনো কোনো শাফেয়ী মতালম্বী আলেম বলেছেন, ক্রীতদাসীর কনুইয়ের নিচের অংশ এবং হাঁটুর নিম্নদেশ ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো আবৃতযোগ্য।

হজরত নাফে থেকে বায়হাকী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাফিয়াহ্ বিন আবু উবায়িদ বলেছেন, এক মহিলা ওড়না পরে এবং চাদরাবৃত হয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? জনৈক ব্যক্তি জবাব দিলো আপনার বংশের অমুক ব্যক্তির বাঁদী। এ কথা শুনে হজরত ওমর তাঁর কন্যা এবং উম্মত জননী হজরত হাফসাকে বলে পাঠালেন, তুমি বাঁদীকে ওড়না এবং চাদর পরিয়েছো কেনো? স্বাধীনা রমণীর মতো এ রকম পোশাক দেখে আমি তো তাকে মনে করেছিলাম সে স্বাধীন পুরুষের স্ত্রী। ভাবছিলাম তার স্বামীকে ধরে এনে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করবো যে, সে কেনো তার স্ত্রীকে স্বাধীনা রমণীর পোশক পরিয়েছে? আরো ভেবেছিলাম, আমি তাকে বলে দেবো— আর কখনও যেনো সে এ রকম না করে। বায়হাকী বলেছেন— হজরত ওমরের এই উক্তি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেছেন, ফরজ নামাজের সময় দুই স্কন্ধ বস্ত্রাবৃত করা ফরজ। নফল নামাজের সময় তাঁর ফরজ এবং ফরজ নয় — দু'রকম উক্তিই বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, 'রসুল স. বলেছেন, একটি বস্ত্র পরিধান করে এবং কাঁধ উন্মুক্ত করে কেউ যেনো নামাজ না পড়ে। বোখারী, মুসলিম এবং আহমদও এ রকম বর্ণনা করেছেন। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, নগ্ন কাঁধে নামাজ পাঠ মাকরূহে তানযিহী (মাকরূহে তাহ্রিমী নয়)। কারমানী বলেছেন, এই আমলটি হারাম হওয়াই সমীচীন। কেননা এ রকম সাধারণ নিষেধাজ্ঞা হারামেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্ত এই যে, নামাজে কাঁধ উন্মুক্ত রাখা সিদ্ধ। তাই এই আমলটি মাকরূহে তানযিহী হওয়াই শোভনীয়।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, কারমানী এ সম্পর্কে রসুল স. এর হাদিস বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, ইমাম আহমদ কাঁধ খোলা রাখাকে হারাম বলেছেন। তিনিই আবার ঐকমত্যাগত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন কি করে?

ইবনে মুনজিরও উল্লেখ করেছেন যে, মোহাম্মদ বিন আলী ঘাড় খোলা রাখাকে নাজায়েয বলেছেন।

তাহাবী তাঁর 'শারহুল মাআনীল আছার' গ্রন্থে এই মাসআলাটি সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে হজরত ইবনে ওমরের উক্তিরূপে তাউস এবং নাখয়ী উল্লেখ করেছেন, কাঁধ খোলা রাখা জায়েয। কেউ কেউ আবার ওয়াহার এবং ইবনে জারীর বর্ণনাসূত্রে এ রকমই বলেছেন। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যরূপে তকিউদ্দিন সুবকী বলেছেন, কাঁধ খোলা না খোলার ব্যাপারে সকলেই স্বাধীন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর সকল গ্রন্থে এর বিরুদ্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাঃ উত্তম বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় নামাজ পাঠ করা মোস্তাহাব। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে 'প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' সুতরাং নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব সতর ঢাকা পর্যন্ত। এর অতিরিক্ত বস্ত্র মোস্তাহাব। হজরত ইবনে ওমর থেকে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজের সময় দুই প্রস্থ কাপড় পরিধান কোরো। কেননা নামাজের সময় পরিপূর্ণ ও সুন্দর পোশক পরার বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়লার অধিকারের সীমানাভূত। বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— এক লোক রসুল স. কে এক কাপড়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি স. বললেন, তোমাদের সকলেরই দুই প্রস্থ কাপড় থাকে, তবে এক প্রস্থ কাপড় পরে নামাজ পড়া যাবে। এরপরে একদিন এক লোক হজরত ওমরের নিকট একই রকম প্রশ্ন করলো। হজরত ওমর উত্তরে বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে সৌন্দর্যচেতনা দান করেছেন। তাই মানুষেরও উচিত সৌন্দর্যসচেতনাকে অগ্রাধিকার দেয়া। অতএব, নামাজের জন্য চাই উত্তম পরিচ্ছদ— তহবন্দ ও চাদর, তহবন্দ ও কামিজ, তহবন্দ ও কোর্তা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও কোর্তা, পায়জামা ও জুব্বা অথবা তাবান (ঢিলা ঢালা পোশাক) এবং কামিজ। সম্ভবতঃ হজরত ওমর তখন এ কথা বলেছিলেন যে, নামাজে পরিধান করা উচিত তাবান এবং চাদর।

কালাবী সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মূর্খতার যুগে হজের সময় বনী আমের গোত্রের লোকেরা স্বল্প পানাহারে অভ্যস্ত ছিলো। চর্বি বা মসলা সংযুক্ত খাদ্য তখন তারা খেতো না। তারা এ রকম করতো হজের সম্মানার্থে। তাদেরকে এ রকম করতে দেখে মুসলমানেরা বলতে শুরু করলো, আমরাই তো হজের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করার অধিকারী। তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো আয়াতের অবশিষ্ট অংশটি।

বলা হলো— 'আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অমিতাচার করবে না। তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।' এ কথার অর্থ— 'তোমরা গোশত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করো এবং পান করো। আল্লাহ্‌পাক যা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তাকে অবৈধ মনে করে সীমালংঘন কোরো না।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, 'তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার জন্য এবং বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি........ আয়াত (২৬) অবতীর্ণ হয়েছে কুরায়েশ, বনী আমের এবং কেনানা বিন বকরের বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে। তারা হজের সময় গোশত খেতো না। গৃহে প্রবেশের সময় সম্মুখদ্বার ব্যবহার না করে ব্যবহার করতো পশ্চাৎদ্বার।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজের সময় যথেচ্ছ আহার কোরো। কিন্তু বিরত থেকো দু'টো বিষয় থেকে— সীমালংঘন ও নগ্নতা। ইবনে আবী শায়বা এবং আব্দ বিন হুমাইদ্ও এ রকম বলেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ হাসান বসরীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওমর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্র নিকটে গেলেন। দেখলেন, তাঁর সামনে রয়েছে একটি গোশতপূর্ণ পাত্র। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গোশতগুলো কেমন? হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি গোশত খুবই পছন্দ করি। হজরত ওমর বললেন, যতটুকু খেতে ইচ্ছে করে, খাও। এতে কোনো দোষ নেই।

হজরত ইবনে ওমরের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, খাও। পান কোরো। দান কোরো। পরিধান কোরো। অপচয় কোরো না। সীমালংঘন কোরো না। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, ইবনে মাজা এবং হাকেম।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, উদর পরিপূর্ণ পানাহার থেকে বিরত থেকো। কারণ এ রকম অতি ভোজন শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে করে রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং নামাজে আসে আলস্য। পরিমিত পানাহার কোরো— শরীর সুস্থ থাকবে। আর দূরে থেকো অমিতাচার থেকে। আল্লাহ্তায়ালা স্থূল শরীরবিশিষ্টদেরকে পছন্দ করেন না। ধর্মবোধের উপর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য না দেয়া পর্যন্ত মানুষ কখনও ধ্বংস হবে না।

বর্ণিত হয়েছে, খলিফা হারুনুর রশীদের সময়ে বাগদাদে বসবাস করতো একজন চতুর খৃষ্টান চিকিৎসক। একবার সে আলী বিন হাসান বিন ওয়াকেদকে বললো, তোমাদের আসমানী কিতাবে চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কিছুই নেই। অথচ বিদ্যা হচ্ছে দু'টি। একটি চিকিৎসা বিদ্যা। আর অন্যটি ধর্মীয় বিদ্যা। আলী বললেন, আল্লাহ্তায়ালা সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিদ্যাকে অর্ধ আয়াতের মধ্যে বিবৃত করেছেন। সেই অর্ধ আয়াতটি হচ্ছে — আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অমিতাচার করবে না। খৃষ্টান চিকিৎসকটি বললো, এ ব্যাপারে তোমাদের নবী কি কিছু বলেন নি? আলী বললেন, আমাদের রসুল চিকিৎসা শাস্ত্রকে প্রকাশ করেছেন অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে। সেই শব্দ কয়টি হচ্ছে — পাকস্থলি রোগের গৃহ। অতিভোজন থেকে বিরত থাকাই চিকিৎসার মূল কথা। তোমার শরীরকে ততটুকু দাও, যতটুকু সে আত্মস্থ করতে সক্ষম। চিকিৎসকটি বললো, তোমাদের আল্লাহ্ এবং তোমাদের রসুলতো চিকিৎসা বিদ্যাকে জালিনুসের উপর নির্ভরশীল করেননি (সকল ব্যবস্থাপত্রই দিয়েছেন)।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

❐ বল, 'আল্লাহ্ স্বীয় দাসদিগের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদিগের জন্য যাহারা বিশ্বাস করে।' এইরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।

প্রথমেই বলা হয়েছে— বলো, আল্লাহ্ তাঁর দাসদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এখানে 'শোভার বস্তু' কথাটির অর্থ— উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, যার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— এ সকল পোশাক-পরিচ্ছদ রচিত হয় মানুষেরই উপকার ও আরাম আয়েশের জন্য। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা এগুলোকে নিষিদ্ধ করবেন কেনো? আর এখানে 'বিশুদ্ধ জীবিকা' অর্থ হালাল আহার্য। হালাল পশুর গোশত এবং চর্বিও মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ্তায়ালা বৈধ করে দিয়েছেন। সেই বৈধতাকে পরিত্যাগ করা হবে কেনো? এভাবে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার রসুল! উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিশুদ্ধ জীবিকাকে আল্লাহ্তায়ালা তো নিষিদ্ধ করেননি। তবে কেনো মানুষ তাওয়াফের সময় নগ্ন হবে? কেনো হজের সময় পরিত্যাগ করবে গোশত ও চর্বি? কেনো স্বেচ্ছায় সায়েবা ও অন্যান্য হালাল পশুর শ্রম কাজে লাগানোকে হারাম মনে করবে? —আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে আরেকটি কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্তায়ালা নিষিদ্ধ না করা পর্যন্ত সকল কিছুই হালাল। হারাম কেবল সেগুলোই যেগুলোকে আল্লাহ্তায়ালা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— দৃষ্টিনন্দন পরিচ্ছদ এবং বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাদ্যবস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল বিশ্বাসীদের জন্য, যাতে করে তারা অর্জন করতে পারে ইবাদত করার নিমিত্তে শারীরিক শক্তি এবং রক্ষা করতে পারে শালিনতা। এসকল নেয়ামত ব্যবহার করে তারা যেনো প্রকাশ করতে পারে আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা। অবিশ্বাসীদের জন্য শোভন বস্তু হিসাবে এ বিশুদ্ধ জীবিকা সমূহকে সৃষ্টি করা হয়নি। পৃথিবীতে কেবল এ সকল নেয়ামত

উপভোগের জন্য তাদেরকে দেয়া হয়েছে সাময়িক অধিকার। এ সকল নেয়ামতের চিরন্তন অধিকারী তারা নয়। এখানে 'খলিসাতান' (বিশেষ করে) কথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্পাকের অসন্তোষ ও ক্রোধ থেকে চিরমুক্ত হবে। তাই পৃথিবীর মতো সেখানে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে না। নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে তারা তখন উপভোগ করে চলবে আল্লাহ্তায়ালার এই নেয়ামত সমূহ। খলিসাতান শব্দটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— বিশেষ করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের যাবতীয় অনুগ্রহসম্ভার বিশেষভাবে উপভোগের অধিকারী হবে কেবল বিশ্বাসীরা। আর অবিশ্বাসীরা সেখানে হবে বিশেষভাবে চিরবঞ্চিত (পৃথিবীর মতো আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহরাজির উপরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সাধারণ অধিকার সেখানে থাকবে না)।

শেষে বলা হয়েছে — 'এরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিবৃত করি।' এ কথার অর্থ— আমি হালাল ও হারামের পার্থক্যরেখা স্পষ্ট করে দিয়েছি। এমতো পথ নির্দেশনা দিয়েছি যে— হালাল গ্রহণীয় এবং হারাম বর্জনীয়। যারা আল্লাহ্তায়ালার এককত্বে বিশ্বাসী এবং যারা তাঁকে মনে করে অংশীবিহীন— তারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যই আমি দিয়ে চলেছি আমার নিদর্শনসমূহের বিশদ বিবরণ।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৩

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

❒ বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহের শরীক করা— যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই।'

কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়াবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।' এখানে 'ফাওয়াহিশা মা জাহারা মিনহা ওয়ামা বাত্বানা' অর্থ— প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। এখানে প্রকাশ্য অশ্লীলতা অর্থ দিবসে পুরুষের বিবস্ত্র অবস্থার তাওয়াফ। আর গোপন অশ্লীলতা অর্থ— নারীর বিবস্ত্র অবস্থার তাওয়াফ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার অর্থ— প্রকাশ্য ও গোপন ব্যভিচার। হজরত ইবনে মাসউদের মারফু বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল আর কেউ নয়। তাই তিনি

প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার বেহায়াপনাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মপ্রশংসা পছন্দকারীও কেউ নেই। তাই তিনি নিজেই তাঁর প্রশংসা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'আর পাপ।' এখানে নিশ্চিত পাপ বুঝাতে 'আল ইছমা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ গোনাহ্ করা এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া। এটি একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ। এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তিও অন্তর্ভুক্ত। সুনির্দিষ্ট নির্দেশের পরে নির্দেশের গুরুত্ব প্রকাশার্থে এ রকম সাধারণ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। জুহাক বলেছেন, 'ইছমুন' অর্থ ওই সকল পাপ, যেগুলোর জন্য কোনো সুনির্ধারিত শাস্তি নেই। হাসান বলেছেন, শরাব। জনৈক কবি বলেছে, আমি এত বেশী ইছমুন পান করেছি যে, আমার জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অসংগত বিরোধিতা।' এখানে 'আল বাগ্ইয়া' অর্থ বিদ্রোহ বা বিরোধিতা। আর 'গইরিল হাক্ব' অর্থ অসংগত। আলোচ্য বাক্যাংশটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি।' এ কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদেরকে মৃদু উপহাস করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশনা ছাড়াই তারা হালাল ও হারাম নির্ধারণ করে নেয়। এ রকম স্বকল্পিত নির্ধারণ নিষিদ্ধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই।' অংশীবাদীরা বাহিরা, সায়েবা ইত্যাদি পশুগুলোকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিলো। অথচ তারা বলতো, আল্লাহ্‌ই এগুলোকে হারাম করেছেন। বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফকেও তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে প্রচার করতো। না জেনে শুনে এ রকম অযথার্থ নির্ধারণকে আল্লাহ্‌পাক এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন— আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা হারাম, যে সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞান নেই। মুকাতিল বলেছেন, দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম সম্পর্কে কোনো কথা বলা আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে সাধারণভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৪

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

❐ প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

'প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে'— কথাটির অর্থ, অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রয়েছে বিভিন্ন সময়। আল্লাহ্তায়ালাই উত্তমরূপে অবগত যে, কোন্ সম্প্রদায়কে কখন তিনি শাস্তিদান করবেন। কথাটির মাধ্যমে মক্কার অংশীবাদীদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— যখন আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে তখন কাউকে কোনো প্রকার সুযোগ দেয়া হবে না। কেউ চাইলে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আযাব আনতে পারবে না। তেমনি আযাবকে কেউ এক মুহূর্ত বিলম্বও করাতে পারবে না। অবিশ্বাসীরা বলতো, হে আল্লাহ্! তোমার নবীর কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করো কঠিন শাস্তি। তাদের এ রকম কথার পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আযাব অবতীর্ণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়াধীন। যখন তিনি চাইবেন, কেবল তখনই আযাব অবতীর্ণ হবে। মানুষ সেই আযাবের মুহূর্তকালও অগ্র-পশ্চাৎ ঘটাতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় রয়েছে, আততায়ী কর্তৃক ছুরিকাঘাতে আহত হজরত ওমরকে লক্ষ্য করে হজরত কা'ব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার হায়াত বৃদ্ধির প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা ফিরিয়ে দেবেন না? হজরত ওমর বললেন, তুমি কি জানো না, আল্লাহ্পাক বলেছেন, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। হজরত কা'ব বললেন, আয়ুর বৃদ্ধি ও স্বল্পতার পরিমাপ লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহ্ফুজে। আল্লাহ্ চাইলে কারো হায়াত বাড়িয়ে দেন এবং চাইলে কারো হায়াত দেন কমিয়ে। এভাবে সুনির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে আর অগ্রপশ্চাৎ করা হয় না।

আবু মালিকার বর্ণনায় রয়েছে, আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে হজরত ওমরের আহত হওয়ার কথা শুনে হজরত কা'ব বললেন, হায় আক্ষেপ! আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্র নামে কসম করলে আল্লাহ্পাক নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর সময়কে পিছিয়ে দিতেন (আল্লাহ্পাক তাঁর কসমকে অফলপ্রসূ হতে দিতেন না)। হজরত ইবনে আব্বাস হজরত ওমরের নিকটে গিয়ে বললেন, কা'ব এ রকম করে বলছেন। হজরত ওমর বললেন, আমি তো আল্লাহ্র নিকট মৃত্যু বিলম্বিত হওয়ার প্রার্থনা জানাবো না।

يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ اِمَّا يَاۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ يَقُصُّوۡنَ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِىۡ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ○ وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَاسۡتَكۡبَرُوۡا عَنۡهَاۤ اُولٰۤٮِٕكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ○

❒ হে বনি আদম! যদি তোমাদিগের মধ্য হইতে কোন রসূল তোমাদিগের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজকে সংশোধন করিবে তাহাদিগের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

❒ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান ও বিবেক। দিয়েছেন কর্মস্পৃহা ও কর্মসম্পাদনের সামর্থ্য। তাই জ্ঞান ও চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে সংশোধিত করা মানুষের একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। আল্লাহ্তায়ালা সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। কারো প্রতি তাঁর অবশ্যকরণীয় কর্তব্য বলে কিছু নেই। মানুষ ভিতরে বাইরে যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই দেখতে পাবে তাঁর অস্তিত্বের ও এককত্বের অসংখ্য নিদর্শন। এতদসত্ত্বেও দয়া করে তিনি মানুষের নিকট যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন নবী ও রসুল। আরো অবতীর্ণ করেছেন আসমানী কিতাব। এসকল কিছুই তাঁর অপার অনুগ্রহ। মানুষের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে, এই বিশেষ অনুকম্পার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। যারা তাঁর রসুলের নির্দেশানুসারে সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং আত্মসংশোধনে ব্রতী হবে, তারা কবরে, কিয়ামতে, শেষ বিচারের সময়ে— কোথাও ভীত চিন্তিত হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্যে কোনো রসুল তোমাদের নিকটে এসে আমার নিদর্শন বিবৃত করে, তখন যারা সাবধান হবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।

পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' এ কথার অর্থ— যারা আমার রসুলের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান

করেছে, প্রদর্শন করেছে অহংকার, তাদের নরকবাস হবে চিরস্থায়ী। এখানে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়া অর্থ— সত্যের আহ্বানে সাড়াদানকারী বিশ্বাসীদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করা। অবজ্ঞাভরে তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক এই মর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, রসুলের অনুসারী সাবধানী এবং সংশোধনকারীরা লাভ করবে সওয়াব এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অহংকারীরা লাভ করবে আযাব। আর বিশ্বাসীদের সওয়াব যেমন চিরস্থায়ী হবে, তেমনি অবিশ্বাসীদের আযাবও হবে চিরস্থায়ী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ
نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا كَافِرِينَ ○ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ
الْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ
لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ○ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ○

❐ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? নির্ধারিত অংশ ইহাদিগের নিকট পৌছিবে, যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাহাদিগের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায়?' তাহারা বলিবে 'তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে' এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।

❐ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমাদিগের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদিগের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর'; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমন কি যখন সকলে

উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদিগের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিদিগের সম্পর্কে বলিবে 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।' আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ।

❒ তাহাদিগের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তিদিগকে বলিবে, 'আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।'

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় জালেম আর কে?' এখানে আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার অর্থ— আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, আল্লাহ্তায়ালার স্ত্রী ও পরিবার পরিজন রয়েছে এ রকম বলা, প্রতিমার নামে পশু উৎসর্গ করা, সেগুলোর গোশত ভক্ষণকে হারাম মনে করা, বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা, আবার 'আল্লাহ্ই এ রকম করতে বলেছেন' এ রকম বলা ইত্যাদি। এই মিথ্যা রচনার মধ্যে এই উম্মতের রাফেজীরাও অন্তর্ভুক্ত। তারাও আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারী। তারা বলে, কোরআন মজীদে আরো অনেক আয়াত ছিলো— সাহাবীগণ সেগুলোকে গ্রন্থিত করেননি। এ রকম বক্তব্য যে আল্লাহ্র সম্পর্কে মিথ্যা রচনার নিদর্শন— সেকথা বলাই বাহুল্য। এখানে 'আওকাজ্জাবা বি আয়াতিহি' (কিংবা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে) কথাটির মধ্যে 'আও' (কিংবা) অব্যয়টি মিথ্যা রচনা ও নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকে একত্রিত করেনি। অর্থাৎ এ অব্যয়টির মাধ্যমে এখানে এ কথা বুঝানো হয়নি যে— মিথ্যা রচনাকারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জালেম বা অত্যাচারী। বরং বুঝানো হয়েছে এ কথা— মিথ্যা রচনাকারীরা যেমন জালেম, তেমনি জালেম সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও। আর যারা মিথ্যা রচনা ও সত্যপ্রত্যাখ্যান দু'টো অপরাধেই সিদ্ধহস্ত, তারা অতি অবশ্যই অধিকতর জালেম।

এরপর বলা হয়েছে— 'নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবে যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবে ও জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়?' এ কথার অর্থ— পৃথিবীর জীবনাবসানের সময় ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের নিকটে উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের পূজিত প্রতিমাগুলো এখন কোথায়— আল্লাহ্কে ছেড়ে যেগুলোকে তোমরা উপাস্য নির্ধারণ করেছিলে?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তারা অন্তর্হিত হয়েছে এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ছিলো।' এ কথার অর্থ— ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে অবিশ্বাসীরা তখন বলবে, আমাদের উপাস্যগুলো এখন অন্তর্হিত। উদ্ধারের কোনো পথ না পেয়ে অবিশ্বাসীরা তখন এ কথাও স্বীকার করবে যে, হায়! আমরা তো ছিলাম প্রকৃতই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

পরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানব দল গত হয়েছে তাদের সঙ্গে তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ করো; যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা যখন বলবেন, হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা এখন তোমাদের পূর্বে গত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জ্বিন ও মানবদলের সঙ্গে দোজখে প্রবেশ করো, তখন দোজখীদের একদল অন্যদলকে অভিসম্পাত করতে থাকবে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নেতা ও জনতা দোজখে প্রবেশের সময় একে অপরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। তাদের পরস্পরবিরোধী দলগুলোও তখন একে অপরকে অভিসম্পাত দিবে। এভাবে পারস্পরিক অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকবে ইহুদী, খৃষ্টান, অংশীবাদী ও অন্য সকল পথভ্রষ্ট দল।

এরপর বলা হয়েছে— এমন কি যখন সকলে তাতে একত্র হবে তখন তাদের পরবর্তিরা পূর্ববর্তিদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ অগ্নিশাস্তি দাও।' এ কথার অর্থ— দোজখে প্রবেশের সময় পথভ্রষ্ট নেতাদের সম্পর্কে তাদের অনুসরণকারীরা বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! এরাই আমাদেরকে ভুল পথে চালিত করেছিলো। সুতরাং, আমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তার দ্বিগুণ শাস্তি এদেরকে দাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নও।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ বলবেন, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তিই দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারছো না। অর্থাৎ শাস্তির রয়েছে দু'টি রূপ, একটি প্রকাশ্য অন্যটি অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য শাস্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু অপ্রকাশ্য শাস্তি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। ওই অপ্রকাশ্য শাস্তির দিকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে তোমরা ওই অপ্রকাশ্য শাস্তি সম্পর্কে জানো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, অবিশ্বাসীদের প্রতিটি দলের নেতা ও জনতার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। কিন্তু হে অজ্ঞ অবিশ্বাসীর দল! তোমরা ওই দ্বিগুণ শাস্তির তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত নও। তত্ত্বটি এই, নেতাদের একগুণ শাস্তি হবে তাদের নিজস্ব অবিশ্বাসের জন্য। আর অন্যকে বিপথগামী করার জন্য হবে আরেকগুণ শাস্তি। অবিশ্বাসী জনতার শাস্তিও হবে দ্বিগুণ। একগুণ হচ্ছে পথভ্রষ্ট নেতার অনুসরণের জন্য। আর একগুণ হচ্ছে তাদের নিজস্ব পথভ্রষ্টতার দরুণ।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তিদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী নেতাদের জন্য অনুসারীদের দ্বিগুণ শাস্তির আবেদনের কথা শুনে নেতারা বলবে, তোমরা ও আমরা এখন সমান। তোমরা যেমন শাস্তিপ্রাপ্ত, তেমনি আমরাও। আমরা এখন কেউ কারো চেয়ে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ নই। আমরা তো আমাদের কৃতকর্মের ফল

ভোগ করছি। সুতরাং তোমরাও তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো। এখানকার 'সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো' এই শেষ কথাটি অবিশ্বাসী নেতাদেরও হতে পারে, আবার আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণাও হতে পারে। অর্থাৎ অবিশ্বাসী নেতা ও জনতার বিতর্কের শেষ দিকে যখন তাদের নেতারা বলবে 'আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই'— তখন আল্লাহ্পাক তাদের সকলের জন্য এই ঘোষণাটি প্রদান করবেন যে— সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪০, ৪১, ৪২

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ ○ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

❒ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহাদিগের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না— যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

❒ তাহাদিগের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদিগের উপরের আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

❒ আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং যারা অহংকারবশতঃ সত্যের প্রতি অবজ্ঞা পোষণকারী, তাদের জন্য কোনো দিনও আকাশের প্রবেশপথ উন্মোচন করা হবে না। জান্নাতের প্রবেশাধিকারও তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আত্মা উর্ধ্বারোহণে সক্ষম হয় না, কারণ তাদের আত্মা অপবিত্র। অপবিত্র আত্মা নিক্ষেপ করা হয় নিম্নতম স্তর সিজ্জিনে।

হজরত বারা বিন আজীব থেকে ইমাম মালেক, নাসাঈ এবং বায়হাকী কর্তৃক এসম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদিসে রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূহ্ কবজ করে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের ফেরেশতারা। তারা ওই রূহ্কে দুর্গন্ধযুক্ত চটের থলিতে পেঁচিয়ে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আকাশের ফেরেশতারা তখন জিজ্ঞেস করে, এই দুর্গন্ধময় আত্মা কার? কৃষ্ণবর্ণ ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির পৃথিবীর নিকৃষ্টতম নাম নিয়ে বলে, অমুকের পুত্র অমুকের। এভাবে সপ্তম আকাশে উপনীত হলে, সেখানকার প্রহরী ফেরেশতারা আর দরজা খুলে দেয় না। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন— তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর বললেন, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে তখন ওই অপবিত্র আত্মাকে সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তিনি স. তেলাওয়াত করলেন— 'ওয়া মাঁই ইউশ'রিক বিল্লাহি ফা কাআন্নামা খার্‌রা মিনাস্‌সামায়ী ফা তাখাত্তাফাহুত্ ত্বইরু আও তাহ্‌বি বিহির রিহু ফি মাকানিন্ সাহিক্ব'। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজাও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এরূপ আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেবো।' এ কথার অর্থ— সূচের ছিদ্রপথে যেমন উটের প্রবেশ অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব অবিশ্বাসীদের বেহেশতে প্রবেশ। আর এভাবেই আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এটাই তার বিধান।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; এভাবে আমি জালেমদেরকে প্রতিফল দেবো।'এখানে 'মিহাদুন' শব্দটির অর্থ শয্যা। আর 'গাওয়াশীন্' শব্দটি গাশিয়াহ্ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ— আচ্ছাদন। এখানে শয্যা ও আচ্ছাদন জাহান্নামের হবে, কথাটির অর্থ হচ্ছে— দোজখে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে চতুর্দিক থেকে অগ্নি পরিবেষ্টিত। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— 'তাদের উপরে থাকবে আগুনের ছায়া এবং নিচেও থাকবে আগুনের ছায়া।'

আগের আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেবো। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে— এভাবে আমি জালেমদেরকে প্রতিফল দেবো। আগের আয়াতে বলা হয়েছে, অপরাধীরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এই আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে, জালেমদের শয্যা ও আচ্ছাদন হবে আগুনের। এ রকম বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, সাধারণ অপরাধ অপেক্ষা জুলুম অধিকতর শাস্তির যোগ্য।

এর পরের আয়াতে (৪২) দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদের প্রতিফলের বিবরণ। বলা হয়েছে— 'আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও ভালো কাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, সেখানেই তারা স্থায়ী হবে।' এখানে আ'মিলুস্ সলিহাত' কথাটির অর্থ— ভালো কাজ করা। এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো যে, বিশ্বাসীরা কেবলই সৎকর্মশীল। যারা সারা জীবন ধরে কেবল পুণ্যকর্ম করেছে, কোনো পাপ করে নি অথবা কোনো প্রকার পুণ্যকর্মই পরিত্যাগ করে নি — তারাই কেবল হবে জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা। তাই সম্ভাব্য সন্দেহটি নিরসনার্থে আয়াতের প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে— আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়— সাধ্যানুসারে যে যেমন পুণ্যকর্ম করবে সেরকমই প্রতিফল পাবে তারা। কেউ কম। কেউ বেশী। আর এভাবে বিশ্বাসীরা লাভ করবে জান্নাতের বিভিন্ন স্তর। কারো মর্যাদা হবে সাধারণভাবে উন্নত এবং কারো মর্যাদা হবে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত। কিন্তু তারা সকলেই হবে জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিবাসী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৩

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

❒ তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদিগের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে নদী এবং তাহারা বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহেরই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদিগের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিলেন;' এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে যে, 'তোমারা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো। এখানে 'গিল্লিন' শব্দটি অর্থ ঈর্ষা বা শত্রুতা। আর 'নাযা'না' শব্দরূপটি এখানে ভবিষ্যতকালবোধক। তাই আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হয়েছে, তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করবো (করেছি বা করি— এ রকম নয়)। অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশ্বাসীরা পরস্পরের প্রতি যে সকল ঈর্ষা পোষণ করে, আখেরাতে সে সকল ঈর্ষাকে আল্লাহ্তায়ালা চিরতরে দূর করে দিবেন। সেখানে থাকবে কেবল ভালোবাসা ও শান্তি। শান্তি ও ভালোবাসা। সেখানে উন্নততর মর্যাদার অধিকারীদের প্রতি কেউই হিংসা করবে না। ঈর্ষান্বিত হবে না। ঈর্ষার প্রবণতা সেখানে হয়ে যাবে চিরতরে অবলুপ্ত।

সাঈদ বিন মানসুর, আবু নাঈম, ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আমার তো ওসমান, তালহা এবং যোবায়েরের মতো হতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে ইচ্ছে করে।

আমি বলি, হজরত ওসমানের মহাতিরোধানের পর উপরে বর্ণিত সাহাবীত্রয় এবং তাঁদের দলের সঙ্গে হজরত আলীর বিবাদ উপস্থিত হয়েছিলো। তাই তিনি ওরকম করে বলেছিলেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী এবং ইসমাঈলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বাসী বান্দাগণকে নরক থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। তারপর তাদের আটকে রাখা হবে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী একটি সেতুর উপর। সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে তাদের পারস্পরিক হক। এইভাবে যখন তারা পরস্পরের নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে দেয়া হবে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার। যিনি আমার জীবনাধিকারী, তাঁর পবিত্র সত্তার শপথ! জান্নাতীদের নিকট জান্নাতের পথ হবে অধিকতর পরিচিত, স্বগৃহের পথের চেয়েও। হজরত কাতাদাও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, জুমার নামাজ পাঠের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকারীগণ যেমন তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ বিস্মৃত হয় না, তেমনি জান্নাতিরাও কখনো জান্নাতের পথ বিস্মৃত হবে না।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হাসান বসরী বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে রসুল স. বলেছেন, পুলসিরাত অতিক্রম করার পর জান্নাতবাসীদেরকে একত্র করা হবে। সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে তাদের পারস্পরিক অধিকার এবং সেখানেই প্রত্যেকের অন্তর থেকে চিরতরে বিদূরিত করে দেয়া হবে ঈর্ষাপরায়ণতা।

কুরতুবী উল্লেখ করেছেন, এ রকম আচরণ করা হবে ওই সকল জান্নাতীদের সঙ্গে যারা সরাসরি জান্নাতের পথ ধরবে। কিন্তু যারা কিছুকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতবাসের অনুমতি পাবে তাদেরকে পুলসিরাত কিংবা অন্য কোনো সেতু অতিক্রম করতে হবে না। সেতু অতিক্রম ব্যতিরেকেই তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী সূত্রে হাফেজ ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, বিশ্বাসীদেরকে দোজখ থেকে পৃথক করে নেয়া হবে— কথাটির অর্থ, তাদেরকে দোজখ থেকে রক্ষা করা হবে এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে তারা চলে যাবে জান্নাতে। হাদিসে উল্লেখিত 'ক্বান্‌তারাহ্' শব্দটির অর্থ পুল বা সেতু। কেউ কেউ বলেছেন শব্দটির অর্থ— পুলসিরাতের ওই প্রান্ত, যা জান্নাত সংলগ্ন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি অন্য একটি পুল— পুলসিরাত নয়। প্রথমোক্ত অভিমতটিকে পছন্দ করেছে আল্লামা সুয়ূতি। আর কুরতুবী পছন্দ করেছেন শেষোক্ত অভিমতটিকে।

আমি বলি, সেখানে দিনার ও দিরহাম হবে অচল। পাপ-পুণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সেখানে মিটিয়ে দেয়া হবে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক অধিকার। সেখানে অত্যাচারের বিনিময় হিসেবে অত্যাচারীদের পুণ্য প্রদান করা হবে অত্যাচারিতকে। যদি অত্যাচারীর পুণ্য না থাকে তবে তাকে বহন করতে হবে অত্যাচারিতের পাপের বোঝা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ঘোষণা এ রকমই। মুসলিম ও তিরমিজির বর্ণনায় হাদিসটির ভাষ্য এ রকম— অত্যাচারিতের হক পরিশোধের পূর্বেই যদি অত্যাচারির নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অত্যাচারিতের গোনাহ্। তারপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। উল্লেখ্য যে, পুলসিরাত অতিক্রমের পর কাউকে আর দোজখে নিক্ষেপ করা হবে না। অতএব যে পুলের উপর আটকে রেখে বান্দাদের পারস্পরিক হক মিটিয়ে দেয়া হবে, সেই পুল— পুলসিরাত নয়। পুলটি অন্য একটি পুল। আর ওই পুলকে হাদিসে বলা হয়েছে 'ক্বান্‌তারাত'।

সতর্কতাঃ শুধুমাত্র পারস্পরিক হক পরিশোধের মধ্যেই ঈর্ষা দূর করার বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়। অন্যভাবেও সেখানে ঈর্ষা দূর করে দেয়া হতে পারে। এ সম্পর্কে সুদ্দী বলেছেন, বেহেশতবাসীরা যখন বেহেশতে গমন করবেন, তখন দেখবেন— বেহেশতের দরজায় রয়েছে একটি বৃক্ষ। ওই বৃক্ষের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দু'টি ঝর্ণা। তাঁরা একটি ঝর্ণার পানি পান করবেন। ফলে তাঁদের অন্তর থেকে চিরতরে দূর হয়ে যাবে ঈর্ষা-বিদ্বেষ। ওই ঝর্ণার পানি হচ্ছে 'শারাবান তহুরা' (পবিত্র পানীয়)। এরপর তাঁরা অপর ঝর্ণাটিতে গোসল করবেন এবং লাভ করবেন 'নাজারাতান নায়ীম' (সুন্দরতর ঔজ্জ্বল্য)। তারপর থেকে হবেন চিরবিদ্বেষবিমুক্ত। তাঁদের চেহারার প্রফুল্লতা আর কখনও অন্তর্হিত হবে না।

এরপর বলা হয়েছে — 'তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য বাণী এনেছিলেন।' এখানে 'যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন' কথাটির অর্থ— যিনি আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— যিনি আমাদেরকে এমন পুণ্যের পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পুণ্যপথে চলার বিনিময় এই জান্নাত।

'লি নাহ্‌তাদী (যেনো আমরা পথ পাই) কথাটির মধ্যে ব্যবহৃত 'লাম' হচ্ছে লামে জুহুদ (অস্বীকৃতিমূলক লাম)। পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ের নেতিবাচকতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয় এই 'লাম'। আর এখানে 'ইন' (যদি) হচ্ছে নাসেবাহ্ (যবরযুক্ত)। এখানে মাসদার বা ধাতুমূল রয়েছে উহ্য। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'মা কানাল্লহু লিইউআ'জিবাহুম' (আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি না দেয়ার মানসে ......)।

এখানে লাওলা (যদি না) শব্দটির বিনিময় রয়েছে অনুক্ত — পূর্ববর্তী বাক্যে রয়েছে এর প্রমাণ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না।

'লাক্বদ জায়াত্ রুসুলু রব্বিনা বিলহাক্ব' (আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণতো সত্যবাণীসহ এসেছিলেন) কথাটির অর্থ — নবী ও রসুলগণ সঠিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছিলাম সত্যপথের সন্ধান। বেহেশতবাসীরা নিজের চোখে পয়গম্বরগণের সুসংবাদের বাস্তবায়ন দেখে তখন এ রকম বলবেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে কোথায় এবং কখন এ রকম বলা হবে, সে সম্পর্কে আলেমগণের রয়েছে দু'টি অভিমত। একটি হচ্ছে— যখন তাঁরা দূর থেকে জান্নাত দেখতে পাবেন, তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষিত হবে আলোচ্য সম্বোধনটি। দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে— জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে এ রকম বলা হবে জান্নাতের অভ্যন্তরে। আল্লামা সুয়ূতি শেষোক্ত অভিমতটিকেই পছন্দ করেছেন। এখানে বলা হয়েছে 'জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।' আরো বলা হয়েছে, এই উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে পুণ্যকর্মের কারণে।

মাদারেক রচয়িতা বলেছেন, এখানে জান্নাত প্রদানের বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে মিরাস (উত্তরাধিকার) শব্দটির মাধ্যমে। প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যতিরেকেই যেমন ওয়ারিশেরা লাভ করে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার, তেমনি ঈমানদারেরাও আল্লাহ্পাকের নিছক দয়ায় লাভ করবে জান্নাত। কোনো পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়। প্রকাশ্যতঃ পুণ্যকর্ম হচ্ছে জান্নাত লাভের কারণ। কিন্তু জান্নাতপ্রাপ্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্পাকের মেহেরবানী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেখানে একজন ঘোষক জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমাদের সম্মুখ-জীবনে রয়েছে পরিপূর্ণ স্বস্তি ও শান্তি। তোমরা আর কখনো দেখবে না ব্যাধি এবং মৃত্যু। তোমাদের এ জীবন চিরন্তন এবং চির যৌবনমণ্ডিত। দুঃখকে চিরদিনের জন্য অতিক্রম করে এসেছো তোমরা। লাভ করেছো চিরস্থায়ী সুখ। এ কথাই ঘোষিত হয়েছে আলোচ্য সম্বোধনটিতে।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে মাজা ও বায়হাকীর মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দু'টি গৃহ। একটি

স্বর্গে আর একটি নরকে। যে নরকে যায়, তাদের স্বর্গের গৃহ অধিকার করে স্বর্গবাসীরা। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— এরই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا۟ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ
ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ۝ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم
بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ ۝

❐ জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তোমরাও তাহা সত্য পাইয়াছ কি?' উহারা বলিবে 'হাঁ।' অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদিগের নিকট ঘোষণা করিবে,'আল্লাহের অভিসম্পাত জালিমদিগের উপর —

❐ যাহারা আল্লাহের পথে বাধা দিত এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিত; উহারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'জান্নাতবাসীগণ অগ্নিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি? তারা বলবে, হ্যাঁ।' এখানে 'মা ওয়াআ'দানা রব্বুনা' (আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) কথাটির অর্থ— আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে সওয়াব দানের অঙ্গীকার করেছিলেন। আর 'মা ওয়াআ'দা রব্বুকুম' (তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন) কথাটির অর্থ— তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যে শাস্তিদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। জান্নাতীরা আয়াতের উদ্ধৃত অংশের প্রশ্নটি করবে দোজখীদেরকে লক্ষ্য করে। সফলতার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দোজখীদের তিরস্কারার্থে তাঁরা তখন এ রকম প্রশ্ন করে বসবে তাদেরকে। নিরুপায় দোজখীরাও তখন প্রকৃত সত্যকে স্বীকার করে বলবে, হ্যাঁ।

এ রকম প্রশ্নোত্তরের পর ভেসে আসবে জনৈক ঘোষণাকারীর একটি আওয়াজ। আয়াতের পরবর্তী অংশে সে কথাই বিবৃত হয়েছে এভাবে— অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্র অভিসম্পাত জালেমদের উপর।'

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দিতো এবং তাতে দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতো; তারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করতো।' এখানে 'ইয়াসুদ্দুনা' অর্থ বাধা দিতো। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা নিজেরা সত্য গ্রহণে বিরত থাকতো এবং অন্যদেরও সত্যগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইয়াব্গুনাহা ই'ওয়াজা' কথাটির অর্থ— অবিশ্বাসীরা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়তো এবং আল্লাহ্তায়ালা যাদেরকে সম্মান করতে নিষেধ করেছেন, তাদেরকে মনে করতো সম্মানার্হ।

আমি বলি, এখানে 'ইয়া সুদ্দুনা' শব্দটির পূর্বে 'কানু' শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাই শব্দরূপটি হয়েছে দূরবর্তী অতীতকালবোধক। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা তাদের পৃথিবীবাসের সময় মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দিতো, সত্য ধর্মের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতো এবং সত্য প্রত্যাখ্যান করতো। আখেরাতে এরূপ করবে না। এখানে 'ইওয়াজুন' শব্দটির 'আইন' অক্ষরটি পড়তে হবে যের সহযোগে। শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এতে করে ধর্মীয় বিষয় সহ অন্য সকল বিষয়ের সকল প্রকার দোষ ত্রুটি ও বক্রতা নির্দেশ করা হয়। কিন্তু 'আইন' অক্ষরটি যবর সহযোগে পড়লে বুঝানো হতো কেবল ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের বক্রতা বা দোষ-ত্রুটিকে। অর্থাৎ দেয়াল, বর্শা ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ের বক্রতা বা দোষত্রুটিকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ○ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

❒ উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদিগের শান্তি হউক।' তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাংখা করে।

❒ যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদিগের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদিগের সঙ্গী করিও না।'

প্রথমেই বলা হয়েছে — উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে। এখানে 'উভয়ের মধ্যে' অর্থ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে। জান্নাত ও জাহান্নামের পর্দা (হেজাব) বা দেয়াল সম্পর্কে সুরা হাদীদের একটি আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহুতায়ালা।

এরপর বলা হয়েছে — 'আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে'। এখানে উল্লেখিত আল আ'রাফ শব্দটি 'আ'রফুন' শব্দের বহুবচন। 'আ'রফুল ফারাস' অর্থ ঘোড়ার কেশর। 'আরফুদ্দিক' অর্থ মোরগের ঝুঁটি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো কিছুর চূড়া বা শিখরকে বলে আ'রাফ। মারেফাত এবং ইরফান অর্থ পরিচিতি। আর পরিচিতির নিদর্শন হিসেবে চূড়া বা শিখরই সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়।

আ'রাফ নামক স্থানে কারা থাকবে সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্নরূপ মন্তব্য করেছেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আ'রাফবাসীরা হবে ওই সকল লোক— যাদের পাপ ও পুণ্য সমান। তাদের পুণ্য তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আবার পুণ্যের স্বল্পতা তাদেরকে করবে বেহেশতে প্রবেশের অযোগ্য।

হজরত তালহা এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আ'রাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেয়াল। বৃহৎ পাপের কারণে আল্লাহ্পাক কোনো কোনো লোককে সেখানে আটকে রাখবেন। তারা মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য ও মলিনতা দেখে কে বেহেশতী এবং কে দোজখী তা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতীদেরকে দেখলেই বেহেশত কামনা করবে। আবার দোজখীদেরকে দেখলে চাইবে দোজখ থেকে পরিত্রাণ। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন জান্নাতের প্রবেশাধিকার। এদিকে ইঙ্গিত করেই এক আয়াতে বলা হয়েছে— দ্যাখো এদের সম্বন্ধেই কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

হান্নাদ, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ তাঁদের তাফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেসের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন— আ'রাফ হচ্ছে বেহেশত ও দোজখের মধ্যবর্তী দেয়াল। আল্লাহ্পাক যাদেরকে সেখানে রাখবেন, তারাই হবে আ'রাফবাসী। আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় এক সময় তারা সেখান থেকে মুক্তি পাবে। মুক্তির সময় এলে প্রথমেই তাদেরকে নিয়ে

যাওয়া হবে একটি হ্রদের কাছে। হ্রদটির নাম 'নহরে হায়াত'। হ্রদটির দুইপাড় বাঁধানো থাকবে সোনা ও মোতি দিয়ে। অন্যপাড়ের মাটি হবে মেশ্‌ক সুরভিত। আ'রাফবাসীদেরকে ওই হ্রদের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে গোসল করার পর তাদের চেহারার রঙ পরিবর্তিত হবে। মুছে যাবে সকল অপরিচ্ছন্নতা। কিন্তু তাদের বুকের উপর দেখা দেবে একটি শাদা উজ্জ্বল তিল। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কামনা বাসনাসমূহ প্রকাশ করো। তারা তাদের সকল কামনা বাসনা প্রকাশ করবে। আল্লাহ্‌পাক তাদের সকল কামনা বাসনা পূর্ণ করবেন। এছাড়াও দান করবেন আরো সত্তর গুণ। এরপর তাদেরকে দেয়া হবে বেহেশতের চিরস্থায়ী অধিকার। কিন্তু তাদের বুকের ওই শাদা উজ্জ্বল তিলও জ্বল জ্বল করতে থাকবে অনন্তকাল। এতে করে অন্য বেহেশতীরা সহজেই তাদেরকে চিনতে পারবে যে, এদেরকেই একসময় রাখা হয়েছিলো আ'রাফে। এই আ'রাফবাসের পরে বেহেশতে গমনকারীদেরকে মিস্‌কিন বলে ডাকবে অন্য বেহেশতবাসীরা।

আবু শায়েখের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কে আ'রাফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওই লোকেরাই আ'রাফবাসী, যারা পিতার অনুমতি ছাড়া জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে অথবা ওই অবস্থায় শহীদ হয়েছে। পিতার অবাধ্য হওয়ার কারণে তাকে বিরত রাখা হবে জান্নাত থেকে। কিন্তু সে শহীদ বলে তাকে দোজখেও দেয়া হবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কে একবার আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, ওরা ওই সকল লোক যারা পিতার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছে। তাদের শাহাদত হবে দোজখের এবং পিতৃ-অবাধ্যতা হবে বেহেশতের প্রতিবন্ধক। সেখানে তাদের গোশত চর্বি গলে যাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল সৃষ্টির হিসাব গ্রহণের পর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করবেন রহমতের দৃষ্টি। এভাবে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তারা আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতবেষ্টিত হয়ে প্রবেশ করবে চিরসুখময় স্থান জান্নাতে।

তিবরানী, বায়হাকী ও হারেস ইবনে উসামা তাঁদের হাদিস গ্রন্থে এবং সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু শায়েখ তাঁদের তাফসীরে হজরত আবদুর রহমান মাজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আ'রাফবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে রসুল স. বলেছিলেন, তারা ওই সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে।

আমি বলি, তাঁরা হচ্ছেন ওই সকল শহীদ, যাঁরা পিতার অবাধ্য অবস্থায় জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তাদের পুণ্য ও পাপ হবে

সমান। উল্লেখ্য যে, পিতৃদ্রোহী শহীদেরা ছাড়াও আরো অনেকে হবে আ'রাফের অধিবাসী। অর্থাৎ যাদের পাপ ও পুণ্য হবে সমপরিমাণের তাদেরকেই কিছুকাল রাখা হবে আ'রাফে।

জারীর বিন হাজাম বিন ওমরের বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী দাউদ এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি স. বললেন, আ'রাফবাসীদের বিচার হবে সকলের শেষে। সকলের বিচার সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্তায়ালা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন, তোমাদের পুণ্য তোমাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আবার পুণ্যের স্বল্পতা তোমাদেরকে বেহেশতে গমন করতেও দেয়নি। কিন্তু এখন থেকে তোমরা মুক্ত। আমার নির্দেশে এবার জান্নাতে গমন করো।

আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, বর্ণনাটি মুরসাল ও হাসান। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে দু'টি পদ্ধতির মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে তাদের সম্পর্কে রসুল স. এর নিকটে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, তারাই আ'রাফবাসী। তারা প্রথম সুযোগে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের জন্য লালায়িত থাকবে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকলকে একত্র করে আল্লাহ্তায়ালা পুণ্যবানদেরকে জান্নাতে যেতে বলবেন এবং পাপীদেরকে যেতে বলবেন দোজখে। এরপর তিনি আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন, তোমরা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছো? তারা বলবে, আপনার হুকুমের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, তোমাদের পুণ্যকর্ম তোমাদেরকে দোজখের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর পাপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেহেশতের পথের। এখন তোমরা আমার পক্ষ থেকে দয়া ও ক্ষমা গ্রহণ করো এবং বেহেশতে প্রবেশ করো।

হজরত হুজায়ফা থেকে সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, আবু শায়েখ, বায়হাকী এবং হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, তারাই আ'রাফবাসী যাদের পাপ জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং পুণ্য দোজখে প্রবেশের প্রতিবন্ধক। আ'রাফ নামক স্থানে তাদেরকে আটকে রাখা হবে। তারপর সকলের বিচার শেষে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, ওঠো, তোমরাও জান্নাতে চলে যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হজরত হুজায়ফা থেকে আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে— আ'রাফবাসী তারাই যাদের পাপ ও পুণ্য সমান। তারা অবস্থান করবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। তারা জান্নাত আকাংখা করবে, অবশেষে জান্নাতেই প্রবেশ করবে।

স্বসূত্রে বাগবী, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইবনে মাসউদের উক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন, শেষ বিচারের দিন মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যার পাপ অপেক্ষা একটি পুণ্য বেশী হবে সে প্রবেশ করবে জান্নাতে। আর যার পুণ্য অপেক্ষা একটি পাপ বেশী হবে সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—'ওজনে যাদের নেক আমল ভারী হবে, তারাই সফলকাম এবং ওজনে যাদের নেক আমল কম হবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে'। এভাবে এক দানা পরিমাণ পুণ্যের ওজন বেশী হলেও লাভ হবে জান্নাত। কিন্তু যাদের পুণ্য ও পাপ সমান সমান হবে, তারা হবে আ'রাফ নামক স্থানের অধিবাসী। পুলসিরাতের সর্বশেষ প্রান্তে তাদেরকে আটকে রাখা হবে। তারা জান্নাতী এবং জাহান্নামী উভয় দলকে দেখবে। জান্নাতীদেরকে দেখে তারা বলবে, 'সালামুন আলাইকুম' এবং জাহান্নামীদেরকে দেখে প্রার্থনা করবে—হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই জালেমদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ো না। ওই সময় পুণ্যবানদেরকে প্রদান করা হবে একটি নূর— যা তাদের সামনে এবং ডানে চলাচল করতে থাকবে। প্রথমে অবশ্য সকল মানুষকে ওই নূর প্রদান করা হবে। কিন্তু পুলসিরাত অতিক্রমের সময় মুনাফিকদের নিকট থেকে ওই নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে। তাদের ওই দুরবস্থা দেখে বিশ্বাসী বান্দারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানাবে, হে আমাদের দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক! দয়া করে আমাদেরকে প্রদত্ত নূর নিষ্প্রভ করে দেবেন না। তখন আ'রাফবাসীদের নিকট থেকেও নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে না। কিন্তু তাদের সম্মুখ যাত্রার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তাদের পাপরাশি। কিন্তু তাদের নূর অন্তর্হিত হবে না বলেই তাদের অন্তরে জাগ্রত থাকবে জান্নাত লাভের বাসনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন—'তাদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা তাতে প্রবেশ করেনি।' সকলের শেষে ওই আরাফবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সর্বশেষ জান্নাতগমনকারী হবে তারাই।

হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, পুণ্যবান ফকিহ্ এবং আলেমগণই হবে আ'রাফবাসী। আ'রাফ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি দেয়াল। সম্ভবতঃ মুজাহিদের এই উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আ'রাফবাসী হবে ওই সকল বিশ্বাসী ফকিহ্ ও আলেম যারা পাপ ও পুণ্য দু'টোই করেছে। তাদের আমল হবে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত। তাদের পাপ ও পুণ্য হবে সমান সমান। আশা করা যায় আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে রহম করবেন।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে— আবু মুজলা বলেছেন, আ'রাফ একটি উঁচু স্থান। সেখানে ফেরেশতারা অবস্থান করবে। সেখান থেকে জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়

দলকে দেখা যাবে। ফেরেশতারা উভয় দলকে তাদের নিদর্শন দেখে চিনতে পারবে। এ উক্তিটি অবশ্য ভুল। কেননা বর্ণিত হয়েছে আ'রাফবাসী হবে পুরুষ। আর ফেরেশতারা নারী বা পুরুষ কোনোটাই নয়। তাছাড়া হাদিস শরীফের বর্ণনাও এই উক্তিটির বিরুদ্ধে।

কেউ কেউ মনে করেন, আ'রাফবাসী হবেন নবী, ওলী ও শহীদগণ। তাঁরা সেখান থেকে বেহেশতি ও দোজখীদেরকে চিনে নিতে পারবেন। এই উক্তিটিও ভুল। কারণ, হাদিস শরীফের বর্ণনা এই উক্তিটির অনুকূল নয়।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, আ'রাফবাসী হবে মুশরিকদের শিশু সন্তানেরা। এই অভিমতটিও সঠিক নয়। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, আ'রাফবাসীরা হবে পুরুষ। অর্থাৎ পরিণত পুরুষ। শিশু নয়। তাছাড়া হাদিস শরীফেও এ রকম বর্ণনা আসেনি।

'কুল্লাম বিসিমাহুম' কথাটির অর্থ— যারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। এখানে সিমা (লক্ষণ) শব্দটি 'সামা ইব্লাহু' থেকে সংকলিত। যেমন— উট, উটের পালকে চিহ্নযুক্ত করে চারণভূমিতে ছেড়ে দেয়া হয়। অথবা শব্দটি 'রাসামা আ'লাল ক্বলবী' থেকে সংকলিত— যার অর্থ অন্তরে নিশানা লাগিয়েছে। এই দ্বিতীয় অবস্থায় নিশানা লাগানোর উদাহরণ স্বরূপ শব্দটি হবে ওয়াস্মুন— যেমন, উচ্চ মর্যাদা সুচিহ্নিত করার জন্য নিশানা লাগানো হয়।

এরপর বলা হয়েছে— এবং জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের শান্তি হোক।' তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে।' এ সম্পর্কে হাসান বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরে শুভ আশা জাগ্রত রাখবেন। কারণ, তাদেরকে অবশেষে দয়া করা হবে। আর নৈরাশ্য তো কেবল অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত। 'লাম ইয়াদ্ খুলুহা' (তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি) — এই কথাটি 'জুমলা মুসতানিফা' (একটি নতুন বাক্য)। পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। অথবা কথাটি 'রিজালুন' এর গুণ বা সিফাত। কিংবা 'নাদও' এর গুণ বা সিফাত। কিংবা নাদাও কথাটির কর্তৃবাচক সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। অতএব যারা নবী ও ফেরেশতাগণকে আ'রাফবাসী বলে থাকেন, তাদের নিকট এ অবস্থাটি হবে জান্নাতবাসীদের অবস্থা।

পরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেমদের সঙ্গী কোরো না।' এ কথার অর্থ— দোজখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র আ'রাফবাসীরা বলবে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে ওই দোজখবাসীদের মতো দোজখী করে দিয়ো না। এখানে 'সুরিফাত' (ফিরিয়ে দেয়া হবে) কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায়, আ'রাফবাসী স্বেচ্ছায় দোজখীদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করবে না। আল্লাহ্তায়ালাই তাদের দৃষ্টি দোজখীদের দিকে ফিরিয়ে দেবেন, যেনো তারা দোজখীদের মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পরিত্রাণপ্রার্থী হয়। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আ'রাফবাসীরা বেহেশ্তের আশাধারী হয়ে থাকবে। তাদের পাপ-পুণ্য সমান বলে তারাই এ রকম আশায় ও অপেক্ষায় প্রহর অতিবাহিত করতে থাকবে। এতে করে বুঝা যায়— নবী, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণগণের (সলেহীনদের) অবস্থা এ রকম নয়। কারণ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওই সময় তাদের ভয় ও চিন্তা বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং আশা ও অপেক্ষার প্রয়োজন তাদের নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৪৮, ৪৯

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ۝ اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ۝

❐ আ'রাফবাসিগণ যাহাদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'তোমাদিগের দল ও তোমাদিগের অহংকার কোন কাজে আসিল না।'

❐ দেখ, ইহাদিগেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আ'রাফবাসী যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের দলবদ্ধতা ও তোমাদের অহংকার কোনো কাজে এলো না।' এখানে অহংকার অর্থ— ওই সকল অবিশ্বাসী নেতাদের অহংকার যা তারা সত্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করতো। এখানে 'জামউন' (দল) অর্থ— অবিশ্বাসী নেতাদের দল— তাদের সতীর্থ, অনুগত সন্তান-সন্ততি ও সাহায্যকারী।

কালাবী বলেছেন, আ'রাফের ওই প্রাচীরের উপর থেকে দোজখবাসী নেতাদেরকে লক্ষ্য করে আ'রাফবাসীরা বলবে, হে ওলিদ বিন মুগীরা, হে আবু জেহেল বিন হিশাম, হে অমুক অমুক নেতারা! দেখো তোমাদের দল ও অহংকার এখন কোনো কাজেই এলো না। এরপর আ'রাফবাসীরা জান্নাতবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে এবং পৃথিবীতে যে সকল বিশ্বাসীদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাসে

জর্জরিত করা হতো, তাঁদেরকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করবে। ওই সকল জান্নাতীদের মধ্যে থাকবেন হজরত সালমান ফারসী, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত খাব্বাব প্রমুখ। পরের আয়াতে (৪৯) আ'রাফবাসীদের সেই মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'দ্যাখো, এদেরই সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।' এ কথার অর্থ, আ'রাফবাসী অত্যাচারিত সাহাবীদের সম্পর্কে বলবে, হে আবু জেহেল! হে ওলিদ! তোমরা তো এদের সম্পর্কে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না এবং তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ দ্যাখো, আজ তারাই জান্নাতী আর তোমরা জাহান্নামী।

এরপর বলা হয়েছে— এদেরকেই বলা হবে 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।' আমি বলি, এখানে 'উদখুলুল জান্নাহ' (তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো) কথাটি আ'রাফবাসীদের বক্তব্যের শেষাংশও হতে পারে। অর্থাৎ আ'রাফবাসী বলবে, হে অবিশ্বাসী নেতারা! তোমরা তো এ সকল দুর্বল ও অত্যাচারিতদের সম্পর্কেই বলতে যে, এরা আল্লাহ্তায়ালার রহমত পাবে না। অথচ তাঁদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। আরো বলা হয়েছে, এখন আর তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা আর কখনোই দুঃখিত হবে না।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো তাফসীরবিদ আলোচ্য বাক্যটির আর একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে—আ'রাফবাসীগণ অবিশ্বাসী নেতাদেরকে লক্ষ্য করে যখন এ রকম বলতে থাকবে, তারা তো আজ জান্নাতে প্রবেশ করেছে ঠিকই কিন্তু তোমরা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারোনি, পারবেও না। শপথ করে তারা এ কথাও বলবে যে, অবশেষে তোমরা অবশ্যই দোজখে আসবে। তাদের এ কথা শুনে যে ফেরেশতা আ'রাফবাসীদেরকে আটকে রাখবে, সেই ফেরেশতা বলবে— তোমরা কি এদের সম্পর্কে শপথ করে বলছো যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করবেন না। পুনরায় ওই ফেরেশতা আ'রাফবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, যাও এবার তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করো। তোমাদের কোনো ভয় নেই। আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। তোমরা এখন থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত।

আতা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আ'রাফবাসীদের জান্নাত যাত্রার পর দোজখীরাও আশান্বিত হয়ে উঠবে। বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন জান্নাতবাসী হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কথাও বলতে চাই। আমরা অনুমতিপ্রার্থী। অনুমতিপ্রাপ্তির পর তারা তাদের জান্নাতী আত্মীয়দের অনাবিল সুখ-

শাস্তি দেখতে সক্ষম হবে। তাদেরকে সহজেই চিনতে পারবে দোজখীরা। কিন্তু বিবর্ণ ও কুৎসিৎ দর্শন দোজখী আত্মীয়দেরকে তাদের জান্নাতী আত্মীয়রা চিনতেই পারবে না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ
لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ
وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ
هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ
فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

❒ অগ্নিবাসিগণ জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদিগের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ এ দুইটি নিষিদ্ধ করিয়াছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য।

❒ যাহারা তাহাদিগের দ্বীনকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, যে-ভাবে তাহারা তাহাদিগের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়াছিল এবং যে-ভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

❒ অবশ্য তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহাকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।

❒ তাহারা শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম বাস্তবায়িত হইবে সেইদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্য আনিয়াছিল, আমাদিগের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্ন কিছু করিতে পারি?' তাহারা নিজেরা নিজদিগের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— অগ্নিবাসিগণ জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা জীবিকারূপে আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও'। এখানে 'আফিদু আ'লাইনা মিনাল মায়ি'— কথাটির অর্থ, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও। এখানে অর্থ হবে— আমাদের উপরে কিছু বেহেশতের শরবত ঢেলে দাও। আর 'আও মিম্মা রযাক্বা কুমুল্লহ্' অর্থ— অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দাও। এভাবে জাহান্নামীরা জান্নাতীদের নিকট বেহেশতী পানীয় ও আহারের জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলবে, আল্লাহ্ এ দু'টি নিষিদ্ধ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।' এ কথার অর্থ জাহান্নামী আত্মীয়স্বজনদেরকে লক্ষ্য করে জান্নাতীরা বলবে— আল্লাহ্তায়ালা এই বেহেশতী পানীয় ও আহার্য কাফেরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে—'যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিলো এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিলো। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হবো, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো।' এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীরা পৃথিবীতে সত্যধর্মের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সত্যধর্মকে গ্রহণ করেছিলো ক্রীড়া-কৌতুকরূপে। এভাবে তারা ভুলে গিয়েছিলো আমাকে, কিয়ামত দিবসকে। তাই আজ আমি তাদেরকেও ভুলে যাবো। তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো তাই আমিও আজ তাদেরকে করবো অস্বীকার।

জায়েদ বিন রাফী সূত্রে ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং জিয়া বর্ণনা করেছেন, অবিশ্বাসীরা দোজখে প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় ধরে অশ্রুবিসর্জন করবে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে তাদের চোখ থেকে ঝরবে রক্ত। নরকের প্রহরীরা বলবে, হে পাপিষ্ঠের দল! পৃথিবীতে তোমরা একটুও কাঁদোনি। আজ তবে এ রকম কেঁদে মরছো কেনো? এ কথা বলা সত্ত্বেও তারা চিৎকার করে বলতে থাকবে, হে আমার জান্নাতবাসী পিতা, হে আমার মাতা, অথবা হে আমার আদরের সন্তানেরা! আমি কবর থেকে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি। হাশরের বিচারানুষ্ঠানের সময়ও আমি ছিলাম

তৃষ্ণার্ত। সেই সীমাহীন তৃষ্ণা নিয়ে এখনও আমি জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছি। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে পানাহারের সামগ্রী হিসেবে যা কিছু দান করেছেন, সেগুলো থেকে আমাকে কিছু দাও। এভাবে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস কিংবা চল্লিশ বছর পর্যন্ত চিৎকার করে ডেকে ডেকেও দোজখীরা কোনো সাড়া পাবে না। তখন এক সময় বলা হবে, তোমাদের শাস্তি চলবে অনন্তকাল। এ কথা শুনে তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়বে। উত্তম কোনো কিছুর আশা তখন তাদের থাকবেই না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক জাহান্নামী তার ভাইকে চিৎকার করে ডেকে বলতে থাকবে, ভাইরে ভাই! আমার মুক্তির জন্য সুপারিশ করো, আমি তো জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলাম। তার ভাই তখন বলবে, জান্নাতের পানাহার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য হারাম। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন— সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হবো, যেভাবে তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো। এখানে 'তাদেরকে বিস্মৃত হবো' কথাটির অর্থ হবে— তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবো। আর 'এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিলো' কথাটির অর্থ হবে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পৃথিবীতে ওই সকল পুণ্যকর্ম পরিত্যাগ করেছিলো, যা আজ এই কিয়ামতে তাদের উপকারে আসতো।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে—'অবশ্য তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যাকে জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিলো বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।' এখানে 'কিতাবুন' অর্থ কোরআন মজীদ। 'ফাস্সালনাহু' অর্থ— বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম। অর্থাৎ হালাল ও হারামকে পৃথকরূপে বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলাম। 'আ'লা ই'লমিন' অর্থ জ্ঞান দ্বারা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে— আমি মানুষের নিকট কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলাম। ওই কিতাবে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি হক ও বাতিলকে স্পষ্টরূপে পৃথক করে দিয়েছিলাম। বিশ্বাসীরা আমার সেই সঠিক বিশ্লেষণপূর্ণ নির্দেশনা মান্য করেছিলো। তাই ওই কিতাব তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলো। আর পথপ্রাপ্ত বলেই তারা পেয়েছিলো আমার দয়া।

এর পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে—'তারা শুধু তার পরিণামের প্রতীক্ষা করে, যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিলো তারা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য এনেছিলো, আমাদের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে যেনো আমরা পূর্বে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি।' এখানে 'হাল ইয়ান জুরুনা ইল্লা তা'বিলাহু' কথাটির অর্থ তারা শুধু তার পরিণামের প্রতীক্ষা করে। অর্থাৎ কোরআনের প্রতি

ইমান আনার জন্য প্রতীক্ষা করে। 'তা'বিলাহু' (তার) অর্থ এখানে কোরআনে উল্লেখিত পুরস্কারের ও শাস্তির। এ রকম বলেছেন মুজাহিদ। 'ইয়াওমা ইয়া'তি তা'বিলুহু' অর্থ, যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর দিন বা কিয়ামতের দিন যখন শাস্তি অথবা পুরস্কার সমুপস্থিত হবে। 'নাসুহু' অর্থ— যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিলো যেমন করে কোনো বিস্মৃতিপ্রবণ ব্যক্তি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যায়। অর্থাৎ ইমান আনতে ভুলে যায়। 'ক্বদ জায়াত রুসুলু রব্বিনা বিল হাক্ব' কথাটির অর্থ— তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের রসুলগণ তো সত্য এনেছিলো। এভাবে অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের সময় পয়গম্বরগণের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কিন্তু এই সাক্ষ্য তাদের কোনো কাজে আসবে না। কারণ, তখন ইমান ও আমলের সময় নয়— প্রতিফল দানের সময়। পয়গম্বরগণের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার পর তখন তারা এ কথাও বলবে, 'আমাদের কি এমন কোনো সুপারিশকারী আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে যেনো আমরা পূর্বে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি? কিন্তু অবিশ্বাসীদের এমতো আশা সেদিন ফলপ্রসূ হবে না। কারণ, পৃথিবীতে পুনরায় কাউকে প্রেরণ করা আল্লাহ্তায়ালার বিধান নয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করতো তাও অন্তর্হিত হয়েছে।' এ কথার অর্থ— তারা সারা জীবন ধরে মিথ্যাচারিতার মধ্যেই কাটিয়েছে, তাই পরিণামে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে মিথ্যা রচনার অর্থ শিরিক বা আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে অংশীস্থাপন।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৪

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ۝

❐ তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদিগের এক অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমাময় বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন'। এ কথার অর্থ-আল্লাহ্তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে পৃথিবীর ছয় দিন অথবা আখেরাতের ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য যে, আখেরাতের একটি দিন পৃথিবীর এক হাজার দিনের সমান।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল আকাশ এবং পৃথিবীকে এক মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু মানুষকে ধীরতা, স্থিরতা এবং ধারাবাহিকতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে হজরত আনাস ইবনে মালিক থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্তায়ালার পছন্দ ধীরতা ও স্থিরতা। আর শয়তানের পছন্দ ব্যতিব্যস্ততা ও ত্বরা প্রবণতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।' বাগবী বলেছেন, মোতাজিলাদের মতে সমাসীন হওয়ার অর্থ প্রাধান্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে, আরশে সমাসীন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার একটি সিফাত বা গুণ। আর আল্লাহ্তায়ালার অন্য সকল সিফাতের মতো সমাসীন হওয়া সিফাতটিও অতুলনীয়, উদাহরণ রহিত। এই সমাসীন হওয়ার ধরন ও অবস্থা জ্ঞানাতীত। কিন্তু এই ঘোষণাটির উপর ইমান আনা ওয়াজিব। আর বিষয়টি যেহেতু জ্ঞানাতীত তাই তা বুঝতে চাওয়ার প্রচেষ্টা নিরর্থক।

ইমাম মালেক বিন আনাসের নিকট এক লোক জিজ্ঞেস করলো, 'আররহমানু আ'লাল আ'রশিস্ তাওয়া' (রহমান আরশে সমাসীন হন) কথাটির অর্থ কী? প্রশ্নটি শুনে ইমাম মালেক অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তারপর বললেন, 'ইস্তাওয়া' (সমাসীন) শব্দটির অর্থ আমি জানি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার স্বরূপ আমার অজ্ঞাত। বিষয়টি জ্ঞানের আওতায় আনা অসম্ভব। কিন্তু কথাটি বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা পাপ। এ রকম প্রশ্ন রসুল স. এর আদর্শের বিরোধী এবং এটি নফসের একটি প্রতারণা। আমি মনে করি এই জ্ঞানাতীত বিষয়টি সম্পর্কে যে জানতে চায় সে পথভ্রষ্ট। এরপর তিনি হুকুম দিলেন, এই প্রশ্নকারী লোকটিকে মজলিশ থেকে বের করে দাও।

সুফিয়ান সওরী, আওযায়ী, লাইস বিন সাঈদ, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া, আবদুল্লাহ ও অন্যান্য আলেম বলেছেন, এই আয়াতটি একটি মোতাশাবিহ্ (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াত। আয়াতের বক্তব্যটিকে বিনাশর্তে ও বিনাপ্রশ্নে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে। আরশের অভিধানগত অর্থ প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু বা সিংহাসন। আরশ আল্লাহ্পাকের একটি বিস্ময়কর ও উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি। আল্লাহ্তায়ালার

তাজাল্লীর সঙ্গে এর রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। তাই এই আরশকে বলা হয়েছে 'আরশুর্ রহমান' (আল্লাহ্তায়ালার আরশ)। কিন্তু এই আরশের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধ স্থানগত নয়। সম্বন্ধটি অবোধ্য। বরং সম্বন্ধটি কেবল সম্মানসূচক। যেমন কাবাগৃহকে কেবল সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র গৃহ। বিভিন্ন হাদিসে এ সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সুরা বাকারার আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যাতেও এ সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের এক অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন'। এখানে 'ইয়ুগ্শি' অর্থ আচ্ছাদিত করেন। 'আল্লাইলা' অর্থ রাত্রিকে। 'বিন্নাহারি' অর্থ দিবস দ্বারা। রাত্রি দ্বারা দিবস আচ্ছাদিত হওয়ার বিষয়টি দৃষ্টিগ্রাহ্য। এখানে কেবল রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করার কথা বলা হয়েছে। দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন হওয়ার কথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ বক্তব্যটিতে। বাগবী বলেছেন, ওই প্রচ্ছন্ন কথাটিসহ বক্তব্যটির পূর্ণরূপ হবে এ রকম— 'ইউগ্শিল্ লাইলান্ নাহারা ওয়া ইউগ্শিন্ নাহারাল লাইলা' (তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন)।

'ইয়াত্লুবুহু' অর্থ— অনুসরণ করে। 'হাছিছান' অর্থ ক্ষিপ্রগতিতে বা দ্রুতগতিতে। 'বিআমরিহি' অর্থ আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞানুসারে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এবং দিবস-রাত্রির পালাবদল আল্লাহ্তায়ালার আজ্ঞাধীন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও দিবস-রজনী এবং দিবস-রজনীর নিয়মিত বিবর্তনকে।

এরপর বলা হয়েছে—'জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই'। এ কথার অর্থ, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনিই একমাত্র সৃজক। সকল কিছুর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার তাঁরই। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনিভাবে পরিচালন করেন তাঁর এই মহাসৃষ্টি। অতুলনীয় তাঁর ক্ষমতা ও পরাক্রম। তাঁর কোনো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার যোগ্যতা ও অধিকার কারো নেই।

সুফিয়ানে কেরাম বলেন, এখানে 'আল খালক্' অর্থ সমগ্র সৃষ্টি। অর্থাৎ আরশ, আকৃতি জগৎ, আকাশ পৃথিবী এবং আকাশ পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত সকল জড় সৃষ্টি, ভূতচতুষ্টয়, উদ্ভিদরাজি, খনিজসম্পদ, সকল প্রাণীকুলের আত্মা, সৃষ্টির স্থূল শরীর ইত্যাদি। আর 'আল আমরু' অর্থ আলমে আমরের কলব, রূহ্, সির, খফি ও আখফা। মানুষ, ফেরেশতা এবং জ্বিনের আত্মা আরশ অপেক্ষা উচ্চ এই অর্থে যে— এদের আত্মা আয়না সদৃশ। ক্ষুদ্র আয়নায় যেমন বিশাল সূর্য প্রতিভাসিত হয়, তেমনি এদের অন্তরের আয়নায় ইমানের কারণে প্রতিবিম্বিত হতে পারে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লী। তাই এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল 'কুন' (হও) আদেশের মাধ্যমে।

বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়াহ্ বলেছেন, খালক্ ও আমর শব্দ দু'টোর মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। যে এ দু'টোকে সমার্থক মনে করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

শেষে বলা হয়েছে— 'মহিমাময় বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্।' কথাটির অর্থ— একক উপাস্য হওয়ার দিক দিয়ে আল্লাহ্ মহিমময়, পবিত্র, অংশীবিহীন। তিনিই সকল সৃষ্টির একক প্রভুপ্রতিপালক। এখানে 'তাবারাকা' শব্দটি এসেছে 'বারাকাতুন' থেকে। শব্দটির অর্থ পবিত্রাতিপবিত্র, মহিমাময়— যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হওয়া অত্যাবশ্যক।

কেই কেউ বলেছেন, 'তাবারক' শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তিনিই সেই মহিমময় সত্তা, যাঁর স্মরণ থেকে বরকত লাভ হয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ— তিনিই সকল বরকতের একক অধিকর্তা।

হাসান বসরী বলেছেন, তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয় সকল বরকত। কেউ কেউ বলেছেন, তাবারাকা অর্থ কুদ্স বা পাকপবিত্র। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি মহান আল্লাহ্র একটি পবিত্র নাম। তিনিই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দান করেছেন বরকত। তত্ত্বানুসন্ধানীগণ বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা চিরস্থায়ী, অবিনাশী। তিনি সদা বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান। কারণ বরকত শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সুদৃঢ়রূপে স্বতিষ্ঠ, সদাপ্রতিষ্ঠিত, অক্ষয়, অব্যয়। আল্লাহ্তায়ালার প্রতি তাবারাকা শব্দটির প্রয়োগ বৈধ। কিন্তু 'মুবারাকা' শব্দটির প্রয়োগ বৈধ নয়। কারণ মুবারক শব্দটি তাঁর শরিয়তসম্মত নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৫

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۚ

❒ তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদিগের প্রতিপালককে ডাক; তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

উদ্উ' রব্বাকুম তাদ্বর্রুআঁও ওয়া খুফ্ইয়াতা' (তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো)। এ কথার অর্থ— তোমরা বিনয়াবনত হয়ে গোপনে তোমার প্রতিপালকের স্মরণ করো, ইবাদত করো, প্রার্থনা করো। 'তাদ্বর্রুআ'ন' একটি মূল শব্দ। এখানে শব্দটি কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। এর একবচন হচ্ছে দ্বরাউ'ন। যেমন 'দ্বরাআ'র্ রজুলু'। 'দ্বরাআ'তা' কথাটির অর্থ— ওই ব্যক্তি দুর্বল ও অক্ষম হয়েছে। দ্বরিউ'ন এবং দ্বনরিউ'ন অর্থ দুর্বল ও অক্ষম।

'তাদ্বর্‌রাউ' অর্থ দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা (বিনীতভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রার্থনা করা)। কামুস গ্রন্থে রয়েছে দ্বরাআ' ইলাইহি দ্বরাআ'ন ওয়া দ্বরাআ'তান কথাটির অর্থ— তাঁর সামনে বিনীত অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে।

'খুফ্‌ইয়াতান' শব্দটির অর্থ— গোপন ইবাদত, যা বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে সম্পাদিত হয় এবং যা আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য যে, আত্মম্ভরিতামুক্ত এবং শুদ্ধসংকল্পসম্বলিত না হলে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কোনো ইবাদতই আল্লাহ্‌পাকের দরবারে গৃহীত হয় না।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। যদি সে আমাকে গোপনে (মনে মনে) স্মরণ করে তবে আমিও তাকে স্মরণ করি গোপনে। যদি সে আমাকে দলবদ্ধভাবে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি পবিত্র ও মর্যাদাশীল দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের সঙ্গে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও স্বশব্দ জিকিরই উত্তম। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। বরং এখানে এ কথাটিই প্রতীয়মান হয় যে, নীরব ও সরব উভয় প্রকার জিকিরই গ্রহণীয়। বরং এখানে নীরব স্মরণকে সরব স্মরণাপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে— 'ফাজকুরুল্লহা কাজিক্‌রিকুম আবাআকুম আও আশাদ্দা জিক্‌রা' (সুতরাং তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তিদের মতো অথবা তাদের চেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র জিকির করো)। এখানে সরব জিকিরের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে অত্যধিক জিকিরের কথা।

আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, গোপন জিকিরই উত্তম এবং উচ্চস্বরে জিকির বেদাত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশব্দ জিকির অত্যাবশ্যক। যেমন— আযান, ইকামত, তকবির, তাশরিক ইত্যাদি। এ ছাড়া নামাজের সময় ইমামের ওজু ভঙ্গ হলে তাকে উচ্চ স্বরে তকবির বলতে হয়। নামাজে মোক্তাদির ওজু ভঙ্গ হলে উচ্চস্বরে সুবহানাল্লাহ্‌ বলে মসজিদ থেকে বের হতে হয়। হজের সময় উচ্চ স্বরে বলতে হয় 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ইত্যাদি। হেদায়া গ্রন্থের টীকা ভাষ্যে শায়েখ ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, তাকবির ও তাশরিকের সীমা ও সংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের অভিমতকে পছন্দ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স, আরাফার দিন (৯ই জিলহজ) ফজরের নামাজের পর থেকে কোরবানীর শেষ দিন আসরের নামাজের পর পর্যন্ত তাকবির ও তাশরিক পড়তেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। আর সাহেবাঈন (ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ) এই প্রসঙ্গে অনুসরণ করেছেন হজরত আলীর অভিমতকে। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স.

আরাফার দিন ফজরের পর থেকে তকবিরে তাশরিকের শেষ দিন আসরের নামাজ পর্যন্ত তকবিরে তাশরিক পড়তেন। এই হাদিসটিও বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা। মোহাম্মদ বিন হাসানও এ রকম বর্ণনা করেছেন। এর পর ইবনে হুম্মাম উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি সাহেবাঈনের উক্তির উপরে ফতওয়া দেয়, সে হয়ে যায় অত্যুত্তম অভিমতের বিরোধী। কেননা ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাঈনের মতভেদ তকবির কম বা বেশী বলার ক্ষেত্রে নয়— উচ্চ অথবা অনুচ্চস্বরে তকবির পড়া অথবা না পড়ার ক্ষেত্রে। সাহেবাঈনের অভিমত হচ্ছে, তকবির পড়তে হবে উচ্চস্বরে। আর ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে, অনুচ্চ আওয়াজে তকবির পড়াই উত্তম। নিম্নস্বরের জিকির অথবা গোপন জিকিরই প্রকৃত জিকির। উচ্চস্বরে জিকির করা বেদাত। এ কথাটিও প্রণিধানণীয় যে, সরবতা ও নীরবতার মধ্যে যেহেতু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, সেহেতু নীরবতাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়াই সমীচীন। তাই গোপন জিকিরই উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের ঐকমত্য ছিলো নীরব জিকিরের পক্ষে।

হাসান বসরী বলেছেন, উচ্চস্বরের দোয়া এবং নিম্নস্বরের দোয়ার মধ্যে সত্তর হাজার গুণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানেরা দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতেন। কিন্তু তাঁদের সেই দোয়ার সামান্য আওয়াজও শোনা যেতো না। শুধু শোনা যেতো তাঁদের ওষ্ঠ সঞ্চালনের মৃদু শব্দ। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো। পুণ্যবানদের সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ইজ্ নাদা রব্বাহু নিদাআন খফিয়্যা' (যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিলো নিভৃতে)।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে জিকিরে খফি (নীরব জিকির) এবং উত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা যা ন্যূনতম সামর্থ্যের অন্তর্ভূত। আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী। হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় একটি প্রান্তর অতিক্রমকালে মুসলিম সৈন্যরা উচ্চ শব্দে তকবিরধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, শান্ত হও। তোমরা কোনো বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে তো আহ্বান করছো না— তোমরা ওই সত্তাকে ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা এবং নিকটতম। বাগবী।

আমি বলি, বাগবী বর্ণিত এই হাদিসটির মাধ্যমে জিকিরে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, রসুল স. এখানে উচ্চস্বরে তকবির উচ্চারণকে নিষিদ্ধ করেননি। বলেছেন, শান্ত হও। তাই এই হাদিসের মাধ্যমে জিকিরে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণিত হয়েছে যে সরব ও নীরব উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ।

দ্রষ্টব্যঃ জিকির তিন প্রকার।

১. চিৎকার করে জিকির করা। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে এ রকম জিকির সকল অবস্থায় মাকরূহ। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে যদি অধিকতর উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পরিস্থিতিগত কারণে আলেমগণ যদি সাময়িকভাবে এ রকম জিকিরকে কল্যাণকর মনে করেন তবে তাকে অসিদ্ধ বলা যাবে না। বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ আওয়াজের জিকিরই উত্তম। যেমন— আযান, হজের তালবিয়া ইত্যাদি। চিশতিয়া তরিকার কোনো কোনো পীর ও মোর্শেদ প্রাথমিক অবস্থায় মুরিদগণকে উচ্চশব্দে জিকির করতে বলেন। শয়তান বিতাড়ণ, আলস্য বিদূরণ, ঔদাসীন্য অপসারণ, অন্তর উত্তপ্তকরণ, অনুপ্রেরণা ও অনুরাগের উজ্জীবন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে চিশতিয়া তরীকার পীরগণ প্রাথমিক সালেকদের জন্য এ রকম জিকির নির্ধারণ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আত্মপ্রসাদ এবং যশ লাভের উদ্দেশ্যে অত্যুচ্চ আওয়াজে জিকির করা থেকে বিরত থাকা একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

২. রসনা সঞ্চালনার মাধ্যমে অত্যন্ত অনুচ্চ আওয়াজে জিকির করা। রসুল স. বলেছেন, সকল সময় আল্লাহ্র জিকিরে তোমার রসনাকে সিক্ত রাখো। ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোনটি? তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের সময় আল্লাহ্র জিকির দ্বারা রসনাকে সতেজ রাখা।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার কিছু ফেরেশতা জিকিরকারীদের অনুসন্ধান করে বেড়ায়। কাউকে আল্লাহ্র জিকির করতে দেখলে সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। একজন অন্যজনকে ডেকে বলে, এসো এদিকে এসো। তারা সকলে সমবেত হয়ে তখন জিকিরকারীদের মজলিশ ঘিরে ফেলে। বেষ্টনী গড়ে তোলে তাদের ডানার মাধ্যমে। এভাবে তারা বেষ্টনী গড়ে তোলে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। তৎসত্ত্বেও তিনি ওই ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দারা কী বলছে? ফেরেশতারা বলে, তারা ঘোষণা করছে আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আরো বর্ণনা করছে আপনার প্রশংসা (বলছে, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর)। আল্লাহ্পাক বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, আমাকে যদি তারা দেখতো, তবে কী অবস্থা হতো তাদের? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা আরো বেশী ইবাদত করতো। আরো বেশী প্রকাশ ঘটাতো আপনার পবিত্রতার ও শ্রেষ্ঠত্বের। বর্ণনা করতো আরো অধিক পবিত্রতা। আল্লাহ্পাক পুনরায় বলেন, কী চায় তারা? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্পাক বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্পাক বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তবে কী অবস্থা হতো তাদের? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা জান্নাতের প্রতি হতো আরো অধিক লালায়িত। আল্লাহ্পাক পুনরায় বলেন, কোন্ বস্তু থেকে পরিত্রাণ চায় তারা?

ফেরেশতারা বলে, দোজখ থেকে। আল্লাহ্‌পাক বলেন, তারা কি দোজখ দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্‌ বলেন, কী অবস্থা হতো তাদের, যদি দেখতো। ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা দোজখের ভয়ে পাপ থেকে আরো অধিক দূরে থাকার চেষ্টা করতো। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, তোমরা তবে সাক্ষী থাকো— আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এক ফেরেশতা তখন বলে, ওই জিকিরের মজলিশে এক লোক উপস্থিত ছিলো, কিন্তু সে ছিলো জিকিরবিহীন অবস্থায়। তার উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। কার্যোপলক্ষ্যে এসে সে বসে পড়েছিলো জিকিরের মজলিশে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, জিকিরকারীদের সঙ্গে যে উপবেশন করে, সে কখনও দুর্ভাগা হয় না। বোখারী, মুসলিম।

৩. জিহ্বা সঞ্চালন ব্যতীত কেবল কলব, রূহ্‌ এবং নফ্‌স দ্বারা গোপনে জিকির করা। এই জিকিরকে বলে জিকিরে খফি। আমল লেখক ফেরেশতারা এই জিকির সম্পর্কে অজ্ঞাত।

মাতা আয়েশা সিদ্দিকা থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছে, রসুল স. বলেছেন, সরব জিকির অপেক্ষা নীরব জিকির সত্তর হাজার গুণ অধিক মর্যাদাপূর্ণ। শেষ বিচারের সময় ফেরেশতারা যখন মানুষের আমলনামা উপস্থিত করবে তখন আল্লাহ্‌তায়ালা এক লোককে দেখিয়ে বলবেন, ভালো করে দ্যাখো, আমার এই বান্দার কোনো পাপ-পুণ্য লেখা বাদ পড়লো কিনা? আমল লেখক ফেরেশতারা বলবে, আমরা যা কিছু জেনেছি, শুনেছি এবং দেখেছি— সকল কিছুই আমলনামায় লিখে নিয়েছি। কোনো কিছুই পরিত্যাগ করিনি। আল্লাহ্‌তায়ালা বলবেন, আমার এই বান্দার গোপন আমলও রয়েছে, যার কথা তোমরা জানোই না। সেই আমল হচ্ছে জিকিরে খফি।

আমি বলি, এই জিকিরে খফি বা কলবী জিকিরের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। শারীরিক শ্রান্তি, ক্লান্তি ও আলস্য এই গোপন জিকিরের প্রতিবন্ধক নয়। জিকিরে জাগ্রত কলবে তাই প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে আল্লাহ্‌র জিকির।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সীমালংঘনকারী অর্থ ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে অবাস্তব প্রার্থনা করে। যেমন বলে, হে আল্লাহ্‌ আমাকে নবীর মর্যাদা দান করো, আকাশে উঠিয়ে নাও, মৃত্যুর আগেই স্বর্গদান করো ইত্যাদি। স্বসূত্রে বাগবী হজরত আবু দাউদ সিজিস্তানীর ধারাবাহিকতায় আবু নূয়ামার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মুগাফ্‌ফাল একবার তাঁর পুত্রকে দোয়া করতে শুনলেন— হে আমার আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে এই মর্মে প্রার্থনা জানাই, যখন আমি বেহেশতে গমন করবো তখন আমাকে বেহেশতের ডানপাশে একটি শাদা স্থান দান করবেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন মুগাফ্‌ফাল বললেন, প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং দোজখ

থেকে নিষ্কৃতি চাও। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ভবিষ্যতে এই উম্মতের কিছু লোক পবিত্রতা অর্জন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করবে। ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান।

হজরত সা'দ থেকে আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অতিশীঘ্রই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা হবে দোয়ার মধ্যে সীমালংঘনকারী। মানুষের জন্য এ রকম প্রার্থনা করাই যথেষ্ট যে, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমি তোমার নিকট বেহেশত প্রার্থনা করি। আর চাই ওই কথা ও কাজ যা আমাকে জান্নাতের সমীপবর্তী করে এবং দোজখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আবু ইয়া'লী বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, বর্ণিত উক্তিটি কি রসুল স. এর না হজরত সা'দ এর।

আতিয়া বলেছেন, এখানে মু'তাদিন (সীমালংঘনকারীগণ) অর্থ ওই সকল লোক, যারা অবৈধ রীতিতে মুসলমানদের জন্য বদ্‌দোয়া করে। যেমন বলে— হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি অভিশাপ অবতীর্ণ করো। স্মর্তব্য যে, এ রকম বদ্‌দোয়া করার ক্ষেত্রে রাফেজীরা সকলের চেয়ে অগ্রগামী। তারা সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের প্রতি অভিশাপ দেয়।

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ই'তাদা (সীমালংঘন) অর্থ চিৎকার করে দোয়া করা। রসুল স. এর হাদিসে এ রকম চিৎকারসর্বস্ব প্রার্থনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হজরত আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা আপন সত্তার উপর বিনম্র হও। তোমরা কোনো বধির সত্তাকে তো ডাকছো না এবং কোনো অনুপস্থিত অস্তিত্বকেও আহ্বান করছো না।

আমি বলি, এখানে সীমালংঘন অর্থ শরিয়তের সীমালংঘন। উপরে বর্ণিত সীমালংঘনের সকল সংজ্ঞাই এর অন্তর্ভুক্ত। দোয়া সম্পর্কে সীমালংঘনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— আমি এতো করে দোয়া করলাম তবু আমার দোয়া কবুল হলো না, অথবা আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে, কিংবা এমন ওসিলার মাধ্যমে দোয়া করা যা শরিয়ত সমর্থিত নয়। যেমন, পরম প্রভু, প্রতিমা ইত্যাদি।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৫৬

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○

❒ দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহের অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদিগের নিকটবর্তী।

'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটিও না।' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে। স্পষ্ট করে দিয়েছেন শরিয়তের বিধি-বিধান। নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন প্রার্থনার সীমালংঘনকেও। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার শুভ উদ্যোগকে অবিশ্বাস, অবাধ্যতা ও বিশৃংখলার মাধ্যমে বিপর্যস্ত করে ফেলো না। আর কখনো আহ্বান জানিয়ো না গাইরুল্লাহ্র প্রতি। এ রকম অর্থ করেছেন বাগবী, হাসান, জুহাক, সুদ্দী এবং কালাবী। আতিয়া বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম— হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অবাধ্য হয়ো না। নতুবা আল্লাহ্তায়ালা বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। তোমাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দেবেন ফল ও ফসল। এভাবে পৃথিবীতে শুরু হয়ে যাবে অশান্তি। আর এখানে 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর' কথাটির অর্থ হবে— নিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং ফল ও ফসলের সমারোহ নিশ্চিত করার পর।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।' এখানে দৃঢ় আশা-আকাঙ্খাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা দেয়া হয়েছে— ভয় ও আশার মাধ্যমে যে দোয়া করা হয়, সে দোয়া কবুল করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা করীম ও রহীম (কৃপাপরবশ ও দয়াপরবশ)। দয়াময় দাতা তিনি। মানুষের পাপ ও অবাধ্যতাই তাদের দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধক। নতুবা পরম দয়ালু দাতার দিক থেকে কারো প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করা শোভনীয় নয়।

রসুল স. একবার উপমাস্বরূপ বললেন! সুদীর্ঘ পথবাহী মলিন পরিচ্ছদাবৃত পরিশ্রান্ত এক মুসাফির আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলন করে বলতে শুরু করলো, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ সে হারাম আহার্য ভক্ষণকারী এবং হারাম পানীয় পানকারী। তার পোশাক পরিচ্ছদও হারাম উপায়ে সংগৃহীত। অর্থাৎ তার অস্তিত্বই হারাম। এ রকম প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল হবে কিভাবে? হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও তিরমিজি। তাঁদের মাধ্যমে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বান্দার দোয়া আল্লাহ্তায়ালার কাছে সরাসরি পৌঁছে যায়। কিন্তু তা কবুলের শর্ত হচ্ছে— অবৈধ দোয়া না করা, রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রার্থনা না করা এবং দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে তাড়াহুড়া না করা কথাটির অর্থ কী? তিনি স. বললেন, এ রকম বলা— মনে হয় আমার দোয়া কবুল হবে না। অথবা এ রকম বলে সে হয়তো দোয়া করাই বন্ধ করে ছিলো।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হৃদয় একটি আধার। এই আধার কারো কারো প্রশস্ত। কারো কারো সংকীর্ণ। হে মানুষ! প্রশস্ত অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থী

হও। তোমার প্রার্থনা অবশ্যই গৃহীত হবে। আল্লাহ্তায়ালা ওই প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করেন না যার প্রার্থনা একাগ্রচিত্ততা বিবর্জিত। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

একটি প্রশ্নঃ উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দোয়া কবুলের দৃঢ় আশা রাখতে হবে। কিন্তু ইতোপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— আমার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে, এ রকম বলা যাবে না। এই বৈপরিত্যের কারণ কী?

উত্তরঃ দোয়া অবশ্যই কবুল হবে— কথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা পরম দয়ালু ও দাতা, এ কথার উপর দৃঢ় আস্থা রাখলে দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হবে । এ কথাও জানতে হবে যে, অবাধ্যতা ও পাপ, প্রার্থনা কবুলের অন্তরায়। সুতরাং নিজের আমলের দিকে দৃকপাত করে নৈরাশ্যে নিপতিত হওয়া যাবে না। দোয়ার সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় দয়া ও দানের প্রতি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, বর্ণিত হাদিসদ্বয়ের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্না রহমাতাল্লহি ক্বরিবুম্ মিনাল মুহ্সিনীন' (আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী)। এখানে 'ক্বরিবুন্' (নিকটবর্তী) ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গের শব্দরূপে। সুতরাং বুঝতে হবে যিনি দয়াবান তাঁর গুণবত্তা প্রকাশক পুংলিঙ্গের শব্দরূপ এখানে রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী'— কথাটি একটি আদেশ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং আদেশদাতা। ক্বরিবুন্ শব্দটি কখনো কর্তৃকারকরূপে আবার কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার শব্দটি উভয় লিঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, অনুগ্রহ আল্লাহ্র। কিন্তু এখানে যেহেতু বলা হয়েছে, অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী— তাই এই নৈকট্য হবে স্থানগত নৈকট্য। আর আল্লাহ্তায়ালার রহমত গুণটি তো আল্লাহ্তায়ালার মতোই বেমেছাল (উদাহরণরহিত)।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৭

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

❐ তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি,

পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বাধিক ফল উৎপাদন করি। এইভাবে মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর;

'ওয়া হুয়াল্লাজী ইউর্সিলুর্ রিয়াহা বুশরান্ বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহি' (তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন)। এখানে 'বুশরান' (সুসংবাদবাহী) শব্দটি বুশুরান এর সংক্ষিপ্তরূপ। শব্দটি বাশিরুন এর বহুবচন। আর এখানে 'রহমত' (অনুগ্রহ) অর্থ বৃষ্টি। এখানে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূবাল বাতাস মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দখিনা বাতাস মেঘকে করে ঘনীভূত। মেঘকে আবর্তিত করে উত্তরের বাতাস। আর পশ্চিমা বাতাস বিক্ষিপ্ত করে দেয় মেঘকে।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, বাতাস হচ্ছে আল্লাহ্পাক কর্তৃক প্রেরিত স্বস্তি। এই বাতাস হয় কখনো রহমত, আবার কখনো আযাবের প্রতিভূ। তাই তোমরা কখনো বাতাসকে মন্দ বোলো না। বরং বাতাস থেকে আল্লাহ্তায়ালার কল্যাণ কামনা কোরো এবং তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট পরিত্রাণপ্রার্থী হও। হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী শরীফের আদব অধ্যায়ে। আবু দাউদ ও হাকেমও হাদিসটির বর্ণনাকারী। ইমাম শাফেয়ীর নীতিমালা অনুসারে বাগবীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হাদিসটির আরেক বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবদুর রাজ্জাক। আর হাকেম বলেছেন, হাদিসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা আক্বল্লাত্ সাহাবান্ ছিক্বালান্ সুক্বনাহু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফা আনযাল্না বিহিল্ মাআ ফাআখ্রাজনা বিহী মিনকুল্লিছ্ ছামারতি' (যখন তাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর তার দ্বারা সর্বাধিক ফল উৎপন্ন করি)। এখানে 'আক্বল্লাত্' শব্দটির অর্থ— যখন উহা বাত্যা তাড়িত হয়। অর্থাৎ মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস। আক্বল্লাত্ শব্দটি ক্বিল্লাত্ শব্দ থেকে সংকলিত। এর অর্থ কোনো কিছুকে বহন করা বা উত্তোলন করা। ক্বলীল অর্থ লঘু, তুচ্ছ। কোনো বস্তু লঘু হলেই তা বহন করা সম্ভব। তাই বহনযোগ্য বস্তুকেই বলে 'ক্বলীল''।

'ছিক্বালান্' শব্দটির অর্থ— পানির কারণে ঘনবদ্ধ হওয়া। শব্দটি ছাক্বীলুন্ এর বহুবচন। সুতরাং সাহাব (মেঘ) ব্যবহৃত হয় 'সাহাইবুন্' (মেঘপুঞ্জ) অর্থে। তাই এখানে বহুবচনের শব্দরূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছিক্বালান্'। 'সাহাব' (মেঘ) শব্দটি এখানে পুংলিঙ্গে একবচন। তাই শব্দটি একক পুংলিঙ্গের সর্বনাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

'লিবালাদিন' অর্থ ওই ভূখণ্ডের জন্য অথবা ওই ভূমিকে উর্বর বা পরিতৃপ্ত করার জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, 'লি বালাদিন' শব্দটির 'লাম' অক্ষরটির অর্থ এখানে ইলা (দিকে) অর্থাৎ নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে।

'মাইয়্যিতিন্' অর্থ মৃত বা অনুর্বর। 'ফাআন্যালনা বিহী' (অবতরণ করি) কথাটির 'বা' অক্ষরটি এখানে কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ মেঘ অথবা বাতাসের কারণে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি।

'ফা আখরাজনা বিহী' অর্থ— তার দ্বারা উৎপাদন করি। এখানে 'তার দ্বারা' (বিহী) সর্বনামটি 'বালাদুন্' (ভূখণ্ড) এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হলে 'বা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হবে আধার হিসেবে। আর সে আধার হবে— নির্জীব ভূখণ্ড। যদি সর্বনামটি বাতাস অথবা বৃষ্টি বর্ষণের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয় তবে 'বা' হবে এখানে কারণ প্রকাশক।

শেষে বলা হয়েছে—'কাজালিকা নুখ্রিজুল মাউতা লাআ'ল্লাকুম তাজাক্কারুন' (এভাবে মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো)। এখানে 'কাজালিকা' (এভাবে) অর্থ— অজন্মা ভূখণ্ডকে এভাবে করি শস্য-শ্যামল।

'নুখরিজুল্ মাউতা'—মৃতকে করি জীবিত। তাজাক্কারুন অর্থ— যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করতে পারো। অর্থাৎ মৃত ভূমিকে জীবিত করার এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তোমরা যেনো এ বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারো যে, এভাবে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা যাঁর রয়েছে, তিনি নিশ্চয় আখেরাতে সকল মৃতকে পুনর্বার জীবিত করতে পারবেন। প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অবশ্যই সহজ।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রথম বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হলে সকল সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে। তখন আল্লাহ্তায়ালা আরশের নিম্নদেশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ওই বর্ষণের নাম 'আবে হায়াত'— যেমন বর্ষিত হয় পুরুষের মণি বা বীর্য। ওই বর্ষণের মাধ্যমে মানুষ তাদের কবরে উদ্ভিদের মতো বেড়ে উঠতে থাকবে। এভাবে যখন তাদের অবয়ব পূর্ণ হবে, তখন সে অবয়বগুলোতে করা হবে জীবন সম্পাত। তারপর তাদের উপর আপতিত হবে ঘন ঘোর নিদ্রা। যখন তারা কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, তখনও তাদের চোখে মুখে থাকবে ঘুমের প্রভাব। তারা বলতে থাকবে, হায়! কে আমাদেরকে এই ঘন ঘোর ঘুম থেকে জাগালো?

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে দু'বার। এই দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ। হজরত আবু হোরায়রার নিকট থেকে এই হাদিস শ্রবণ করে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, চল্লিশ অর্থ কি চল্লিশ দিন? হজরত আবু হোরায়রা বললেন, না। লোকেরা বললো, তবে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, তাও নয়।

লোকেরা পুনরায় বললো, তবে কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি তাও বলতে পারবো না (অর্থাৎ রসুল স. কেবল বলেছেন, চল্লিশ। দিন মাস বা বছরের উল্লেখ তিনি করেননি)। এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ওই বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বৃক্ষের চারার মতো মানুষের জীবন অঙ্কুরিত হবে এবং তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠতে থাকবে। ওই পুনর্জীবন ক্রমপরিণতি লাভ করতে থাকবে তাদের অস্থিসমূহকে অবলম্বন করে। আবু দাউদও এই হাদিসটির বর্ণনাকারী। হজরত আনাসের বর্ণনায় অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, শিংগায় দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মৃত সৃষ্টির উপর জীবনসঞ্চারক বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শিংগার দুই ফুঁৎকারের অন্তর্বর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। ওই সময় আরশের নিম্নদেশ থেকে প্রবাহিত হবে পানির প্রস্রবণ। ওই পানি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত মানুষ, চতুস্পদ জন্তু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীকুল লাভ করবে নতুন অবয়ব। সে অবয়ব হবে অবিকল পূর্বের অবয়বের মতো। এরপর ওই অবয়বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে রুহ্ বা আত্মাকে। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া ইজান্ নুফুসু যুইয়্যিজাত (যখন প্রাণগুলো সংযোজিত হবে)। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। হুলাইমী বলেছেন, ঐকমত্য এই যে, শিংগার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ বছর। মুরসাল, হাসান বর্ণনাসূত্রে ইবনে মোবারকও এ রকম বলেছেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৮

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

❒ এবং উৎকৃষ্ট ভূমি— ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না; এইভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

এখানে 'আল বালদুত্ তইয়্যেব' অর্থ উৎকৃষ্ট ভূমি। 'বিইজ্নি রব্বিহি' অর্থ— আল্লাহ্র ইচ্ছায় বা আদেশে। 'ওয়াল্লাজি খাবুছা' অর্থ— যা অনুর্বর (ভূমি)। আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— ফসল উৎপন্ন হয় আল্লাহ্তায়ালার আদেশেই। কিন্তু তা উৎকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হয় অল্প আয়াসে এবং নিকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন হয় কঠোর পরিশ্রমের ফলে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় পরাক্রম ও অনুগ্রহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে, দয়াময় প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সকলের প্রতি সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু সৃষ্টির যোগ্যতার তারতম্য হেতু

সকলে সমভাবে উপকৃত হয় না। যেমন, বৃষ্টি— সকল মাটিতে বর্ষিত হলেও সকল ক্ষেত্রে একই রকম ফল ও ফসল উৎপাদিত হয় না। অধিকতর যোগ্য ও উৎকৃষ্ট ভূমিতে প্রকাশিত হয় ফল ও ফসলের বিপুল সমারোহ। আর ধারণযোগ্যতার ন্যূনতার কারণে নিকৃষ্ট ভূমিতে দেখা দেয় শস্যের স্বল্পতা। তাই দানের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য না ঘটলেও তারতম্য ঘটে গ্রহণের ক্ষেত্রে।

আয়াতের অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে, নবী ও রসুল প্রেরণ বিশ্বমানবতার জন্য এক বিশাল রহমত। এই রহমত সাধারণভাবে সকলের নিকট প্রেরিত। কিন্তু এই রহমতের নামে উপকৃত হয় কেবল বিশ্বাসীরা। আল্লাহ্তায়ালার দানের যথাসমাদর করার যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তারা তত্ত্ব অনুসন্ধানী, বিবেচক এবং কৃতজ্ঞচিত্ত। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে নির্দেশনা ও জ্ঞান দান করে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বৃষ্টিপাতের মতো। উৎকৃষ্ট ভূমিতে বৃষ্টিপাত হলে যেমন সেখানে উৎপন্ন হয় বিপুল ফল ও ফসল, তেমনি হেদায়েত গ্রহণের যোগ্য যারা তারা হয়ে উঠে ইমান, হেদায়েত ও সাফল্যের ফসলে পরিপূর্ণ। আর কঠিন মৃত্তিকায় বৃষ্টি বর্ষিত হলে, ধারণযোগ্যতার অভাবে যেমন সে মাটি সিক্ত হয় না, ফলে সেখানে জন্মলাভ করে না কোনো তৃণ, উদ্ভিদ এবং তৃণলতাও, তেমনি হেদায়েত গ্রহণের অযোগ্য চরিত্ররাও চিরবঞ্চিত রয়ে যায় প্রকৃত পথপ্রদর্শন থেকে। তাই সমভাবে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের আওতায় আসা সত্ত্বেও বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞচিত্তরা হয় সফল। আর অসফল হয় অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞরা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৯

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

❐ আমি তো নূহ্কে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

'লাক্বাদ্ আরসালনা নুহান ইলা ক্বওমিহি' অর্থ— আমি তো নুহ্কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। এখানে 'লাক্বাদ আরসালনা' (আমি তো পাঠিয়েছিলাম) কথাটি একটি অনুক্ত শপথের জবাব। এখানে উল্লেখিত 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে নৈকট্য অর্থে। আর এ নৈকট্য প্রকাশক 'লাম' কখনো 'ক্বদ্' শব্দ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয় না।

হজরত নুহের বংশপরিচয় এ রকম, হজরত নুহ্ ইবনে লামাক অথবা লামাক বিন মুতাশাআলিখ অথবা মুতা শাওলিখ বিন খুনুখ অথবা আখনুখ। তাঁর মায়ের নাম আওফাহ্ অথবা ফাইউনুস বিনতে বারালিক বিন কাতাশা ও আলিখ। আখনুখই হচ্ছেন হজরত ইদ্রিস। নবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লেখার প্রথা প্রবর্তন করেন। আখনুখ বিন মাহ্লীল অথবা মাহ্লায়েল। এর পিতার নাম কিনান অথবা কানেন)। কানেনের পিতার নাম নুশ অথবা মানীশ। মানীশের পিতা হচ্ছেন হজরত শীশ। আর হজরত শীশ ছিলেন হজরত আদমের পুত্র।

মুসতাদ্রাক গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আদম থেকে হজরত নুহ পর্যন্ত ব্যবধান ছিলো দশ পুরুষের। হজরত আবু জর গিফারী থেকে মারফু সূত্রে তিবরানীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। উপরের আলোচনা থেকে এ কথাটিই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হজরত ইদ্রিস ছিলেন হজরত নুহের পূর্ববর্তী সময়ের নবী। অধিকাংশ সাহাবীও এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত নুহের প্রকৃত নাম ছিলো সাকান, শাকির অথবা ইয়াশাকির। হজরত আদমের পর তিনিই ছিলেন তাঁর সমকালীন মানবতার পথপ্রদর্শক এবং আশ্রয়স্থল। তাই তাঁর নাম হয়েছে সাকান। আল্লামা সুয়ূতি তাঁর ইতকান গ্রন্থে মুসতাদরাক গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, হজরত নুহের প্রকৃত নাম ছিলো আবদুল গাফ্ফার। তিনি নিজের জন্য এবং স্বসম্প্রদায়ের জন্য অনেক কেঁদেছেন। তাই তাঁর উপাধি হয়েছে নুহ। অথবা কিয়ামতের ভয়ে তিনি অধিকাংশ সময় থাকতেন রোদন ভারাক্রান্ত। তাই তাঁর নাম হয়েছে নুহ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি একবার একটি কুৎসিতদর্শন কুকুরকে দেখে বলেছিলেন, কী কুৎসিত! আল্লাহ্পাক তখন কুকুরের মুখে ভাষা দিলেন। কুকুর বললো, দোষ কি তবে আমার না আমার স্রষ্টার? এ কথা শুনে হজরত নুহ বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে এলো, তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে রোদন করলেন তিনি।

বাগবী লিখেছেন, কপালে ফোঁটাবিশিষ্ট একটি কুকুরকে দেখে হজরত নুহ একবার বলেছিলেন, নাপাক, নাপাক। দূর হয়ে যাও। এরপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো— হে নুহ! তুমি কুকুরকে দোষ দিচ্ছো, না তার স্রষ্টাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অবিশ্বাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। তাই আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন মহাপ্লাবনের মাধ্যমে। সেই বদদোয়া করার কারণে তিনি অনেক অনেক কেঁদেছেন। তাই তিনি হয়েছেন নুহ। কারো কারো অভিমত হচ্ছে, মহাপ্লাবনের সময় তাঁর এক অবিশ্বাসী পুত্র কেনানকে উদ্ধারের জন্য তিনি

আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করেছিলেন। ওই স্বাভাবিক অথচ নিষিদ্ধ পুত্র বাৎসল্যের কথা স্মরণ করে তিনি প্রায়শঃ লজ্জিত ও রোদনার্ত থাকতেন। তাই তিনি উপাধি পেয়েছেন নুহ।

চল্লিশ বছর বয়সে হজরত নুহের উপর নবুয়তের গুরুভার অর্পণ করা হয়। হাকেমের মুসতাদ্রাক গ্রন্থে হজরত ইবনে আব্বাসের মারফু সূত্রে এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা চল্লিশ বছর বয়সে হজরত নুহকে নবুয়ত দান করেছিলেন। নয়শত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে। অল্পসংখ্যক লোক তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলো। অধিকাংশই ছিলো অবিশ্বাসী ও অত্যাচারী। তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছিলেন তিনি। আর মহাপ্লাবনের পর তিনি পৃথিবীতে ছিলেন ষাট বছর।

'খুলাসাতুস সায়ের' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত নুহ নবী হয়েছিলেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে। মহাপ্লাবনের পর তিনি পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন চারশত পঞ্চাশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নবী হয়েছিলেন দুইশত পঞ্চাশ, চারশত পঞ্চাশ অথবা চারশত ষাট বছর বয়সে। মহাপ্লাবন শেষ হওয়ার পর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন আরো দুইশত পঞ্চাশ বছর। তাঁর পৃথিবীর বয়স ছিলো সর্বমোট চৌদ্দশত পঞ্চাশ বছর।

মুকাতিল বলেছেন, একশত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছিলেন হজরত নুহ। ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত নুহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত আদমের মহাপ্রস্থানের আটশত ছাব্বিশ বছর পর। আমি বলি, এই হিসাবটি সঠিক হলে বুঝতে হবে হজরত নুহের মহাতিরোধান ঘটেছিলো হজরত আদমের মহাআবির্ভাবের দুই হাজার আটশত ছাপ্পান্ন বছর পর। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আদম পৃথিবীতে ছিলেন নয়শত ষাট বছর। তাঁর পৃথিবীর আয়ু ছিলো এক হাজার বছর। কিন্তু সে আয়ু থেকে চল্লিশ বছর আয়ু তিনি দিয়েছিলেন হজরত দাউদকে।

আল্লামা নববী তাঁর তাহ্জীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কোনো নবীই পৃথিবীতে হজরত নুহের সমান হায়াত পাননি।

এরপর বলা হয়েছে— এবং সে বলেছিলো, ' হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি'। — সত্যের প্রতি এই উদাত্ত আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানেরা। সে কথাই বিবৃত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ
ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ
لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

❒ সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, আমি তো বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের রসূল,

❒ আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহের নিকট হইতে জানি।'

❒ 'তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদিগেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।'

❒ অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

উদ্ধৃত পাঁচটি আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'। এখানে 'আলমালাউ' অর্থ সম্প্রদায়ের প্রধানগণ। হজরত নুহের সম্প্রদায়-প্রধানেরা ছিলো অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাই তাদেরকে বলা হতো 'মালা'। 'দ্বলালিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট

ভ্রান্তি। 'তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি'— সম্প্রদায়-প্রধানদের এই জঘন্য উক্তির যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন হজরত নুহ। পরের আয়াতে (৬১) তা বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল'। 'দ্বলালুন' শব্দটির অর্থ— ভ্রান্তি। আর 'দ্বলালাতুন' শব্দটির অর্থ সামান্যতম ভ্রষ্টতা বা ভ্রান্তি। আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্বলালাতুন'। অর্থাৎ এখানে হজরত নুহ সামান্যতম ভ্রান্তিকেও স্বীকার না করে এ রকম বলেছেন যে, হে জনতা! তোমরা নিতান্তই অজ্ঞ, মূর্খ। তাই তোমরা আমাকে ভ্রান্ত বলতে পারছো। কিন্তু শুনে নাও হে আমার সম্প্রদায়! আমার অস্তিত্বে ও চরিত্রে সামান্যতম বিভ্রান্তিও নেই। কারণ, আমি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার বাণীবাহক। আমি তো নিয়ে এসেছি ইমান, হেদায়েত এবং সরল পথের আহ্বান। আমি সত্য রসুল। সুতরাং আমার বিভ্রান্তি অসম্ভব। এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতা প্রবহমান রয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৬২)।

বলা হয়েছে—'আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জানো না আমি তা আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি।' এখানে উল্লেখিত 'রিসালাতি' শব্দটি 'রিসালাতুন' শব্দের বহুবচন। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে— ১. রসুলগণের রেসালাতের সময় ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। ২. অর্থগত দিক থেকেও রেসালাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থবোধক। কখনও এর সম্পর্ক বিশ্বাসের সঙ্গে, কখনও কর্মের সঙ্গে, আবার কখনও উপদেশ অথবা নির্দেশের সঙ্গে। ৩. অথবা এখানে রেসালাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই সকল বার্তা ও নির্দেশনা যেগুলো দেয়া হয়েছিলো পূর্ববর্তী নবীগণকে। যেমন, হজরত শীশ এবং হজরত ইদ্রিসের উপর অবতীর্ণ আসমানী সহীফাদ্বয়।

এখানে 'আনসাহু' (হিতোপদেশ) শব্দটি এসেছে 'নসহুন বা নসীহাতুন' (সদুপদেশ অথবা কল্যাণকামনা) থেকে। বাগবী লিখেছেন, এর অর্থ উত্তম ও কল্যাণকর এমন কিছু, যা নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য সমানভাবে কাঙ্খিত।

'মিনাল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্র নিকট থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত নুহের শেষ উক্তিটি হচ্ছে— তোমরা যা জানো না আমি তা আল্লাহ্র নিকট থেকে জানি। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— আমি আল্লাহ্তায়ালার সত্য রসুল। নির্ভুল প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমাকে জ্ঞান দান করা হয়। জ্ঞানার্জনের এ রকম সুরক্ষিত কোনো ব্যবস্থা তোমাদের নেই। তাই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো।' এখানে 'আও আ'জিবতুম' (তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো) একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ এই প্রশ্নটির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের বিস্ময়কে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কথাটির পূর্বে বসানো হয়েছে সংযোজক অব্যয়—'আও' (অথবা)। কিন্তু সংযোগযোগ্য বিষয়টি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত বিষয়সহ তাই বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এ রকম— তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো (আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করছো। বস্তুতঃ বিস্মিত হবার কিছু নেই)।

এখানে 'জিকরুন' শব্দটির অর্থ উপদেশ। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ— বিবরণ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— প্রত্যাদেশিত বার্তা।

'আলা রজুলিম মিনকুম' কথাটির অর্থ— তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত একজনের মাধ্যমে। এ রকম বলার কারণ হচ্ছে, তাদের ধারণা ছিলো, মানুষ কখনো আল্লাহ্তায়ালার রসুল বা বাণীবাহক হতে পারে না। কেবল ফেরেশতারাই রসুল হওয়ার যোগ্য। অবিশ্বাসীরা এ রকম কথাও বলতো যে, এ রকম কথা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনিনি।

'লিতুনজিরাকুম' কথাটির অর্থ— যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে। 'ওয়া লিতাত্তাক্বু' কথাটির অর্থ তোমরা সাবধান হও। আর 'ওয়া লায়া'ল্লাকুম তুরহামুন' কথাটির অর্থ— এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো। এখানে 'লাআ'ল্লা' শব্দটি হচ্ছে— হরফে তামান্না (আশাব্যঞ্জক অক্ষর)। সুতরাং এখানে—'তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ করো' কথাটির অর্থ হচ্ছে— তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো বা সাবধান হও, কিন্তু এ কথা মনে কোরো না যে, তাকওয়া অবলম্বন করলেই আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে অনুকম্পা করতে বাধ্য হবেন। আল্লাহ্তায়ালা সকল বাধ্যবাধকতা থেকে পবিত্র। তাকওয়া বা সাবধানতাকে তিনি বানিয়েছেন তাঁর রহমতপ্রাপ্তির উপায় বা অবলম্বন। তাই এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, অবলম্বন বা উপায় হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টি ও নির্ধারণ। সৃষ্টির অধীন হওয়া তাঁর পক্ষে একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি কাউকে অনুকম্পা প্রদান করতে বাধ্য নন। সুতরাং এই নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে যে— সাবধান হও এবং সাবধানতা অবলম্বনের মাধ্যমে আশাধারী হয়ে থাকো যে, আল্লাহ্তায়ালা যেহেতু অনুকম্পাপরবশ, তাই তিনি অনুকম্পা দানে নিরাশ করবেন না।

আবু নাঈমের মাধ্যমে হজরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীর নিকট একবার প্রত্যাদেশ করা হলো— হে নবী! তোমার অনুগত উম্মতকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো তাদের আমলের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত না হয়। কেননা কিয়ামতের দিন হিসাবের সময় আমি যাকে খুশী তাকে শাস্তি দান করবো। হে নবী! তুমি তোমার অবাধ্য উম্মতদেরকেও বলে দাও, নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না (মুক্তি অসম্ভব জেনে আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না)। কেননা কিয়ামতের দিন আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। কারো পরোয়া করবো না।

এর পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিলো আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাদেরকে নিমজ্জিত করি।' এখানে বক্তব্যবিষয় হচ্ছে— হজরত নুহের পথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা বিফল হলো। অবাধ্য জনগোষ্ঠী তাঁকে ক্রমাগত দিয়েই চললো মিথ্যাচারিতার অপবাদ। দীর্ঘ দিন ধরে এ অবস্থা চলার পর আমার নির্দেশে শুরু হলো মহাপ্লাবন। ওই মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নুহকে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলাম আমি। সেই নৌকায় উঠে বসলো নুহ ও তার অনুগত উম্মতেরা। ভয়াবহ প্লাবনে নিমজ্জিত হলো সারা পৃথিবী। নুহের নৌকার আরোহীরা কেবল উদ্ধার পেলো। এভাবে আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং নিমজ্জিত করে দিলাম ওই সকল মানুষকে, যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

উল্লেখ্য যে, হজরত নুহের নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তাঁর চল্লিশজন বিশ্বাসবান ও চল্লিশজন বিশ্বাসবতী উম্মত। এক বর্ণনায় এসেছে, নৌকার আরোহী ছিলেন আটজন কিংবা দশজন পুরুষ ও নারী। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকার আরোহী ছিলেন হজরত নুহ সহ তাঁর তিনপুত্র— শাম, হাম, ইয়াফিস, তাঁদের তিন স্ত্রী অথবা তিন সন্তান এবং আরো ছয়জন ইমানদার মানুষ। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। আর তথ্যগত বৈসাদৃশ্যও রয়েছে সেগুলোতে।

শেষে বলা হয়েছে—'তারা ছিলো এক অন্ধ সম্প্রদায়'। এ কথার অর্থ— হজরত নুহের অবাধ্য সম্প্রদায় ছিলো অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই অন্তর্নিহিত দৃষ্টি অবাধ্যদের ছিলো না। এখানে 'কৃওমান আ'মীন' অর্থ অন্ধ সম্প্রদায়। আ'মীন শব্দটি 'আ'মইউন' শব্দের বহুবচন। শব্দটি আসলে ছিলো 'আ'ম্মিইয়্যিন'। সহজ উচ্চারণের তাগিদে শব্দটির একটি 'ইয়া' অক্ষর বাদ পড়েছে।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ
وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ
رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ۝

❒ আ'দ জাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না?'

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা তো দেখিতেছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

❒ সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসূল।'

❒ 'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।'

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আ'দ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠিয়েছিলাম।' আ'দ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন হজরত নুহ। তাদের বংশধারা এ রকম, আ'দ—আউস—এরম—সাম—নুহ। এখানে 'আখাহুম হুদান' অর্থ— তাদের সম্প্রদায়ভূত ভ্রাতা, ধর্মীয় ভ্রাতা নয়।

হজরত হূদের পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন রিয়াহ্। তাঁর পিতা ছিলেন খুলুদ। তাঁর পিতা ছিলেন আস এবং তাঁর পিতা ছিলেন আউস। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত হূদ ছিলেন শালেখ বিন আরফাখশায বিন সাম বিন হজরত নুহ এর পুত্র।

শায়েখ আবু বকর তাঁর শরহে খুলাসাতুসসায়ের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত হূদের আসল নাম ছিলো আবার, আবের, উবাইর অথবা গুবাইর। আর তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন শালেখ বিন কায়নান বিন আরফাখশায বিন হিশাম বিন নূহের পূর্বে। সকল বংশপরিচয় (নসবনামা) বিষয়ক গ্রন্থে এ রকমই বর্ণিত

হয়েছে। কিন্তু একটি বিরল বর্ণনায় এসেছে, হজরত হূদের বংশধারা এ রকম— হূদ—খালিদ—খুলুদ—আয়েস—আমালি—কআ'দ—আউস—এরেম—শাম— নুহ। হজরত হূদের মায়ের নাম ছিলো মাকআবাহ্ বিনতে উয়াইলাম বিন শাম বিন নুহ। হজরত হূদের ললাটে রসুল মোস্তফা স. এর নূর সমুদ্ভাসিত ছিলো। মানুষ ওই নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতো, এই ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করবে এবং মূর্তি ভেঙে দিবে। মানুষ তাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করতো। তাঁর পরলোক গমনের পর একশত বছরের মধ্যে আর কোনো নবী আসেননি। একশত বছর পরে এসেছিলেন হজরত সালেহ্। তখন রাজা প্রজা সকলেই সরে গিয়েছিলো একত্ববাদের পথ থেকে। কেউ হয়ে গিয়েছিলো মূর্তিপূজক, কেউ সূর্যপূজক, আবার কেউ অগ্নিপূজক। হজরত সালেহ্‌কে আল্লাহ্‌তায়ালা পাঠিয়েছিলেন সামুদ জাতিকে হেদায়েতের জন্য। হজরত হূদ ছিলেন হজরত নুহের শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পৃথিবীর আয়ু ছিলো চারশত বছর অথবা চারশত ষাট বছর। তাঁর মায়ের নাম ছিলো মারজানা। তাঁর পবিত্র সমাধি রয়েছে 'হাদ্বরা-মাউত' নামক স্থানে। কেউ কেউ বলেছেন মক্কায়। এই শেষ কথাটি শায়েখ আবু বকরের নিজস্ব অভিমত।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত হূদের পবিত্র সমাধি রয়েছে হাদ্বরা মাউতের লাল টিলায়।

হজরত আবদুর রহমান বিন সাবেতের বর্ণনায় রয়েছে, হাজরে আসওয়াদ, জমজম এবং মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থলে রয়েছে তিরানব্বই জন নবীর কবর। ওই কবরগুলোর মধ্যেই রয়েছেন হজরত হূদ, হজরত সালেহ্ এবং হজরত শোয়ায়েব। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের কোনো সম্প্রদায় সীমালংঘন করার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওই নবীগণ তাঁদের অনুগত উম্মতদেরকে নিয়ে চলে আসতেন মক্কায়। সেখানে পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সকলে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। ইন্তেকালের পর সেখানেই দাফন করা হতো তাঁদেরকে।

এখানে হজরত হূদকে বলা হয়েছে, 'তাদের ভ্রাতা'। ইবনে ইসহাক বলেছেন, এ কথার অর্থ— বংশগত ভ্রাতা। শায়েখ আবু বকর বলেছেন, হজরত হূদ ছিলেন 'আ'দ' জাতির সমকক্ষ বা সমগোত্রীয়। তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হজরত হূদকে পয়গম্বর নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তারা যেনো সহজেই তাদের নবীর কথা বুঝতে পারে এবং সহজে আকৃষ্ট হতে পারে সত্যধর্মের দিকে। ভিন্ন ভাষাভাষী কাউকে নবী করলে, সেই নবীর বক্তব্য তাদের নিকট সহজবোধ্য হতো না এবং তাদের মূর্খ নেতারা দুর্বোধ্যতার দোহাই দিয়ে জনতাকে সহজেই সত্যবিমুখ করে দিতে পারতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না'? এখানে 'ক্বলা ইয়া ক্বওমি' (সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়) সম্বোধনটি

একটি না সূচক সম্বোধন। তাই এখানে ফাক্বুলা বলা হয়নি। 'ইয়াত্তাক্বুন' (তারা কি সাবধান হবে না)। কথাটির কর্ম এখানে উহ্য। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— তারা কি সাবধান হবে না?

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা বলেছিলো, আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

হজরত হূদের সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ ইমান এনেছিলো। কেউ কেউ আনেনি। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা বলেছিলো'। হজরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই ইমান আনেনি। তাই ইতোপূর্বে (আয়াত ৬০) বলা হয়েছে 'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিলো।' এখানে 'ফি সাফাহাতিন' অর্থ নির্বুদ্ধিতা। অর্থাৎ হজরত হূদের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী প্রধানেরা তাঁকে বলেছিলো, 'আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ।' এ কথার অর্থ— হে হূদ! তুমি নির্বোধ। কারণ তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাচ্ছো। তারা আরো বলেছিলো—'এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।' এ কথার অর্থ— হে হূদ! তুমি তো একটি অসম্ভব দাবি করে বসেছো। মানুষ কি কখনো রসুল হয়? এ কথায় বুঝা যায়, অন্যান্য নবীদের অবাধ্য উম্মতদের মতো হজরত হূদের সম্প্রদায়ের অবাধ্য উম্মতেরাও মনে করতো, নবী ও রসুল হতে পারে কেবল ফেরেশতা, মানুষ নয়।

পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে—'সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল।'

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে—'আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।' এ কথার অর্থ— হজরত হূদ বললেন, হে আমার অবোধ সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত সত্য রসুল— বাণীবাহক। আমি আমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত সত্যবাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো যে, আমি তোমাদের প্রকৃত হিতাকাংখী— বিশ্বস্ত উপদেষ্টা।

কালাবী বলেছেন, হজরত হূদের আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে— হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের মধ্যেই বেড়ে উঠেছি। তোমরা ভালো করেই জানো মিথ্যাচারিতার লেশমাত্র আমার চরিত্রে নেই। আজ যখন আমি আল্লাহ্তায়ালার বাণীবাহকরূপে তোমাদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে নির্বুদ্ধিতা ও মিথ্যাচারিতার অভিযোগ আনছো কেনো?

উল্লেখ্য যে, সকল নবী ও রসুল এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চরম ভ্রান্ত ও নির্বোধ। কিন্তু ধৈর্য ও শিষ্টাচারের সঙ্গে তাঁরা বারংবার তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, আমাদেরকে তোমরা বিরুদ্ধবাদী মনে করো কেনো? তোমাদের প্রকৃত হিতাকাংখী তো আমরাই। তাঁদের এ রকম কথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও সহিষ্ণু। তাই শুভ সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁরা অবাধ্যদেরকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন সত্যপথের দিকে। অবাধ্যদের প্রতি কতোটুকু দয়ার্দ্র ও সহিষ্ণু হতে হবে, সেই নির্দেশনাটিই নিহিত রয়েছে আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত হজরত হূদের বক্তব্যের মধ্যে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ
جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا
اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ قَالَ قَدْ وَقَعَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوْٓا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

❒ তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের একজনের মাধ্যমে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।'

❒ তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদিগের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে আমরা যেন শুধু আল্লাহের ইবাদত করি এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ যাহার ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

❒ সে বলিল, 'তোমাদিগের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদিগের উপর নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করছেন, হে আদ সম্প্রদায়! তোমরা কি এ কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করবার জন্য উপদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে কীভাবে? এই উপদেশ তো অবতীর্ণ হচ্ছে তোমাদেরই উপকারের জন্য। এর মাধ্যমে তোমাদের নবী হূদ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছে— সতর্ক করছে। স্মরণ করো, নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে অধিকতর শারীরিক সৌষ্ঠব, শক্তিমত্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত এই বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এই নেয়ামতের। যদি এ রকম করো, তবে তোমরা হয়তো হবে সফলকাম।

এখানে 'বাস্ত্বাতান্' অর্থ দীর্ঘ ও বলশালী। কালাবী এবং সুদ্দী বলেছেন, সামুদ সম্প্রদায়ের দীর্ঘতম ব্যক্তির উচ্চতা ছিলো একশত হাত। আর হ্রস্বতম ব্যক্তির উচ্চতা ছিলো সত্তর হাত। আবু হামজা ইয়ামিনী বলেছেন, তাদের গড় উচ্চতা ছিলো সত্তর হাত। আশি হাতের কথা বলা হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায়। মুকাতিলের বর্ণনায় রয়েছে বারো হাতের কথা। ওয়াহাব বলেছেন, তাদের কোনো কোনো লোকের মস্তক ছিলো গম্বুজসদৃশ এবং চোখের কোটর, নাক ও কানের ছিদ্র ছিলো এতো বড় যে, ভোঁদড় জাতীয় প্রাণী সেখানে অনায়াসে তাদের শাবক প্রসব করতে পারতো।

আয়াতের শেষে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহরূপে প্রদত্ত অভূতপূর্ব শারীরিক সামর্থ্যের কথা স্মরণ করতে বলেছেন, যেনো এই স্মরণ হয় কৃতজ্ঞতার কারণ এবং কৃতজ্ঞতা যেনো কারণ হয় সফলতার। সে কারণে শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছে— সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

পরের আয়াতটির (৭০) মর্মার্থ হচ্ছে— অবাধ্যরা বললো, হে হূদ! তুমি কি আমাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছো যে, আমরা যেনো শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করি, আর পরিত্যাগ করি ওই সকল প্রতিমাগুলোকে যেগুলোর উপাসক ছিলো

আমাদের পূর্বপুরুষেরা। হে হূদ! তুমি তো আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাও। সুতরাং, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছো; তা সত্বর নিয়ে এসো।

এখানে 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে এসেছো' কথাটির অর্থ— হে হূদ! তুমি কি তবে অন্য কোনো স্থান থেকে অথবা আকাশ থেকে আমাদের কাছে নেমে এসেছো। 'আমাদের পূর্বপুরুষগণ যার ইবাদত করতো' অর্থ— আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল দেব-দেবীর উপাসনা করতো। এই আয়াতে উল্লেখিত অবাধ্যদের উক্তিসমূহ ছিলো হজরত হূদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও শ্লেষ। এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, হজরত হূদ তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তাই তাদের বক্তব্য ছিলো এ রকম শ্লেষাত্মক। চিরভ্রষ্ট ছিলো বলেই তারা ছিলো আল্লাহ্তায়ালার আযাব সম্পর্কে নির্ভয়। তাই তারা এ কথাও বলতে পেরেছিলো যে— সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার (যে আযাবের) ভয় দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের শেষটির (৭১) মর্মার্থ হচ্ছে— অবাধ্যদের অনড় অবিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে আল্লাহ্র নবী হজরত হূদ বললেন, হে অবাধ্য সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র আযাব কামনা করছো। কিন্তু তোমরা এ কথা জানো না যে, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। হে অবিমৃশ্য জনতা! তোমরা কি তোমাদের পথভ্রষ্ট পিতৃপুরুষদের স্বসৃষ্ট কতিপয় দেব-দেবীদের নাম সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও— যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার কোনো অনুমোদন মাত্র নেই? ঠিক আছে! নির্ধারিত সময়ের যে আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে, সেই আযাবের প্রতীক্ষায় তোমরা থাকো। আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষারত রইলাম।

এখানে 'ক্বদ ওয়াক্বয়া' অর্থ— শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর খুব শীঘ্রই আযাব নেমে আসবে। এর কোনো অন্যথা হবে না।

'রিজ্সুন' অর্থ আযাব। শব্দটি এসেছে, 'ইরতিজাস্' থেকে— যার অর্থ 'ইদ্বতিরাব্' (দুর্ভাবনা, বিরক্তি)। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, রিজ্সুন্ শব্দটি আসলে ছিলো 'রিজযুন'। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে রিজ্সুন এবং রিজযুন্ শব্দ দু'টোর অর্থ— হুঁশিয়ারী বা চিৎকার। 'গদ্বাবুন্' অর্থ প্রতিশোধ স্পৃহা। 'আসমায়ুন' অর্থ ওই সকল প্রতিমার নাম— যে সকল নাম দিয়েছিলো অংশীবাদীদের ধর্মগুরুরা। অথবা এখানে 'নাম' অর্থ ওই সকল প্রতিমার নাম যা সম্পূর্ণতই কল্পনানির্ভর ও অপ্রয়োজনীয়। যেমন গ্রীক দার্শনিকেরা নাম দিয়েছে

উকুলে আশারা (দশটি জ্ঞান)। হিন্দুরা নাম দিয়েছে দেবী, ভগবতী ইত্যাদি। তাদের ধারণা ওই সকল প্রতিমার মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা অনুপ্রবিষ্ট হন।

'সুলতান' অর্থ এখানে দলিল বা প্রমাণ— যা ওই সকল বাতিল উপাস্যকে উপাস্য বলে প্রমাণ করে। অংশীবাদীরাও আল্লাহ্তায়ালাকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলে মানে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ ইবাদতের সঙ্গে তারা তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকেও অংশ দান করে। তারা মনে করে প্রতিমাগুলো আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তাদের এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। আর তাদের ধারণার পক্ষে কোনো জ্ঞানগত কিংবা বিশ্বস্ত বর্ণনাগত কোনো দলিলও নেই। তাদের অবিশুদ্ধ ধারণার সূত্র হচ্ছে তাদেরই পিতৃপুরুষদের মনগড়া অপবিশ্বাস। হজরত হূদও এ কথাই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং শেষে বলেছিলেন, আমি যে আযাবের কথা তোমাদেরকে জানিয়েছি, সেই আযাব আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো। আমিও অপেক্ষায় রইলাম।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ৭২

فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

❒ অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা বিশ্বাসী ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা যে আযাব কামনা করছিলো, সেই আযাব যখন এসে পড়লো, তখন আমি হূদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং যারা ইমানদার ছিলো না তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিলাম।

এখানে 'দাবীরুন' অর্থ মূল। এই শব্দটির মাধ্যমে এখানে অবিশ্বাসীদেরকে নির্মূল করার কথা বলা হয়েছে— যেমন ফুল ও ফলসহ সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করা হয় কোনো বৃক্ষের, সেভাবেই আল্লাহ্পাক মূলোৎপাটন করেছিলেন অবিশ্বাসীদেরকে।

'ওয়ামাকানু মু'মিনীন' অর্থ— এবং তারা বিশ্বাসী ছিলো না। অর্থাৎ নির্মূল করা হয়েছিলো কেবল অবিশ্বাসীদেরকে। বিশ্বাসীরা ছিলো নিরাপদ। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, পরিত্রাণ লাভের কারণ হচ্ছে বিশ্বাস। আর অবিশ্বাস ধ্বংসের কারণ।

আ'দ সম্প্রদায়ের কাহিনীঃ মোহাম্মদ বিন ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, 'আহ্কাফ' বা আম্মান এবং 'হাদ্বরা'মাউত' এর মধ্যবর্তী মরুভূমি এলাকায় ছিলো আ'দ সম্প্রদায়ের বসবাস। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী ও বলবান। শারীরিক শক্তিমত্তার কারণে তারা হয়ে উঠেছিলো অহংকারী। অন্য সম্প্রদায়গুলির উপর তারা চালাতো অত্যাচার। ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখতো সকলকে। প্রতিমাপূজারী ছিলো তারা। পূজা করতো তিনটি প্রতিমার— সদা, সমুদ এবং হিবা। আল্লাহ্তায়ালা তাদের বংশের হূদ নামক এক ব্যক্তিকে নবুয়ত দান করলেন। বংশমর্যাদার দিক থেকে হজরত হূদ অত্যুন্নত না হলেও চরিত্রগত দিক থেকে ছিলেন সর্বাধিক উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন তৌহিদের দিকে। আরো বললেন, খবরদার! কারো প্রতি অত্যাচার কোরো না। কিন্তু তাঁর এই সরল ও পবিত্র আহ্বানে সাড়া দিলো না তাঁর সম্প্রদায়। উপরন্তু বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। আর আমরা হচ্ছি এক শক্তিমান সম্প্রদায়। আমাদের সমকক্ষ কে? আ'দ সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতো এবং সেগুলোকে জবর দখল করে রাখতো। অবাধ্যতার জন্য তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন আল্লাহ্পাক। পরপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হলো। চরম দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলো মানুষ। সে যুগের নিয়ম ছিলো— বিপদ মুসিবত দেখলে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, অংশীবাদী সকলেই কাবা গৃহের চত্বরে উপস্থিত হয়ে বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতো। ওই সময় মক্কায় বসবাস করতো আমালিকা। অর্থাৎ আমালিক বিন লাদের বিন শাম বিন নুহের বংশধরেরা। তাদের সর্দার ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকর। মুয়াবিয়ার মা কাল্হিদা বিনতেল খাইর ছিলো আদ কুলোদ্ভবা। তাই আদ সম্প্রদায় ছিলো মুয়াবিয়া বিন বকরের মাতুলকুল। তাঁর মাতুল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো কায়েল বিন উনায, ইয়াকিম বিন হাযাল বিন হুযায়েল, আতিল বিন যাদ বিন বড় আদ এবং মুরসাদ বিন সা'দ বিন আফীর। ফাবিয়া বিন বকরের মাতুল জাইসুমাহ্ বিন কুসাইর। প্রত্যেকেই গোত্রের কিছু কিছু লোক নিয়ে চলে গেলেন মক্কায়। এরপর কিছু অনুসারী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন লোকমান বিন ছোট আদ বিন বড় আদ প্রমুখ। তাদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ালো সত্তরে। মুয়াবিয়া বিন বকরের আতিথ্যে সেখানে তারা অবস্থান করলো মাসাধিককাল। তারা প্রতিদিন মদ্যপান করতো এবং মুয়াবিয়া বিন বকরের দু'টি সুন্দরী ও সুকণ্ঠী ক্রীতদাসীর গান শুনতো। ওই বাঁদী দু'জনকে একত্রে বলা হতো জাররাদাতাইন। এভাবে কেটে গেলো আরো এক মাস। মুয়াবিয়া বিন বকর বললো, আমার মামাবাড়ীর লোকেরা খরা ও দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হতে চলেছে। তাদের বিপদমুক্তির জন্য এরা এসেছে মক্কায়। তারপর আসল কথা ভুলে মত্ত হয়েছে নৃত্যগীত ও মদ্যপানে। এরা আমার অতিথি। তাই তাদেরকে

চলে যাওয়ার কথাও বলতে পারি না। কী করবো? যদি কিছু বলি তবে তারা বলবে, আমি মেহমানদারী করতে অনিচ্ছুক। ওদিকে আমার মাতৃকুলের আত্মীয়েরা মরতে বসেছে। এ রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে উপায়ন্তর না দেখে তাঁর বাঁদীদের কাছে পরামর্শ চাইলো মুয়াবিয়া বিন বকর। বাঁদীদ্বয় বললো, আপনি এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করুন। আমরা তা মেহমানদের মজলিশে সঙ্গীতাকারে গাইবো। আমাদের সুরেলা আবৃত্তি শুনে নিশ্চয় তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আর তারা বুঝতেও পারবে না যে, কবিতা রচনা করেছে কে? পরামর্শটি মনঃপুত হলো মুয়াবিয়ার। সে তখন একটি কবিতা রচনা করলো, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ—

কায়েল, হে কায়েল এবং হাইছুম! ওঠো। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ বৃষ্টির দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবেন। খরাতপ্ত আদ সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে তৃষ্ণার্ত। তাদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। বয়োবৃদ্ধরা মরোনোন্মুখ। ললনাকুল ছিলো ধৈর্যধারনকারিণী। কিন্তু তারাও এখন ছটফট করছে পিপাসায়। দুর্ভাগা আদ সম্প্রদায়কে ভক্ষণের জন্য যেনো হিংস্রপ্রাণীকুল আক্রমণোদ্যত। দুঃখের অকূল পাথারে দিশাহীন তারা। আর তোমরা এদিকে মদ-মত্ত আনন্দমগ্ন। হে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ! ধিক তোমাদেরকে। তোমাদের কপালে নেই নিরাপত্তা এবং শুভবার্তা।

সুন্দরী ক্রীতদাসীদের উপরে বর্ণিত কবিতার সাংগিতিক আবৃত্তি শুনে অতিথিরা একজন আরেকজনকে বলতে শুরু করলো, দেখেছো! কী বেভুল আমরা। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছে এ মক্কায়। আর এদিকে আমরা সব ভুলে বসে আছি। চলো, চলো। এক্ষুণি চলো কাবা গৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা শুরু করি। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইমানদার। কিন্তু তাঁর সাথীরা তা জানতো না। হজরত হুদের সত্য আহ্বানকে স্বীকার করেছিলেন তিনি। তাঁর নাম মুরছাদ বিন মাসউদ বিন আফীর। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দোয়ায় বৃষ্টি হবে না। তোমাদের দোয়া কবুল হবে তখনই, যখন তোমরা হবে নবী হুদের অনুগত এবং অংশীবাদীতা থেকে বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী। এরপর মুরছাদ ঘোষণা করলেন, আমি ইমানদার। এ কথা বলার পর তিনি আবৃত্তি করলেন কয়েকটি ছন্দবদ্ধ কবিতা, যেগুলোর মর্মার্থ নিম্নরূপ—

আদ সম্প্রদায় তাদের নবীর আদেশ লংঘন করেছে। তাই তারা আজ খরাপীড়িত, পিপাসিত। আকাশ তাদের প্রতি এক বিন্দু পানিও বর্ষণ করেনি। সমুদ্ নামক এক প্রতিমার উপাসক তারা। তার সঙ্গে আরো দু'টো প্রতিমা রয়েছে

তাদের। সে দু'টোর নাম— সদা ও হাবা। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। তিনি আমাদেরই হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন সত্য রসুল। তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা সন্ধান পেতে পারি সরল সত্য পথের। আমাদের অন্ধত্ব দূর হতে পারে কেবল তাঁরই আনুগত্যের মাধ্যমে। আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি, হজরত হুদের উপাস্যই আমার উপাস্য। সে-ই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপাস্য আল্লাহ্‌তায়ালাই আমার একমাত্র নির্ভর। আমি তাঁরই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা করি।

আদ সম্প্রদায়ের অতিথিদল মুয়াবিয়া বিন বকরকে বললো, মুরছাদকে ঠেকাও। সে যেনো আমাদের সঙ্গে কাবা চত্বরে না যেতে পারে। কিন্তু মুরছাদ তাদের আগেই কাবাগৃহের চত্বরে গিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন। একটু পরে অন্যান্যরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে পৃথক অবস্থান গ্রহণ করে বৃষ্টি প্রার্থনা শুরু করলো। মুরছাদ তাঁর একক নিবেদনে জানালেন, হে আমার আল্লাহ্‌! বিশ্বাসীদের মধ্যে এখানে আমি একা। তুমি আমার দোয়া কবুল করো। আমার অবিশ্বাসী সাথীদের অন্তর্ভুক্ত আমাকে কোরো না।

অবিশ্বাসীদের দলনেতা ছিলো কায়েল বিন উনায। তার দলের লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌! কায়েলের দোয়া কবুল করো। তার সঙ্গে আমাদের আবেদনও মঞ্জুর করে নাও।

অবিশ্বাসীদের আরেক নেতা ছিলো লোকমান বিন আদ। তাদের সম্মিলিত দোয়া শেষ হওয়ার পর সে পৃথক স্থানে গিয়ে এই বলে দোয়া শুরু করলো, হে আমার প্রভু! আমি তোমার সকাশে এবার আমার একক নিবেদন পেশ করছি। তুমি আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও। তার ওই দোয়া কবুল হয়েছিলো। দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলো সে।

কায়েল বিন উনাযও তার একক প্রার্থনায় জানালো, হে প্রভু! হুদ যদি সত্য পয়গম্বর হয় তাহলে আমাকে অনাবৃষ্টির আযাব থেকে রক্ষা করো। বৃষ্টিবিহীন জীবন তো আমাকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। এ রকম প্রার্থনা করার ফলে আকাশে দেখা দিলো তিন রঙের মেঘ— শাদা, লাল ও কালো। ওই মেঘকুণ্ডলী থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— হে কায়েল! তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য এই তিন রঙের মেঘের মধ্যে যে কোনো এক রঙের মেঘ নির্বাচন করো। কায়েল বললো, আমি কালো মেঘকে পছন্দ করলাম। কারণ ঘন কালো মেঘ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হয়। মেঘ থেকে পুনরায় আওয়াজ ভেসে

এলো— তুমি পছন্দ করেছো ধ্বংসকে। আদ সম্প্রদায়ের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। এই ঘোষণার পর পর ভয়াবহ ঘন কালো মেঘপুঞ্জ উড়ে চললো আদ সম্প্রদায়ের বসতির দিকে।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো আদ সম্প্রদায়। বললো, এই মেঘ নিশ্চয় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু নেপথ্যে ঘোষিত হলো, কক্ষনো নয়। এটি হচ্ছে সেই আযাব, যার প্রার্থী তোমরা হয়েছিলে। এটি হচ্ছে মর্মন্তুদ শাস্তি সম্বলিত একটি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা। এই ঘূর্ণিঝড় তোমাদের সকল কিছুর ধ্বংস সাধন করবে।

শুরু হলো সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রভঞ্জন। নির্মম আযাব। ঝড়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে সর্বপ্রথম বেহুঁশ হয়ে গেলো মিহ্দার নামক এক রমণী। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কী দেখেছো তুমি? সে বললো, বিকটদর্শন লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের মতো প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়। বিশাল আকৃতির কিছু লোক সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। এরপর শুরু হলো অভূতপূর্ব সেই প্রলয়ঙ্করী পবন। সাত রাত আট দিন ধরে বয়ে চললো সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়। সেই তুফানে মৃত্যুমুখে পতিত হলো আদ সম্প্রদায়ের সকল সদস্য। সেই ভয়ঙ্কর তুফানের মধ্যেও হজরত হুদ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা রইলেন পূর্ণ নিরাপদ। তাঁদের সমাবেশস্থলে বয়ে যাচ্ছিলো মৃদুমন্দ সমীরণ। তাঁদের এলাকার বাইরে সবকিছু হয়ে যাচ্ছিলো তছ্নছ্। বিক্ষিপ্ত বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো উটের পিঠের বোঝা। আবার তা আছড়ে পড়ছিলো সেগুলোর উপর। বাতাস কখনো সকলকে উঠিয়ে নিচ্ছিলো আসমানে। আবার সকলকে সজোরে আছাড় দিচ্ছিলো পাথরের উপর।

ওদিকে আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদল তখন অবস্থান করছিলো তাদের মেজবান মুয়াবিয়া বিন বকরের বাড়িতে। ঝড়ের তৃতীয় দিনে এক চাঁদনী রাতে আদ সম্প্রদায়ের এক উষ্ট্রারোহী মক্কায় অবস্থানরত তাদের প্রতিনিধি দলের নিকট উপস্থিত হলো। উষ্ট্রারোহী ব্যক্তিটি তাদেরকে জানালো, মহাসর্বনাশ শুরু হয়েছে। মনে হয় আদ সম্প্রদায়ের আর কেউই অবশিষ্ট নেই। প্রতিনিধিদল তার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলো না। তারা বললো, বলো কী? তুমি যখন রওয়ানা হয়েছিলে তখন হুদ ও তার সঙ্গীদেরকে কোথায় দেখেছো? সে বললো, আমি তাদেরকে দেখে এসেছি নিরাপদ সমুদ্র উপকূলে। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হারমিলা বিনতে বকর বললো, কাবার প্রভুর কসম! এ লোক সত্য কথা বলেছে।

বর্ণনাকারীগণ উল্লেখ করেছেন, মুরছাদ্ বিন সা'দ, লোকমান বিন আ'দ এবং কায়েল বিন উনাযের দোয়া কবুল হওয়ার প্রাক্কালে তাদেরকে বলে দেয়া

হয়েছিলো যে, তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। এখন তোমরা বলো, কে কি চাও? জেনে রেখো, তোমরা কেউই চিরদিন বেঁচে থাকতে পারবে না। মৃত্যু তোমাদের হবেই হবে। মুরছাদ দোয়া করলো, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাকে সততা ও পুণ্য দান করো। তাঁর প্রার্থনা কবুল করা হলো। লোকমান দোয়া করলো, হে প্রভু! আমার আয়ু বাড়িয়ে দাও। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কতো বছর বাঁচতে চাও তুমি? লোকমান বললো, সাতটি শকুন যতদিন বাঁচে ততদিন। তার দোয়া কবুল করা হলো। পরবর্তী সময়ে লোকমান নিয়ম করে নিয়েছিলো এ রকম— ডিম থেকে সদ্য বহির্গত পুরুষ শকুনের বাচ্চা প্রতিপালন করতো সে। পরিণত বয়সে ওই শকুন মরে গেলে সে পুনরায় আরেকটি শকুন শাবক পুষতে শুরু করতো। এভাবে একে একে সাতটি শকুন শাবক পুষেছিলো সে। প্রতিটি শকুন শাবক বেঁচে ছিলো আশি বছর ধরে। একে একে সেগুলো মরে যাওয়ার পর লোকমান ঢলে পড়েছিলো মৃত্যুর কোলে। তার সর্বশেষ শকুনটির নাম ছিলো লুবাত্।

কায়েলেরও দোয়া কবুল হয়েছিলো। সে বলেছিলো, হে প্রভু! আমার সম্প্রদায়ের লোকদের যে পরিণতি হয় আমি চাই সেই পরিণতি। তাকে বলা হয়েছিলো, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ধ্বংস হতে চলেছে। সে বলেছিলো, তাহলে আমার জীবিত থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই। তার এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে তাকেও গ্রাস করেছিলো ঝঞ্ঝাতুফানের ওই ভয়ংকর আযাব।

সুদ্দী বলেছেন, ঘন কৃষ্ণ মেঘ থেকে আদ সম্প্রদায়ের উপর নেমে এসেছিলো ভয়াবহ তুফানের আওয়াজ। তারা যখন দেখলো বোঝা বহনকারী উটের পালকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, তখন ভয়ে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো আপনাপন গৃহে। সকল দরজা অর্গলাবদ্ধ করে দিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু এতে করেও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। ঘর দরজাসহ সকলকে ধ্বংস করে ফেলা হলো। পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো তাদের মরদেহ। এরপর আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন কালো রঙের পাখির এক বিশাল ঝাঁক। ওই পাখিরা তাদের মরদেহগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে।

এক বর্ণনায় এসেছে, ওই ভয়াবহ তুফান ওলটপালট করে দিলো আদ সম্প্রদায়ের সমগ্র জনপদ। সাত রাত আট দিনের সেই ভয়ংকর বালুঝড় বালির মধ্যে প্রোথিত করলো তাদেরকে। বিক্ষিপ্ত বালুকারাশির মধ্য থেকে উত্থিত হচ্ছিলো তাদের আর্তচিৎকার। তারপর সেই ভয়াবহ ঝড় বালুকারাশিসহ তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলো সাগরে। ওই দিন ঝড়ো বাতাস ছিলো সর্বাপেক্ষা তীব্র গতিসম্পন্ন। সেই বিক্ষিপ্ত তীব্র গতির পরিমাপ করার সাধ্য ছিলো না কারো।

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۘ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ
جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَ
تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ○

❒ সামূদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমার নিকট তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। এই আল্লাহের উষ্ট্রী তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহের জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।'

❒ স্মরণ কর, আ'দ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং আল্লাহের অনুগ্রহ স্মরণ কর, এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।

❒ তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল-বিশ্বাসীদিগকে বলিল, 'তোমরা কি জান যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত?' তাহারা বলিল, 'তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।'

❒ দাম্ভিকেরা বলিল, 'তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ছামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম'। এখানে 'তাদের ভ্রাতা' অর্থ তাদের ধর্মীয় ভ্রাতা নয়। অর্থাৎ হজরত সালেহ্ সামুদ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের সঙ্গে সম্প্রদায়গত বা বংশগতভাবে সম্পর্কিত। ওই সম্প্রদায় ছিলো খরা-পীড়িত। বৃষ্টিহীনতা দেখা দেয়ার কারণেই গোত্রটির নাম হয়েছিলো ছামুদ। যেমন 'ছামাদুল মাআ' শব্দটির অর্থ পানি হ্রাস পেয়েছে। ছামুদ সম্প্রদায় বসবাস করতো হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাদের জনপদ বিস্তৃত ছিলো কোরা উপত্যকা পর্যন্ত। হজরত সালেহের পিতা ছিলেন উবাইদ এবং পিতামহ ছিলেন আসাব বিন মাসেহ্। অথবা তিনি ছিলেন রিবাহ্ বিন উবাইদ বিন হাযের বিন ছামুদের পুত্র।

হজরত সালেহ্ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি। অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে যিনি এনেছিলেন একটি উষ্ট্রী। এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য এবং ওই অলৌকিক উষ্ট্রীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে কথাই বলা হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে।

বলা হয়েছে— সে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ্ নেই। তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালক থেকে স্পষ্ট নির্দশন এসেছে। এই আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিতে চরে খেতে দাও এবং একে কোনো ক্লেশ দিয়ো না, দিলে ব্যথাদায়ক শাস্তি তোমাদের প্রতি আপতিত হবে। এখানে 'বাইয়েনাত' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট দলিল বা মোজেজা। 'হাজিহি নাক্বাতুল্লহ্' অর্থ— এই আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী। এ কথায় বুঝা যায় ওই উষ্ট্রীটি ছিলো একটি অসাধারণ ও অলৌকিক উষ্ট্রী। তাই ওই উষ্ট্রীকে আয়াতে বলা হয়েছে স্পষ্ট নির্দশন বা মোজেজা। ওই অলৌকিক উষ্ট্রীকে সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে এভাবে— উষ্ট্রীটিকে যথেচ্ছ চরে খেতে দিতে হবে। সকল জমিন তার জন্য করতে হবে অবারিত। উষ্ট্রীটিকে কোনো ক্লেশ দেয়া চলবে না। ক্লেশ দিলে নেমে আসবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিও না।' এখানে 'বাওয়াআকুম' অর্থ— আশ্রয় দিয়েছেন। 'ফিল আরদ্বি' অর্থ— পৃথিবীতে। 'তাত্তাখিজুনা' অর্থ— নির্মাণ করো। 'মিন সুহুলিহা'

অর্থ— সমতল ভূমিতে। এখানে মিন (মধ্যে) শব্দটির অর্থ হবে (তে)। 'তাই সমতল ভূমির মধ্যে' না বলে এখানে বলা হয়েছে 'সমতল ভূমিতে'। কথাটি 'সমতল ভূমিতে' না হয়ে 'নরম ভূমিতে'ও বলা যেতে পারতো। কারণ কোমল মৃত্তিকায় কাঁচাপাকা ইট দ্বারা আরামদায়ক গৃহ নির্মাণ করতে অভ্যস্থ ছিলো ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা।

'তান্হিতুনা' অর্থ— পাহাড় কেটে কেটে। 'বুয়্যূতান' অর্থ গৃহ নির্মাণ করতো। অর্থাৎ ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা পর্বতগাত্রের পাথর খোদাই করে নির্মাণ করতো বাসোপযোগী গৃহ। উল্লেখ্য, ছামুদ সম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে বসবাস করতো সমভূমিতে, কাঁচাপাকা ইট নির্মিত গৃহে। আর শীতকালে বসবাস করতো পর্বতগাত্রে নির্মিত পাথরের ঘরে।

এর পরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা দুর্বল বিশ্বাসীদের বললো, তোমরা কি জানো যে সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বললো, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' এখানে 'আল্লাজীনাস্ তাকবারু' অর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি বা নেতারা। ছামুদ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতারা ছিলো হজরত সালেহের প্রতি বিদ্বেষী। হজরত সালেহের আনুগত্যকে তারা মনে করতো অপমানজনক। তাই সত্যধর্মের আহ্বানের প্রতি তারা প্রকাশ করতো স্পষ্ট অবজ্ঞা।

'আল্লাজীনাস তুদ্বই'ফু' অর্থ— দুর্বল ও অভাবগ্রস্ত। অবিশ্বাসী গোত্র প্রধানেরা বিদ্রূপবশতঃ তাদেরকে বলতো, 'আল্লাজীনাস তুদ্বই'ফু লিমান আমানা' (দুর্বল বিশ্বাসীরা)। অর্থাৎ হজরত সালেহের বিশ্বাসভাজন উম্মতেরা ছিলেন বিত্তবিবর্জিত এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন। দাম্ভিক প্রধানদের প্রশ্নটি ছিলো এ রকম— তোমরা কি নিশ্চিত যে, সালেহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? ইমানদারেরা এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'হাঁ' বলে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এ রকম সংক্ষিপ্ত উত্তর না দিয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মনোভাব। বলেছেন, 'তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।' এমতো জবাবের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা এ কথাই বলতে চেয়েছেন, হজরত সালেহের নবুয়ত একটি চরম সত্য যার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। যার জ্ঞান আছে সে হজরত সালেহেকে বিশ্বাস না করেই পারে না।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে—'দাম্ভিকেরা বললো, তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' সত্যের আহ্বানকে এভাবেই অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো ছামুদ সম্প্রদায়ের গর্বোন্মত্ত নেতারা। এর সমুচিত প্রতিফলও তারা পেয়েছিলো। সে বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াত সমূহে।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

❒ অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহের আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালেহ্! তুমি রসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

❒ অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালেহ্! তুমি রসুল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আনো।' এখানে আ'ক্বারু অর্থ— তারা হত্যা করলো। আজহারী বলেছেন, 'আক্বারু' অর্থ— উটের কুঁজ কর্তন করা। আসল অর্থ জবাই করা। পলাতক উটকে ধরে এনে প্রথমে কেটে দেয়া হয় তার কুঁজ। এভাবে প্রথমে দুর্বল করে নিয়ে জবাই করা হয় তাকে।

কামুস গ্রন্থে আ'ক্বর অর্থ— আহত করা, উট ও ঘোড়ার পায়ের গোড়ালীতে আঘাত হানা। সিহাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, আ'ক্বরাদ্ দার অর্থ— মূল অবস্থান বা গৃহ। আ'ক্বরাল হাউদ্বি অর্থ— মূল চৌবাচ্চা। আ'ক্বারাতু নাখলা অর্থ— আমি খেজুর গাছটি শিকড় থেকে কেটে দিয়েছি। আর 'আ'ক্বারাতুল বায়ির অর্থ— আমি উটকে নহর (জবাই) করে দিয়েছি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'তারা সেই উষ্ট্রী বধ করে'। অলৌকিক উষ্ট্রী বধের মতো জঘন্য পাপ কর্মটির সমর্থক ছিলো সকল অবাধ্য জনতা। তাই ওই উষ্ট্রের ঘাতক হিসেবে এখানে সকলকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে— পবিত্র উটটিকে বধ করেছিলো অবাধ্য জনতার সমর্থনপুষ্ট কাজার বিন সালেফ। মহাপ্রতারক ওই লোকটি আকৃতি ও প্রকৃতিতে ছিলো ফেরাউনের মতো লোহিতাভ ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট।

রসুল স. একবার হজরত আলীকে বলেছিলেন, অতীত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে নবী সালেহের উটের হন্তারক এবং ভবিষ্যতের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তিটিই হবে তোমার হন্তারক।

'ওয়া আ'তাও আ'ন আমরি রব্বিহিম' কথাটির অর্থ— এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে। এখানে আ'তাও শব্দটির অর্থ— চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘন। আ'তী, ই'য়াতু, উ'তু— শব্দত্রয়ের অর্থ সীমালংঘন, অবাধ্যতা, ভ্রান্তি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, উ'তুওয়ান, উ'ত্‌ওয়ান্‌, ই'ত্‌ইয়ান্‌— এই তিনটিই শব্দমূল। শব্দগুলো সমার্থক। চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘনকে বুঝানো হয় এই শব্দগুলোর মাধ্যমে।

অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় ছিলো প্রকৃতই চূড়ান্ত পর্যায়ের সীমালংঘনকারী। তাই তারা পবিত্র উষ্ট্রীটিকে বধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। উপরন্তু দম্ভ প্রকাশ করেছে এভাবে— হে সালেহ্‌! তুমি রসুল হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো তা আনয়ন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রার্থিত আযাব এসেই পড়লো। পরের আয়াতে (৭৮) সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে—'অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।'

এখানে 'আর্‌রজফাতু' অর্থ— ভূমিকম্প। 'দারিহিম' অর্থ— আপন বসবাসে বা নিজ গৃহে। 'জাছ্বিমিন্‌' অর্থ— শেষ হয়ে গেলো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ সত্যদ্রোহী ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে যেভাবে বসেছিলো সেভাবেই মরে গিয়েছিলো। কথা বলা বা নড়াচড়ার অবকাশ তারা পায়নি। অর্থাৎ বিকট আওয়াজে যখন ভূমিকম্প হলো, তখনই যে যেভাবে ছিলো, সেভাবেই সাবাড় হয়ে গেলো সত্য-বিদ্বেষী ছামুদ সম্প্রদায়।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৭৯

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ○

❒ তৎপর সে তাহাদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেষ্টাদিগকে পছন্দ কর না।'

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ছামুদ জনপদে পড়ে ছিলো অবাধ্যদের হাজার হাজার লাশ। সত্যপ্রত্যাখ্যানের এই ভয়ানক পরিণতি দেখে হজরত সালেহ্‌ তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে বললেন— হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার

প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো উপদেশদাতাদেরকে পছন্দ করো না।

একটি প্রশ্নঃ ভূমিকম্পে উৎসন্ন হয়েছিলো গোটা জনপদ। সেক্ষেত্রে হজরত সালেহ্ আ. কীভাবে মৃতদেরকে সম্বোধন করলেন?

উত্তরঃ রসুলপাক স.ও মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছিলেন। বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশ ফেলে রাখা হয়েছিলো একটি গর্তে। ওই লাশের স্তূপকে লক্ষ্য করে কথা বলেছিলেন রসুলপাক স. স্বয়ং। বোখারী ও মুসলিমে হজরত আবু তালহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, বদর যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে রসুল স. তাঁর উটের চালককে উট সজ্জিত করতে বললেন। কিন্তু উটে না চড়ে সাহাবীগণকে নিয়ে তিনি পদব্রজে চললেন পরিত্যক্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। সাহাবীগণ তখনও জানতেন না, কোথায় চলেছেন তাঁদের প্রিয় রসুল। রসুল স. উপস্থিত হলেন ওই গর্তটির পাড়ে। তারপর উচ্চস্বরে বললেন, হে আবু জেহেল বিন হিশাম, হে উমাইয়া বিন খালফ, হে উতবা বিন রবীয়া, হে শায়বা বিন রবীয়া! কতই না উত্তম হতো যদি তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে মান্য করতে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তোমরা এখন অবহিত হয়েছো কি? আমি তো আল্লাহ্পাককৃত সকল অঙ্গীকারকেই সত্য হিসেবে প্রত্যক্ষগোচর করেছি। হে অবিশ্বাসীর দল! তোমরা তোমাদের নবীর স্বসম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও সর্ব নিকৃষ্ট। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো। আর অন্যেরা আমাকে সত্য বলে জেনেছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো— অথচ অন্যেরা হয়েছে আমার সুহৃদ ও সহায়ক। হে নিকৃষ্ট গোত্র! আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন। আমি ছিলাম বিশ্বাসভাজন (আমিন), অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করোনি। সত্যবাদী ছিলাম আমি। তৎসত্ত্বেও তোমরা মিথ্যাশ্রয়ী মনে করেছো আমাকে। রসুল স. এর কথা শেষ হলে হজরত ওমর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! মৃত্যুর তিনদিন পর আপনি তাদেরকে ডেকে আপনার কথা শোনাচ্ছেন। তারা তো মৃত। তারা কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে? রসুল স. বললেন, নিশ্চয়। তোমাদের চেয়ে অধিক স্পষ্ট করে তারা শুনছে আমার কথা। কিন্তু উত্তর দেয়ার অধিকার তাদের নেই।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জীবিত ও অনাগত মানবতাকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যেই হজরত সালেহ্ মৃত ছামুদ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ওরকম করে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে আয়াতের বর্ণনা বিন্যাসের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেছে। সঠিক বিন্যাসটি হতে পারতো এ

রকম—'অতঃপর হজরত সালেহ বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন। বললেন, হে আমার স্বজাতি! আমি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছি আমার পালনকর্তার বার্তা। আর আমি সদুপদেশ দিয়েছি তোমাদেরকে। বাস্তবে তোমরা উপদেশ দাতাকে পছন্দও করোনি!' এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর—'অতঃপর ভূমিকম্প আঘাত হানলো তাদেরকে, তারা স্বীয় আবাসে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো' আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো।

ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনীঃ হজরত আমর বিন খারেজা থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ওহাব বিন মুনাব্বাহ্, ইবনে জারীর এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো ছামুদ জাতি। তারা ছিলো দীর্ঘদেহী এবং দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন। তারা কাঁচা পাকা ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী করতো। সেগুলো এক সময় ধ্বংস হয়ে যেতো, অথচ তারা বেঁচে থাকতো। এতোই দীর্ঘ ছিলো তাদের আয়ুষ্কাল। তাই তারা পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে ঘর বানাতো। তারা ছিলো আপাদমস্তক পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন। ছিলো অনাচারী ও লুণ্ঠনকারী। তাদের হেদায়েতের জন্য তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন নবী সালেহ্। তিনি ছিলেন আরব গোত্রভূত। বংশগত মর্যাদার দিক থেকে মধ্যম স্তরের হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। রেসালতের দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন যৌবনকালে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্ম প্রচারের পুরো দায়িত্ব বহন করেছিলেন তিনি। এভাবেই তিনি উপনীত হলেন বার্ধক্যে। কিন্তু তখনও তাঁর বিশ্বাসী উম্মতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তাছাড়া তারা ছিলো দরিদ্র ও প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন। কিন্তু নবী সালেহ্ সমান উদ্যমে তখনও জানিয়ে চলেছিলেন সত্যধর্মের আহ্বান। অবাধ্যদেরকে তিনি প্রদর্শন করতে লাগলেন আল্লাহ্তায়ালার আযাবের ভয়। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা একদিন বললো, হে সালেহ্! তোমার নবুয়তের পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করো। হজরত সালেহ্ বললেন, কী প্রমাণ চাও? তারা বললো, আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের মেলায় চলো। পরদিন ছিলো তাদের বাৎসরিক উৎসবের দিন। বিরাট মেলা বসতো ওই দিন। ওই দিন তারা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হলো মেলায়। তারা বললো, মেলায় গিয়ে তুমি তোমার মাবুদের নিকট প্রার্থনা কোরো। আর আমরা প্রার্থনা করবো আমাদের মাবুদের নিকট। যদি তোমার প্রার্থনা কবুল হয়, তবে আমরা হয়ে যাবো তোমার অনুগত। আর আমাদের প্রার্থনা গৃহীত হলে, আমাদের আনুগত্য করতে হবে তোমাকে। নবী সালেহ্ তাদের কথা মেনে নিলেন। পরদিন মেলায় গিয়ে মূর্তিপূজকেরা তাদের প্রতিমাগুলোর নিকট প্রার্থনা করলো— সালেহের প্রার্থনা যেনো গৃহীত না হয়।

তাদের নেতা জানদা বিন আমর বিন জাও বললো, হে সালেহ্! ওই প্রস্তরখণ্ডটি থেকে পূর্ণ গর্ভবতী ঘন পশমবিশিষ্ট একটি উটনীকে যদি তুমি বের করে নিয়ে আসতে পারো, তবে আমরা তোমাকে সত্য পয়গম্বর বলে মেনে নিবো। পয়গম্বর সালেহ্ তাদের সকলকে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ করালেন। সকলে স্বীকার করলো, প্রার্থিত মোজেজা প্রকাশিত হলে আমরা হয়ে যাবো ইমানদার।

পয়গম্বর সালেহ্ দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। তারপর প্রার্থনা পেশ করলেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে। হঠাৎ একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে সন্তান প্রসবিনী উটের আওয়াজের মতো আওয়াজ বের হতে শুরু করলো। একটু পরে পাথরটি গেলো ফেটে, ওই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলো একটি গর্ভবতী উটনী। উটনীটি একটু পরেই তার বাচ্চা প্রসব করলো। এই বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে জানদা বিন আমর এবং তার বংশের কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ইমানদার হয়ে গেলো। অন্যান্য গোত্র প্রধানেরাও ইমান আনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু প্রধান পুরোহিত যাওয়াব বিন আমর বিন লবিদ ও হাব্বাব এবং গণক দাব্বাব বিন সাহর তাদেরকে নিরস্ত করলো। পুরোহিতদ্বয় ও গণকও ছিলো তাদের গোত্র প্রধান।

হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন, এখানকার কূপের পানি একদিন পান করবে 'এই উটনী'। আরেকদিন পান করবে তোমাদের পশুগুলো। আর এর বিচরণে কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। হজরত সালেহের এ নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করা হলো কিছুদিন। অলৌকিক ওই উটনীটি তার শাবকসহ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে লাগলো। নির্বিঘ্নে ভক্ষণ করতে লাগলো বিভিন্ন স্থানের তৃণ ও উদ্ভিদ। কূপের পানি পান করতে লাগলো একদিন পর একদিন। যেদিন সে পানি পান করতো সেদিন কূপে আর কোনো পানি অবশিষ্ট থাকতো না। পানি পান করার পর সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে যেতো। লোকেরা এসে দুগ্ধ দোহন করতো তার। দোহন শেষে পুনরায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো সে। গ্রীষ্মকালে উটনীটি বিচরণ করতো সমভূমিতে। অন্য পশুরা তখন তাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতো মরুভূমির দিকে। কিন্তু শীতকালে দিনে সে বিচরণ করতো মরুভূমির তপ্ততায়। গৃহপালিত উট ভেড়া ছাগলগুলো তখন ভয়ে অবস্থান গ্রহণ করতো শীতার্ত মরুদ্যানে। সে পাহাড়ে উঠলে অন্য পশুরা নেমে যেতো নিচে আর নিচে নামলে অন্য পশুরা উঠে যেতো পাহাড়ে। মানুষ তাদের পশুগুলোর দুরবস্থা দেখে ধীরে ধীরে চঞ্চল হয়ে উঠতে শুরু করলো। উটনীটি হয়ে উঠলো তাদের নিকট চরম বিরক্তিকর। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করলো, ওটাকে হত্যা করাই সমীচীন। সকলে একমত হলো এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো উটনীটিকে এবার সরিয়ে দিতেই হবে।

উনাইযাহ্ এর ডাক নাম ছিলো উম্মে গানাম। তার পিতার নাম ছিলো গামাম বিন মাজায এবং তার স্বামীর নাম ছিলো যাওয়াব বিন আমর। তার ছিলো কয়েকটি সুন্দরী কন্যা এবং অনেক গৃহপালিত পশু। এ রকম অনেক গৃহপালিত পশুর অধিকারিনী ছিলো মোখতারের কন্যা সাদুফও। এই দুই মহিলার সঙ্গে ছিলো রসুল সালেহের শত্রুতা। কারণ অলৌকিক উষ্ট্রীটির কারণে তাদের পশুগুলো কষ্ট পেতো খুব। তাই ওই দুই মহিলাই উটনীকে হত্যা করার ব্যাপারে গ্রহণ করেছিলো অগ্রবর্তিনীর ভূমিকা। সাদুফ প্ররোচিত করলো হাব্বাবকে। কিন্তু হাব্বাব রাজী হলো না। তখন সাদুফ উৎসাহিত করলো তার চাচাতো ভাই মাসদাকে। বললো, উটনীটিকে হত্যা করতে পারলে আমি হয়ে যাবো তোমার। সাদুফ ছিলো সুন্দরী ও বিত্তবতী। তাই মাসদা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্মত হলো। অপর মহিলা উনাইযাহ্ ঠিক করলো কাযার বিন সালিফকে। উনাইযাহ্ তাকে বললো, তুমি উটনীটিকে মেরে ফেলতে পারলে আমার কন্যাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি পাবে। কাযারের গায়ের রঙ ছিলো লাল। চোখ ছিলো নীল বর্ণের। দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট ছিলো সে। বর্ণনাকারীদের ধারণা, সে ছিলো অবৈধ জাত। সালিফের গৃহে জন্ম হয়েছিলো বলেই তাকে বলা হতো কাযার বিন সালিফ। সালিফ ছিলো তাদের সম্প্রদায়ের এক প্রতাপশালী নেতা। 'ইজিম্‌বায়াচ্ছা আশক্বাহা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুল স. বলেছেন, সে ছিলো তাদের গোত্র প্রধান। আবু জামআর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জামআ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী। হাদিসে বর্ণিত উষ্ট্রী বধের ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— মাসদা ও কাযার দু'জনেই উষ্ট্রী বধ করতে চললো। সাহায্যকারী হিসাবে সাতজন লোককে সঙ্গে নিলো তারা। উষ্ট্রীটির প্রত্যাবর্তনের পথে পাথরের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ওঁৎ পেতে বসে রইলো কাযার। অন্য পথে আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মাসদা। হঠাৎ সে উষ্ট্রীটিকে চলে যেতে দেখে নিক্ষেপ করলো একটি তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো উষ্ট্রীটির পায়ের উপরিভাগে। ওদিকে উনাইযাহ্ তার সুন্দরী এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কাযারকে গিয়ে বললো, এখানে নয়, ওদিকে যেয়ে দেখো উষ্ট্রীটি তীরবিদ্ধ হয়েছে। কাযার তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলো সেদিকে এবং সজোরে তার উপরে হানলো তরবারীর আঘাত। উষ্ট্রীটি তার শাবককে জোরে চিৎকার করে ডাকলো। তরবারীর আঘাতে কুঁজ কর্তিত হয়েছিলো তার। কাজার এবার তার বুকে ছুঁড়ে মারলো বর্শা। বর্শাবিদ্ধ উষ্ট্রীটি একটু পরেই মৃত্যুবরণ করলো। অবাধ্য জনতা আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলো। তারা উটের গোশত ভাগ করে নিলো এবং সে গোশত রান্নাও শুরু করলো। শাবকটি তার গর্ভধারিণীর এ রকম পরিণতি দেখে উঠে গেলো একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। কেউ কেউ বলেছেন, পাহাড়টির নাম সুর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খাযাহ্।

রসুল সালেহ্ সেখানে উপস্থিত হলেন একটু পরেই। তাঁর বিশ্বাসী অনুচরেরা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের কোনো দোষ নেই। উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছে কাযার এবং মাসদা। রসুল সালেহ্ বললেন, শাবকটির সন্ধান করো। যদি তাকে পাও, তবে আশা করা যায় তোমরা আযাব থেকে বাঁচতে পারবে। লোকেরা তৎক্ষণাৎ শাবকটিকে খুঁজতে বের হলো। পাহাড়ের উপরে সেটিকে দেখতে পেয়ে ধরতে গেলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা পাহাড়কে করে দিলেন অনেক অনেক উচ্চ। যেখানে উড়ন্ত পাখিরাও পৌঁছতে সক্ষম হলো না।

বর্ণিত হয়েছে, শাবকটি হজরত সালেহ্কে দেখতে পেয়ে কেঁদে আকুল হলো। অনেক রোদনের পর সে তিনবার উচ্চারণ করলো বুকভাঙা আওয়াজ। সে আওয়াজে ফেটে গেলো একটি বড় পাথর। আর ওই ফাটলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলো শাবকটি। এভাবে সে চিরদিনের জন্য চলে গেলো মানবচক্ষুর অন্তরালে। হজরত সালেহ্ হন্তারক জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শাবকটি চিৎকার করেছে তিনবার। তাই তোমাদের জন্য আয়ু নির্ধারিত হলো মাত্র তিনদিন। তিনদিন পর তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব। এর কোনো অন্যথা হবে না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, অলৌকিক উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য রওয়ানা হয়েছিলো নয়জন। পাঁচজন উষ্ট্রীটিকে এবং অবশিষ্ট চারজন তার শাবকটিকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। শাবক হত্যার দলে ছিলো মাসদা ও তার ভাই যাব বিন মাহ্রাজ। শাবকটিকে দেখতে পেয়েই মাসদা নিক্ষেপ করলো তীর। তীরটি বিদ্ধ হলো তার হৃৎপিণ্ডে। মাসদা ও তার সঙ্গীরা তার পা ধরে পাহাড় থেকে নিচে টেনে নামালো এবং সেটিকেও তার মায়ের মতো জবাই করে গোশত বণ্টন করে নিলো নিজেদের মধ্যে। হজরত সালেহ্ বললেন, তোমরা চরম সীমালংঘনকারী। এবার তবে আল্লাহ্র আযাব আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ভয় করলো না। তারা আরো উপহাস করে বলতে শুরু করলো, হে সালেহ্! আযাব তো আসবে বুঝলাম, কিন্তু কখন আসবে? সে আযাবের নিদর্শন কোথায়? ছামুদ সম্প্রদায় রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবারকে বলতো যথাক্রমে— আওয়াল, আওন, দিবার, জাব্বার, মোনেস, আরুবাহ্ এবং শায়ার। তারা উটনীটিকে হত্যা করেছিলো বুধবার। তাদের বিদ্রূপের উত্তরে হজরত সালেহ্ বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার ভোর বেলা থেকে তোমাদের চেহারা হয়ে যাবে হলুদ। শুক্রবার সকাল থেকে হবে লাল এবং শনিবার সকাল থেকে হবে কালো। আর রবিবার সকালে তোমাদের প্রতি আপতিত হবে আযাব। এ কথা শুনে নয়জন হন্তারক বলতে লাগলো, এবার চলো আমরা সালেহ্কেই শেষ করে দেই। আযাব যদি আসেই তবে আযাব আসার আগেই তাকে শেষ করে দেয়া ভালো। আর যদি আযাব না আসে তবে সেও চলে

যেতে পারবে তার প্রিয় উটনীটির কাছে। হত্যার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা। গভীর রাতে তারা একযোগে উপস্থিত হলো হজরত সালেহের বাসগৃহের নিকটে। কিন্তু যারা হত্যা করতে উদ্যত হলো তারা আর ফিরে এলো না। ফেরেশতারা পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে মেরে ফেললো। ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে অবাধ্য জনতা এগিয়ে গেলো হজরত সালেহের বসতবাটির দিকে। মৃত সাথীদেরকে দেখে তারা বললো, হে সালেহ্! তুমিই এদেরকে হত্যা করেছো। তাই এবার আমরা তোমাকেও হত্যা করবো। তাদের কোনো কোনো লোক প্রতিবাদ করে উঠলো। বললো, সংযত হও। সালেহ্ যদি সত্য পয়গম্বর হয়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করতে পারবে না, বরং কথিত আযাব এসে পড়বে আরো তাড়াতাড়ি। আমাদের জন্য তিনদিন অপেক্ষা করাই সংগত। তিনদিন পরেই আমরা বুঝতে পারবো সালেহের কথা সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তবে তখন যে কোনো সময় আমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবো। এই পরামর্শটি মেনে নিলো সকলে। তারা আর জটলা না করে সরে পড়লো।

বৃহস্পতিবার সকালে তারা সবিস্ময়ে দেখলো, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের চেহারা হয়ে গেছে হলুদ। তারা বুঝলো আর উপায় নেই। আযাব থেকে বাঁচবার আর কোনো আশাও নেই। কিন্তু আযাবের আলামত দেখতে পেয়েও এতটুকু অনুতপ্ত হলো না অবাধ্যরা। তওবা করার পরিবর্তে আরো বেশী উগ্র হয়ে পড়লো তারা। হত্যার উদ্দেশ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো হজরত সালেহ্কে। কিন্তু হজরত সালেহ্ তখন আত্মগোপন করেছেন। গোপনে উপস্থিত হয়েছেন ছামুদ সম্প্রদায়ের বনী গানাম গোত্রাধিপতির নিকট। ওই গোত্রাধিপতির নাম ছিলো তাকাব্বাল। ডাক নাম আবু হারব। সে অংশীবাদী হওয়া সত্ত্বেও ছিলো হজরত সালেহ্র অনুরাগী। সে হজরত সালেহ্কে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখলো। তাঁকে না পেয়ে দূরাচারেরা তাঁর অনুচরবর্গের উপর শুরু করে দিলো জুলুম। এই অত্যাচারের দৃশ্য দেখে এক বিশ্বস্ত অনুচর গোপনে হজরত সালেহ্র নিকটে উপস্থিত হলো। তার নাম ছিলো সদা' বিন হরোম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী! পাষণ্ড অবিশ্বাসীরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আমরা কি আপনার ঠিকানা বলে দিবো? তিনি বললেন হ্যাঁ। তোমরা তাদেরকে বলো যে, আমাদের নবী কোথায় আছে তা আমরা জানি। কিন্তু তাঁর ঠিকানা বলে দিলেও তোমরা তাঁকে পাবে না। এ কথা বলে তোমরা আমার অবস্থানস্থলের সংবাদ তাদের জানাও। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ জানিয়ে দিলেন, কোথায় রয়েছেন হজরত সালেহ্। কিন্তু বিশ্বাসীদের কথা শুনে অবিশ্বাসীরা হয়ে পড়লো উদ্যমহীন। আযাবের আতঙ্ক তাদেরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছিলো। অবাক হয়ে তারা দেখছিলো তাদের চেহারার হলুদ রঙ। সন্ধ্যার পর তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো হায়! তিনদিনের একদিন তো গত হয়ে গেলো। পরদিন সকালে তারা দেখলো, লাল টকটকে চেহারা হয়েছে সকলের। মনে হচ্ছিলো, চেহারায় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে লাল রক্তের প্রলেপ। আহাজারিতে কেটে গেলো তাদের সমস্ত দিন— সমস্ত

রাত্রি। তৃতীয় দিন সকালে তারা দেখলো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছে সকলের চেহারা। আতঙ্ক আর রোদন বেড়েই চললো তাদের। সন্ধ্যার পর বিশ্বাসী সহচরবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে হজরত সালেহ্ রওয়ানা দিলেন সিরিয়ার দিকে। ফিলিস্তিনের একটি মরুভূমিতে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করলেন।

ওদিকে রবিবার সকালে অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো। দেহে জড়িয়ে নিলো কাফনের কাপড়। তারা একবার তাকাতে লাগলো মাটির দিকে। আর একবার তাকাতে লাগলো আকাশের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করছিলো— আযাব কি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে, না উত্থিত হবে মাটি থেকে। কিন্তু তারা কোনো কিছুই ঠাহর করতে পারছিলো না। বেলা বাড়তে শুরু করলো। হঠাৎ বিকট আওয়াজে শুরু হলো ভূমিকম্প। একই সঙ্গে আকাশ থেকে উচ্চারিত হলো এক বিকট আওয়াজ। ওই আওয়াজ ছিলো বজ্রপাতের চেয়েও অনেক অনেক শক্তিশালী। ওই আওয়াজে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা মুহূর্তের মধ্যে কলিজা ফেটে মরে গেলো। কিন্তু ওই আওয়াজের মধ্যেও সাময়িকভাবে বেঁচে গেলো এক রমণী। তার নাম যারিয়াত বিনতে সালাফ। হজরত সালেহ্র ঘোর শত্রু ছিলো সে। আযাব আসার আগেই আযাবের ভয়ে খসে পড়েছিলো তার এক পা; সে ভয়ে কোনো রকমে পালিয়ে পৌঁছেছিলো পাশের কুরা উপত্যকাতে। গ্রামবাসীদেরকে ভয়ানক আযাবের সংবাদ জানিয়ে সে পানি প্রার্থনা করলো। পানি দেয়া হলো তাকে, কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথে সে মরে পড়ে রইলো।

সুদ্দীর বর্ণনায় এসেছে— আল্লাহ্তায়ালা হজরত সালেহ্র নিকটে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন— তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অতি শীঘ্র তোমার উটনীকে হত্যা করবে। হজরত সালেহ্ তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ কথা বলতেই তারা বলে উঠলো, আমরা কখনোই এ রকম করতে পারবো না। হজরত সালেহ্ বললেন, এ মাসে জন্মগ্রহণ করবে একটি শিশু। সে বড় হয়ে হত্যা করবে অলৌকিক উটনীটিকে। ফলে তোমাদের ধ্বংস হয়ে উঠবে অনিবার্য। তারা বললো, এ মাসে ভূমিষ্ঠ হওয়া সকল শিশুকে হত্যা করে ফেলবো আমরা। সে মাসে ভূমিষ্ট হলো দশটি শিশু। তাদের নয়টিকেই হত্যা করে ফেললো তারা। কিন্তু কেমন করে যেনো লাল রঙ এর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি শিশু বেঁচে গেলো। অতি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো শিশুটি। তাকে দেখে নিহত শিশুদের পিতারা আক্ষেপ করে বলতো, হায়! আমাদের শিশুদের হত্যা না করলে সেও এতদিনে বড় হয়ে উঠতো। তাদের আক্রোশ তখন গিয়ে পড়তো হজরত সালেহ্র উপর। তারা বললো, এই লোকটির উস্কানিতেই আমাদের শিশু সন্তানগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। তারা একজোট হলো। নিজেদের মধ্যে এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে, গভীর নিশীথে আমরা আক্রমণ করে সালেহ্ ও তার বাড়ির সকলকে হত্যা করে ফেলবো। তারা ঠিক করলো সকলকে দেখিয়ে আমরা বের হবো সফরে। মানুষ মনে করবে আমরা অন্য দেশে সফরে গিয়েছি। কিন্তু আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে থাকবো কয়েকদিন। তারপর সালেহ্ যখন

ইবাদতের উদ্দেশ্যে গভীর রাতে উপাসনালয়ের দিকে যাবে তখন তাকে আমরা একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবো। পুনরায় ফিরে যাবো পর্বতের গুহায়। কয়েকদিন পর ঘরে ফিরে এসে আমরা হত্যার সংবাদ শুনে বিস্মিত হবার ভান করবো। বলবো, হায়! কী মর্মবিদারক সংবাদ। আমরা তো তখন এখানে ছিলামও না। লোকেরা বুঝতেও পারবে না, কে আসলে হত্যা করেছে সালেহ্কে।

হজরত সালেহ্ তাঁর জনপদের লোকদের সঙ্গে রাত্রি অতিবাহিত করতেন না। তিনি রাত্রিযাপন করতেন এক মসজিদে। ওই মসজিদটির নাম মসজিদে সালেহ্। সকালে তিনি ওই মসজিদে আগত লোকজনদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসিয়ত করতেন। দিনের বেলায় ফিরে আসতেন স্বগৃহে। সন্ধ্যায় পুনরায় গমন করতেন ওই মসজিদে।

যারা তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলো তারা একদিন দিনের বেলায় সফরের ভান করে সকলের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। অদূরের একটি পাহাড়ে আত্মগোপন করে রইলো তারা। পরিকল্পনা করলো, রাত্রের অন্ধকারে মসজিদে অবস্থানরত হজরত সালেহ্কে একযোগে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলবে তারা। কিন্তু তাদের সে আশা সফল হলো না। আল্লাহ্পাকের হুকুমে গুহাটি ধ্বসে পড়লো। গুহার মধ্যেই পাথর চাপা পড়ে মারা পড়লো তারা। এভাবেই সকল কৌশলের উপর আল্লাহ্তায়ালার কৌশল বিজয়ী হয়। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা ফন্দি আঁটলো। আমিও তাদের ফন্দির জবাব দিলাম। অথচ তারা অনুভব করতে পারলো না।'

বিষয়টি কিন্তু চাপা রইলো না। কিছু লোকের নজরে পড়লো, ওই লোকগুলোর লাশ পাথর চাপা পড়ে বিক্ষিপ্তরূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা জনপদের সকল লোককে একত্র করে জানালো, দ্যাখো সালেহ্ কেবল ওই লোকগুলোর সদ্যভূমিষ্ঠ নয়টি শিশুকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের পিতাদেরকেও হত্যা করে ফেলে রেখেছে পাহাড়ের পাশে। সকলে তখন একমত হলো যে, সালেহ্র উটনীটিকে এবার হত্যা করতেই হবে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিলো হজরত সালেহ্কে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে।

সুদ্দীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, দশটি শিশুর মধ্যে নয়টিকে হত্যা করা হয়েছিলো। একটিকে হয়নি। সেই শিশুটি খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকলো। অন্য শিশুরা এক বছরে যতটুকু বাড়ে, সে ততটুকু বাড়তে থাকলো এক মাসে। এভাবে অতি দ্রুত বড় হলো সে। বড় হয়ে একদিন সে তার সাথীদেরকে নিয়ে মদ্য পান করতে বসলো। মদ্যপানের জন্য প্রয়োজন হলো পানির। ওই দিন ছিলো উটনীটির পানি পানের দিন। তাই কূপে কোনো পানি পাওয়া গেলো না। পানি না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো তারা। বললো, উটনীর দুধ দিয়ে আমরা কী করবো। আমাদের দরকার পানি। উটনীটি যেদিন পানি পান করে সেদিন কূপের আর কোনো পানিই থাকে না। আমাদের সকল পশুকে সেদিন থাকতে হয় পিপাসিত।

উটনীটি পানি পান না করলে আমরা ওই বিপুল পরিমাণ পানি দিয়ে আমাদের পশুগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে পারতাম। ক্ষেতেও পানি সিঞ্চন করতে পারতাম। এই উটনীটির জন্যই আমাদের পশুগুলোকে একদিন পর একদিন তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়। এই উপদ্রব আমরা সহ্য করি কী করে। উটনীটিকে তাই হত্যা করাই সমীচীন। সকলে এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললো, ঠিক আছে, তাই করা হোক। এরপর সকলে মিলে হত্যা করলো ওই অলৌকিক উটনীটিকে।

আবদুল্লাহ্ বিন দীনারের চাচাতো ভাই থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. হিজর নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সহচরবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন, এখানকার কূপটির পানি কেউ পান কোরো না। পশুদেরকে পান করিয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো ওই কূপের পানি সংগ্রহ করেছি। আর ওই পানি দিয়ে আটার খামিরও তৈরী করেছি। রসুল স. বললেন, পানি ও আটার খামির ফেলে দাও।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হুকুম দিয়েছিলো, হিজর এলাকার কূপ থেকে যদি তোমরা পানি সংগ্রহ করে থাকো, তবে সে পানি ফেলে দাও। আর ওই পানি দিয়ে যদি খামির প্রস্তুত করে থাকো, তবে তা খাইয়ে দাও তোমাদের উটগুলোকে। পানি সংগ্রহ করো ওই কূপ থেকে, যে কূপের পানি পান করেছিলো সালেহ্ নবীর উটনী।

বাগবী লিখেছেন, আবু যোবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. যখন ছামুদ সম্প্রদায়ের এলাকা হিজর অতিক্রম করছিলেন, তখন সাহাবীগণকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা কখনো এই বিরান জনপদে বিচরণ করবে না। এখানকার পানিও পান করবে না। এ এলাকাটি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার আযাবগ্রস্ত এলাকা। সুতরাং ভয়ে রোদন করতে করতে এই এলাকা অতিক্রমের সময় মনে মনে প্রার্থনা করতে থেকো যে, তোমাদের উপরে যেনো এ রকম আযাব আপতিত না হয়। আর তোমরা তোমাদের রসুলের নিকট কখনো কোনো মোজেজা দেখতে চেয়ো না। ছামুদ সম্প্রদায় তাদের রসুলের নিকট মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তখন একটি পাথরের অভ্যন্তর থেকে বের করে দিয়েছিলেন একটি অলৌকিক উটনী। এই পাহাড়ী পথ ধরে ওই উটনীটি একটি কূপে পানি পান করতে যেতো। যেদিন পানি পান করতো, সেদিন কূপের পানি হয়ে যেতো নিঃশেষ। অবাধ্য ছামুদ সম্প্রদায় ওই অলৌকিক উটনীটিকে হত্যা করেছিলো। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ওই প্রতাপশালী সম্প্রদায়কে। তাদের সম্প্রদায়ের আবু রাগাল নামক এক ব্যক্তি তখন ছিলো মক্কায়। তাই সে ওই আযাব থেকে তখন রক্ষা পেয়েছিলো। কিন্তু যখন সে হেরেমের সীমানার বাইরে গেলো তখন তার উপরেও আপতিত হলো আযাব। সে ভূমিতে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। তার কাছে তখন ছিলো একটি স্বর্ণ খণ্ড। তার সাথে সাথে ওই স্বর্ণ খণ্ডটিও দেবে গিয়েছিলো মাটিতে। এ কথা বলে রসুল স. সাহাবীগণকে আবু রাগালের কবর দেখিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ সেখানকার ভূমি খনন করে পেয়ে

গেলেন ওই স্বর্ণখণ্ডটি। ছামুদ গোত্রের চার হাজার লোক ইমান এনেছিলেন হজরত সালেহ্র প্রতি। হজরত সালেহ্ তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণকে নিয়ে আযাব আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন হাদ্বরা মাউতে। সেখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বাসীদের এক নতুন জনপদ। সেখানেই মহাপ্রয়ান ঘটেছিলো হজরত সালেহ্র। তাই ওই স্থানের নাম হয়েছে হাদ্বরা মাউত। এরপর তাঁর উম্মতেরা গড়ে তুলেছিলো আর একটি জনপদ। ওই জনপদের নাম ছিলো হাসুরা।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত সালেহের মহাঅন্তর্ধান ঘটেছিলো মক্কায়। পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর বয়স হয়েছিলো আটান্ন বছর। তিনি তাঁর বিশ্বাসী উম্মতগণের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন মাত্র বিশ বছর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪

وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۭ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

❒ এবং লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই';

❒ 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

❒ উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, 'ইহাদিগকে জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র হইতে চাহে।'

❒ অতঃপর তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❒ তাহাদিগের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, সুতরাং অপরাধীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

উদ্ধৃত পাঁচ আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'এবং লুতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।' এখানে লুতান (লুত) শব্দটির পূর্বে 'আরসাল্না' (পাঠিয়েছিলাম) কথাটি উহ্য রয়েছে। অথবা উহ্য রয়েছে 'উজ্‌কুরু' (স্মরণ করো) কথাটি।

'আ তা'তুনাল ফাহিশাতা' (তোমরা কি কুকর্ম করছো) কথাটির মধ্যে রয়েছে চরম হুঁশিয়ারী। 'আল ফাহিশাতা' (কুকর্ম) কথাটির অর্থ এখানে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা। 'মা সাবাক্বাকুম বিহা মিন আহাদিম্ মিনাল আ'লামীন' অর্থ— যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। এখানে 'মিন্ আহাদিন' কথাটির 'মিন' (মধ্যে) হচ্ছে মিন-এ জায়েদা (অতিরিক্ত সংযোজন)। এ রকম সংযোজনের মাধ্যমে বক্তব্যকে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়। আর 'মিনাল আ'লামীন' কথাটির 'মিন' হচ্ছে মিন-এ তাবয়্যিজিয়াহ্ (আংশিক অর্থ প্রকাশক মিন)।

আমর বিন দীনার বলেছেন, পুরুষের উপর পুরুষের উপগত হওয়ার এই কুপ্রথাটি হজরত লুতের সম্প্রদায়ের লোকেরাই সর্বপ্রথম শুরু করেছিলো। আয়াতে তাই স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে— তোমরা এমন কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করো, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

হজরত লুতের পিতা ছিলেন হারেছ অথবা হারম। তাঁর পিতামহ ছিলেন তারেক। তিনি ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের ভ্রাতুস্পুত্র।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ তারা কাম-তৃপ্তির জন্য নারী গমনের স্বাভাবিক বিধানটিকে লংঘন করে পুরুষের উপর উপগত হতো। নিঃসন্দেহে ওই কুকর্মটি ছিলো ঘৃণ্য ও নিষ্ফল। আল্লাহ্‌তায়ালার সাধারণ ও স্বাভাবিক বিধান এই যে, কাম পরিতৃপ্তির জন্য ও সন্তান লাভের লক্ষ্যে নারী ও পুরুষ বৈধ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রতিকর্মে লিপ্ত হবে। কিন্তু হজরত লুতের অবাধ্য সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিলো জ্ঞানহীন পশুর মতো। এ আয়াতের মাধ্যমে এ কথাটিও প্রমাণিত হয় যে, রমণীদের সঙ্গে পায়ু সঙ্গম হারাম। কারণ তা পুরুষে পুরুষে সমকামের মতোই অপবিত্র, ঘৃণ্য এবং শুভ উদ্দেশ্যবর্জিত। সুরা বাকারার তাফসীরে এই মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানকার এ সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে— তোমাদের অভ্যাসই হচ্ছে শরিয়তের যুক্তিসঙ্গত বিধানকে লংঘন করা। বিবাহকে ত্যাগ করে তোমরা এমন কাজের দিকে ধাবিত হয়েছো— যা মানবতাবিরোধী ও অকল্যাণকর।

এই আয়াতেও জঘন্য কুকর্মটি সম্পর্কে ঘৃণা ও নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছে। এই নির্দেশনাটি দেয়াই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য যে, কামতৃপ্তির জন্য তোমরা অবলম্বন করেছো অপবিত্রতা, অবৈধতা ও অস্বাভাবিকতাকে। অতএব হে লুতের সম্প্রদায়! এ কথাটি জেনে রাখো যে, এটা নিশ্চিত সীমালংঘন। এটাও সুনিশ্চিত যে, তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেও (৮২)। বলা হয়েছে—'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, এদেরকে জনপদ থেকে বহিষ্কার করো, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র হতে চায়।' পাপিষ্ঠদের এ বক্তব্যটি ছিলো হজরত লুত ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দের প্রতি একটি স্পষ্ট বিদ্রূপ। অপবিত্রতায় আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো তারা। তাই স্বাভাবিক পবিত্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপপ্রবণ হতে বাধেনি তাদের ।

পরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিলো ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' এখানে 'ওয়া আহ্লাহু' কথাটির অর্থ বিশ্বাসী পরিজনবর্গ। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত লুতের ছিলো দুই স্ত্রী। প্রকাশ্যে বিশ্বাসিনীর ভান করলেও তাঁর এক স্ত্রী ছিলো কাফের। ওই স্ত্রী সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, 'তার স্ত্রী ছিলো ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের উপর যখন আল্লাহ্র আযাব নেমে এলো তখন আল্লাহ্তায়ালা হজরত লুত ও তাঁর বিশ্বাসী সাথীদেরকে ওই পাপিষ্ঠ জনপদ থেকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই অবিশ্বাসী স্ত্রী তখন সেই নির্দেশ মানেনি। সে রয়ে গিয়েছিলো তার সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে এবং অবাধ্যদের সঙ্গে। সে-ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো আল্লাহ্র আযাবে।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিলো তা লক্ষ্য করো।' এখানে 'মাতারান' (মুষলধারে বৃষ্টি) কথাটির অর্থ বিস্ময়কর বৃষ্টি। ওই বিস্ময়কর বৃষ্টি ছিলো পাথরের বৃষ্টি। প্রতিটি পাপিষ্ঠের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো একটি করে পাথর। ওই তীব্র গতিতে বর্ষিত নির্ধারিত পাথরের আঘাতে ধ্বংস হয়েছিলো পাপিষ্ঠরা। ওয়াহাব লিখেছেন, ওই বৃষ্টি ছিলো গন্ধক ও আগুনের বৃষ্টি। আবু উবায়দা বলেছেন, 'আমতারা' অর্থ রহমতের বৃষ্টি। আর মাতারা অর্থ গজবের বৃষ্টি। আর 'আল-মুজরিমীন' কথাটির অর্থ এখানে অপরাধী, সীমালংঘনকারী এবং কাফের।

বর্ণিত হয়েছে, হজরত লুত তাঁর পিতৃব্য হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে বাবেল শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়া অতিক্রম কালে তিনি যাত্রা স্থগিত

করলেন জর্ডান নামক স্থানে। আল্লাহ্তায়ালা সেখান থেকে তাঁকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন সদোমবাসীদেরকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। সদোমের লোকেরাই শুরু করেছিলো ঘৃণ্য সমকামিতা। হজরত লুত তাদেরকে ওই জঘন্য পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে বললেন। কিন্তু তারা হজরত লুতের কথায় কর্ণপাত করলো না। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে প্রস্তর বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইসহাক বিন বশীর এবং ইবনে আসাকেরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, গৃহবাসী সদোমদেরকে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। আর মুসাফির সদোমদেরকে বিনাশ করা হয়েছিলো পাথরের বৃষ্টির দ্বারা।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের এলাকাটি ছিলো সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। আশে পাশের সকল অঞ্চলের চেয়েও সুন্দর অঞ্চল ছিলো ওই সদোম। তাই আশে পাশের লোকেরা প্রায়শঃই অত্যাচার করতো তাদের উপর। ফল ও ফসল লুঠ করে নিয়ে যেতো। অবাধে পশুপাল চরাতো ফসলের ক্ষেতে। ইবলিস একদিন মানুষের আকৃতিতে শুভাকাঙ্খীর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হলো বিমর্ষ সদোমদের নিকট। পরামর্শ দিলো— তোমরা যদি পুরুষ সম্ভোগ করো, তবে বেঁচে থাকতে পারবে সকল অত্যাচার থেকে। সদোমেরা প্রথমে এ পরামর্শকে ভালো মনে করলো না। কিন্তু বহিরাগতদের উপদ্রব যখন চরমে পৌঁছলো, তখন উদ্ধারের আশায় মরিয়া হয়ে চোর, ডাকাত অথবা তাদের অল্পবয়সী সন্তানদেরকে ধরে শুরু করলো পুরুষ সম্ভোগ।

হাসান বসরী বলেছেন, সদোম সম্প্রদায়ের লোকেরা এতো চরমে পৌঁছলো যে, তারা রমণীদেরকে কেবল বিয়েই করতো। কিন্তু কাম চরিতার্থ করতো পুরুষদের সঙ্গে। কালাবী বলেছেন, ইবলিসই সদোম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম এনেছিলো এই ঘৃণিত প্রথাটি। সদোমদের জনপদ ছিলো ফল ও ফসলে ভরা। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা সেখানে আসতো। কিন্তু সদোমবাসীরা ছিলো বড়ই সংকীর্ণচিত্ত। পথিক ও অনাথদেরকে তারা কিছুই দিতে চাইতো না। একদিন ইবলিস উঠতি বয়সের যুবকের আকৃতিতে লোভনীয় ভঙ্গিতে হাজির হলো তাদের এলাকায়। যারা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো তাদেরকে সে ইঙ্গিত করলো তার পশ্চাৎদেশের দিকে। এভাবে তাদেরকে সে প্রথম শিক্ষা দিলো সমকাম। ধীরে ধীরে ওই ঘৃণ্য কুকর্মের মধ্যে ডুবে গেলো সকলে। পরিণাম হলো অত্যন্ত ভয়াবহ। পাথর বৃষ্টি এবং ভূমিধ্বসের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হলো সকলকে।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ
وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ○ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ○

❒ মাদিয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহের ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে; লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না, এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা বিশ্বাসী হইলে তোমাদিগের জন্য ইহা কল্যাণকর।

❒ বিশ্বাসীগণকে ভয়-প্রদর্শনের জন্য কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহের পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না, এবং উহাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিবে না।' স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ্য কর।

❒ আমার প্রতি যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে যদি তোমাদিগের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী'।

প্রথমে বলা হয়েছে—'মাদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম।' হজরত ইব্রাহিমের এক পুত্রের নাম ছিলো মাদিয়ান। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে মাদিয়ানবংশভূতদের কথা। বাগবী উল্লেখ করেছে, মাদিয়ানবাসীরাই আসহাবুল আয়কাত (অরণ্যবাসী)।

আতা বলেছেন, হজরত শোয়াইবের পিতা ছিলেন তাওবাহ্ এবং পিতামহ ছিলেন হজরত ইব্রাহিম। ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত লুতের কন্যা মীকাইলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত শোয়াইব। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত শোয়াইব ছিলেন মীকাইলের পুত্র, মীকাইল ইয়াশজারের, ইয়াশজার মাদিয়ানের, আর মাদিয়ান ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের সন্তান। । শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন হজরত শোয়াইব। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী। তাই তাঁর উপাধি ছিলো খতিবুল আম্বিয়া। তাঁর স্বজাতি ছিলো অবিশ্বাসী ও পরিমাপে দিতো কম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, রসুলপাক স. যখনই হজরত শোয়াইবের আলোচনা করতেন তখনই বলতেন, তিনি ছিলেন খতিবুল আম্বিয়া। এ কারণেই তিনি স্বজাতিকে উত্তমরূপে সম্বোধন করতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলী ছিলো সুললিত, সুগঠিত ও হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য আয়াতে তাঁর একটি আংশিক ভাষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, সে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।'

এখানে 'উয়্বুদুল্লহ' অর্থ— নির্জনে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো। 'বাইয়্যেনাত' অর্থ মোজেজা। অবশ্য কোরআন মজীদে হজরত শোয়াইবের কোনো মোজেজার উল্লেখ নেই। তাই কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাইয়্যেনাত' শব্দটির অর্থ হবে— হেকমত অথবা নসিহত। উল্লেখ্য যে, হজরত শোয়াইবের বাচনশৈলী ছিলো যেমন কুশলী, তেমনি মাধুর্যমণ্ডিত।

'আল-মীযান' শব্দটি মীয়া'দ শব্দটির মতো একটি মূল শব্দ। এর অর্থ ওজন। অথবা দাঁড়িপাল্লা। মীযান অর্থ যদি শুধু দাঁড়িপাল্লা হয় তবে বুঝতে হবে 'ওজন' কথাটি এখানে রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ত কথাটিসহ মীযান শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ হবে— দাঁড়িপাল্লার ওজন।

'কাইলুন' অর্থ পরিমাপ। শব্দটির মূল ধাতু এখানে উহ্য রয়েছে। 'আ'য়শা' শব্দটির সঙ্গে 'মায়া'শ শব্দটির সম্পর্ক যে রকম, সে রকমই সম্পর্ক 'মাইল' শব্দটির সঙ্গে 'কমইয়াল' শব্দটির।

'তাব্খাসু' (প্রাপ্য বস্তু) শব্দটির দু'টি কর্ম রয়েছে এখানে। একটি হচ্ছে— 'আন্নাস' (লোকদেরকে)। আরেকটি হচ্ছে 'আশইয়াআহুম' (কম দিবে না)। আরবী পরিভাষা অনুসারে বলা হয়— 'বাখাসতু যায়দান হাক্বাহু' (আমি জায়েদকে তার যথাপ্রাপ্য অপেক্ষা কম দিয়েছি)। এখানে 'আশ্ইয়া' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। এর দ্বারা বুঝা যায় মাদিয়ানের আপামর জনসাধারণ কম-বেশী সকল সামগ্রী ওজন ও পরিমাপে কম দিতো। কেউ কেউ বলেছেন মাদিয়ানবাসীরা ছিলো অতিরিক্ত সঞ্চয়প্রবণ। তারা প্রতিটি দ্রব্য-সামগ্রী কুক্ষিগত করে রাখতে চাইতো।

'ওয়ালা তুফ্সিদু' অর্থ— বিপর্যয় ঘটিও না। অর্থাৎ কুফরী ও জুলুম কোরো না।

'বা'দা ইস্লাহিহা' অর্থ— শান্তি স্থাপনের পর। অর্থাৎ— হে মাদিয়ানবাসী! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের নিকটে নবী প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেন। তাঁর এই শান্তি প্রচেষ্টাকে তোমরা বিপর্যস্ত করে তুলো না। তোমরা তাঁর নসিহত গ্রহণ করো। পরিমাপে ও ওজনে কম দিলে কিছু সম্পদগত উপকার হয়তো তোমাদের হবে, কিন্তু তোমরা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতের শেষ কথাটি হচ্ছে— 'তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর'। এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বলেছিলেন, হে মাদিয়ানের জনতা! তোমরা তো আমাকে সত্যবাদী বলে জানো। যদি তাই হয় তবে আমার কথা বিশ্বাস করো তোমরা। এ কথাটি সর্বান্তকরণে মেনে নাও যে, পরিমাপে ও ওজনে কম দেয়া একটি গর্হিত অপরাধ। এ অপরাধটি পরিত্যাগের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, মাদিয়ানবাসীরা ভালো করেই জানতো যে হজরত শোয়াইব সত্যবাদী। কারণ তারা দেখেছিলো নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেও তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছিলো। তাই তাঁর নবুয়তের প্রতি তারা জানিয়েছিলো অস্বীকৃতি।

বর্ণিত হয়েছে, মাদিয়ানের এক লোক তাদের জনপদের প্রধান সড়কের মাথায় বসে থাকতো। হজরত শোয়াইবের নিকট গমনকারী লোকদেরকে বাধা দিতো সে। বলতো, ওদিকে যেয়ো না। শোয়াইব তো মিথ্যাবাদী। সে তোমাদেরকে

ধর্মচ্যুত করতে চায়। লোকটি হজরত শোয়াইবের বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দকেও বিভিন্নভাবে ভয় দেখাতো। হত্যারও হুমকি দিতো। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন। পরের আয়াতের (৮৬) বক্তব্যে সে কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

বলা হয়েছে—'বিশ্বাসীগণকে ভয় প্রদর্শনের জন্য কোনো পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্র পথে তাদেরকে বাধা দিবে না এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না।' এখানে 'তাব্গুনাহা ই'ওয়াজা' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার পথে বক্রতা আনয়ন করতে চেষ্টা কোরো না বা সন্দেহ সৃষ্টি কোরো না। অথবা মানুষকে এ কথা বলো না যে, আল্লাহ্র নবী কর্তৃক প্রদর্শিত পথ বঙ্কিম। এ রকম কথা সরল মানুষদেরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'সিরাতুন' শব্দটির অর্থ সত্যধর্মের পথ। ধর্মের মূল পথ একটিই। কিন্তু এর শাখা-প্রশাখা রয়েছে অনেক। যেমন, বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ, আল্লাহ্র পরিচয় লাভের বিশেষ নির্দেশনা, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার বিবরণ, শাস্তি ও শান্তির বিধান ইত্যাদি। এ সকল শাখা কিন্তু ধর্মের মূল পথের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। অবিশ্বাসী মাদিয়ানবাসীরা হজরত শোয়াইবের অনুসারীদেরকে ধর্মের যে কোনো এক শাখায় আমল করতে দেখলেও তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট প্রদান করতো এবং হত্যা করা হবে বলে ভয়ও দেখাতো।

এরপর বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিলো, তা লক্ষ্য করো।' এ কথার অর্থ— ইতোপূর্বে তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম। তোমাদের সম্পদও ছিলো সীমিত। আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ধন সম্পদে বরকত দান করেছেন। তাই তোমরা হয়ে উঠেছো ধনে জনে গরিষ্ঠ ও বৈভবিত। সুতরাং তোমরা অহমিকা কোরো না। স্মরণ করো, ইতোপূর্বে তোমাদের মতো এ রকম ধন-জন-শোভিত অনেক সম্প্রদায়কে তাদের পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। ভেবে দেখো, কী নিদারুণ পরিণতি হয়েছিলো হজরত লুত, হজরত হুদ এবং হজরত নুহের সম্প্রদায়ের।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে—'আমার প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে তাতে যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে এবং কোনো দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।' এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইব বলেছিলেন, হে

আমার সম্প্রদায়! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে বিজয় দান করবেন। আর অবিশ্বাসীদেরকে করবেন ধ্বংস। সুতরাং বিতণ্ডায় লিপ্ত না হয়ে প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়। চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়। ওই সময় এলে সত্যানুসারী ও মিথ্যাশ্রয়ীদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। মীমাংসা করবেন আল্লাহ্পাক স্বয়ং। তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৮৮, ৮৯

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۟ۚ قَدِ
افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ
وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

❐ তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, 'তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে; অন্যথায় হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত করিবই।' সে বলিল, 'কী, আমরা উহা ঘৃণা করিলেও?

❐ তোমাদিগের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদিগের কাজ নয়; সব কিছুই আমাদিগের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; আমরা আল্লাহের প্রতি নির্ভর করি; হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের ও আমাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও; এবং তুমিই মীমাংসাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— মাদিয়ানের অহংকারী নেতারা বললো, তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে। যদি না আসো তবে শুনে নাও হে শোয়াইব! তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে আমরা আমাদের ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করবোই।

হজরত শোয়াইব কখনোই অবিশ্বাসী বা অংশীবাদী ছিলেন না। সুতরাং কুফরী ধর্মমতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। নবুয়ত ও রেসালাত লাভের পূর্বে অথবা পরে কোনো নবী রসুল মুহূর্তের জন্যও কুফরীর উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন না। কিন্তু যারা নবী-রসুল প্রবর্তিত সত্যধর্মে দীক্ষিত হন, তারাই কেবল ছেড়ে আসেন তাদের পূর্ববর্তী কুফরী মত ও পথ। তাই দাম্ভিক নেতারা তাদের বক্তব্যের শুরুতে হজরত শোয়াইবকে সম্বোধন না করে এ রকম বলেছে— তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে। অর্থাৎ তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিলো এ কথা বলা যে, কুফরী মত ও পথ ছেড়ে যারা হজরত শোয়াইবের মত ও পথকে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তাদের আগের ধর্মাদর্শে। এরপর হজরত শোয়াইবকে লক্ষ্য করে দাম্ভিকেরা বলছে— অন্যথায় হে শোয়াইব! তোমাকে এবং তোমার অনুচরদেরকে আমাদের জনপদ থেকে আমরা বহিষ্কার করবোই।

আয়াতের শেষাংশে উদ্ধৃত হয়েছে হজরত শোয়াইবের বক্তব্য। হজরত শোয়াইব তখন বলেছিলেন, 'কী, আমরা তা ঘৃণা করলেও?' এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের অনড় জবাব হচ্ছে— কখনোই নয়। অর্থাৎ সত্যের আলো প্রাপ্তির পর মিথ্যার অন্ধকারে পুনঃপ্রত্যাবর্তন অসম্ভব। কারণ মিথ্যা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য। হজরত শোয়াইবের বক্তব্যের এই ধারাবাহিকতা প্রবাহিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেও।

পরের আয়াতে (৮৯) তাই বলা হয়েছে— 'তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবো, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়।' এখানে 'ক্বদিফ্তারইনা' অর্থ— তবে তো আমরা মিথ্যা আরোপ করবো বা মিথ্যা বলবো। 'আ'লাল্লহি কাজিবা' অর্থ—আল্লাহ্র সঙ্গে আমরা কি কাউকে অংশীদার করবো? এখানে 'ইজ্ নাজ্জানা' (তবে তো) একটি শর্ত। 'ইফ্তারইনা' শব্দরূপটি অতীতকালবোধক হলেও এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালবোধক। শব্দটির পূর্বে ক্বদ্ (নিশ্চয়) যুক্ত হওয়ার কারণেই এর অর্থ হয়েছে ভবিষ্যতকালবোধক। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা আমাদেরকে দয়া করে সত্য ধর্মবিশ্বাস দান

করেছেন এবং জানিয়েছেন সত্য-মিথ্যার প্রভেদ। তাই আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের পূর্ববর্তী ধর্মমতটি ছিলো মিথ্যা। আর এখনকার ধর্মমতটি সত্য। এখন যদি আমরা আবার আগের ধর্মে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহ্‌কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো। আমাদের পক্ষে এ রকম করা কখনোই সম্ভব নয়— হজরত শোয়াইবের অনুসারীদের এই বক্তব্যটি অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে এই বক্তব্যের মধ্যে। কিন্তু তকদিরের উপর বিশ্বাস করাও ইমানের একটি শর্ত। তাই তাঁরা এই বিশ্বাসটিকেও প্রকাশ করেছেন এভাবে— আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। এ কথার অর্থ— আমরা জানি না কী রয়েছে আমাদের অদৃষ্টে। আল্লাহ্‌তায়ালা চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের অধিকারী। সুতরাং আমাদের ধর্মচ্যুত হওয়াই যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়, সত্যধর্মে দৃঢ়পথে থাকতে তিনি যদি সাহায্য না-ই করেন তবে তো আমরা স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে সত্যকে ধরে রাখতে পারবো না। —এই বক্তব্যটির দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মোতাজিলাদের ওই অভিমতটি ভুল যেখানে তারা বলেছে— অবিশ্বাস ও পাপ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। মোতাজিলারা অজ্ঞ ও ভ্রষ্ট। তাই তারা আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিশ্বাসীদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করে দেয়া। তাই তাঁর বক্তব্যে এই শর্তটি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাই তিনি ইচ্ছা করলে কেবল পূর্ব ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমরা এরূপ ইচ্ছা করি না। এ রকম ইচ্ছা করলে আমরা তো আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত সত্য ধর্মকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করবো— যা আল্লাহ্‌তায়ালাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর।

এরপর বলা হয়েছে— 'সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান সীমাহীন, আদি- অন্তহীন। তিনিই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর কোন বান্দা অবিশ্বাসের দিকে যাবে এবং কোন বান্দা যাবে বিশ্বাসের দিকে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সারা জীবন দোজখীদের মতো আমল করতে করতে এমন অবস্থায় পৌছে যে, দোজখের সঙ্গে তার দূরত্ব থাকে মাত্র এক হাত। সহসা অদৃষ্ট তার উপর প্রবল হয়। তার আমল তখন হয়ে যায় জান্নাতবাসীদের মতো এবং জান্নাতই হয় তার চূড়ান্ত গন্তব্য।

এরপর বলা হয়েছে—'আমরা আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করি।' এ কথার অর্থ— আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্তায়ালাই আমাদেরকে ইমানের প্রতি সুদৃঢ় রাখবেন এবং বিশ্বাসের পথে দান করবেন অধিকতর সাফল্য। রসুল স. এরশাদ করেছেন, সকল মানুষের হৃদয় আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক ও অতুলনীয় দুই আঙ্গুলের নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেদিকে ইচ্ছা করেন, সেদিকেই ঘুরিয়ে দেন মানুষের হৃদয়ের গতি। এরপর রসুল স. প্রার্থনা করলেন, হে আমার আল্লাহ্! হে হৃদয়সমূহের বিবর্তক! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার আনুগত্য-অভিমুখী করে দাও। মুসলিম।

আয়াতের শেষাংশে হজরত শোয়াইবের একান্ত প্রার্থনাটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও; এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' অবিশ্বাসী জনতার ইমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হজরত শোয়াইব এ রকম সিদ্ধান্তমূলক প্রার্থনা পেশ করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালার মহান দরবারে। তাঁর ওই প্রার্থনার মধ্যে ছিলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করার নিবেদন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ○ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ○ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

❒ তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীগণ বলিল, 'তোমরা যদি শোয়াইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

❒ অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

❒ মনে হইল শোয়াইবকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শোয়াইবকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

❐ সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌছাইয়া দিয়াছি, এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি; সুতরাং আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি।

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— তার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীরা তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন উপদলের লোকদেরকে বললো, তোমরা শোয়াইবের অনুসরণ কোরো না। করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শোয়াইব বলেন, ওজনে ও মাপে কম দেয়া যাবে না। এ রকম করলে তোমাদের লভ্যাংশ যাবে কমে। তবে ভেবে দেখো, এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কি ঠিক?

পরের আয়াতে (৯১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেলো।' এখানে 'আর রজফাতু' অর্থ— ভূমিকম্প। এ রকম বলেছেন কালাবী। 'ফিদারিহিম' অর্থ— তাদের নিজ গৃহে। আর 'জাছিমীন' অর্থ— মুখ থুবড়ে পড়ে মৃত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা মাদিয়ানবাসীদের দিকে উন্মুক্ত করলেন জাহান্নামের দরজা। শুরু হলো অসহ্য গরম। গরমে হাঁশ ফাঁশ করতে লাগলো তারা। ছায়ায় বসে থেকে অথবা পানি পান করেও তাদের স্বস্তি মিললো না। প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে তারা চলে গেলো খোলা প্রান্তরের দিকে। সেখানে দেখলো আকাশে জমেছে অনেক মেঘ। ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিলো সেখানে। তারা পরস্পরকে ডেকে বলতে লাগলো, এসো সবাই, এদিকে এসো। এখানে রয়েছে শ্রান্তিহারক হাওয়া। এ রকম ডাক শুনে একে একে তারা সকলেই সমবেত হলো সেখানে। সহসা শুরু হলো অগ্নুৎপাত। মেঘ থেকে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি। ফলে আগুনে পোড়া ফড়িঙের মতো সকলেই মরে পড়ে থাকলো সেখানে।

ইয়াজিদ জারীরী বলেছেন, আল্লাহ্পাক মাদিয়ানের অবিশ্বাসীদের উপর সাত দিন ধরে প্রবাহিত করলেন তুফান। তুফান শেষে শুরু হলো অসহনীয় উত্তাপ। ওই সময় তারা দেখতে পেলো অদূরে একটি পাহাড়ে বয়ে চলেছে জলবতী ঝর্ণা। তারা একে একে সকলে গিয়ে সমবেত হলো সেখানে। তখন ওই সমাবেশের উপর সহসা ধ্বসে পড়লো বিশাল পাহাড়টি। 'ইয়াওমুজ্ জিল্লাতি' কথাটির অর্থ— পাহাড়ের ছায়ার দিন।

হজরত কাতাদা বলেছেন, আসহাবুল আইকাহ এবং আসহাবুল মাদিয়ান— উভয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হজরত শোয়াইব। আইকাহ্ সম্প্রদায় বসবাস করতো অরণ্য পরিবেষ্টিত একটি এলাকায়। তাই তাদেরকে বলা হতো আসহাবুল আইকাহ বা অরণ্যবাসী। তাদের মধ্যেও অনেকে

অস্বীকার করেছিলো হজরত শোয়াইবকে। তাদেরকে একত্র করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো মেঘের ছায়ায়, পাহাড়ের পাদদেশে। আর মাদিয়ানবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো ভূমিকম্পের মাধ্যমে। অনন্তর হজরত জিবরাইলও তখন তুলেছিলেন একটি গগনবিদারী আওয়াজ। সেই আওয়াজে মুহূর্তের মধ্যেই মরে সাবাড় হয়ে গিয়েছিলো তারা।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'মনে হলো শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা যেনো কখনো সেখানে বসবাস করেইনি। শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারাই হয়েছিলো ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে 'কা আঁ'ল্ লাম ইয়াগনাও' কথাটির অর্থ সমূলে উৎপাটিত করা। সমূলে বংশনিপাত করা হয়েছিলো মাদিয়ানবাসী অবাধ্যদেরকে। সে কথাটিই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— মনে হচ্ছিলো, তারা যেনো কখনোই সেখানে বসবাস করতো না।

'হুম খসিরুন' কথাটির অর্থ— তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। অর্থাৎ মাদিয়ানবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো দুনিয়ায়। তেমনি তারা আখেরাতেও হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

মাদিয়ানবাসীদের এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণটিও ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তিদানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শোয়াইবকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এ কথার অর্থ— হজরত শোয়াইবের সত্য ধর্মের আহ্বানকে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করেছিলো তারা। তাই তাদেরকে উৎখাত করা হয়েছে সমূলে।

এর পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে—'সে তাদের থেকে মুখ ফিরালো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমাদের প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি; এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি; সুতরাং আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি।' এ কথার অর্থ— প্রত্যাখ্যানপ্রবণ স্বজাতিকে সত্যের আহ্বান জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের বোধোদয়ের জন্য অপেক্ষা করলেন হজরত শোয়াইব। তারপর যখন স্থির নিশ্চিত হলেন যে, এরা চিরভ্রষ্ট, কল্যাণরহিত— তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়াই সমীচীন। তিনি তাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আক্ষেপ ভরে শুধু বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি। তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি সত্যের সওগাত। দান করেছি তোমাদেরকে শুভ নির্দেশনা। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অপার অনুগ্রহ গ্রহণ করার যোগ্য নও। তোমরা স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছো সত্যকে। এভাবে নিজেদের উপর অবধারিত করে নিয়েছো আল্লাহ্র গজবকে। এ গজব তোমাদের নিজস্ব অর্জন। সুতরাং তোমাদের জন্য আমি আক্ষেপ করবো কেনো? এ রকম আক্ষেপ করেই বা কী লাভ? তোমরা তো ফিরে আসছো না। সংশোধনের সুযোগও আর তোমাদের নেই।

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّبِیٍّ اِلَّاۤ اَخَذۡنَاۤ اَهۡلَهَا بِالۡبَاۡسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ
یَضَّرَّعُوۡنَ ۝ ثُمَّ بَدَّلۡنَا مَکَانَ السَّیِّئَۃِ الۡحَسَنَۃَ حَتّٰی عَفَوۡا وَّقَالُوۡا قَدۡ مَسَّ
اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بَغۡتَۃً وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ۝ وَلَوۡ اَنَّ اَهۡلَ
الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ وَلٰکِنۡ
کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ ۝

❒ আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাহাতে তাহারা নতি স্বীকার করে।

❒ অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদিগের পূর্বপুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে। অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদিগকে আমি বিধৃত করি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

❒ যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করিত ও সাবধান হইত তবে তাহাদিগের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আমি কোনো জনপদে নবী পাঠালে তার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা নতি স্বীকার করে।' এ কথার অর্থ— আমি কোনো জনপদে নবী প্রেরণ করলে ওই জনপদের অধিবাসীরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তখন আমি তাদের উপর আপতিত করি দুঃখ ও ক্লেশ। এ রকম করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেনো তাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করে বিনম্র হয়। এটাই স্বাভাবিকতা যে, বিপদ মানুষকে বিনম্র করে। জাগিয়ে তোলে সত্যবোধ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, এখানে 'বা'সা' অর্থ দারিদ্র এবং 'দ্বর্‌রা' অর্থ ব্যাধি বা পীড়া। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বা'সা এবং দ্বর্‌রা (দুঃখ ও ক্লেশ) শব্দ দু'টোর অর্থ যথাক্রমে যুদ্ধ ও অনটন।

'লাআল্লাহুম ইয়াতাদ্বর্‌রাউ'ন' কথাটির অর্থ— যাতে তারা নতি স্বীকার করে।

কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীতে আ'সা (আশা করা যায়), কাদা (সম্ভবত), লাআল্লা (যাতে, যেনো)— এ সকল শব্দের ব্যবহার শোভনীয় নয়। কারণ এতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার শক্তি, অভিপ্রায় এবং জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। আশা করা যায়, সম্ভবতঃ, যাতে বা যেনো ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি অপরিমেয় ও অতুলনীয় নয়। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার ঘোষণায় সকল ক্ষেত্রে 'নিশ্চয়', 'অবশ্যই'— এ সকল শব্দ ব্যবহার হওয়াই সমীচীন। কারণ এতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তি যে সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী— সে কথাই প্রমাণিত হয়। এই অভিমতটি কিন্তু ভুল। কেননা বহু আয়াতে আ'সা, কাদা, লা আল্লা— এই শব্দগুলোর ব্যবহার ঘটেছে। আর এগুলো কোনোক্রমেই আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান, ইচ্ছা ও শক্তিকে খর্ব করে না। বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দগুলো। এই আয়াতে যেমন বলা হয়েছে উন্নাসিক জনতার উপর দুঃখ ও ক্লেশ আপতিত করার কথা। সত্য পথে প্রত্যাবর্তনের নিমিত্তেই আল্লাহ্‌পাক এ রকম দুঃখ বিপদ অবতারণ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় চরম বিপদগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো অবাধ্য সম্প্রদায় সত্যের দিকে ফিরে আসার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়নি। এ রকম বাস্তব অবস্থা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাআল্লা' (যাতে) শব্দটি। অন্য আয়াতেও তেমনি বাস্তব অবস্থাকে নির্দেশ করার জন্য 'আশা করা যায়', খুব সম্ভব বা সম্ভবতঃ ইত্যাদি শব্দগুলোর ব্যবহার ঘটেছে।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি; অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।' এ কথার অর্থ— দুঃখ বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও যখন উন্নাসিক জনতার বোধোদয় ঘটে না, তখন আমি তাদেরকে দান করি প্রাচুর্য। বংশবিস্তার ও সম্পদের প্রাচুর্যও আমি দান করি একই উদ্দেশ্যে— যাতে তারা সেই সুখ-শান্তি লাভের কারণে কৃতজ্ঞ হয়। আর ওই কৃতজ্ঞতার সূত্র ধরে ফিরে আসে সত্যের পথে। এভাবে আমি তাদেরকে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ দান করি। আমি অবতীর্ণ করি অকল্যাণ। তারপর ওই অকল্যাণকে পরিবর্তিত করি কল্যাণে। কিন্তু চির অবাধ্য সম্প্রদায় আমার এই পরীক্ষা সম্পর্কে উদাসীন। তারা বিপদে বিনয়ী হয় না, তেমনি কৃতজ্ঞ হয় না সুখ-সন্দর্শনেও।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।' এ কথার অর্থ অবিশ্বাসীরা বলে, এটা হচ্ছে সময়ের বিবর্তনের ফল। দুঃখ ও সুখ এভাবেই পালাক্রমে আসে। আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরেও এ রকম পালাক্রমে এসেছিলো দুঃখ এবং সুখ।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না।' এ কথার অর্থ— ওই অবিশ্বাসী সম্প্রদায় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণ থেকে বিচ্যুত। তাই তারা বোধ ও উপলব্ধিহীন। দুঃখ এবং সুখ যে আল্লাহ্তায়ালাই অবতীর্ণ করেন— তা তারা বুঝতেও পারে না। এভাবে আল্লাহ্তায়ালার গজবের উপযোগী হয়ে পড়ে তারা। তাই অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। তাদের উপর আপতিত করি আমার গজব।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে—'যদি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বাস করতো ও সাবধান হতো, তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।' এ কথার অর্থ— নির্দিষ্ট জনপদে প্রেরিত আমার নবীরা সঠিক পথের সন্ধান দান করেছিলেন। কিন্তু সত্যবিমুখ জনতা নিতান্ত মূর্খ ও অপরিণামদর্শী বলে তাদেরকে মান্য করেনি। তারা যদি তাঁদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে আমি তাদেরকে দান করতাম সর্বপ্রকার কল্যাণ। আকাশের ও পৃথিবীর। ইহকালের ও পরকালের। কিন্তু তারা তা করেনি। তাই তাদের অবিশ্বাস ও অপকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আকাশমণ্ডলীর কল্যাণ বা বরকত অর্থ বৃষ্টি। আর পৃথিবীর কল্যাণ বা বরকত অর্থ ফল, ফসল ও অন্যান্য শাক-সব্জি। বরকত শব্দটির অর্থ এখানে প্রবৃদ্ধি-প্রাচুর্য বিনষ্ট না হওয়া, দূরীভূত না হওয়া, অপসৃত না হওয়া ইত্যাদি। 'তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো'— কথাটির অর্থ এখানে, তারা আমার প্রেরিত পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তাদের উপর শাস্তি আপতিত হয়েছিলো এ কারণেই। তাই শেষে বলা হয়েছে— তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ○ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

❒ তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

❒ অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত?

❒ তাহারা কি আল্লাহের চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহের চক্রান্ত হইতে নিরাপদ বোধ করে না।

উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— 'তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন।' এখানে 'আফা আমিনা' (তবে কি তারা বিশ্বাস করে) কথাটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের (৯৫) 'অতঃপর অকস্মাৎ তাদেরকে আমি বিধৃত করি'— কথাটির সঙ্গে, যদিও বাক্য দু'টোর মধ্যে রয়েছে কিছুটা পরিভাষাগত অন্তরায়। এই যোগসূত্রের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— অতীতের অবাধ্য জনপদবাসীরাও ছিলো আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে বেখবর, যেমন বেখবর এখনকার মক্কাবাসীরা। তাদের উপর আমি অতর্কিতে আযাব অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন তারা ছিলো নিদ্রামগ্ন অথবা অন্য কোনো কর্মে ব্যস্ত। সুতরাং অবাধ্য মক্কাবাসীদের কি এই ভয় নেই যে, আমি তাদের উপর যে কোনো সময় আযাব অবতীর্ণ করতে পারি। এমন কি তাদের নিদ্রাবস্থাতেও। অতীতের অবাধ্যরা মিথ্যারোপ করেছিলো তাদের নবীদের প্রতি, আর এখনকার অবাধ্য মক্কাবাসীরাও মিথ্যারোপ করে চলেছে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ রসুল মোহাম্মদ স. এর প্রতি। কী নির্ভয় তারা! বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের 'আহ্লুল কুরা' (জনপদের অধিবাসীবৃন্দ) অর্থ— মক্কা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। আর 'ওয়াহুম নায়িমুন্' (যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন) কথাটির অর্থ— যখন তারা থাকবে গাফেল, আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত। আগের আয়াতের শুরুতে (৯৭) বলা হয়েছিলো 'আফা আমিনা' (তবে কি তারা বিশ্বাস করে) আর এই আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'আওয়া আমিনা' (অথবা কি বিশ্বাস করে)। এই দু'টো শব্দই ধমকের সুরে প্রশ্নাকারে ব্যবহার করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে। আগের আয়াতে বলা হয়েছে রাত্রিকালীন অসচেতনতার কথা। আর এই আয়াতে বলা হয়েছে দিবসকালীন ঔদাসীন্যের কথা। দু'টো আয়াতের সম্মিলিত বক্তব্য এই যে, রাতে অথবা দিনে, নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অথবা দিবসের কর্ম কোলাহলের মধ্যে, যে কোনো সময় অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর পতিত হতে পারে আল্লাহ্র গজব, অতীতের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর উপর যেমন আপতিত হয়েছিলো। এ কথা জানার পরেও মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অংশীবাদীরা কী এতোটুকুও ভয় করে না? এখানে 'দোহা' (পূর্বাহ্নে) শব্দটির উদ্দেশ্য— দ্বিপ্রহরপূর্ব সময়, যখন মানুষ থাকে ক্রীড়া বা কর্মমুখর।

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে—'তারা কি আল্লাহ্র চক্রান্তের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র চক্রান্ত থেকে নিরাপদ

বোধ করে না।' আগের আয়াত দু'টোতে বলা হয়েছে— তারা কি আল্লাহ্‌র গজবের ভয় করে না? আর এখানে বলা হয়েছে— তারা কি আল্লাহ্‌তায়ালার চক্রান্তের বা কৌশলের ভয় করে না? অর্থাৎ অবাধ্যতার তাৎক্ষণিক শাস্তি অবতীর্ণ না করে আল্লাহ্‌তায়ালা যে তাদেরকে কৌশলমূলক অবকাশ দান করেছেন, সেকথা ভেবে কি তারা ভীত হয় না? এ রকম নিরুপদ্রব জীবন যাপনের মধ্যেই তো আগের অবাধ্য সম্প্রদায়গুলোর উপর নেমে এসেছিলো অতর্কিত আযাব। সে রকম আযাব তো এখনো অকস্মাৎ নেমে আসতে পারে— সে ভয় কি বর্তমানের অংশীবাদীদের নেই?

উদ্ধৃত প্রশ্নাবলীর সিদ্ধান্তমূলক একটি জবাব দেয়া হয়েছে আয়াতের শেষে এভাবে—'এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌র চক্রান্ত থেকে নিরাপদ বোধ করে না।' এ কথার অর্থ— চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্ততাই যাদের ললাট-লিখন তারাই কেবল অবাধ্যতা ও অংশীবাদীতার মধ্যে নির্বিকার জীবন যাপন করতে পারে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০০, ১০১, ১০২

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ
وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ
يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ○ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ
وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ○

❐ কোন দেশের জনগণের পর যাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় তাহাদিগের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের পাপের দরুণ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দিব, এবং তাহারা শুনিবে না।

❐ এই জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের রসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করিবার ছিলো না, এইভাবে আল্লাহ্‌ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

❒ আমি তাহাদিগের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পাইয়াছি।

প্রথমে বলা হয়েছে—'কোনো দেশের জনগণের পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি।' এখানে 'আওয়া লাম ইয়াহদি' অর্থ— এটা কি প্রতীয়মান হয়নি? 'ইয়ারিছুনাল আরদ্ব' অর্থ— যারা এ ভূমির উত্তরাধিকারী হয়। 'মিমবা'দি আহ্‌লিহা' অর্থ— কোনো দেশের বিগত জনগণের ধ্বংসের পর। 'আঁল্ লাও নাশাউ' অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে। 'আসাব্‌নাহুম' অর্থ— তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। আর 'বিজুনুবিহিম' অর্থ— তাদের পাপের দরুন। এভাবে পূর্ণ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— ইতোপূর্বে কোনো দেশের অবাধ্য জনগণের বিনাশপ্রাপ্তির পর যারা তাদের শাস্তিসূত্রে উত্তরাধিকারীরূপে স্থলাভিষিক্ত হয়, তাদের নিকট কি এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, আমি ইচ্ছে করলে স্থলাভিষিক্তদেরকেও তাদের পাপাচারের দরুণ শাস্তি দান করতে পারি।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং তাদের হৃদয় মোহর করে দিবো এবং তারা শুনবে না।' এ কথার অর্থ— অবাধ্যদের চরম ঔদাসীন্যের শাস্তি আমি অবশ্যই দেবো। আমি তাদের হৃদয়ের দরজা করে দেবো অর্গলিত। জুজায বলেছেন, একই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। এখানে বলা হয়েছে, হৃদয়কে অবরুদ্ধ করে সত্যের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে দেয়াই হচ্ছে অবাধ্যদের প্রধান শাস্তি। সেই শাস্তিই আমি তাদেরকে দেবো। তাদের হৃদয়কে করে দেবো আমি মোহরাঙ্কিত। ফলে তারা সত্যের আওয়াজ হৃদয় দিয়ে শুনবে না।

পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'এ জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলো। কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাতে তারা বিশ্বাস করবার ছিলো না।' এখানে 'তিলকাল্ কুরা নাকুস্‌সু' মিন আমবায়িহা (এ জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি) কথাটির অর্থ— হজরত নুহ, হজরত লুত, হজরত শোয়াইবের সম্প্রদায় এবং আদ এবং ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি। 'ওয়ালাক্বদ জায়াত্ হুম রুসুলুহুম বিল বাইয়্যেনাত' অর্থ— তাদের নিকট তাদের রসুলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণ বা মোজেজাসহ এসেছিলো। 'ফামা কানু লি ইউ'মিনু বিমা কাজ্জাবু মিন্ ক্বলু' অর্থ— কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাতে তারা বিশ্বাস করবার ছিলো না। অর্থাৎ ওই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের প্রতি নবী-রসুল প্রেরণের পূর্বে যেমন অবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি নবী রসুল প্রেরণের পরে অবিশ্বাসীই রয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ্‌র এককত্বকে যেমন তারা আগে স্বীকার করতো না, তেমনি স্বীকার করতো না নবী-

রসুল প্রেরণের পরেও। নবুয়ত, শরিয়ত— কোনো কিছুরই পরোয়া করতো না তারা। সত্যের আহ্বান, মোজেজা দর্শন— কোনো কিছুই তাদের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা রয়ে গিয়েছিলো যথা পূর্বং তথা পরং।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, আত্মার জগতে যখন সর্বপ্রথম সকল আত্মাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা হয়েছিলো, তখনও অবিশ্বাসীদের আত্মা আন্তরিক স্বীকৃতি দেয়নি— দিয়েছিলো বাহ্যিক স্বীকৃতি। তাই পৃথিবীতে এসেও তারা পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে ও পরে রয়ে গিয়েছিলো বেইমান। তাই ধ্বংসের পর পুনরায় তাদেরকে পৃথিবীতে আনা হলেও তারা রয়ে যাবে অবিশ্বাসী। যতো কিছুই করা হোক না কেন, কোনো কিছুতেই কোনো দিনও তারা ইমান আনতো না। অন্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— যদি তাদেরকে বিরত রাখা হয়, তবুও তারা নিষিদ্ধ কাজের প্রতি পুনরায় ধাবিত হয়।

ইয়ামন বিন যুবাব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— প্রত্যেক নবী তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা তাদের নবীর কথা বিশ্বাস করেনি। ফলে আল্লাহ্‌র গজবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারা। তাদের স্থলে এসেছে অন্য এক সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য নবী প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তারাও তাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মতো। তাদের এ অপ-আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। সেখানে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট তাদের পূর্বে এমন কোনো রসুল আসেনি, যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করে দেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! অনড় অবিশ্বাসের কারণে আপনার পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের হৃদয় যেমন আমি মোহর করে দিয়েছিলাম, তেমনি আপনার সম্প্রদায়ের চির অবাধ্যদের হৃদয়ও আমি মোহর করে দিয়েছি। তাই তাদের অন্তরে ইমান অনুপ্রবেশ করবে না। অজস্র নিদর্শন দর্শনের পরেও তাই তাদের হৃদয় কখনো বিনম্র হবে না। হৃদয়ে তাদের জাগ্রত হবে না কখনো আল্লাহ্‌র ভয়ের পবিত্র অনুভূতি।

এর পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে—'আমি তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পেয়েছি।' এখানে 'ওয়ামা ওয়াজাদ্‌না লি আকছারিহিম' (তাদের অধিকাংশকে পাইনি) কথাটির অর্থ— ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অধিকাংশকে। 'মিন্ আ'হ্‌দিন' অর্থ— কাউকেই। এখানে কৃত প্রতিশ্রুতিটি রয়েছে অনুক্ত। ওই প্রতিশ্রুতিটি হচ্ছে আহদে মীছাক। অর্থাৎ হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার সকল সন্তানদেরকে বের করে নিয়ে যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তায়ালা গ্রহণ করেছিলেন, সেই

প্রতিশ্রুতি। অথবা ওই প্রতিশ্রুতি— যা বিপদ ও শত্রুকবলিত এক সম্প্রদায় করেছিলো এ কথা বলে যে— যদি আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে রক্ষা করা হয়, তবে আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো (হবো ইমানদার ও অনুগত)।

'ওয়া ইঁউ ওয়াজাদ্‌না আক্‌ছারাহুম লা ফাসিক্বীন' কথাটির অর্থ— কিন্তু তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পেয়েছি। কুফাবাসী আলেমগণ বলেছেন, 'ইন' (না) শব্দটি এখানে নেতিবাচক আর 'লাম' অক্ষরটির অর্থ এখানে 'ইল্লা' (ব্যতীত)— 'ইস্তেছনা' (ব্যতিক্রম)। বসরার আলেমগণ বলেছেন, এখানে 'ইন' (না) হচ্ছে মুখাফফাফ (সংক্ষেপক)। এমতাবস্থায় এখানে 'ওয়াজাদ্‌না' (আমরা পেয়েছি) কথাটি অর্থ হবে— আ'লিমনা (আমরা জেনেছি)। কেননা সংক্ষেপণ ক্রিয়াটি এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এটাই এমতো বাকভঙ্গির নিয়ম।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ
فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝
وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

❒ তাহাদিগের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই, কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

❒ মূসা বলিল, ' হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।

❒ আমি ইহাতে দৃঢ় যে আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না; তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদিগের নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সহিত যাইতে দাও।'

❒ ফেরাউন বলিল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর'।

❒ অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

❒ এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তাদের পর মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই।' এখানে 'মিম বা'দিহিম' (তাদের পর) কথাটির অর্থ— ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ্, হজরত লুত এবং হজরত শোয়াইবের পর। অর্থাৎ উল্লেখিত নবীগণের পর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাঁর পিতার নাম ছিলো ইমরান।

এখানে 'বি আয়াতিনা' (নিদর্শন) অর্থ, হজরত মুসা কর্তৃক আনীত মোজেজাসমূহ— একটু পরেই সেগুলোর বিবরণ আসবে। ফেরাউন ছিলো মিসর রাজ্যের অধিকারী। যেমন পারস্য রাজ্যের অধিকারী ছিলো কিসরা। হজরত মুসা যে ফেরাউনের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার নাম ছিলো কাবুস অথবা ওলিদ বিন মাসআব বিন রাইয়ান। 'মালাউন' শব্দটির অর্থ অভিজাত সম্প্রদায়, সম্প্রদায়াধিপতি, পারিষদ, সভাসদ ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফা জলামু বিহা' (কিন্তু তারা অস্বীকার করে) —এখানে 'জুলুম' শব্দের অর্থ অপাত্রে স্থাপন। এখানে তাই বলা হয়েছে, হজরত মুসার সত্য আহ্বানকে ফেরাউন ও তার একান্ত অনুচরেরা অপাত্রে স্থাপন করেছে। যথামূল্য দিতে স্বীকৃত হয়নি।

শেষে বলা হয়েছে—'বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিলো তা লক্ষ্য করো।' এ কথার অর্থ— স্মরণ করো, কী পরিণতি হয়েছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মিসর রাজ ও তার অনুসারীদের। আমি তো তাদেরকে সাগর বক্ষে সলিল সমাধি দিয়েছিলাম।

পরের আয়াতে (১০৪) বলা হয়েছে— মুসা বললো, হে ফেরাউন! 'আমি বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত।' এ কথার অর্থ, নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রত্যাদেশানুসারে মিসর রাজ্যের দরবারে উপস্থিত হয়ে হজরত মুসা ঘোষণা করলেন, হে মিসরাধিকারী! আমি বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত সত্য রসুল।

পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে—'আমি এতে দৃঢ় যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবো না; তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি। সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও।' এই আয়াতটিও হজরত মুসার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। অর্থাৎ ফেরাউনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হজরত মুসার বক্তব্য আগের আয়াত (১০৪) থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে এই আয়াতে এসে।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে—'হাক্বীক্বুন্ আ'লা'। কথাটির অর্থ— আমি এতে দৃঢ় যে, অথবা আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত যে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আ'লা' শব্দটি ছিলো আসলে আ'লাইয়া। পরে অতিরিক্ত বিবেচনায় 'ইয়া' অক্ষরটিকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা 'আ'লা' শব্দটি এখানে হরফে জর (যের প্রদায়ক)। স্বাভাবিক নিয়মে 'হাক্বীক্বুন' শব্দটির পরে 'বা' অক্ষরটি ব্যবহার করা যেতো। অর্থাৎ বলা যেতো—'হাক্বীক্বু বী'। কিন্তু নিশ্চিতি ও দৃঢ়তা প্রকাশার্থে আনা হয়েছে 'আ'লা' শব্দটি। যেমন—'রমাইতু বিল ক্বাওসি' অর্থ, আমি ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করেছি। আর 'রমাইতু আ'লাল ক্বাওসি' অর্থ— আমি দৃঢ়রূপে ধনুক ধারণ করে তীর নিক্ষেপ করেছি। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'হাক্বীক্বুন আ'লা' কথাটির অর্ন্তনিহিত অর্থ হবে 'হারিসুন আ'লা'। তখন কথাটির মর্মার্থ হবে— এটা আমার প্রতি অত্যাবশ্যক যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবো না।

'বাইয়্যেনাত' অর্থ— প্রমাণ। এখানে হজরত মুসা তাঁর নবুয়তের পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আনার কথা বলেছেন। এতে করে তিনি এ কথাটিই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যেহেতু স্পষ্ট প্রমাণ এনেছি, সেহেতু আমি সত্য রসুল। তোমরা আমার কথা মেনে নাও।

হজরত মুসার বক্তব্যের শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি হচ্ছে— সুতরাং বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও। এ কথার অর্থ— হে ফেরাউন! মিসর ভূমিতে বসবাসরত বনী ইসরাইল জনতাকে তাদের পিতৃ পুরুষের জন্মভূমিতে যেতে দাও। উল্লেখ্য যে, চারশত বছর আগে হজরত ইউসুফ যখন মিসররাজ ছিলেন, তখন মিসরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন হজরত ইয়াকুব। তিনি ছিলেন হজরত ইউসুফের পিতা। তাঁর বংশধরগণকে বলা হয় বনী ইসরাইল। হজরত ইউসুফের মহাঅন্তর্ধানের পর পুনরায় রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় অবিশ্বাসী সম্রাটেরা। তারা বিদ্বেষবশতঃ ক্রমবর্ধমান বিশাল বনী ইসরাইল জনতাকে প্রায় বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য করেছিলো। আদি মিসরীয়রা শ্রমিকের মতো খাটাতো তাদেরকে। মাটি কাটা, ইট পাথরের বিভিন্ন নির্মাণ ইত্যাদি তারা

করাতো বনী ইসরাইলদেরকে দিয়ে। তারা ভেবে নিয়েছিলো বনী ইসরাইলেরা তাদের ক্রীতদাস অথবা বন্দী। হজরত মুসাও ছিলেন বনী ইসরাইল বংশদ্ভুত। মজলুম বনী ইসরাইল জনতাকে মুক্ত করার প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তিনি। সেই প্রত্যাদেশানুসারেই তিনি বলেছিলেন— সুতরাং বনী ইসরাইলদের আমার সাথে যেতে দাও।

পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— ফেরাউন বললো, 'যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাকো, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ করো।'

এর পরের আয়াতে (১০৭) বলা হয়েছে—'অতঃপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাত অজগর হলো।' এখানে 'ছু'বানুন' অর্থ পুরুষ অজগর। ওই অজগরটি বিশালাকৃতি হলেও ছিলো ছোট সাপের মতো তীব্র গতি সম্পন্ন। অন্য এক আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন—'কা আন্নাহা জান্নুন' (যেনো ছোট সাপের মতো সঞ্চরণশীল)। হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী বলেছেন, হজরত মুসার যষ্টি অজগরে রূপান্তরিত হতো। অজগরটি ছিলো হলুদ বর্ণের। তার সারা শরীর ছিলো পশমে ভরা। মস্তকের উপরিভাগে ছিলো ঝুঁটি। অজগরটি মুখব্যাদান করলে তার উভয় দন্তপাটির মাঝখানে সৃষ্টি হতো আশি হাতের ব্যবধান। নিচের পাটি মাটিতে এবং উপর পাটি থাকতো রাজপ্রাসাদের শিখর বরাবর। অজগরটি ফেরাউনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো।

বর্ণিত হয়েছে, অজগরটি ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের গম্বুজ পুরে নিয়েছিলো তার মুখের মধ্যে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ফেরাউন ঢুকে পড়লো রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। সাপটি তখন জনতার দিকে অগ্রসর হতেই চিৎকার করে পালাতে শুরু করলো তারা। পরস্পরের পদতলে পিষ্ট হয়ে মারা গেলো পঁচিশজন। নিরুপায় ফেরাউন তখন রাজপ্রাসাদের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে মুসা! যে সত্তা কর্তৃক তুমি প্রেরিত হয়েছো, ওই সত্তার দোহাই দিয়েই আমি বলছি, তোমার সাপকে তুমি সামলাও। তাহলে আমি তোমার উপর ইমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাইলদেরকে যেতে দিবো। হজরত মুসা সাপটিকে ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেলো লাঠি।

হজরত কাতাদা থেকে মুয়াম্মারের মাধ্যমে আবদুর রাজ্জাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

শেষের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে—'এবং সে তার হাত বের করলো আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো।' মোজেজাস্বরূপ সর্প দর্শনের পর ফেরাউন হজরত মুসাকে বলেছিলো, আরো কোনো মোজেজা আছে নাকি তোমার? হজরত মুসা বলেছিলেন, হ্যাঁ। এ কথা বলেই তিনি প্রদর্শন করেছিলেন হস্ত শুভ্র হওয়ার মোজেজাটি। তিনি তাঁর হাত প্রবেশ করালেন আস্তিনের অভ্যন্তরে। তারপর হাত বের করে নিয়ে আসতেই দেখা গেলো ওই হাত থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে শুভ্র উজ্জ্বল আলো। ওই শুভ্রতা ছিলো অসাধারণ। সূর্যের

আলোকচ্ছটা অপেক্ষা তা ছিলো তীব্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তা ছিলো দৃষ্টিনন্দন এবং হৃদয়হারক। কিছুক্ষণ পর হজরত মুসা পুনরায় তার হাত প্রবেশ করালেন আস্তিনে। তারপর হাত বের করে আনতেই দেখা গেলো সেই শুভ্র উজ্জ্বল অলৌকিক আলোটি আর নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝

❒ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর,

❒ এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চায়; এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?'

❒ তাহারা বলিল 'তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও।' এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও,

❒ যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'এতো একজন সুদক্ষ যাদুকর।' অর্থাৎ দক্ষ যাদুকর বলেই সে মানুষের নজরবন্দী করে লাঠিকে দেখায় সাপরূপে, আর হাতকে করে আলোকিত। এ কথা বলেছিলো ফেরাউনের দরবারীরা। কিন্তু সুরা 'শুআরা'য় উক্তিটি ফেরাউনের উক্তিরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে করে মনে হয় ফেরাউন ও তার সভাসদেরা সকলেই এ রকম উক্তি করেছিলো। প্রথমে এ রকম বলেছিলো ফেরাউন। তারপর সে কথায় সায় দিয়েছিলো দরবারীরা। অথবা কথাটি পুনঃধ্বনিত হয়েছিলো তাদের কণ্ঠে। তারপর সকলে কথাটিকে সাধারণ্যে প্রচার করে দিয়েছিলো।

পরের আয়াতে (১১০) বলা হয়েছে—'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে চায়; এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?' এ কথাটি সম্ভবতঃ ফেরাউন বা তার দরবারীদের পূর্বের আয়াতে উক্ত বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। এ ছিলো তাদের পরামর্শ বিনিময়। পরামর্শ বিনিময়ের স্বরূপটি ছিলো এ রকম— হজরত মুসার অলৌকিক নিদর্শন দেখে ফেরাউন তার একান্ত অনুচরদের বললো, মুসা তো দেখছি একজন সুদক্ষ যাদুকর। কি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তার এ যাদু

প্রদর্শনের মধ্যে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে দূরভিসন্ধি। সে তোমাদেরকে তোমাদের জন্মভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়। এখন তোমরা পরামর্শ দাও— কি করা উচিত আমাদের।

পরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।' এখানে 'আরজিহ্ ওয়া আখাহু' কথাটির অর্থ— তাকে এবং তার ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। 'আরজিহ্' শব্দটির পূর্ণ রূপ হচ্ছে 'আরজিউহু। কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'আরজা'আল আম্রা' অর্থ— এই কর্মটিকে বিলম্বিত করেছি। এভাবে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— পরামর্শরূপে ফেরাউনের সভাসদেরা বললো, হজরত মুসার প্রতি ইমান আনার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে মুসা ও হারুনকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সমীচীন নয়। বরং তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া হোক। কিছুদিন যাক। তাহলে আসল অবস্থাটা বুঝা যাবে। আর ইত্যবসরে রাষ্ট্রীয় কিছু কর্মচারী এবং শান্তিরক্ষকদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো যেতে পারে। তারা খবর সংগ্রহ করে আনুক, বড় বড় যাদুকরেরা কোন্ কোন্ জনপদে বসবাস করে।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেনো তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।' এখানে 'সাহীরুন আ'লীম' অর্থ— সুদক্ষ যাদুকর। কথাটি 'ইয়াতুকা' (এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?) —প্রশ্নটির উত্তর। অর্থাৎ পরামর্শরূপে ফেরাউনের সভাসদেরা ফেরাউনকে এই মর্মে পরামর্শ দিয়েছিলো যে, সম্রাট যদি সম্মত হন তবে দিকে দিকে তথ্য সংগ্রাহক এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীকে পাঠিয়ে যাদুকরদের খোঁজখবর করা হোক। তারা বড় বড় যাদুকরদের ধরে আপনার দরবারে হাজির করবে। মুসার সঙ্গে তারা লিপ্ত হবে যাদুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যদি মুসা বিজয়ী হয়, তবেই কেবল আমরা তার উপর ইমান আনবো। আর যদি পরাজিত হয়, তবে আমরা বুঝতে পারবো মুসা আল্লাহ্র প্রেরিত কোনো পয়গম্বর নয়, সে আসলে যাদুকর।

হজরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী এবং ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, যখন ফেরাউন হজরত মুসার যষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা দেখলো, তখন বললো, মুসাকে পরাস্ত করতে হলে বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাতে হবে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক তার সঙ্গে পারবে না। এ কথা বলে সে বনী ইসরাইলের কিছু বালক নির্বাচন করে গুরাবা নামক এক পল্লীতে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে বাস করতো বড় বড় যাদুকর। তারা শিক্ষানবীসদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলো। ফলে তারাও হয়ে গেলো বড় বড় যাদুকর। এরপর ফেরাউন তাদেরকে ডেকে বললো, কি রকম শিক্ষা পেয়েছো তোমরা? তারা বললো, এখন পৃথিবীর সকল যাদুকর মিলেও আমাদের মোকাবেলো করতে পারবে না। তবে আসমান থেকে অবতীর্ণ কোনো কিছুর মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই।

এরপর ফেরাউন রাজ্যের বড় বড় যাদুকরদের একত্র করলো। মুকাতিল বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো বাহাত্তর জন— সত্তর জন বনী ইসরাইল এবং দুইজন কিবতী (মিসরের আদি অধিবাসী)। কিবতীদের প্রধান যাদুকরের নাম ছিলো শামউন। কালাবী বলেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো সত্তরজন। বনী ইসরাইল যাদুকরদেরও ছিলো একজন সর্দার। অন্যান্য যাদুকরেরা ওই দু'জন সর্দারের নিকট থেকে যাদু শিক্ষা করেছিলো। ঘটনাক্রমে ফেরাউনের কারাগারে বন্দী ছিলো তারা। হজরত কা'আব বলেছেন, ওই যাদুকরদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার। সুদ্দী বলেছেন, তিরিশ হাজার। ইকরামা বলেছেন সত্তর হাজার এবং মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন আশি হাজার।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○ قَالَ نَعَمْ
وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ
الْمُلْقِيْنَ ○ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ
بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَاْفِكُوْنَ ○ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا
صٰغِرِيْنَ ○

❒ যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?'

❒ সে বলিল, 'হাঁ' এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদিগেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

❒ তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব?'

❒ সে বলিল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর' যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল, তাহাদিগকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের যাদু দেখাইল।

❒ মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' সহসা উহা তাহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল;

❒ ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

❒ সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে— যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকটে এসে বললো, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' এ কথার অর্থ— সংগ্রাহকরূপে প্রেরিত রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে মিসররাজের সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের প্রাক্কালে যাদুকরেরা বললো, হে মিসরাধিরাজ! মুসার সঙ্গে যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে যদি আমরা জয়লাভ করি তবে আমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তো? আপনার ঘনিষ্ঠজনের মর্যাদা কি আমরা তাহলে পাবো?

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— সে বললো, 'হ্যাঁ' এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' যাদুকরদের প্রশ্নের উত্তরে কেবল হ্যাঁ বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু ফেরাউন হ্যাঁ বলার পরেও অতিরিক্ত এ কথাটি বলেছিলো যে—'এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' বাকভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, কথাটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর— যে প্রশ্নের মাধ্যমে ফেরাউনের একান্ত সান্নিধ্য কামনা করেছিলো যাদুকরেরা। আর ফেরাউন ইচ্ছে করেই যাদুকরদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য তার বক্তব্যকে দীর্ঘ করেছিলো— এ রকমও বলা যেতে পারে।

মুকাতিল বলেছেন, ফেরাউনের উপস্থিতিতে হজরত মুসা যাদুকরদেরকে বলেছিলেন, যদি আমি বিজয়ী হই তবে কি তোমরা আমার উপর ইমান আনবে? প্রধান যাদুকর বললো, কোনো যাদুকর আমার উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আপনি যদি বিজয়ী হন, তবে বুঝবো, আপনি যাদুকর নন— সত্য রসুল। তখন আপনার উপর নিশ্চয়ই ইমান আনবো আমরা।

পরের আয়াতে (১১৫) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'হে মুসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করবো? এ কথার অর্থ— হে মুসা! আপনিই কি প্রথমে আপনার যষ্টি নিক্ষেপ করবেন, না প্রথম লাঠি ও রশি নিক্ষেপ করবো আমরা? যাদুকরেরা চেয়েছিলো তারাই তাদের যাদু প্রদর্শন করবে প্রথম সুযোগে। তবুও নির্ভীকতা ও আনুষ্ঠানিকতা দেখাতে গিয়ে তারা হজরত মুসাকে এ রকম প্রশ্ন করেছিলো।

পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে— সে বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো।' এখানে হজরত মুসার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে রসুলসুলভ নির্ভীকতা। প্রতিপক্ষদের

বিশাল আয়োজন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সত্যের বলে বলীয়ান। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাই তিনি নির্ভীকচিত্তে জবাব দিয়েছিলেন— তোমরাই নিক্ষেপ করো।

এরপর বলা হয়েছে— যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন তারা লোকের চোখে যাদু করলো, তাদেরকে আতংকিত করলো এবং তারা বড় এক রকমের যাদু দেখালো। ঘটনাটি ঘটলো এভাবে— হজরত মুসার জবাব শুনে যাদুকরেরা প্রচণ্ড উৎসাহে তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে নিক্ষেপ করলো মাটিতে। যাদুর প্রভাবে বিশাল দর্শক জনতার ঘটলো দৃষ্টিবিভ্রম। তারা দেখতে পেলো, মাটিতে নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশিগুলো বিশালাকৃতির অজগরে রূপান্তরিত হয়ে ফোঁসফোঁস করছে। সম্মুখবর্তী প্রান্তরে কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সাপ আর সাপ। এভাবে উপস্থিত জনতাকে আতংকিত করলো যাদুকরেরা এবং প্রদর্শন করলো অভূতপূর্ব যাদুর খেলা।

এর পরের আয়াতে (১১৭) বলা হয়েছে—'মুসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো, সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগলো।' আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অসংখ্য সাপের গর্জন শুনে কিছুটা বিচলিত হলো হজরত মুসা। আমি তখন তার উপর অবতীর্ণ করলাম প্রত্যাদেশ। বললাম, হে আমার রসুল! বিচলিত হয়ো না। যাদুকরদের প্রদর্শিত সকল কিছুই প্রতারণা। প্রতারকেরা কখনোই সফল হয় না। তুমিও তোমার যষ্টি নিক্ষেপ করো। হজরত মুসা নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যষ্টিটি হয়ে গেলো— বিপুলাকৃতির একটি অজগর। দিগন্তকে আড়াল করে সেই অজগর ক্ষিপ্রতেজে তার শরীর সঞ্চালন করতে শুরু করলো এবং গ্রাস করতে লাগলো যাদুকরদের সাপগুলোকে। তারপর জনতার দিকে মুখ করতেই সকলে পালাতে শুরু করলো পড়িমরি করতে করতে। ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গেলো অনেকেই।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, যাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ইস্কান্দারিয়ায়। আর ওই অলৌকিক অজগরটির লেজ রয়ে গিয়েছিলো বাহিরাহ্ নামক স্থানে। আশি হাত চওড়া ছিলো অজগরটির মুখগহ্বর।

যাদুকরদের বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণ গ্রাস করার পর অলৌকিক অজগরটিকে ধরে ফেললেন হজরত মুসা। সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেলো তাঁর হাতের লাঠি। এতে করে প্রমাণিত হলো— হজরত মুসা যাদুকর নন, সত্য রসুল, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাধ্য কোনো যাদুকরের থাকতে পারে না।

পরের আয়াতে (১১৮) বলা হয়েছে— 'ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।'

তার পরের আয়াতে (১১৯) বলা হয়েছে—'সেখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হলো।' এ কথার অর্থ— মিসরাধিরাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপরে নেমে এলো চূড়ান্ত পরাজয়। চরমরূপে লাঞ্ছিত হলো তারা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

❒ এবং যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল।

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বিশ্ব-প্রতিপালকের প্রতি,

❒ যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

❒ ফেরাউন বলিল, 'কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য! ইহা তো এক চক্রান্ত; আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে।

❒ আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদিগের সকলকেই শুলবিদ্ধও করিবই।'

❒ তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব;

❒ তুমি তো আমাদিগের উপর দোষারোপ করিতেছ শুধু এই জন্য যে আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদিগের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী রূপে আমাদিগের মৃত্যু ঘটাও।

প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে—'ওয়া উলক্বিয়াস্ সাহারাতু সাজিদীন' (এবং যাদুকরেরা সেজদাবনত হলো)। আয়াতের বক্তব্যভঙ্গি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, যাদুকরেরা স্বেচ্ছায় সেজদাবনত হয়নি। আল্লাহ্পাকই তাদেরকে সেজদায় পতিত হতে বাধ্য করেছেন। সত্যদর্শনের আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া তাদের উপায়ন্তর ছিলো না। আখফাশ বলেছেন, অকস্মাৎ যাদুকরেরা সেজদায় পতিত হয়েছিলো। তাই বলা যায়, কেউ নিশ্চয় তাদেরকে সেজদায় পতিত করিয়েছিলো।

পরের আয়াতে (১২১) বলা হয়েছে— 'তারা বললো আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি।'

এরপরের আয়াতে (১২২) বলা হয়েছে, 'যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।' দুটো আয়াতের সম্মিলিত মর্মার্থ হলো এ রকম— সেজদা করার পর যাদুকরেরা ঘোষণা দিলো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি ইমান আনলাম। ইমান আনলাম ওই প্রতিপালকের প্রতি, যিনি হজরত মুসা এবং হজরত হারুনের প্রতিপালক। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যরেখা সুস্পষ্ট করার নিমিত্তেই এ রকম করে বলেছিলেন সত্যের আলোকস্নাত নতুন ইমানদারেরা। ফেরাউন নিজেকে প্রভুপ্রতিপালক বলতো। প্রজাসাধারণও তাকে প্রভুপ্রতিপালক বা রব হিসেবে মেনে নিয়েছিলো। যাদুকরদের ইমানের ঘোষণা শুনে জনসাধারণ হয়তো মনে করতে পারতো যে, যাদুকরেরা হয়তো নতুন উদ্যমে ফেরাউনকে প্রভুপ্রতিপালক হিসাবে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। তাই তারা তাদের ঘোষণাটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এভাবে— আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম বিশ্বপ্রতিপালকের প্রতি, যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক।

এর পরের আয়াতে (১২৩) বলা হয়েছে, 'ফেরাউন বললো, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা এতে বিশ্বাস করলে? তোমরা চক্রান্ত করেছো নগরবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কারের জন্য। এটা তো এক চক্রান্ত; আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে।' যাদুকরদেরকে হজরত মুসার দলে ভিড়ে যেতে দেখে ফেরাউন যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলো। সে ভাবলো, এটা নিশ্চয়ই পূর্ব-পরিকল্পিত। পূর্বেই তারা নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করেছিলো। রাজপরিবার ও মিসরের আদি অধিবাসীদেরকে উৎখাত করার জন্যই তারা নিজেদের মধ্যে আঁতাত করেছে। ফেরাউন তাই হুঙ্কার ছেড়ে বললো, কী! এতবড় স্পর্ধা তোমাদের। আমি তোমাদের প্রতিপালক। অথচ আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মুসাকে বিশ্বাস করে বসলে। এটা নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত। তোমরা এই নগরের অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও। কিন্তু জেনে রাখো, এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

এর পরের আয়াতে (১২৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবোই; অতঃপর তোমাদের সকলকেই শূলবিদ্ধও করবোই।' এখানে 'মিনখিলাফিন' কথাটির অর্থ— বিপরীত দিক থেকে কর্তন। অর্থাৎ ডান হাত এবং বাম পা অথবা বাম হাত এবং ডান পা কর্তন। 'লাউসাল্লীবান্নাকুম' কথাটির অর্থ নীল নদের কূলে, বৃক্ষের নিচে তোমাদেরকে আমি শূলে চড়াবো— যাতে করে তোমাদের চরম লাঞ্ছনার বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকট হয়ে ওঠে। আর সেই দৃশ্য দেখে অন্যেরাও যেনো শিক্ষা গ্রহণ করে।

হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউনই শূলবিদ্ধ করার প্রথাটির আবিষ্কারক।

এর পরের আয়াতে (১২৫) বলা হয়েছে— তারা বললো, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।' এরপরে ১২৬ আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তো আমাদের উপর দোষারোপ করছো শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে।' আয়াত দু'টোর সম্মিলিত মর্মার্থ হচ্ছে— সদ্য ইমান আনয়নকারী যাদুকরেরা বললো, হে মিসরের নৃপতি! আমরা লাভ করেছি সত্য পথ। বিশ্বাস করেছি আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন। এটা কোনো অপরাধ হতে পারে না। তবে তোমার আইনে যদি এটা অপরাধ হয়, তবে তুমি যা খুশি করতে পারো আমাদেরকে। আমরা সত্য থেকে একচুলও নড়বো না। আমরা সুনিশ্চিত যে, আমাদের প্রত্যাবর্তন আমাদের প্রতিপালকের নিকটেই। সুতরাং মৃত্যুর ভয় আমরা করি না।

শেষে উল্লেখিত হয়েছে, নতুন ইমানদারদের একটি প্রার্থনা। প্রার্থনাটির উল্লেখ এ রকম— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। এ কথার অর্থ— হে আমাদের আল্লাহ্! আমরা তোমাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা এ বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। মিসররাজ আমাদেরকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু তার হুমকির পরোয়া আমরা করি না। আমরা চাই, যে মুসিবত আমাদের উপর নেমে আসছে, সে মুসিবতে আমরা যেনো ধৈর্য ধারণ করতে পারি। হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং তোমার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার তৌফিক দান করো।

কালাবী বলেছেন, ফেরাউন সদ্য ইমানগ্রহণকারী ওই যাদুকরদের হাত ও পা কেটে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে শূলে চড়িয়েছিলো। কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন, ফেরাউন এ রকম করতে পারে না। কারণ একস্থানে হজরত মুসা এবং হজরত হারুনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—'তাদের ক্ষমতা তোমাদের নিকটে পৌঁছবে না। তোমরা দু'জন এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ
يَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

❒ ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, 'আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন?' সে বলিল, 'আমরা তাহাদিগের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদিগের উপর প্রবল।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাকে বর্জন করতে দিবেন?' এ কথার অর্থ— কিবতীদের বিভিন্ন গোত্রের নেতারা ফেরাউনকে বললো, মুসা ও তার সম্প্রদায়ের উত্থান তো অসহ্য। তারা আপনাকে যেমন মানে না, তেমনি মানে না আপনার পূজ্য প্রতিমাগুলোকে। এভাবে তারা দেশে শুরু করেছে ধর্ম বিপর্যয়। হে রাজন! আপনি কি এর কোনো বিহিত করবেন না? তাদেরকে কি এভাবেই ছেড়ে দেবেন?

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউনের কাছে ছিলো একটি গাভী। ওই গাভীটির পূজা করতো সে। প্রজাসাধারণের প্রতিও এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলো, সুন্দর কোনো গাভী পেলেই তার পূজা করতে হবে। পরবর্তী সময়ে সামেরীও তাই বনী ইসরাইলদেরকে গাই পূজার পরামর্শ দিয়েছিলো।

হাসান বসরী বলেছেন, ফেরাউন তার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখতো। ওই ক্রুশটির পূজা করতো সে।

সুদ্দী বলেছেন, ফেরাউন নির্মাণ করেছিলো একটি বিশাল মূর্তি এবং জনসাধারণকে বলেছিলো, এই মূর্তিটির পূজা করো তোমরা। এই মূর্তিটিই তোমাদের প্রভু। এ কথাও জেনে রাখো যে, তোমাদের এবং তোমাদের পূজ্য এই মূর্তিটির প্রভু আমি নিজে। সাধারণভাবে সে এই ঘোষণা দিয়েছিলো যে, 'আনা রব্বুকুমুল আ'লা' (আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু)। কিবতীরা ছিলো সূর্য ও নক্ষত্রের পূজারী।

এরপর বলা হয়েছে—'সে বললো, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো, আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।' এ কথার অর্থ— গোত্রীয় প্রধানদের কথা শুনে ফেরাউন বললো, ঠিক আছে।

এখন থেকে আমরা বনী ইসরাইলদের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলবো। আর নবজাত কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রেখে দেবো। এভাবে আমরা পর্যুদস্ত করে দেবো তাদেরকে। এ রকম করা আমাদের জন্য অতি সহজ। কারণ আমরা পরাক্রান্ত এবং তারা দুর্বল। উল্লেখ্য যে, হজরত মুসার জন্মের প্রাক্কালেও ফেরাউন এ রকম হুকুম জারী করেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার জন্মের বছরে ফেরাউন বনী ইসরাইলদের নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করিয়েছিলো। পুনরায় সে এ রকম হুকুম জারী করেছিলো হজরত মুসার নিকট থেকে সত্যধর্মের আহ্বান শোনার পর। এ রকম হুকুম জারী করার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিলো তার। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে— মানুষের কাছে এ কথা প্রমাণ করে দেয়া যে, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভুল। তারা বলেছিলো, বনী ইসরাইলদের মধ্যে এক শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে এবং তার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে ফেরাউন ও তার রাজত্ব। নতুন করে শিশু হত্যার নির্দেশ বলবৎ করে সে এ কথাটি সকলকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলো যে— দ্যাখো, মুসা কিন্তু জ্যোতিষীদের কথিত ব্যক্তিত্ব নয়। যদি তাই হতো তবে কিবতীরা নিশ্চয় বনী ইসরাইলদের উপর এ রকম পরাক্রান্ত থাকতে পারতো না।

দ্বিতীয়বার শিশু হত্যার নির্দেশ শুনে আতংকিত হলো বনী ইসরাইলেরা। অনুযোগ পেশ করলো হজরত মুসা সকাশে।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ১২৮

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

❐ মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'আল্লাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; রাজ্য তো আল্লাহেরই! তিনি তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদিগের জন্য।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বনী ইসরাইলদের অনুযোগ শুনে হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিনীতভাবে রোদন করো। শরণ প্রার্থনা করো তাঁর নিকটেই। আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তোমাদের উপর যে দুঃখ বিপদ আপতিত হয়েছে তা সহ্য করে যাও। এটা হচ্ছে তোমাদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সচেষ্ট হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকেই করেন রাজ্যাধিকারী। কখনো অবিশ্বাসীকে আবার কখনো বিশ্বাসীকে। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার সিদ্ধান্তের প্রতি অনুযোগ উত্থাপন কোরো না। মনে রেখো,

সাবধানীদের (মুত্তাকীদের) জন্যই নির্ধারিত রয়েছে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য। তাদের জন্য রাখা হয়েছে জান্নাত। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সুখ বা দুঃখ কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং বিপদে ধৈর্য-ধারণ করো। ধ্বংসশীলতার প্রতি বিমুখ হয়ে দৃষ্টি ফেরাও অবিনাশী আখেরাতের দিকে।

এখানে 'রাজ্য তো আল্লাহ্‌রই'—কথাটির অর্থ, সকল রাজ্যের মতো এই মিসর রাজ্যও নিশ্চয় আল্লাহ্‌র। আর 'তিনি তার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন'— কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি অনুক্ত শুভ সংবাদ। সেই শুভ সংবাদটি হচ্ছে— অচিরেই ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে আর তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে তোমরা— বনী ইসরাইলেরা।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটি হচ্ছে— ওয়াল আ'ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন (এবং শুভ পরিণাম তো সাবধানীদের জন্য)। 'উক্ববা' এবং 'আ'ক্বিবাত্' শব্দদ্বয়ের অর্থ— পশ্চাৎ থেকে আসা কোনো কিছু, যা পরিণতি বা পরিণাম নির্নায়ক। কর্মের নেপথ্যেই থাকে বিনিময় বা পরিণাম। শুভ পরিণাম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় উক্ববা, আ'ক্বিবাত্, উ'ক্বব— এই শব্দগুলো। আর মন্দ পরিণতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয় আ'ক্ববাত্, মুয়া'ক্বিবাত্ এবং ই'ক্বাব্। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন— উলায়িকা লাহুম্ উ'ক্ববাদ্ দার (তাদের জন্য শুভ পরিণতিস্থল), ওয়ানি'মা উক্ববাদ্‌দার (আর শুভ পরিণতিস্থল কতোইনা সুন্দর), ওয়া খইরু উ'ক্ববা (আর সুন্দর পরিণতি) ইত্যাদি। আবার অন্যত্র এরশাদ করেছেন— ওয়া হাক্কা ই'ক্বাব (আর বাস্তব হলো শাস্তি), শাদীদুল ই'ক্বাব (কঠোর শাস্তি), ওয়া ইন আ'ক্বাব্‌তুম ফাআ'ক্বাবু বিমিছলি মা উ'ক্বিব্‌তুম (যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে তোমাদেরকে প্রদত্ত শাস্তির অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করো) ইত্যাদি।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১২৯

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ
اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۟

❐ তাহারা বলিল, 'আমাদিগের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও।' সে বলিল 'শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বললো, আমাদের নিকট তোমার আসবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসবার পরেও।' এ কথার অর্থ— বনী ইসরাইলেরা বললো, হে আমাদের পয়গম্বর মুসা! আমরা তো একই অবস্থায় রয়ে গেলাম। তোমার পয়গম্বর হিসেবে আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ফেরাউন আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। আগেও সে আমাদের শিশুদেরকে হত্যা করিয়েছে। এখনো দিয়েছে নতুন করে শিশু হত্যার নির্দেশ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— বনী ইসরাইলেরা বললো, হে নবী মুসা! তোমার নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাদেরকে বিনা মূল্যে অর্ধ দিবস শ্রম দিতে হতো। আর এখন বিনা মূল্যে শ্রম দিতে হচ্ছে পূর্ণ দিবস।

কালাবী বলেছেন, হজরত মুসার নবুয়ত লাভের পূর্বে ফেরাউন নিয়ম করে দিয়েছিলো— মাটি ছেনে ইট তৈরীর জন্য খামীর প্রস্তুত করবে অন্য শ্রমিকেরা এবং ইট প্রস্তুতের জন্য শ্রম দেবে বনী ইসরাইলেরা। আর হজরত মুসার নবুয়ত লাভের পর সে নিয়ম করে দিলো— মাটি ছেনে খামীর প্রস্তুত করা থেকে ইট প্রস্তুত করা পর্যন্ত সব কাজই করতে হবে বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমরা কী করো তা তিনি লক্ষ্য করবেন।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! উত্তমরূপে অবগত হও যে, অচিরেই আল্লাহ্পাক ফেরাউনের রাজত্ব ধ্বংস করে দিবেন। তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করবেন তোমাদেরকে। তখন তিনি তোমাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করবেন যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো কি না।

আলোচ্য আয়াতে দেয়া হয়েছে বনী ইসরাইলদেরকে বিজয় ও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি। সেই সঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, ওই সুখের সময়েও কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা নেয়া হবে তোমাদের, যেমন এখন নেয়া হচ্ছে ধৈর্যের পরীক্ষা। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, বিপদে ধৈর্য ধারণ এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

বলা বাহুল্য যে, বনী ইসরাইলেরা বিপদে যেমন ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি, তেমনি বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করার পরেও প্রকাশ করতে পারেনি কৃতজ্ঞতা। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। তাদের সাম্রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী করে দিয়েছিলেন বনী ইসরাইলদেরকে। কিন্তু তারা এই অনুগ্রহের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে শুরু করে দিয়েছিলো গো-শাবকের পূজা। বর্ণিত হয়েছে, হজরত দাউদের সময় থেকে মিসর রাজ্যে বসবাস গড়তে শুরু করেছিলো বনী ইসরাইলেরা।

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ আমি তো ফেরাউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

❒ যখন তাহাদিগের কোন কল্যাণ হইত তাহারা বলিত ইহা তো আমাদিগের প্রাপ্য, আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহা মূসা ও তাহার সঙ্গীদিগের উপর আরোপ করিত; শোন, তাহাদিগের শুভাশুভ আল্লাহের নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ ইহা জানে না।

❒ তাহারা বলিল, 'আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদিগের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা আক্রান্ত করেছি। এখানে 'বিস্‌সিনীনা' শব্দটির অর্থ অভাব, দুর্ভিক্ষ। 'আস্‌সানাতুন' অর্থ সাল বা বছর। অভাবের বছর বুঝাতে গিয়ে অতি ব্যবহারের কারণে শব্দটির অর্থ হয়েছে অভাব বা দুর্ভিক্ষের বছর। দুর্ভিক্ষের বছরই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে। 'আস্‌সানাতুন' শব্দটি আরো অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন 'সান্নাতুল ক্বওমি' (ওই ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়েছে) 'মাস্‌সাত্ হুমুস্‌সান্নাত' (তাদের উপর পতিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ) ইত্যাদি। 'বিস্‌সিনীনা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচন রূপে। কিবতীদের উপর বছরের পর বছর অথবা উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ এসেছিলো বলেই শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচন হিসেবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ রকম মন্তব্য করেছেন।

'ওয়া নাক্বসিম্ মিনাছ ছামারত' কথাটির অর্থ— এবং ফল-ফসলের স্বল্পতা। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে বুঝানো হয়েছে— ফসলের স্বল্পতা গ্রামবাসীদের জন্য দেখা দিয়েছিলো। আর ফলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছিলো শহরবাসীদের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাআল্লা হুম ইয়াজ্জাক্কারুন' (যাতে তারা অনুধাবন করে)। এ কথার অর্থ— পাপাচারে ও অবাধ্যতার কারণেই যে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা, এ কথা যেনো তারা উপলব্ধি করে। অর্থাৎ সত্য উপলব্ধি জাগ্রত করার নিমিত্তেই তাদের উপর আমি অবতারণ করেছিলাম দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা।

পরের আয়াতে (১৩১) বলা হয়েছে—'যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো তারা বলতো, এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো তখন তা মুসা ও তার সঙ্গীদের উপর আরোপ করতো। এখানে 'হাসানাত' (কল্যাণ) অর্থ— শস্যশ্যামল শস্যক্ষেত, ফল ভরা বাগান, নিরাপত্তা, সুখ ইত্যাদি। 'ক্বালু' অর্থ— ফেরাউনের অনুসারীরা বলতো। 'লানা হাজিহি' অর্থ— এটাতো আমাদের প্রাপ্য। 'সাইয়েয়াতুন' অর্থ— অকল্যাণ বা বিপদ-মুসিবত, দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা ইত্যাদি। 'বি মুসা ওয়ামাম্মাআ'হু' অর্থ— মুসা ও তার সঙ্গীদের জন্য। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— ভালো কিছু হলে বা নির্বিঘ্ন জীবন-যাপন চলতে থাকলে ফেরাউনের অনুসারীরা বলতো, এটা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। আর এটাই আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু কোনো অকল্যাণ হলে বা বিপদ মুসিবত এসে পড়লে তারা বলতো, মুসা ও তার সঙ্গীদের জন্যই আমাদের উপর নেমে এসেছে এই দুর্বিপাক। মুসার আবির্ভাবের আগে আমরা তো কখনো এ রকম খরা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ দেখিনি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেছেন, ফেরাউনের রাজ্য শাসনকাল ছিলো চারশত বছর। তার রাজত্বকাল পূর্ব সময় থেকে তার রাজ্য শাসনকাল পর্যন্ত ছয়শত ছাব্বিশ বছর ধরে মিসরে কোনো বালা মুসিবত আসেনি। আর মুসার সময়ে ফেরাউন তার সারা জীবনে কোনো রকম কষ্টই পায়নি। সামান্য ক্ষুধা অথবা জ্বরের কষ্টও যদি সে পেতো, তবে 'আমি তোমাদের বড় প্রভু'—এ রকম কথা কিছুতেই বলতে পারতো না। 'কল্যাণ আমাদের প্রাপ্য এবং অকল্যাণ মুসা ও তার সঙ্গীদের কারণে আপতিত হয়'—এ রকম কথাও তার মুখে উচ্চারিত হতো না। তার এমতো উক্তি যে চরম নির্বুদ্ধিতার নামান্তর তা বলাই বাহুল্য। তার হৃদয় হয়ে গিয়েছিলো পাথরের মতো। তাই সে এ কথা কিছুতেই বুঝতে পারতো না যে, নিরুপদ্রব জীবন হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত একটি বিশেষ অনুগ্রহ। আর এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পরীক্ষাও বটে। ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রকৃত অনুগ্রহ-দাতা আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁর প্রিয় রসুলকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন অলৌকিক নিদর্শন, তখন তারা সত্যের আহ্বানকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আশ্রয় করেছে অবাধ্যতাকে। এই অকৃতজ্ঞতার কারণেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের স্বল্পতা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি।

এরপর বলা হয়েছে—'শোনো, তাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ কথা জানে না।' এ কথার অর্থ, শুভ এবং অশুভ আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্‌তায়ালাই ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে পার্থিব কল্যাণের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন বলেই তারা পেয়েছিলো বিপদমুক্ত জীবন। আর এখন আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদের অকল্যাণ চান বলে তারা হয়েছে অশুভ অবস্থার সম্মুখীন। এ অবস্থা হচ্ছে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যতার শাস্তি। কিন্তু তারা অবোধ। তাই এ কথা বুঝতে পারছে না। তারা চির অবিশ্বাসী বলেই অদৃষ্টের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত।

কামুস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'ত্বইরু' অর্থ শুভাশুভ— তকদির বা অদৃষ্ট। অথবা শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম। কিংবা 'অশুভ' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে অশুভ অবস্থার কারণ। অর্থাৎ অশুভ অবস্থার কারণ হিসেবে তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের পাপসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাদের অদৃষ্টে। আর অদৃষ্ট অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশে তাদের উপর নেমে এসেছে বিভিন্ন প্রকার বিপদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সবচেয়ে অশুভ অবস্থা হচ্ছে— তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে চিরস্থায়ী নরক।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, এখানে 'আল হাসানাতু' (কল্যাণ) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে লামে তারীফ (প্রত্যয়সূচক লাম) সহযোগে। 'সাইয়েয়াতুন' (অকল্যাণ) শব্দটিতে সে রকম করা হয়নি। 'আল হাসানাতু' এর সঙ্গে আবার উল্লেখিত হয়েছে 'ইজা' (যখন) শব্দটি— যা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াকে বাস্তবরূপে প্রমাণিত করেছে। অপরদিকে সাইয়েয়াতুন শব্দটির সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে ইন্‌ (যদি) শব্দটি— যা সুনির্দিষ্ট নয়। এই পার্থক্যটির কারণ হচ্ছে— অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত রহমতের কারণে আল্লাহ্‌তায়ালাই স্বেচ্ছায় ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে পার্থিব কল্যাণ দান করেছিলেন। কিন্তু অকল্যাণের কারণ তারাই সৃষ্টি করেছিলো। অকৃতজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ডেকে এনেছিলো আল্লাহ্‌র আযাব। আর অবশ্যই তা আল্লাহ্‌তায়ালার অননুমোদিত ছিলো না। তাই এখানে 'লাম'কে লামে তারীফ এবং ইজা সহযোগে এবং অকল্যাণকে অনির্দিষ্ট অবস্থায় এবং ইন্‌ সহযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (১৩২) বলা হয়েছে—'তারা বললো, আমাদেরকে যাদু করবার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করো না কেনো আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো না।' বিদ্রূপবশতঃ হজরত মুসা কর্তৃক আনীত মোজেজাসমূহকে ফেরাউন ও তার লোকেরা বলতো যাদু। তাই তারা এভাবে

বলতে পেরেছিলো যে, হে মুসা! তুমি যতো কিছুই অলৌকিক নিদর্শন দেখাও না কেনো, যাদুর মাধ্যমে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে আমাদের ধর্মমত থেকে যতই সরাতে চেষ্টা করো না কেনো, কিছুতেই আমরা তোমাকে এবং তোমার ধর্মমতকে গ্রহণ করবো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৩

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ○

❐ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপর আপতিত পাঁচটি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তিগুলো হচ্ছে— প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত। এরপর বলা হয়েছে, ওই শাস্তিগুলোও ছিলো আল্লাহ্তায়ালার আয়াত বা স্পষ্ট নিদর্শন। এ সকল নিদর্শন দেখেও তাদের বোধোদয় ঘটেনি। তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি তাদের অহমিকার বৃত্ত থেকে। তাই এরপর বলা হয়েছে— কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

ইবনে আবী হাতেম এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উপরে বর্ণিত আযাবগুলো এসেছিলো এক মাস পর পর।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, একটি আযাব চলতে থাকতো এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত— এক সপ্তাহকাল। তারপর দেয়া হতো এক মাসের বিরতি। বিরতির পর শুরু হতো দ্বিতীয় আযাব। এই নিয়মে ধারাবাহিকভাবে তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো উপরে বর্ণিত পাঁচটি আযাব। তাঁর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, যাদুকরেরা পরাস্ত হওয়ার পর বিশ বছর পর্যন্ত হজরত মুসা তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং কিছুদিন পর পর তাদেরকে প্রদর্শন করা হতো নতুন নতুন মোজেজা।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত কাতাদা, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, যাদুকরদের ইমান আনার পরেও ফেরাউন ও তার সঙ্গীরা অবিশ্বাসে অনড় হয়ে রইলো। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন দুর্ভিক্ষ। তাদের ফল ও ফসলের উৎপাদনে দেখা দিলো স্বল্পতা। এতে করে তাদের বোধোদয় ঘটলো

না। হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! ফেরাউন অবাধ্য। তারা বিপদে পড়লে ইমান আনবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে। আর বিপদ সরে গেলে জানাচ্ছে অস্বীকৃতি। অতএব হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ করো, যা আমার সম্প্রদায় এবং অনাগত মানবতার জন্য হয় নসিহত। প্রার্থনা কবুল হলো। আল্লাহ্তায়ালা পাঠালেন প্লাবন। শুরু হলো আঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত। ওই বৃষ্টির পানিতে ডুবে গেলো কিবতীদের ঘরদোর। বসা বা শোয়ার জায়গা তাদের রইলো না। পানির মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাদেরকে। তাদের ফসলের ক্ষেতও নিমজ্জিত হলো প্লাবনে। চাষাবাদের কোনো সুযোগও আর রইলো না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, পাশাপাশি বসবাস করলেও বনী ইসরাইলদের ঘরদোর ছিলো প্লাবনমুক্ত। ওই প্লাবন স্থায়ী ছিলো সাত দিন— এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত।

মুজাহিদ এবং আতা বলেছেন, এখানে প্লাবন অর্থ মৃত্যু। জননী আয়েশা থেকে ইবনে জারীর কর্তৃক একটি মারফু বর্ণনায় রয়েছে, ওয়াহাব বলেছেন, ইয়ামিনি পরিভাষায় প্লাবন বা তুফানকে বলা হয় প্লেগ। আবু কালাবাহ্ বলেছেন, এখানে তুফান কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, বসন্ত রোগ। কিবতীরাই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে ওই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিলো অন্যান্য স্থানে।

মুকাতিল বলেছেন, ওই আযাব এসেছিলো পানির তুফানরূপে— যা তাদের ফসলের ক্ষেতকে নিমজ্জিত করেছিলো। আবু জুবিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই তুফান ছিলো মহান আল্লাহ্র একটি হুকুম— যাকে বলা হয়েছে তায়েফ। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাত্বাফা আলাইহিম ত্বয়েফুম্ মির্ রব্বিকা ওয়াহুম নায়েমুন' (আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি প্রদক্ষিণকারী দল তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় প্রদক্ষিণ করলো)।'

কুফাবাসী আলেমগণ বলেছেন, 'রূহ্জান' এবং 'নুকসান' শব্দ দু'টোর মতো 'তুফান' শব্দটিও একটি মূল শব্দ— যার বহুবচন নেই। কিন্তু বসরাবাসী আলেমগণের মতে তুফান শব্দটি বহুবচন— এর এক বচন হচ্ছে 'তুফানাতুন'।

প্লাবনে নিমজ্জিত নিরুপায় কিবতীরা কাকুতি মিনতি করে বললো, হে মুসা! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের প্লাবন-মুক্তির জন্য দোয়া করুন। প্লাবন সরে গেলে আমরা আপনার উপর ইমান আনবো এবং বনী ইসরাইলদেরকে আর উত্যক্ত করবো না। হজরত মুসা দোয়া করলেন। সরে গেলো প্লাবনের আযাব। সে বছর ফল ও ফসলের উৎপাদন হলো প্রচুর ও অভূতপূর্ব। সবুজের সমারোহে ছেয়ে গেলো সারা দেশ। এ অবস্থা দেখে কিবতীরা বললো, প্লাবনের পানি তো এসেছিলো নেয়ামতরূপে। তাই তো দেশে এখন এতো ফসলের সমারোহ। তাদের প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গেলো তারা। এভাবে অতিবাহিত হলো একটি মাস। তারপর নেমে এলো দ্বিতীয় আযাব।

পঙ্গপালে ছেয়ে গেলো সারা দেশ। পঙ্গপালের দল প্রথম চোটেই সাবাড় করে দিলো ক্ষেতের সকল ফসল। তারপর একে একে খেতে শুরু করলো শাকসব্জী, গাছপালা, ঘরের দরজা, জানালা, কড়িকাঠ। বনী ইসরাইলেরা সব দিক থেকে রইলো নিরাপদ। পঙ্গপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিবতীরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে মুসা! আমাদেরকে বাঁচাও। এক্ষুণি দোয়া করো তোমার আল্লাহ্‌র কাছে। বলো, পঙ্গপালের হাত থেকে রক্ষা পেলে আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো তোমার ধর্মমত। কিবতীদের কাকুতি মিনতি শুনে হজরত মুসা দোয়া করলেন। এক শনিবার থেকে পরের শনিবার পর্যন্ত একনাগাড়ে অত্যাচার চলার পর হজরত মুসার দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ওই পঙ্গপালগুলোর প্রত্যেকটির বুকে লেখা ছিলো—'আল্লাহ্‌র সৈন্য'। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, সাতদিন পর হজরত মুসা শহরের বাইরে এক প্রান্তরে পৌঁছে হাতের লাঠি দ্বারা ইশারা করলেন। তার লাঠির ইশারা অনুসরণ করে পঙ্গপালেরা তৎক্ষণাৎ যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলে গেলো। দেশের খাদ্যশস্য সম্পূর্ণই শেষ করে ফেলতো পঙ্গপাল। কিন্তু তার আগেই কার্যকর হলো হজরত মুসার দোয়া। পঙ্গপাল চলে যাওয়ার পর তাই কিবতীরা বলতে শুরু করলো, যাক, পঙ্গপাল তো আমাদেরকে পুরোপুরি অন্নহীন করতে পারেনি। কষ্টে সৃষ্টে এ দিয়েই আমরা ফসলের মওসুম পর্যন্ত চালিয়ে দিতে পারবো। কষ্ট হলেও এ ব্যাপারে আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। পিতৃপুরুষদের ধর্মরক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য।

তাদের এ সকল কথা শুনে মনঃক্ষুণ্ন হলেন হজরত মুসা। ভাবলেন, কী অবলীলায় কিবতীরা পুনঃপুনঃ ভঙ্গ করে চলেছে অঙ্গীকার। দেখতে দেখতে কেটে গেলো একটি মাস। কিবতীদের উপর আবার নেমে এলো গজব। হঠাৎ করে দেশ ছেয়ে গেলো উকুনে।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত 'কুম্মাল' শব্দটির অর্থ ঘুণ বা কীট। হজরত কাতাদা, মুজাহিদ, সুদ্দী এবং কালাবী বলেছেন, কুম্মাল হচ্ছে ডানাবিহীন ছোট ছোট ফড়িং। আগের পঙ্গপালগুলো ছিলো বড় বড় ডানা বিশিষ্ট। আর পরের উকুন বা ফড়িংগুলো ছিলো ডানাহীন।

হজরত ইকরামা বলেছেন, মাদী ফড়িংকে বলা হয় কুম্মাল। আবু উবায়দা বলেছেন, কুম্মাল হচ্ছে হামনান (কীট বিশেষ)। আতা খোরাসানী বলেছেন, কুম্মাল শব্দটির অর্থ— উকুন।

বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসাকে নির্দেশ দিলেন, আইনশ্‌শামস্‌ গ্রামের দিকে যাও। সেখানে রয়েছে একটি ধুসর টিলা। ওই টিলার পাদদেশে তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। যথাস্থানে লাঠির আঘাত করতেই সেখানে সৃষ্টি হলো একটি গহ্বর। আর ওই গহ্বর থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরোতে শুরু করলো অসংখ্য উকুন। উকুনগুলো ঢুকে পড়লো তাদের ক্ষেতে, সব্‌জী বাগানে, ঘরে, কাপড়ে, খাবারের বাসনে— সবখানে। উকুনের কামড়ে চিৎকার করতে লাগলো কিবতীরা। খাওয়া দাওয়াও গেলো বন্ধ হয়ে। কারণ আহারের উদ্যোগ নিলেই আহার্য বস্তুর মধ্যে মুহূর্তমধ্যে ঢুকে পড়তো অসংখ্য উকুন।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, কুম্মাল অর্থ শস্যদানা ভক্ষণকারী কীট বা ঘুণ পোকা। কিবতীদের খাদ্যবস্তু দ্রুত খেয়ে ফেলতে শুরু করলো ওই পোকাগুলো। গম পিষে আটা তৈরী করতে না করতেই পোকাগুলো খেয়ে ফেলতো দশ ভাগের প্রায় নয় ভাগ। এ রকম বিপদে আর কখনো পড়েনি কিবতীরা। তারা তাই দিশাহারা হয়ে পড়লো। পোকাগুলো কিবতীদের মাথার চুল, শরীরের পশম, চোখের ভ্রূ সব খেয়ে ফেললো। সারা শরীরে সব সময় কিলবিল করতে থাকতো পোকাগুলো। দেখলে মনে হতো যেনো তাদের শরীরে দেখা দিয়েছে বসন্ত রোগ। শয়ন, বিশ্রাম, নিদ্রা সবকিছু বন্ধ হয়ে গেলো কিবতীদের। আর্তচিৎকার শুরু করে দিলো তারা। হজরত মুসাকে বললো, আমরা তওবা করছি। আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। আযাব সরে গেলে আমরা আপনার ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবো। হজরত মুসা প্রার্থনা জানালেন। দুই শনিবারের মধ্যবর্তী সময়ে উকুনের আযাবে বিপর্যস্ত থাকার পর উদ্ধার পেলো কিবতীরা। কিন্তু এবারও তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। বললো, বুঝেছি। তুমি আসলে যাদুকর। না হলে পাহাড়ের টিলা থেকে তুমি এতো উকুন বের করলে কি করে। এক মাস আরামে কাটালো তারা। হজরত মুসা পুনরায় বদদোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর অবতীর্ণ করলেন ব্যাঙের আযাব।

অসংখ্য ব্যাঙে ভরে গেলো দেশ। গৃহ, গৃহাঙ্গন, প্রান্তর, খাদ্যপাত্র— সবকিছুতে কিলবিল করতে লাগলো কেবল ব্যাঙ আর ব্যাঙ। কিবতীদের মাথায়, শরীরে বার বার লাফ দিয়ে বসতো ব্যাঙেরা। কথা বলার জন্য মুখ খুলতেই মুখে ঢুকে পড়তো। বসে থাকতো হাড়ি পাতিলের মধ্যে। উনুনে আগুন জ্বালালে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে নিভিয়ে দিতো আগুন। শয্যা হয়ে উঠতো ব্যাঙের স্তুপ। ফলে বিশ্রাম ও নিদ্রা হয়ে গেলো বন্ধ। খাবার জন্য মুখ খুললে মুখে ঢুকে যেতো ব্যাঙ। ফলে পানাহারও বন্ধ করতে হলো তাদেরকে। খাদ্য প্রস্তুতকালেও আটার খামীরের মধ্যে মিশে যেতো ব্যাঙেরা। এই চরম বিপদ থেকে কোনোক্রমেই পরিত্রাণ পাচ্ছিলো না তারা।

হজরত ইকরামার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ব্যাঙ প্রথমে ছিলো স্থলভাগের প্রাণী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যখন তাদেরকে কিবতীদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলেন, তখন নির্দেশ পালনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো তারা। তখন মাটি পানি আগুন— কোনো কিছু পরোয়া না করে তারা বার বার লাফিয়ে পড়তে থাকলো কিবতীদের পানি ভর্তি বালতিতে, চৌবাচ্চায়, হাঁড়িতে, আবার কখনো জ্বলন্ত উনুনে। আল্লাহ্তায়ালা তাদের এই আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তখন থেকে মাটি ও পানি উভয় স্থানে তাদের বসবাস করে দিলেন স্বচ্ছন্দ।

ব্যাঙের আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে কিবতীরা হজরত মুসার কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করলো খুব। বললো, এবার আমরা খাঁটি তওবা করছি। হে মুসা! এখন থেকে আপনার ধর্মই আমাদের ধর্ম। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আর কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না আমরা। হজরত মুসা বিগলিত হলেন। দোয়া করলেন আযাব অপসারণের জন্য। ফলে এক শনিবার থেকে আরেক শনিবার পর্যন্ত সময়ে ব্যাঙের আযাব দূর হয়ে গেলো।

কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো। হয়ে গেলো আনুগত্যবিমুখ। হজরত মুসা রুষ্ট হলেন। বদ্দোয়া করলেন আবার। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো রক্তের আযাব। নীল দরিয়ার পানি হয়ে গেলো রক্ত। কূপ, হ্রদ, খাল-বিল— সবকিছুর পানি পরিণত হলো রক্তে। তারা আঁজলা ভরে পানি হাতে নিলেই দেখতো তাজা টকটকে রক্ত। কিবতীজনতা ফেরাউনের কাছে গিয়ে এই শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে জানালো। ফেরাউন বললো, ভয় পেয়ো না, এটা হচ্ছে মুসার যাদু। যাদুর প্রভাবে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে তোমাদের। জনতা বললো, আমরা তো আমাদের চোখের পানি ছাড়া আর কোথাও কোনো পানি দেখছি না। সব পানি পরিণত হয়েছে রক্তে।

রক্তের এই আযাব চলতেই থাকলো দিনের পর দিন। বনী ইসরাইলদের কিন্তু কোনোই অসুবিধা হলো না। এক পাত্রে পানি উঠিয়ে পান করতো তারা। কিন্তু ওই একই পাত্রে পানি ওঠালেও কিবতীদের পাত্র ভরে যেতো রক্তে। একই কূপ থেকে স্বচ্ছন্দে পানি পান করতো বনী ইসরাইল। কিন্তু কিবতীরা ওই কূপ থেকে পানি তুললেই দেখতো, এতো পানি নয়— তাজা রক্ত। কিবতীদের পিপাসার্ত রমণীরা বনী ইসরাইলের রমণীদের কাছে পানি পান করতে চাইতো। তারা কিবতী রমণীদের পাত্রে ঢেলে দিতো স্বচ্ছ সলিল। কিন্তু কিবতী রমণীরা দেখতো তাদের পাত্র ভরে উঠেছে তাজা রক্তে। তখন তারা বলতো, তোমরা তোমাদের মুখে পানি নিয়ে কুলি করে আমাদের মুখে ঢেলে দাও। বনী ইসরাইলী রমণীরা তাই করতো। কিন্তু তাদের কুলির পানিও কিবতী রমণীদের মুখে পৌঁছে পরিণত হতো রক্তে। ফেরাউন নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পিপাসায়। পিপাসা নিবারণের জন্য সে

একদিন গাছের তাজা পাতা চিবোতে শুরু করলো। কিন্তু দেখলো সেই রসের মধ্যেও রয়েছে রক্তের স্বাদ। এই চরম আযাব তাদের উপর চলতে থাকলো এক শনিবার থেকে অন্য শনিবার পর্যন্ত।

জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কিবতীদের উপর রক্তের আযাব আপতিত হয়েছিলো এভাবে— তাদের সকলের নাক দিয়ে নির্গত হতে শুরু করেছিলো রক্ত। সে রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছিলো না। তাই তারা অতিষ্ঠ হয়ে হজরত মুসার শরণাপন্ন হলো। বললো, আর আমরা ভুল করবো না। এবারের মতো আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। আপনি দোয়া করে এই মুসিবত থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দিন। বিপদমুক্ত হলে আমরা আর কখনো আপনার ধর্মমত পরিত্যাগ করবো না। আর বনী ইসরাইলদেরকেও আপনার সঙ্গে চলে যেতে দেবো। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সরে গেলো রক্ত-আতংক। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো কিবতীরা। এবারো তারা ভঙ্গ করে ফেললো তাদের অঙ্গীকার। অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকেই ধরে রইলো তারা। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— তারা অহংকারীই রয়ে গেলো, আর তারা ছিলো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৪

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ

❑ এবং যখন তাহাদিগের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদিগের জন্য প্রার্থনা কর; তোমার সহিত তাহার যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনি ইসরাইলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব।'

আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে—'এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসতো'—এখানে ওই শাস্তিগুলোর কথাই বলা হয়েছে, যে শাস্তিগুলোর কথা এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের অভিমত হচ্ছে, এখানে উল্লেখিত রিজযুন্ (শাস্তি) অর্থ প্লেগ। কিবতীদের উপর প্লেগের আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো ইতোপূর্বে বর্ণিত প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্তের আযাবের পর। অর্থাৎ প্লেগ ছিলো তাদের উপর আপতিত ষষ্ঠ আযাব। ওই প্লেগ মহামারীতে একদিনে সত্তর হাজার কিবতী মরে গিয়েছিলো। মৃতদেহগুলোকে দাফন করতে করতে নেমে এসেছিলো সন্ধ্যা। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উসামা বিন জায়েদ থেকে বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্লেগ হচ্ছে এক প্রকার আযাব— যা আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন বনী ইসরাইল এবং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর। কোনো স্থানে প্লেগ দেখা দিলে স্বেচ্ছায় সেস্থানে যেয়ো না। আর প্লেগের স্থানে অবস্থান করলে সে স্থানও পরিত্যাগ কোরো না।

জননী আয়েশা থেকে আহমদ ও বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্লেগ একটি আযাব। আল্লাহ্পাক যেখানে চান সেখানেই প্লেগ অবতীর্ণ করেন। কিন্তু প্লেগ মুমিনদের জন্য রহমত। কোনো জনপদ প্লেগে আক্রান্ত হলে কোনো মুসলমান যদি তকদিরের উপর বিশ্বাস রেখে ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায় সেখানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তবে সে পাবে শহীদের মর্যাদা।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্লেগের আযাব অবতীর্ণ করা হয়েছিলো বনী ইসরাইলদের উপর। কিবতীদের উপরে নয়। সম্ভবতঃ কিবতীদের উপর ইতোপূর্বে উল্লেখিত আযাবগুলো শেষ হওয়ার পর বনী ইসরাইলদের উপর নেমে এসেছিলো প্লেগের আযাব। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের উক্তিটিকে যথার্থ মনে করা হলে হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক নিদর্শন সমূহের ধারাবাহিক তালিকা দাঁড়াবে এ রকম— ১. লাঠি ২. শুভ্র হস্ত ৩. দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের স্বল্পতা ৪. প্লাবন ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ভেক ৮. রক্ত এবং ৯. প্লেগ। এভাবে দেখা যায় আলোচ্য আয়াতে নবম শাস্তিটির কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বলতো, হে মুসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, তোমার সঙ্গে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করো তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করবোই এবং বনী ইসরাইলকেও তোমার সঙ্গে যেতে দিবো।'

'বিমা আ'হিদা ই'নদাকা' (তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে) কথাটির অর্থ— হে মুসা! আমরা ইমান আনলে আল্লাহ্ আযাব দূর করে দেবেন, এই মর্মে আল্লাহ্র সঙ্গে আপনার যে অঙ্গীকার রয়েছে। আতা বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— হে মুসা! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে যে নবুয়ত দান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে অঙ্গীকার অর্থ হজরত মুসার দোয়া কবুল হওয়ার অঙ্গীকার। সুতরাং এখানে 'বিমা' (যাতে) শব্দটি সম্পর্কিত হয়েছে 'উদ্‌উ' (প্রার্থনা করো) কথাটির সঙ্গে। অথবা উদ্‌উ শব্দটি এখানে সর্বনামের অবস্থা প্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— হে মুসা! আপনার নবুয়ত অথবা দোয়া

কবুলের অঙ্গীকার সূত্রে আপনি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করুন। অথবা এখানে কথাটি সম্পর্কিত হয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়াসহ অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মুসা! আপনার নবুয়তের অসিলায় আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে বিমা আ'হিদা কথাটির 'বা' অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রকাশক। —যার উত্তর হচ্ছে 'লা ইন কাশাফ্তা' (যদি তুমি শাস্তি অপসারিত করো)। অর্থাৎ— আমরা এই মর্মে শপথ করছি, আল্লাহ্তায়ালা তোমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছেন, সেই অঙ্গীকারানুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়, তবে আমরা ইমান আনবোই আনবো।

শেষে বলা হয়েছে— এবং বনী ইসরাইলকেও তোমার সঙ্গে যেতে দিবো। এ কথার অর্থ— হে মুসা! আযাব সরে গেলে আমরা তো ইমান আনবোই, তদুপরি বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে সিরিয়া চলে যাওয়ার ব্যাপারেও আমরা তোমার পথরোধ করবো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৫, ১৩৬

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ○ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ

فَأَغْرَقْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ عَنْهَا غَٰفِلِينَ ○

❐ যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্টকালের জন্য যাহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত ছিলো তাহারা তখনই তাহাদিগের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

❐ সুতরাং আমি তাহাদিগের উপর প্রতিশোধ লইয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি, কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল অনবধান।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম।' এ কথার অর্থ— আমার রসুল মুসার প্রার্থনা মঞ্জুর করে যখনই কিবতীদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিতাম।

এরপর বলা হয়েছে—'এক নির্দিষ্টকালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।' এখানে তাদের জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত— কথাটির অর্থ তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত। অথবা সাগর বক্ষে তাদের সলিল সমাধি হওয়া পর্যন্ত। কেউ কেউ

বলেছেন, এখানে তাদের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থ— কিবতীদের ইমান আনার জন্য নির্ধারিত সময়। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এ রকম— তাদের অঙ্গীকারানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ইমান আনার বদলে তারা ভঙ্গ করে ফেলতো তাদের অঙ্গীকার।

পরের আয়াতে (১৩৬) বলা হয়েছে—'সুতরাং আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান।' এখানে 'ফান্‌তাক্বামনা' কথাটির অর্থ— আমি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। 'ফাআগরাক্বনাহুম ফিল্‌ ইয়াম্মি' অর্থ— তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। ইয়াম্মি শব্দটির অর্থ এখানে গভীর অভ্যন্তরে। ইয়াম্মি শব্দটি এসেছে 'তায়াম্মুম' থেকে। তায়াম্মুম অর্থ— সংকল্প বা দৃঢ় ইচ্ছা। সমুদ্র ভ্রমণকারীরা সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হয় স্বেচ্ছায়।

'বিআন্‌নাহুম কাজ্‌জাবু বিআয়াতিনা' অর্থ— তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। আর 'ওয়া কানু আ'নহা গফিলীন' অর্থ— এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান। বলা বাহুল্য যে, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা বার বার আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনরাজি প্রত্যক্ষ করেও ইমানের পথে আসেনি। তাই তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা এখানে এসেছে এভাবে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৩৭

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ

بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

❑ যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; আর ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

এখানে 'যে সম্প্রদায়কে' কথাটির অর্থ বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে। 'দুর্বল গণ্য করা হতো' কথাটির অর্থ— সহায়হীন মনে করে যাদেরকে (বনী ইসরাইলদেরকে) ক্রীতদাস বানানো হতো, তাদের মেয়েদের নিকট থেকে নেয়া

হতো বিভিন্ন রকমের খেদমত। সদ্যজাত পুত্রসন্তানকে করা হতো হত্যা ইত্যাদি। 'তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি' কথাটির অর্থ— মিসর ও সিরিয়ায় আমি দান করেছি বরকত বা কল্যাণ। সেখানে রয়েছে নদী। রয়েছে শ্যামল শস্য ভূমি। আরো রয়েছে বৃক্ষরাজি, ফল ও ফসলের সমারোহ। সেই মিসর রাজ্য থেকে ফেরাউনকে সরিয়ে এবং সিরিয়া থেকে আমালিকাদের রাজত্ব উচ্ছেদ করে ওই বিশাল অঞ্চলের সামগ্রিক অধিকার আমি দান করেছি বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং বনী ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলো।' এ কথার অর্থ— শতাব্দীর পর শতাব্দী ফেরাউন ও তার অনুসারীদের হাতে নিগৃহীত হয়ে চলেছিলো বনী ইসরাইলেরা। ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়েও পরিত্রাণের অপেক্ষায় প্রহর গুণে যাচ্ছিলো তারা। আল্লাহ্তায়ালা তাই তাদেরকে দান করেছিলেন শুভ প্রতিশ্রুতি। সেই শুভ প্রতিশ্রুতি এতোদিনে লাভ করেছে বাস্তবতা। আর এটাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারণ। উল্লেখ্য যে, এখানে বর্ণিত শুভ বাণী বা শুভ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখিত হয়েছে সুরা কাসাসের আয়াতে—'ওয়া নুরিদু আন্নামুন্না' থেকে 'মাকানু ইয়াহ্জারুন' পর্যন্ত। এ সম্পর্কে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে— আ'সা রব্বুকুমা আঁ ইউহ্লিকা আ'দুওয়াকুম ওয়া ইয়াস তাখলিফা কুম ফিল আরদ্ব' (অচিরে তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিবেন তোমাদের প্রতিপালক, আর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন সে দেশে) ।

শেষে বলা হয়েছে—'আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিলো তা ধ্বংস করেছি।' হাসান বলেছেন, এখানে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সুবিন্যস্ত ও শিল্পসম্মত আঙ্গুরের বাগিচাগুলোকে ধ্বংস করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ধ্বংস করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে ওই সকল অট্টালিকা ও রাজপ্রাসাদ সমূহকে যেগুলোর প্রধান নির্মাতা এবং পরিকল্পক ছিলো ফেরাউনের মুখ্য মন্ত্রণাদাতা হামান।

এই আয়াতে শেষ করা হয়েছে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাহিনী। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এসেছে বিজয়ী বনী ইসরাইলদের অসদাচরণ, অকৃতজ্ঞতা এবং অনানুগত্যের বিবরণ। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন অনেক অলৌকিক নিদর্শন। দান করেছেন মুক্তি, স্বচ্ছলতা এবং নিরুপদ্রব জীবন। কিন্তু এতো কিছু পেয়েও তারা প্রকাশ করেছে অবাধ্যতা। ওই ঘটনাবলীর মাধ্যমে রসুল স. এর উম্মতগণকে সতর্ক করাই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য। বিবরণগুলোর মধ্যে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, ধৈর্যধারণের ফল অত্যন্ত শুভ। আল্লাহ্তায়ালা ধৈর্যধারণকারীদেরকে অবশেষে অজস্র নেয়ামত দান করেন। কিন্তু ওই নেয়ামতের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং দুঃখে ধৈর্য এবং সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে ইমানদারেরা যেনো সদা সতর্ক থাকে। প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দিয়ে কোনোক্রমেই যেনো তারা না হয় অলস ও উদাসীন।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ یَّعْكُفُوْنَ عَلٰۤی اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ
قَالُوْا یٰمُوْسَی اجْعَلْ لَّنَاۤ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝ اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِیْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ قَالَ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبْغِیْكُمْ
اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاِذْ اَنْجَیْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِیْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْمٌ ۝

❒ এবং বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তাহাদিগের দেবতার ন্যায় আমাদিগের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও;' সে বলিল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়;

❒ 'এই সব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো ধ্বংস করা হইয়াছে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক।'

❒ সে আরও বলিল, 'কী, আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমাদিগের জন্য আমি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব যখন তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন?'

❒ স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফেরাউনের অনুসারীদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত; তাহারা তোমাদিগের পুত্র সন্তানকে হত্যা করিত এবং তোমাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা।

প্রথমে বলা হয়েছে—'এবং বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই; অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসে।' কালাবী বলেছেন, ফেরাউন ও তার অনুসারীরা সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হলো। আর নির্বিঘ্নে সাগরের অপর পাড়ে পৌছলেন হজরত মুসা ও তাঁর সম্প্রদায়। এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হজরত মুসা আশুরার রোজা রেখেছিলেন।

সাগর পার হয়ে প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এসেছিলো বনী ইসরাইলেরা। ওই জাতি গো-শাবকের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করতো। তাদেরকে দেখেই গো-শাবক পূজার প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছিলো বনী ইসরাইলেরা।

ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে যোবায়ের বলেছেন, গো-শাবকের ওই মূর্তিটি ছিলো তামা ও পিতল নির্মিত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, গো-প্রতিমার পূজক ওই সম্প্রদায়টি ছিলো আমালিকা সম্প্রদায়। ইবনে ইমরান জুনির উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, ওই মূর্তি পূজকেরা ছিলো জাযায়েম গোত্রের লোক। হজরত কাতাদার উক্তিরূপে বাগবী বর্ণনা করেছেন, তারা ছিলো লাখম গোত্রের।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা বললো, হে মুসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়ে দাও; সে বললো, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।' বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালার এককত্বে সন্দেহ করে বনী ইসরাইলেরা উল্লেখিত আবেদনটি করেনি। করেছিলো নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাবশতঃ। তারা মনে করেছিলো, এ রকম মূর্তি পূজার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায়। হজরত মুসা তাই তাদের এই অনভিপ্রেত আবেদন শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, তোমরা তো দেখছি এক মূর্খ সম্প্রদায়।

পরের আয়াতে (১৩৯) বলা হয়েছে—'এই সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস করা হয়েছে এবং তারা যা করছে তা-ও অমূলক।' এ কথার অর্থ—ওই মূর্তি পূজক আমালিকা সম্প্রদায়কে তো আল্লাহ্তায়ালা ধ্বংস করে দিবেন। সুতরাং হে বনী ইসরাইল! তোমরা ধ্বংসের অনুসারী হতে চাও কেনো। মূর্তির উপাসনা একটি তৌহিদ বিরোধী কর্ম— যা নিরর্থক ও অমূলক। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাক্যটি হজরত মুসার। তাঁর বক্তব্যে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষয় দু'টো হচ্ছে— ১. মূর্তিপূজকদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ২. তাদের পূজা পার্বন আল্লাহ্তায়ালার নিকট অগ্রাহ্য— যেহেতু তা অমূলক। স্বসম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও মূর্খতা অপসারণের উদ্দেশ্যে হজরত মুসা এমন কথা বলেছিলেন।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে—'সে আরো বললো, কী, আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমাদের জন্য আমি অন্য ইলাহ্ খুঁজবো, যখন তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' এ কথার অর্থ— বনী ইসরাইলদের মূর্খজনোচিত আবদার শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হজরত মুসা তাদেরকে বললেন, একি বলছো তোমরা! মানবেতর জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দিয়েছেন স্বাধীনতা, স্বচ্ছলতা। দেখিয়েছেন বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ। সে পরম করুণা পরবশ আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করতে বলো আমাকে। আল্লাহ্তায়ালাই তো তোমাদেরকে দিয়েছেন বিশ্ব জগতের শ্রেষ্ঠত্ব। সেই আল্লাহ্র সমতুল আর কেউ নেই।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ওয়াকেদ লাইসী বলেছেন, একবার আমরা রসুল স. এর সঙ্গে হুনাইন নামক এক স্থান অতিক্রম করছিলাম। পথিমধ্যে পড়লো একটি কুলবৃক্ষ। মূর্খতার যুগের মানুষেরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ওই বৃক্ষটিতে ঝুলিয়ে তার চার পাশে ঘুরতো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের জন্যও এমন একটি বরই গাছ নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরাও সে গাছটিতে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতে পারি। তিনি স. বললেন, আল্লাহু আকবার! তোমরা তো দেখি বনী ইসরাইলদের মতো কথা বলতে শুরু করেছো। তারা বলেছিলো, হে মুসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও। তোমরাও কি শেষে তোমাদের পূর্ববর্তিদের পথ ধরবে?

এর পরের আয়াতে (১৪১) বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতো; তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখতো; এতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা।' এ কথার অর্থ— হে বনী ইসরাইল! অতীতের দিকে তাকাও। এই তো সেদিনের কথা, যখন ফেরাউন তোমাদেরকে কতোভাবে কষ্ট দিতো— তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বধ করতো, তাদের বিভিন্ন কাজে লাগাতো তোমাদের নারীদেরকে। তোমরা ছিলে নিতান্ত অসহায়। সেই চরম অসহায় অবস্থা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি আমিই। সেটা ছিলো দুঃখের পরীক্ষা। সে পরীক্ষা শেষে তোমরা এখন এসেছো আরেক পরীক্ষায়। এ পরীক্ষা হচ্ছে সুখের পরীক্ষা। তোমরা কি চাও না, এই মহা পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হও?

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪২, ১৪৩

وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ
لَيْلَةً وَّقَالَ مُوسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝ وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ ۚ
فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ
سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

❐ স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে

পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারুণকে বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সদাচার করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগের অনুসরণ করিবে না।'

❒ মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব' তিনি বলিলেন 'তুমি আমাকে কখনই দেখিবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখিবে' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হইলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং বিশ্বাসীদিগের মধ্যে আমিই প্রথম।'

প্রথমে বলা হয়েছে—'স্মরণ করো, মুসার জন্য আমি তিরিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এ সম্পর্কে ইবনে হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, আবুল আলীয়া বলেছেন, জিলকদ মাসের তিরিশ দিন এবং জিলহজ মাসের দশদিন মিলে মোট চল্লিশ দিন রোজা রেখেছিলেন হজরত মুসা।

ইমাম সুয়ূতি লিখেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে এক মাস (তিরিশ দিন) রোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অঙ্গীকার করেছিলেন এক মাস পর তিনি হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলবেন।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, ফেরাউনের জীবদ্দশায় মিসরে থাকতেই হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের শত্রু নিধনের পর তোমাদেরকে দান করবেন একটি কিতাব। ওই কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকবে তাঁর আদেশ ও নিষেধের বিবরণ। এরপর যথাসময়ে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহ্পাক। হজরত মুসা তখন অঙ্গীকৃত কিতাব যাচঞা করলেন। আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিলেন তিরিশ দিন একটানা রোজা রাখো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু ঠিক তিরিশ রোজার দিন মুখে কিছুটা দুর্গন্ধ অনুভব করলেন তিনি। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য তিনি তখন একটি নরম কাঠ দ্বারা মেসওয়াক করে ফেললেন। আবুল আলীয়া বলেছেন, হজরত মুসা তখন চিবিয়েছিলেন একটি গাছের ছাল। মেসওয়াক করার পর পরই সেখানে হাজির হলো একটি ফেরেশতার দল। তারা বললো, আপনার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিলো মেশকের সুঘ্রাণ। মেসওয়াক করে সেই সুঘ্রাণকে আপনি দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা তখন পুনঃনির্দেশ দিলেন আরো দশ দিন রোজা রাখতে। বললেন, এভাবে রোজা অবস্থায় অতিবাহিত করতে হবে মোট চল্লিশ দিন। আরো

প্রত্যাদেশ করলেন, হে মুসা! তুমি কী এ কথা জানো না যে, রোজাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আমার কাছে মেশক আম্বরের চেয়েও উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দায়লামীও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং মুসা তার ভ্রাতা হারুণকে বললো, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সদাচার করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তুর পর্বতের দিকে যাত্রার প্রাক্কালে হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতা হজরত হারুণকে এই মর্মে নির্দেশনা দিলেন যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে আমার স্থলাভিষিক্ত। তোমার প্রতি উপদেশ এই যে, তুমি সকলের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে। এভাবে সংশোধন করবে তাদেরকে। পরিচালিত করবে সকলকে সুপথে। আর যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কস্মিনকালেও তাদেরকে সমর্থন করবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, হজরত মুসা তাঁর ভ্রাতাকে দু'টি নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে— আসলিহ্ (সদাচার করবে বা সংশোধন করবে)। আর একটি হচ্ছে 'ওয়ালা তাত্তাবি' (অনুসরণ করবে না) —অর্থাৎ যারা অবাধ্য, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাদের আনুগত্য করবে না।

পরের আয়াতে (১৪৩) বলা হয়েছে—'মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সহিত কথা বললেন তখন সে বললো 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো', তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এখানে 'ওয়ালাম্মা জাআ মূসা' (মুসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো) কথাটির অর্থ— হজরত মুসা যখন সিনাই পর্বতমালার তুর পাহাড়ে উপনীত হলেন। 'লিমিক্বাতিনা' কথাটির অর্থ আমার নির্ধারিত স্থানে। লিমিক্বাতিনা কথাটির প্রথমে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি সুনির্দিষ্ট অবস্থা প্রকাশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— কথোপকথনের জন্য আমি যে স্থান ও সময় নির্ধারণ করেছিলাম— সেই সুনির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে।

তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, হজরত মুসা পাক পবিত্র হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে একান্ত আলাপনের জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত তুর পাহাড়ে নির্ধারিত সময়ে গমন করেছিলেন। এখানে 'ওয়া কাল্লামাহু রব্বুহু' কথাটির অর্থ— তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন। বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন তুর পাহাড়ের চার পাশে সাত ফারসাখ (২১ মাইল) এলাকা করে দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকার। ওই এলাকা থেকে শয়তানকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। মাটিতে অবস্থানরত কীট-পতঙ্গগুলোকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো সেখানে থেকে। আমল লেখক ফেরেশতাদ্বয়কেও পৃথক করে দেয়া হয়েছিলো। উন্মোচন করে দেয়া

হয়েছিলো উর্ধ্বাকাশের সকল আবরণ। হজরত মুসা তখন দেখলেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ফেরেশতা। আর উপরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন আল্লাহ্তায়ালার আরশ। ওই অবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন। হজরত মুসার পাশে উপস্থিত থাকলেও হজরত জিবরাইল ওই বাক্যালাপ শুনতে পাননি। হজরত মুসা তখন তকদির লিপিবদ্ধকারী কলমের লেখার আওয়াজও শুনতে পেলেন।

বায়যাবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত মুসা শুনতে পেলেন, সকল দিক থেকে ভেসে আসছে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র বাণীর উচ্চারণ। আমি বলি, এ কথার অর্থ— হজরত মুসা তখন কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে আল্লাহ্তায়ালার কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ ওই অতুলনীয় বাণীবৈভব কোনো এক বা একাধিক নির্দিষ্ট দিকের মুখাপেক্ষী নয়। কোনো দিক যাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, সেই অতুলনীয় ও অবিভাজ্য পবিত্র সত্তার বাণী তো দিকের অতীত হবেই। হজরত মুসা যখন স্বকর্ণে আল্লাহ্তায়ালার বাণী শুনতে পেলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হলো, আল্লাহ্-দর্শনের তীব্র আকাংখা। তিনি প্রেমাতিশয্যবশতঃ বলে উঠলেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো।

'আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না' এ কথার অর্থ— পৃথিবীর সময় এবং স্থানের অধীন তুমি এখন। এ অবস্থা দর্শন দানের উপযুক্ত নয়। এখানে থেকে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। এখানে এ রকম চেষ্টা কেউ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপ্রতিপালক! তোমার দর্শনধন্য মৃত্যু তো দর্শনবিহীন জীবনের চেয়েও মহীয়ান।

আল্লামা সুয়ূ্যতি লিখেছেন, এখানে 'লান্ তারানি' কথাটির অর্থ— তুমি আমাকে দেখতে পাবেই না। অর্থাৎ— তুমি আমাকে এখানে দেখতে পাবে না, কিন্তু আখেরাতে বেহেশতে দেখতে পাবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক এখানে লা উরা (আমি দর্শনীয় নই) এ রকম বলেননি। এতে করে বুঝা যায় আল্লাহ্তায়ালাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, কিন্তু তা পৃথিবীতে হবার নয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এখানে যে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে, সেই পাহাড়টি ছিলো মাদায়েনের সর্ববৃহৎ পাহাড়। পাহাড়টির নাম আল যোবায়ের।

সুদ্দীর বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে হজরত মুসার বাক্যালাপের সময় ইবলিস ঢুকে গিয়েছিলো মাটির মধ্যে। তারপর সে মাটি ফুঁড়ে হজরত মুসার দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে উত্থিত হয়ে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো যে, যে কথা ভেসে আসছে সে কথা শয়তানের, আল্লাহ্র নয়। হজরত মুসা তাই আল্লাহ্কে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

উপরের বর্ণনা থেকে এ কথাটিও তো প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌কে দেখা সম্ভব। কারণ, হজরত মুসা ছিলেন একজন উলুল আজম পয়গম্বর। তাই তিনি কোনো অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থী হতে পারেন না। অসম্ভব জেনেও তার প্রার্থনা করা বিজ্ঞতার পরিচয় নয়। অতএব, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার অসম্ভব বলা হলে হজরত মুসাকে বিজ্ঞ না বলে বলতে হয় অজ্ঞ। আল্লাহ্‌র পরিচয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিত্ব এ রকম অজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন না। এই অভিমতটির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে বলেছেন 'লান্ তারানি' (দেখতে পাবেই না)। 'লা উরা' (দর্শনীয় নই) এ রকম বলেননি। তাই এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ্‌র দীদার পৃথিবীতে সম্ভব নয়, কিন্তু পরবর্তী পৃথিবীতে সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রকৃত সমাধান এটাই।

একটি প্রশ্ন ঃ হজরত মুসা কি এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার যে অসম্ভব— সে কথাও জানতেন না?

উত্তর ঃ আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে 'লান্ তারানি'— ঘোষণাটির পূর্বে এ কথা তার জানা না থাকারই কথা এবং আল্লাহ্‌তায়ালা না জানানোর আগে কোনো কিছু না জানা কোনো দোষ নয়। হজরত নুহের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটেছে। মহাপ্লাবনের সময় তিনি তাঁর এক পুত্রের জন্য পরিত্রাণপ্রার্থী হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন, এ রকম প্রার্থনা সমীচীন নয়। এ কথা জানার পর তিনি ওই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি আর করেননি। হজরত ইব্রাহিমও তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন না জেনে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাঁকে এ কথা জানালেন যে, মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা হয় না, তখন থেকে তিনি এ রকম প্রার্থনা আর করেননি। আখেরী রসুল স.ও তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের হেদায়েতের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে। ওই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা জানিয়েছেন— 'কোনো নবী এবং মুমিনের জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তারা কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবে— যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়'।

কোনো কোনো মুনাফিকের জন্য রসুলপাক স. আল্লাহ্‌পাকের সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। সেই প্রার্থনাসূত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন 'ইস্‌তাগফিরলাহুম আওলা তাসতাগফার লাহুম ইন তাসতাগফার লাহু সাব্‌ঈনা মার্‌রাতান ফালাঁই ইয়াগফিরাল্লহু লাহুম' (তাদের জন্য আপনি ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন। যদি তাদের জন্য আপনি সত্তর বারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, তবু কখনোই তা আল্লাহ্ মঞ্জুর করবেন না)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'আর কখনও তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া (জানাযা) করবেন না এবং কারো কবরের পাশেও দোয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবেন না।'—এ সকল দৃষ্টান্তসমূহের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো বিষয়ে অবগত করানোর আগে সে বিষয়ের অবগতি না থাকা দোষের কিছু নয়।

মোতাজিলারা বলে, দুনিয়া কিংবা আখেরাত— কোনো স্থানেই আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভব নয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'লান্ তারানি' (তুমি আমাকে কখনোই দেখবে না)। এখানে 'লান' শব্দটি (কখনোই না) একটি চূড়ান্ত নির্দেশনা, যার অন্যথা অসম্ভব। তাই দুনিয়া-আখেরাত কোনোখানে কখনো আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব নয়। আমরা বলি, এখানে 'কখনোই' অর্থ— দুনিয়াতে কখনোই। আখেরাত এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে এ রকম বলে দুনিয়ায় দর্শনের সম্ভাবনাকেই সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দেয়া হয়েছে। 'লান' শব্দটির এ রকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে একস্থানে এরশাদ হয়েছে, 'ওয়া লাঁই ইয়্যাতামান্নাওহু আবাদা' (এরা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না)। এ কথার অর্থ, ইহুদীরা দুনিয়ায় কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কিন্তু আখেরাতে মৃত্যুর আকাংখী হবে তারা। যেমন এক স্থানে এরশাদ হয়েছে—'তারা দোয়া করবে, আক্ষেপ! আমাদের মালিক যদি এখন আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতো, আমাদের উপর আরোপ করতো মৃত্যুর আদেশ।' অন্যত্র বলা হয়েছে— (ইহুদীরা বলবে) 'হায় আফসোস! প্রথম মৃত্যুতেই যদি আমাদেরকে শেষ করে দেয়া হতো।' আরেক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে— 'ওয়া ইয়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা' (হায় আক্ষেপ! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম)।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসা আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তার সম্প্রদায়ের লোকদের আবদার রক্ষা করার জন্য। যেমন এক আয়াতে এসেছে— (ইহুদীদের গোত্র নেতারা বললো) 'আরিনাল্লহা জাহরাতান' (আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিয়ে দিন)। এই অভিমতটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ ওই ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘটনা। বর্ণিত উক্তিটির কারণে তখন ওই গোত্র নেতাদের উপর আপতিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আযাব। বজ্রপাতের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটানো হয়েছিলো তাদের। আর ওই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ ঘোষিত হয়েছিলো— 'তারা এ কথা বলার অধিকার রাখে না, তাই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।' আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর প্রেমিক রসুলের একান্ত কথোপকথনের। তৃতীয় কারো উপস্থিতি এখানে নেই। আর হজরত মুসাও ছিলেন যোগ্য প্রেমিক। তাই তাঁর দর্শনাভিলাষের কারণে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি। কেবল বলে দেয়া হয়েছে— হে আমার দর্শনমত্ত প্রেমিক রসুল! তোমার অভিলাষ পূরণের স্থান এটা নয়। পৃথিবী আল্লাহ্‌তায়ালার দীদারের ভার বহনে অক্ষম। এ কথা বলে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়েও দিয়েছেন তাঁর প্রিয়

রসুলকে। বলেছেন— 'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' প্রিয়তমের দর্শনেচ্ছা প্রেমরীতির প্রতিকূল নয়। যদি হতো তবে আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয় কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদ জানাতেন। কিন্তু যারা প্রকৃত প্রেমিক নয়, তাদের আল্লাহ্-দর্শনের আবদার অবশ্যই অন্যায়। তাই অবাঞ্ছিত ইহুদী গোত্রনেতাদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র জানিয়েছেন—'তারা এ কথা বলার অধিকার রাখে না, তাই তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।' অতএব এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত রসুলগণ যা করেন, তা কখনো অজ্ঞজনোচিত হতে পারে না। আর অজ্ঞদের আবদার অনুসারেও তিনি আল্লাহ্ দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নি।

এরপর বলা হয়েছে—'তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' এ কথার অর্থ— হে মহাপ্রমিক মুসা! উত্তমরূপে অবগত হও যে, ওই বিশাল পর্বতও আমার জ্যোতিচ্ছটার আবির্ভাব সহ্য করতে পারবে না। তা হলে তুমি কিভাবে সহ্য করবে। এখানে শর্ত করে দেয়া হয়েছে যে, পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকলে হজরত মুসার আল্লাহ্-দর্শন সম্ভব। এতে করে বুঝা যায়, পৃথিবীতে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লির আবির্ভাবে পাহাড়ের স্বস্থানে স্থির থাকা সম্ভব নয়। তাই হজরত মুসার পক্ষেও পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন সম্ভব নয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্-দর্শন অসম্ভব। একই সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণিত হলো যে, আখেরাতে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন সম্ভব। কারণ আখেরাতে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এরপর বলা হয়েছে—'যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেলো তখন বললো, মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' ওয়াহাব বিন মোনাব্বাহ্ এবং ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত মুসা যখন বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো'— তখন চার ফারসাখ এলাকা জুড়ে নেমে এলো ঘন কুয়াশা ও অন্ধকার। শুরু হলো বিদ্যুৎ-চমক, এবং বজ্রপাত। আল্লাহ্তায়ালা আকাশের ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যাও— মুসার নিকটে গিয়ে সমবেত হও। নির্দেশ পেয়ে প্রথম আকাশের ফেরেশতারা বিড়ালের আকার ধারণ করে উড়ন্ত মেঘমালার মতো হজরত মুসার দিকে গমন করতে শুরু করলো। বজ্রগম্ভীর আওয়াজে তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণা। এরপর দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতারা বাঘের আকার ধারণ করে যেতে শুরু করলো তুর পাহাড়ের সন্নিকটে। তাদের মুখেও বিরামহীনভাবে ধ্বনিত হচ্ছিলো আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা

ও পবিত্রতার উচ্চকিত আওয়াজ। ফেরেশতাদের এই বিশাল সমাবেশ ও আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতার মুহুর্মুহু ঘোষণা শুনে ঘন কুয়াশা এবং অন্ধকার বেষ্টিত হজরত মুসা ভীত হয়ে পড়লেন। খাড়া হয়ে উঠলো তাঁর শরীরের সমস্ত পশম। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমার অসমীচীন আবেদনের জন্য আমি অনুতপ্ত। হায়! আমি যদি এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারতাম। সমবেত ফেরেশতাদের সর্দার তখন তাঁকে বললেন, হে দীদারাভিলাষী নবী! আপনি আপনার আবেদনের উপরেই স্থির থাকুন। এখনো সামনে রয়েছে অনেক বিস্ময়।

এরপর আবির্ভূত হলেন তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা। তাদের বর্ণ ছিলো আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো। আর আকার ছিলো ব্যাঘ্রের মতো। বিশাল সেনাদলের মতো সম্মিলিত পদবিক্ষেপে আগমন করছিলো তারা। উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করছিলো আল্লাহ্পাকের প্রশংসা ও পবিত্রতা। হজরত মুসা জীবনের আশা পরিত্যাগ করলেন। ফেরেশতা বাহিনীর অধিপতি বললেন, হে ইমরান তনয়! আপন স্থানে অটল থাকুন। সামনে তো রয়েছে আরো অনেক অসহনীয় দৃশ্য।

এরপর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আগুন ও বরফের শরীর বিশিষ্ট রক্তাভ ও শ্বেতাভ বর্ণের ফেরেশতাবৃন্দ উপস্থিত হলো। তারা এলো চতুর্থ আকাশ থেকে। পূর্বে সমবেত সকল ফেরেশতার সম্মিলিত আওয়াজের চেয়ে নবাগত ফেরেশতা বাহিনীর তসবী পাঠের কণ্ঠস্বর ছিলো আরো অনেক উচ্চ। হজরত মুসার মনে হচ্ছিলো কর্ণকুহর বুঝি বিদীর্ণ হয়ে যাবে। শরীরের গ্রন্থিসমূহ মনে হয় এই মুহূর্তে হয়ে যাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ফেরেশতাধিপতি বললেন, হে রসুল মুসা! বিচলিত হবেন না। আরো অনেক কিছু রয়েছে সম্মুখে। সবে তো শুরু।

এরপর উপস্থিত হলো সপ্তবর্ণ বিশিষ্ট ফেরেশতার দল। তারা ছিলো পঞ্চম আকাশের। মনে হচ্ছিলো যেনো আগুনের ঢেউ। কিন্তু সে আগুন ছিলো উত্তাপ বিবর্জিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন ওই ফেরেশতাদের উচ্চকণ্ঠে তসবিহ্ পাঠ শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন বিস্মিত ও আতংকিত হজরত মুসা। ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। অধিনায়ক ফেরেশতাটি বললেন, হে ইমরান পুত্র! ধৈর্যধারণ করুন। আরো বিস্ময় রয়েছে সামনে। সকল দৃশ্য উন্মোচিত হবে একে একে। আপনি কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হবেন না।

ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতারা এরপর হাজির হলেন আগুনের পোশাক পরে। তাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছিলো একটি করে খেজুরের গাছের মতো লম্বা আগুনের লাঠি। লাঠিগুলো ছিলো সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। চারটি করে মুখ ছিলো প্রত্যেকের। তাই তাদের তসবীহ্ পাঠের আওয়াজ ছিলো আরো বেশী ভয়ংকর। সেই আওয়াজে ডুবে যাচ্ছিলো পূর্বের সকল ফেরেশতাদের সম্মিলিত তসবিহ্ পাঠের আওয়াজ। চতুর্মুখী সেই আওয়াজে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হচ্ছিলো—

সুব্বুহুন কুদ্দুসুন ওয়া রব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার্‌রুহ্, রব্বিল ই'য্যাতি আবাদান লা ইয়ামুতু। হজরত মুসা এবার রোদনসিক্ত কণ্ঠে সেই তসবী পাঠ শুরু করে দিলেন। বললেন, হে আমার প্রিয়তম প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে বিস্মৃত হবেন না। আপনার এই দাসকে আর পরীক্ষা করবেন না। জানি না এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে আমি আর কখনো পরিত্রাণ পাবো কিনা। একি অসহনীয় অবস্থা! আমি নিশ্চিত, এই স্থান পরিত্যাগ করলে আমি ভস্মীভূত হবো। আর আমি এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, এখানে আমার সামনে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নেই। অধিনায়ক ফেরেশতা বললেন, হে ইমরান নন্দন! ভয়-ভীতির সীমানা অতিক্রম করেছেন আপনি। আপনার জীবন এখন কণ্ঠাগত। তবু হে রসুল প্রবর! সহিষ্ণুতাকে আশ্রয় করাই আপনার পক্ষে সমীচীন।

এরপর এলো সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা। তারা গগনবিদারী আওয়াজে পাঠ করতে শুরু করলো— 'সুব্‌হানাল মালিকুল কুদ্দুসি রব্বিল ই'য্যাতি আবাদান লা ইয়ামুতু'(যাবতীয় পবিত্রতার অধীশ্বরেরই সমস্ত পবিত্রতা। মহিমময় পালনকর্তা চিরঞ্জীব, অমর)। থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো সিনাই পর্বতমালা। পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলো আরশের। আল্লাহ্‌তায়ালার সৌন্দর্যচ্ছটার অতি দূরবর্তী এক বিন্দু প্রতিচ্ছায়া পতিত হলো সিনাই গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ চূড়াবিশিষ্ট আল যোবায়ের পর্বতশৃঙে। নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেলো আল যোবায়ের। আর হজরত মুসা জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। ওই তাজাল্লি প্রক্ষেপণের লেলিহান প্রতিক্রিয়ায় হজরত মুসা যেনো ভস্মীভূত না হন, তাই যে পাথরের উপর হজরত মুসা দাঁড়িয়েছিলেন, সেই পাথরটিকেই আল্লাহ্‌পাক উল্টো করে গম্বুজের মতো স্থাপন করলেন ভূতলশায়ী হজরত মুসার উপর। এভাবে অতিবাহিত হলো কিছুটা সময়। হজরত মুসা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। তসবী পাঠ করতে করতে পূর্ববৎ দণ্ডায়মান হলেন তিনি। বললেন, হে আমার জীবন মৃত্যুর অধীশ্বর! আমি তো আপনার উপর ইমান আনয়ন করেছি। এ কথাও এখন জানলাম যে, কেউ আপনার ফেরেশতাকুলকে চাক্ষুষ করলে ভীত-সন্ত্রস্ত হবেই। আর আপনাকে দেখতে চাইলে মৃত্যুবরণ করবেই। হে মহা বিশ্বের মহা অধিপতি! আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনিই মহান। আপনিই সকল সৃষ্টির একমাত্র প্রভুপ্রতিপালক। অতুলনীয় রাজাধিরাজ । একামাত্র উপাস্য । আপনার সমতুল কেউ নেই। আপনার সমকক্ষ হওয়ার ধৃষ্টতাও কেউ রাখে না। হে আমার প্রেমময় প্রেমাধিরাজ! আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনকামী। সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা কেবলই আপনার। আপনার কোনো অংশীদার নেই। পবিত্রাতিতমপবিত্র আপনি। আপনি মহীয়ান, গরিয়ান। মহাবিশ্বের আপনিই একক প্রভুপ্রতিপালক।

এখানে তাজাল্লি শব্দটির অর্থ নূরের আবির্ভাব। আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, ওই সময় মূহূর্তের জন্য একটি নূরের ঝলক বিম্বিত হয়েছিলো মাত্র। হাকেমের বিশুদ্ধ বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে।

মহান সুফী সাধকগণ বলেন, প্রতিচ্ছায়ার স্তরের আবির্ভাবকে বলা হয় তাজাল্লি— যেমন আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। তুর পর্বতে যা ঘটেছিলো, তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার দর্শন নয়। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তাজাল্লি সহ্য করার দিক থেকে হজরত মুসা নিশ্চয়ই পাহাড়াপেক্ষা অধিকতর যোগ্য। তাই পাহাড় ভস্মীভূত হয়েছিলো বটে, কিন্তু হজরত মুসা ভস্মীভূত হননি। তিনি বেহুঁশ হয়েছিলেন মাত্র। ক্ষণকাল পরে আবার সংজ্ঞাও ফিরে পেয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— আমি তো আসমান জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা এ গুরুভার বহন করতে অস্বীকৃত হলো এবং শঙ্কিত হলো। আর মানুষ তা বহন করলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্র নূর তখন প্রকাশিত হয়েছিলো পাহাড়ের উপর। জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর সত্তার জ্যোতি তখন অবারিত করেছিলেন এবং পর্দা উঠিয়ে ষাঁড়ের নাসিকা রন্ধ্রের পরিসরের সমান জ্যোতি প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এবং হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, সূঁচের অগ্রভাগ পরিমাণ নূরের তাজাল্লি তখন পাহাড়ের উপর প্রক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। আর তাতেই পাহাড়টি হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সুদ্দী বলেছেন, তখন নূরের তাজাল্লিসম্পাত ঘটেছিলো কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমতুল্য। হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সর্বোচ্চ গিরায় বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ স্থাপন করে রসুল স. এই আয়াত পাঠ করে বলেছিলেন, ব্যস। এতোটুকুই তাজাল্লি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো তখন। আর তাতেই পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং মুসা হয়ে পড়েছিলেন বেহুঁশ। আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কনিষ্ঠা আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, এতোটুকু তাজাল্লি নিক্ষেপের ফলে পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো চূর্ণ-বিচূর্ণ।

হজরত সহল বিন সা'দ সায়াদীর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সত্তর হাজার নূরের পর্দা থেকে মাত্র এক দিরহাম পরিসরের পর্দা উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তাতেই পাহাড় হয়ে গিয়েছিলো ভস্মীভূত।

দাক্কান শব্দটির অর্থ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'দাক্কান, দাক্কুন এবং হাদামুন্' শব্দত্রয়ের অর্থ সমতল বালুকা ভূমি।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাক ওই পাহাড়কে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলেন। আর ওই জমাট ভস্মের পাহাড়টি তখন চলতে চলতে গিয়ে পড়েছিলো সমুদ্রবক্ষে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে এখন পর্যন্ত সেটি সতত ধাবমান।

আতিয়া বলেছেন, পাহাড়টি তখন পরিণত হয়েছিলো বালির পাহাড়ে। কালাবী বলেছেন, 'দাক্কান' শব্দটির অর্থ কাস্‌রান। অর্থাৎ খণ্ড-বিখণ্ড। পাহাড়ের খণ্ড-বিখণ্ড অংশগুলো তখন যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো ছোট ছোট পাহাড়ের সঙ্গে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে— নূরের তেজে তখন ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিলো পাহাড়টি। তিনটি খণ্ড গিয়ে পড়েছিলো মদীনায় এবং অবশিষ্ট তিনটি খণ্ড গিয়ে স্থির হয়েছিলো মক্কায়। মদীনায় ওই তিনটির নাম হয়েছে উহুদ, অরকান এবং রিজবী। আর মক্কায় সেগুলোর নাম হয়েছে সাওর, সাবীর এবং হেরা।

তাখরিজে বায়যাবী গ্রন্থে সায়াফ উল্লেখ করেছেন, ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বলেছেন, আরাফা প্রান্তরে সন্ধ্যার সময় হজরত মুসার প্রতি আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন— 'ইন্নানী আনাল্লহ্' (নিশ্চয় আমিই আল্লাহ)। হজের সমাবেশস্থলের সন্নিকটে তখন প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো নূরের বিচ্ছুরণ। ফলে ওই পাহাড়টি বিভক্ত হয়েছিলো সাতটি খণ্ডে। একটি খণ্ড এখনো স্বস্থানে অটুট। সেই স্থানটি হচ্ছে ইমামের অবস্থানস্থল। তিনটি খণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে পতিত হয়েছিলো মদীনায়। ওই তিনটির নাম— তাইয়্যেবা, উহুদ এবং রিজবী। একটি খণ্ড উড়ে গিয়ে পড়েছিলো সিরিয়ার সিনাই পর্বতমালায়। উড়ে গিয়ে পড়েছিলো বলেই ওই পর্বতটির নাম তুর। আমি বলি, বর্ণনাটি অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। কারণ, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছিলেন সিরিয়ার সিনাই গিরিশ্রেণীর তুর পাহাড়ে। সেখানেই তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো তওরাত শরীফ। আরাফা প্রান্তরে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। 'সয়িক্বা' শব্দটির অর্থ সংজ্ঞাহীন বা বেহুঁশ। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত কাতাদা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— মৃত্যু। কালাবী বলেছেন, আরাফার দিন বৃহস্পতিবার হজরত মুসা বেহুঁশ হয়েছিলেন এবং জুমার কোরবানীর দিন আল্লাহ্পাক তাঁকে তওরাত দান করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, বেহুঁশ অবস্থা থেকে সংজ্ঞা ফিরে পাবার পর ফেরেশতারা তাঁকে বলেছিলো, হে ইমরানের দুলাল! আপনার দীদারের বাসনা ফলপ্রসূ হয়েছে কি?

'ফালাম্মা আফাক্বা' অর্থ— হজরত মুসা জ্ঞান ফিরে পেলেন। 'ক্বলা' অর্থ— তখন বললেন। 'সুব্হানাকা তুব্তু ইলাইকা' অর্থ মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম। অর্থাৎ— অনুমতি ব্যতিরেকে দীদার যাচঞা করার দুঃসাহস থেকে আমি অনুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন (তওবা) করলাম। ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন অর্থ— এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম। অর্থাৎ— এই উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য ইমানদার। বলাবাহুল্য যে, নবীর ইমান নিশ্চয় তাঁর উম্মতের ইমানাপেক্ষা অগ্রগামী।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

❒ তিনি বলিলেন 'হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও;

এখানে 'ইস্তাফাইতুকা আ'লান্নাস' কথাটির অর্থ, তোমার যুগের সকল লোকদের উপর আমি তোমাকে দান করেছি শ্রেষ্ঠত্ব। 'বিকালামি' অর্থ— আমার বাক্যালাপ। 'মা আতাইতুকা' অর্থ— যে প্রত্যাদেশ আমি তোমাকে দিয়েছি।

বর্ণিত হয়েছে, তুর পাহাড়ে আল্লাহ্তায়ালার সরাসরি বাক্যালাপের পর হজরত মুসার মুখমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত হতো তীব্র নূর। পৃথিবীর জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত ওই নূর ছিলো একই রকম তীব্র। কেউ তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারতো না। তাই তিনি তাঁর চেহারা সব সময় ঢেকে রাখতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপের পর থেকে সব সময় আপনি তো সকল দিক থেকেই আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। হজরত মুসা তাঁর মুখমণ্ডলের আবরণ উন্মোচন করলেন। জ্বলন্ত সূর্যের দিকে যেমন তাকানো যায় না, তেমনি হলো তাঁর স্ত্রীর অবস্থা। তিনি দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। সেজদাবনত হয়ে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি জানালেন অশেষ কৃতজ্ঞতা। সেজদা থেকে উঠে বললেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেনো বেহেশতেও আমি আপনার সঙ্গিনী হতে পারি। হজরত মুসা বললেন, তাই হবে, যদি তুমি আমার পরলোকগমনের পর অন্য কোথাও বিবাহবদ্ধা না হও। কারণ, এটাই বিধান যে, বেহেশতিনীরা বেহেশতে বাস করবে তাদের সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, হজরত মুসা তওরাত শরীফ অধ্যয়নের পর বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তওরাতে দেখলাম শ্রেষ্ঠ এক উম্মতের কথা। তাদের আবির্ভাব হবে মানুষের কল্যাণের জন্য। তারা মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবে, আর বিরত থাকতে বলবে অসৎ কাজ থেকে। আল্লাহ্র প্রতি এবং আল্লাহ্র পূর্বাপর সকল কিতাবের প্রতি থাকবে তাদের বিশুদ্ধ বিশ্বাস। বিভ্রাট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তারা। লড়াই করবে দাজ্জালের বিরুদ্ধেও। হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি ওই উম্মতকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে মুসা! তারা তো হবে মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মত। হজরত মুসা বললেন, আমি পাঠ করলাম আর

এক উম্মতের কথা। তারা আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রশংসা করবে। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখবে সূর্যের গতিবিধির প্রতি (নামাজের সময়ের প্রতি)। তারা কোনো কাজ করতে চাইলে বলবে, ইনশাআল্লাহ্ করবো। তাদেরকেই উম্মত করে দিন আমার। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে নবী মুসা! তারা তো হবে সর্বশেষ রসুলের উম্মত। হজরত মুসা বললেন, আর এক উম্মতের কথা পড়লাম কিতাবে। তারা নিজেদের মান্নত, কাফ্ফারা ও সদকা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করবে, উপযুক্তরা তা ভক্ষণ করবে, আগের উম্মতদের মতো উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে আসমানী আগুনে পোড়াবে না। তারা দোয়া করলে কবুল হবে। সুপারিশ করলে কবুল হবে সুপারিশ। ওই সকল লোককেই আমি চাই আমার উম্মতরূপে। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তারা তো হবে রসুল মোহাম্মদের উম্মত। হজরত মুসা এবার বললেন, আমি দেখলাম আর এক উম্মতের বিবরণ। তারা উচ্চভূমিতে আরোহণকালে বলবে 'আল্লাহু আকবার।' আর নিম্নভূমিতে আরোহণকালে বলবে 'সুবহানাল্লাহ্', আলহামদুলিল্লাহ্ (অর্থাৎ হজযাত্রী হবে তারা)। তাদের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে করা হবে পবিত্র (তায়াম্মুম ও নামাজ পাঠের জন্য)। তারা পানি দ্বারা যেমন পবিত্র হবে ওজু ও গোসলের মাধ্যমে, তেমনি পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্রতা অর্জন করবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমেও। কিয়ামতের দিন তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো হবে ওজুর কারণে উজ্জ্বল। হে আমার আল্লাহ্! আপনি ওই লোকদেরকে বানিয়ে দিন আমার উম্মত। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, হে রসুল মুসা! তারা তো হবে শেষতম রসুলের উম্মত। হজরত মুসা আবারো বললেন, হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! আমি দেখলাম, এক উম্মত শুভকর্মের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গে পাবে একটি পুণ্য। আর কাজটি করলে পুণ্য পাবে কমপক্ষে দশটি। পাপকর্মের সংকল্প করলে তাদের কোনো পাপ হবে না। পাপ করে ফেললে পাপ হবে কেবল একটি। হে আমার আল্লাহ্! ওই লোকদেরকেই আমি চাই আমার উম্মত হিসাবে। আল্লাহ্পাক জানালেন, তারা যে মোহাম্মদ নবীর উম্মত হিসাবে নির্ধারিত। হজরত মুসা পুনরায় বললেন, হে আমার জীবন মৃত্যুর অধীশ্বর! আমি আরো দেখলাম এক দুর্বল উম্মতের কথা। সকল কিতাবের সত্যায়ণকারীরূপে পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব তুমি দান করবে তাদেরকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হবে পাপী। কারো কারো আমল হবে পাপ-পুণ্য মিশ্রিত। আবার কেউ কেউ হবে পুণ্যবান। কিন্তু তারা সকলেই হবে রহমতপ্রাপ্ত। রহমত-বঞ্চিত হবে না কেউই। হে আমার পরম প্রভু! আপনি তাদেরকেই বানিয়ে দিন আমার উম্মত। আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, তারা যে আমার আহমদ নবীর উম্মত। হজরত পুনর্বার নিবেদন করলেন, প্রিয়তম প্রভু আমার! আমি দেখলাম, এক উম্মত বক্ষবদ্ধ করবে আসমানী কিতাব (হাফেজে কোরআন হবে)। সজ্জিত থাকবে জান্নাতী পোশাকে। তাদের নামাজের কাতার হবে ফেরেশতাদের কাতারের মতো। মসজিদে তাদের কোরআন আবৃতি গুঞ্জরিত হতে থাকবে মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো। তাদের

কেউ দোজখের আগুনে স্থায়ী হবে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা হবে তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হে আমার আল্লাহ্! তুমি ওই দলটিকে আমার উম্মত নির্ধারণ করে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তারা আমার আহমদ নবীর উম্মতরূপে নির্ধারিত। হজরত মুসা শেষতম রসুলের উম্মতের এতো মর্যাদা দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আক্ষেপের স্বরে বললেন, হায়! আমি নবী না হয়ে যদি ওই নবীর উম্মত হতে পারতাম। এরপর বিমর্ষ নবীকে প্রসন্ন করার নিমিত্তে আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন— হে মুসা! আমি তোমাকে আমার বাণী ও বাক্যালাপ দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও।'—এই বেহেশতী শান্তি প্রদায়ক প্রত্যাদেশ শুনে হজরত মুসা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا
بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ○ سَأَصْرِفُ
عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ
الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ○ وَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

❒ আমি তোমার জন্য ফলকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদিগের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি সত্যত্যাগীদিগের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

❒ পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে গর্ব করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব। তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও

উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে, ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল অনবধান।

❒ যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।

আগের আয়াতে উল্লেখিত প্রত্যাদেশের প্রবহমানতা চলে এসেছে উদ্ধৃত আয়াতগুলোতেও। প্রথমে নির্দেশনা এসেছে— আমি তার জন্য ফলকে উৎকীর্ণ তওরাতে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাও বিবৃত করেছি। সুতরাং ওগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তোমার সম্প্রদায়কে তাদের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তা অবলম্বন করতে নির্দেশ দাও। আমি সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো।

যে ফলকগুলোতে তওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ ছিলো, সেগুলোর সংখ্যা ছিলো সাতটি, অথবা দশটি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আলওয়াহ্' শব্দটির অর্থ— ফলকসমূহ। হাদিস শরীফে এসেছে, তওরাত শরীফের ফলকগুলো ছিলো বেহেশতের বরই গাছের তক্তা। প্রতিটি তক্তা ছিলো বারো হাত দীর্ঘ। হজরত জাফরের মধ্যস্থতায় হজরত আলী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু শায়েখ। ওই হাদিসে এ কথাও এসেছে যে, আল্লাহ্তায়ালা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন হজরত আদমকে। স্বহস্তে ফলকে লিপিবদ্ধ করেছেন তওরাত। আর স্বহস্তে রোপণ করেছেন বেহেশতের তুবা নামক বৃক্ষটি।

হাসান বসরী বলেছেন, ওই ফলকগুলো ছিলো কাঠের তক্তা। কালাবী বলেছেন, সবুজ জবরজাদ নির্মিত ছিলো ফলকগুলো। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো লাল ইয়াকুতের। এ সম্পর্কে সর্বশেষ উক্তি করেছেন হজরত কা'ব আহবার। বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও আবু শায়েখ।

রবী বিন আনাস বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো জবরজাদের। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, জামরাদের— যা আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে হজরত জিবরাইল এনেছিলেন এডেন থেকে। যে কলম দিয়ে অদৃষ্টলিপি লেখা হয়, সেই কলম দিয়েই লেখা হয়েছিলো তওরাত। আর নহরে নূরের পানি ব্যবহৃত হয়েছিলো কালিরূপে। আবু শায়েখের বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে জুরাইজ বলেছেন, ফলকগুলো ছিলো জামরাদ ও জবরজাদের। ওয়াহাব বলেছেন, ঠুস নামক পাথর থেকে আল্লাহ্পাক ফলকগুলো উৎপাটনের হুকুম দিয়েছিলেন। তারপর সেগুলোকে করেছিলেন নরম। তারপর প্রস্তরখণ্ডকে চিরে বানানো হয়েছিলো দশটি মসৃণ ফলক। আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে বাক্যালাপের সময় হজরত মুসা ওই ফলকগুলোর

উপর কলমের লেখার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিলো এই ঘটনা। ফলকগুলো দৈর্ঘ্যে ছিলো হজরত মুসার শরীরের সমান— দশ হাত।

মুকাতিল ও ওয়াহাব বলেছেন, আংটির নকশার মতো লিপির মাধ্যমে ফলকসমূহের উপরে লেখা হয়েছিলো তওরাত। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, অবতরণকালে তওরাতের ওজন ছিলো সত্তরটি উটের বোঝা সদৃশ। এক বৎসরের কমে তওরাতের একটি খণ্ড পড়ে শেষ করা যেতো না। হজরত মুসা, হজরত ইউশা, হজরত উযায়ের এবং হজরত ঈসা ব্যতীত অন্য কেউ সম্পূর্ণ তওরাত পাঠ করতে পারেনি।

এখানে 'মিন কুল্লি শাইয়িম্ মাউয়ি'জাতাঁন অর্থ— সর্ব বিষয়ে উপদেশ। 'ওয়া তাফ্সিলল্ লি কুল্লি শাইয়িন' অর্থ— সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। এখানে 'উপদেশ' অর্থ ওই সকল বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা যেগুলোর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কামুস গ্রন্থে রয়েছে এর অর্থ— তিরস্কার ও পুরস্কারের এমন নির্দেশনা, যা পাঠ করলে হৃদয় বিনম্র হয়। 'সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা' কথাটির অর্থ— আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও অন্যান্য নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ। 'ওয়া খুজহা বি ক্কুওয়াতিন' কথাটির অর্থ— সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধরো। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার এই নির্দেশসমূহ ধারণ করো দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে। কেননা অশক্ত অভিপ্রায় হচ্ছে আলস্য ও ঔদাসীন্যতুল্য। দুর্বল সংকল্পধারীরা কখনো সফলতার মুখ দেখে না।

'ওয়া মুর ক্বওমাকা ইয়াখুজু বিআহ্সানিহা' কথাটির অর্থ— এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর মধ্যে (তওরাতের মধ্যে) যা শ্রেষ্ঠ; তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। 'বিআহ্সানিহা' কথাটির অর্থ এখানে যা শ্রেষ্ঠ, সর্বাঙ্গসুন্দর বা সর্বোত্তম। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্তায়ালার কিতাবে বর্ণিত সকল বিষয়ই সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। অসুন্দর বলে সেখানে কোনো কিছু নেই।

আতা বলেছেন, 'ইয়াখুজু বি আহ্সানিহা' কথাটির ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ— তওরাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে। বিধানসমূহের প্রতি নিবদ্ধ করবে অভিনিবেশী দৃষ্টি। বিভিন্ন বিবরণ ও উদাহরণ থেকে গ্রহণ করবে উপদেশ। আর আমল করবে এর বিধানানুসারে। গভীর পর্যবেক্ষণে মগ্ন হবে না এর মোতাশাবাহাত (রহস্যাচ্ছন্ন বক্তব্য) সম্পর্কে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'বিআহ্সানিহা' কথাটির উদ্দেশ্য— ফরজ ও মোস্তাহাব বিধানসমূহ, যেগুলোর মাধ্যমে পুণ্য অর্জিত হয়। ফরজ ও মোস্তাহাব ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয় মোবাহ্ (বৈধ) —যেগুলো করলে সওয়াব হবে, কিন্তু না করলে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'যা শ্রেষ্ঠ তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও' কথাটির অর্থ— হে রসুল মুসা! তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সর্বোত্তম আমলের নির্দেশ দাও। অর্থাৎ— রুখসত (সহজসাধ্য) নয়, নির্দেশ দাও আজিমত (দৃঢ়তাব্যঞ্জক) আমলের। প্রতিটি আমলের দু'টো দিক রয়েছে— একটি সর্বোত্তম, অন্যটি অপেক্ষাকৃত কম উত্তম। যেমন, কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) অপেক্ষা উত্তম ক্ষমা, প্রতিশোধ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম ধৈর্য ইত্যাদি। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এভাবে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম আমল না করে অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তম আমলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—'আমি সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাবো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল মুসা! আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণামস্থল প্রদর্শন করাবো। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে দেখাবো মিসরের ফেরাউন ও তার সম্পদায়ের বিরান বসতবাটী। এ রকম বলেছেন আতিয়াহ্ আওফী। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'বাসস্থান' অর্থ— কাফেরদের ধ্বংসের স্থান। হজরত কাতাদা এবং কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য সম্প্রদায়ের বিরান জনপদের ধ্বংসচিহ্ন। হজরত মুসার অনুগমনকালে বনী ইসরাইলদেরকে এ সকল ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছিলো। মুজাহিদ, হাসান এবং আতা বলেছেন, এখানে 'সত্য-ত্যাগীদের বাসস্থান' অর্থ— জাহান্নাম, যেখানে অবিশ্বাসীরা বসবাস করবে অনন্তকাল।

পরের আয়াতে (১৪৬) বলা হয়েছে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দিবো, তারা আমার নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না।'

এখানে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়' কথাটির অর্থ— যারা ভ্রষ্ট ধর্মমতের কারণে গর্বিত এবং যারা পৃথিবীতে অহংকারবশতঃ মানুষের উপর অত্যাচার করে ও যারা আমার প্রিয়জনদের (নবী রসুলদের) বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

'তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দিবো' কথাটির অর্থ— আমি ওই অহংকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ থেকে কোনো উপদেশ বা উপকার গ্রহণ করতে দেবো না। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— আমি দাম্ভিক অবিশ্বাসীদেরকে আমার পক্ষ থেকে অবতারিত মোজেজাসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দিবো না, আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টাসমূহকে হতে দেবো না ফলপ্রসূ। অর্থাৎ— আমার নিদর্শনসমূহকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেই ছাড়বো। ধ্বংস করে দেবো মিথ্যাবাদীদেরকে— যেমন দিয়েছি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদেরকে। কাফেরদের পছন্দ না হলেও আমি আমার সত্যধর্মের নূরকে করবো পূর্ণ বিকশিত। উদ্ধৃত কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— অবিশ্বাসীরা

অবিবেচক ও অহংকারী বলে আমি তাদেরকে শুদ্ধ ধর্মমত থেকে করবো চিরবঞ্চিত। ফলে তারা কোরআনের আয়াতের উপর আস্থা রাখতে পারবে না, ছত্রছায়ায় আসতে পারবে না সত্যধর্মের। তাদের অন্তরকে আমি করে দেবো সত্যধর্মের প্রতি বিকর্ষণপ্রবণ। অন্য একটি আয়াতেও তাই বলা হয়েছে—'ফালাম্মা জাগু আজাগাল্লহু কুলুবুহুম' (যখন তারা বক্র হলো, আল্লাহ্ বক্র করে দিলেন তাদের অন্তরসমূহকে)। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'সাআস্‌রিফু' (দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো) কথাটির অর্থ এখানে— আমি তাদেরকে কোরআনের মর্মার্থ ও রহস্যের সন্ধান দেবো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আয়াতী (আমার নিদর্শন) কথাটির অর্থ ওই নয়টি নিদর্শন, যা আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুসাকে দান করেছিলেন। যদি তাই হয় তবে এখানে 'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়' কথাটির লক্ষ্যস্থল হবে কেবল কিবতীরা (ফেরাউনের অনুসারীরা)। আর তখন আলোচ্য আয়াতটিও সুনির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে তাদের সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না' কথাটির অর্থ— ওই গর্বিত অবিশ্বাসীদেরকে আমার সকল নিদর্শন দেখানো হলেও তারা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করবে না। কারণ তাদের বোধ ও চিন্তা-চেতনা হয়ে গিয়েছিলো বিকৃত। অথবা তারা এ কারণেই ইমান আনতে পারবে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের হৃদয়কে করেছেন মোহরাঙ্কিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।' এখানে 'সাবীলার্ রুশদি' অর্থ— সৎপথ। 'রাশ্‌দা,' 'রুশদা' এবং 'রাশাদীন' শব্দত্রয় সমার্থক— যেমন সমার্থক 'সাক্বাম' 'সুক্বাম' এবং সাক্বামী' শব্দত্রয়। আবু আমর বলেছেন, কোনো কাজকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করাকে বলা হয় রুশদ্। আর 'রাশ্‌দা' বলা হয় ধর্মের উপর দৃঢ়তাকে। 'সাবীলাল্ গায়্যী' অর্থ ভ্রান্ত পথ। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায় এ রকম— অন্যায়কারী গর্বিত অবিশ্বাসীরা অসুস্থ ও বিকৃত চিন্তাচেতনা দ্বারা পরিচালিত। তাই তারা সৎপথ পরিত্যাগ করে এবং গ্রহণ করে ভ্রান্ত পথ।

শেষে বলা হয়েছে—'এটা এই হেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিলো অনবধান।' এ কথার অর্থ, দর্পিত অবিশ্বাসীদের ভ্রান্তপথ গ্রহণ এবং সৎপথ বর্জনের মূল কারণটি এই— তারা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে আমার নিদর্শনসমূহকে। আর এ সম্পর্কে তারা ছিলো বড়ই অসতর্ক ও উদাসীন।

পরের আয়াতে (১৪৭) বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়।' এ কথার অর্থ— আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎ অস্বীকারকারীরা পুণ্যকর্ম করলেও তা হবে নিষ্ফল।

বাস্তবে দেখা যায়, অবিশ্বাসীরাও দরিদ্রকে অর্থ ও অন্ন দান করে, রক্ষা করে সামাজিক শিষ্টাচার। আত্মীয়তার সম্পর্ককে রাখে অটুট ইত্যাদি। তারা মনে করে এতে করে তাদের অনেক পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা মরীচিকার মতো অলীক। আখেরাতে তারা এ সকলের বিনিময় পাবে না। কারণ ইমানবিহীন সৎকর্ম গ্রহণীয় নয়। (মূল ব্যতীত বৃক্ষ যেমন ধারণামাত্র)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যা করে তদানুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।' এ কথার অর্থ— শেষ বিচারের দিন বিশুদ্ধচিত্ত ও ধর্মনিষ্ঠদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার। আর অবাধ্য ও পাপাচারীদেরকে দেয়া হবে শাস্তি। যারা অবিশ্বাসী ও অংশীবাদী তারা সেদিন হবে সম্পূর্ণ অসফল। তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا
اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا سُقِطَ
فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ
بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ
قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ
وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ
وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

❑ মূসার লোকেরা তাহার অনুপস্থিতিতে নিজদিগের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব যাহা গরুর শব্দ করিত। তাহারা কি দেখিল না যে উহা তাহাদিগের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল সীমালংঘনকারী।

❒ তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে তখন তাহারা বলিল, 'আমাদিগের প্রতিপালক যদি আমাদিগের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই।'

❒ মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদিগের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করিলে?' এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারুণ বলিল 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়, এবং আমাকে সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

❒ মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও আর দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

হজরত মুসা যখন আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে একান্ত আলাপন ও কিতাব গ্রহণের জন্য তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, তখন সত্যধর্ম বিশ্বাস থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিলো বনী ইসরাইলেরা। তারা অলংকার দ্বারা একটি গো-শাবক নির্মাণ করেছিলো। ওই বাছুরের মূর্তিটি থেকে আবার জীবিত বাছুরের মতো হাম্বা আওয়াজ নির্গত হতো। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শুরুতে সেই ঘটনাটিরই উল্লেখ করা হয়েছে—'এবং মুসার লোকেরা তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব যা গরুর শব্দ করতো'। এখানে 'মুসার লোকেরা' অর্থ— হজরত মুসার উম্মত বা বনী ইসরাইল। 'তাঁর অনুপস্থিতিতে' অর্থ— হজরত মুসা যখন তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, সেই সময়ে। 'নিজেদের অলংকার' অর্থ— কিবতীদের গচ্ছিত অলংকার, যা বনী ইসরাইলেরা সঙ্গে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে উঠেছিলো এবং কিবতীদের সলিল সমাধির পর তারাই যেগুলোর হয়ে গিয়েছিলো প্রকৃত মালিক। ওই অলংকার দিয়েই তারা নির্মাণ করেছিলো একটি গো-বৎসের মূর্তি।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত কাতাদা এবং তাফসীরকারগণের একটি দলের অভিমত এই যে, ওই গো-প্রতিমাটি নির্মাণ করেছিলো সামেরী নামক এক ব্যক্তি। সে ওই মূর্তিটির মুখে দিয়েছিলো হজরত জিবরাইলের অশ্বপদস্পর্শিত কিছু মাটি। তাই মূর্তিটিতে ফুটে উঠেছিলো এক প্রকারের জীবনের চিহ্ন। এ সম্পর্কে সামেরীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে সুরা তোয়াহা'য় এভাবে—'আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখেনি; অতঃপর আমি সেই স্বর্গীয় দূতের পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি মাটি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম।' যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইন্শাল্লাহুতায়ালা।

'খুওয়ারুন' শব্দটির অর্থ— ওই গো-অবয়বটি থেকে মাঝে মাঝে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ উত্থিত হতো। কেউ বলেছেন, একবার মাত্র হাম্বা উচ্চারিত হয়েছিলো মূর্তিটি থেকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মূর্তিটি বার বার হাম্বা হাম্বা বলে ডাকতো। বনী ইসরাইলেরা তার হাম্বা ডাক শুনলে সেজদায় পতিত হতো এবং হাম্বা ডাক বন্ধ হলে মাথা ওঠাতো সেজদা থেকে।

ওয়াহাব বলেছেন, মূর্তিটির আওয়াজ ছিলো ঠিকই, কিন্তু সেটি ছিলো চলচ্ছক্তিহীন। সুদ্দী বলেছেন, মূর্তিটি চলাফেরাও করতো। কোনো কোনো বিজ্ঞজন উল্লেখ করেছেন, সেটি ছিলো একটি নিষ্প্রাণ স্বর্ণপ্রতিমা। বাতাস তার মুখ দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যেতো পশ্চাৎদেশ দিয়ে। সেটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো যেনো বাতাস ধীরে অথবা জোরে গমনাগমনের সময় তা থেকে নির্গত হয় গরুর আওায়াজের মতো আওয়াজ।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা কি দেখলো না যে, সেটি তাদের সঙ্গে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা সেটিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলো এবং তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।' প্রচণ্ড রোষ প্রদর্শন করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। বলা হয়েছে, নিরেট মূর্খ বনী ইসরাইল সম্প্রদায়। সহজ সরল বিবেচনাবোধও তাদের নেই। একটি গো-বৎসের মূর্তিকেই তারা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করলো? অথচ সেটি বচনক্ষমতারহিত এবং তাদেরকে পথ দেখাতে অসমর্থ। অতএব এ কথা নিশ্চিত যে,তারা ছিলো সীমালংঘনকারী।

পরের আয়াতে (১৪৯) বলা হয়েছে—'তারা যখন অনুতপ্ত হলো ও দেখলো যে, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে তখন তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবোই।' এখানে 'সুকিত্বা ফী আইদীহিম' অর্থ— যখন তারা হাত কামড়াতে লাগলো। অনুতপ্ত ব্যক্তি ক্ষোভে দুঃখে নিজের হাত কামড়াতে থাকে। তাই এখানে হাত কামড়াতে লাগলো কথাটির মর্মার্থ হবে— অনুতপ্ত হলো। অর্থাৎ— তুর পাহাড় থেকে ফিরে এসে হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের এই চরম অধঃপতন দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। তখন সম্বিত ফিরে পেলো বনী ইসরাইলেরা। বুঝলো, গো-বৎসের উপাসনা তাদেরকে ধর্মচ্যুত করে দিয়েছে। অন্তরে তাদের প্রজ্বলিত হলো অনুতাপের আগুন। তাই তারা আল্লাহ্তায়ালা সকাশে প্রার্থনা জানালো এভাবে— আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে মার্জনা না করেন তবে আমরা তো হবো নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।

এর পরের আয়াতে (১৫০) বলা হয়েছে— 'মুসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলো তখন বললো, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করলে?' এখানে 'আসিফান' শব্দটির অর্থ— চরম ক্ষুব্ধ হয়ে। এ রকম বলেছেন হজরত আবু দারদা। হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দী বলেছেন— শব্দটির অর্থ— চরম দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে,

'আসাফুন' অর্থ— গভীর দুঃশ্চিন্তায় নিপতিত হওয়া। 'আসাফা আলাইহি' অর্থ— এর প্রতি ক্রোধান্বিত।

'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কতো নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো।' হজরত মুসার এই সম্বোধনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছেন হজরত হারুন। আর পরোক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা গো-বৎসের পূজা করতে সম্মত হয়নি। অথবা সম্বোধন করা হয়েছে শুধুমাত্র গো-বৎস পূজারীদেরকে। হজরত হারুণকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে হজরত মুসা গমন করেছিলেন তুর পর্বতে। ফিরে এসে লোকদের স্খলন দেখে তিনি হজরত হারুণকে লক্ষ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা প্রতিনিধি হিসাবে কতই না নিকৃষ্ট। আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছি বিশুদ্ধ তৌহিদ। অথচ তোমাদের উপস্থিতিতেই তোমাদের সম্প্রদায়ের অনেক লোক পা বাড়িয়েছে অংশীবাদীতার দিকে। তাদেরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারো নি।

'তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ তোমরা ত্বরান্বিত করলে?' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ কর্তৃক সময় নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা এরূপ আচরণ শুরু করে দিলে? তোমরা ভেবেছো আমি আর ফিরবো না। তাই অতীতের উম্মতদের মতো তোমরা তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করতে শুরু করেছিলে?

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিলো আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো।' আপন সম্প্রদায়ের লোকদেরকে শিরিক করতে দেখে চরম ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তওরাতের ফলকগুলো স্কন্ধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে দিয়েছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমনার্থে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নিকট। এখানে 'ফলকগুলো ফেলে দেয়া'র প্রকৃত অর্থ হবে— দ্রুত রেখে দেয়া। একজন মহাসম্মানিত রসুল কর্তৃক আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সন্দেহটি এখানে অমূলক ও অবান্তর।

ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে জাবরজাদের সাতটি তক্তার উপর লিখিত তওরাত দান করেছিলেন। ওই কিতাবে ছিলো সকল কিছুর বিবরণ এবং সঠিক পথের দিশা। তওরাত নিয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। তিনি লোকদেরকে গো-বৎসের পূজা করতে দেখে ক্ষুব্ধ হলেন চরম উত্তেজনার ফলে আল্লাহ্র কিতাবের সম্মান যেনো খর্ব না হয় তাই তিনি অতি দ্রুত তওরাতের ফলকগুলো একপাশে রেখে দিলেন। এভাবে রাখতে গিয়ে একটি ফলক বাদে অন্য ছয়টি ফলক গেলো ভেঙে। তখন

ভাঙা ফলকগুলো আল্লাহ্তায়ালা উঠিয়ে নিলেন। রইলো কেবল অটুট সপ্তম ফলকটি। বাগবী বলেছেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের বিবরণ সমৃদ্ধ ফলকগুলো কেবল উঠিয়ে নিয়েছিলেন আল্লাহ্পাক। আর রেখেছিলেন কেবল ওই ফলকটি, যাতে লিপিবদ্ধ ছিলো হেদায়েত, আহকাম এবং হালাল-হারামের বিবরণ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, শ্রবণ কখনও দর্শন তুল্য নয়। তুর পাহাড়ে অবস্থানের সময়েই আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে বনী ইসরাইলদের পথভ্রষ্টতার সন্ধান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি তওরাতের ফলকসমূহ নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু স্বচক্ষে শিরিক করতে দেখে তিনি সংযত করতে পারেন নি নিজেকে। ফলকগুলো ফেলে (রেখে) দিয়েছিলেন। ফলকগুলো ভেঙে গিয়েছিলো তখন। আহমদ, তিবরানী, হাকেম।

'স্বীয় ভ্রাতাকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো'—এ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, আপনজনকে লক্ষ্য করেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। হজরত মুসার তখন মনে হয়েছিলো, ভ্রাতা হারুণের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই সকল গণ্ডগোলের মূল। তাই তিনি ক্ষোভে দুঃখে হজরত হারুনের কেশগুচ্ছ ধরে নিজের দিকে টেনে এনেছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, হজরত হারুনের মস্তকের অগ্রভাগের চুল এবং দাড়ি ধরে আকর্ষণ করেছিলেন হজরত মুসা। হজরত হারুন ছিলেন হজরত মুসার অগ্রজ। তিন বছরের বড় ছিলেন তিনি। তিনি হজরত মুসার মতো উষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন না। ছিলেন কোমল। তাই বনী ইসরাইলেরা হজরত মুসার চেয়ে অধিক অনুরাগী ছিলো হজরত হারুনের।

এরপর বলা হয়েছে— হারুন বললো, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে প্রায় হত্যাই করে ফেলেছিলো। তুমি আমার সঙ্গে এমন কোরো না, যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়, এবং আমাকে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না'। এখানে 'ইবনা উম্মা' কথাটির অর্থ— হে আমার সহোদর! ক্বারী ইবনে আমের, ক্বারী হামজা, ক্বারী কাসায়ী ও অন্যান্যরা কথাটিকে পড়েছেন— 'ইবনা উম্মী'। এটাই অধিকতর শুদ্ধ। কেননা কথাটির প্রকৃত রূপ ছিলো—'ইয়া ইবনা উম্মী'। কিন্তু এখানে সম্বোধনসূচক শব্দ 'ইয়া' (হে) বাদ পড়েছে। কিন্তু এই বাদ পড়া সত্ত্বেও মিম অক্ষরের যের হরকতটি তো রয়েছেই। এরপর অধিকাংশ ক্বারী কথাটিকে সংক্ষেপ করতে গিয়ে যের এর স্থলে লাগিয়েছেন যবর। এখানে ওই সংক্ষিপ্ত রূপটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

ক্ষুব্ধতাকে কোমলতার মাধ্যমে প্রশমিত করতে চাইলেন হজরত হারুন। তাই তিনি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন এভাবে— হে আমার ভ্রাতা! আমি লোকদেরকে এই অপকর্ম থেকে বিরত রাখার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হয়ে পড়েছিলো

সংঘবদ্ধ ও প্রবল। আমার সদুপদেশকে তারা কোনো গুরুত্বই দেয়নি। আমাকে তারা ভেবে নিয়েছিলো তাদের প্রধান অন্তরায়। এমন কি হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং হে আমার সহোদর! শত্রুকে আনন্দিত করে এমন আচরণ তুমি আমার সঙ্গে কোরো না। গো-বৎস পূজারীরা নিশ্চিত সীমালংঘনকারী। আমি তো তা নই। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে কোরো না।

এর পরের আয়াতে (১৫১) বলা হয়েছে— মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও। আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

'রব্বিগফিরলী ওয়ালি আখী' কথাটির অর্থ— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো। অর্থাৎ— হজরত মুসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমার ভাইয়ের সঙ্গে যে অশিষ্ট আচরণ আমি করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর গো-বৎস পূজারীদেরকে ওই অপকর্ম থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে আমার ভ্রাতা হারুন যদি সামান্যতম কোনো অবহেলাও করে থাকে, তবে তুমি তাকেও মার্জনা করো। এখানে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে হজরত হারুনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই ছিলো হজরত মুসার আলোচ্য প্রার্থনাটির উদ্দেশ্য। কিন্তু ভ্রাতার মনস্তুষ্টির জন্য এবং শত্রুদের আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করার জন্য হজরত মুসা নিজেকেও সংশ্লিষ্ট করেছিলেন তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, অন্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হতে চাইলে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে প্রথমে— যাতে নিজেকে নিষ্পাপ মনে করার অপরিচ্ছন্নতার অবকাশ আর না থাকে। আর একটি কথাও অবশ্য স্মরণীয়। সেটি হচ্ছে— গোনাহ্ দোয়া কবুল হওয়ার অন্তরায়। তাই দোয়া করতে গেলে প্রথমে ওই অন্তরায়টি অপসারণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। একারণেই জানাযার নামাজের দোয়ায় উল্লেখ করতে হয়—'আল্লাহুম্মাগফিরলী হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা' (হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত এবং মৃত তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও)। অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আগেই নিজের ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলে। আবার কবর জিয়ারতের দোয়ায় বলতে হয়—'ইয়াগফিরুল্লহু লানা ওয়ালাকুম' (আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করুন)। এক্ষেত্রেও প্রার্থনাকারী নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে আগে। নবী-রসুলগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। পাপের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততাই তাদের নেই। তৎসত্ত্বেও উম্মতদেরকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা এক স্থানে এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্তাগ্ফির লীজাম্বিকা ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াদ্খিলনা ফী রহ্মাতিকা' (আপনি আপনার অপরাধের জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন ইমানদার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য। আর বলুন, আমাদেরকে রহমতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিন)। কথাটির অর্থ— হে আল্লাহ্! আমাদের সকলকে দান করুন পাপবিবর্জিত জীবন। পরকালে আমাদের প্রতি রহম করুন এবং উভয় জগতে আমাদেরকে দান করুন উচ্চ মর্যাদা।

সবশেষে বলা হয়েছে—'ওয়া আন্তা আর্হামুর রহিমীন' (আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু)। এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমরা নিজেদের প্রতি যতটুকু অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারি, তুমি তদপেক্ষা অধিক অনুকম্পাশীল।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫২, ১৫৩

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِهَا وَاٰمَنُوٓا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❑ যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদিগের উপর তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসিবে আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❑ যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে অনুতপ্ত হইলে ও বিশ্বাস করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইন্নাল্লাজিনাত্তাখাজুল ই'জলা অর্থ— যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। সাইয়ানালুহুম গদ্বাবুম মির্রব্বিহিম ওয়া জিল্লাতুন ফিল্ হাইয়াতিদ্ দুন্ইয়া অর্থ— পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে। এখানে 'গদ্বাবুন' অর্থ গজব বা ক্রোধ। 'জিল্লাতুন' অর্থ লাঞ্ছনা। আর একটি অর্থ— লাঞ্ছিত অবস্থায় দেশান্তরিত হওয়া। এই আয়াতের ঘোষণা অনুসারে পৃথিবীতেই বনী ইসরাইলদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র গজব ও লাঞ্ছনা। নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো গো-বৎসের পূজা থেকে তওবা করতে হবে এবং তওবার নিদর্শন স্বরূপ পরস্পরকে হত্যা করতে হবে। আর তাদের প্রতি দেশান্তরিত হওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, তাকেই এখানে বলা হয়েছে জিল্লাত্ বা লাঞ্ছনা।

কিন্তু আতিয়াহ্ আওফী বলেছেন, এখানে ঘোষিত ক্রোধ ও লাঞ্ছনার লক্ষ্য হচ্ছে রসুল স. এর যুগের ইহুদীরা। এখানে ওই ইহুদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের গো-বৎসের উপাসনার কথা উল্লেখ করে লজ্জা দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, অবাধ্যতা ও মিথ্যা রচনার জন্য তোমাদেরকে পরকালে তো শাস্তি দেয়া হবেই, উপরন্ত ইহকালেও তোমাদের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্র গজব এবং লাঞ্ছনা। তাই হয়েছিলো। বনী নাজির ও বনী কুরায়জার একটি দলের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো ও অন্য দলটিকে করা হয়েছিলো বিতাড়িত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মদীনার ইহুদীদের উপর যে কর আরোপ করা হয়েছিলো, সেই করকেও এখানে বলা হয়েছে লাঞ্ছনা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া কাজালিকা নাজ্যিল মুফ্তারীন'। কথাটির অর্থ— এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

পরের আয়াতে (১৫৩) বলা হয়েছে—'যারা অসৎ কাজ করে তারা পরে অনুতপ্ত হলে ও বিশ্বাস করলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসার অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছিলো। তারপর ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে তারা তওবা করেছিলো এবং ফিরে এসেছিলো বিশ্বাসের চির সুবাসিত কাননে। তওবার শর্তও তারা পালন করেছিলো দ্বিধাহীন চিত্তে। আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ লাভের নিমিত্তে যথাযথভাবে তারা সম্পন্ন করেছিলো স্বজন-হননের নির্দেশটি। এভাবে গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও যারা অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবলম্বন করে বিশ্বাসকে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কারণ তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৪

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

❐ মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল; যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও দয়া।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাম্মা সাকাতা আ'ম্ মুসাল গদ্বাব্' (মুসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো)। এখানে 'সাকাতা' শব্দটির অর্থ সাকানা (প্রশমন)। হজরত হারুন যখন প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন এবং গো-বৎসের উপাসকেরা যখন

লজ্জিত হয়ে তওবা করতে সম্মত হলো, তখন প্রশমিত হলো হজরত মুসার ক্রোধ। এখানে 'সাকানা' শব্দটির বদলে সাকাতা শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় বক্তব্যটি হয়েছে অধিকতর গতিশীল। স্বচক্ষে শিরিক করতে দেখে চরম উত্তেজিত হয়েছিলেন হজরত মুসা। তাই তওরাতের ফলকগুলো অতি দ্রুত ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে সাতটি ফলকের ছয়টি গিয়েছিলো ভেঙে। একটি ছিলো কেবল অটুট।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে যা লিখিত ছিলো তাতে ছিলো পথ নির্দেশ ও দয়া। এখানে 'তাতে যা লিখিত ছিলো' কথাটির অর্থ— তওরাতের ওই অটুট অনুলিপিটিতে যা লিখা ছিলো। অনুলিপি বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে নুসখাহ্ শব্দটি। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যে ফলকটি ভাঙেনি সেই ফলকটিকে এখানে বলা হয়েছে নুসখাহ্ বা অনুলিপি। আর ওই অনুলিপি করা হয়েছে লাওহে মাহ্ফুজ থেকে।

কেউ কেউ বলেছেন, সজোরে নিক্ষেপ করার ফলে তওরাতের মূল ফলকগুলো সবই ভেঙে গিয়েছিলো। পরে সেগুলো থেকে করা হয়েছিলো নতুন অনুলিপি। কেউ কেউ বলেছেন, নুসখাহ্ অর্থ লিখিত। শব্দটি কর্মকারকের অর্থ প্রকাশক। যেমন খুত্বাতুন (ভাষণ) অর্থ মাখতুবুন (ভাষণ)।

আতা বলেছেন, 'নুস্খাতুহা' শব্দটির অর্থ— অবশিষ্ট অংশ। হজরত ইবনে আব্বাস এবং আমর ইবনে আবিদ্ দুনইয়া বলেছেন, হজরত মুসা ফলকগুলো নিক্ষেপ করার ফলে সেগুলো এমনভাবে ভেঙে গিয়েছিলো যে, পাঠোদ্ধার আর সম্ভব হচ্ছিলো না। হজরত মুসা তাই চল্লিশ দিন রোজা রেখেছিলেন। তারপর তাঁকে দুইবারে ফলক প্রদান করা হয়।

'তাতে ছিলো পথ-নির্দেশ ও দয়া'। কথাটির অর্থ— তওরাত শরীফের ওই অনুলিপিটিতে এ কথাগুলো স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, কিভাবে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করা যায় হেদায়েত এবং কি করেই বা আল্লাহ্তায়ালার ক্রোধ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে পাওয়া যায় আল্লাহ্তায়ালার দয়া।

শেষে বলা হয়েছে— 'লিল্লাজিনা হুম লিরব্বিহিম ইয়ার্হাবুন' (যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে)। এখানে 'লিরব্বিহিম' শব্দটির প্রথমে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি অতিরিক্ত। কেননা 'ইয়ারহাবুন' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' ব্যতিরেকে। এটাই আরবী ভাষার নিয়ম। যেমন, 'রউফুল্লাকুম' কথাটির মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে অতিরিক্ত লাম। ক্বারী কাসায়ী বলেছেন, ক্রিয়া পরে উল্লেখিত হওয়ার কারণে এখানে বক্তব্যের কার্যকারিতা হয়ে পড়েছে দুর্বল। তাই কর্মের সঙ্গে এখানে 'লাম' অক্ষরটি উল্লেখিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। অন্যত্রও এর দৃষ্টান্ত

রয়েছে। যেমন— 'লির্‌রুইয়্যা তা'বুরুন' (তোমরা যেনো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো)। কুতরব বলেছেন, এখানে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে 'মিন্‌' (মধ্যে) অর্থে। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইয়ার্‌হাবুন' কথাটির অর্থ হবে 'রহিবুন'। অর্থাৎ কথাটি এখানে কর্তৃকারকের অর্থ প্রকাশক। কেউ কেউ আবার বলেছেন, 'লাম' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা'লীল (হেতুবাচক) এর জন্য। এ কথাটিকে মেনে নিলে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্‌র জন্য তারা পাপকে ভয় করে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৫, ১৫৬

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○ۚ

❑ মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল তখন মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে। আমাদিগের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সে জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্দারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদিগের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

❒ 'আমাদিগের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া— তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি উহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

প্রথমে বলা হয়েছে—'মুসা স্বীয় সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলো।' উল্লেখ্য যে, হজরত মুসা কর্তৃক মনোনীত ওই সত্তরজন ছিলো বনী ইসরাইলের গোত্রীয় নেতৃবর্গ। তারা অংশগ্রহণ করেছিলো গো-বৎস পূজায়। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশানুসারে তাদেরকে নিয়ে হজরত মুসা নির্ধারিত সময়ে তুর পর্বতে গমন করেছিলেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে এই মর্মে নির্দেশ দান করলেন, হে আমার রসুল মুসা! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সত্তরজনকে সঙ্গে নিয়ে তুর পর্বতে এসো এবং গো-বৎস পূজারীদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। বনী ইসরাইলের গোত্র ছিলো বারোটি। প্রতিটি গোত্র থেকে ছয়জন করে নির্বাচন করতে গিয়ে হজরত মুসা দেখলেন, তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বাহাত্তর জনে। তিনি বললেন, সঙ্গে নিতে হবে সত্তরজনকে। সুতরাং তোমরা দু'জনকে বাদ দাও। কিন্তু কেউ বাদ পড়তে রাজী হলো না। তিনি তখন বললেন, যে দু'জন বাদ পড়বে তারাও আমার সঙ্গে গমনকারীদের মতো সওয়াব লাভ করবে। একথা শোনার পর হজরত কালেব এবং হজরত ইউশা থেকে যেতে সম্মত হলেন। হজরত মুসা তখন সত্তর জনকে নিয়ে গমন করলেন তুর পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে হালকা মেঘপুঞ্জ এসে সকলকে আবৃত করলো। সকলে পতিত হলো সেজদায়। সেজদারত অবস্থায় তারা শুনলো, আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসার সঙ্গে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ ধরে চললো আদেশ, নিষেধ ও হেদায়েত সম্পর্কিত আলোচনা। মেঘ কেটে গেলো। সাথীরা বললো, হে নবী মুসা! আমরা আল্লাহ্কে দেখবো। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ দর্শনের ব্যবস্থা করুন। নয়তো আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো যে, আপনার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন। আমরা যে কথাগুলো শুনেছি, সেগুলো তো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কথা হতে পারে। এমতোধৃষ্টতা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বজ্রপাত। কেউ কেউ বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভূমিকম্প। আর সেই ভূমিকম্পের ফলে সকলেই মারা গেলো। সুদ্দী এই অভিমতটিকে সমর্থন করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটেছিলো পরে। আলোচ্য ঘটনাটি সে ঘটনা নয়। আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে হুকুম দিয়েছিলেন, সত্তরজনকে মনোনীত করে জনপদ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসো। নির্দেশ মোতাবেক হজরত মুসা সত্তরজনকে নিয়ে চলে গেলেন জনপদ থেকে দূরে

একটি উন্মুক্ত এলাকায়। সেখানে তিনি সকলকে নিয়ে প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে ওই নেয়ামত দান করো, যা ইতোপূর্বে কাউকে দান করোনি, ভবিষ্যতেও কাউকে দিবে না। আল্লাহ্তায়ালা প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। বজ্রপাতে আক্রান্ত হলো হজরত মুসার সাথীরা।

ওয়াহাব বলেছেন, ভূমিকম্প কবলিত হয়েছিলো তারা। কিন্তু সেই ভূমিকম্পের ফলে তারা মরেনি। তবে মৃত্যুর ভয়ে প্রকম্পিত হয়েছিলো সকলে। তাদের তখন মনে হয়েছিলো শরীরের গ্রন্থিসমূহ বুঝি খসে খসে পড়বে।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো তখন মুসা বললো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সে জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে আর্রজ্ফাতু অর্থ— ভয়াবহ ভূমিকম্প। ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছিলো তারা, যারা গো-বৎস পূজারীদের থেকে পৃথক হয়নি। হজরত মুসা আশংকা করলেন, এই ভূমিকম্পে হয়তো সকলেই মারা পড়বে। তারা ছিলো হজরত মুসার সকল উত্তম কর্মের সহযোগী। হজরত মুসার নির্দেশও তারা যথাযথভাবে পালন করতো। ভূমিকম্প আক্রান্তদের জন্য হজরত মুসার হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি রোদনার্ত স্বরে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমিই তো জীবন মৃত্যুর মালিক। এর আগেও তো তুমি আমাদের সকলকে মেরে ফেলতে পারতে। মেরে ফেলতে পারতে ফেরাউনের মাধ্যমে। অথবা সাগর বক্ষে নিমজ্জিত করে। কিংবা অন্য যে কোনো ভাবে। কিন্তু তুমি তা না করে দয়া করে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছো। তাই এক্ষণে আমরা তোমার রহমত প্রার্থী। সুতরাং তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেইতো এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে' কথাটির অর্থ— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি যদি চাইতে তবে এই স্থানে আসার পূর্বেই সম্প্রদায়ের সকল লোকের সামনে এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে। তখন ঘটনাটি সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারতো। আমি সকলকে এখানে নিয়ে এসে মেরে ফেলেছি— এ রকম অপবাদ আর তারা দিতে পারতো না।

'আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে, সে জন্যে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?'— কথাটির অর্থ, হে আমার আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়ের এই নির্বোধ লোকেরা তোমাকে দেখতে চাওয়ার দাবি তুলে যে গর্হিত

উন্নাসিকতা দেখিয়েছে, অথবা বাছুরের পূজা করে যে চরম অপরাধ তারা করেছে, তাদের কয়েকজনের কারণে তুমি কি আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবে? মোবার্‌রাদ বলেছেন, প্রশ্নাকারে উত্থাপিত এই বাক্যটি আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত অন্বেষণের একটি বিশেষ ভঙ্গীর আবেদন। এভাবে প্রশ্নাকারে প্রার্থনা উপস্থাপনের কারণ এই যে, হজরত মুসা ভালো করেই জানতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক। তাই তিনি কিছু লোকের অপরাধের কারণে সকলকে ধ্বংস করবেন না। এই নিবেদনটিই তিনি জানিয়ে দিলেন প্রশ্নের ভঙ্গীতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করো এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো।' এ কথার অর্থ হজরত মুসা বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি দয়া করে এই সত্তরজনকে তোমার পবিত্র বাণী শুনতে দিয়েছো। তাই তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে তোমাকে দেখার অভিলাষ। অথবা তুমি একটি গর্জনরত গো-বৎস মূর্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করেছো তাদেরকে। তুমি চাওনি তাই তারা এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কেবল তারাই, যাদেরকে তুমি চেয়েছো সৎপথে পরিচালিত করতে।

'ইল্লা ফিত্‌নাতুকা' কথাটির অর্থ— এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা। এ কথা উল্লেখের মাধ্যমে হজরত মুসার নিবেদনটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার আল্লাহ্! এ কথাতো তুমি আমাকে পূর্বেই জানিয়েছো যে, পরীক্ষার মাধ্যমে কাউকে কাউকে করবে পথভ্রষ্ট এবং কাউকে করবে পথপ্রাপ্ত। তাই তোমার ইচ্ছানুসারেই তাদের কেউ কেউ হয়েছে অনুত্তীর্ণ এবং কেউ কেউ হয়েছে উত্তীর্ণ। এ কথা নিশ্চিত যে, অভিপ্রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত, পবিত্র। শেষে বলা হয়েছে— 'তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদের অভিভাবক, রক্ষক। তুমিই মার্জনাকারী, দয়াময় এবং শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপরবশ। তাই দয়া করে তুমি আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দাও।

পরের আয়াতে (১৫৬) বলা হয়েছে, 'আমাদের জন্য নির্ধারিত করো ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি।' এ কথার অর্থ— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! পূর্ণ কল্যাণ দান করো আমাদেরকে। পৃথিবীতে দান করো তোমার একনিষ্ঠ আনুগত্য, পার্থিব নেয়ামত ও মার্জনা। আর আখেরাতে দান করো মাগফেরাত, রহমত এবং জান্নাত। আমরা তো সর্বান্তকরণে তোমার সকাশে প্রত্যাবর্তন করেছি।

হজরত কাতাদা, ইবনে জারিহ্ এবং মোহাম্মদ বিন কা'য়াব বলেছেন, ভূমিকম্প কবলিতদের অপরাধ ছিলো এই— গো-মূর্তি উপাসকদের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করেনি। বরং অবাধে মেলামেশা করেছে তাদের সঙ্গে। তাদেরকে শুভ কাজের নির্দেশ দেয়নি, বিরত থাকতেও বলেনি অশুভ কর্মকাণ্ড থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তাতো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত।' এ কথার অর্থ— হজরত মুসার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, হে আমার রসুল মুসা! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমার রহমত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কেউই আমার রহমত থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু আখেরাতে অবিশ্বাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে না। কেননা অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে নিজেরাই আল্লাহ্তায়ালার রহমতের বৃত্ত থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

রসুল স. বলেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে, প্রবেশ করবে না কেবল তারা, যারা অস্বীকারকারী। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কারা সেই অস্বীকারকারী? তিনি স. বললেন, যারা আমার আদর্শের প্রতিপক্ষ। বোখারী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে আতিয়াহ্ আওফী বলেছেন, আকাশ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্র রহমত সকলেই পায়। কিন্তু সেই রহমতের অধিকারী হয় কেবল মুত্তাকীরা (সাবধানীরা)। তাদের অসিলায় বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলকেই রিজিক প্রদান করা হয় এবং দূর করা হয় বিপদাপদ। কিন্তু অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্র রহমতের পরিচয় পায় না। পরকালে তাই বিশ্বাসীরা যখন আল্লাহ্র রহমত সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন অবিশ্বাসীরা হয়ে যাবে চিরবঞ্চিত। যেমন, উন্মুক্ত স্থানে প্রদীপ জ্বালালে প্রদীপের মালিকের সঙ্গে যারা মালিক নয় তারাও সমানভাবে আলো লাভ করে। কিন্তু প্রদীপের মালিক যদি প্রদীপ নিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তবে যারা মালিক নয় তারা নিপতিত হয় ঘোর অন্ধকারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল মুসার সম্প্রদায়! শুনে নাও, পরকালে আমি আমার রহমত তোমাদের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধানী— অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা থেকে মুক্ত এবং যারা জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে যারা বিশ্বাস করে। অন্যকে সম্পদ দান নফসের জন্য অত্যন্ত কঠিন। তাই এখানে বিশেষভাবে জাকাত দানের কথা বলা হয়েছে।

'আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে' কথাটির অর্থ এখানে— যারা আমার অবতারিত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়— এ বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালার জ্ঞান ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে পরবর্তী সময়ে হজরত মুসার শরিয়ত রহিত হবে। পরবর্তী আয়াতেও তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে শেষতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি। সেখানে রয়েছে বনী ইসরাইলদের প্রতি শেষ রসুলের অনুসরণের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৭

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ ۫ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟

❑ 'যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর রসুলের যাহার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যাহা তাহাদিগের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে নিষেধ করে, যে তাহাদিগের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদিগের ভার হইতে ও বন্ধন হইতে যাহা তাহাদিগের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

এখানে 'আল্লাজিনা ইয়াত্‌তাবিউ'না' (যারা অনুসরণ করে) হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'ইয়া' মুরুনা' (নির্দেশ দেয়) বিধেয়। অথবা উদ্দেশ্য এখানে অনুক্ত এবং আল্লাজিনা ইয়াত্‌তাবিউ'না বিধেয়। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তারা ওই সকল লোক যারা অনুসরণ করে।

'আর রসুলান্ নাবিইয়্যাল উম্মিইয়্যা' অর্থ— বার্তাবাহক অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার রসুল। উম্মী অর্থ মা। অর্থাৎ ওই শিশু যে জ্ঞানরূপ মায়ের (জ্ঞানের মূলের) সঙ্গে থাকে। জ্ঞানের দূরবর্তী বিবরণ— লিপিবিদ্যার সঙ্গে থাকে না।

রসুল স. বলেছেন, আমি আমার দলের মধ্যে উম্মী। আমি লিখতে ও হিসাব কষতে জানি না (কারণ লিপিবিদ্যা ও হিসাব বিদ্যাসহ সকল বিদ্যা, বিদ্বান আমারই মুখাপেক্ষী। আর আমি মুখাপেক্ষী কেবল আল্লাহ্‌র)। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। 'উম্মী' শব্দটির যথাব্যাখ্যা করা উচিত। রসুল স. জ্ঞান আহরণ করেছেন জ্ঞানের মূল কেন্দ্র থেকে (আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাতুল এলেম থেকে)। অক্ষর পরিচিতির মাধ্যমে নয়। কারণ সকল মাধ্যম তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি মুখাপেক্ষী কেবল আল্লাহ্‌র। সুতরাং তাঁর উম্মী হওয়া একটি অতুলনীয় মোজেজা। আর এটাকে মোজেজা বলে সনাক্ত করতে পারেন কেবল তাঁরাই— যাঁরা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানী।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'উম্মী' শব্দটির আসল সম্পর্ক উম্মতের সঙ্গে। উম্মত অর্থ উম্মতওয়ালা— বিপুল সংখ্যক উম্মতের অধিকারী। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন দেখা যাবে আমার অনুসারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বেহেশতের কড়া প্রথম আন্দোলিত করবো আমিই। মুসলিম।

'উম্মী' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ছিলো 'উম্মাতী'। উচ্চারণ-সংক্ষেপের কারণে 'তা' অক্ষরটি হয়েছে অবলুপ্ত। যেমন 'মাক্কী' ও 'মাদানী'র আসল শব্দরূপ হচ্ছে— মাক্কাতী এবং মাদীনাতী। কেউ কেউ বলেছেন, উম্মী শব্দটি 'উম্মুল ক্বোরা' (মক্কাবাসী) কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ওই সকল ইহুদী যারা ছিলো রসুল স. এর সমসাময়িক। রসুল স. এর জামানা যারা পায়নি— অর্থাৎ যারা তাঁর মহাআবির্ভাবের আগেই পরলোকগমন করেছে, তারা কিন্তু এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল নয়। অন্যত্র তাই এরশাদ হয়েছে— 'মা তাফার্‌রাক্বাল্লাজিনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিমবা'দি মা জাআত্‌ হুমুল বাইয়্যেনাহ্‌'(যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেই শুধু তারা মতবিরোধ করেছে)।

হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন কিয়ামতের সময় প্রত্যেক নবী নূরের মিম্বরে বসবেন। আমি উপবেশন করবো সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল মিম্বরে। জনৈক ঘোষণাকারী আহ্বান করবে— নবী উম্মী কোথায়? নবীগণ সমস্বরে বলবেন, আমরা তো প্রত্যেকেই নবী উম্মী (উম্মতের অধিকারী)। তখন ঘোষণাকারী বলবে, নবী উম্মী আরবী কোথায়? তখন আমি মিম্বার থেকে নেমে আসবো এবং বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বো। ভিতর থেকে আওয়াজ আসবে, কে? আমি বলবো, আমি মোহাম্মদ, আহমদ। পুনরায় আওয়াজ আসবে, আপনি কি আমন্ত্রিত? আমি বলবো, হ্যাঁ। খুলে দেয়া হবে

বেহেশতের তোরণ। আমার আল্লাহ্ তখন অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় রূপে জ্যোতিষ্মান হবেন। তাঁর ওই অবিভাজ্য সৌন্দর্যচ্ছটা অবলোকন করে আমি পড়ে যাবো সেজদায় এবং এমন গুণগান তাঁর গাইবো— যা আর কেউ কখনো করেনি। নির্দেশ হবে, মস্তক উত্তোলন করো। কথা বলো। সুপারিশ করো। তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। —এই হাদিসটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উম্মী শব্দটির আসল অর্থ উম্মাতী (উম্মতধারী)। তাই কিয়ামতের ওই সময় সকল নবী নিজেদেরকে উম্মী বলে পরিচয় দিবেন এবং রসুল স.কেও সে অর্থেই সেদিন বলা হবে নবী উম্মী আরবী। অর্থাৎ ওই উম্মতওয়ালা নবী— যিনি আরবের অধিবাসী। সকল নবী উম্মতওয়ালা হলেও উম্মতের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় রসুল স.কে বিশেষভাবে সেদিন বলা হবে উম্মী (সর্বাধিক উম্মতওয়ালা)।

এরপর বলা হয়েছে—'যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।' এ কথার অর্থ— ইহুদীরা তওরাত খুললেই দেখতে পায়, সেখানে রয়েছে শেষ রসুল স. এর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ।

হজরত আনাসের বর্ণনায় রয়েছে, এক ইহুদীর ছেলে ছিলো রসুল স. এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক। একবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। রসুল স. তাকে দেখতে গেলেন। দেখলেন তার পিতা ছেলেটির শিয়রে বসে তওরাত পাঠ করছে। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র কসম দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, সত্যি করে বলো, তওরাতে আমার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ রয়েছে কি না? ইহুদী বললো, না। ইহুদী পুত্র বললো, মিথ্যা কথা। তওরাতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে আপনার কথা। আমি নিজে সে সকল বিবরণ পাঠ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং নিঃসন্দেহে আপনিই সেই রসুল। রসুল স. তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, ওই অবিশ্বাসীকে তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতার শয্যাপার্শ্ব থেকে সরিয়ে দাও। দায়িত্ব গ্রহণ করো তার শুশ্রূষার।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এক ইহুদীর কাছ থেকে ঋণ হিসেবে কিছু অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। সে হঠাৎ একদিন তার ঋণ পরিশোধের দাবী জানালো। রসুল স. বললেন, এ মুহূর্তে তো আমি অপারগ। ইহুদী বলল না, আমি অতশত বুঝি না। প্রাপ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। রসুল স. বললেন, তাই হবে। তিনি স. সেখান থেকে আর নড়লেন না। ওখানে আদায় করলেন জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর। সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে ইহুদীকে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু তার মন গললো না। রসুল স. নির্বিকার। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এক ইহুদী আপনাকে আটকে রেখেছে— এটা আমাদের পক্ষে অসহনীয়। রসুল স. বললেন, আমাকে আমার প্রভুপ্রতিপালক কারো অধিকার খর্ব করতে নিষেধ করেছেন, সে অধিকার চুক্তিভূত হোক অথবা

হোক চুক্তিবহির্ভূত। বেলা বাড়তে শুরু করলো। দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে অকস্মাৎ পাওনাদার ইহুদী বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি— আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি— নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কেবল পরীক্ষা করার নিমিত্তেই আমি আপনার সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছি। কারণ আমি তওরাত কিতাবে আপনার সম্পর্কে যে বিবরণ পাঠ করেছি তা এ রকম— শেষ রসুলের নাম হবেন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন মক্কায়। হিজরত করবেন মদীনায়। সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তাঁর প্রশাসন। তিনি কর্কশ স্বভাবের নন। বাজারের মধ্যেও তিনি কাউকে চিৎকার করে ডাকবেন না। কখনো উচ্চারণ করবেন না অশ্লীল বচন। বায়হাকী।

আতা বিন ইয়াছার বলেছেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আসের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাকে রসুল স. এর ওই সকল গুণাবলীর কথা বলুন, যেগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! কোরআন মজীদেই রসুল স. এর সকল গুণাবলী আলোচিত হয়েছে। ওই আলোচনার কিছু অংশ লিপিবদ্ধ রয়েছে তওরাতে। তওরাতে বলা হয়েছে— হে নবী! আমি তোমাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণায়ক, পুণ্যের ও জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা, পাপ ও দোজখ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (আরবদের) রক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা আমি তোমার নাম রেখেছি মোতাওয়াক্কিল। তাই তুমি কখনো বদমেজাজী হবে না, বাজারে শোরগোল করবে না, অশুভ দ্বারা অশুভকে প্রতিহত করবে না এবং ক্ষমা ও উদারতাই হবে তোমার সাফল্যের উপকরণ। বিপথগামীরা পূর্ণরূপে সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ স্বীকার না করা পর্যন্ত) আমি তোমার প্রাণ হরণ করবো না। তোমার মাধ্যমে আমি অন্ধকে দান করবো দৃষ্টি এবং বধিরকে দান করবো শ্রুতি। আর উন্মুক্ত করে দিবো বদ্ধ হৃদয়গুলোকে। বোখারী। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালেম থেকে দারেমীও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, তওরাতে সংকলিত রয়েছে— মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ হবে আমার নির্বাচিত দাস। সে উষ্ণ স্বভাব সম্পন্ন নয়। বাজারে শোরগোলকারী নয়, মন্দের মাধ্যমে মন্দের প্রতিকারকারী নয়। বরং ক্ষমা পরবশ। তাঁর জন্মস্থান মক্কা, হিজরতের স্থান মদীনা। তার রাজত্বের বিস্তৃতি সিরিয়া পর্যন্ত। আল্লাহ্র প্রশংসা করা হবে তাঁর উম্মতের অধিকাংশের স্বভাব, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় তারা হবে আল্লাহ্র প্রশংসামুখর। নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তারা উচ্চারণ করবে আল্লাহ্র প্রশংসাধ্বনি। আর উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় বলবে তকবির। সূর্যের গতিবিধির প্রতি তারা হবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিধারী। নামাজের সময় এলে নামাজ পড়বে। ওজুর সময় ধৌত করবে হাত, পা ও

মুখমণ্ডল। তাদের মোয়াজ্জিনেরা আজান দিবে উন্মুক্ত আকাশের নিচে। সমর প্রান্তরে ও নামাজে তারা হবে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ। মধুমক্ষিকাদের গুঞ্জনের মতো হবে তাদের রাতের নামাজের আওয়াজ। 'মাআলিমুত্তানযিল' গ্রন্থে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন বাগবী। মাসাবীহ্ গ্রন্থেও হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে। দারেমী হাদিসটি উল্লেখ করেছেন কিছুটা পরিবর্তিত রূপে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, তওরাতে স্পষ্টাক্ষরে রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে এ কথাও লেখা রয়েছে যে, হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে তাঁর রওজা শরীফের পাশে দাফন করা হবে। তিরমিজি ও আবু দাউদ বলেছেন, সে কারণেই রসুল স. এর সমাধির পাশে হজরত ঈসার সমাধির জন্য জায়গা রেখে দেয়া হয়েছে।

'ইয়া'মুরুহুম বিল মা'রুফ' অর্থ— যে তাদেরকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয়। 'ওয়া ইয়ানহাহুম আ'নিলমুনকার' অর্থ— এবং অসৎকার্য নিষেধ করে। অর্থাৎ— ওই উম্মী নবী মানুষকে আল্লাহ্তায়ালার বিধানানুসারে শরিয়তের ফরজ নির্দেশসমূহ পালন করতে বলে, উৎসাহ দান করে মোস্তাহাব আমলগুলো পালন করতেও। আর নিষেধ করে হারাম কাজ করতে। মকরুহ্ কাজ করতেও করে নিরুৎসাহিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে' এ কথার অর্থ— অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ কতিপয় বৈধ বস্তুও হারাম করে দেয়া হয়েছিলো ইহুদীদের জন্য। আল্লাহতায়ালার প্রিয়তম উম্মী রসুল সেগুলোকে হালাল করে দেন। মূর্খতার যুগের লোকেরা স্বেচ্ছায় কতিপয় বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলো। যেমন বাহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হাম ইত্যাদি। সেগুলোকেও হালাল করে দেন উম্মী রসুল। আর এই রসুল অপবিত্র বস্তুগুলোকে করে দেন অবৈধ (হারাম)। যেমন— রক্ত, মদ, শূকর, মড়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের ভার থেকে ও বন্ধন থেকে যা তাদের উপর ছিলো।' হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক, সুদ্দী ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে ইস্রা (ভার) কথাটির উদ্দেশ্য ওই অঙ্গীকার যাতে বনী ইসরাইলদেরকে তওরাতের পূর্ণ অনুসরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। হজরত কাতাদা বলেছেন, এখানে 'ভার' অর্থ ওই কঠোরতা যা বনী ইসরাইলেরা নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ করেছিলো। 'ওয়াল আগলালা' অর্থ— বন্ধন। হজরত মুসার শরিয়তের বিধান ছিলো— পাপ থেকে তওবা করলে তওবাকারীরা একে অপরকে হত্যা করে ফেলবে (এটাই তওবা কবুলের শর্ত), কোনো কোনো অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করবে, পরিধেয় বস্ত্রে অপবিত্রতা লেগে গেলে অপবিত্র

অংশ কেটে বাদ দিতে হবে, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত সকল হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) হবে বাধ্যতামূলক, রক্ত প্রবাহ করতে হবে নিষিদ্ধ, শনিবার দিন কোনো পার্থিব কাজ করা যাবে না, উপাসনালয় ছাড়া অন্য কোথাও উপাসনা করা যাবে না ইত্যাদি। এ সকল কঠিন নির্দেশই ছিলা ইহুদীদের জন্য বন্ধন বা শৃংখলতুল্য। এ সকল ভার বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন সেই উম্মী রসুল।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।' এখানে 'আ'য্যারুহু' অর্থ— তাঁকে সম্মান করে। 'নাসারূহু' অর্থ— তাঁকে সাহায্য করে। অর্থাৎ— যারা এই উম্মী রসুলের দুশমনদেরকে পর্যুদস্ত করে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে ও তাঁকে সাহায্য করে ধন্য হয়।

'ওয়াত্তাবায়ু'না নুরাল্লাজী উনযিলা মায়া'হু' কথাটির অর্থ— এবং যে আলো তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে। এখানে নূর (আলো) অর্থ, কোরআন মজীদ। তাঁর সাথে, অর্থ তাঁর নবুয়তের সাথে। নূর নিজে উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য। অন্যকেও উজ্জ্বল করে এবং প্রকাশ করে দেয়। কোরআন মজীদও তেমনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকাশ্য কালাম ও মোজেজা— যা মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও আচরণকে করে তোলে উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য। এদিক থেকে নূরও কোরআন সমার্থক বলে কোরআনকে এখানে নূর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে 'মায়া'হু' (তাঁর সাথে) শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'ইত্তাবায়ু' (অনুসরণ করে) কথাটির সঙ্গে। 'উনযিলা' (অবতীর্ণ হয়েছে) শব্দটির সঙ্গে নয়। এমতাবস্থায় বাক্যটির মমার্থ দাঁড়াবে এ রকম— অনুসরণ করে আলোর (কোরআনের) ঐবং এই নবীর সাথে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেই আলোর। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ— দু'টোই অনুসরণীয়।

আলমুফলিহুন অর্থ সফলকাম— চিরস্থায়ী সফলতার অধিকারী। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে আল্লাহ্‌র রহমতে নিমজ্জিত ব্যক্তি।

উল্লেখ্য যে, এখানেই শেষ হয়েছে হজরত মুসার প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ্‌তায়ালার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। পুনরায় আমরা শুরু করছি হজরত মুসা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রসঙ্গ।

নাওফবুকায়ী হামেরি বর্ণনা করেছেন, হজরত মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তরজন ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে জানালেন হে নবী মুসা! তোমার সাথীদেরকে জানিয়ে দাও, এখন থেকে তোমরা সকলে নামাজের সময়

হলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। কেবল নামাজ পড়তে পারবে না শৌচাগারে, স্নানাগারে ও কবরস্থানে। আমি তোমাদের অন্তরে দান করবো বিশ্বাসী পরিতৃপ্তি। তোমরা সকলে তওরাত স্মৃতিবদ্ধ করতে পারবে। তওরাত মুখস্থ বলতে পারবে পুরুষ, নারী, স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট বড়— সকলে। হজরত মুসা এ কথা প্রচার করলেন। লোকেরা শুনে বললো, আমরা আমাদের নির্ধারিত মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়বো না। স্মৃতিবদ্ধ করার মতো তওরাতের প্রতি আমরা অতো গভীর মনোযোগও দিতে পারবো না। আমরা দেখে দেখেই তওরাত পড়তে চাই। তাদের ওই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ফাসাআকতুবুহা লিল্লাজীনা ইয়াত্তাক্বুনা......ইয়ু'মিনুন' (যারা আল্লাহ্ভীরু অচিরেই তাদের জন্য তা লিখে রাখবো.....বিশ্বাসবান)।

উপরে বর্ণিত নেয়ামতসমূহ বনী ইসরাইলেরা গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। আল্লাহ্ প্রদত্ত ওই নেয়ামতগুলো সাদরে গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর উম্মতবৃন্দ। তাই হজরত মুসা বলেছিলেন হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে ওই উম্মতের পয়গম্বর বানিয়ে দিন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছিলেন, তাদের নবী তো হবে তাদের মধ্য থেকেই (যেমন তুমি নবী হয়েছো তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে)। হজরত মুসা বললেন, তবে আমাকে ওই নবীর উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, তার আগেই সাঙ্গ হবে তোমার পৃথিবীর জীবন। হজরত মুসা বললেন, হে আমার পরম প্রভু! আমি বনী ইসরাইলদের একটি শাখা নিয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হলাম। অথচ এরা তোমার প্রদত্ত অনুগ্রহ হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। আর তুমিও তা দান করলে অন্য দলকে। আল্লাহ্তায়ালা এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন— 'ওয়া মিন ক্বওমি মূসা উম্মাতুঁই ইয়াহ্দুনা বিল হাক্কি ওয়াবিহি ইয়া'দিলুন' (মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে (আয়াত ১৫৯)। হজরত মুসা তখন আল্লাহ্তায়ালার এ রকম বাণী শুনে প্রসন্ন হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, নাওফবুকায়ীর এই বিবরণটি আলোচ্য আয়াতের প্রকাশ্য শব্দ ও বিবরণের পরিপন্থী। কারণ আলোচ্য আয়াতটি কেবল আহলে কিতাবদের ইমানদার লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কোনো ধর্ম থেকে ইসলামে আগমনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (কারণ এখানে বলা হয়েছে 'যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জিল যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়')।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা এবং ইবনে জারিহ্ বলেছেন, যখন 'ওয়া রহমাতি ওয়াসিয়াত কুল্লা শাইয়্যিন' (আর আমার দয়া— তাতো সকল কিছুতে ব্যাপ্ত— আয়াত ১৫৬) —এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ইবলিস বললো, আমিও তাহলে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবো না। কারণ

আমিও 'কুল্লা শাইয়্যিন' (সকল কিছুতে) এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর অবতীর্ণ হলো— সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করবো যারা সাবধান হয়, জাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে (আয়াত ১৫৬)। এই আয়াত শুনে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বললো, আমরাও তাকওয়া (সাবধানতা) অবলম্বন করি, জাকাত প্রদান করি এবং আল্লাহ্র প্রতি আমাদের বিশ্বাসও রয়েছে। সুতরাং আমরাও বঞ্চিত হবো না আল্লাহ্র রহমত থেকে। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রহমতকে কেবল এই উম্মতের জন্য সুনির্ধারিত করে দিলেন এভাবে— যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী রসুলের....... শেষ পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন হজরত মুসার প্রার্থনার জবাব হিসেবে। সেই জবাবটিই কোরআনে উদ্ধৃত করে আল্লাহ্তায়ালা যেনো রসুল স.কে জানিয়ে দিচ্ছেন— হে আমার আখেরী রসুল! আমি মুসার প্রার্থনার জবাবে এই কথাগুলো বলেছিলাম। প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ্তায়ালাই অবহিত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৮

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى
يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

❒ বল, হে মানুষ! আমি তোমাদিগের সকলের জন্য রসূল আল্লাহের, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহের প্রতি ও তাঁহার নিরক্ষর বার্তাবাহক রসূলের প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তাঁহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও।

আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রসুল। —এ কথার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. সকল সৃষ্টির রসুল। নবীদের, ফেরেশতাদের, জ্বিনদের— সকলের। অন্যান্য নবী রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য। আর বিশ্ব মানবতা ও নিখিল সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছেন রসুলে পাক স.। তিনি স. এরশাদ করেছেন, অন্য নবীদের উপর আমাকে ছয়টি শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। ১. আমাকে জ্ঞানদান করা হয়েছে শব্দাবলীর গভীর রহস্য সম্পর্কে। তাই আমার সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম গভীর ও

বিস্তৃত। ২. আমাকে দেয়া হয়েছে মহাপ্রতাপসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব, তাই দূরের শত্রুরাও আমার কথা শুনে ভয় পায়। ৩. আমার জন্য হালাল করা হয়েছে গণিমতের মাল। ৪. সমস্ত পৃথিবীর মৃত্তিকাকে ইবাদতের স্থান বানানো হয়েছে আমার জন্য। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে এবং ৬. নবুয়তের প্রবহমানতাকে সমাপ্ত করা হয়েছে আমার মাধ্যমেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম ও তিরমিজি।

হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পাঁচটি কারণে আমি অন্য নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১. আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের জন্য। ২. আমার উম্মতকে দেয়া হয়েছে শাফায়াতের অধিকার। ৩. এমন পরাক্রমশীল ব্যক্তিত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, যাতে করে এক মাসের দূরত্বে অবস্থারনত শত্রুরাও আমার কথা শুনে ভীত হয়। ৪. সকল স্থানের মাটি আমারই জন্য করা হয়েছে নামাজ পাঠের উপযোগী। ৫. আগের কোনো নবীর জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিলো না, কিন্তু আমার জন্য গণিমত বৈধ।

হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রপরম্পরায় বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, অন্য নবীদের উপর চারটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে আমাকে। এই বর্ণনাটির মধ্যে শাফায়াতের উল্লেখ নেই।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হলেও সম্বোধনটি প্রত্যক্ষভাবে প্রযোজ্য মদীনার ইহুদী ও কতিপয় খৃষ্টানদের উপরে। যেহেতু তাদের কিতাবে রসুল স. প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। সুতরাং অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ন্যূনতম সুযোগও তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাজি লাহু মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি' (যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী)। উল্লেখ্য যে, এই সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্তায়ালার একটি অতুলনীয় সিফাত বা গুণ। এভাবে আয়াতের মর্ম দাঁড়িয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ্। রসুল আমি। আর আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সকলের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে—'তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর বার্তাবাহক রসুলের প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোম্বরা তার অনুসরণ করো যাতে তোমরা পথ পাও।' এখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে অক্ষরের অমুখাপেক্ষী ওই পয়গম্বরের অনুসরণের, যিনি জীবন ও মৃত্যু প্রদাতা আল্লাহ্তায়ালার বার্তাবাহক রসুল— যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ্কে এবং আল্লাহ্তায়ালার পূর্বাপর সকল প্রত্যাদেশকে। এ রকম যারা করবে তারাই পাবে

হেদায়েত। এখানে হেদায়েতপ্রাপ্তির দু'টি শর্তকে স্পষ্টাক্ষরে বলে দেয়া হয়েছে। সে দু'টি শর্ত হচ্ছে— বিশ্বাস ও আনুগত্য। সুতরাং যে রসুল স.কে রসুল বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরিয়তের উপর আমল করে না, সে পূর্ণ হেদায়েতপ্রাপ্ত নয়। বিশ্বাসের দিক দিয়ে পথপ্রাপ্ত বলে গণ্য হলেও আমলের দিক দিয়ে সে পথভ্রষ্ট।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৫৯

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

❒ মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে।

এখানে 'ওয়ামিন ক্বওমি মুসা' অর্থ— মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে। উম্মাতুন অর্থ এমন দল। ইয়াহ্দুনা বিল হাক্বি অর্থ— যারা ছিলো সত্য, সত্যের অনুসারী। অর্থাৎ যারা ছিলো সত্যাধিষ্ঠিত এবং সেই সত্যের প্রতি অন্যকে আহ্বানকারী। ওয়াবিহী ইয়াদিলুন অর্থ— এবং যারা ছিলো ন্যায় বিচারকারী। অর্থাৎ তারা পারস্পরিক সমস্যা সমাধান করতো ন্যায় বিচারের মাধ্যমে।

জুহাক, কালাবী এবং রবী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দলটি বসবাস করে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে— চীন দেশের চেয়েও দূরে এক নদীর উপকূলে। নদীটির নাম দরিয়ায়ে আওরাখ। তারা কেউ বিত্তশালী নয়। বনী ইসরাইলদের অন্য কোনো দলের সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার সংস্রব নেই। সেখানে রাতে বৃষ্টি হয়। দিনের আকাশ থাকে নির্মেঘ। তারা জীবিকা নির্বাহ করে চাষাবাদের মাধ্যমে। অন্য কোনো মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে না। তারা সকলেই সত্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্ণিত হয়েছে, মেরাজের রজনীতে হজরত জিবরাইল রসুলপাক স.কে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। হজরত জিবরাইল জিজ্ঞেস করলেন, আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, তোমরা কি তাঁকে চিনতে পেরেছো? তারা বললো, না। হজরত জিবরাইল বললেন, ইনিই উম্মী নবী মোহাম্মদ। এ কথা শুনে তারা সকলেই রসুল স. এর উপর ইমান আনলো এবং নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! হজরত মুসা আমাদেরকে অসিয়ত করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সেই উম্মী নবীর সাক্ষাত পাও, তবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। হে মহাসম্মানিত রসুল! আপনি হজরত মুসার সালাম গ্রহণ করুন। রসুল স. সালাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জবাবও দিলেন। তারপর তাদেরকে শিক্ষা দিলেন মক্কায় অবতীর্ণ দশটি সুরা। নির্দেশ দিলেন, তোমরা নামাজ পাঠ কোরো এবং জাকাত দিয়ো। আরো বললেন, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কোরো। আর সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিন হিসেবে শনিবারের পরিবর্তে এখন থেকে নির্ধারণ কোরো শুক্রবারকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের সত্যপন্থী দল বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদীদেরকে, যারা রসুল স. এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলো এবং মুসলমান হয়েছিলো।

বাগবী বলেছেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিকতর শুদ্ধ। আমি বলি, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি গরীব (দুর্লভ)। আর বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তরেও উপনীত হয়নি। কেননা মেরাজের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো রসুল স. এর হিজরতের পূর্বে— মক্কায়। ওই সময় জুমার নামাজ পাঠের নির্দেশ অবতীর্ণই হয়নি। আর তখন পর্যন্ত এমন দশটি সুরাও অবতীর্ণ হয়নি, যেগুলোর মধ্যে বিবৃত ছিলো ইসলামের সামগ্রিক বিধিবিধান। অতএব উল্লেখিত বনী ইসরাইলদের সত্যাধিষ্ঠিত দলটি ওই দল যারা হজরত মুসার সময় দৃঢ়ভাবে তাঁর অনুসরণ করেছে এবং ওই দল, যারা রসুল স. এর নিকট থেকে সরাসরি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে। যেমন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং তাঁর মতো অন্যান্য সাহাবী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬০, ১৬১, ১৬২

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ قِيْلَ
لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا
كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

❐ তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর'; ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবন উৎসারিত হইল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল, এবং

মেঘ দ্বারা তাহাদিগের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাদিগের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম 'ভাল যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা আহার কর।' তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজদিগের প্রতিই জুলুম করিতেছিল।

❒ স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করিব।"

❒ কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সীমালংঘনকারী ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদিগের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

হজরত ইয়াকুবের একটি নাম ছিলো ইসরাইল। দ্বাদশ পুত্রের জনক ছিলেন তিনি। ওই দ্বাদশ পুত্রের বংশধারাই পরবর্তী সময়ে পরিণত হয়েছে বনী ইসরাইলের (হজরত ইয়াকুবের বংশের) বারোটি গোত্রে। আল্লাহ্পাকই এভাবে তাদের বারোটি গোত্রকে পরিচিতি দান করেছেন। তাই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে— তাদেরকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করেছি। এ রকম বলেছেন জুজায।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুসার সম্প্রদায় যখন তাঁর নিকট পানি প্রার্থনা করলো, তখন তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত করো; ফলে তা থেকে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিলো।' ঘটনাটি এ রকম— তখন উন্মুক্ত তীহ্ প্রান্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো বনী ইসরাইলদেরকে। রসুল মুসাও ছিলেন ওই তীহ্ প্রান্তরেই। পিপাসিত বনী ইসরাইল জনতা তখন পানি প্রার্থনা করলো হজরত মুসার নিকট। হজরত মুসা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানালেন। আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যাদেশ করলেন, যে অলৌকিক পাথরটি তোমার সঙ্গে রয়েছে, সেই পাথরটিতে তোমার লাঠির দ্বারা আঘাত করো। হজরত মুসা নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের বারোটি কোণ থেকে প্রবল বেগে উৎসারিত হলো বারোটি ঝর্ণা। তখন প্রতিটি গোত্র তাদের নিজ নিজ ঝর্ণা চিনে নিলো। আর ওই ঝর্ণার পানি দ্বারা মেটালো তাদের পিপাসা।

লক্ষ্যণীয় যে, এখানে হজরত মুসা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন— এ কথাটির উল্লেখ নেই। উল্লেখ না থাকার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, হজরত মুসা ছিলেন আল্লাহ্র রসুল। তিনি তো আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করবেনই। তাই 'তিনি লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করলেন'— এ রকম উল্লেখকে এখানে

নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। এ কথাটিও এখানে প্রতীয়মান হয়েছে যে, হজরত মুসা স্বেচ্ছায় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করেননি। করেছিলেন প্রত্যাদেশানুযায়ী।

এখানে 'আমবাজাস্' শব্দটির অর্থ— উৎসারিত হওয়া বা ফেটে বের হওয়া। কিন্তু আবু আমর বলেছেন, শব্দটির অর্থ ফিনকি দিয়ে ফুটে বের হওয়া। অর্থাৎ প্রচণ্ড বেগে নির্গত হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম, তাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ভালো যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা আহার করো। তারা আমার প্রতি কোনো জুলুম করেনি, কিন্তু তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিলো।

পরের আয়াতে (১৬১) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তাদেরকে বলা হয়েছিলো, এই জনপদে বাস করো ও যেথা ইচ্ছা আহার করো এবং বলো 'ক্ষমা চাই' এবং নতশিরে প্রবেশ করো; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো। আমি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো।'

এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সুরা বাকারায় করা হয়েছে। সেখানকার এ সম্পর্কিত আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, সেখানে বলা হয়েছে 'ফাকুলু' (অতঃপর আহার করো)। আর এখানে বলা হয়েছে, কেবল 'কুলু' (আহার করো)। 'ফা' কথাটির উল্লেখ সেখানে এ কারণেই করা হয়েছিলো যে আহার করাটাই ছিলো ওই জনপদে অবস্থানের কারণ। অর্থাৎ নির্দেশটি ছিলো এ রকম— ওই জনপদে গিয়ে বসবাস করবে অতঃপর ওই জনপদেই আহার করবে। আর আলোচ্য আয়াতের বিবরণ ভঙ্গিটিই উপরোক্ত বক্তব্যকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাই এখানে 'ফা' কথাটির উল্লেখ আর করা হয়নি। এ রকম বলেছেন বায়যাবী।

আমি বলি, সুরা বাকারায় ওই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিলো— 'উদ্খুলু হাজিহিল কুর্ইয়াতি ফাকুলু'(ওই জনপদে প্রবেশ করো তারপর আহার করো)। উল্লেখ্য যে, ওই জনপদে আহার করতে গেলে প্রথমে সেখানে প্রবেশ করতে হবে। তাই সেখানে পরিণাম প্রকাশকরূপে 'ফা' শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে— 'উস্কুনু হাজিহিল কুর্ইয়াহ্' (ওই জনপদে বাস করো)। তাই এখানে 'কুলু' শব্দটির পূর্বে পরিণাম প্রকাশক 'ফা' সংযোজন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ যে যেখানে অবস্থান করে, সে সেখানেই সম্পন্ন করে তার পানাহার। অর্থাৎ আহার ও বসবাসের মধ্যে কোনো অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তাই বসবাস এবং আহারের মধ্যে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ওয়াও' (ও) সংযোজক অব্যয়টি। সে কারণে এখানকার বক্তব্যটির উদ্দেশ্যের মধ্যে নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় নয়।

দু'টি বাক্য উল্লেখিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। শেষ বাক্যটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে পৃথকভাবে। বলা হয়েছে—'আমি সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো।' বক্তব্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার দান বা সওয়াব আল্লাহ্তায়ালারই একান্ত অনুগ্রহ। সে অনুগ্রহ কোনো আমলের বিনিময় নয়। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ প্রতিপালন করা না করার উপরে সেই বিশেষ অনুগ্রহের কোনো সম্পর্ক নেই।

পরের আয়াতে (১৬২) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী ছিলো তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো। সুতরাং আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালংঘন করেছিলো।'

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

❒ তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদিগের নিকট আসিত; কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদ্‌যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদিগের নিকট আসিত না; এই ভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম যেহেতু তাহারা সত্যত্যাগ করিত।

❒ স্মরণ কর, তাহাদের এক দল বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন?' তাহারা বলিয়াছিল 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ-মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এই জন্য।'

❒ যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন উহা বিস্মৃত হয় তখন তাহারা অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা সীমালংঘন করে তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিই।

❒ তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্যেও বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম 'ঘৃণিত বানর হও!'

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ে বিবৃত হয়েছে বনী ইসরাইলদের একটি চরম অবাধ্যতার ঘটনা। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ লংঘন করেছিলো তারা। সে কারণে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তিও দিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের ওই ঘটনাটি ইহুদীরা ভালো করেই জানতো। কিন্তু রসুল স. এর ওই ঘটনা জানার কোনো উপায় ছিলো না। প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই তাঁকে জানানো হয়েছে সেই ঘটনা। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর একটি অনন্য মোজেজা। একই সঙ্গে তাঁর মোজেজা প্রকাশ করে ও ইহুদীদেরকে সত্যের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের বিবরণ।

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতটির মর্মার্থ এই— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করুন সমুদ্রতীরবর্তী ওই জনপদবাসীদের সম্বন্ধে, যারা সাপ্তাহিক বিশেষ ইবাদতের দিনের অবমাননা করতো। আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শনিবার সকল পার্থিব কর্ম থেকে বিরত থেকে কেবল আল্লাহ্পাকের ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে হবে। কিন্তু এই নির্দেশ লংঘন করেছিলো তারা। লোভ ছিলো তাদের সীমাহীন। তাদের অন্তরে সত্যবিশ্বাসের লেশ মাত্র ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা সেকথা অবশ্যই জানতেন। তবে তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি পরীক্ষার। সে পরীক্ষাও আল্লাহ্তায়ালা করেছিলেন। পরীক্ষাটি ছিলো এই— তারা যে শনিবারে বিশেষভাবে ইবাদত করতো, সেই শনিবারে সাগরে জোয়ারে ভেসে আসতো অসংখ্য মাছ। আর যে শনিবারে ইবাদত করতো না, সেই শনিবারে জোয়ারের পানিতে কোনো মাছই আসতো না।

এখানে জনপদটির নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বলা হয়েছে— সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই জনপদটির নাম আয়লাহ্। জনপদটি ছিলো মাছায়েন এবং তুর পর্বতের মধ্যবর্তী একটি সমুদ্রোপকূলে। আজহারী বলেছেন, ওই অবাধ্য জনগোষ্ঠির বসবাস ছিলো সিরিয়ার যিলতাবরীয়াহ নামক সমুদ্রোপকূলে।

আয়াতে উল্লেখিত 'শুর্‌রাআ'ন' শব্দটি 'শারিই' শব্দের বহুবচন। কথাটির উদ্দেশ্য— পানির উপরে ভেসে ভেসে আসতো। জুহাক বলেছেন, কথাটির অর্থ— ঝাঁকে ঝাঁকে, ধারাবাহিকভাবে। বর্ণিত হয়েছে, শাদা দুম্বা অথবা ভেড়ার পালের মতো অসংখ্য মাছ ভেসে আসতো শনিবারের জোয়ারে। বলা বাহুল্য, মৎসজীবী ওই ইহুদী জনগোষ্ঠির জন্য এটা ছিলো ইমানের একটি পরীক্ষা। প্রবৃত্তির নির্দেশ না আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ— কোনটি তাদের কাছে বড়ো, এটাই ছিলো সে পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

এক বর্ণনায় এসেছে, শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিলো, আল্লাহ্ তো শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করেননি। নিষেধ করেছেন খেতে। তোমরা তাঁর নির্দেশের অর্থই বুঝতে পারোনি। আর ভুল বুঝবার কারণেই দ্যাখো, এতগুলো মাছ তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কুমন্ত্রণাটি প্রবৃত্তির অনুকূলে বলে খুবই পছন্দ হলো ইহুদীদের। তারা শনিবার দিন মাছ ধরতে শুরু করলো। কিন্তু পুরোপুরি দ্বিধামুক্ত হতে পারছিলো না তারা। তাই শয়তান পুনর্বার তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো, সরাসরি এ রকম নির্দেশ লংঘন না করাই ভালো। বরং সমুদ্রতীরে বড় বড় গর্ত খনন করা হোক। জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা মাছ ভাটার সময় সেগুলোতে আটকা পড়বে। পরদিন রবিবার সেগুলো ধরে নেয়া যাবে সহজেই। শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়েছে। আটকে রাখতে তো আর নিষেধ হয়নি। আর মাছ তো শনিবারে ধরাই হচ্ছে না। ধরা হচ্ছে রবিবারে। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশও পালন হবে। আর আমাদের কার্যসিদ্ধিও ঘটবে। এই সিদ্ধান্তটি খুবই মনঃপুত হলো তাদের। নির্দ্বিধায় তারা কার্যকর করলো সিদ্ধান্তটি। বেশ কিছুদিন ধরে এই নিয়মই জারী রাখলো তারা। ধীরে ধীরে হয়ে উঠলো আরো বেপরোয়া। বলতে শুরু করলো, শনিবারেই আমরা মাছ আটকে রাখি। সুতরাং ধরতে আর দোষ কী? আটকে রাখা আর ধরা তো একই কথা। কিছু দিন পর বলতে শুরু করলো, শনিবারে মাছ ধরা আমাদের জন্য হালাল। নিষেধাজ্ঞা হয়তো ছিলো এক সময়। কিন্তু এখন নেই। এরপর থেকে শনিবার দিন মাছ ধরা, খাওয়া, বিক্রি করা— সবই চলতে লাগলো তাদের।

এ রকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো ওই জনপদের তিন ভাগের এক ভাগ লোক। বাকী এক ভাগ প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। সতর্ক করে দিলো অবাধ্যদেরকে। বললো, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ লংঘনের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। বাকী এক ভাগ রইলো নীরব। তারা নিজেরা মাছ ধরতো না। যারা ধরতো— তাদেরকে কোনো কিছু বলতোও না।

পরের আয়াতে (১৬৪) বলা হয়েছে 'স্মরণ করো, তাদের এক দল বলেছিলো, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কাঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো? তারা বলেছিলো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এই জন্য।'

মৎস শিকার থেকে বিরত দল দু'টোর কথোপকথন উদ্ধৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। 'মৌনাবলম্বনই শ্রেয়'—এ রকম ভাবতো যারা, তারা প্রতিবাদী দলটিকে বললো, অযথা তোমরা বাক্যব্যয় করছো কেনো? যে আল্লাহ্র নির্দেশ তারা লংঘন করেছে সেই আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে শাস্তি দিবেন— পৃথিবীতে এবং আখেরাতেও। এ কথার প্রেক্ষিতে প্রতিবাদীরা বলেছিলো, আল্লাহ্তায়ালার নিকট জবাবদিহির ভয়ে আমরা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। 'অন্যায় হতে দেখেও বাধা দাওনি কেনো? '— এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন যদি আমাদেরকে হতে হয়! আখেরাতে অন্যায়ের নীরব সমর্থক বলে যদি আমাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়— সেই ভয়ে আমরা সতর্ক করছি অবাধ্যদেরকে। আর আমরা এ আশাও করি যে, আমাদের সতর্কবাণী শুনে হয়তো তাদের বোধোদয় ঘটবে। অনুতাপজর্জরিত হৃদয় নিয়ে পুনরায় হয়তো তারা ফিরে আসবে সত্যের পথে।

এর পরের আয়াতে (১৬৫) বলা হয়েছে— 'যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন যারা অসৎকার্য থেকে নিবৃত্ত করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা সীমালংঘন করে তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করতো বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই।'

প্রতিবাদী দল ও অবাধ্য দলটির পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে এই আয়াতে। আল্লাহ্তায়ালা প্রতিবাদী দলটিকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর অবাধ্য দলটিকে দিয়েছিলেন কঠিন শাস্তি। কিন্তু মৌন দলটির পরিণতির কথা এখানে বলা হয়নি। বরং তাদের কোনো উল্লেখই এখানে নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস একবার এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, ওই পুণ্যবান নীরব দলটির কী হয়েছিলো তা আমি বলবো না। সেখানে উপস্থিত হজরত ইকরামা বললেন, হজরত! আপনার জন্য আমার জীবন কোরবান। আপনি কি ওই নীরব দলটি সম্পর্কে কিছুই বলবেন না? আমরা তবে রহস্যটি উদ্ধার করবো কী করে? অবাধ্যদেরকে যে আল্লাহ্তায়ালা উপযুক্ত প্রতিফল

দিবেন, সে বিশ্বাস তো তাদের ছিলোই। তাইতো তারা প্রতিবাদীদেরকে বলেছিলো, 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেনো?' অথচ এই আয়াতে তাদের উল্লেখমাত্র করা হলো না। তারা উদ্ধার পেয়েছিলো, না ধ্বংস হয়েছিলো— কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমরা। হজরত ইকরামা বলেছেন, আমার কথা শুনে খুবই খুশী হলেন হজরত ইবনে আব্বাস। আমাকে উপহার দিলেন দুই প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র। তারপর বললেন, নিঃসন্দেহে উদ্ধার পেয়েছিলো মৌন দলটি।

ইমরান বিন রুকুব বলেছেন, প্রতিবাদী ও মৌন দু'টো দলকেই মুক্ত রাখা হয়েছিলো শাস্তি থেকে। শাস্তি পেয়েছিলো কেবল অবাধ্যরা। হাসান এবং মুজাহিদও এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইবনে জায়েদ বলেছেন,অবাধ্য ও মৌনদল দু'টো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। পরিত্রাণ লাভ করেছিলো কেবল প্রতিবাদীরা।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর শেষটিতে (১৬৬) বলা হয়েছে— 'তারা যখন নিষিদ্ধ কার্যেও বাড়াবাড়ি করতে লাগলো তখন তাদেরকে বললাম 'ঘৃণিত বানর হও'। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, অবাধ্যদের সীমালংঘন পৌঁছলো চরমে। প্রতিবাদীদের সদুপদেশের প্রতি তারা কর্ণপাত মাত্র করলো না। তখন পাপিষ্ঠদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলো পুণ্যবানেরা। এভাবে জনপদের একাংশে পুণ্যবানদের এবং অপরাংশে পাপীদের বসবাস নির্ধারিত হলো। হজরত দাউদ ছিলেন তাদের নবী। তিনি পাপাচারীদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ঘোষিত হলো— ঘৃণিত বানর হও। তখন রাতে আপন আপন গৃহে বিশ্রামরত ছিলো তারা। হঠাৎ একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা আর মানুষ নয়— বানর। সকাল হলো। কিন্তু তারা কেউ ঘরের দরজা খুললো না। ওদিকে পুণ্যবানদের পাড়ায় যথারীতি আপন কাজে নিয়োজিত পুণ্যবানেরা এক সময় লক্ষ্য করলো, ওপাড়ার সকল ঘরের দরজা বন্ধ। কৌতূহলবশতঃ তারা এগিয়ে গেলো সেদিকে। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অবাধ্য আত্মীয়দেরকে নাম ধরে ডাকতে লাগলো তারা। তারপর অবাক হয়ে দেখলো, সকল ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে কেবল বানর। বানরগুলো তাদের পুণ্যবান আত্মীয়দের সকলকেই চিনতে পারলো। কোনো আওয়াজ করতে পারলো না। কাঁদতে লাগলো কেবল। আল্লাহ্তায়ালাই পাপিষ্ঠদেরকে বানরে পরিণত করেছেন, সে কথা আর বুঝতে বাকী রইলো না পুণ্যবানদের। তাঁরা তখন বললেন, আমরা কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেই নি? বানরেরা মাথা নেড়ে জবাব দিলো, হ্যাঁ। তিনদিন বেঁচে ছিলো তারা। অনেক লোক বানরগুলোকে দেখতে আসতো। মাত্র তিনদিন পর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো বানরগুলো।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❐ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাহাদিগের উপর শক্তিশালী করিতে থাকিবেনই যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়া ইজ তাআ'জ্জানা রব্বুকা' (তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন)। কথাটির প্রকৃত অর্থ— তোমার প্রতিপালক দৃঢ় সংকল্প করেছেন, অনড় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন অথবা এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে তাআ'জ্জানা শব্দটির অর্থ, বলেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হুকুম দিয়েছেন। আতা বলেছেন— নির্দেশ ঘোষণা করেছেন। এরপর আল্লাহ্তায়ালার ওই অনড় ঘোষণাটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত এ রকম লোককে তাদের উপর শক্তিশালী করতে থাকবেনই, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদেরকে শায়েস্তা করতে থাকবেন। কারণ তাদের মতো অবাধ্যতা আর কেউ করেনি। করবেও না। তাদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর আল্লাহ্তায়ালা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন হজরত সুলায়মানকে। তারপর বখ্তে নসরকে। বখতে নসর তাদের যুবকদের হত্যা করেছিলো। মহিলা ও শিশুদেরকে বানিয়েছিলো ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। অবশিষ্টদের উপর ধার্য করেছিলো কর। রসুল পাক স. এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিউপাসক বখ্তে নসরের বংশীয় রাজাদেরকে তারা ওই কর দিয়ে আসছিলো। রসুল স.কেও তারা বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছিলো। তারা ছিলো শঠ, প্রবঞ্চক, অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ। তাই রসুল স.ও তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ফলে বনী কুরায়জার পুরুষেরা হয়েছিলো নিহত। মহিলা ও শিশুরা হয়েছিলো বন্দী। আর বনী নাজির ও বনী কাইনুকাকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো মদীনা থেকে। এরপর হজরত ওমরের খেলাফতের সময় খয়বর ও ফেদাক থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো তাদেরকে। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশও এ রকম যে— ইহুদীদের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা অপমানকর কর প্রদানে সম্মত হয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি দানে সত্বর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও।' এ কথার অর্থ— কেবল আখেরাতে নয়, অবাধ্যতার শাস্তি তিনি দিয়ে থাকেন কখনো কখনো দুনিয়াতেও। যেমন শাস্তিদান করে চলেছেন ইহুদীদেরকে। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, তিনি কেবল শাস্তিদাতাই নন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। আর ওই ক্ষমা ও দয়া পেতে গেলে করতে হবে তওবা। আনতে হবে ইমান।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৮

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

❒ দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

'দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি'—এ কথাটি বলা হয়েছে শুরুতেই। কথাটির অর্থ— আমি বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিয়েছি বনী ইসরাইলদেরকে। তাই তারা আর কখনও সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হতে পারবে না।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ।' এখানে সৎকর্মপরায়ণ বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদীদেরকে যারা রসুল স. এর নিকট থেকে ইসলামের আহ্বান পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন সত্যকে। হয়ে গিয়েছিলেন মুসলমান।

আমি বলি, 'সলিহুন' (সৎকর্মপরায়ণ) বলে এখানে প্রকাশ্যতঃ তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা হজরত মুসার শরিয়ত রহিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর খাঁটি অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ হজরত ঈসার মহা আর্বিভাবের পূর্ব পর্যন্ত যারা হজরত মুসার শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

'ওয়া মিনহুম দুনা জালিকা' (এবং তাদের কতক অন্যরূপ)। —এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই ইহুদীদেরকে যারা রসুল স. কে পেয়েও তাঁর প্রতি ইমান আনেনি। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। অবশ্য কথাটির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ওই ইহুদীরা, যারা হজরত দাউদ, হজরত সুলায়মান এবং হজরত ঈসার নবুয়তকে অস্বীকার করতো।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' এ কথার অর্থ— আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি সুস্থতা, সম্পদ, পরাক্রম ইত্যাদি দ্বারা— যেনো তারা কৃতজ্ঞতার পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করে সত্যের দিকে। আবার পরীক্ষাস্বরূপ আমি কখনও তাদের উপর চাপিয়ে দেই অসুস্থতা, দারিদ্র ও পরাক্রমহীনতা— যেনো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পথ ধরে তারা ফিরে আসে চিরস্থায়ী সফলতার দিকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৬৯

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى
وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۗ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۗ وَالدَّارُ
الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়; তাহারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদিগের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদিগের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে, যাহারা সাবধান হয় তাহাদিগের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না?

'ফাখালাফা মিম বা'য়্দি হিম খালফুন' অর্থ অতঃপর অযোগ্য উত্তর পুরুষগণ একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে 'খালফুন' শব্দটির অর্থ— বংশানুক্রম বা বংশধারা। কামুস গ্রন্থে এ রকম বলা হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, খালফুন শব্দটি পড়তে হয় 'লাম' অক্ষরে সাকিন সহকারে। শব্দটির অর্থ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সে স্থলাভিষিক্ত আপন সন্তানও হতে পারে, অথবা অন্য কেউ।

ইবনে আরাবী বলেছেন, শব্দটিকে পড়তে হবে 'খালাফুন'— 'লাম' অক্ষরে যবর দিয়ে, তাহলে শব্দটির অর্থ হবে উত্তম স্থলাভিষিক্ত। আর লামের উপর সাকিন দিয়ে পড়লে অর্থ হবে অনুত্তম স্থলাভিষিক্ত।

নজর বিন শামায়েল বলেছেন, মন্দ স্থলাভিষিক্ত বুঝানোর জন্য কখনও কখনও শব্দটির মধ্যবর্তী অক্ষর লামের উপরে যবর ব্যবহৃত হয় আবার কখনও ব্যবহৃত হয় সাকিন। কিন্তু উত্তম স্থলাভিষিক্ত বুঝানোর জন্য লাম অক্ষরের উপর ব্যবহৃত হয় কেবল যবর।

মোহাম্মদ ইবনে জারীর বলেছেন, নন্দিত অবস্থা প্রকাশের জন্য অধিকাংশ সময় যবর এবং নিন্দিত অবস্থা প্রকাশের জন্য সাকিন ব্যবহার করা হয় লাম অক্ষরটিতে।

বায়যাবী লিখেছেন, 'খালফুন' শব্দটি একটি মূল ধাতু। কর্তৃকারক এবং কর্মকারক উভয় রূপে ব্যবহৃত হয় শব্দটি। মূল ধাতু হওয়ায় একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কেউ কেউ আবার বলেছেন, শব্দটি বহুবচন। এখানে খালফুন শব্দ দ্বারা রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়ারিছুল কিতাব' (তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়)। এ কথার অর্থ— ইহুদীদের উত্তর পুরুষেরা তাদের পূর্বপুরুষের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সাথে সাথে কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। ওই কিতাব তারা পাঠও করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে'। এ কথার অর্থ— তারা কিতাব পাঠ করে ঠিকই, কিন্তু তা ব্যবহার করে দুনিয়ার স্বার্থে। উৎকোচ ও দুনিয়ার অন্য তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে, মানুষের সন্তুষ্টির জন্য দান করে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধানবিরোধী সিদ্ধান্ত। তাদের কিতাবে লিখিত রসুল স. সম্পর্কীয় বিবরণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপন করে তারা। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও অর্থসমাগম বন্ধ হওয়ার আশংকায় তারা বজায় রাখে এই গোপনীয়তা। এভাবে তুচ্ছ দুনিয়াই তাদের কাছে হয়ে উঠেছে মুখ্য। আর গৌণ হয়ে গিয়েছে চিরস্থায়ী আখেরাত। তারা পাপী। অথচ তওবা না করা সত্ত্বেও তারা মনে করে— আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তাদের এই ধারণাটিও ঘৃণ্য ও জঘন্য। রসুল স. বলেছেন, ওই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে অনুগত ও পরবর্তী পৃথিবীর পাথেয় সংগ্রহে নিয়োজিত। আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ সম্পর্কে অলীক ধারণা রাখে। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম। বাগবী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত শাদ্দাত ইবনে আউস থেকে।

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকটে এলে তা-ও তারা গ্রহণ করে।' এ কথার অর্থ— তারা করে চলে পাপের পর পাপ। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে করে তারা ক্ষমার্হ। সুদ্দী বলেছেন, বনী ইসরাইলদের মধ্যে কাউকে বিচারক নিযুক্ত করা হলে সে নির্বিকারচিত্তে উৎকোচ গ্রহণ করতো। ঘুষ ছাড়া কারো পক্ষে রায় দিতো না। কেউ তাদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলে তারা বলতো আল্লাহ্ আমাকে মাফ করে দিবেন। ঘুষখোর কোনো বিচারককে অপসারণ করে অন্য কাউকে বিচারকের আসনে বসালে দেখা যেতো, সেও নির্বিবাদে উৎকোচ গ্রহণ শুরু করেছে।

এরপর বলা হয়েছে—'কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের নিকট থেকে নেয়া হয়নি যে তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? এবং তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে।' এ কথার অর্থ— তাদের কিতাব তওরাতে উল্লেখ রয়েছে ওই অঙ্গীকারের অর্থ— যারা (তাদের পূর্ব-পুরুষেরা) আল্লাহ্র সাথে করেছিলো। ওই অঙ্গীকারের মূল কথা ছিলো— আল্লাহ্ সম্পর্কে তারা কোনো মিথ্যা কথা বলবে না। আর তওরাতে এ কথাও স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, পাপিষ্ঠরা পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত (তওবা না করা পর্যন্ত) আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ইহুদীরা এ সকল কথা পড়ে জেনে বুঝে নির্বিচারে করে চলেছে মিথ্যাচারের বেসাতি। আর কতদিন চালাবে তারা তাদের মিথ্যাচার? তারা কি সাবধান হবে না?

শেষে বলা হয়েছে—'যারা সাবধান হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি এটা অনুধাবন করো না?' এ কথার অর্থ— তোমরা কি এতটুকু অনুধাবন করতে পারো না যে, মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা হিংসা, ষড়যন্ত্র— এ সকলকিছুই পাপ। তোমরা কি বুঝতে পারো না, সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। যারা সময় থাকতে সাবধানতা (তাকওয়া) অবলম্বন করে তারাই উত্তম বিবেচনা করে পরকালের আবাসকে। আর পরকালের আবাস চিরস্থায়ী। হে অবিমৃশ্য ইহুদীকুল! তোমরা চলেছো অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যের দিকে যে গন্তব্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন লেলিহান শাস্তি— তোমরা কি তা অনুধাবন করতে পারো না (আফালা তা'ক্বিলুন)।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭০, ১৭১

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

❒ যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে আমি তো তাহাদিগের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

❒ স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাহাদিগের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তাহারা মনে করিল যে উহা তাহাদিগের উপর পড়িয়া যাইবে; বলিলাম 'আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর যাহাতে তোমরা সাবধান হও'।

প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে আমি তো তাদের মতো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না'। মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণকে লক্ষ্য করে। বনী ইসরাইলদের (আহলে কিতাবদের) মধ্যে তাঁরা ছিলেন খাঁটি ইমানদার। ছিলেন তওরাতের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁরা কখনো তওরাতের কোনো বিধান পরিবর্তন করেননি। কখনো উৎকোচ গ্রহণ করে তওরাতের নামে ভুল সিদ্ধান্ত দেননি। রসুল স. হিজরত করে মদীনায় এলে তাঁরা বিশুদ্ধচিত্তে সত্যধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সম্মানিত সাহাবী। আতা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য উম্মতে মোহাম্মদী।

'ইন্না লা নুদ্বীয়ু' অর্থ আমি নষ্ট করি না। 'আজরাল মুসলিহীন' অর্থ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল। এ কথায় প্রতীয়মান হয় যে, সৎকর্মপরায়ণতাই আসলে শ্রমফল বা সওয়াব বিনষ্ট হওয়ার অন্তরায়।

পরের আয়াতে (১৭১) বলা হয়েছে—'স্মরণ করো আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিলো যেনো এক চন্দ্রাতপ; তারা মনে করলো যে তা তাদের উপর পড়ে যাবে।' এখানে 'উজকুরু' (স্মরণ করো) কথাটি উহ্য রয়েছে। 'নাতাক্বনা' শব্দের অর্থ গুঁজে দেয়া বা ঠেলে দেয়া। কিন্তু এখানে 'নাতাক্বনাল জাবালা' কথাটির অর্থ হবে— আমি পর্বতকে উর্ধ্বে স্থাপন করি। 'ফাওক্বাহুম' (তাদের উপর) অর্থ— বনী ইসরাইলদের উপর। বনী ইসরাইলেরা কঠিন বিধান সম্বলিত তওরাতের গুরুভার বহন করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। তখন আল্লাহ্পাক পাহাড় উঠিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম করা হয়েছিলো এজন্য যে, পর্বতপতনের ভয়ে তারা যেনো তওরাতকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 'কাআন্নাহু জুল্লাতুন' অর্থ— আর তা ছিলো যেনো এক চন্দ্রাতপ বা ঝুলন্ত ছাদ। 'ওয়া জন্নু আন্নাহু ওয়াক্বিউ'ম বিহীম' অর্থ— তারা মনে করলো যে তা তাদের উপর পড়ে যাবে।

এরপর বলা হয়েছে—'বললাম, আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং এতে যা আছে তা স্মরণ করো যাতে তোমরা সাবধান হও।' এ কথার অর্থ— আমি বনী ইসরাইলদেরকে নির্দেশ দিলাম, আমি যে তওরাত তোমাদেরকে দান করলাম সেই পবিত্র তওরাত কিতাবকে নির্বিবাদে গ্রহণ করো। নয়তো মাথার উপরের ওই ঝুলন্ত পর্বত তোমাদের উপর ফেলে দেয়া হবে। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে তওরাতকে গ্রহণ করে তার বিধানানুযায়ী আমল করো। তওরাতের নির্দেশ কখনো বিস্মৃত হয়ো না। যদি এ রকম করো, তবে সম্ভবতঃ তোমরা মুত্তাকী (সাবধানী) হতে পারবে। পরিত্যাগ করতে পারবে সকল অসৎ স্বভাব এবং বেঁচে থাকতে পারবে সকল পাপ থেকে।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ أَوْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

❐ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদিগের নিজদিগের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন 'আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?' তাহারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রহিলাম।' এই স্বীকৃতিগ্রহণ এই জন্য যে তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম,

❐ কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদিগের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদিগের পূর্বে শির্ক করে, আর আমরা তো তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদিগের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?'

❐ এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

'তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন' কথাটির অর্থ— তোমার প্রভুপ্রতিপালক আদম ও আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করেন এবং 'তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন' কথাটির অর্থ— এবং তিনি আদম ও আদম সন্তানদেরকে একে অপরের সাক্ষী বানান। অর্থাৎ আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হওয়ার পর সকল মানুষ হয়ে গিয়েছিলো একে অপরের দর্শক।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এই জন্য যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।'

হজরত আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর পিঠের উপর হাত বুলালেন। তখন কিয়ামত পর্যন্ত যে সকল মানুষ পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলকে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। তাদের সকলের দু'চোখের মাঝে সৃষ্টি করলেন নূর। আদম বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, এরা সকলেই তোমার সন্তান। হজরত আদম দেখলেন, এক ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থান খুব উজ্জ্বল। ওই ব্যক্তিকে খুব ভালো লাগলো তাঁর। বললেন, হে আমার পরম প্রভু! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বললেন, এর নাম দাউদ। হজরত আদম বললেন, হে আমার প্রভুপালক! তুমি তার পৃথিবীর আয়ু নির্ধারণ করেছো কতদিন? আল্লাহ্ বললেন, ষাট বছর। আদম বললেন, আমার আয়ু থেকে তুমি তাকে চল্লিশ বছর আয়ু দিয়ে দাও। পৃথিবীর জীবন যাপনের পর হজরত আদমের যখন পরকাল যাত্রার সময় হলো, তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন মৃত্যুর ফেরেশতা হজরত আজরাইল। হজরত আদম বললেন, এখনো তো আমার চল্লিশ বছর আয়ু রয়েছে। হজরত আজরাইল বললেন, সেই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দেননি? হজরত আদম তাঁর আয়ু প্রদানের কথা মনে করতে পারলেন না। তাই বলেন, না। হজরত আদমের এই বিস্মৃতিপ্রবণতার কারণেই তাঁর সন্তানেরাও বিস্মৃতিপ্রবণ। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ ভুলে তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। তাই তাঁর সন্তানেরাও ভুলে যায়।

হজরত আবু দারদা থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদমকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ডান কাঁধে হাত রাখলেন। তখন অসংখ্য পিপীলিকার মতো তাঁর অনাগত সুন্দর বংশধরেরা দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর আল্লাহ্তায়ালা হাত রাখলেন তাঁর বাম কাঁধে। তখন বেরিয়ে এলো ছোট্ট পিপীলিকার মতো অসংখ্য কুৎসিতদর্শন মানুষ। আল্লাহতায়ালা বললেন, তোমার ডান কাঁধ থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে, তারা জান্নাতী। তাদের আনুগত্যে আমার কিছু এসে যায় না। আর তোমার বাম কাঁধ থেকে যারা বেরিয়ে এসেছে, তারা দোজখী। তাদের অবাধ্যতায় আমার কোনো পরোয়া নেই। আহমদ। মুকাতিল ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ রকম বর্ণনা করেছেন। মুকাতিলের বর্ণনায় অতিরিক্ত যে কথাগুলো রয়েছে তা হচ্ছে— এরপর আল্লাহ্তায়ালা সকলকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে পুনঃস্থাপন করলেন। অংগীকারাবদ্ধ সকল মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে বের হয়ে মাতৃ-উদরের মাধ্যমে পৃথিবীতে আগমন না করবে, ততদিন পর্যন্ত কবরবাসীরা কবরেই শায়িত থাকবে (মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান হবে না)। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এসে আদম সন্তানদের অনেকেই আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকেন। ওই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন— আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার রক্ষকরূপে পাইনি।

মুসলিম ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি নিজেও রসুল স. এর নিকট এর মর্মার্থ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁর অলৌকিক দক্ষিণ হস্ত আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো আদম সন্তানদের একটি দল। আল্লাহ্ বললেন, আমি এদেরকে সৃষ্টি করেছি জান্নাতের জন্য। এরা জান্নাতবাসীদের মতো আমল করবে। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন তাঁর অলৌকিক বাম হাত। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলো অনেক আদম সন্তান। আল্লাহ্‌তায়ালা বললেন, দোজখের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি এদেরকেই। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! জান্নাতীরা ও জাহান্নামীরা তো নির্ধারিতই। তবে আর আমলের প্রয়োজন কী? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে সে জান্নাতের অনুকূল আমলই করে। সারা জীবনে না করলেও মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে এমন আমল করে, যার ফলে জান্নাত হয়ে যায় তার জন্য অনিবার্য। দোজখের জন্য নির্ধারিতরাও তেমনি পৃথিবীতে দোজখের অনুকূল আমলই করে। সারা জীবনে না করলেও মৃত্যুর পূর্বে সে এমন আমল করে যার ফলে তার দোজখযাত্রা হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী। মালেক, আবু দাউদ, তিরমিজি, আহমদ, বোখারী, ইবনে হাব্বান হাকেম, বায়হাকী। তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে মুসলিম ইবনে ইয়াসার হজরত ওমর থেকে হাদিসটি স্বকর্ণে শোনেননি। তাই বাগবী বলেছেন, কোনো কোনো হাদিস বিশারদগণের অভিমত এই— হজরত ওমর ও মুসলিম ইবনে ইয়াসারের মধ্যে রয়েছে আর একজন বর্ণনাকারী, যার নাম জানা যায়নি।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে সকলের নিকট থেকে সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আরাফার প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিলো ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানটি। পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকৃতিতে তখন আরাফা প্রান্তরে সমবেত হয়েছিলো সকলে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপালক নই? সকলে বলেছিলো, হে আমাদের আল্লাহ্! আপনিই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক। আমরা সকলে এই অঙ্গীকারের সাক্ষী। এরপর তিনি স. আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করলেন। আহমদ, নাসাঈ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি শুদ্ধ।

হজরত ইবনে ওমর থেকে শিথিলসূত্রে ইবনে জারীর বলেছেন, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে রসুল স. বলেছেন, চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে যেমন মস্তকের কেশগুচ্ছ থেকে সকল উকুন বের করে আনা হয়, তেমনি করে আল্লাহ্‌তায়ালা আদমের

পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে আনলেন সকলকে। তারপর বললেন, আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই? সকলে বললো, নিশ্চয়ই। তখন ফেরেশতারা বললো, আমরা সকলেই এই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের সাক্ষী।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আদম পৃথিবীতে প্রথম অবতরণ করেছিলেন হিন্দুস্তানের 'দাহনা' নামক স্থানে। সেখানেই তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করেছিলেন আল্লাহ্তায়ালা। সেখানেই স্বীকৃতি নিয়েছিলেন তাঁর প্রভুপালকত্বের।

কালাবী বলেছেন, ওই অঙ্গীকারের আয়োজন করা হয়েছিলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে। সুদ্দী বলেছেন, হজরত আদম পৃথিবীতে অবতরণ করার আগেই তাঁর অনাগত সন্তানদের নিকট থেকে কথিত অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা সকল আদম সন্তানকে একত্র করে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন পৃথকভাবে। তারপর তাদেরকে দান করেছেন অবয়ব ও বাকশক্তি। তারপর তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন অঙ্গীকার। বলেছেন, বলো হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের প্রভুপালয়িতা নই? সকলেই জবাব দিয়েছেন, অবশ্যই। আল্লাহ্তায়ালা তখন বলেছেন, আমি তোমাদের এই অঙ্গীকারের সাক্ষী রাখলাম সাত আসমানকে, জমিনকে এবং তোমাদের পিতা আদমকে, যেনো তোমরা পুনরুত্থান দিবসে এ কথা বলতে না পারো যে, আমার একক অস্তিত্ব ও প্রতিপালকত্ব সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। হে আদম সন্তান! উত্তমরূপে অবগত হও— আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভুপ্রতিপালক নেই। আমার সঙ্গে কখনো কাউকে শরীক কোরো না। পৃথিবীতে তোমাদের নিকট আমি প্রেরণ করবো আমার বাণীবাহক রসুলদেরকে। তারা তোমাদেরকে অদ্যকার এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। আর আমি আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করবো সেখানে। সকল আদম সন্তান সমস্বরে জবাব দিলো, নিশ্চয় তুমিই আমাদের প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোনো প্রভুপ্রতিপালক নেই। উপাস্যও কেউ নেই। এরপর সকলকে উপস্থিত করা হলো হজরত আদমের দৃষ্টি সীমানায়। উর্ধ্বজগত থেকে হজরত আদম দেখলেন, বিচিত্র আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট তাঁর সন্তানেরা। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন। আর কেউ অজ্ঞ, কেউ বিজ্ঞ। তিনি বললেন, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! তুমি আমার সন্তানদেরকে এতো বিচিত্রদর্শন করলে কেনো? আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমি চাই, আমার সকল বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক (চেয়ে দেখুক তাদের নিজের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা অন্যের মধ্যে নেই— এই ভেবে কৃতজ্ঞচিত্ত হোক তারা)। হজরত আদম আরো দেখলেন, তার সন্তানদের মধ্যে যারা নবী ও রসুল, তাঁরা প্রদীপের মতো

সমুজ্জ্বল। আর তাঁদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে পৃথকভাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— ওয়া ইজ্ আখাজনা মিনান্ নাবিয়্যিনা মীছাক্বাহুম থেকে ওয়া ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়াম পর্যন্ত। স্মর্তব্য যে, হজরত ঈসা কোনো পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসেননি। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে কেবল মাতার মাধ্যমে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীতে। কিন্তু তিনিও ছিলেন নবী রসুলদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত ওই অঙ্গীকারানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। হজরত উবাই ইবনে ক'াব বর্ণনা করেছেন, হজরত ঈসা রূহানীভাবে হজরত মরিয়মের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর মাতৃগর্ভে। আহমদ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আদম সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের সময় আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বলেছিলেন, হুঁশিয়ার! কাউকে আমার অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। যে এ রকম করবে সে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, অবিশ্বাসী। আমি অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। সকল আদম সন্তান তখন আল্লাহ্তায়ালার এই ঘোষণার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করলো। আরো বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্পাক তখন সকল আদম সন্তানদের বয়স, জীবিকা এবং বিপদ-মুসিবত লিখে দিলেন এবং বললেন, আমি চাই সকলে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে, আদম সন্তানদের নিকট থেকে তৌহিদের স্বীকৃতি এবং পারস্পরিক সাক্ষ্য গ্রহণের পর আল্লাহ্তায়ালা পুনরায় তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে। অঙ্গীকারাবদ্ধ আদম সন্তানদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে না আসা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

বাগবী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আদম সন্তানদেরকে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- 'আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে।' এখানে 'আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে'—এ রকম বলা হলো না কেনো? আমি বলি, হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে সকল আদম সন্তানের বের করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হাদিস শরীফে।

কোনো কোনো আলেম উদ্ভূত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন এভাবে— পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে আসে। আর পিতাপুত্র সকলেই তো হজরত আদমেরই সন্তান। সুতরাং এই অতি বাস্তব কথাটি উল্লেখের প্রয়োজনই বা কী?। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ বলেই সম্ভবতঃ আলোচ্য আয়াতে আর উল্লেখ করা হয়নি।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক হস্তদ্বয় স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে সুন্দর ও অসুন্দর মানুষের কথা। এ সকল কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের কাঁধের উপর অথবা তাঁর সন্তানদের কারো কাঁধের উপর তাঁর হস্ত স্থাপন করেছিলেন।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেছেন, অঙ্গীকার গ্রহণের সময় পুণ্যবানেরা আল্লাহ্তায়ালার এককত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো আন্তরিক প্রসন্নতার সঙ্গে। কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপটেরা স্বীকৃতি দিয়েছিলো আন্তরিক অপ্রসন্নতার সঙ্গে। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাহু আসলামা মান্‌ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ্বি ত্বাওআঁও ওয়া কারহা' (আর তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পন করেছে যা কিছু আছে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়)।

'তারা বলে, নিশ্চয় আমি সাক্ষী রইলাম।' সুদ্দী লিখেছেন, এই কথাটি আল্লাহ্‌র। ওই অঙ্গীকার গ্রহণের সময় বান্দারা কেবল বলেছিলো 'বালা' (হ্যাঁ)। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বলেছিলেন— আমি এই 'মীছাকে আযলের' (অঙ্গীকার দিবসের) সাক্ষী। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উদ্ধৃত কথাটি ছিলো বান্দাদের। তারা তখন 'বালা' বলার পরক্ষণেই বলেছিলো, 'শাহিদ্‌না' (আমরা সাক্ষী রইলাম)।

কালাবী বলেছেন, উদ্ধৃত উক্তিটি ছিলো ফেরেশতাদের। ঘটনাটি ছিলো এই রকম— 'আমি কি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক নই', এই প্রশ্নের জবাবে আদম সন্তানদের বালা (হ্যাঁ) উচ্চারণের পর আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এই স্বীকৃতির সাক্ষী থেকো, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম।'

শেষে প্রকাশ করা হয়েছে ওই অঙ্গীকার গ্রহণের কারণ। কারণটি আলোচ্য আয়াতের (১৭২) শেষ থেকে শুরু করে পরবর্তী আয়াতের (১৭৩) শেষ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে এভাবে— এই স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে, তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম' (১৭২) কিংবা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? (১৭৩)।

এর পরের আয়াতে (১৭৪) বলা হয়েছে—'এভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।' 'ওয়া কাজালিকা নুফাস্‌সিলুল আয়াতি' অর্থ— এভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। 'ওয়া লাআল্লাহুম ইয়ারজিউ'ন' অর্থ— যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। ইতোপূর্বে বর্ণিত মানুষের জন্মপূর্ব সময়ের অঙ্গীকার সম্পর্কিত হাদিসসমূহের আলোকে জমহুর তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ করেছেন এভাবে— এভাবে আমি আমার আয়াতকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করি যেনো বান্দারা তাদের বিস্মৃত অঙ্গীকারের বিষয়ে চিন্তা করে, উপদেশ গ্রহণ করে এবং ফিরে আসে ইমানের পথে।

বায়যাবী ও তাঁর অনুসারীগণ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে— আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানকে বের করে সকলের নিকট থেকে তাঁর অতুলনীয় এককত্ব ও প্রতিপালকত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তারপর পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে। দেয়া হয়েছে জ্ঞান ও

সুস্থ বিবেচনাবোধ। এই জ্ঞান সৃষ্টিগতভাবেই দেয়া হয়েছে তাদেরকে। এরপর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হয়েছে জন্মপূর্ব সেই অঙ্গীকারের কথা। এখন প্রত্যাদেশ সঞ্জাত জ্ঞান এবং সৃষ্টিগত জ্ঞানই সেই স্বীকৃতি ও সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত।

বায়যাবী লিখেছেন, পূর্বের আয়াতে (১৭২-১৭৩) বলা হয়েছে— 'তোমরা যেনো কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। কিংবা তোমরা যেনো না বলো, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরিক করে আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে?' অবিশ্বাসীদের এ রকম অজুহাত উত্থাপনের কোনো সুযোগ সেদিন থাকবে না। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা বিশদভাবে সত্যধর্মের বিবরণ দান করেছেন। জাগিয়ে তুলেছেন জন্মপূর্ব সময়ের সেই পবিত্র অঙ্গীকারের স্মৃতি। দিয়েছেন স্বভাবজ জ্ঞান, বিবেচনা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা। এতকিছু করার পর পূর্বপুরুষদের অজুহাত গৃহীত হতে পারে কীরূপে?

বায়যাবী আরো লিখেছেন, 'বিশদভাবে বিবৃত করি' কথাটির উদ্দেশ্য এই যে— ইতোপূর্বে বনী ইসরাইলদের নিকট থেকে বিশেষ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো। সেকথা তওরাতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। পুনরায় কোরআনের মাধ্যমে জানানো হলো মানুষের জন্মপূর্ব সেই অঙ্গীকারের কথা। এভাবে উপস্থাপন করা হলো বর্ণনাসঞ্জাত (নকলী) প্রমাণ। এর সঙ্গে রয়েছে স্বভাবগত জ্ঞান, অনুধাবন যোগ্যতা। এভাবে নকলী, আকলী— সকল দিক থেকে আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি আমার নিদর্শনরাজিকে। এ রকম করেছি এ জন্য, যেনো রুদ্ধ হয় অজুহাত ও কৌশল এবং যেনো প্রকৃতপথে (ইসলামের পথে) প্রত্যাবর্তন হয় সহজ, সহজতর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৫

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

❒ তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বালআম বাউর ছিলো ইহুদী সম্প্রদায়ভূত। সে ছিলো এক আধ্যাত্মিক সাধক। তার পদস্খলনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এ রকম বলেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ। আতীয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বালআম ছিলো বনী ইসরাইল। তাঁর উক্তিরূপে আবু তালহা উল্লেখ করেছেন, সে ছিলো কেনান অঞ্চলের লোক।

আমালিকাদের রাজ্যের এক শহরে বসবাস করতো সে। মুকাতিল বলেছেন, সে ছিলো বালকা নামক শহরের বাসিন্দা। এ ব্যাপারে হজরত ইবনে আব্বাস, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং সুদ্দী যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ।

হজরত মুসা নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন, আমালিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে উৎখাত করে তাদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বনী ইসরাইলকে। তিনি তখন বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন কেনান অঞ্চলের দিকে। সেখানকার এক শহরে বাস করতো বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক বালআম বাউর। ইসমে আজম জানতো সে। সকল দোয়াই কবুল হতো তার। কেনানের লোকেরা উপায়ন্তর না দেখে সমবেত হলো বালাআমের দরবারে। বললো, হে সাধকপ্রবর! আমরা বিপদগ্রস্ত। মুসা নবী তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ নিচ্ছে। শুনেছি সে খুবই উগ্র ও কঠোর। সে আমাদেরকে এ রাজ্য থেকে উৎখাত করে বনী ইসরাইলদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমাদের সকলকে সে নাকি হত্যা করে ফেলবে। এখন আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আপনি আমাদের পক্ষে এবং মুসা নবীর বিপক্ষে যদি দোয়া করেন, তবেই কেবল আমাদের জীবন রক্ষা হয়।

বালআম বললো, রে হতভাগ্যের দল! মুসা তো নবী। তাঁর সঙ্গে রয়েছে ইমানদার লোকেরা এবং ফেরেশতারা। আমি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করবো। তোমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলেই এ রকম বলতে পারলে। তোমাদের আবদার শুনলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত— দু'টোই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আগন্তুক জনতা কিন্তু নিরস্ত হলো না। তারা কাকুতি মিনতি করে একই নিবেদন জানাতে লাগলো বার বার। তাদের করুণ নিবেদন শুনে কিছুটা নরম হলো বালআম বাউর। বললো, ঠিক আছে, আমি তাহলে এস্তেখারা করে নেই। এস্তেখারা না করে কখনোই দোয়া করতো না সে। এস্তেখারার পর স্বপ্ন-নির্দেশের অপেক্ষা করতো। স্বপ্নে দোয়া করতে বলা হলেই কেবল দোয়া করতো। তার এবারের এস্তেখারা কিন্তু অনুকূল হলো না। স্বপ্নযোগে তাকে হজরত মুসার বিরুদ্ধে দোয়া করতে পরিষ্কার ভাবে নিষেধ করে দেয়া হলো। সে অপেক্ষমান জনপ্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে দিলো এ কথা। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। তারা বালআমকে অনেক উপঢৌকন দিলো। তারপর বললো, দয়া করে বিপদকবলিতদেরকে রক্ষা করুন। এতে করে বৃদ্ধি পাবে আপনারই মহানুভবতা। বালআম বললো, ঠিক আছে। দেখি আর একবার এস্তেখারা করে।

পুনরায় এস্তেখারা করলো সে। কিন্তু এবার স্বপ্নযোগে কোনো প্রকার নির্দেশই সে পেলো না। সে লোকদেরকে জানালো, আমাকে যে এবার হ্যাঁ, না— কোনো কিছুই বলা হলো না। লোকেরা বললো, এতে করে বোঝা যাচ্ছে দোয়া করতে

আপনাকে নিষেধ করা হয়নি। যদি আমাদের জন্য দোয়া করা আল্লাহ্ অপছন্দ করতেন তাহলে নিশ্চয় স্পষ্ট করে আপনাকে নিষেধ করে দেয়া হতো। সুতরাং আপনি কালবিলম্ব না করে আমাদের জন্য দোয়া করুন।

জনতার অনুনয় বিনয় ও তাদের দেয়া উপঢৌকনের কারণে গলে গেলো বালআম। প্রশংসা ও পার্থিব প্রাপ্তির প্রভাবে সে হারিয়ে ফেললো তার বিশ্বাস ও শুভবিবেচনা। এক খচ্চরে আরোহণ করে সে রওয়ানা দিলো হিতান পর্বতের দিকে। লোকেরাও চললো তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য, পর্বত শিখরে আরোহণ করে সে দেখে নেবে হজরত মুসার বাহিনীকে। বুঝতে চেষ্টা করবে তাদের শক্তিমত্তাকে। কিন্তু পাহাড়ের কাছে গিয়ে খচ্চর থেমে গেলো। খচ্চরকে প্রহার করলো সে। কিন্তু কয়েক পা যাবার পর পুনরায় থেমে গেলো খচ্চর। বালআম সেটিকে বার বার প্রহার করতে থাকলো। আল্লাহ্র ইচ্ছায় খুলে গেলো খচ্চরের বাকশক্তি। খচ্চরটি বললো, হতভাগ্য বালআম। কোথায় চলেছো তুমি? দেখতে পাচ্ছো না ফেরেশতারা বার বার আমার পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। আর তুমি চলেছো আল্লাহ্র সত্য নবী ও ইমানদারদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে।

বালআম বাউর তবুও চললো হিতান পাহাড়ের দিকে। উঠে পড়লো চূড়ায়। তার সঙ্গীরাও উঠে পড়লো সেখানে। সে দোয়া শুরু করলো। কিন্তু যা উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলো তা পারছিলো না। উচ্চারণগুলো হয়ে যাচ্ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। শত চেষ্টা করেও সে তার রসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলো না।

লোকেরা বললো, আপনি তো দেখি বনী ইসরাইলদের জন্যই দোয়া করছেন। আর আমাদের জন্য করছেন বদদোয়া। বালআম বললো, আমি তো চেষ্টা করছি। কিন্তু যা চাচ্ছি, উচ্চারণ করছি তার বিপরীত। আমাকে এ রকম করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বালআমের বদদোয়ার উদ্যোগটি ছিলো আল্লাহ্তায়ালার অসন্তোষের কারণ। সেই অসন্তোষের ফল পেলো সে হাতে হাতে। তার জিহ্বা ঝুলে পড়লো বুক পর্যন্ত। সে লোকদেরকে বললো, দ্যাখো, তোমাদের জন্য আমার দুনিয়া ও আখেরাত— দু'টোই বরবাদ হয়ে গেলো। তোমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো না। এখন কৌশল ও ষড়যন্ত্র ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। তোমরা তোমাদের কতিপয় সুন্দরী রমণীদেরকে পসরা সাজিয়ে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করার ছল করে বনী ইসরাইলদের নিকট পাঠাও। তাদের সৈন্যদের কেউ যদি তাদের সম্ভোগ করতে চায়, তবে তারা যেনো সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে। এভাবে তাদের একটি সৈন্যকেও যদি তোমরা ব্যভিচার করাতে পারো, তবে তারা আর তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। লোকেরা খুবই পছন্দ করলো পরিকল্পনাটি। তারা পণ্য-পসারিনীর ছলে কিছু সুন্দরী ও সুসজ্জিতা রমণীকে ছেড়ে

দিলো বনী ইসরাইল বাহিনীর দিকে। তাদের একজন ছিলো খুবই সুন্দরী। নাম ছিলো তার কিসতী বিনতে সুর। সে গমন করছিলো যামরী বিন শালুম নামের এক গোত্রীয় নেতার সামনে দিয়ে। সে ছিলো শামউন গোত্রের নেতা। কিসতীর চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলো যামরী। তার হাত ধরে ফেললো সে। তারপর তাকে নিয়ে উপস্থিত হলো হজরত মুসার নিকট। বললো, আমার ধারণা, আপনি বলবেন, এই সুন্দরী নারী আমার জন্য হারাম।

হজরত মুসা বললেন, হ্যাঁ। ওকে ছেড়ে দাও। ওই মহিলা তোমার জন্য হালাল নয়। যামরী বললো, আল্লাহ্‌র কসম! এই নারী আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। সুতরাং আপনার নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে আমি অপারগ। এ কথা বলেই সে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে। চরিতার্থ করলো তার কামনা। কিন্তু তার রতিকর্ম শেষ হতে না হতেই প্লেগে আক্রান্ত হলো বনী ইসরাইল জনতা। অল্প সময়ের মধ্যে মারা গেলো সত্তর হাজার লোক।

যায়হাজ বিন আয়জার বিন মারঅন ছিলেন বনী ইসরাইলদের আর এক গোত্রাধিপতি। হজরত মুসা তাঁকে দিয়েছিলেন সৈনিকদের বিচারকের দায়িত্ব। তিনি তখন ঘটনাস্থলে ছিলেন না। আপন তাঁবুতে ফিরে এসেই তিনি দেখলেন, মহামারী প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। শুনলেন, যামরীর কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এই গজব। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণ বর্শাটি নিয়ে ছুটে গেলেন যামরীর তাঁবুর দিকে। ঢুকেই দেখলেন, তখনো তারা পরস্পরলগ্ন। যায়হাজ বর্শা ছুঁড়লেন। একই বর্শায় বিদ্ধ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। তিনি বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় দুজনকে ঊর্ধে উঠিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর কনুই তখন লেগে গেলো পাঁজরে। আর পাপিষ্ঠ লাশ দুটো লেগে গেলো তাঁর চোয়ালের সাথে। এভাবে লাশ দু'টোকে শূন্যে তুলে ধরে তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকলেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তোমার নাফরমানদের জন্য এই পরিণতিই শোভনীয়।

ধীরে ধীরে অপসারিত হলো গজব। নেমে এলো আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত। প্লেগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলো অবশিষ্ট জনতা। তখন থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ বনী ইসরাইলেরা পশু জবাই করলে পশুর চোয়াল ও সামনের পাঁজরের পা দিতে শুরু করলো যায়হাজকে। পরবর্তী সময়েও রয়ে গিয়েছে তাদের ওই প্রচলনটি। পরে তারা জবাইকৃত পশুর চোয়াল ও রান দিতো তাঁর অধস্তন বংশধরদেরকে। প্লেগের মূল হোতাকে বধ করেছিলেন বলেই যায়হাজ পেয়েছিলেন ওই সম্মান।

মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, বাল্‌কা নামক রাজ্যের শাসনকর্তা বালআম বাউরকে ডেকে বলেছিলো, মুসা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে দোয়া করুন। বালআম বলেছিলো, আমিও বনী ইসরাইল। সুতরাং আমি তার বিরুদ্ধে বদদোয়া

করতে পারবো না। রাজা বললো, আমার নির্দেশ না মানলে তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হবে। ভীত হলো বালআম। সে তখন একটি খচ্চরে আরোহন করে চললো বনী ইসরাইল বাহিনীর দিকে। পথ চলতে চলতে একস্থানে থেমে পড়লো খচ্চরটি। বালআম তাকে প্রহার করলো। খচ্চর বলে উঠলো, তুমি আমাকে প্রহার করছো কেনো? আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে লেলিহান আগুন। ওই আগুনই আমার সম্মুখযাত্রা স্থগিত করে দিয়েছে। বালআম ফিরে এলো। রাজাকে সে খুলে বললো সব কথা। রাজা বললো, অতো শতো বুঝি না। তোমাকে বদদোয়া করতে হবেই। না করলে আমি তোমাকে শূলে চড়াবো। মৃত্যু ভয়ে ভীত বালআম তখন ইসমে আজম পড়ে নিয়ে শুরু করলো তার অপপ্রার্থনা। আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীতও হলো তার ওই অপপ্রার্থনাটি। ফলে বনী ইসরাইলেরা আটকা পড়লো তীহ্ প্রান্তরে। হজরত মুসা নিবেদন জানালেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! সবদিকই তো উন্মুক্ত। অথচ আমরা এখানে বন্দী হয়ে গেলাম কেনো? আল্লাহ্তায়ালা জানালেন, বালআমের বদদোয়ার পরিণতিতে। হজরত মুসা বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি বালআমের বদদোয়া যেমন কবুল করে নিয়েছো, তেমনি আমার বদদোয়াও কবুল করে নাও। তুমি তার নিকট থেকে তার ইমান ও ইসমে আজম ছিনিয়ে নাও। হজরত মুসার দোয়া কবুল করা হলো। জবাই করা ছাগলের শরীর থেকে যেমন চামড়া ছিলে নেয়া হয়, তেমনি করে ছিনিয়ে নেয়া হলো বালআম বাউরের ইমান, ইসমে আজম ও বেলায়েত। শাদা কবুতরের মতো জ্যোতির্ময় এক অবয়ব বের হয়ে গিয়েছিলো বালআমের ভিতর থেকে। বালআম বাউরের এই বিপথগামিতার কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হজরত জায়েদ বিন আসলাম এবং হজরত লাইছ বিন সা'দ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উমাইয়া বিন সলত সাকাফী সম্পর্কে। ওই লোকটি ছিলো আসমানী কিতাবের একনিষ্ঠ অধ্যয়নকারী। তাই সে জানতো আরব ভূমিতেই আল্লাহ্তায়ালা প্রেরণ করবেন শেষ পয়গম্বর। মনে মনে সে ভাবতো, নিশ্চয়ই আমাকেই দেয়া হবে সেই পয়গম্বরীর দায়িত্ব। কিন্তু যখন রসুল স. এর নবুয়তপ্রাপ্তির সংবাদ তার কাছে পৌঁছলো তখন তার অন্তরে প্রজ্বলিত হলো ঈর্ষার আগুন। তাই সে প্রত্যাখ্যান করলো রসুল স.কে। উমাইয়া ছিলো প্রতিভাদীপ্ত কবি ও বিশুদ্ধ বাগ্মী।

একবার অন্য দেশ থেকে সফর করে ফিরে আসার সময় বদর প্রান্তর অতিক্রম করছিলো সে। সে জানতে পারলো, কিছুকাল আগে এই প্রান্তরেই রসুল স. প্রতিপক্ষের অনেক লোককে হত্যা করেছেন। এই প্রান্তরেই ফেলে রাখা হয়েছে নিহতদের মরদেহগুলো। উমাইয়া তখন বললো, মোহাম্মদ সত্য নবী হলে এভাবে তার নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করতে পারতো না।

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তার বোন ফারিয়া উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. তাকে বললেন, মৃত্যুকালে কী অবস্থা হয়েছিলো তার? ফারিয়া বললো, তখন তার শয্যাপার্শ্বে ছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম, দু'জন লোক ছাদ ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করলো। একজন বসলো উমাইয়ার শিয়রে। আর একজন বসলো তার পায়ের দিকে। পায়ের দিকের লোকটি তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, এর অন্তর্জগত কি সতর্ক? শিয়রের জন জবাব দিলো, হ্যাঁ। পায়ের দিকের লোকটি পুনরায় বললো, তার বক্ষদেশ কি কুপ্রবৃত্তির অপপ্রভাব থেকে মুক্ত? তার সাথী জবাব দিলো, না। এ লোক প্রবৃত্তিতাড়িত, প্রতারক। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলো আমার। আমি বললাম, একি দেখলাম আমি। তারপর উমাইয়াকে খুলে বললাম সব কিছু। শয্যাশায়ী উমাইয়া ছিলো পূর্ণ সচেতন। সে আমার দর্শনের ব্যাখ্যা করলো এভাবে— আমার জন্য উত্তম কিছু নির্ধারণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তা ফিরিয়ে নেয়া হলো। এটুকু বলার পর সে রোগ যন্ত্রণায় বেঁহুশ হয়ে পড়লো। হুঁশ ফিরে এলে বললো, জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেনো, শেষ গন্তব্য তো ধ্বংসের দিকেই। আমার সম্মুখে যে অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে তার বিবরণ দেয়া অপেক্ষা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ছাগল চরানোই ছিলো আমার জন্য শ্রেয়। হায়! তা যদি করতে পারতাম (যদি পৃথক হয়ে যেতে পারতাম সকল মানুষের নিকট থেকে)। এরপর সে তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলো এভাবে—

'নিঃসন্দেহে হিসাবের দিনটি হবে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিবস। ওই দিবসটি হবে সবচেয়ে ভারী, সবচেয়ে ভয়াবহ। ওই ভয়াবহতা দর্শনে নিমেষের মধ্যে শিশু হয়ে যাবে বয়োবৃদ্ধ।'

রসুল স. বললেন, তোমার ভ্রাতার আরো কিছু কবিতা আমাকে শোনাও। ফারিয়া তার ভাইয়ের আরো কিছু কবিতা পাঠ করলো। তিনি স. বললেন, তোমার ভ্রাতার কবিতাগুলো ইমানদার, কিন্তু তার হৃদয় ছিলো কাফের। —এই ঘটনাটিই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত।

এক বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে এসেছে, বনী ইসরাইলের বাসুলাম নামক এক লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। তাকে দেয়া হয়েছিলো তিনটি দোয়ার অধিকার। অর্থাৎ তাকে জানানো হয়েছিলো, তোমার তিনটি দোয়া কবুল করা হবে। লোকটি ছিলো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। তার স্ত্রী একদিন বললো, তুমি আমার জন্য দোয়া করো— যেনো আল্লাহ্ আমাকে বনী ইসরাইলদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী করে দেন। বাসুলাম এ রকমই দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে দোয়া কবুল হলো। তার স্ত্রী হয়ে গেলো সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী। কিন্তু রূপসী নারী তখন স্বামীকে মনে করতে লাগলো তার অনুপযুক্ত। স্বামীর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন শুরু করলো সে। বাসুলাম মনোক্ষুণ্ন হলো। সে আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! একে কুকুর

বানিয়ে দাও। দ্বিতীয় দোয়াটিও কবুল হলো সঙ্গে সঙ্গে। তার স্ত্রী হয়ে গেলো কুকুর। অন্য কুকুরদের মতো সারাক্ষণ সে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো। বাসুলামের পুত্র কন্যারা পড়লো মহাবিপাকে। মায়ের এ দূরবস্থা তারা সহ্য করতে পারলো না। পিতাকে বললো, এ অবস্থা তো সহ্য করা যায় না। লোকেরা আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে। কুক্কুরীর পুত্র কন্যা বলে লজ্জা দেয়। তুমি তাড়াতাড়ি দোয়া করে আমাদের মাকে ভালো করে দাও। বাসুলাম পুনরায় দোয়া করলো, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। তাই হলো। বাসুলামের স্ত্রী হয়ে গেলো আগের মতোই সাধারণ ঘরের সেই ছাপোষা গৃহিণী। এভাবে তিনটি দোয়াই বিফলে গেলো বাসুলামের।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতরূপে বালআম বাউর এবং উমাইয়ার ঘটনা দু'টোই ব্যাপকবিদিত। আমি বলি, ওই বর্ণনাটি অসঙ্গত যেখানে বলা হয়েছে— বালআমের বদদোয়ায় বনী ইসরাইলেরা আটকা পড়েছিলো তীহ্ প্রান্তরে। কারণ বর্ণনাটির বিপক্ষে রয়েছে কোরআনের সুস্পষ্ট বিবরণ। সুরা মায়িদার ২৪ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করলেই বিষয়টি আর কারো নিকট অস্পষ্ট থাকবে না। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের আদেশ তারা মানেনি বলেই চল্লিশ বছর তীহ্ প্রান্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তাদেরকে।

হাসান ও ইবনে কীসান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদী সম্প্রদায়ভূত মুনাফিকদের সম্পর্কে— যাদের নিকট রসুল স. ছিলেন আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক পরিচিত। এ রকম সন্দেহাতীত পরিচিতি লাভের পরও তারা বিশুদ্ধচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করতো না। তাদের মুখে বিশ্বাস। আর অন্তরে অবিশ্বাস।

কাতাদা বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য করে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়নি। সাধারণভাবে এখানে এ কথাটিই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা কোনো কোনো লোককে হেদায়েত দান করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত সেই হেদায়েত গ্রহণ করতে চায় না। হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল লোকের বৃত্তান্ত জনসমক্ষে বিবৃত করুন (যাতে মানুষ সতর্ক হয়)। এ রকম অর্থ গ্রহণ করলে এখানে আয়াতি (নিদর্শন) কথাটির মর্মার্থ হবে— হেদায়েত।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দীর নিকট এখানে 'নিদর্শন' কথাটির অর্থ হবে— ইসমে আজম। হজরত ইবনে আব্বাসের অপর বর্ণনায় রয়েছে, এখানে ওই ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, অথচ তারা কিতাবের বিধানাবলী থেকে এমনভাবে বিচ্যুত হয়েছিলো যেমন করে সাপ বেরিয়ে যায় তার খোলস থেকে।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র নিকটে যা চাইতো, তাই পেতো। এরপর তার পশ্চাতে লাগলো শয়তান। আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়েই সে হয়ে পড়েছিলো বিপথগামী।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ
الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ سَآءَ
مَثَلًا ِالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝ مَنْ يَّهْدِ
اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

❒ আমি ইচ্ছা করিলে উহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার কামনা বাসনার অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহাকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহবা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপায়; যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি কাহিনী বিবৃত কর যাহাতে তারা চিন্তা করে।

❒ যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!

❒ আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম' এখানে 'এর দ্বারা' অর্থ নিদর্শনের দ্বারা, যে নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। এভাবে আলোচ্য কথাটির মর্ম দাঁড়াচ্ছে— আমি ইচ্ছে করলে যে নিদর্শন তাকে দিয়েছিলাম, সেই নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে পুণ্যবানদের মতো উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম— যদি আমি চাইতাম তবে বর্ণিত নিদর্শনের মাধ্যমে আমি তাকে অবিশ্বাস থেকে বাঁচিয়ে দিতাম।

এরপর বলা হয়েছে—'কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার কামনা বাসনার অনুসরণ করে।' এখানে 'আরদ্ব' (মাটি) বলে বুঝানো হয়েছে পার্থিবতাকে— যা নিকৃষ্ট। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার সকল সম্পদ, উপভোগের সামগ্রী— সকল কিছুই উৎপন্ন হয় মৃত্তিকা থেকে। তাই এখানে 'আরদ্ব' শব্দটির মাধ্যমে দুনিয়াকেই বুঝানো হয়েছে।

আখলাদা ও খালাদা শব্দ দু'টো সমার্থক। শব্দ দু'টোর অর্থ— ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া বা অবস্থান করা। যেমন বলা হয়— আখলাদা ফুলান বিল মাকাম (অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে অবস্থান করছে)।

'ওয়াত্তাবায়া হাওয়াহু' অর্থ কামনা বাসনার অনুসরণ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি মোহগ্রস্ততার কারণে বা মানুষকে তুষ্ট করার জন্য বালআম বাউরের মতো বদ্‌দোয়া করে— এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমার নিদর্শন থেকে।

দুনিয়ার আকৃষ্টি মানুষের স্বভাবগত বিষয়। আর উচ্চ মর্যাদা লাভ হয় কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার মোহেরবাণীর কারণে। তাই এখানে উচ্চ মর্যাদার সম্পর্ক করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও দানের সঙ্গে। আর দুনিয়ামুখী হওয়া ও কামনা বাসনার সম্পর্ক করা হয়েছে বান্দার সঙ্গে। ইমাম বায়যাবী বলেছেন, উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পৃক্ত করেছেন তাঁর মাশিয়াত বা অভিপ্রায়ের সঙ্গে। এক্ষেত্রে সন্দেহ হতে পারে যে, বান্দার কর্মকাণ্ড তাহলে কিছুই নয়। এই সন্দেহটি দূর করবার জন্যই 'দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে', 'কামনা বাসনার অনুসরণ করে'—এ কথাগুলো বলা হয়েছে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ড সেই অভিপ্রায় বাস্তবায়নের কারণ বা মাধ্যম। কেউ উচ্চ মর্যাদার অনুকূল কাজ না করলে বুঝতে হবে, তার কাজ না করাটাই আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা। এক্ষেত্রে কারণের উৎস যেহেতু নেতিবাচক, তাই কারণও হয়ে পড়েছে নেতিবাচকতার অধীন। সকল কারণ বা মাধ্যমের মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। আমরা যে সকল কারণ দেখি ও বুঝি সেই প্রকাশ্য কারণগুলো ওই মূল কারণের ছায়া বা প্রতিচ্ছায়া। এভাবে মুল বক্তব্যটি হতে পারতো এ রকম— 'ওয়ালাকিন্নাহু আ'রাদ্বা আ'নহা'(কিন্তু এ থেকে বিমুখ হলেন তিনি)। কিন্তু তা না করে এখানে বলা হয়েছে 'সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার কামনা বাসনার অনুসরণ করে।' এভাবে বলাতেই আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অমান্য করার প্রকাশ্য কারণগুলো পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ কথাটিও জানা গিয়েছে যে— পৃথিবী-প্রীতি সকল পাপের উৎস। এই হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণিত। হাদিসটিকে হাসান ও বায়হাকী বলেছেন মুরসাল। কারণ এই সূত্রে কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ নেই।

এরপর বলা হয়েছে—'তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তাকে তুমি ক্লেশ দিলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনকে বর্জন করে ও কামনা

বাসনার অনুগামী হয়ে যে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় তাদের অবস্থা কুকুরের মতো। সকল পশু পরিশ্রান্ত হলেই কেবল হাঁপায়, কিন্তু কুকুর হাঁপায় সকল অবস্থায়। পরিশ্রান্ত হলেও। না হলেও। সকল অবস্থায় সে যেমন তার জিহ্বা বের করে রাখে, তেমনি কাফের সম্প্রদায়ও সকল অবস্থায় প্রকাশ করতে থাকে তাদের ভ্রষ্টতা, নিচতা ও হীনতাকে।

মুজাহিদ বলেছেন, ওই সকল লোকের অবস্থা কুকুরের মতো যারা কোরআন পড়ে কিন্তু তার উপর আমল করে না। উদ্ধৃত বাক্যটির উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে— যারা প্রকৃত অবিশ্বাসী, তাদেরকে তোমরা যতই সতর্ক করো, উপদেশ দাও, অথবা অন্য কোনো উপায়ে বুঝাতে চেষ্টা করো— তারা কখনও ইমান ও হেদায়েতকে গ্রহণ করবে না। তারা চির ভ্রষ্ট, চির নিকৃষ্ট এবং চির হতভাগ্য। এই বক্তব্যটি অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—'এবং তোমরা যদি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান করো, তবে তারা তোমাদের এ আহ্বানের অনুসরণ করবে না। তাদের অবস্থা সর্বদাই একই রকম থাকবে, তোমরা তাদের আহ্বান করো অথবা চুপ থাকো।'

এরপর বলা হয়েছে—'যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ'—এখানে 'যে সম্প্রদায়' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদেরকে। তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা এতোদিন ধরে তওরাত শরীফে শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণ পাঠ করে এসেছে। তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রচার করেছে। কিন্তু রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁকে দেখে, তাঁর মোজেজাসমূহ অবলোকন করে এবং পবিত্র কোরআনের বাণী শুনেও তাঁকে রসুল বলে স্বীকার করলো না। পিতা-মাতার চোখে আপন সন্তান যেমন অতি পরিচিত, তেমনি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তারা রসুল স. এর অনুসারী হলো না। প্রত্যাখ্যান করলো তাঁকে, তাঁর রেসালাতকে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে। এভাবে তারা হয়ে পড়লো জিহ্বা বের করে সকল সময় হাঁপাতে থাকা কুকুরের মতো নিকৃষ্ট। তওরাতের নির্দেশনা ও উপদেশ তাদের কোনোই উপকারে এলো না। উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের মতোন অন্য সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও আলোচ্য দৃষ্টান্তটির অন্তর্ভুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে—'তুমি কাহিনী বিবৃত করো যাতে তারা চিন্তা করে।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ইহুদীদের সামনে উপরে বর্ণিত বিবরণসমূহ বিবৃত করুন— যাতে তারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। এভাবে গভীর গবেষণার মাধ্যমে সদুপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। যেনো বিরত হয় ওই সকল ব্যক্তির অনুসরণ থেকে, যারা চির ভ্রষ্ট।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদের অবস্থা বুঝানোর জন্য। তারা আকাংখা করতো, যদি তাদের নিকট কোনো পথপ্রদর্শক প্রেরিত হতো, যদি কোনো আহ্বানকারী আহ্বান জানাতো আল্লাহ্‌র প্রতি। এরপর আবির্ভূত হলেন মহানবী মোহাম্মদ স.। তিনি যে

সত্যবাদী, তাও তারা জানতো। কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাঁর রেসালাতের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো তারা। কিছুতেই তারা আসতে সম্মত হলো না হেদায়েতের পথে। তাদেরকে আহ্বান করা ও না করা হয়ে পড়লো সমার্থক।

পরের আয়াতে (১৭৭) বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কতো মন্দ।' এই আয়াতটি মর্মগত দিক থেকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অথবা এটি সম্পূর্ণ পৃথক বক্তব্যসমৃদ্ধ একটি আয়াত। আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পাপীদের কৃত পাপ তাদের উপরে আপতিত হয়। অত্যাচারীর অত্যাচার আত্মঅত্যাচারেরই নামান্তর। যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে প্রত্যাখ্যাত। তাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি ভোগ করবে মিথ্যাচারীরাই। হায়! কতোই না মন্দ তাদের পরিণতি।

এর পরের আয়াতে (১৭৮) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে বলা হয়েছে 'ফাহুয়াল মুহ্তাদী' (সে-ই পথ পায়)। পথ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনের শব্দরূপ। কিন্তু 'মাই ইউদ্বলিল' (যাকে বিপথগামী করেন) কথাটির 'বিপথ' অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন। শেষে বহুবচনকে প্রকাশ করা হয়েছে স্পষ্টরূপে এভাবে— 'উলায়িকা হুমুল খসিরূন' (তারাই ক্ষতিগ্রস্ত)। এভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হেদায়েতপ্রাপ্তদের পথ প্রকৃতপক্ষে একটিই (তৌহিদ, রেসালত, আখেরাত, তকদীর ইত্যাদি একই বিশ্বাসের বলয়ভূত)। তাই বলা হয়েছে—'ফাহুয়াল মুহ্তাদী'। এভাবে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে, সকল হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একটি একক সত্তার মতো। কারণ তাদের পথ এক। কিন্তু বিপথ ও কুপথের সংখ্যা অনেক। তাই ক্ষতিগ্রস্ত বিপথগামীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ— 'আলখসিরূন'।

আরেকটি বিষয় এখানে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, পথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতা— দু'টোই নির্ধারিত হয় আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে। আর হেদায়েত দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হেদায়েতের অধিকারী করে দেয়া। কেবল হেদায়েতের পথ বলে দেয়া বা বর্ণনা করা নয়। আল্লাহ্তায়ালা যাকে হেদায়েতের অধিকারী করে দেন, সে-ই লাভ করে সফলতা। মোতাজিলারা বলে, হেদায়েতের পথ বলে দেয়া বা পথের বিবরণ দেয়াই হেদায়েতে ইলাহীর অর্থ। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য তাদের অভিমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায়'—কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, হেদায়েত প্রাপ্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। যে হেদায়েতপ্রাপ্ত সে লাভ করবে আল্লাহ্তায়ালার অসংখ্য নেয়ামত। হেদায়েতপ্রাপ্তির মধ্যেই সেসকল বিষয়ের শুভসংবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেসকল কিছু বুঝতে এই একটি মাত্র ঘোষণাই যথেষ্ট যে— আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়।

একবার জাবিয়াহ্ নামক স্থানে হজরত ওমর ভাষণ দান করলেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর তিনি বললেন— মাইইয়াহ্ দিহিল্লাহু ফালা মুদ্বিল্লালাহু ওয়া মাইইউদ্বলিল্হু ফালা হাদিইয়ালাহ্ (আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে পথ প্রদর্শনের অধিকার কেউ রাখে না)।

ওই সমাবেশে বসেছিলো জনৈক খৃষ্টান, ইহুদী অথবা অগ্নি উপাসক আলেম। সে হজরত ওমরের ভাষণ শুনে কিছু বললো। হজরত ওমর তাঁর অনুবাদককে বললেন, কী বলছে লোকটি? অনুবাদক বললো, সে বলছে, আল্লাহ্ কাউকে বিপথগামী করেন না। হজরত ওমর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ই তোমাকে প্রবেশ করাবেন দোজখে। তোমরা কর প্রদানের মাধ্যমে সন্ধিবদ্ধ হয়েছো আমাদের সঙ্গে। নতুবা এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ কথা শুনে লোকটি সেখান থেকে উঠে চলে গেলো। তখন সমাবেশে তকদীর সম্পর্কে ভিন্নমতাবলম্বী আর কেউ রইলো না।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৭৯

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○

❒ আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদিগের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদিগের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাহাদিগের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না, ইহারা পশুর ন্যায়, না, উহা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়! তাহারাই উদাসীন।

এখানে 'জারা'না' অর্থ— সৃষ্টি করেছি। 'লি জাহান্নামা' অর্থ— জাহান্নামের জন্য। 'কাছিরম্ মিনাল্জিন্নি ওয়াল ইন্সি' অর্থ বহু জ্বিন ও মানবকে। আদি অন্তের সকল কিছু আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ব। তিনিই সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অসীম জ্ঞানের কারণে এ কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত যে, তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে অনেক জ্বিন ও মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে কথাটিই এখানে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।

হজরত আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জান্নাতীদেরকেও— যখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিলো (সকলে মিলে ছিলো আদি পিতা হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশে)। আর আল্লাহ্তায়ালা জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামীদেরকেও— যখন তারা ছিলো তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে। মুসলিম। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে সকল হাদিসে বলা হয়েছে, হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সকল সন্তানদেরকে বের করে নিয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার কথা।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসুল স. দু'টি লিখিত ফলক দু'হাতে নিয়ে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কি জানো, এই লিখিত দপ্তর দু'টো কী। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দয়া করে আপনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করুন। রসুল স. তাঁর ডান হাতের ফলকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই দপ্তরটি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে লিখিত। এর মধ্যে লেখা রয়েছে জান্নাতীদের নাম, পিতার নাম এবং গোত্রের নাম। এরপর শেষ করে দেয়া হয়েছে লিপিবদ্ধ করার কাজ। এই তালিকার মধ্যে আর কখনো সংযোজন বা বিয়োজন ঘটবে না। এরপর তিনি স. তাঁর বাম হাতের ফলকটি দেখিয়ে বললেন, এই দপ্তরটিও আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে লিখিত। দোজখীদের নাম, পিতৃপরিচয় ও গোত্র পরিচয় লেখা রয়েছে এর মধ্যে। এটাই দোজখীদের চূড়ান্ত তালিকা। এখানে সংযোজন বা বিয়োজনের আর অবকাশ মাত্র নেই। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তাহলে আমাদের কি আর কোনো আমল করার প্রয়োজন রয়েছে? জান্নাত ও জাহান্নামের সিদ্ধান্ত তো সুনির্ধারিত। রসুল স. বললেন, সোজা পথে চলতে থাকো। জান্নাতীদের শেষ জীবন হবে জান্নাতবাসীদের আমলের মতো— সারা জীবন ধরে সে যে আমলই করুক না কেন। দোজখীদেরও জীবন সাঙ্গ হবে দোজখীদের আমলের উপরে— সারা জীবন ধরে সে যে আমলই করুক না কেনো। এরপর তিনি স. তাঁর দু'হাতের দিকে ইশারা করলেন। তারপর লিখিত দপ্তর দু'টো কোথায় যেনো নিক্ষেপ করলেন (আমরা তার দিশা খুঁজে পেলাম না)। তারপর বললেন, তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান থেকে মুক্ত। জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ফয়সালা তিনি সুসম্পন্ন করেই রেখেছেন। তিরমিজি।

একটি প্রশ্নঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা খলাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন' (ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিনি)। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ালাক্বদ্ জারা'না লিজাহান্নামা কাছিরম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি' (আমি তো বহু জ্বিন ও

মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি)। আয়াত দু'টো পরস্পরবিরোধী নয় কি? যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো অসম্ভব। অথচ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত করা (আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা)। এই দ্বন্দ্বটির তবে সমাধান কী?

উত্তরঃ এখানে কোনো দ্বন্দ্ব আসলে নেই। মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে— তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর পরিচয় লাভ করবে। কিন্তু এ বিষয়টিও আল্লাহ্‌তায়ালার জানা যে, সবাই এরূপ করবে না। কেউ করবে কেউ করবে না। উদ্দেশ্য ও জানা— দু'টো পৃথক বিষয়। আর 'বহু মানুষ ও জ্বিনকে দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি' কথাটির অর্থও এ রকম নয় যে, তাদেরকে আমি সৃষ্টিই করেছি জাহান্নামের উদ্দেশ্যে। বরং কথাটির অর্থ হবে— আমি জানি অনেক মানুষ ও জ্বিন জাহান্নামের পথ ধরবে। যারা এ রকম করবে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে যারা কার্যকর করবে না— তাদের সৃজনের পরিণতি অবশ্যই জাহান্নাম। অন্য এক আয়াতে তাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন—'লা আমলাআন্না জাহান্নামা মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্‌নাসি আজমাঈ'ন (আমি অবশ্যই জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে অনেককে একত্রে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো)।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'আমি মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি'—আয়াতটি সাধারণ অর্থবোধক হলেও তা কেবল বিশেষ মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আয়াতটির আসল অর্থ হবে— আমি বিশেষ বিশেষ মানুষ ও জ্বিনকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে (আমার পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে) সৃষ্টি করেছি। আর কারা ওই বিশেষ মানুষ তা আল্লাহ্‌ আগে থেকেই জানেন। —এই অভিমতটি প্রমাণবিহীন এবং ভুল।

মোতাজিলারা বলে এখানে 'লি জাহান্নামা' শব্দটিতে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি পরিণতিপ্রকাশক। তাই কথাটির অর্থ হবে— আধিকাংশ মানুষ ও জ্বিনের পরিণতি হবে জাহান্নাম। সুতরাং জাহান্নামই যাদের সুনির্ধারিত পরিণতি তাদেরকে 'জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি'—এ রকম বলা অযৌক্তিক নয়। মোতাজিলারা পাপীদের গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়ের বাইরে সংঘটিত হয় বলে মনে করে। তাই তারা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোরআনের ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু তাদের এ রকম ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য বিবরণের বিপরীত। কারণ, কোরআনের বহুস্থানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, পুণ্য ও পাপ— কোনোটিই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়বহির্ভূত নয়।

এরপর বলা হয়েছে—'তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না, তারা পশুর মতো, না, পশু অপেক্ষাও অধিক মূঢ়!' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ওই জাহান্নামীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি আহরণের সকল সূত্র রুদ্ধ। তাদের হৃদয় রয়েছে বটে, কিন্তু সত্যকে অনুভব করতে তারা অসমর্থ। চোখও তাদের রয়েছে, কিন্তু সে চোখ সত্যদর্শন করতে অপারগ। তারা শ্রবণেন্দ্রিয়ধারীও, কিন্তু তা সত্যের আহ্বান শুনতে অক্ষম। পশুদের মতো তারা কেবল আহার, বিহার ও রতিকর্মসর্বস্ব জীবন যাপনে অভ্যস্ত। পশুরই মতো তারা। না, তাও নয়। তারা প্রকৃতপক্ষে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কারণ পশুরাও উপকার ও ক্ষতির প্রভেদ বোঝে। বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে ক্ষতিকর বিষয় থেকে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা জাহান্নামের পথে চলেছে— এ কথা বুঝতে পেরেও কেমন নির্বিকার। জ্ঞাতসারে জাহান্নামযাত্রার বিষয়টি এক আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে—'আপন সন্তানের পরিচয়ের মতো জানে তারা রসুলের পরিচয়, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে জুলুম ও অহমিকার কারণে।

কোনো কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী আবার স্বভাবজ জ্ঞানও পুরোপুরি বিনষ্ট করে ফেলে। হারিয়ে ফেলে সুস্থ বিবেচনাবোধ। অথচ তারা জানে না, সকল জ্ঞানবান মানুষের উপরে রয়েছে শরিয়ত প্রতিপালনের দায়িত্ব। পশুকুলের উপরে এ দায়িত্ব নেই। তাই পশুকুল অভিযুক্ত হবে না। কিন্তু মানুষ হবে। সুতরাং দায়-দায়িত্ববোধহীন উদাসীন মানুষ তো পশুর চেয়ে নিকৃষ্টই।

শেষে বলা হয়েছে— 'উলাইকা হুমুল গফিলুন' (তারাই উদাসীন) এ কথার অর্থ— বোধহীন, প্রকৃত দৃষ্টি ও শ্রুতিহীন যারা— তারাই প্রকৃত অর্থে উদাসীন। সৃষ্টিকুলের কেউই এ রকম উদাসীন নয়। সকল সৃষ্টি সর্বক্ষণ স্মরণমুখর। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ওয়া ইম্‌মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি' ('এমন কোনো বস্তু নেই যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসার তসবীহ্ পাঠ করে না)। আরো এরশাদ করেছেন— 'আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে আল্লাহ্ এমনই এক সত্তা যার জন্য আকাশ ও জমিনের মধ্যস্থিত সকলে সেজদা করে। এছাড়া সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পাহাড়, বৃক্ষ, পশু ও অধিকাংশ মানুষ তাঁকে সেজদা করে, অথচ অনেকের উপরে নির্ধারিত রয়েছে শাস্তি।'

মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, এক লোক আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করে নামাজের মধ্যে দোয়া করলো। আর একজন নামাজের মধ্যে 'আল্লাহ্' নামের স্থলে উচ্চারণ করলো 'রহমান'। তখন প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে বললো, তুমি কাফের। আমরা তো কেবল এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করি। তুমি (আল্লাহ্ ও রহমান) দু'জনকে সম্বোধন করলে কেনো? ওই দুইজনের কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❒ উত্তম নামসমূহ আল্লাহেরই, তোমরা তাঁহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

উত্তম নামসমূহ অর্থ গুণবত্তাপ্রকাশক নামসমূহ— যে নাম কেবল গুণ বা সিফাতকে প্রকাশ করে না, গুণধারীকে (আল্লাহ্কেও) নির্দেশ করে। আল্লাহ্তায়ালার সত্তাবাচক নাম এবং গুণবাচক নামের মধ্যে আবার যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। সত্তাবাচক নাম একটি। আর গুণবাচক নাম অনেক। কিন্তু সকল গুণবাচক নামই ওই এক পবিত্র সত্তাকে নির্দেশ করে। আরবী ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় আল্লাহ্তায়ালার অনেক গুণ প্রকাশক নাম রয়েছে। যেমন- খোদা, পরমাত্মা, বিশ্বাত্মা, পরম পুরুষ, বিধাতা, সুফী সম্প্রদায়দের মধ্যে ব্যবহৃত— ওয়াজিবুল ওজুদ (অনিবার্য অস্তিত্ব), ইল্লাতি তাম্মাহ্ (সকল কারণের কারণ) ইত্যাদি।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ওই নামগুলো স্মরণে রাখবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা বেজোড় ও একক পছন্দ করেন।

বোখারী ও মুসলিম কোনো একটি নির্দিষ্ট হাদিসে আল্লাহ্তায়ালার নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ করেন নি। কারণ, তাঁদের অভিমত হচ্ছে— একই হাদিসে নিরানব্বই নামের উল্লেখ নেই। 'আদ্দাওয়াত' গ্রন্থে তিরমিজি ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে এই নামগুলো স্মৃতিবদ্ধ করবে, সে বেহেশতে যাবে। সে নামগুলো হচ্ছে—

আল্লাহুল্ লাজি লা ইলাহা ইল্লাহুয়ার রহমানুর রহীমু, আল্ মালিকু, আল কুদ্দুসু, আস্ সালামু, আল্ মু'মিনু, আল মুহাইমিনু, আল-আমীনু, আল জ্বব্বারু, আল্ খফিদু, আর্ রফিয়ু, আল্ মুয়িয্যু, আল মুজিল্লু, আস্ সামীয়ু, আল্ বাসীরু, আল্ হাকামু, আল্ আদ্লু, আল্ লাত্বীফু, আল্ খবীরু, আল্ হালীমু, আল্ আজীমু, আল্ গফূরু, আশ্ শাকূরু, আল্ আলীয়্যু, আল্ কাবীরু, আল্ হাফীজু, আল্ মুক্বীতু, আল্ হাসীবু, আল্ জ্বলীলু, আল্ করীমু, আর্ রক্বীবু, আল্ মুজ্বীবু, আল্ ওয়াসিয়ু,

আল্ হাকীমু, আল্ ওয়াদূদু, আল্ মাজ্বীদু, আল-বায়িসু, আশ্ শাহীদু, আল্ হাক্বক্কু, আল্ ওয়াকীলু, আল্ ক্বাবীয়্যু, আল্ মাতীনু, আল্ ওয়ালীয়্যু, আল হামীদু, আল্ মুহ্সী, আল্ মুব্দী, আল্ মুয়ীদু, আল্ মুহ্য়ী, আল্ মুমীতু, আল্ হাইয়্যু, আল্ কাইয়্যুমু, আল্ ওয়াজ্বিদু, আল্ মাজ্বিদ, আস্ সমাদু, আল্ ওয়াহিদু, আল্ ক্বদিরু, আল্ মুক্বতাদিরু, আল্ মুক্বাদ্দিমু, আল্ মুআখ্খিরু, আল্ আওয়ালু, আল্ আখিরু, আজ্ জহিরু, আল্ বাত্বিনু, আল্ ওয়ালিয়্যু, আল্ মুতাআ'লী, আল্ বার্রু, আত্ তাওয়াবু, আল্ মুন্তাক্বিমু, আল্ আফুবু, আর্ রউফু, আল্ মালিকুল মুল্কি, জুল জ্বালালি ওয়াল্ ইকরম, আল্ জ্বামিয়ু, আল্ গনিয়্যু, আল্ মুগনী, আল্ মানিয়ু, আদ্ দ্বর্রু, আন্ নাফিয়ু, আন্ নূরু, আল-হাদী, আল্ বাদীয়ু, আল্ বাক্বী, আল্ ওয়ারিছু, আর্ রশীদু, আস্ সবুরু,

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নাম উল্লিখিত নামগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও নাম রয়েছে তাঁর। তবে উল্লিখিত নামগুলো উল্লেখের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যে এগুলো স্মরণে রাখবে সে জান্নাতে যাবে। তাই হয়তো রসুল স. এসকল নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিজি শরীফের মধ্যে যে নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে ২৭টি নাম এমন রয়েছে যা শব্দগত দিক দিয়ে পবিত্র কোরআনের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। সেগুলো হচ্ছে—

আল্ ক্বাবিদু, আল্ বাসিত্বু, আল্ খাকিদু, আর্ রফীয়ু, আল্ মুয়িয্যু, আল্ মুজিল্লু, আল্ আদ্লু, আল্ জ্বালীলু, আল্ বায়িছু, আল্ মুহ্সী, আল্ মুব্দী, আল্ মুয়ীদু, আল্ মুহ্য়ী, আল্ মুমীতু, আল্ ওয়াজ্বিদু, আল্ মাজ্বিদু, আল্ মুক্বাদ্ দিমু, আল্ মুআখ্ খিরু, আল্ ওয়ালীউ, জুল্ জ্বালালি ওয়াল ইক্রামি, আল্ মুক্বসিত্বু, আল্ মুগ্নী, আল্ মানিয়ু, আদ্ দ্বর্রু, আন্ নাফিয়ু, আল্ বাক্বী, আর্ রশীদু, আস্ সবুরু,

নিম্নের আয়াতের মধ্যে কতকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু তিরমিজি শরীফের বর্ণনায় তা উল্লেখ নেই। যেমন—

হুয়া খইরুঁও ওয়া আবক্বা, ইলাহুন শাকিরুন, রব্বুল আলামীন, আহাদুন, মালিকু ইয়াওমিদ্দীন, আল আয়্লা, আল আকরামু, খফিয়্যুন্, আ'লামু বিমান দ্বল্লা আন্ সাবীলিহি, ওয়া আয়্লামু বিল মুহতাদীন, আল্ ক্বরীবু, আন নাসীরু, আল ক্বদীরু, আল মুবীনু, আল খাল্লাক্বু, মুবতালিকুম, আল্ মূসিয়ু, আল্ মালিকু, আল্ কাফী, ফাত্বিরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, আল্ ক্বাইমু বিল ক্বিসত্বি। গাফীরুজ্জ জম্বি, ক্ববিলুত তওবি, শাদীদুল্ ইক্বাব, নিয়্মাল মাওলা, আল গলিবু আলা আম্রিহী, সারীয়ুল হিসাব, ফালিক্বুল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ফালিক্বুল ইসবাহ্, জ্বায়িলুল্ লাইলি সাকানা, আল্লামুল গুয়ুব, আলিমুল গইবি ওয়াশ্ শাহাদাতী, জুত্ তাওলি, জুন্ ইন্তিক্বম, রফিয়ুদ্ দারাজ্বাত, জুল্ আরশ্, জুল্ মায়ারিজ্ব, জুল্

ফাদ্বলিল্ আযীম, জুল্ কুওয়াতি, জুল্ মাগফিরাত, জামিয়ুন্ নাসি, লিইওয়ামিন লা রয়বা ফিহি, মুতিম্মু নিয়্মাতিহি, মুতিম্মু নূরিহি, আদুউল লিল্ কাফিরীন, ওয়ালীউল্ মু'মিনীনা, আল্ ক্বহিরু ফাওক্বা ইবাদিহি, আস্‌রাউল হাসিবীন, মুখরিজুল মাইয়্যেতা মিনাল্ হাইয়্যে, মুহ্‌মিল মাওতা, আরহামুর রহিমীন, আহ্‌কামুল হাকিমীন, খয়রুর রযিক্বীন, খয়রুল মাকিরীন, খয়রুল ফাতিহীন, মুখ্‌যিল কাফিরীন্, মুহিনু কাইদিল্ কাফিরীন, ফায়্আলুল্ লিমা ইয়ুরীদ, আল্ মুস্‌তায়ান, নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, আহ্‌লুত্ তাকওয়া, আহ্‌লুল্ মাগফিরাহ্, নিয়্মাল মাহিদুনা, রাব্‌বিন্ নায়্, মালিকিন্ নাস, ইলাহিন্নাস্, আক্বরবু ইলাইহি মিন্ হাব্‌লিল্ ওয়ারীদ, আল ক্বইমু আলা কুল্লি নাফ্‌সিম্ বিমা কাসাবাত্ আহাক্ব আন্ তাখ্‌শাহুল্ লাজি হুয়া আগনা ওয়া আক্বনা, ওয়াল্ লাজি হুয়া আমাতাঁওয়া আহ্‌ইয়া, ওয়াল্‌লাজি হুয়া আদ্বহাকা ওয়া আরশ, ওয়াল্ লাজি হুয়া আদহাকা ওয়া আরক্বা, ওয়াল্লাজি খলিক্বজ্ জাওজাইন্, আজ্ জাকারু ওয়াল উনছা, ওয়াল্ লাজি আহ্‌লাকা আদা নিল্ উলা, ওয়াল্ লাম্ ইয়াকুল্ লাহু ওয়ালাদুন্ (লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম্ ইয়া কুল্‌লাহু কুফুওয়ান আহাদ), ওয়ালাম্ ইয়াকুন্ লাহু শরীকুন্ ফিল মুলকি, ওয়ালাম ইয়া কুল্‌লাহু ওয়ালীউম্ মিনাজ্ জুল্‌লি, আল্‌লাজি আন্‌যালা আলা আবদিহিল্ কিতাবু, আল্‌লাজি বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন্, আল্‌লাজি ইয়াব্ সুত্বর রিযক্বা লিমাইইয়াশা, আল্ লাজি ইয়াবদাউল্ খলক্বা সুম্মা ইয়ায়িদুহু, আল্‌রাজি বিয়া দিহিল্ মুল্‌কু, আল্ লাজি বাআ'ছা ফিল্ উম্মিয়্যীনার রসুলা, লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্‌নি কুন্‌তু মিনাজ্ জলেমীন— এ আয়াতকে হাদীসের মধ্যে ইসমে আজম বলা হয়েছে। এ ছাড়াও কোরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সিফাত (গুণ) আরও বর্ণনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো নাম অন্য হাদিসের মধ্যে এরূপও এসেছে যা কুরআন মজীদের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়নি। যেমন— আল হান্নান, আল মান্নান, আল জাওয়াদুআল আজওয়াদ, আল ফারদু, আল বিতর, আসসাদিকু, আল জামীলু, আল ক্বাদীমু, আল বার্‌রু, আল ওয়াফী, আল আদিলু, আল মু'ত্বি, আল মুগীছু, আত তাইয়্যেবু, আত ত্বাহেরু, আল মুবারাকু, খলিক্বশ শামসি ওয়াল ক্বমার, আল মুনিরু, আর্ রফিক্ব, আত তিফলুস সগীর, জাবীরুল আজমুল কাবীর, কাবীরু কুল্লা কাবীবিন্, আল্লাজী নাফসী বি ইয়াদিহি ইত্যাদি। তারপর এটাও মনে করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ্‌র যে নামগুলো কোরআন মজীদে ও হাদিসে রয়েছে সেগুলো ছাড়া আল্লাহ্‌র আর কোনো নাম নেই। কেননা এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তওরাত শরীফে তাঁর এক হাজার নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

রসুল স. দোয়া করতেন— হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার সকল নামের মাধ্যমে, যা তুমি তোমার সত্তার জন্য নির্ধারণ করেছো এবং যেগুলো অবতীর্ণ করেছো কিতাবে, অথবা যে নাম সৃষ্টিকুলের কাউকে শিখিয়েছো কিংবা যে নামসমূহ তুমি বিশেষভাবে রেখে দিয়েছো তোমার অদৃশ্য জ্ঞানে।

উদ্ধৃত হাদিস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার নাম রয়েছে অসংখ্য। আমাদের কর্তব্য আমাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার সকল নামের উপরেই ইমান আনতে হবে। সে নাম আমরা জানি অথবা নাই-ই জানি।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।' এখানে উল্লেখিত 'ইলহাদ' বা 'লাহদুন' অর্থ বিকৃত করা বা সোজা পথ পরিত্যাগ করে বক্র পথে চলে যাওয়া, যা সত্য নয় তাকে সত্য বলে জানা। শব্দ দু'টো সমার্থক। যেমন 'ধর্মবিকৃতি ঘটিয়েছে' কথাটি 'আলহাদা ফিদ্দীন' অথবা 'লাহাদা ফিদ্দীন'— দুভাবেই প্রকাশ করা যায়।

এখানে 'যারা তাঁর নাম বিকৃত করে' বলে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। কারণ, তারা আল্লাহ্র নাম বিকৃত করে ওই বিকৃত নামে ডাকে তাদের প্রতিমাগুলোকে। এভাবেই তারা আল্লাহ্কে বানিয়েছে আল্লাত, 'আল আজিজ' কে বিকৃত করে বানিয়েছে আল উজ্জা এবং মান্নান থেকে বানিয়েছে মানাত। এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মুশরিকেরা তাদের দেবতাকে বলে 'ইলাহ্'। তাদের ওই বিকৃতিকেই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে 'যারা তাঁর নাম বিকৃত করে' কথাটির মাধ্যমে। হজরত ইবনে আব্বাস তার তাঁফসীরে বলেছেন, অভিধানজ্ঞগণ বলেছেন, আল্লাহ্র নাম বিকৃত করার অর্থ ওই সকল নামে আল্লাহ্তায়ালাকে ডাকা, যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ বা নির্ধারণ করেননি। যা কিতাবে এবং হাদিসে উল্লেখিত হয়নি। যেমন কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে বলে তাঁকে বলা যাবে— জাআদ (সুপ্রচুর দানশীল)। কিন্তু সখী (দাতা) বলা যাবে না তাঁকে— কারণ তা কোরআনে নেই। তেমনি তাঁকে আলীম (জ্ঞানী) বলা যাবে, কিন্তু বলা যাবে না আকেল (বুদ্ধিমান) ইত্যাদি।

আবার কোরআনে স্পষ্ট থাকলেও কতকগুলো বিশেষণে তাঁকে অভিহিত করা যাবে না। যেমন কোরআন মজীদে বলা হয়েছে— 'ইউখদিউনাল্লহা ওয়া হুয়া কদিউ'হুম' (তারা আল্লাহর সঙ্গে প্রতারণা করতে চায় অথচ তিনিই প্রতারণায় শ্রেষ্ঠ)। — এ রকম উল্লেখের কারণে আল্লাহ্কে কিছুতেই শ্রেষ্ঠ প্রতারক বলা যাবে না। উদ্ধৃত আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু আল্লাহ্তায়ালাকে শ্রেষ্ঠ প্রতারক প্রমাণ

করা নয়। বরং আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা প্রতারণা করো, আর যাই করো— কোনো দিক দিয়েই তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। কারণ তোমরা দুর্বল। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। দুর্বল প্রতারণা যেমন সবল প্রতারণার নিকটে পরাস্ত হয়, তেমনি আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় শক্তির কাছে পরাভূত হয় তোমাদের সকল প্রতারণা, সকল অপচেষ্টা।

আর একটি দৃষ্টান্তঃ এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া মাকারু ওয়া মাকারল্লহ্ ওয়াল্লহু খইরুল মাকিরীন' (তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, অথচ আল্লাহ্তায়ালাই উত্তম ষড়যন্ত্রকারী)। আয়াতে এ রকম উল্লেখ থাকলেও আল্লাহ্তায়ালাকে কখনোই অভিহিত করা যাবে না 'ষড়যন্ত্রকারী' বলে। কারণ ষড়যন্ত্রপ্রবণতা একটি দোষ। আর সকল দোষক্রটি ও সৌন্দর্যহীনতা থেকে তিনি চিরমুক্ত, চির পবিত্র। আয়াতটির মর্মার্থ আসলে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো প্রকার প্রচেষ্টাই সফল হবে না। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রও নয়। কারণ তোমরা ও তোমাদের ষড়যন্ত্র দুর্বল। আল্লাহ্তায়ালার অসীম শক্তিমত্তার বিরুদ্ধে তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র পরাভূত হবেই।

এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন আল্লাহকে বলা যাবে— 'ক্বইম বিল ক্বিসত্' (নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠিত), কিন্তু তাঁকে শুধু 'ক্বইম' (নিষ্ঠাবান) বলা যাবে না। বলা যাবে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। অথবা শুধু 'স্রষ্টা' (খালেক), কিন্তু 'বানর ও শূকরের স্রষ্টা'— এ রকম বলা যাবে না। কারণ এ রকম বলার মধ্যে রয়েছে অপবাদের গন্ধ। আবার এ রকমও বলা যাবে না যে— তিনি 'জায়েদ' নামের কোনো বাদশাহ্র চেয়ে বড়। এ রকম তুলনা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি তো অতুল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সমকক্ষহীন।

উপরের আলোচনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, স্বধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্তায়ালার কোনো নাম নির্ধারণ করা যাবে না। কেবল কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফে উল্লেখিত নাম সমূহের মাধ্যমে কেবল ভাবতে হবে আল্লাহ্কে। তওরাতে উল্লেখিত নামের মাধ্যমে ডাকা যাবে না। কারণ ইহুদীরা তওরাত বিকৃত করেছে। তবে যে সকল তওরাত বিশেষজ্ঞ রসুল স. এর নিকট আত্মসমর্পণ করে খাঁটি মুসলমান হয়েছিলেন, তারা যদি তওরাতে উল্লেখিত আল্লাহ্র কোনো নামের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তবে সে নামে তাঁকে আহ্বান করা যাবে। এ রকম ব্যক্তিত্ব ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম। হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আবু হোরায়রা প্রমুখ তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন তওরাতের অনেক তথ্য। আর সেগুলোকে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাসও করতেন।

উপরে বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— ওই সকল লোকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করো, যারা আল্লাহকে শরিয়ত সমর্থিত নামে ডাকে না, ডাকে বিকৃত নামে। এ রকম অর্থও দাঁড়াতে পারে কথাটির— আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নামসমূহ যারা মানে না, আল্লাহ্‌কে ডাকে তাদের স্বরচিত নামে, তাদের পরোয়া তোমরা কোরো না। তাদের বিদ্রূপবানকেও তোমরা উপেক্ষা করে চলো। যেমন তোমরা রহমান নামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে ডাকলে তারা ঠাট্টা করে বলে— আমরা তো রহমানে ইয়ামাসা ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না। আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনাটি এ রকমও হওয়া সম্ভব যে— হে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকেরা তাদের দেবতাকে আল্লাহ্‌র নামে ডাকে। তাদের ওই সম্বোধনের শব্দরূপটি দাঁড় করায় স্ত্রীলিঙ্গে। তোমরা সে কারণে মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লোক তোমরা। তারা অংশীবাদী। তোমরা বিশ্বাসী। সুতরাং বর্জন করো তাদেরকে। আল্লাহ্‌তায়ালাই তাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করবেন। তাই এই নাম বিকৃতির প্রতিফল হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮১

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ۝

❒ যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এক দল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়বিচার করে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, আতার বিবরণে রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে বলা হয়েছে মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের কথা।

কাতাদা বলেছেন, আমার নিকট এই তথ্যটি পৌছেছে যে, রসুল স. এই আয়াত পড়লে সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন এই আয়াত তোমাদের জন্য। তোমাদের সামনে যারা রয়েছে, তাদেরকেও (ইহুদীদের পূর্ব পুরুষদেরকেও) দেয়া হয়েছিলো এ রকম সাধুবাদ। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে— 'মুসার সম্প্রদায় থেকে একটি দল সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করবে এবং ন্যায়বিচার করবে।'

কালাবী বলেছেন, কোনো বিশেষ উম্মত এই আয়াতের লক্ষ্য নয়। বরং বিশেষ ও সাধারণ— সকল শ্রেণীর ও সকল যুগের ন্যায়বান বিশ্বাসীরাই এই আয়াতের বিবরণভূত। ইতোপূর্বে (১৭৯) আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিলো— 'আমিতো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।' আর এখানে এসে বলে দেয়া হলো জান্নাতীদের কথা— যারা ন্যায়ের পথপ্রদর্শক এবং ন্যায়বিচারক।

কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক যুগের ন্যায়বানদের ঐকমত্য নির্ভুল। ওই হাদিসের সঙ্গে রয়েছে এর সম্পর্ক যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সব সময় এমন একটি দল থাকবে, যে দল হবে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশের বিশুদ্ধ অনুগামী। অসহযোগী ও বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবেই একদিন এসে পড়বে কিয়ামত। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান ও মুগীরা বিন শো'বা থেকে। —এই অভিমতটি কিন্তু ভুল। আর আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে উদ্ধৃত হাদিসটির কোনো সম্পর্কও নেই। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দল থাকবেই— এ রকম কথা আলোচ্য আয়াতে নেই।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮২, ১৮৩

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ وَاُمْلِىْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ۝

❐ যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে তাহারা জানিতেও পারিবে না।

❐ আমি তাহাদিগের সময় দিয়া থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারবে না।' এখানে 'যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে' বলে নির্দেশ করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। বলা হয়েছে, তাদেরকে আমি ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো, কিন্তু তারা জানতেও পারবে না। আতা বলেছেন, 'তারা জানতেও পারবে না' কথাটির অর্থ— আমি তাদেরকে চরম পরিণতিতে পৌঁছাবো অত্যন্ত গোপনে— ফলে তারা বিষয়টি অনুমানও করতে পারবে না। কালাবী বলেছেন, কথাটির অর্থ— আমি তাদের স্বভাব আচরণ— সব কিছু তাদের দৃষ্টিতে করে দিবো শোভন। ফলে তারা আত্মপ্রসাদে মগ্ন থাকবে সব সময়। আর এদিকে আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যেতে থাকবো ধ্বংসের দিকে। জুহাক বলেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— তারা যতো নতুন পাপ করবে, আমি ততই তাদেরকে দান করবো নতুন নতুন নেয়ামত। আর এদিকে চলতে থাকবে তাদের ধ্বংসের

পথে নীরব অভিযাত্রা। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আমি তাদের সকল নেয়ামত দান করবো, কিন্তু ভুলিয়ে দেব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিন্তা। আর এভাবেই আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে নিয়ে যাবো বিনাশের দিকে কিন্তু তারা থাকবে বেখবর।

পরের আয়াতে (১৮৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।' এখানে 'আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি' কথাটির অর্থ— আমি তাদের পৃথিবীর আয়ু বাড়িয়ে দেই। কথাটির যোগসূত্র রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই' কথাটির সঙ্গে। ওই যোগসূত্রসহ বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— আমি তাদের বয়স বাড়িয়ে দেবো, তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে করে দিবো সুন্দর, ফলে পাপে পাপে ভরপুর হয়ে যাবে তারা। এভাবে অজ্ঞাতসারে তারা এগিয়ে যেতে থাকবে ধ্বংসের দিকে। 'আল্লাহ্র কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ'— এ কথায় বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার কৌশল অন্য কারো মতো নয়। অন্য সকল কৌশল সম্পর্কে তো ধারণা বা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আল্লাহ্র কৌশল অনুধাবন করতে অপারগ। এমন কি বিশ্বাসীরাও তাঁর কৌশলের পূর্ণ রহস্য সম্পর্কে অনবগত। কেননা তা আগমন করে নেয়ামতরূপে, যে নেয়ামতের নেপথ্যে প্রস্তুত রয়েছে বিনাশের অনিবার্য আয়োজন। হজরত ইবনে আব্বাস এ সম্পর্কে বলেছেন, কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— আমার গোপন পরিকল্পনা অত্যন্ত কঠোর, বলিষ্ঠ।

কোনো বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে যারা প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করার দরুণ অতর্কিত গজবের শিকার হয়েছিলো। এক রাতের মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো তারা।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এক রাতে রসুল স. আরোহণ করলেন সাফা পাহাড়ে। তারপর উচ্চকণ্ঠে নাম ধরে ধরে ডাকতে শুরু করলেন বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার প্রধানদেরকে। বললেন, হে অমুকের পুত্র অমুক। সাবধান হও। ইমান আনো এক আল্লাহ্র প্রতি। নয়তো অতি সত্বর তোমাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গজব। তাঁর এই উদাত্ত আহ্বান শুনে এতটুকুও বিচলিত হলো না সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। বরং বলাবলি করতে লাগলো, দেখেছো! তোমাদের সাথী মোহাম্মদ সারা রাত ধরে কীভাবে চিৎকার করে চলেছে। পাগল না হলে কী এ রকম কেউ করে। তাদের এ রকম অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ
يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ
عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝
مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

❑ তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদিগের সহচর উন্মাদ নহে; সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

❑ তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রতি এবং ইহার প্রতিও যে তাহাদিগের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করিবে!

❑ আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিপথগামী করেন তাহাদিগের কোন পথ প্রদর্শক নাই, আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

'আওয়ালাম ইয়াতাফাক্কারু' অর্থ তারা কি চিন্তা করে না। মা বিসাহিবিহিম মিন্ জিন্নাত্ অর্থ তাদের সহচর উন্মাদ নয়। এখানে 'সাহিবিহিম' (সহচর) অর্থ— রসুলুল্লাহ্ স.। জিন্নাত্ অর্থ জুনুউন্নাদ। মুবীন অর্থ— সুস্পষ্টরূপে ভীতির প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ যে ভীতিপ্রদর্শনকারী বা স্পষ্ট সতর্ককারীর কথায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই শেষে বলা হয়েছে— সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী (ইন্‌হুয়া ইল্লা নাজিরুম্‌মুবীন)।

পরের আয়াতে (১৮৫) বলা হয়েছে— তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি এবং তার প্রতিও যে, তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী সুতরাং এরপর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে!' সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিবেচনা ও আচরণের প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি, আল্লাহ্‌তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টির প্রতি এবং মানুষ যে মরণশীল, সে কথার প্রতি তারা অভিনিবেশী হয় না কেনো। এই বিশাল নিসর্গের সকল কিছুই তো আল্লাহ্‌তায়ালার একক সৃজনশীলতার প্রমাণ। সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসুল কোরআনের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ তাদেরকে জানিয়ে যাচ্ছেন সত্যের আহ্বান। অথচ তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে বলছে উন্মাদ। সামনে তাদের অনড় মৃত্যু। এ কথাও কি তারা ভেবে দেখে না! অনন্ত জীবনে মুক্তি পেতে হলে

মৃত্যুর আগেই আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং কোরআনকে যে নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে, সে কথাও কি তারা বুঝে না! রসুল ও কোরআনকে ছেড়ে তারা কার কথায় কোন্ কথায় বিশ্বাস করতে চায়!

এর পরের আয়াতে (১৮৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোনো পথ প্রদর্শক নেই, আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেন।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী স্বেচ্ছায় বিপথগামিতাকেই আরাধ্য করে নিয়েছে। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে বিপথগামী করেছেন। ছেড়ে দিয়েছেন পথ প্রদর্শকহীনভাবে। অবাধ্যতায় আবর্তমান উদ্ভ্রান্তের মতো তারা। আল্লাহ্পাকই তাদেরকে দিয়েছেন উদ্ভ্রান্তির সাময়িক অবকাশ।

হজরত কাতাদা থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, একবার কুরায়েশ নেতারা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি আমাদের আপনজন। বলো তো দেখি, কিয়ামত কখন হবে? ইবনে জারীর প্রমুখের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার হামল বিন আবী কুশাইর এবং শামুল বিন জায়েদ রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, হে মোহাম্মদ! তুমি তো দাবী করো যে তুমি নবী। তবে বলো, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৮৭, ১৮৮

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

❑ তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে! আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদিগের উপর আসিবে, তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ

অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জ্ঞাত নহে।'

❒ বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।'

এখানে কিয়ামত বুঝাতে 'আস্‌সাআ'ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি কিয়ামতের একটি প্রসিদ্ধ নাম। অকস্মাৎ এসে পড়বে বলে কিয়ামতকে বলা হয় সাআ'ত। কিয়ামতকে সাআ'ত বলার আরেকটি কারণ এই যে, কিয়ামতের পরক্ষণেই গ্রহণ করা হবে হিসাব। আর একটি কারণ— কিয়ামতের দিন হবে সুদীর্ঘ। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তা হবে মুহূর্তকাল মাত্র।

'আইয়্যানা মুরসাহা' অর্থ— কখন আসবে বা কখন শুরু হবে। হজরত ইবনে আব্বাস 'মুরসাহা' শব্দটির অর্থ করেছেন— মুনতাহা (সমাপ্তি)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই তা যথাকালে প্রকাশ করবেন; তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা।' হজরত কাতাদা বলেছেন, কিয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্‌পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। নিকটবর্তী ফেরেশতাবৃন্দ অথবা কোনো নবী রসুল—কাউকেই তিনি এ জ্ঞান দান করেননি।

'লা ইউজাল্লিহা লিওয়াক্বআতিহা ইল্লা হুয়া' অর্থ— শুধু তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ এই গোপন রহস্যটি তিনি কারো কাছেই উন্মোচন করবেন না।

'ছাকুলাত ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ— তা হবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। 'ছাকুলাত' অর্থ ভারী বা ভয়ংকর। আর ভারী বলে এর সঠিক দিনক্ষণ গোপন রাখা হয়েছে। জ্বিন মানুষ সকলেই এ বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভার ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণেই এই রহস্যটি রহস্যাচ্ছন্নই রাখা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবেই, তুমি এ বিষয়ে অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে।' ইল্লা বাগতাতান্ অর্থ— কিন্তু অকস্মাৎ, যখন সকল মানুষ থাকবে কিয়ামত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তখন কাপড় ক্রেতা বিক্রেতা ঠিক করতে থাকবে কাপড়ের মাপ-জোক। কিন্তু তারা তাদের কাজ শেষ করতে পারবে না। এসে পড়বে ভয়াবহ কিয়ামত। তখন এক লোক মেরামত করতে থাকবে তার পানির চৌবাচ্চা। কিন্তু তার পানি পান করার আগেই কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। কেউ দুগ্ধ দোহন করবে তার উষ্ট্রীর। কেউ মুখে তুলে নিবে আহার্যের লোকমা। কিন্তু তারা কেউই পান ও আহার করতে পারবে না। শুরু হয়ে যাবে মহাপ্রলয় (কিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকবে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু কিয়ামত শুরু হবে অতর্কিতে, হঠাৎ)।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মানুষ রাস্তায়, বাজারে, বৈঠকে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকবে, পরিশোধ করতে থাকবে পণ্যসামগ্রীর মূল্য, কিন্তু পণ্যসামগ্রী হস্তান্তর করার আগেই ফুৎকার দেয়া হবে শিংগায়। সে ভয়ংকর আওয়াজ শুনে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এক আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'মা ইয়ান্‌জুরুনা ইল্লা সাইহাতাঁও ওয়াহিদাতান' (এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানিনাদের)। তখন লোকেরা বাজারে কেনা-বেচা করতে থাকবে, কাপড় মাপতে থাকবে, উটনীর দুধ দোহন করতে থাকবে এবং ব্যস্ত থাকবে নানা কাজে। সহসা শুরু হবে ভয়াবহ মহাপ্রলয়। কেউ কাউকে কোনো অসিয়ত করতে পারবে না। ফিরতেও পারবে না স্বগৃহে।

'আজজুহুদ' গ্রন্থে হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বর্ণনা করেছেন। সহসা শুরু হবে কিয়ামত— তখন কিছু লোক কাপড় মাপতে থাকবে, কিছু লোক দোহন করতে থাকবে উটনীর দুধ। এরপর তিনি পাঠ করলেন— ফালা ইয়াস্‌তাত্বিউ'না তাওসিইয়াতাঁও ওয়ালা ইলা আহ্‌লিহিম ইয়ারজিউন (তারা অসিয়তও করতে পারবে না এবং বাড়ী ফিরেও যেতে পারবে না)।

হ্রস্বসূত্রে হজরত উকবা বিন আমের থেকে তিবরানী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে একটি ঢাল পরিমাণ ঘনকালো মেঘ পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। তারপর ওই মেঘ ক্রমশঃ প্রসারিত হতে হতে ঢেকে ফেলবে সম্পূর্ণ আকাশ। তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ঘোষিত হবে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।

ইয়াস্আলুনাকা কাআন্নাকা হাফিয়্যুন আ'নহা অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কিয়ামত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত মনে করে এ বিষয়ে তারা আপনার নিকট জানতে চায়। 'হাফিয়্যুন আ'নহা' অর্থ সবিশেষ অবহিত। বিশেষভাবে অবহিত বুঝাতেই এখানে 'হাফিয়্যুন আ'নহা' বলা হয়েছে। সাধারণভাবে অবহিত বুঝানো হলে হাফিয়্যুন শব্দটির পরে আন্হা শব্দটি ব্যবহারের আর কোনো প্রয়োজন পড়তো না।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে আনহা শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে ইয়াস্ আলুনাকা (প্রশ্ন করে) কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ ওই সকল লোক আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে এ কথা ভেবে যে, আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কোনো কোনো তাফসীরকার আবার বলেছেন, 'হাফিয়্যুন' শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে হাফাওয়াতুন থেকে। হাফাওয়াতুন অর্থ— মহানুভবতা, দয়ার্দ্রতা। কুরায়েশ নেতাদের কথায় এ রকম সুরই ধ্বনিত হয়েছিলো। তারা রসুল স. কে বলেছিলো, তুমি আমাদের মহানুভব স্বজন। অতএব আমাদেরকে বলে দাও কিয়ামত সংঘটিত হবে কখন?

এরপর বলা হয়েছে— বলো, 'এই বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকেরই আছে।' আলোচ্য আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে দু'বার। কিয়ামতের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ববহ করে তুলবার জন্যই করা হয়েছে এ রকম পুনরুল্লেখ।

শেষে বলা হয়েছে— 'কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।' এ কথার অর্থ— কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় সম্পর্কে আল্লাহ্পাক কাউকে কোনো কিছু জানাননি। তাই এ ব্যাপারে কেউ কোনো কিছু জানে না।

পরের আয়াতে (১৮৮) বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' 'লা আমলিকু লিনাফ্সি নাফ্আঁ'ও ওয়ালা দ্বর্রা ইল্লা মা শাআল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। এই উক্তিটি দাসত্বের (উবুদিয়াতের) চরম বহিঃপ্রকাশ। আর বাক্যটি গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান না রাখারই একটি প্রমাণ।

'লাস্‌তাকছারতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাসানিইয়াস্‌ সুউ' অর্থ— তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। অর্থাৎ— তোমরা দ্যাখো না কেনো, আমার উপরও তো বিপদ মুসিবত আসে। আমি যুদ্ধে পরাজিত হই। আবার কখনও হই বিজয়ী। অদৃশ্যের জ্ঞান যদি আমি রাখতাম, তবে পরাজয় আমাকে স্পর্শই করতো না। আমার জন্য আমি নির্ধারণ করতাম কেবল বিজয় আর বিজয়।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উদ্ধৃত বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— গায়েবের খবর যদি আমি জানতাম, তবে এ কথাটিও আমি জানতাম যে, আমি কখন মৃত্যুবরণ করবো। তাহলে আমি সবসময় ভালো কাজ করতাম। অকল্যাণের সঙ্গে রাখতাম সযত্ন ও সতর্ক দূরত্ব। বেঁচে থাকতাম সকল বিশৃঙ্খলা থেকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে এ রকম— কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, সে কথা যদি আমি জানতাম, তবে আমি তা অবশ্যই বলে দিতাম। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে অথবা অবিশ্বাস করতে। আর অবিশ্বাস করলে আমার তো কোনো ক্ষতি হতো না।

কেউ কেউ বলেছেন, 'মা মাস্‌সানিইয়াস্‌ সুউ' (কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতো না) বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বাক্যের সঙ্গে এ বাক্যের কোনো সংযোগ নেই। উক্তিটির মাধ্যমে মুশরিকদের ওই উক্তিটির প্রতিবাদ করা হয়েছে, যে উক্তির মাধ্যমে তারা রসুল স. কে উন্মাদ আখ্যা দিয়েছিলো। এখানে উদ্ধৃত উক্তিটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! ভুল বলেছো তোমরা। উন্মাদ আমি কস্মিনকালেও নই। যদি তাই হতাম তবে অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতোই করতো। কিন্তু কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করেনি। কারণ আমি যে আল্লাহ্‌র রসুল।

শেষে বলা হয়েছে— 'আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী'। এখানে 'আমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদবাহী বিশ্বাসীদের জন্য'— এ রকম বলাই ছিলো সমীচীন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সতর্ক করা হলেও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সেদিকে কর্ণপাত মাত্র করে না। তাই দেখা যায় সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ দ্বারা উপকৃত হয় কেবল বিশ্বাসীরাই। সে কথাটিই এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

❒ তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে কাল অতিবাহিত করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদিগের প্রতিপালক আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।'

❒ তিনি যখন তাহাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে যাহা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহের শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে হজরত আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁর বক্ষপিঞ্জর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হজরত হাওয়াকে, যাতে আদম তাঁর সঙ্গিনীর নিকট থেকে পান সঙ্গসুখ ও ভালোবাসা। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হলেন। ফলে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লেন হাওয়া। সে গর্ভ ছিলো অনায়াসে বহনযোগ্য— লঘু। এক সময় সে গর্ভ হয়ে উঠলো গুরুভার। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমাদেরকে যদি সুঠাম, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করো, তবে অবশ্যই আমরা হবো তোমার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

বাগবী লিখেছেন, কোরআন-ব্যাখ্যাতাগণ উল্লেখ করেছেন, হজরত হাওয়ার সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর অচেনা আগন্তুকের বেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হলো ইবলিস। বললো, তোমার উদরে কী? হজরত হাওয়া বললেন, জানি না। ইবলিস বললো মনে হয় কুকুর, শূকর বা অন্য কোনো পশু। যাই থাক— সমস্যা হচ্ছে,

বের হবে কিভাবে? নিম্নাঙ্গ দিয়ে বের হলে তো জীবন বিপন্ন হবেই। মুখ দিয়েও বের হয়ে আসতে পারে। না হলে পেট চিরে বের করতে হবে। এ কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন হজরত হাওয়া। তিনি স্বামীকে খুলে বললেন সব। হাওয়াকে একা পেয়ে আর একদিন এলো ইবলিস। বললো, আমি আল্লাহ্‌র এক বিশেষ বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। আমি দোয়া করলে তুমি সহজে মুক্তি পাবে গর্ভধারণের বিপদ থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে নিরাপদে সন্তান প্রসব করিয়ে দেবেন। যদি নিরাপদে সবকিছু হয় তবে জেনে নিও, আমার দোয়ার কারণেই তা হয়েছে। তখন তোমার সন্তানের নাম রেখো আব্দুল হারেছ। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের মধ্যে ইবলিস পরিচিত ছিলো হারেছ নামে। হজরত আদমের সঙ্গে দেখা হতেই হাওয়া তাঁকে খুলে বললেন সব। হজরত আদম বললেন, সম্ভবতঃ ওই লোকটিকে আমি চিনি। সে ইবলিস নয়তো! যখন নিরাপদে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন আদম হাওয়া দু'জনে ভাবলেন ওই লোকটি তবে ঠিক কথাই বলেছিলো। তাঁরা তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ।

কালাবী বলেছেন, ইবলিস হজরত হাওয়াকে বলেছিলো, আমি তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবো। আমার দোয়ায় তোমার পেট থেকে যদি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তবে তুমি তার নাম রেখো আমার নামে। হজরত হাওয়া বললেন, তোমার নাম কী? ইবলিস বললো, আল হারেছ। হারেছ যে ইবলিসের এক নাম সে কথা জানা ছিলো না হজরত হাওয়ার। তাই তাঁর সদ্যজাত সন্তানের নাম রাখলেন তিনি আব্দুল হারেছ।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অনেক সন্তান সন্ততির জননী হয়েছিলেন হজরত হাওয়া। হজরত আদম কারো নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্, কারো নাম রাখলেন ওবায়দুল্লাহ্। কারো আবদুর রহমান। কিন্তু শিশুরা অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলো। তাই তিনি তাঁর নবজাত এক সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ। সেই সন্তানটি বেঁচে গেলো।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব থেকে আহমদ, তিরমিজি ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হজরত হাওয়ার শিশুরা বেশীদিন বাঁচতো না। ইবলিস শুভাকাঙ্খীর বেশে তাঁকে পরামর্শ দিলো, এবার সন্তান জন্ম নিলে নাম রেখে দিয়ো আব্দুল হারেছ। তাই করলেন তিনি। নবজাতকের নাম রাখলেন আব্দুল হারেছ। সেই সন্তানটি বেঁচে গেলো। ইবলিসের কুমন্ত্রণাতেই এ রকম ঘটেছিলো। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেন, উত্তম ও বিরল (হাসান ও গরীব)।

বাগবী বলেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত হাওয়ার কাছে দু'বার এসেছিলো ইবলিস। আর দু'বারই ইবলিসের প্রতারণায় পতিত হয়েছিলেন তিনি। একবার জান্নাতে। আর একবার পৃথিবীতে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আদম প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। কিন্তু সে সন্তান মারা গেলো অল্পদিনের মধ্যে। পরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ইবলিস এসে বললো, কী নাম রেখেছেন? হজরত আদম বললেন, ভাবছি আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ বা এ রকম কিছু রাখবো। ইবলিস বললো, এ রকম নাম রাখলে মনে করেছেন আল্লাহ্ কি তাকে এখানে রেখে দিবেন। আবদুল্লাহ্ (আল্লাহর দাস) কে তো আল্লাহ্ নিয়েই যাবেন তাঁর কাছে। বরং আমার কথা শুনুন। বাচ্চার নাম রাখুন আবদুস্ শামস্। এ নাম রাখলে আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বেঁচে থাকবে শিশুটি। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া মিলে তখন তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আবদুস্ শামস্। বাগবী বলেছেন, এই বর্ণনাটির চেয়ে পূর্বের বর্ণনাগুলো অধিকতর শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (১৯০) বলা হয়েছে—'তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' এ কথার অর্থ— স্বামী-স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে দান করলেন পূর্ণাঙ্গ এক শিশু। কিন্তু তারা শিশুর নামকরণে প্রশ্রয় দিলো শিরিককে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো প্রকৃত অপ্রকৃত সকল শিরিক থেকে পবিত্র।

হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বিশ্বাসে ও আচরণে শিরিক কখনোই ছিলো না। কেবল সন্তান-বাৎসল্যের কারণে তারা সন্তানের নামের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন শিরিককে। ভেবেছিলেন, নামে আর কি আসে যায়। শিরিক থেকে আমাদের বিশ্বাস ও ইবাদত তো মুক্ত রয়েছেই।

আবদ বা গোলামের একটি অর্থ সেবক বা খাদেম। দাস বা বান্দা নয়। আবার রব (প্রতিপালক) শব্দটিও কখনো কখনো পিতা মাতা বা লালন পালনকারী অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তারা কেউই মাবুদ বা উপাস্য নয়। অর্থাৎ তাদেরকে কেউই আল্লাহ্ মনে করে না। বিনয় প্রকাশার্থে কেউ কেউ অতিথিকে বলে, নির্দেশ করুন। আপনার সেবার জন্য এই গোলাম হাজির। হজরত ইউসুফ আ. আজিজে মিসরকে বলেছিলেন— 'ইন্নাহু রব্বি আহসানা মাছওয়া' (তিনিই আমার মনিব, আমার উত্তম আশ্রয়)। হজরত ইউসুফের এ কথার উদ্দেশ্য এ রকম ছিলো না যে— আপনিই আমার উপাস্য প্রভুপ্রতিপালক। হজরত আদমও তাঁর সন্তানের নাম রেখেছিলেন এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে— যা বাহ্যতঃ শিরিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিরিক নয়। অবশ্যই নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবী। নবী-রসুল

মুহূর্তকালের জন্যও শিরিক করতে পারেন না। আর নবী বলেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অপ্রকৃত শিরিক থেকেও মুক্ত রাখার নিমিত্তে আয়াতে এ রকম স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছেন। এতে করে বরং ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার বিরল দয়া— যে দয়া লাভ করেন কেবল নবী-রসুলেরাই।

হজরত ইকরামা ও হাসান বলেছেন, এখানে 'তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' কথাটির অর্থ— আদম-হাওয়ার সন্তানেরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে। উদ্ধৃত বাক্যটির লক্ষ্য আদম-হাওয়া নন, মক্কার মুশরিকেরাই বাক্যটির লক্ষ্য। অন্যত্রও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ছুম্মাত্তাখাজতুম (অতঃপর তোমরা গ্রহণ করলে)। এখানে মদীনার ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে গো-বৎস পূজা এবং তওবার স্বজন-হননের কথা। কিন্তু মদীনার ইহুদীরা তো ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলোই না। জড়িত ছিলো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা।

হজরত আদম তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আবুল হারেছ অথবা আবদুল হারেছ। অথচ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ শুরাকাআ (তারা শিরিক করে)। এতে করে বুঝা যায়, এখানে হজরত আদম শিরিক করেছেন এ রকম বলা হয়নি। বলা হয়েছে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের শিরিক করার কথা। বাক্যটির কর্তা এখানে রয়েছে উহ্য। বহুবচনরূপী ক্রিয়ার সূত্রে এখানে উহ্য কর্তা বা কর্তাদেরকে সনাক্ত করতে হবে। এভাবে সনাক্ত করতে গিয়েই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে হজরত আদমকে শিরিকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত করা হয়েছে তার পরবর্তী সময়ের মুশরিক সন্তানদেরকে। মক্কার মুশরিকদেরকে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো আলেমের ধারণা, আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বক্তব্যের সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। এখানে মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করার কথা। আগের বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে— এ রকম বলা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ রকম হলে বুঝতে হবে, হজরত আদম এখানে কেবল লংঘন করেছিলেন নামকরণ সম্পর্কিত উত্তম বিধানটি। উত্তম নামের বদলে রেখেছিলেন অনুত্তম নাম। নবীদের জন্য এ রকম অনুত্তম কর্ম শোভনীয় নয় বলেই আল্লাহ্পাক এখানে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেছেন। আল্লামা সুয়ূ্যতি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত খলাক্বাকুম (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে মধ্যবর্তী কথাগুলোকে বাদ দিয়ে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করো।

বাগবী বলেছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত হাওয়ার কাছে দু'বার এসেছিলো ইবলিস। আর দু'বারই ইবলিসের প্রতারণায় পতিত হয়েছিলেন তিনি। একবার জান্নাতে। আর একবার পৃথিবীতে।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আদম প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। কিন্তু সে সন্তান মারা গেলো অল্পদিনের মধ্যে। পরের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ইবলিস এসে বললো, কি নাম রেখেছেন? হজরত আদম বললেন, ভাবছি আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ বা এ রকম কিছু রাখবো। ইবলিস বললো, এ রকম নাম রাখলে মনে করেছেন আল্লাহ্ কি তাকে এখানে রেখে দিবেন। আবদুল্লাহ্ (আল্লাহর দাস) কে তো আল্লাহ্ নিয়েই যাবেন তাঁর কাছে। বরং আমার কথা শুনুন। বাচ্চার নাম রাখুন আবদুস্ শামস্। এ নাম রাখলে আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন বেঁচে থাকবে শিশুটি। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া মিলে তখন তাঁদের সন্তানের নাম রাখলেন আবদুস্ শামস্। বাগবী বলেছেন, এই বর্ণনাটির চেয়ে পূর্বের বর্ণনাগুলো অধিকতর শুদ্ধ।

পরের আয়াতে (১৯০) বলা হয়েছে—'তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' এ কথার অর্থ— স্বামী-স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে দান করলেন পূর্ণাঙ্গ এক শিশু। কিন্তু তারা শিশুর নামকরণে প্রশ্রয় দিলো শিরিককে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তো প্রকৃত অপ্রকৃত সকল শিরিক থেকে পবিত্র।

হজরত আদম ও হজরত হাওয়ার বিশ্বাসে ও আচরণে শিরিক কখনোই ছিলো না। কেবল সন্তান-বাৎসল্যের কারণে তারা সন্তানের নামের মধ্যে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন শিরিককে। ভেবেছিলেন, নামে আর কি আসে যায়। শিরিক থেকে আমাদের বিশ্বাস ও ইবাদত তো মুক্ত রয়েছেই।

আবদ বা গোলামের একটি অর্থ সেবক বা খাদেম। দাস বা বান্দা নয়। আবার রব (প্রতিপালক) শব্দটিও কখনো কখনো পিতা মাতা বা লালন পালনকারী অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তারা কেউই মাবুদ বা উপাস্য নয়। অর্থাৎ তাদেরকে কেউই আল্লাহ্ মনে করে না। বিনয় প্রকাশার্থে কেউ কেউ অতিথিকে বলে, নির্দেশ করুন। আপনার সেবার জন্য এই গোলাম হাজির। হজরত ইউসুফ আ. আজিজে মিসরকে বলেছিলেন— 'ইন্নাহু রব্বি আহসানা মাছওয়া' (তিনিই আমার মনিব, আমার উত্তম আশ্রয়)। হজরত ইউসুফের এ কথার উদ্দেশ্য এ রকম ছিলো না যে— আপনিই আমার উপাস্য প্রভুপ্রতিপালক। হজরত আদমও তাঁর সন্ত-ানের নাম রেখেছিলেন এ রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে— যা বাহ্যতঃ শিরিক, কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিরিক নয়। অবশ্যই নয়। কারণ তিনি ছিলেন নবী। নবী-রসুল

মুহূর্তকালের জন্যও শিরিক করতে পারেন না। আর নবী বলেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে অপ্রকৃত শিরিক থেকেও মুক্ত রাখার নিমিত্তে আয়াতে এ রকম স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনা করেছেন। এতে করে বরং ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি আল্লাহ্তায়ালার বিরল দয়া— যে দয়া লাভ করেন কেবল নবী-রসুলেরাই।

হজরত ইকরামা ও হাসান বলেছেন, এখানে 'তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে' কথাটির অর্থ— আদম-হাওয়ার সন্তানেরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে। উদ্ধৃত বাক্যটির লক্ষ্য আদম-হাওয়া নন, মক্কার মুশরিকেরাই বাক্যটির লক্ষ্য। অন্যত্রও এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ছুম্মাত্তাখাজতুম (অতঃপর তোমরা গ্রহণ করলে)। এখানে মদীনার ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে গো-বৎস পূজা এবং তওবার স্বজন-হননের কথা। কিন্তু মদীনার ইহুদীরা তো ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলোই না। জড়িত ছিলো তাদের পূর্ব-পুরুষেরা।

হজরত আদম তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন আবুল হারেছ অথবা আবদুল হারেছ। অথচ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ শুরাকাআ (তারা শিরিক করে)। এতে করে বুঝা যায়, এখানে হজরত আদম শিরিক করেছেন এ রকম বলা হয়নি। বলা হয়েছে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের শিরিক করার কথা। বাক্যটির কর্তা এখানে রয়েছে উহ্য। বহুবচনরূপী ক্রিয়ার সূত্রে এখানে উহ্য কর্তা বা কর্তাদেরকে সনাক্ত করতে হবে। এভাবে সনাক্ত করতে গিয়েই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে হজরত আদমকে শিরিকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি। অভিযুক্ত করা হয়েছে তার পরবর্তী সময়ের মুশরিক সন্তানদেরকে। মক্কার মুশরিকদেরকে।

বাগবী উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো আলেমের ধারণা, আলোচ্য বাক্যটি একটি পৃথক বাক্য। আগের বক্তব্যের সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। এখানে মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করার কথা। আগের বাক্যের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে— এ রকম বলা হলেও কোনো ক্ষতি নেই। এ রকম হলে বুঝতে হবে, হজরত আদম এখানে কেবল লংঘন করেছিলেন নামকরণ সম্পর্কিত উত্তম বিধানটি। উত্তম নামের বদলে রেখেছিলেন অনুত্তম নাম। নবীদের জন্য এ রকম অনুত্তম কর্ম শোভনীয় নয় বলেই আল্লাহ্পাক এখানে বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত খলাক্বাকুম (সৃষ্টি করেছেন) কথাটির সঙ্গে। এ রকম হলে মধ্যবর্তী কথাগুলোকে বাদ দিয়ে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করো।

সবশেষে বলা হয়েছে—'কিন্তু তারা যাতে শরীক করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।' বাগবী লিখেছেন, এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— তারা যাকে শরীক করে। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে নিষ্পাপ সন্তান-সন্ততি দান করেন। অথচ তারা তাদেরকে বানায় ইহুদী এবং খৃষ্টান। আল্লাহ্পাকের সঙ্গে শরীক করে তারা— যা থেকে আল্লাহ্তায়ালা অনেক উচ্চে।

ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'তারা যাকে শরীক করে বলে নির্দেশ করা হয়েছে ওই সকল কাফেরের প্রতি, যারা তাদের সন্তানের নাম রাখতো আবদুল উজ্জা, আবদুল লাত, আবদুল মানাত, আবদুস শামস ইত্যাদি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইকরামা এবং হাসান আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন ভিন্নরূপে। তাদের ব্যাখ্যাটি এ রকম— আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সহধর্মিনীকে। তারপর তাদের মিলনের ফলে প্রবহমান হতে শুরু করলো মানুষের বংশপ্রবাহ। কিন্তু অনেক মানুষ সেই অতুলনীয় ও এক সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে শরীক করলো অন্যকে। এই তাফসীরটি হজরত ইবনে আব্বাস হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ এবং প্রখ্যাত তাফসীরকারগণের অনুকূল নয়। কিন্তু আমি মনে করি এই তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও সঠিক। নিম্নে এই অভিমতটির প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো—

আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম ও হাওয়াকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সেই নিষেধাজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের ওই ভুলের জন্য তাঁদেরকে ভর্ৎসনাও করা হয়েছিলো। যেমন, একস্থানে বলা হয়েছে— 'ওয়াআ'সা আদামু রব্বাহু ফা গাওয়া' (আর আদমকে তার প্রতিপালক ভর্ৎসনা করলেন, এতে তিনি হলেন বিব্রত)। হজরত আদম ও হজরত হাওয়া তখন তাঁদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁরা দোয়া করেছিলেন— 'রব্বানা জলামনা আংফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ ফিরলানা ওয়াতার হামনা লা নাকুন্নানা মিনাল খসিরীন' (হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা তো আমাদের সত্তার উপর অত্যাচার করেছি। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করলে আমরা তো হবো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের বিস্মৃতি মার্জনা করেছিলেন। তারপর ঘোষণা দিয়েছিলেন— অতঃপর আল্লাহ্ আদমকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দান করলেন এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে গ্রহণ করলেন পথপ্রদর্শক হিসেবে। বিস্মৃতি ক্ষমা করা সত্ত্বেও হজরত আদম ও হাওয়া তাঁদের ভুলের স্মৃতিচারণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বোখারী ও মুসলিমে এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, হায়! এখন আমরা যদি কোনো সুপারিশকারী পেতাম, তবে সেই সুপারিশকারী আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে আমাদেরকে এই অসহনীয় অবস্থা

থেকে মুক্ত করতে পারতেন। সকলে তখন হজরত আদমের নিকট সমবেত হয়ে বলবে, আপনি সকল মানুষের পিতা। আল্লাহ্‌তায়ালা অলৌকিক হস্তদ্বারা সৃজন করেছেন আপনাকে। দিয়েছিলেন জান্নাতে বসবাসের অধিকার। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে ফেরেশতাদের সেজদার মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। আপনাকে শিখিয়েছেন সকল কিছুর নাম। অতএব আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে সুপারিশ করে আপনার সন্তানদেরকে এই কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। হজরত আদম তখন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কথা মনে করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবেন— যদিও সে ভুল মার্জনা করা হয়েছিলো। কিন্তু তখন তিনি সন্তানের শিরিকমিশ্রিত নাম রাখা সম্পর্কিত ভুলটির কথা স্মরণ করবেন— এ রকম কোনো বর্ণনা নেই। অথচ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা অপেক্ষা দ্বিতীয় অপরাধটি অধিক মারাত্মক। দ্বিতীয় অপরাধটির মার্জনা সম্পর্কিত বিবরণও কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আলোচ্য আয়াতে হজরত ইকরামা ও হাসানকৃত তাফসীরটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَ
لَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

❒ তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট,

❒ উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং উহাদের নিজদিগকেও নহে।

❒ তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহ্বান কর বা চুপ করিয়া থাক তোমাদিগের পক্ষে উভয়ই সমান।

❒ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগের ন্যায় দাস; তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাহারা তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিক্।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।' এ কথার অর্থ— মুশরিকরা উপাসনা করে স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাগুলোর— যেগুলো নিষ্প্রাণ ও সৃজনক্ষমতাহীন। ওই বাতিল উপাস্যগুলো ও সেগুলোর উপাসকেরাও সৃষ্ট। আর প্রতিমাগুলো তো কেবল সৃষ্টই নয়, সৃষ্টদের দ্বারা সৃষ্ট।

পরের আয়াতে (১৯২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়।' এ কথার অর্থ— মুশরিকদের পূজনীয় প্রতিমাগুলো তাদেরকে সাহায্য করবে কিভাবে, তারা নিজেরাই তো নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাদেরকে আঘাত করলে বা ভেঙে ফেললে প্রতিবাদ বা প্রতিহত করার শক্তিও তারা রাখে না।

এর পরের আয়াতে (১৯৩) বলা হয়েছে—'তোমরা তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো বা চুপ করে থাকো তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে আহ্বান করলেও তারা তোমাদের কথা মানবে না। সুতরাং তোমাদের আহ্বান করা বা চুপ থাকা দু'টোই সমান।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুশরিকদেরকে। বলা হয়েছে, হে অংশীবাদীর দল! তোমরা তোমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে অনন্তকাল ধরে ডাকলেও তারা তোমাদের কথা শুনবে না। তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অতএব তোমাদের ডাকা বা চুপ থাকা একই কথা।

উল্লেখ্য যে, প্রতিমা পূজকেরা প্রতিমাগুলোর সামনে তাদের প্রার্থনা পূরণের উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে থাকতো। মুখে কিছুই বলতো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তোমাদের নীরব ও সরব প্রার্থনা একই রকম গুরুত্বহীন, নিষ্ফল।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (১৯৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান করো তারা তো তোমাদের ন্যায় দাস; তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদীরা! চরমতম মূর্খ তোমরা। তাই বোঝো না, তোমরা যে দেব-দেবীর নিকট প্রার্থী হও তারা তো তোমাদেরই মতো আল্লাহ্তায়ালার দাস। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ করো যে, তোমাদের আহ্বানে তোমাদের ওই জড়পদার্থ নির্মিত দেব-দেবীগুলো সাড়া দিচ্ছে।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে ফেরেশতা-পূজারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান করো' কথাটির অর্থ হবে এখানে— আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল ফেরেশতাদের পূজা তোমরা করো। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যাটির চেয়ে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ কথাটির অর্থ— হে অংশীবাদীরা! তোমরা আদৌ সত্যবাদী নও। যদি হতে তবে কখনোই এ রকম জড়তার পূজারী হতে পারতে না। তোমরা রক্ত মাংসের মানুষ আর তোমাদের উপাস্যগুলো জড়পদার্থ নির্মিত। যদি তোমাদের উপাস্যগুলো উন্নতও হয়, তবে হয়তো হবে জীবন্ত মানুষের মতো সচেতন ও বিবেচক। এ রকম হলেও তো সেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কারণ যারা মুখাপেক্ষিতার দিক থেকে নিম্নস্তরের অথবা সমান্তরাল তারা সর্বাবস্থায় উপাস্য হওয়ার যোগ্যতারহিত। উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাধারী কেবল ওই পবিত্র ও অতুলনীয় সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী কিংবা সমান্তরাল নন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا
تُنظِرُونِ ○ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ○ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ○ وَإِن
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

❒ তাহাদিগের কি চলিবার পা আছে? তাহাদিগের কি ধরিবার হাত আছে? তাহাদিগের কি দেখিবার চক্ষু আছে? কিংবা তাহাদিগের কি শ্রবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, ‘তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহের শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

❒ ‘আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদিগের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।’

❒ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদিগের নিজদিগকেও নহে।

❒ যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে কিন্তু তাহারা দেখে না।

উদ্ধৃত আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'তাদের কি চলবার পা আছে? তাদের কি ধরবার হাত আছে? তাদের কি দেখবার চক্ষু আছে? কিংবা তাদের কি শ্রবণ করবার কর্ণ আছে?' এ কথার অর্থ— ওই সকল প্রতিমার পা, হাত, চোখ, কান— কিছুই নেই। এরপরেও হে মূঢ় অংশীবাদীরা! তোমরা ওগুলোর উপাসনা করে চলেছো কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'ছুম্মা কীদুনী ফালাতুনযিরুন' (বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছো তাদেরকে ডাকো ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে অংশীবাদী নেতা ও জনতা! তোমরা উত্তমরূপে অবগত হও যে, আমি মহাবিশ্বের মহাঅধীশ্বর এক আল্লাহ্র উপাসক। সুতরাং আমি তোমাদের ও তোমাদের বাতিল উপাস্যগুলোর কোনোই পরোয়া করি না। তোমরা তোমাদের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র বিরতিহীনভাবে চালিয়ে যাও। আমি ওগুলোকে তো আমলেই আনি না।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে (১৯৬)—'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই আমার অভিভাবক ও রক্ষক। তিনি আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কোরআন। তিনি সকল নবী এবং রসুলেরও অভিভাবক ও সংরক্ষক।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করে না, তার সহায়ক স্বয়ং আল্লাহ্। শত শক্রর শক্রতাও তার অনিষ্ট করতে অসমর্থ।

এর পরের আয়াতে (১৯৭) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান করো তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়।'

শেষে উদ্ধৃত আয়াতটিতে (১৯৮) বলা হয়েছে— 'যদি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করো তবে তারা শুনবে না এবং তুমি দেখতে পাবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তারা দেখে না।' 'এখানে লা ইয়াছমাউ অর্থ— শ্রবণ করবে না। 'ওয়াতারাহুম' অর্থ— আর তুমি তাদেরকে দেখবে। অংশীবাদীরা তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোর কান, চোখ— সবই নির্মাণ করে। মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, সেগুলো যেনো তাকিয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতো শ্রবণেন্দ্রিয়হীন এবং দৃষ্টিক্ষমতারহিত। তাই এখানে বলা হয়েছে— মুশরিকদের প্রতিমাগুলো শ্রুতিশক্তিহীন, দৃষ্টিহীন। হে আমার রসুল! সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে সেগুলো যেনো তোমাকে দেখছে। কিন্তু সেগুলোতো দেখতেই পায় না।

হাসান বসরী বলেছেন, 'এখানে শুনতে পায় না' ও 'দেখতে পায় না'— কথা দু'টোর লক্ষ্য হচ্ছে অংশীবাদীরা। এভাবে আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান জানালেও তারা তা বিশ্বাসের সঙ্গে শুনবে না। দেখবেও না বিশ্বাসের সঙ্গে। তাকিয়ে থাকবে শুধু। কিন্তু সে দৃষ্টিতে থাকবে না সত্যানুরাগের ন্যূনতম কোনো চিহ্ন।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ১৯৯, ২০০

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

❒ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর।

❒ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহের শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর রসুলকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, হে আমার রসুল! আপনি মানুষের প্রতি প্রদর্শন করুন ক্ষমাপরায়ণতা। সাদরে গ্রহণ করুন তাদের অপরাগতা ও অনুযোগকে। সহজসাধ্য আমলের উপরেই তাদেরকে স্বস্তি পেতে দিন। বিব্রতকর কোনো প্রশ্ন তাদেরকে করবেন না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির মাধ্যমে পাপিষ্ঠদেরকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের ঘনিষ্ঠ সহচর ও পরামর্শদাতা ছিলো হুর বিন তাইয়াস। হুরের পিতৃব্য উয়াইনা বিন হুসাইন বিন হুজায়ফা একবার তাকে বললো, হে পিতৃব্য পুত্র! যে কোনো উপায়ে তুমি আমাকে খলিফা হজরত ওমরের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দাও। খলিফার অনুমতিক্রমে সাক্ষাতের দিন ধার্য হলো। নির্দিষ্ট দিনে খলিফার সামনাসামনি হতেই ওয়াইনা বিন হুসাইন বললো, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি দান করো না। ন্যায় বিচারও করো না। এ কথা শুনে হজরত ওমর ভয়ানক রেগে গেলেন। কঠোর কোনো নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। তখন হজরত হাসান বলে উঠলেন, 'হে আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ্তায়ালা

তাঁর রসুলকে লক্ষ্য করে বলেছেন— 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করো।' এই আয়াত শুনে সংযত হলেন হজরত ওমর। বুঝলেন, কটুভাষী এ লোকটিকে উপেক্ষা করতে হবে। কারণ সে অজ্ঞ।

হজরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামত সম্পর্কিত হাদিসে রসুল স. জানিয়েছেন, সেদিন হিসাবের জন্য সমবেত করা হবে সকল মানুষকে। অসহনীয় ওই পরিস্থিতিতে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে— আল্লাহ্‌র দায়িত্বে যাদের বিনিময় রয়েছে, তারা দাঁড়াও এবং বেহেশতে প্রবেশ করো। লোকেরা বলাবলি করবে, আল্লাহ্‌র দায়িত্বে আবার কার বিনিময় রয়েছে। ঘোষক বলবে— আল্লাহ্‌র দায়িত্বে যে বিনিময় রয়েছে তা হচ্ছে ক্ষমা। এ কথা শুনে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে যাবে এবং দল বেঁধে সকলে প্রবেশ করবে জান্নাতে। উত্তম সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

এক বর্ণনায় এসেছে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রসুল স. হজরত জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভ্রাতঃ। এই নির্দেশনাটির মর্মার্থ কী? হজরত জিবরাইল বললেন, জানি না। আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ে পরে আপনাকে জানাবো। কিছুক্ষণ পর হজরত জিবরাইল পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বললেন, হে রসুল! আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার উম্মতকে এই আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তোমরা তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করো। যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেছে তোমরা তাদেরকে দান করো। ক্ষমা করে দাও তাদেরকে যারা তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। জাবের, ইবনে আবীদ্ দুন্ইয়া, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও শা'বী থেকে ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত উবাই বিন কাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে আপন অবস্থানকে উন্নত করতে চায় তার কর্তব্য হচ্ছে, সে যেনো ক্ষমা করে দেয় তার অধিকার খর্বকারীকে এবং সম্পর্ক স্থাপন করে সম্পর্কচ্ছেদকারী আত্মীয়ের সঙ্গে। এই হাদিসের সূত্র অবশ্য বিপর্যস্ত। হাকেম।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিয়মিত দান করলেই নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা হয় না। সম্পর্কচ্ছেদকারী আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হলেই তাকে বলা যেতে পারে আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষাকারী। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর দরবারে এসে এক ব্যক্তি একবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয় রয়েছে যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে— তবুও আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। আমি তাদের উপকার করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। আমি তাদের জন্য ধৈর্যধারণ করি কিন্তু তারা করে আমার সঙ্গে নির্বোধজনোচিত আচরণ। রসুল স. বললেন, তুমি যেমন বললে সে রকমই যদি তোমার আচরণ হয়ে থাকে, তবে তো তাদের গরম পাত্রে ঘি ঢালছো। (এ রকম আচরণ করার কারণে তোমার সঙ্গে থাকবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নেয়ামত ও সাহায্য, যে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে তোমার ওই আত্মীয়েরা)। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক এবং কালাবী এই আয়াতের মর্মার্থ করেছেন এ রকম— হে রসুল! আপনি মানুষের নিকট থেকে তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ নিয়ে নিন। অন্য এক আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন— তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কি দিবো? আপনি বলে দিন, পরিবার-পরিজনের নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বাদে যা অতিরিক্ত থাকবে— সবই। জাকাত ফরজ হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হলে এই আয়াতটি অবশ্য রহিত হয়ে যায়।

'ওয়া' মুরু বিল মা'রুফ' কথাটির অর্থ— শরিয়ত ও জ্ঞানের দিক থেকে যা উত্তম তার নির্দেশ দিন। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখলে হাতের দ্বারা বাধা দিয়ো। না পারলে বাধা দিয়ো কথার মাধ্যমে। তাও যদি না পারো, তবে ওই মন্দ কর্মকে ঘৃণা কোরো অন্তর থেকে। আর এটাই হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম স্তর। মুসলিম।

হজরত হুজায়ফার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার জীবনাধিকারী ওই পবিত্র সত্তার শপথ তোমরা উত্তমকর্মের নির্দেশ দিয়ো। মানুষকে বিরত রেখো মন্দকর্ম থেকে। নতুবা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তি। তোমরা তখন দোয়া করবে। কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। তিরমিজি।

ওয়া আ'রিদ্ব আ'নিল জাহিলীন অর্থ— এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করো। অর্থাৎ মূর্খদের সঙ্গে সমান্তরাল আচরণ কোরো না। উপেক্ষা করো নির্বোধদেরকে। অন্য একটি আয়াতেও এ রকম বলা হয়েছে। যেমন 'ওয়া ইজা খত্বাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বলু সালামা' (আর যখন নির্বোধেরা আহ্বান করে, বলে দাও সালাম)।

ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সকল পয়গম্বরকে সর্বোত্তম স্বভাব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জনের উত্তমতম নির্দেশনা।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় রয়েছে রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌ আমাকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কর্মপ্রণালীর পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরণ করেছেন।

জননী আয়েশার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. কখনও অশ্লীল কথা বলতেন না। অশ্লীল কথাকে পছন্দও করতেন না। বাজারে গিয়ে কাউকে চিৎকার করেও ডাকতেন না, মন্দের মাধ্যমে কখনও গ্রহণ করতেন না মন্দের প্রতিশোধ। বরং তিনি মার্জনা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন। তিরমিজি, বাগবী।

পরের আয়াতে (২০০)বলা হয়েছে— 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' 'নাজগুন' শব্দটির অর্থ আংগুলের অগ্রভাগ দিয়ে কোনো কিছু অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া বা ঠুকে দেয়া। এখানে শব্দটির অর্থ হবে অনুপ্রাণিত করা, প্ররোচিত করা বা কুমন্ত্রণা দেয়া। তাই বলা হয়েছে— 'ওয়া ইম্মা ইয়ানযাগান্নাকা মিনাশ্‌শাইত্বনি নাজগুন' (যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে)। এখানে 'ইম্মা' শব্দটির 'মা' অতিরিক্ত।

আবদুর রহমান বিন জায়েদ বর্ণনা করেছেন, যখন 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো' (১৯৯) আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন রসুল স. বললেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমি যদি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ি, তখন কী করবো? তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতটি— যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করবে।

'ফাস্‌তায়িজ বিল্লাহ্‌' অর্থ— আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করলে কী হবে— সে কথাটি এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য কথাটি হচ্ছে— তখন আল্লাহ্‌তায়ালা শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণাকে অপসারিত করে দিবেন।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাহু সামিউ'ন আ'লীম' (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— শয়তানের প্ররোচনা থেকে পরিত্রানের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার শরণপ্রার্থী হলে তিনি নিশ্চয়ই সে কথা শুনবেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর কীভাবে আপনার কার্য সমাধা হবে, সে কথাও তিনি উত্তমরূপে অবগত। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা বলে তিনি আপনার প্রার্থনা যেমন শোনেন, তেমনি তিনি সর্বজ্ঞ বলে

আপনার বিরুদ্ধবাদীদের অসৎ কর্মকাণ্ডের খবরও রাখেন। তাই তিনি নিজেই তাদেরকে শায়েস্তা করবেন। আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শয়তানের প্ররোচনাকে প্রশ্রয় দিয়ে আপনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো বদলা নিতে যাবেন না।

সুরা আ'রাফঃ আয়াত ২০১, ২০২

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ○ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ○

❐ যখন যাহারা সাবধান হয় তাহাদিগকে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের চক্ষু খুলিয়া যায়।

❐ তাহাদিগের সংগী-সাথীগণ তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উন্নততর জ্ঞান দান করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা সাবধানী, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।' এ কথার অর্থ— সাবধানীদেরকে (মুত্তাকীদেরকে) পথচ্যুত করার জন্য শয়তান সব সময় চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলেই তাঁরা হয়ে উঠেন আত্মসচেতন। তৎক্ষণাৎ অন্তরচক্ষু খুলে যায় তাঁদের। সে অন্তর্দৃষ্টির সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে শয়তানের প্ররোচনার কৌশল ও তত্ত্ব। তাই তাঁরা সহজেই আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন ওই প্ররোচনা থেকে।

সুদ্দী বলেছেন, পদস্খলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সাথে সাথেই মুত্তাকীরা হয়ে ওঠেন পূর্ণ সচেতন। মুকাতিল বলেছেন শয়তানের প্ররোচনা সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হন সাবধানীরা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি। তাই সহজেই তারা মুক্ত হতে পারেন আল্লাহ্‌র নির্দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'শয়তান' অর্থ— শয়তানের সমাজ বা শয়তানের দল। যেমন, 'মানুষ' অর্থ— মনুষ্যকুল।

পরের আয়াতে (২০২) বলা হয়েছে, 'তাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোনো ত্রুটি করে না।' এখানে 'ইখওয়ানুহুম' অর্থ শয়তানের ভাই। অর্থাৎ ফাসেক ও পাপিষ্ঠ লোক সকল। কিংবা

সকল শয়তান। পাপিষ্ঠরা যেহেতু সাবধানী নয়, তাই তারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয় সহজেই। এভাবে আমস্তক ডুবে যায় পাপের গহ্বরে।

ছুম্মা লা ইয়ুক্বসিরুন অর্থ— এ বিষয়ে তারা কখনো ত্রুটি করে না অর্থাৎ পাপাচারীরা বিরত থাকে না পাপ থেকে। কারণ তারা অন্তর্দৃষ্টিবিবর্জিত এবং অসচেতন। তাদের অবস্থা মুত্তাকীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ রকম বলেছেন জুহাক ও মুকাতিল। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে— তারা শয়তানকে বিরত রাখে না প্ররোচনা দান থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন কথাটির অর্থ— পাপীরা বিরত থাকে না পাপ থেকে এবং শয়তানও বিরত থাকে না প্ররোচনা প্রদান থেকে।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৩

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

❒ তুমি যখন তাহাদিগের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর না তখন তাহারা বলে, 'তুমি নিজেই একটি কিছু বাছিয়া লও না কেন? বল, 'আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই আমি তো শুধু তাহারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও দয়া।'

এখানে 'বি আয়াতিন' অর্থ কোরআন মজীদের আয়াত। অথবা ওই সকল মোজেজা, যা দেখতে চাইতো অবিশ্বাসীরা।

কালাবী বলেছেন, হিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ অবিশ্বাসী মক্কাবাসীরা রসুল স. এর নিকট বিভিন্ন নিদর্শন (আয়াত) দেখতে চাইতো। কখনো কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটলে তারা বলতো, হে মোহাম্মদ! আগের আয়াতগুলোর মতো তুমি নিজে নিজে নতুন কোনো আয়াত বানিয়ে নাও না কেনো? তাদের এ রকম অপকথনের জবাবরূপে এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে—'তুমি যখন তাদের নিকট কোনো আয়াত উপস্থিত করো না, তখন তারা বলে, তুমি নিজেই একটা কিছু বেছে নাও না কেনো? বলো, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।'

শেষে বলা হয়েছে—'এই কোরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও দয়া।' এ কথার অর্থ— কোরআন

আমার স্বরচিত কোনো বাণী নয়। কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার এক অতুলনীয় নিদর্শন। যারা এ কথা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এই কোরআন পথনির্দেশ ও দয়া।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৪

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

❒ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদিগের প্রতি দয়া করা হয়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআন মজীদ পাঠ করার সময় মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। এ রকম করলে কোরআন পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের উপর বর্ষিত হবে আল্লাহ্তায়ালার রহমত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু আইয়াজের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম দিকে নামাজীরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে আবী শাইবা এবং সুনান গ্রন্থে বায়হাকী। হজরত আবু হোরায়রার অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে জোরে শব্দ করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নামাজ পাঠ করছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। ইতোপূর্বে নামাজের মধ্যেও সালাম আদান প্রদান চলতো। তাই আমি সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার তিনি নামাজ শেষ করে আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্তায়ালা যা চান তাই করেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেছেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর রসুল স. নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী। হজরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকে লোকেরা নামাজে কথাবার্তা বলতো। নামাজ পাঠরত ব্যক্তিকে আগন্তুক জিজ্ঞেস করতো, কতো রাকাত পড়েছো? নামাজী জবাব দিতো, এতো রাকাত পড়েছি। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। এই আয়াতে চুপচাপ মনোযোগের সঙ্গে কোরআন পাঠ শুনতে বলা হয়েছে। আবদুর রাজ্জাক, আব্দ ইবনে হুমাইদ, আবু শায়েখ, ইবনে জারীর।

জুহাক বর্ণনা করেছেন, লোকেরা নামাজের মধ্যে একে অপরকে ডাকতো। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আব্দ ইবনে হুমাইদ।

উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, নামাজের অভ্যন্তরে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ইমাম আবু হানিফা এবং এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, কম-বেশী, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, অথবা বাধ্য হয়ে, যেভাবেই হোক না কেনো, নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে বেখেয়ালে সালাম করলে নামাজ বাতিল হয় না। অন্য তিন ইমাম বলেছেন, ভুলবশতঃ কথা বললে, সালাম করলে, নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় না এ কথা জেনেও কথা বলে ফেললে, সালামের সঙ্গে অন্য কথা বললে, অথবা আপনা আপনি মুখ থেকে সালাম উচ্চারিত হলে নামাজ বাতিল হবে না— কথা যতো বেশিই হোক না কেনো।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ভুলে অথবা না জেনে নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বললে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, নামাজের মধ্যে নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এ রকম বিষয়ে কথা বললেও নামাজ নষ্ট হয় না। যেমন— অন্ধকে রাস্তা বলে দেয়া, বিপথগামীকে পথের সন্ধান বলে দেয়া ইত্যাদি। এক্ষেত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে সিরীনের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটি তিন ইমামের ঐকমত্যের দলিল। সেখানে বলা হয়েছে, একবার রসুল স. আমাদেরকে মাগরিব অথবা ইশা— যে কোনো এক ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়েছিলেন। দু'রাকাত নামাজ পড়ে তিনি সালাম ফিরালেন। মনে হলো তিনি স. খুবই রাগান্বিত। মসজিদের মধ্যে পড়ে ছিলো একটি তক্তা। তিনি তাতে হেলান দিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে আঙ্গুলের জাল বানালেন এবং বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন তাঁর দক্ষিণ গণ্ডদেশ। আমি তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। সবাই বলাবলি করতে লাগলো, নামাজ কি কসর (সংক্ষিপ্ত) হয়ে গেলো? হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। কিন্তু তাঁরাও রসুল স.কে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সেখানে উপস্থিত লম্বা হাতবিশিষ্ট একজনকে বলা হতো জুলইয়াদাইন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! নামাজ কি কসর হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন না। কসরও হয়নি। ভুলও হয়নি (পুরো নামাজই আমি পড়িয়ে দিয়েছি)। এরপর তিনি স. অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জুলইয়াদাইন কি ঠিক কথা বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। এ কথা শুনেই রসুল স. সামনে চলে গেলেন এবং বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ পড়ে নিলেন। শেষে সালাম ফিরিয়েই আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় চলে গেলেন এবং সাধারণ সেজদার মতো অথবা তার চেয়ে একটু দীর্ঘ সেজদা করলেন। তারপর মস্তক উত্তোলন করলেন। পুনরায়

আল্লাহু আকবর বলে সেজদায় চলে গেলেন এবং সাধারণ সেজদার মতো অথবা তদাপেক্ষা কিছু দীর্ঘ সেজদা করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

ইবনে সিরীনের নিকট এ ব্যাপারে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমি ইমরান বিন হুসাইনকে বলতে শুনেছি, তারপর তিনি স. সালাম ফিরিয়েছিলেন (এই কথাটুকু হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় নেই)। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটির বর্ণনাকারী।

হজরত ইমরান বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. আসরের নামাজ তিন রাকাত পড়িয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলো খারবাক নামক এক ব্যক্তি। তাঁর হাত ছিলো বেশ লম্বা। তিনি উচ্চস্বরে বিষয়টি বর্ণনা করলেন। রসুল স. তৎক্ষণাৎ গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, এ লোক কি ঠিক কথা বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দু'টো সেজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুলুল্লাহ্ স. এর ধারণা ছিলো, নামাজ পুরোপুরিই আদায় করা হয়েছে। ওদিকে জুলইয়াদাইনেরও ধারণা হয়েছিলো যে, নামাজ হয়তো সংক্ষেপ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এ রকম হলে তো নামাজ পূর্ণই হয়েছে। তাই তিনি ওরকম কথা বলেছিলেন। তাঁর ধারণায় নামাজ সংক্ষিপ্ত হওয়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাটিও বিদ্যমান ছিলো।

উপরের বর্ণিত হাদিস দু'টো বিশ্লেষণ করে যে আপত্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—

১. হজরত আবু হোরায়রা সপ্তম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন। আর জুলইয়াদাইন শহীদ হয়েছিলেন দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধে। সুতরাং এ কথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, ওই নামাজে হজরত আবু হোরায়রা ও জুলইয়াদাইন দু'জনে এক সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

২. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে বৈসাদৃশ্য। কেউ বলেছেন, রসুল স. দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, সালাম ফিরিয়েছিলেন তিন রাকাত পড়ে।

৩. হাদিসে ওই সময়ের কথা বলা হয়েছে, যখন নামাজের মধ্যে কথা বলা ছিলো জায়েয। তাই তখন হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলেছিলেন।

উল্লেখিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে— মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যানুসারে হাদিসটি বিশুদ্ধ। কারণ, বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেছিলেন হজরত যুশ্‌শামালাইন। কিন্তু হজরত জুলইয়াদাইন ইন্তেকাল করেছিলেন রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর। হজরত ইমরান বিন হুসাইনের বর্ণনায় জুলইয়াদাইনকে বলা হয়েছে খারবাক। আর হজরত যুশ্‌শামালাইনের আসল নাম ছিলো উমাইর। প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তিটি জুহুরীর বর্ণনায় প্রযোজ্য— যেখানে এসেছে, তখন যুশ্‌শামালাইন উঠে দাঁড়ালেন। আবু দাউদ।

আল্লামা সিজিস্তানী বলেছেন, নামের বিভ্রাট ঘটেছে এখানে। বর্ণনাকারীগণ ভেবেছেন, যুশ্‌শামালাইন এবং জুলইয়াদাইন একই ব্যক্তি। তাই তাঁরা জুলইয়াদাইনের পরিবর্তে উল্লেখ করেছেন যুশ্‌শামালাইনের কথা।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় কোনো তারতম্য নেই। হজরত ইমরান বিন হুসাইনের বর্ণনাতেও তো তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কথা আছে। তাঁর হাদিস সংকলন করেছেন মুসলিম। কিন্তু হজরত আবু হোরায়রার হাদিস অধিকতর বিশুদ্ধ। রসুল স. কয় রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও দোষের কিছু নেই। এতে করে হাদিসের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় না।

এখন অবশিষ্ট রইলো, নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গটি। হজরত জায়েদ বিন আরকাম ছিলেন মদীনাবাসী। তিনি বলেছেন, আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম। 'যখন কোরআন পাঠ আরম্ভ হয় তোমরা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করবে' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলো এবং আমাদেরকে নামাজে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হলো।

আবু সুলাইমান খাত্তাবী উল্লেখ করেছেন, হিজরতের কিছুকাল পরে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ কথাটি নিশ্চিত যে, হজরত আবু হোরায়ার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই নামাজে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং অন্যান্যদের কথাবার্তা বলা দ্বারা যে দলিল দেয়া হয়েছে, তার জবাব দেয়া হয়েছে দু'ভাবে। যেমন—

১. হজরত আবু আইয়ুব থেকে হাম্মাদ বিন যায়েদ উল্লেখ করেছেন, তখন নামাজিরা ইশারার মাধ্যমে 'হাঁ' বলেছিলেন। মুখে হাঁ উচ্চারণ করেননি। সুতরাং যে বর্ণনায় হাঁ বলেছেন— এ রকম বলা হয়েছে, সেই বর্ণনাটিরও উদ্দেশ্য হবে— মুখে হাঁ বলেননি, হাঁ বলেছিলেন ইশারায়।

২. হজরত আবু সাঈদ মুয়াল্লা বর্ণনা করেছেন, আমি মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ছিলাম। এমন সময় রসুল স. আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। নামাজ শেষ করার পর আমি রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমি নামাজ পড়ছিলাম তাই সাড়া দিতে পারিনি। রসুল স. বললেন আল্লাহ্পাক কি নির্দেশ দেননি— 'আসতাজীবু লিল্লাহি ওয়ালির্ রসুলিহি ইজা দাআ'কুম' (যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তোমাদেরকে আহ্বান করে, তখন তাদের ডাকে সাড়া দাও)। বোখারী।

ইমাম আবু হানিফা তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে হজরত মুয়াবিয়া বিন হাকামের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পড়ছিলাম। এমন সময় একজনের হাঁচি উঠলো, আমি বলে উঠলাম ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্। অন্যান্যরা আমার দিকে কটমট করে চাইলো। আমি বললাম তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো কেনো? তারা তাদের নিজেদের উরুদেশে হাত দিয়ে আঘাত করলেন। আমি বুঝলাম তারা আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে। নামাজ শেষ হলো। রসুল স. আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে এ রকম শিক্ষাদানকারী দেখিনি। তিনি আমাকে প্রহারও করলেন না, মন্দও বললেন না। বরং বললেন, এটা হচ্ছে নামাজ। নামাজের মধ্যে কথাবর্তা বলা জায়েয নয়। নামাজের মধ্যে রয়েছে কেবল তসবিহ্, তকবির এবং কোরআন তেলাওয়াত। মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কথাবার্তা বললে নামাজ নষ্ট হয়, কিন্তু ওজু নষ্ট হয় না। দারাকুতনী।

প্রথমোক্ত হাদিসটি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, হাদিসটি ইমাম আবু হানিফার পক্ষে নয়— বিপক্ষে। হাদিসটিতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসুল স. হজরত মুয়াবিয়াকে পুনরায় নামাজ পড়তে বলেছিলেন। এ কথা তিনি বলেননি। বরং বলেছিলেন, নামাজে কথা বলা যায় না। পরের হাদিসটির এক বর্ণনাকারীর নাম আবু কায়বা। তাকে বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল বলেছেন ইয়াহ্ইয়া বিন মুইন এবং আবদুর রহমান বিন ইসহাক। ইমাম আহমদ বলেছেন, তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য। তার বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। ইবনে হাব্বানও এ রকম বলেছেন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আতা এবং মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে জুমআর খুতবার প্রসঙ্গে। এর মাধ্যমে ইমামের খুতবা

প্রদানের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন আল্লামা সুয়ূতি। আমি খুতবার সময় চুপ থাকার মাসআলা বিবৃত করেছি সুরা জুমআর তাফসীরে।

ওমর বিন আবদুল আজিজ বর্ণনা করেছেন, বক্তার বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের নীরব থাকাই সমীচীন। কালাবী বলেছেন, প্রথম দিকে নামাজের সময় কোরআন পাঠকালে বেহেশত ও দোজখের প্রসঙ্গ এলে নামাজিরা কেউ কেউ চিৎকার করে উঠতো। জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করতো। পরিত্রাণ প্রার্থনা করতো জাহান্নাম থেকে। কেউ কেউ ধারণা করেছেন, নামাজে ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে ক্বেরাত না পড়ার হুকুম এই আয়াতের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা এবং জায়েদ বিন আসলাম থেকে বাগবী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠকালে লোকেরা উচ্চ শব্দ করতো, অর্থাৎ সরবে কোরআন পাঠ করতো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

বাগবী লিখেছেন, এক দল লোকের ইমাম হয়ে নামাজ পাঠের সময় হজরত মেকদাদ শুনতে পেলেন কেউ কেউ জোরে জোরে কোরআন পাঠ করছে। নামাজ শেষে তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি এ কথা জানোনা যে, নামাজে ইমামের কোরআন পাঠ নীরবে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হয়। আল্লাহ্তায়ালা এ রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। বাগবী আরো লিখেছেন, হাসান, জুহুরী এবং নাখয়ীও এ রকম বলেছেন যে, ইমামের পেছনে মোক্তাদীর ক্বেরাত নিষেধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। যারা বলেন জুমআর খুতবার সময় কথাবার্তা নিষেধ করার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে— তাদের চেয়ে হাসান ও জুহুরীর উক্তিটি অধিকতর উত্তম, কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর জুমআর নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মদীনায়।

বায়হাকী লিখেছেন, ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, ঐকমত্যানুসারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে নামাজ সম্পর্কে, খুতবা সম্পর্কে নয়। ইবনে হুম্মামও এ রকম বলেছেন।

মুজাহিদের মাধ্যমে বাগবী উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. নামাজে কোরআন পাঠ করছিলেন তখন এক আনসারী মোক্তাদীও কোরআন পাঠ করছিলেন। ওই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আমি ইমামের পিছনে মোক্তাদীর ক্বেরাত বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেছি সুরা মুরসালের তাফসীরে।

জুহুরীর মাধ্যমে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক আনসারী যুবক সম্পর্কে। এক নামাজে রসুল স. কোরআন পাঠ করছিলেন। ওই যুবকটিও তাঁর সাথে সাথে কোরআন পাঠ করছিলো।

আমি বলি, নামাজের বাইরে কোরআন পাঠ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সাঈদ বিন মানসুর বলেছেন, মোহাম্মদ বিন ক'াব থেকে বর্ণিত হয়েছে, লোকেরা রসুল স. এর নিকট থেকে কোরআন শিখতো। তিনি স. যা পাঠ করতেন, সকলেই সমস্বরে তাই পাঠ করতো। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 'লুবাবুন্ নুকুল' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, এই বর্ণনাটির মাধ্যমে স্পষ্ট জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি নামাজরত নয়, সে নামাজরত অথবা নামাজের বাইরের কাউকে কোরআন পাঠ করতে দেখলে কী করবে? কেবল নীরব থাকবে, না মনোযোগের সঙ্গে শুনবেও। এই মাসআলাটির ব্যাপারে মতপার্থক্য বিদ্যমান। বায়যাবী লিখেছেন, আলেমগণের মতে এমতাবস্থায় মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা মোস্তাহাব— ওয়াজিব নয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, আলেমগণের কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, নামাজের ভিতরে ও বাইরে— উভয় অবস্থায় কোরআনের আবৃত্তি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা ওয়াজিব।

খুলাসা গ্রন্থে রয়েছে, কোনো ফেকাহ্‌র গ্রন্থ লিপিবদ্ধকালে কারো সামনে যদি কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়— তখন গ্রন্থ রচনাকারী যদি কোরআন পাঠের দিকে মনোযোগী হতে না পারে, তবে কোরআন পাঠক গোনাহ্‌গার হবে। এই সূত্রটি ধরে এই মাসআলাটিও এসেছে যে, রাতে ছাদের উপর কেউ চিৎকার করে কোরআন পাঠ করলে সে গোনাহ্‌গার হবে, যেহেতু তা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে মানুষের বিশ্রাম ও নিদ্রায়। আলোচ্য আয়াতে মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, বিশেষ একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা।

আমি বলি, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. রাতে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরে থেকেও ওই কোরআন পাঠ শ্রুত হতো। আর অনেকেই তা মন দিয়ে শুনতেন। হজরত উম্মে হানী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি রাতে আমার গৃহের ছাদের উপর শয়ন করতাম। তখন শুনতে পেতাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। ওই হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে আ'রিস শব্দটি। বাগবী তাঁর 'শারহুস সুন্নাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, আ'রিস অর্থ ছাদ। তখনকার মক্কার ঘরগুলোকে আ'রিস বলা হতো এই কারণে যে, সেগুলোতে থাকতো কাঠের ছাদ। মঞ্চের মতো নির্মিত ওই ছাদগুলোতে মানুষ উপবেশন করতো অথবা শয়ন করতো। আবু দাউদ।

তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শয়নগৃহে রসুল স. এর কোরআন পাঠ বাইরের মানুষও শুনতে পেতো। তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীগণ কেউ কেউ ওই সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে জননী আয়েশা

রা. বলেছেন, আমি রসুল স. এর সামনে শুয়ে থাকতাম। তিনি নামাজ পাঠ করতেন। সেজদার সময় আমার পায়ে হাত রেখে সরিয়ে নেয়ার ইশারা করতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। সেজদা শেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় প্রসারিত করে দিতাম পা। তখন ঘরে কোনো আলো থাকতো না। এছাড়া সাহাবীগণের সাধারণ অভ্যাস ছিলো এই যে, তাঁরা দিনে রাতে সব সময় উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন। কেউ কারো বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন না।

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার আমাকে বললেন, তুমি গত রাতে কোরআন তেলাওয়াত করছিলে। আর আমি তোমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। বোখারী ও মুসলিমে আরো এসেছে হজরত আবু মুসা বলেছেন, রসুল স. বলতেন, সফরের সময়েও আমি আমার সফরসঙ্গী আবু মুসার কণ্ঠস্বর চিনতে পারি— যখন সে কোরআন তেলাওয়াত করে। যে স্থানে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়, সেই স্থানও আমি চিনে নিতে পারি। অথচ দিনের বেলায় চিনতে পারি না। এতে করে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধযাত্রার সময় রাত্রে হজরত আবু মুসা কোরআন পাঠ করতেন, তখন সৈনিকদের অনেকেই থাকতেন নিদ্রিত।

ইবনে আবী দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আলী বিন আবী তালেব একবার মসজিদের মধ্যে কিছু লোকের কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন এবং বললেন, এ সকল লোকের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ। রসুল স. এ রকম পছন্দ করতেন। —এ সকল হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খুলাসা রচয়িতার অভিমতটি ভুল।

হজরত মুয়াবিয়া বলেন, সম্ভবতঃ আমি হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল প্রমুখ সাহাবীকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলে শ্রোতার উপর কি মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা ও চুপচাপ থাকা ওয়াজিব? তাঁরা বললেন, 'যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ সহকারে শোনো ও চুপ করে থাকো।' —এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ইমামের পিছনে মোক্তাদীর কোরআন পাঠকে নিষিদ্ধ করার জন্য।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল কোরআন শব্দটির মধ্যে যে আলিফ লাম রয়েছে, তা আহাদি (সীমাবদ্ধ) —জিনস্ (সামগ্রিক) বুঝানোর জন্য নয়। আলিফ লাম এর এ রকম প্রয়োগের মাধ্যমে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, কোরআনের ওই তেলাওয়াত তোমরা মনোযোগের সঙ্গে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো যা পাঠ করা হয় তোমাদেরকে শোনানোর জন্যই। যেমন— ইমাম কোরআন পাঠ করেন মোক্তাদীকে শোনানোর জন্য, জনসমাবেশে বক্তা তেলাওয়াত করেন সমবেত জনতাকে শোনানোর জন্য, ক্বারী সাহেব তেলাওয়াত করেন তাঁর ছাত্রদেরকে শেখানোর জন্য ইত্যাদি। আল্লাহ্তায়ালাই সঠিক তত্ত্ব অবগত।

দ্রষ্টব্যঃ নিজের কোরআন পাঠে অথবা ইমামের তেলাওয়াতে বেহেশত দোজখের প্রসঙ্গ এলে সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত প্রার্থনা ও দোজখ থেকে পরিত্রাণ কামনা করা উচিত নয়। বরং স্বাভাবিক গতিতে তেলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কালাবীর এ রকম অভিমত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নীরবে কোরআন পাঠ শ্রবণকারীর জন্য রহমতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। সে কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে এভাবে— যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্ত্বেও যারা কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে উদাসীন, তাদের রহমত পাওয়া বা দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মাসআলা ঃ একা একা ফরজ নামাজ পাঠকারীও কোরআন তেলাওয়াতের সময় বেহেশতপ্রার্থনা বা দোজখমুক্তির প্রার্থনা করতে পারবে না। কিন্তু নফল নামাজ পাঠকারী তার নামাজে তেলাওয়াতের সময় জান্নাতের প্রসঙ্গ এলে জান্নাত প্রাপ্তির জন্য এবং জাহান্নামের প্রসঙ্গ এলে তা থেকে মুক্তির জন্য নামাজের মধ্যেই দোয়া করতে পারবে। বরং এ রকম করাই উত্তম। আর নফল নামাজের তেলাওয়াতে মনোযোগও দিতে হবে অত্যন্ত গভীরভাবে।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে একবার রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়লাম। রসুল স. কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে জান্নাতের কথা পাঠ করলে পাঠ থামিয়ে জান্নাতপ্রাপ্তির প্রার্থনা করলেন। আবার দোজখের বিবরণ এলে তেলাওয়াত থামিয়ে দোয়া করলেন দোজখ থেকে পরিত্রাণের জন্য।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৫

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

❒ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে। এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নামাজের ক্বেরাতের উচ্চারণসীমা নির্দেশ করা হয়েছে। 'ওয়াজকুর রব্বাকা ফি নাফসিকা' কথাটির মধ্যে উল্লেখিত জিকির অর্থ নামাজের ক্বেরাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নামাজের মধ্যে গোপনে, মনে মনে ক্বেরাত পাঠ করবে। ওয়া দুনাল জাহ্রি মিনাল

ক্বওলি— এখানে আল জাহরি অর্থ, প্রকাশ্য নামাজ (যে নামাজে জোরে ক্বেরাত পড়তে হয়)। দুনাল জাহরি অর্থ অনুচ্চস্বরে। অর্থাৎ সুউচ্চস্বরের চেয়ে কম আওয়াজে এবং নিঃশব্দ আওয়াজের চেয়ে কিছুটা উচ্চস্বর। এ রকম বলার উদ্দেশ্য এই যে— যে নামাজগুলোতে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠের বিধান রয়েছে সে নামাজগুলোর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন পাঠ কোরো, অতিরিক্ত চিৎকার কোরো না। বরং এমন শান্তভাবে সুমধুর স্বরে পড়ো যেনো পশ্চাতের ব্যক্তিদের শুনতে কোনো অসুবিধা না হয়।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, কোরআন পাঠ করো মধ্যবর্তী আওয়াজে— খুব নিম্নস্বরে নয়, আবার খুব উচ্চ স্বরেও নয়। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন— তোমরা তোমাদের আওয়াজ অতি উচ্চ কোরো না এবং কোরো না অতি নিম্ন। বরং অবলম্বন করো মধ্যবর্তী পন্থা। হজরত আবু কাতাদার স্পষ্ট হাদিসেও এই বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, এক রাতে রসুল স. হজরত আবু বকরের গৃহে গমন করে দেখলেন, তিনি নামাজে মনে মনে কোরআন মজীদ পাঠ করছেন। এরপর হজরত ওমরের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজে কোরআন পাঠ করছেন উচ্চস্বরে। পরদিন দু'জনে রসুল স. এর দরবারে এলে তিনি স. হজরত আবু বকরকে বললেন, নামাজে এমনভাবে কোরআন পাঠ করো যে শোনাই যায় না। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি যার ইবাদত করি, তাঁকে শোনানোই আমার উদ্দেশ্য। রসুল স. তখন হজরত ওমরকে বললেন, তুমি তো কোরআন পাঠ করো উচ্চকণ্ঠে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করি এ জন্য যে, শয়তান যেনো আমার আওয়াজ শুনে পালিয়ে যায় এবং নিদ্রামগ্ন লোকেরা জাগ্রত হয় ইবাদতের জন্য। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, তুমি তোমার আওয়াজ কিছুটা বাড়াও এবং হজরত ওমরকে বললেন, তুমি তোমার আওয়াজ কিছুটা কমাও। আবু দাউদ। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রেবাহ আনসারী থেকে তিরমিজিও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোরআন পাঠের উচ্চারণসীমা সম্পর্কিত নির্দেশনাটি আসলে এ রকম— নীরবে ও সরবে, দু'ভাবেই তোমরা পাঠ করো কোরআন মজীদ। কিন্তু অতি উচ্চকণ্ঠ হয়ো না। কখনো পাঠ করো আওয়াজ করে, কখনো পাঠ করো বিনা আওয়াজে। পাঠ করো দু'ভাবেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রাতের নামাজে রসুল স. কখনো উচ্চ কণ্ঠে আবার কখনো নিম্ন কণ্ঠে কোরআন পাঠ করতেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাই কায়েস বর্ণনা করেছেন, আমি জননী আয়েশার নিকট রসুল স. এর ক্বেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, হে আমাদের জননী! আপনি দয়া করে বলুন, রসুল স. কীভাবে কোরআন পাঠ করতেন— সশব্দে না নিঃশব্দে? জননী বললেন, দু'রকমভাবেই কোরআন পাঠ করতেন তিনি— কখনো শব্দবিবর্জিতভাবে আবার কখনো শব্দসহযোগে। আমি বললাম, আল্লাহ্তায়ালার শোকর। রসুল স. তো সকল নিয়মই সিদ্ধ রেখেছেন। তিরমিজি। তিরমিজির মতে হাদিসটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুর্লভ।

দ্রষ্টব্যঃ রাতে নামাজে এবং নামাজের বাইরে কিরূপে কোরআন পাঠ করতে হবে— সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন রকমের উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মনে মনে কোরআন পাঠ করা মকরূহ্। কোরআন পাঠ করতে হবে স্পষ্ট উচ্চারণে। তার প্রমাণ স্বরূপ রয়েছে হজরত উম্মে হানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসগুলো— যেগুলোতে বলা হয়েছে, রসুল স. গৃহমধ্যে কোরআন পাঠ করতেন। কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যেতো বাইরে থেকে। হজরত উম্মে হানী বলেছেন, তিনি রসুল স. এর কোরআন পাঠ শুনতে পেতেন তাঁর গৃহের ছাদ থেকে।

জমহুরের অভিমত হচ্ছে, সশব্দে বা নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করার বিষয়টি পাঠকের নিজস্ব বিষয়। ইচ্ছে করলে সে সশব্দে, আবার ইচ্ছে করলে নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করতে পারবে। হজরত আবু হোরায়রা এবং জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. কখনো কোরআন তেলাওয়াত করতেন উচ্চ কণ্ঠে আবার কখনো কোরআন তেলাওয়াত করতেন নিম্ন কণ্ঠে।

তাহাবী লিখেছেন, হজরত উম্মে হানী এবং হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসগুলোতে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠের কথা বলা হলেও রসুল স. কখনো নিঃশব্দে বা নিম্নস্বরে কোরআন পাঠ করেননি— এ রকম কোনো কিছু বলা হয়নি। অর্থাৎ সব সময়ই তিনি উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করতেন, এ রকম কথা তাদের হাদিসে নেই। হজরত আবু হোরায়রার এক হাদিসে বলা হয়েছে, নামাজী ব্যক্তি ইচ্ছে করলে নিঃশব্দে কোরআন পাঠ করতে পারে। আবার পাঠ করতে পারে উচ্চস্বরেও। অবশ্য শেষের উক্তিটিই অধিকতর উত্তম। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ এই অভিমতটির স্বপক্ষে।

যারা নামাজীকে সশব্দে বা নিঃশব্দে— যে কোনোভাবে কোরআন পাঠের স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যেও রয়েছে দু'টি দল। এক দলের মতে নিঃশব্দে পাঠ করাই উত্তম। কেননা হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, উচ্চস্বরে কোরআন পাঠকারী সর্বসমক্ষে সদকা প্রদানকারীর মতো এবং নিঃশব্দে কোরআনপাঠকারী গোপনে সদকা প্রদানকারীর

মতো। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম সূত্রসম্বলিত। এ কথা সন্দেহাতীত সত্য যে, প্রকাশ্য দান অপেক্ষা গোপন দান উত্তম। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— তোমরা প্রকাশ্যে যদি দান করো তবে তা উত্তম। আর যদি গোপন রাখো এবং দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

হজরত আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, আমি ইব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি কোরআন মজীদ দেখে দেখে পাঠ করছেন। একটু পরে এক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলো। ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি কোরআন মজীদ গুটিয়ে ফেলে পৃথক স্থানে রেখে দিলেন। বললেন, ওই লোকটি যাতে বুঝতে না পারে যে আমি সব সময় কোরআন মজীদ পড়ি।

আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন, আমি জনৈক সাহাবীর নিকট বসেছিলাম। আরো কয়েকজন উপবিষ্ট ছিলো সেখানে। এক লোক বললো, আমি রাতে এতদূর পর্যন্ত কোরআন শরীফ পাঠ করেছি। সাহাবী বললেন, কোরআন মজীদ পাঠ করা এতটুকুই ছিলো তোমার ভাগ্যে।

অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, উচ্চ কণ্ঠে কোরআন মজীদ পাঠ করাই উত্তম। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে কতিপয় হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরো কতিপয় হাদিস বর্ণনা করা হলো।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর সুমধুর স্বরের কোরআন পাঠ যেভাবে শ্রবণ করেন, সেভাবে আর কোনো কিছুই শ্রবণ করেন না। এখানে শ্রবণ করেন অর্থ প্রসন্ন হন এবং গ্রহণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, রসুল স. একবার মন্তব্য করলেন, হে আবু মুসা! নবী দাউদের কণ্ঠস্বর থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে একটি কণ্ঠস্বর।

হজরত ফুজালা বিন উবাইদ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, রমণীদের সঙ্গীত যেমন মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করা হয়, তার চেয়ে অধিক মনোযোগের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা শ্রবণ করেন সুমধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট কোরআন পাঠকের আবৃত্তি।

আবু দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ হজরত বারা বিন আজীব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা পবিত্র কোরআনকে সজ্জিত করো (সুমধুর স্বরে কোরআন পাঠ করো যাতে শ্রোতার শ্রুতি ও অনুভব প্রশান্ত হয়)।

নীরব পাঠ উত্তম না সরব— এই বিষয়টির সমাধান প্রদানার্থে ইমাম গাজ্জালী এবং কিছু সংখ্যক আলেম উল্লেখ করেছেন, যদি পাঠক ধারণা করে, উচ্চ কণ্ঠে কোরআন পাঠ করলে অন্তরে অহমিকার সৃষ্টি হবে, তবে তার জন্য নিঃশব্দ পাঠই উত্তম। আর অহমিকা থেকে নির্ভয় বোধ করলে উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করাই উত্তম। এতে করে অন্যেরও উপকার হয়। পাঠক ও শ্রোতা দু'জনেই হয় উজ্জীবিত। দূর হয়ে যায় আলস্য, নিদ্রা এবং জড়তা। নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে উঠে মনোযোগী হতে পারে তার ইবাদতে। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলতে হয়— সশব্দে কোরআন পাঠই উত্তম। এতে সওয়াবও হয় বেশী। তাই আমরা বলি, পবিত্র কোরআন দেখে পড়াই উত্তম।

আমি বলি, এ কথাটি সন্দেহাতীত যে, সশব্দে কোরআন পাঠের স্বপক্ষে রয়েছে অনেক হাদিস। এ পক্ষে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের রয়েছে অসংখ্য উক্তি ও আমল। কিন্তু এই বিধানটি ওই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য, যার অন্তরে রিয়া আগমনের কোনো সম্ভাবনা নেই। রিয়ামুক্ত তেলাওয়াত মানুষের জন্য কিছুতেই বিব্রতকর বা কষ্টকর নয়। বরং তা হৃদয়হারক। কিন্তু অহমিকার সম্ভাবনা থাকলে সশব্দে পাঠ না করাই উত্তম। অর্থাৎ অহমিকার সম্ভাবনা না থাকলে সশব্দে কোরআন পাঠ মোস্তাহাব। যদি কিছু লোক কোরআন শ্রবণের জন্য একত্র হয় তবে সশব্দে কোরআন পাঠ করা অধিকতর উত্তম। কিন্তু শ্রমসাধ্য ও চিৎকার সর্বস্ব কোরআন পাঠ জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন, দুনাল জাহরি মিনাল ক্বওলি।

ইমাম মোহাম্মদ তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক সূত্রে আবু সুহায়েলের পিতার উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব নামাজে এতো জোরে ক্বেরাত পাঠ করতেন যে, আমি আবু জাহিমের ঘরের কাছ থেকেই তাঁর ক্বেরাত শুনতে পেতাম। এ কারণেই ইমাম মোহাম্মদ বলেন, জেহেরী (সরবে পঠিতব্য) নামাজে উচ্চস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা উচিত। কিন্তু এতো উচ্চস্বরে পাঠ করা উচিত নয়, যাতে পাঠক কষ্টের মধ্যে পড়ে।

একটি প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র জিকির ও দোয়ায় উচ্চকণ্ঠ হওয়া বেদাত। নিঃশব্দে এবং অনুচ্চস্বরে জিকির করা এবং দোয়া করা সুন্নত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে জিকিরের আলোচনাসূত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ক্বেরাতের। তাহলে ক্বেরাত ও জিকিরের মধ্যে পার্থক্য কী? ক্বেরাতও তো জিকির— নয় কি?

উত্তর ঃ কোরআনের মধ্যে রয়েছে অনেক উপদেশ, অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এবং অনেক জরুরী বিধান। কোরআনের বিবরণ ও ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী, মাধুর্যমণ্ডিত এবং প্রাঞ্জল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জিকির অপেক্ষা অতিরিক্ত। জিকিরের মাধ্যমে

অন্তরের ঔদাসিন্য বিদূরিত হয়। জিকির স্বয়ং একটি ইবাদত। কিন্তু এর মধ্যে অন্যকে শোনানোর মতো কিছু নেই— যেরকম রয়েছে কোরআনে। আর কবুল হওয়া না হওয়াই দোয়ার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এর মধ্যেও অন্যকে জানানোর কিছু নেই। তাই নীরব জিকির ও দোয়া সর্বোত্তম। নীরব জিকিরের গতি মগ্নতার দিকে। জিকিরে মগ্ন ব্যক্তির স্মৃতিপটে কেবল আল্লাহ্ই সমুদ্ভাসিত থাকেন। এভাবেই তার লাভ হয় ফানাফিল্লাহ। এ সকল বৈশিষ্ট্য আবার ক্বেরাতের মধ্যে নেই।

দ্রষ্টব্য ঃ শো'বা বর্ণনা করেছেন, আমাকে হজরত আবু উবায়দা 'তোমরা সুমধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা পবিত্র কোরআনকে অলংকৃত করো'— এই হাদিসটি প্রচার করতে নিষেধ করেছিলেন। হজরত আবু উবায়দা তখন বলেছিলেন, এ হাদিস শুনলে লোকেরা কোরআনকে কেন্দ্র করে সুর চর্চা ও স্বর চর্চা শুরু করে দিতে পারে। এরপর অবশ্য হজরত আবু উবায়দা সুমধুর স্বরে কোরআন পাঠ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে— কোরআন পাঠ করতে হবে আল্লাহ্র ভয় ও ভালোবাসা বুকে নিয়ে আবেগপ্রবণ স্বরে— নিছক প্রমোদ কিংবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে নয়। কেবল কণ্ঠশৈলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শনের জন্যও নয়। তাঁর এ উক্তির স্বপক্ষে মারফু সূত্রে ও অন্যান্য সূত্রে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাউসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম কোরআন পাঠকারী কে? তিনি স. বললেন, ওই ব্যক্তি— যার পাঠ শুনলে মনে হয় আল্লাহ্র ভয় বুকে নিয়েই সে কোরআন পাঠ করছে।

দারেমী বলেছেন, তাউসের বর্ণনাটি মুরসাল। বর্ণনাটির সারমর্ম হচ্ছে, ওই ব্যক্তিই সুমধুর স্বর বিশিষ্ট পাঠক, যার পাঠের সঙ্গে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার ভয়।

হজরত হুজায়ফা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবী উচ্চারণে ও নিয়মে কোরআন পাঠ করো। ওই দুই কিতাবওয়ালাদের সঙ্গিতমুখীনতা থেকে বিরত থাকো। ভবিষ্যতে এমন লোক আসবে, যারা গানের সুরে অথবা বিলাপ বা শোকগাঁথার সুরে কোরআন পাঠ করবে। কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌছবে না। তাদের ও তাদের অনুরাগীদের অন্তর ফেতনায় নিমজ্জিত হবে। বায়হাকী এবং রজীন তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

মুজাহিদ বলেছেন, জিকির করবে অন্তরে অন্তরে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। অর্থাৎ দোয়ার মধ্যে থাকতে হবে বিনয় ও শঙ্কা। উচ্চকণ্ঠ হবে না। চিৎকার করে আল্লাহ্কে ডাকাডাকি করবে না। মনে মনে দোয়া করলে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

আমি বলি, এখানে 'অনুচ্চস্বরে' এবং 'মনে মনে' কথা দু'টের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংযোগ। কথা দু'টোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিকিরে জেহেরী (উচ্চস্বরের জিকির) এবং জিকিরে খফিকে (মনে মনে জিকিরকে)। 'উদ্উ রব্বাকুম তাদ্বার্‌রুআঁ'ও ওয়া খুফ্ইয়াতান' (তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো সবিনয়ে চুপেচুপে) আয়াতের তাফসীরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, মনে মনে ও অনুচ্চস্বরে জিকির করার হুকুমটি প্রযোজ্য হবে মোক্তাদির উপর। অর্থাৎ ইমামের ক্বেরাত শেষ হলে মোক্তাদিরা মনে মনে বা অনুচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠ করবে। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। বায়যাবীর অভিমতটি কিন্তু ভুল। কেননা এই আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে কেবল রসুল স.কে। তিনি স. ছিলেন ইমাম। তাই এখানে সম্বোধনের শব্দরূপটি একবচনের। মোক্তাদিদেরকে সম্বোধন করা হলে এখানে বহুবচনের সম্বোধনরূপ ব্যবহৃত হতো। যেমন আগের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা মনযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।' আরেকটি কথা এই যে, ক্বেরাত জেহেরী বা সির্‌রি (সশব্দ বা নিঃশব্দ) যে রকমই হোক না কেনো চুপচাপ মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে হবে। শুনতে না পেলেও অভিনিবেশী হতে হবে ইমামের ক্বেরাতের প্রতিই। এ রকম না করলে মোক্তাদির আমল হয়ে যাবে পূর্বের আয়াতের নির্দেশনা বিরোধী। মোক্তাদি ইমামের ক্বেরাতের প্রতি মনোযোগী হবে, আবার নিজেও ক্বেরাত পাঠ করবে— এ রকম তো হতেই পারে না। আর ইমামের ক্বেরাত শেষ হলে তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে চলে যাবেন। মোক্তাদীকেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। তাহলে মোক্তাদি আবার ক্বেরাত পড়বে কখন। তাই আলেমগণ বলেছেন, ইমামের অনুসরণ করা যেহেতু ফরজ, তাই ইমাম রুকুতে থাকবে আর মোক্তাদি ক্বেরাত পাঠ করবে— এ রকম করা কিছুতেই জায়েয নয়। আবার ক্বেরাত শেষে ইমাম রুকুতে না গিয়ে যদি মোক্তাদির ক্বেরাত পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তো তিনি আর ইমামই রইলেন না— মোক্তাদির অনুগত হয়ে গেলেন।

'বিল গুদুয়্যি' অর্থ প্রত্যুষে, ভোরে, প্রভাতে অথবা দিবসের প্রারম্ভে। শব্দটি মূল ধাতু। কামুস গ্রন্থে রয়েছে 'আল গুদুওয়াতু' শব্দটির 'গইন' অক্ষরকে পড়তে হবে পেশ সহযোগে। 'গুদওয়াতু' অর্থ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়।

'ওয়াল আসলি' অর্থ দিবসের শেষ ভাগ। শব্দটি 'আসিল' শব্দের বহুবচন। বাগবী লিখেছেন, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়কে বলে 'আসিল'। প্রত্যুষ ও সায়াহ্ন— সময় দু'টো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই ওই দুই সময়ে জিকির করতে

বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্‌র জিকির তো করতে হবে সর্বক্ষণ। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়ালা তাকুম্ মিনাল গফিলিন' (এবং তুমি উদাসীন হবে না)। এ কথার অর্থ— কোনো সময়েই আল্লাহ্‌র জিকির থেকে অমনোযোগী হবে না।

আমি বলি, আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে— 'ওয়াজকুর্‌রব্বাকা ফি নাফসিকা'। পরে বলা হয়েছে 'বিল গুদুয়্যি ওয়াল আসালি ওয়ালা তাকুম্ মিনাল গফিলিন'। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে 'জিকির' বলে সব রকম জিকিরকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআন তেলাওয়াত অথবা অন্য যে কোনো ধরনের জিকির এই আয়াতের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র স্মরণের বিষয়ে উদাসিনতা বা অমনোযোগিতা দূর করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য— যে কোনো ধরনের জিকিরের মাধ্যমে হোক না কেনো।

সুরা আ'রাফ ঃ আয়াত ২০৬

اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ یَسْجُدُوْنَ۩ ٥ السجدة

❐ যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহংকারে তাঁহার ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

এখানে 'যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে' কথাটির উদ্দেশ্য— ফেরেশতাবৃন্দ, নবী রসুলগণ এবং পুণ্যবানগণ। এঁরাই আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, সান্নিধ্য বা নৈকট্য বলতে আমরা যা বুঝি, সে রকম নৈকট্য বা সন্নিধান আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে কারো হয় না। কারণ তিনি দেহবিশিষ্ট বা স্থানবিশিষ্ট নন। আক্ষরিক অর্থে তাঁর সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য পাওয়ার অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাবান (মুআয্‌যাজ ও মুকাররম) হওয়া।

এরপর বলা হয়েছে—'তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই নিকট সেজদাবনত হয়।' এ কথার অর্থ— ফেরেশতা, নবী-রসুল এবং পুণ্যবানেরা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রকৃত দাস। একনিষ্ঠ দাসত্ব করেন বলেই তাঁরা অহংকার থেকে বিমুক্ত। অহংকার হচ্ছে আল্লাহ্‌র দাসত্ব বিরোধী একটি অপবিত্র অনুভূতি। তাই যারা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্নিধানপ্রাপ্ত তাঁরা অহমিকামুক্ত দাসত্বে অভ্যস্ত। তাঁরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করেন। বলেন, 'সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'লা' (পবিত্র সেই প্রভুপ্রতিপালক, যিনি মহানতম)। আর তাঁরা সেজদাবনত হন কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। সে সেজদায় অন্য কারো কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব থাকে না।

মা'দান বিন তালহা বর্ণনা করেন, আমি একবার হজরত ছাওবানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ছিলেন রসুল স. এর মুক্ত করা ক্রীতদাস এবং বিশিষ্ট সাহাবী। আমি বললাম, হজরত! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যে আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম। এবারেও নীরব রইলেন তিনি। তৃতীয়বার যখন আমি একই প্রশ্ন করলাম, তখন তিনি বললেন, আমি রসুল স. এর নিকটে এই প্রশ্নটিই করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্কে বেশী বেশী সেজদা করো। তুমি যে সেজদা করবে, আল্লাহ্পাক তোমার মর্যাদা তদপেক্ষা এক গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন তোমার একটি গোনাহ্। মা'দান আরো বর্ণনা করেন, এরপর আমি দেখা করলাম হজরত আবু দারদার সঙ্গে। তাঁর নিকটও আমি একই প্রশ্ন করলাম। তিনিও আমাকে একই জবাব দিলেন, যে জবাব দিয়েছিলেন হজরত ছাওবান। মুসলিম।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, বান্দা আল্লাহ্কে সেজদা করলে ওই সেজদার কারণে আল্লাহ্তায়ালা তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং মার্জনা করেন একটি পাপ। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, বাগবী।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুপ্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদাবনত অবস্থায় বেশী বেশী দোয়া করো। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আরো রয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন আদম সন্তানেরা সেজদার আয়াত পাঠ করে আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়, তখন শয়তান কাঁদতে থাকে এবং দূরে সরে যায়। বলে— হায়! আদম সন্তানদেরকে সেজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তারা সেজদাও করেছে। ফলে তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে জান্নাত। আমাকেও সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আমি সে নির্দেশ পালন করিনি। তাই আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে জাহান্নাম। মুসলিম।

হজরত রবীয়া বিন কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি রাতে রসুল স. এর সঙ্গে থাকতাম। সংগ্রহ করে দিতাম তাঁর ওজুর পানি। গুছিয়ে দিতাম অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একবার তিনি স. আমাকে বললেন, বলো কী চাও? বললাম, আমি জান্নাতে আল্লাহ্র রসুলের সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি স. বললেন, অন্য কিছু যাচঞা করো। আমি বললাম, এটাই আমার বাসনা। তিনি বললেন, তাহলে বেশী বেশী সেজদা করে আমাকে সাহায্য করো (বেশী বেশী সেজদা করো যেনো জান্নাতে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে রাখতে পারি)। মুসলিম।

আমি তেলাওয়াতে সেজদার মাসআলা সুরা ইনশাক্কাত এর তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যথাস্থানে আলোচনাটি দেখে নেয়া যেতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

নির্দেশনাঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা করে নিবেন।

চতুর্থ খণ্ড শেষ